আল্লামা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ.

জীবন ও কর্ম

মাওলানা মুহাম্মাদ সালমান

আল-ইরফান পাবলিকেশান্স

আল্লামা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ.
জীবন ও কর্ম

লেখক ও প্রকাশক
মাওলানা মুহাম্মাদ সালমান
মিরপুর-১২, ব্লক-ধ, বাসা-২/৮৯, ঢাকা

প্রকাশকাল
রবিউল আওয়াল/১৪২৩ হি.
জৈষ্ঠ/১৪০৯ বাং.
মে/২০০২ ঈ.

প্রচ্ছদ
বশির মেসবাহ

অক্ষর বিন্যাস
মাওলানা ওয়াসি উদ্দীন

শুভেচ্ছা বিনিময়
দুইশত টাকা মাত্র

মুদ্রণ
মোহাম্মাদী প্রিন্টিং প্রেস
৪৯ হরনাথ ঘোষ রোড, লালবাগ, ঢাকা

পরিবেশক

আল-কাউসার প্রকাশনী	মজলিসে নশরিয়াতে ইসলাম
৫০ বাংলাবাজার, ঢাকা	৩৮ বাংলাবাজার, ঢাকা

Allamah Syed Abul Hasan Ali Nadwi : Life & activities
by Moulana Mohammad Salman.
Published by the author. Price: Tk. 200.00 / US$ 10.00

عزیز القدر سلمہ اللہ تعالیٰ

ان عزیز کا سعادت نامہ جس پر تاریخ نہیں ہے ملا،
ڈاکٹر اسحاق صاحب سے میں بہت عرصہ سے واقف ہوں جب وہ
دارالمصنفین لاندھ وہ آکر ٹھہرتے تھے۔ مولانا الیاس صاحب
کی سوانح کے بنگالی ترجمہ کے لئے مجھ سے بھی ابھی چند روز ہوئے
ایک صاحب جن کا نام عندم طوبیٰ اجازت مانگی تھی
اور میں نے اجازت دے دی تھی، اگر وہ یہ کام نہ کر سکیں تو
آپ یہ کام ضرور کیجئے گا، مگر تھوڑا انتظار کر لیجئے
باقی میری اور بہت کتابیں ہیں جن کا بنگالی ترجمہ ہونا
چاہئے، میں اس وقت بہت مشغول ہوں ایک سطر
اپنے ہاتھ سے لکھتے ہوں تاکہ تمہاری خوشی پوری ہو جائے

عزیزی مولوی سلمان سلمہ اللہ، لمبا یا خط ملا، خوشی ہوئی، رسائل
صحیح جگہ پر پہنچ گئے، مزید مسرت ہوئی، عرصہ سے ملاقات نہیں ہوئی، لمبا رکھنے
دعا کرتا ہوں،

[illegible]

12-2-80

হযরত মাওলানা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী (রহ.) এর পক্ষ থেকে মাওলানা মুহাম্মদ সালমান সাহেবের নিকট লিখিত একখানা পত্র। পত্রের শেষ প্যারাটি হযরত মাওলানা আলী মিয়ার স্বহস্তে লিখিত।

নদওয়াতুল উলামা লাখনৌ এর নাযেম
হযরত মাওলানা সাইয়েদ মুহাম্মদ রাবে' নদভী সাহেবের দো'আ

Phones 323864-229174
Fax 787010-700370
email rabeynadwi@yahoo.com

Mohammad Rabey Nadwi
Nadwatul Ulama
P.O. Box 93 Lucknow-226007,
U.P. (INDIA)

محمد الرابع الحسنی الندوی
ندوۃ العلماء، ص.ب ۹۳ لکناؤ (الہند)

Dated:20/05/2002

التاریخ: ۶/ ۳/ ۱۴۲۳ھ

بسم اللہ الرحمن الرحیم

کلمات دعائیہ

حضرت مولانا سید ابو الحسن علی حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ایسے عالم دین وداعی اسلامی کی زندگی گزاری جو گوناگوں صلاحیتوں اور عالمی بصیرت کی حامل تھی، انھوں نے اپنی ان صلاحیتوں سے امت اسلامیہ کی زندگی کے متنوع پہلوں میں رہبری کی اور حالات حاضرہ کو نظر میں رکھتے ہوئے ان خطرات سے متنبہ کیا جو امت اسلامیہ کو علاقائی اور عالمی دونوں سطح پر درپیش ہیں، انھوں نے متعدد خطرات کے ظاہر ہونے سے قبل انکی بعض علامات سے ہی انکی تشخیص کی جو عام طور پر بعد میں بالکل صحیح ثابت ہوئے۔

مجھے یہ سنکر بے حد خوشی ہوئی کہ مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندویؒ کے حالات زندگی اور کارناموں پر ایک کتاب بنگلہ زبان میں حضرت مولاناؒ کے مجاز مولانا محمد سلمان صاحب بنگلادیشی ترتیب دے رہے ہیں۔ بلا شبہ مرتب اور اس کام کے معاونوں کے لئے یہ بڑی سعادت کی بات ہے، میں اس پر مسرت کا اظہار کر رہا ہوں۔ اور دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کام کو قبول فرمائیں اور بہتر جزاء عطا فرمائیں، امین۔

۶/ ۳/ ۱۴۲۳ھ — محمد رابع حسنی ندوی
۲۰/ ۵/ ۲۰۰۲ء — ناظم ندوۃ العلماء لکھنؤ

رئیس ندوۃ العلماء، رئیس المجلس التعلیمی الدینی ورئیس المجمع الاسلامی العلمی بلکناؤ۔ وعضو رابطہ الأدب الاسلامی العالمیۃ ونائب رئیسہ

প্রসঙ্গ কথা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যুগে যুগে দিশেহারা মানব সমাজকে পথের সন্ধান দেওয়ার জন্য নবী ও রাসূল পাঠিয়েছেন। নবুয়ত ও রিসালাতের ধারা শেষ হওয়ার পর পরিবর্তনশীল জীবন ও সমাজের উপর প্রভাব ফেলতে পারে এমন সব ব্যক্তি এ ধরাধামে আবির্ভূত হয়েছেন, যাঁরা দূরদর্শিতা, জ্ঞান, মেধা ও আধ্যাত্মিক তরবিয়তের মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহর বিরুদ্ধে পরিচালিত সকল আগ্রাসনের দাঁতভাঙ্গা জবাব দিয়ে ইসলামের মর্যাদা সমুন্নত রাখতে সমর্থ হয়েছেন।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে এ উপমহাদেশ যে সকল সংস্কারক মহাপুরুষের আগমনে ধন্য হয়েছিল, হযরত মাওলানা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী (রহ.) ছিলেন তাদের অন্যতম। তিনি ছিলেন বালাকোটের শহীদ হযরত সাইয়েদ আহমাদ শহীদ (রহ.)-এর খান্দানের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে ইউরোপের সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিপ্লবের এবং পাশ্চাত্যের বিভিন্নমুখী হামলার ফলে পুরো মুসলিম জাহানে বিপর্যয় ও স্থবিরতার ছাপ ফুটে উঠেছিল। বিশেষ করে হিমালয়ান উপমহাদেশে ইংরেজ রাজত্ব কায়েম হওয়ার পর মুসলমানদের অবস্থা খুবই বিপন্ন হয়ে পড়ে। ফলে ঐ সময়ের আলেম-উলামা এবং সমাজসেবীদের সে চ্যালেঞ্জ মুকাবেলায় হিমশিম খেতে হয়।

এ কঠিন অবস্থায় হুজ্জাতুল ইসলাম মাওলানা কাসেম নানুতুবী (রহ.) দেওবন্দ আন্দোলনের মাধ্যমে, স্যার সৈয়দ আহমাদ আলীগড় আন্দোলনের মাধ্যমে এবং মাওলানা মুহাম্মাদ আলী মুংগেরী (রহ.) নদওয়াতুল উলামা আন্দোলনের মাধ্যমে নিজ নিজ চিন্তা চেতনা বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে এ দেশের মুসলমানদের বাঁচাবার চেষ্টা করেন। যুগের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় হযরত মুঙ্গেরী (রহ.) যে কর্মসূচী ও রূপরেখা প্রণয়নের সূচনা করেছিলেন, নদওয়াতুল উলামা সংগঠন ও দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামার মাধ্যমে তাতে অগ্রগতি সাধিত হতে হতে অবশেষে হযরত মাওলানা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভীর মাধ্যমে তা চূড়ান্তরূপ পরিগ্রহ করে।

হযরত মাওলানা ছিলেন একজন ইনসানে কামিল, এক জীবন্ত বিশ্বকোষ। তাঁর ছিয়াশি বছরের বর্ণাঢ্য জীবন ছিল নানা বৈচিত্র্যে ভরপুর। জীবদ্দশাতেই তাঁকে কয়েকটি আন্তর্জাতিক পুরষ্কার দেয়া হয়েছিল এবং তাঁর বিভিন্ন অবদানের উপর পৃথিবীর কয়েকটি ইউনিভার্সিটিতে পি.এইচ.ডি. করা হয়েছিল। সমসাময়িক উলামা মাশায়েখ তাঁকে রাজুলুন মাউহুব, মাজমাউল কামালাত, আয়াতুম মিন আয়াতিল্লাহ, মুওফ্ফাক মিনাল্লাহ ইত্যাদি খেতাবে ভূষিত করেছিলেন। আল্লাহ পাক তার কর্ম জীবনে অসাধারণ বরকত দান করেছিলেন। দীর্ঘ ১৪ বছর তিনি দৃষ্টি শক্তির ক্ষীণতার কারণে নিজে লেখাপড়া করতে পারতেন না। অপরকে ডিকটেশান দিয়ে লেখাতেন। এরপরও তাঁর জীবনের এই ঈর্ষণীয় সাফল্য তাঁর প্রতি আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের বিশেষ রহমত ছাড়া আর কিছু নয়।

এমন একজন ক্ষণজন্মা মনীষীর জীবনকথা বাংলা ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর সামনে তুলে ধরার প্রবল আকাঙ্ক্ষা বহু বছর ধরে মনের গহীনে লালন করছিলাম। হযরতের জীবদ্দশাতেই আশির দশকের পর হতে "জ্ঞান তাপস মাওলানা আবুল হাসান আলী নদভী, রায়বেরেলীর স্মৃতি, মুসলিম বিশ্বের গৌরব মাওলানা আবুল হাসান আলী নদভী, আরবী সাহিত্যপ্রেমিক মাওলানা আবুল হাসান আলী নদভী" ইত্যাদি শিরোনামে মাসিক মদীনা, দৈনিক ইনকিলাব, মাসিক দাওয়াতুল হক, সাপ্তাহিক মুসলিম জাহান প্রভৃতি পত্রিকায় আমার কয়েকটি লেখা ছাপা হয়েছিল। তাঁর ইন্তেকালের পর এ আবেগ আরো প্রবল হয়। নিজের অযোগ্যতা সত্ত্বেও আল্লাহপাকের উপর ভরসা করে, হযরতের মুহিব্বীনদের পরামর্শ নিয়ে এ জীবনীগ্রন্থ সংকলনের কাজে হাত দেই, **'আল্লামা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ. : জীবন ও কর্ম'** নামে যা এখন পাঠকের সামনে রয়েছে।

এ জীবন চরিতখানিকে একটি সংকলন গ্রন্থ বলা যেতে পারে। ফলে মাঝে মধ্যে একই বিষয়ের পুনরাবৃত্তি হওয়াও অস্বাভাবিক নয়। তাছাড়া এ গ্রন্থে বিভিন্ন বইপত্র ও সাময়িকীর সাহায্য নেয়া হয়েছে। প্রাথমিক প্রয়াস হওয়ায় এ গ্রন্থে কিছু তথ্যগত ভুল-ভ্রান্তি থাকাও অস্বাভাবিক নয়।

ইনশাআল্লাহ্ হযরতের মত মহান কর্মবীরের উপর এদেশের সুযোগ্য আলেম-উলামা এবং বুদ্ধিজীবীরা আরও সমৃদ্ধ জীবনী গ্রন্থ রচনা করবেন, এটাই আশা রাখি।

আমি ১৯৬৯ সালে কলেজ ছেড়ে হযরত মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রহ.)-এর নিজ গ্রামে প্রতিষ্ঠিত দারুল উলূম খাদেমুল ইসলাম মাদরাসায় ভর্তি হই। দু'তিন বছর পর সম্ভবত '৭২ সালের দিকে মাদরাসা দফতরে **'তালেবানে উলূমে নবুয়ত কা মাকাম আওর উনকি যিম্মাদারীয়াঁ'** নামক একখানি উর্দূ পুস্তিকা নজরে আসে। উপরে লেখকের নাম ছিল মাওলানা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী। হযরতের মোবারক নাম সর্ব প্রথম এখানেই দেখি। পুস্তিকায় ১৯৫৪ সালে দারুল উলূম দেওবন্দের ছাত্রদের সামনে একটি ভাষণ মুদ্রিত ছিল। উক্ত ভাষণে মাদরাসার ছাত্রদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে একটি হৃদয়গ্রাহী বার্তা ছিল। সে বার্তা আমার ব্যথাতুর আত্মাকেও আলোড়িত করে তোলে। আমি সেই থেকে হযরতের একান্ত সান্নিধ্য ও সাহচর্য লাভের জন্য চেষ্টা সাধনা শুরু করি।

সেমতে ১৯৭৫ সালে ভারতের সাহারানপুর জেলার বিখ্যাত গঙ্গুহ মাদরাসা থেকে হযরতের সঙ্গে পত্র বিনিময় শুরু করি। তারপর নদওয়ায় যেয়ে হযরতের সাথে দেখা করি। আল্লাহপাক ইসলাহী সম্পর্ক কায়েম করারও তাওফীক দেন। কয়েক রমযান মাসে রায়বেরেলীর তাকিয়া কেলায় হযরতের সোহবতে থেকে রূহানী ফুয়ুযাত হাসিলের চেষ্টা করতে থাকি। ১৯৮০ সাল হতে কর্মজীবনে প্রবেশ করা পরও হযরতের খেদমতে হাযিরা দিতে থাকি এবং তাঁর পরামর্শের মাধ্যমে সকল কাজ আঞ্জাম দিতে থাকি। ফলে এ সম্পর্ক উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৯৯৯ সালে মার্চ মাসে হযরত অসুস্থ হয়ে পড়লে নদওয়ায় ছুটে যাই। এক সপ্তাহ হযরতের খেদমতে থেকে ১২ই এপ্রিল ফিরে আসি। এটাই ছিল হযরতের সাথে আমার শেষ সাক্ষাৎ। এরপর সেবছরই তিনি ৩১শে ডিসেম্বর শুক্রবার ২২ রমযান ১৪২০ হি. ইন্তেকাল করেন।

এ গ্রন্থ প্রণয়নে আমাকে সর্বপ্রকার সহযোগিতা করেছেন তরুণ আলিম বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও সাংবাদিক মাদরাসা দারুর রাশাদের শিক্ষা সচিব মাওলানা মুহাম্মদ লিয়াকত আলী। এছাড়া মাওলানা অসিউর রহমান, মাওলানা হাবীবুর রহমান কিশোরগঞ্জী, মাওলানা ইদ্রিস আলী, মাওলানা

ইদ্রিস বিন জহুরও আমাকে একাজে নানাভাবে সাহায্য করেছেন। ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর ইসলামী বিশ্বকোষ বিভাগের ডাইরেক্টর, হযরতের খলীফা মাওলানা আবু সাঈদ মুহাম্মাদ ওমর আলী, তরুণ সাহিত্যিক সাংবাদিক মাওলানা উবায়দুর রহমান খান নদভী ও বন্ধুবর মাওলানা আবু তাহের মেসবাহ্ শত ব্যস্ততার মধ্যেও পাণ্ডুলিপিখানা এক নজর দেখে দিয়েছেন। মাওলানা আবু সাঈদ মুহাম্মাদ ওমর আলী সাহেব গ্রন্থখানার ভূমিকা লিখে দিয়ে আমাকে বাধিত করেছেন। মুহতারাম মেসবাহ সাহেবের "মুসলিম ভারতের অভিভাবক মাওলানা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী" শীর্ষক লেখাটি গ্রন্থের শেষে পরিশিষ্ট আকারে সংযোজন করা হয়েছে।

গ্রন্থখানির প্রকাশনা ও অন্যান্য সকল কাজে নিরলস পরিশ্রম করেছেন আমাদের মাদরাসার শায়খুল হাদীছ ও আল-কাউসার প্রকাশনীর স্বত্বাধিকারী মাওলানা মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান। কম্পোজে সহযোগিতা করেছে আমার স্নেহাস্পদ ছাত্র মাওলানা ওয়াসি উদ্দীন, মাওলানা দেলোয়ার, মুহাম্মাদ ফয়যুল্লাহ ও মুহাম্মাদ জালাল উদ্দীন। প্রুফ সংশোধনে সাহায্য করেছে আমাদের মাদরাসার ইদারাতুল মা'আরিফ বিভাগের প্রাক্তন ছাত্র মাওলানা নকীব আশরাফ, বর্তমান ছাত্র মাওলানা রবিউল ইসলাম ও মাদরাসার অফিস সহকারী হেদায়াতুল্লাহ খান। এছাড়া আমার স্নেহভাজন ছাত্র আলী আযম, রকীবুল ইসলাম, তোফায়েল আহমাদ, আব্দুল্লাহ, জাকির উদ্দীন প্রমুখ একাজে যথেষ্ট শ্রম দিয়েছে।

উম্মতের কাণ্ডারী হযরত মাওলানা আলী মিয়া রহ. আজ আর আমাদের মধ্যে না থাকলেও তাঁর কালজয়ী রচনাসম্ভার এবং বিশ্বজনীন চিন্তা-চেতনার পয়গাম নিঃসন্দেহে নতুন শতাব্দীর দিশেহারা মানব সমাজের মাঝে এক নব জাগরণের সূচনা করবে। দু'আ করি আল্লাহ পাক যেন এ মনীষীর দরাজাত বলন্দ করেন। এ গ্রন্থ প্রণয়নে সকলের সহযোগিতা কবুল করে নেন এবং এ জীবনীগ্রন্থ পাঠ করে আমাদের সকলকে হযরত মাওলানার মত যোগ্য আলেম হিসেবে গড়ে উঠার তাওফীক দেন। (আমীন)

তাং ১৫/০৫/২০০২ ঈ.
১ রবিউল আউয়াল, ১৪২৩ হি.
মাদরাসা দারুর রাশাদ
১২/ই, মিরপুর, ঢাকা।

মুহাম্মদ সালমান
সাইয়েদ আবুল হাসান আলী
নদভী রহ. পাঠাগার

পেশ-কালাম

হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিছে দেহলভী (রহ.) -এর নানা হযরত শায়খ মুহাম্মাদ (রহ.)-এর বিখ্যাত উক্তি তিনটি জিনিস মানুষের জন্য সবচে' বড় পর্দা বা অন্তরাল হিসাবে বিবেচিত হয়: (১) সমকাল (২) একই পেশা ও (৩) একই দেশের অধিবাসী হওয়া।

অর্থাৎ মানুষের যোগ্যতা ও প্রতিভা মূল্যায়নের ক্ষেত্রে সাধারণত উল্লিখিত তিনটি জিনিস বাধা হিসাবে দেখা দেয়। অধিকাংশ সময় দেখা যায়, মানুষ জীবিত থাকা অবস্থায় তার যোগ্যতা ও প্রতিভার স্বীকৃতি পায় না। এক্ষেত্রে সমকাল প্রধান বাধা হিসেবে দেখা দেয়। একই পেশার মানুষও সাধারণত সমপেশার মানুষের যোগ্যতাকে স্বীকৃতি দিতে অনীহ থাকে। তেমনি একই দেশের অধিবাসীর ক্ষেত্রেও ঐ একই কথা প্রযোজ্য। ফরাসী দার্শনিক ভল্টেয়ারের একটা কথা আছে ঃ No man is hero to his vallet. আপন ঘরে কেউ বীর নন।

অধিকাংশের ক্ষেত্রে এ কথা সত্য হলেও আল্লামা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী (রহ.)-এর ক্ষেত্রে তা সত্য হয়নি। তিনি ছিলেন এক্ষেত্রে এক উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম। তিনি তাঁর সমকালে, সমশ্রেণী ও সমপেশার লোকদের দ্বারাই এবং কেবল বিদেশেই নয়, স্বদেশেও বিশেষভাবে নন্দিত হয়েছেন যা রীতিমত বিস্ময়করই বটে। তাঁর অতুলনীয় ব্যক্তিত্ব যেমন বিদেশের মাটিতে তেমনি স্বদেশের মাটিতেও নন্দিত হয়েছে, নন্দিত হয়েছে সমকালে ও সমশ্রেণীর লোকদের দ্বারাই। সমকালে ও সমশ্রেণীর লোকেরা স্বদেশে ও বিদেশে যেভাবে তাঁর যোগ্যতা ও প্রতিভার অকুণ্ঠ স্বীকৃতি দিয়েছেন তাতে করে একথা অত্যন্ত জোর দিয়ে বলা যায়, নিকট ও দূর ভবিষ্যতে তিনি আরও বেশী নন্দিত হবেন ও স্বীকৃতি পাবেন।

সাধারণত দূরের জিনিস যেভাবে উজ্জ্বল ও প্রোজ্জ্বল হয়ে ধরা পড়ে, দৃষ্টি কাড়ে, কাছের জিনিস সেভাবে ধরা পড়ে না, দৃষ্টি কাড়ে না। কথায় বলে, আলোর পাশেই অন্ধকার বিরাজ করে। কিন্তু আল্লামা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী (রহ.)-এর আলোকোজ্জ্বল অস্তিত্ব অত্যন্ত প্রোজ্জ্বলভাবে দূরের ও

কাছের সকলের কাছেই সমান ভাবে ধরা পড়েছিল। সন্দেহ নেই যে, তিনি নবী বংশের দুটো শাখার প্রধানতম ধারা হাসানী শাখার সন্তান ছিলেন এবং এ কথাও সত্য যে, ঐ শাখার উজ্জ্বলতম রত্ন প্রখ্যাত ঐতিহাসিক লেখক ও সাহিত্যিক বিখ্যাত বুযুর্গ ও ওলী হযরত মাওলানা ফজলে রহমান গঞ্জে মুরাদাবাদীর খলীফা এবং দারুল উলুম নদওয়াতুল উলামার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা নাযেম (রেক্টর) আল্লামা সাইয়েদ আবদুল হাই হাসানী (রহ.)-এর আদরের দুলাল ছিলেন। কিন্তু এ কথা আরো বেশী সত্য যে, তিনি আল্লাহ্‌র অপার অনুগ্রহ, পিতা-মাতার নেক দো'আ এবং বহু বুযুর্গের তাওয়াজ্জুহ ও স্নেহদৃষ্টির ফলে বংশীয় ও পিতৃ-পরিচয়কে অস্বীকার না করেও এসবের বহু উর্ধ্বে উঠতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং আরব-অনারব নির্বিশেষে সমগ্র বিশ্ব থেকেই সমভাবে অকুণ্ঠ স্বীকৃতি আদায় করেছিলেন। তিনি সর্বস্তরের ও সর্বশ্রেণীর মানুষের যেই শ্রদ্ধা ও ভালবাসা অর্জন করেছিলেন, মহল নির্বিশেষে সমকালীন সকল আলেম-উলামা ও বুযুর্গের যেই স্নেহ ও আস্থা লাভ করেছিলেন তা রীতিমত নজীর বিহীন। সমকালে অপর কোন ব্যক্তিত্বের ক্ষেত্রে এমনটি দেখা যায় না। এ যেন কুরআনুল কারীমের সেই আয়াতের বাস্তব ব্যাখ্যা যেখানে বলা হয়েছে, "যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে দয়াময় আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্য সৃষ্টি করবেন ভালবাসা।"

(সূরা মারয়াম-৯৬)

এ ধরনের একটি হাদীসও দেখতে পাওয়া যায় যেখানে বলা হয়েছে: "আল্লাহ যখন কোন বান্দাকে ভালবাসেন তখন আসমান ও যমীনে তার ঘোষণা দেয়া হয়। ফলে সৃষ্টির সকলেই তাকে ভালবাসতে থাকে।" সমকালীন উলামায়ে কেরাম ও বুযুর্গবৃন্দ আল্লামা নদভী (রহ.) কে কোন্ দৃষ্টিতে দেখতেন এবং তিনি তাদের কী পরিমাণ স্নেহ-ভালবাসা ও আস্থা লাভে ধন্য হয়েছিলেন তা তাঁদের আচার-আচরণ ও কৃত উক্তি থেকে সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়ে।

হযরত শাহ্ আবদুল কাদির রায়পুরী (রহ.) সমকালীন বুযুর্গদের মধ্যে সর্বমহলের কাছে গ্রহণযোগ্য অন্যতম শীর্ষস্থানীয় বুযুর্গ ছিলেন। আল্লামা নদভী (রহ.)-এর ছিলেন তিনি দ্বিতীয় শায়খ যিনি তাঁকে চার তরীকায়,

বিশেষ করে সাইয়েদ আহমদ বেরেলভী (রহ.)-এর তরীকায়ে মুহাম্মাদীয়াতে খেলাফত দান করেছিলেন। তিনি তাঁর এ শাগরিদকে কোন দৃষ্টিতে দেখতেন ও কিভাবে মূল্যায়ন করতেন সে সম্পর্কে একটি ঘটনা তুলে ধরছি। বর্ণনাকারী মাওলানা মুগীছী বলেন ঃ

"১৩৮০ হিজরীর রমযান মাস। রায়পুর খানকায় ভারতবর্ষের কমবেশী সমস্ত উলামায়ে কেরাম ও মাশায়েখ এবং হযরতের ভক্তকুলের এক বিশাল সমাবেশ। আসর নামাযের পর হযরত রায়পুরী অভ্যাস মাফিক ছাপড়ায় তক্তপোষের উপর বসেছেন। অন্য তক্তপোষের উপর আছেন শায়খুল হাদীছ হযরত মাওলানা যাকারিয়া এবং হযরত মাওলানা আলী মিয়াঁ (আবুল হাসান আলী নদভী সারা ভারতে তিনি এ নামেই মশহুর ছিলেন।) সম্ভবত রমযানের ১৪ তারিখ। আমরা যারা খাদেম হযরতের শরীর দাবাচ্ছিলাম। অধিকাংশ সময় অধম এই সুযোগ পেত। হযরত রায়পুরী (রহ.)-এর সঙ্গে আমাদের পারিবারিক সম্পর্ক এবং গোটা খান্দান ও আত্মীয়-স্বজনের আন্তরিক ও প্রীতিপূর্ণ সম্পর্কই ছিল এর কারণ। এছাড়া হযরত আমাদেরকে অত্যন্ত বেশী স্নেহ করতেন। এরই উপর নির্ভর করে এই অধম হযরতকে জিজ্ঞেস করল, হযরত! হযরত শায়খুল হাদীস তাঁর বার্ধক্যজনিত দুর্বলতা, তদুপরি আপনার সমবয়স্ক হবার দরুন তক্তপোশের উপর বসেন, সেটা বুঝি। কিন্তু মাওলানা আলী মিয়াঁর বসাটা আমরা বুঝতে পারিনা।

হযরত রায়পুরী (রহ.) একথা শুনতেই বলে ওঠেন, আরে! তোমরা জান না, আলী মিয়াঁ মুজাদ্দিদ আলফে ছানী (রহ.) এর স্পষ্টবাদিতা ও সত্য কথন, শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ (রহ.) এর চিন্তা-চেতনা ও ধ্যান-ধারণা, সাইয়েদ আহমদ শহীদ (রহ.)-এর জিহাদী জযবার সুন্দর প্রতিচ্ছবি, হাজী ইমদাদুল্লাহ (রহ.), মাওলানা রাহমাতুল্লাহ কিরাণভী (রহ.), মাওলানা রশীদ আহমাদ গঙ্গোহী (রহ.) ও মাওলানা কাসেম নানুতুবী (রহ.)-এর জিহাদী কর্মকৌশলের নমুনা, সাইয়েদ সুলায়মান নদভী (রহ.), মাওলানা শিবলী নোমানী (রহ.)-এর চিন্তাধারা ও ইতিহাসের মহা এ্যালবাম এবং মাওলানা মুহাম্মাদ ইলিয়াস (রহ.),শায়খুল ইসলাম হুসাইন আহমাদ মাদানী (রহ.) ও শায়খুল হাদীছ মাওলানা যাকারিয়া (রহ.)-এর দ্বীনী ও ইলমী দু'আর ফসল। আরে নাদান

মনে রাখ, খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতী (রহ.) থেকে শুরু করে আজকের সব বুযুর্গ ও আকাবিরের তিনি প্রকৃত মুখপাত্র আর আমার চোখের মণি।"

আল্লামা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী (রহ.)-এর উল্লিখিত পরিচয় ও পরিচিতিই বন্ধুবর মাওলানা সালমান তাঁর এই গ্রন্থে বিভিন্ন তথ্যপঞ্জী সহকারে তুলে ধরেছেন। অবশ্য কোন একটি মাত্র গ্রন্থে আল্লামা নদভী (রহ.)-এর বিরাট কর্মময় ও ঘটনাবহুল জীবনেতিহাস তুলে ধরা সহজ ব্যাপার নয়। তবুও লেখকের এ প্রয়াসকে মুবারকবাদ জানাতেই হয় এজন্য যে, আমাদের অত্যন্ত কাছের মানুষ হলেও এই বিরাট প্রতিভা ও যুগান্ধর পুরুষটি সম্পর্কে আমরা খুব কমই জানি। আর যেটুকু জানি তাতে তাঁর পরিচয় একজন আলেম ও ইতিহাস সচেতন লেখকের মধ্যেই সীমিত হয়ে পড়ে। অথচ তিনি যে এর বহু উর্ধ্বের ছিলেন। পাঠক এ বইয়ে তার পরিচয় পাবেন। আর এ পরিচয় আমাদেরকে উপকৃত করবে।

এ গ্রন্থের লেখক স্বপ্রতিষ্ঠিত মাদরাসার মুহতামিম এবং একটি বড় মসজিদের খতিব হিসাবে কর্মব্যস্ত দায়িত্ব পালনের অতিরিক্ত এই বিরাট কাজটি কিভাবে করতে পারলেন তা ভাবতেও বিস্ময় জাগে। আল্লাহ্‌র অপার অনুগ্রহ, আল্লামা নদভী (রহ.)-এর প্রতি লেখকের অকৃত্রিম ভক্তি ও শ্রদ্ধা এবং তাঁর কিছু সংখ্যক ভক্ত-সাথী-সহযোগীর আন্তরিক সহযোগিতা লেখককে একাজে উৎসাহ যুগিয়েছে। অধিকন্তু আল্লামা নদভী (রহ.)-এর দীর্ঘ সাহচর্য ধন্য অন্যতম খলীফা হিসেবে একাজের জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতা ও অধিকার তো লেখকের আছেই।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দরবারে আকুল মুনাজাত, তিনি যেন আল্লামা নদভী (রহ.)কে জান্নাতুল ফেরদাউসে উচ্চ মাকাম দান করেন এবং গ্রন্থের লেখক, প্রকাশক ও পাঠকসহ আমাদের সকলকে তাঁর জান্নাতি সাহচর্য দান করেন। আমীন!

আবু সাঈদ মুহাম্মাদ ওমর আলী
২০/৫/২০০২

ইসলামী বিশ্বকোষ বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
বায়তুল মুকাররম ঢাকা

সুচীপত্র

এক নজরে হযরত মাওলানা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী (রহ.)/২৫

অধ্যায়–১ পারিবারিক ঐতিহ্য (৩৭ – ৪৩)

১. পরিবার ও বংশলতিকা/৩৭
২. সাইয়েদ শাহ আলামুল্লাহ/৩৮
৩. সাইয়েদ আহমাদ শহীদ/ ৪০
৪. দাদা- হাকীম সাইয়েদ ফখরুদ্দীন/৪০
৫. পিতা- মাওলানা আবদুল হাই/৪১
৬. মাতা- খায়রুন্নেসা/৪১
৭. পিতৃকুল ও মাতৃকুলের মাঝে সেতুবন্ধন/৪২
৮. জন্ম/৪৩
৯. জন্মভূমি (তাকিয়া কেলা)/৪৩

অধ্যায়–২ শিক্ষা (৪৭ – ৬৬)

১. প্রাথমিক শিক্ষা /৪৭
২. মায়ের তরবিয়ত /৪৭
৩. কয়েকটি তরবিয়তি পত্র /৫০
৪. আরেকটি পত্র/৫৫
৫. ডাঃ মাওলানা সাইয়েদ আবদুল আলীর সংক্ষিপ্ত পরিচয়/৫৬
৬. বড় ভাইয়ের তরবিয়ত /৫৭
৭. শায়খ খলীল আরবের তত্ত্বাবধানে /৬২
৮. ব্যতিক্রমধর্মী শিক্ষা পদ্ধতি /৬৩
৯. শায়খুল হাদীছ মাওলানা হায়দার হাসান খান /৬৪
১০. আল্লামা তাকী উদ্দিন হেলালী /৬৫
১১. দারুল উলূম দেওবন্দে /৬৬
১২. লাহোরের দরসে তফসীরে অংশগ্রহণ /৬৬
১৩. বিবাহ /৬৬

অধ্যায়–৩ অধ্যাপনা (৬৭ – ৭৮)

১. শিক্ষক হিসেবে দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামায় /৬৭
২. দারুল উলূমের সাধারণ পরিবেশ /৬৮
৩. আরবী শিক্ষার নতুন অভিজ্ঞতা /৭২
৪. অন্যান্য দরস ও কিতাব /৭৩
৫. প্রসঙ্গ ঃ দারুল উলূমের পরিবেশ, প্রতিষ্ঠাতা ও পথিকৃৎগণ /৭৩
৬. ছাত্রদের কিছু বৈশিষ্ট্য /৭৬
৭. মাওলানার দরসে কুরআন /৭৬
৮. দামেশ্‌ক ইউনিভার্সিটিতে ভিজিটিং প্রফেসর হিসেবে /৭৭
৯. ভিজিটিং প্রফেসর হিসেবে মদীনা ইউনিভার্সিটিতে /৭৮

অধ্যায়–৪ আধ্যাত্মিকতার সন্ধানে (৮১–৯৮)

১. হযরত মাওলানা আহমাদ আলী লাহোরীর খেদমতে /৮১
২. হযরত লাহোরীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় /৮১
৩. প্রথম সাক্ষাৎ /৮৪
৪. দ্বিতীয় সাক্ষাৎ ও প্রথম বায়আত /৮৬
৫. ইজাযত ও খেলাফত /৮৭
৬. হযরত আবদুল কাদের রায়পুরী (রহ.)-এর খেদমতে /৮৭
৭. হযরত রায়পুরী (রহ.)-এর সংক্ষিপ্ত পরিচয় /৮৮
৮. রায়পুরের খানকাহ /৯১
৯. হযরত থানভীর সোহবতে /৯৩
১০. যিকরে ইলাহী ও মুজাহাদা /৯৩
১১. বাতেনী অবস্থা /৯৪
১২. ফানাইয়াত (আত্মবিলোপ) /৯৫
১৩. বায়আত /৯৭
১৪. সালেকীনের তরবিয়ত ও মা'মুলাত /৯৮

অধ্যায়–৫ মাওলানা আলী মিয়াঁ ও তাবলীগী জামাআত (১০১ –১১৬)

১. নতুন দ্বীনী ব্যক্তিত্বের সন্ধান /১০১
২. লাখনৌর আশেপাশে দাওয়াতী কাজের সুচনা /১০৪
৩. হযরতজীর সঙ্গে সম্পর্কের কারণসমূহ /১০৫

৪. তাবলীগী মেহনতের মাধ্যমে ছাত্রদের চরিত্রগঠন/ ১০৬
৫. লাখনৌ শহরে তাবলীগের কাজ ও হযরতজীর আগমন /১০৭
৬. রায়বেরেলী আগমন /১০৮
৭. হযরতজীর মুখপাত্র রূপে /১০৯
৮. তাবলীগে আত্মনিয়োগ এবং দারুল উলূম থেকে দীর্ঘ ছুটি গ্রহণ /১০৯
৯. হযরতজীর ইন্তেকালের দিন /১১০
১০. লাখনৌর দ্বীনী পরিসরে তাবলীগের মাকবুলিয়াত /১১১
১১. হিজাযে দাওয়াতী কাজের জন্য আলী মিয়াঁর নির্বাচন /১১২
১২. আরব বিশ্বে দীর্ঘ দাওয়াতী সফর /১১৬

অধ্যায়–৬ **দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামা ও মাওলানা আলী মিয়াঁ (১১৭ – ১৫১)**

১. নদওয়াতুল উলামার প্রতিষ্ঠা ও প্রেক্ষাপট /১১৭
২. মাওলানা মুহাম্মাদ আলী মুঙ্গেরী রহ. /১১৮
৩. নদওয়ার সাথে মাওলানা আলী মিয়াঁর সম্পর্ক /১২৪
৪. নতুন সিলেবাসের প্রয়োজনীয়তা /১৩১
৫. আরবী ভাষা ও সাহিত্যের সিলেবাসে সংস্কারের সূচনা /১৩৪
৬. 'মুখতারাত' সংকলন /১৩৫
৭. আল কেরাআতুর রাশেদা /১৩৯
৮. কাসাসুন নাবিয়্যীন লিল আতফাল /১৪১
৯. সিলেবাস প্রণয়নের অন্যান্য প্রচেষ্টা /১৪৪
১০. নদওয়ার পঁচাশি বর্ষপূর্তি উপলক্ষে শিক্ষা সম্মেলন /১৪৭
১১. কাদিয়ানী বিরোধী আন্তর্জাতিক সম্মেলন /১৫১

অধ্যায়–৭ **দ্বীনী সংগঠনসমূহ ও মাওলানা আলী মিয়াঁ (১৫৫ – ১৭৩)**

১. দ্বীনী মাদরাসা /১৫৫
২. মুসলিম পারসোনাল ল' বোর্ড /১৬১
৩. পায়মে ইনসানিয়াত /১৬২
৪. রাবেতায়ে আদবে ইসলামী /১৬৪

৫. শিবলী একাডেমী /১৬৭
৬. দ্বীনী তা'লীমী কাউন্সিল /১৬৮
৭. রাবেতায়ে আলমে ইসলামী /১৬৯
৮. অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ/১৭০

অধ্যায়-৮ **বহির্বিশ্বে হযরত মাওলানা আলী মিয়াঁ (১৭৪ – ১৮৯)**
এশিয়া ও আফ্রিকা
১. সৌদী আরব (১৯৪৭) /১৭৩
২. মিসর (১৯৫১) /১৭৪
৩. ইখওয়ানুল মুসলিমীন /১৭৫
৪. সুদান /১৭৫
৫. দামেশ্‌ক /১৭৬
৬. মক্কা শরীফ /১৭৬
৭. লেবানন /১৭৭
৮. তুরস্ক (১৯৫৬) /১৭৭
৯. বাগদাদ /১৭৮
১০. পাকিস্তান (১৯৫৩) /১৭৮
১১. রেঙ্গুন (১৯৬০) /১৭৯
১২. কুয়েত (১৯৬২) /১৮০
১৩. আফগানিস্তান, ইরান, লেবানন, সিরিয়া
ও জর্দান সফর/ ১৮০
১৪. শ্রীলংকা (১৯৮২) /১৮০
১৫. বাংলাদেশ (১৯৮৪) /১৮১
১৬. মালয়েশিয়া (১৯৮৭) /১৮৩
১৭. উযবেকিস্তান (১৯৯৩) /১৮৪
ইউরোপ (১৯৬৩) /১৮৫
১৮. স্পেন /১৮৬
ইউরোপ (দ্বিতীয় সফর ১৯৬৪) /১৮৭
ইউরোপ (তৃতীয় সফর ১৯৮৩) /১৮৭
আমেরিকা (১৯৯৭) /১৮৭
চোখের অপারেশন /১৮৯

অধ্যায়–৯ **একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় মাওলানা আলী মিয়াঁর রূপরেখা (১৯৩ – ২০২)**

১. মুসলিম বিশ্বের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা /১৯৩
২. ঈমানের নবায়ন /১৯৪
৩. অভ্যন্তরীণ প্রস্তুতি /১৯৫
৪. চেতনার দীক্ষা /১৯৬
৫. ব্যক্তি ও গোষ্ঠীস্বার্থ বিসর্জন /১৯৮
৬. প্রযুক্তিগত ও সামরিক প্রস্তুতি /১৯৯
৭. নতুন শিক্ষাব্যবস্থা /২০০
৮. নতুন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা /২০২

অধ্যায়–১০ **আরব জাতীয়তাবাদের সয়লাব ও দ্বীনী মূল্যবোধের দাবী (২০৫ – ২১১)**

১. পশ্চিমাদের আশংকা /২০৫
২. পশ্চিমা বুদ্ধিজীবীদের কৌশল /২০৬
৩. আরব জাতীয়তাবাদ /২০৭
৪. মিসরের অভ্যুত্থান /২০৮
৫. সাময়িক আনন্দ /২০৯
৬. নদওয়ার ভূমিকা /২১০
৭. মাওলানা আলী মিয়াঁর বক্তব্য /২১১

অধ্যায়–১১ **অনন্য চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য (২১৫ –২২৪)**

১. উম্মতের জন্য দরদ-ব্যথা /২১৫
২. চিত্তের উদারতা /২১৬
৩. কাউকে কষ্ট না দেয়া /২১৬
৪. ইখলাসের মূর্ত প্রতীক /২১৭
৫. আত্মত্যাগী মহাপুরুষ /২১৭
৬. নম্রতা /২১৮
৭. মেহমানদারী /২১৯
৮. কুরআনের মহাব্বত /২১৯
৯. নামায ও জামাআতের এহতেমাম /২২০

১০.দুঃস্থমানবতার সেবা /২২১
১১.পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও অনাড়ম্বর জীবন /২২১
১২.মুরব্বী মান্যতা /২২২
১৩.শোকরগুযারী /২২৪

অধ্যায়-১২ **আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি ও পুরস্কার (২২৫ -২৩৫)**
১. শাহ ফয়সল এওয়ার্ড /২২৫
২. কাশ্মীর ইউনিভার্সিটির সম্মানসূচক ডিগ্রী /২২৭
৩. প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হকের পুরস্কার /২৩০
৪. দুবাই আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্ব পুরস্কার /২৩১
৫. কাবা শরীফের চাবি প্রদান /২৩৩
৬. ব্রুনাই এওয়ার্ড /২৩৫

অধ্যায়-১৩ **ইন্তেকাল ও বিশ্বব্যাপী শোক (২৩৭ -২৫০)**
১. জীবনের শেষ দিনগুলো /২৩৭
২. তাঁর স্মরণে সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ও পত্র-পত্রিকার বিশেষ সংখ্যা / ২৪১
৩. লাখনৌতে অনুষ্ঠিত শোকসভা /২৪২
৪. আলিগড়ের আলোচনা সভা /২৪৩
৫. ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের আলোচনা সভা /২৪৩
৬. শোকের ছায়া দিল্লীতে /২৪৩
৭. দিল্লীর দ্বিতীয় সেমিনার /২৪৪
৮. বোম্বে /২৪৪
৯. আওরঙ্গাবাদ /২৪৫
১০.রায়বেরেলি /২৪৫
১১.কলকাতা /২৪৫
১২.কাশ্মীর /২৪৫
১৩.দেরাদুন /২৪৫
১৪.আন্তর্জাতিক অঙ্গনে শোকের প্রকাশ /২৪৬-২৪৯
নেপাল, আমিরাত ,বাংলাদেশ, মালয়েশিয়া,ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যান্ড, পাকিস্তান, মিসর, দক্ষিণ আফ্রিকা, যুক্তরাজ্য
১৫.পত্র-পত্রিকার সংবাদ পরিক্রমা ও হযরত নদভী (রহ.) স্মরণে বিশেষ সংখ্যা /২৪৯-২৫০

অধ্যায়-১৪ ইরশাদাত ও মালফুযাত (২৫১ -২৮১)

১. পৈত্রিক নিবাসের বৈশিষ্ট্য /২৫১
২. কুরআনের মাধ্যমে শিক্ষাজীবনের সূচনা /২৫১
৩. আল্লামা সাইয়েদ সুলাইমান নদভীর কুরআনী জ্ঞান /২৫৮
৪. কুরআনের গুরুত্বপূর্ণ দিক /২৫৮
৫. কুরআন সবার জন্য /২৫৯
৬. প্রিয় রচনা /২৫৯
৭. নদওয়াতুল উলামা /২৫৯
৮. নদওয়া মুজাদ্দেদী ওয়ালীউল্লাহী দরসগাহ/২৬০
৯. নদওয়ার বৈশিষ্ট্য /২৬০
১০. আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের চিন্তা /২৬০
১১. সাহিত্য চর্চার প্রয়োজনীয়তা /২৬১
১২. সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সাহিত্য ও অন্যান্য রাষ্ট্রের সাহিত্য/২৬১
১৩. মন ও মস্তিষ্কের ব্যবধান /২৬২
১৪. আল্লাহ ওয়ালাদের আছর ও বরকত/২৬২
১৫. তাসাওউফ কি?/২৬৩
১৬. তাওয়াক্কুল /২৬৩
১৭. শিশুদের প্রতি সস্নেহ উপদেশ /২৬৩
১৮. আজ আমরা হতাশা ও বিস্ময়ের সম্মুখীন/২৬৪
১৯. বড় রোযা ছোট রোযা /২৬৫
২০. মক্তব-মাদরাসা প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা /২৬৫
২১. বুযুর্গানের ছোহবতের কোন বিকল্প নেই /২৬৫
২২. আল্লাহওয়ালাদের নিকট উপস্থিত থাকার লাভ /২৬৬
২৩. পূর্বসূরী উলামায়ে কেরাম /২৬৬
২৪. আল্লাহ তাআলার বিরাট অনুগ্রহ /২৬৬
২৫. ইখলাস ও আখলাক /২৬৬
২৬. সামাজিক জীবনে অনিষ্টতা /২৬৭
২৭. বিশ্বাস ও উদ্দেশ্যের একাত্মতা /২৬৭

২৮. সাইয়েদ আহমাদ শহীদের আত্মশুদ্ধি
আন্দোলন ও জিহাদ/ ২৬৭
২৯. মুজাদ্দেদে আলফে ছানী (রহ.) ও
শাহ ওয়ালী উল্লাহর অবদান /২৬৭
৩০. সর্বজনপ্রিয়তা ও গ্রহণযোগ্যতার রহস্য /২৬৮
৩১. ইখলাস ও খাঁটি নিয়ত বৃথা যায় না /২৬৮
৩২. নিয়তের উপর গুরুত্বারোপ /২৬৯
৩৩. মানুষের দ্বৈত আচরণ /২৭০
৩৪. ধর্ম ও রাজনীতি /২৭০
৩৫. তালীম ও তাবলীগওয়ালাদের দায়িত্ব/২৭১
৩৬. সম্মানযোগ্য শাসক /২৭২
৩৭. কুসংস্কার দূর করাও একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব /২৭২
৩৮. তাবলীগের অর্থ ও কার্যকর পদ্ধতি /২৭৩
৩৯. স্পেনে দাওয়াতী কাজ করা জরুরী /২৭৩
৪০. বিনা ভাতায় শিক্ষাদান প্রসঙ্গ /২৭৩
৪১. মাওলানা ইমরান খানের চমকপ্রদ ঘটনা /২৭৪
৪২. তাওয়াজ্জুহ (অন্তর্দৃষ্টিপাত)-এর ফায়দা ও প্রভাব /২৭৪
৪৩. রিয়াজত ও মোজাহাদার সময় অবস্থা ও
যোগ্যতার দিকে লক্ষ্য রাখা /২৭৪
৪৪. মা'মুলাতের পাবন্দী করা /২৭৫
৪৫. ধর্মীয় চেতনা /২৭৫
৪৬. কতিপয় দায়িত্ব /২৭৫
৪৭. খতমে নবুওয়াতে বিশ্বাস /২৭৬
৪৮. জীবনযাপনের ধরন /২৭৬
৪৯. বেকারত্ব সকল অনিষ্টের মূল /২৭৭
৫০. স্থানীয় ভাষার প্রতি গুরুত্বারোপ করা আবশ্যক /২৭৭
৫১. পবিত্র হিজাযের সঙ্গে আন্তরিক সম্পর্ক হওয়া উচিত/২৭৮
৫২. নিজের দোষ ও অন্যের গুণের প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত/২৭৮
৫৩. বস্তুর হাকীকত দেখা উচিত /২৭৮
৫৪. যিকিরের প্রভাব সৃষ্টি করার তরীকা/২৭৯

৫৫.দাওয়াতের দুই পদ্ধতি /২৭৯
৫৬.বিনয়, শোকর ও ইখলাসের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক/২৭৯
৫৭.হযরত শাহ্ আলামুল্লাহর সুন্নতের পাবন্দী ও যুহ্দ /২৮০
৫৮.বাকসংযমের প্রতি উৎসাহ প্রদান /২৮০
৫৯.কল্যাণ ও অকল্যাণ একত্রিত হতে পারে না /২৮০
৬০.চারটি গুণ হওয়া বাঞ্ছনীয় /২৮১
৬১.দ্বীনের দাওয়াত /২৮১
৬২.শেষ কথা /২৮১

অধ্যায়–১৫ **মাওলানা আলী মিয়াঁ আকাবিরে উম্মতের দৃষ্টিতে (উপমহাদেশীয় ওলামা মাশায়েখ) (২৮৩ – ৩০১)**

১. হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহ.) /২৮৩
২. হযরত মাওলানা আবদুল কাদের রায়পুরী (রহ.) /২৮৫
৩. আল্লামা ইকবাল (রহ.) /২৮৬
৪. শায়খুল হাদীস হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ যাকারিয়া (রহ.) /২৮৭
৫. হযরত মাওলানা হোসাইন আহমাদ মাদানী (রহ.) /২৮৮
৬. আল্লামা সাইয়েদ সুলায়মান নদভী (রহ.) /২৮৯
৭. হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ শফী (রহ.) /২৮৯
৮. মাওলানা মানাযের আহসান গিলানী (রহ.) /২৯০
৯. হযরত মাওলানা মনযুর নো'মানী (রহ.) /২৯১
১০. মাওলানা আবদুল মাজেদ দরিয়াবাদী (রহ.) /২৯২
১১.মাওলানা শাহ ওছিউল্লাহ ইলাহাবাদী (রহ.) /২৯৪
১২.হযরত শাহ্ মুহাম্মাদ ইয়াকুব সাহেব মুজাদ্দেদী (ভূপালী) /২৯৫
১৩.হযরত মাওলানা মোহাম্মাদ আহমাদ ফুলপুরী (রহ.) /২৯৬
১৪.বিশিষ্ট দাঈ হযরত মাওলানা ক্বারী সিদ্দীক আহমাদ বান্দবী /২৯৬
১৫.আরেফ বিল্লাহ ডাক্তার আবদুল হাই (রহ.) /২৯৭
১৬.আল্লামা ইউসুফ বিন্নুরী (রহ.) /২৯৭
১৭.হযরত মাওলানা তাকী উসমানী /২৯৮

আরব উলামাগণের নজরে

১. আল্লামা ইউসুফ আল কারযাভী (কাতার) /২৯৯
২. শায়েখ আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দা (রহ.) /৩০০
৩. শায়েখ আলী তানতাবী (রহ.) (মক্কা মোকাররমা) /৩০০
৪. সাইয়েদ কুতুব শহীদ (রহ.) (মিসর) /৩০১
৫. খানায়ে কাবার চাবি ব্যবহার এবং কা'বায় প্রবেশ /৩০১
৬. বায়তুল্লাহর ইমাম ফযিলাতুশ শায়খ
মুহাঃ আবদুল্লাহ সুবাইল /৩০১

অধ্যায়–১৬ চিঠিপত্র (৩০৪ – ৩২৯)

১. বাদশাহ ফয়সল /৩০৪
২. আবদুল্লাহ আল-সালেম আল-সাবাহ /৩০৮
৩. নাজমুদ্দীন আরবাকান /৩১১
৪. ডাঃ সাইয়েদ আবদুল আলী /৩১৩
৫. মাওলানা মাসউদ আলম নদভী /৩১৬
৬. মাওলানা মুহাম্মাদ আল-হাসানী /৩১৭
৭. মাওলানা আবদুল করীম পারেখ /৩২০
৮. মাওলানা সুলতান যওক নদভী /৩২৫
৯. মাওলানা আবু সাইদ মুহাম্মাদ ওমর আলী /৩২৭
১০. মাওলানা মুহাম্মাদ সালমান /৩২৯

অধ্যায়-১৭ রচনাবলী – উর্দূ (৩৩৪ – ৩৪৫)

১. সীরাতে সাইয়েদ আহমাদ শহীদ /৩৩৪
২. ইনসানি দুনইয়া পর মুসলমানুঁ কা উরুয ওয়া
যাওয়াল কা আসর /৩৩৪
৩. তারিখে দাওয়াত ওয়া আযীমাত /৩৩৭
৪. নবীয়ে রহমত /৩৩৯
৫. সাওয়ানেহে হযরত মাওলানা আবদুল
কাদের রায়পুরী /৩৩৯
৬. আরকানে আরবাআ /৩৪০
৭. হযরত মাওলানা ইলিয়াস আওর
উনকি দ্বীনী দাওয়াত /৩৪০

৮. পুরানে চেরাগ /৩৪০
৯. হায়াতে শায়খুল হাদীছ /৩৪১
১০. ফযলে রহমান গঞ্জমুরাদাবাদী /৩৪১
১১. দো মাহিনা আমেরিকা মে /৩৪২
১২. কাদিয়ানিয়াত /৩৪২
১৩. কারওয়ানে মাদীনা /৩৪২
১৪. কারওয়ানে জিন্দেগী /৩৪২
১৫. মাগরেব ছে কুছ ছাফ ছাফ বাতেঁ /৩৪২
১৬. তাযকিয়া, ইহসান, তাসাওউফ ওয়া সুলূক /৩৪২
১৭. দরিয়ায়ে ইয়ারমুক ছে দরিয়ায়ে কাবুল তাক /৩৪৩
১৮. আসরে হাযের মে দ্বীন কি তাফহীম ওয়া তাশরীহ /৩৪৩
১৯. আল-মুরতাযা /৩৪৩
২০. মোতালায়ে কুরআন কে উসুল ওয়া মাবাদী /৩৪৩
২১. নুকূশে ইকবাল /৩৪৩
২২. মা'রেকায়ে ঈমান ও মাদ্দিয়াত /৩৪৩
২৩. যিকরে খায়ের /৩৪৪
২৪. হায়াতে আবদুল হাই /৩৪৪
২৫. পাজা ছুরাগে জিন্দেগী /৩৪৪
২৬. হাদীসে পাকিস্তান /৩৪৪
২৭. সুহ্বতে বা আহলে দিল /৩৪৪
২৮. তা'মীরে ইনসানিয়াত /৩৪৪
২৯. মানসাবে নবুয়ত আওর উসকে
আলী মাকাম হামেলীন /৩৪৫
৩০. মুসলিম মামালেক মে ইসলামিয়াঁত আওর
মাগরিবিয়াত কি কাশমাকাশ /৩৪৫
৩১. যব ঈমান কি বাহার আয়ি /৩৪৫
৩২. হেজাযে মোকাদ্দাস আওর জাযিরাতুল আরব /৩৪৫
আরবী রচনাবলী /৩৪৬
ইংরেজী রচনাবলী /৩৪৯

অধ্যায়–১৮ রচনাবলী হতে (৩৫২ – ৪৯৮)

১. নতুন তুফান এবং তার প্রতিরোধ /৩৫২
২. ইসলামের জীবন বিধান /৩৭৪
৩. ইসলামী রেনেসাঁর অগ্রপথিক /৩৯১
৪. আরকানে আরবাআ /৪০৭
৫. প্রাচ্যের উপহার /৪২৫
৬. মাদরাসার ছাত্রদের মর্যাদা ও দায়িত্ব-কর্তব্য /৪৬৫
৭. বিবিধ /৪৯৮

অধ্যায়–১৯ খোলাফায়ে কেরাম /৫১৩

পরিশিষ্ট - মুসলিম ভারতের অভিভাবক /(৫১৫ – ৫২৪)

নির্ঘণ্ট – (৫২৫ – ৫২৮)

ছবি ও আলোকচিত্র / (৫২৯ – ৫৩২)

এক নজরে হযরত মাওলানা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী (রহ.)

(১৩৩৩হি./১৯১৪ঈ. – ১৪২০হি./১৯৯৯ ঈ.)

জন্ম ঃ ১৩৩৩ হিজরীর ৬ই মুহররম, মোতাবেক ইং ১৯১৪ সনের ৫ই ডিসেম্বর, শুক্রবার ভারতের উত্তর প্রদেশের রায়বেরেলী জেলাধীন তাকিয়া কেলা নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। নাম রাখা হয় আবুল হাসান আলী। সংক্ষেপে আলী মিয়াঁ।

পিতা-মাতা-ভাইবোন ঃ হযরত মাওলানা আলী মিয়াঁর সম্মানিত পিতার নাম সাইয়েদ আবদুল হাই এবং মাতার নাম সাইয়েদাহ খায়রুননেছা। ডাক্তার সাইয়েদ আবদুল আলী তাঁর বড় ভাই। আমাতুল্লাহ তাসনীম ও আমাতুল আযীয তাঁর বড় দু'বোনের নাম। সম্মানিতা মাতা কুরআন মজীদের হাফেযা ছিলেন। তাঁর খালা, খালাতো বোন, মামী এবং ফুফুও কুরআনের হাফেযা ছিলেন। ১৩৪১ হিজরীতে পিতা ও ১৩৮৮ হিজরীতে মাতা ইন্তেকাল করেন।

প্রাথমিক শিক্ষা ঃ মুহতারামা আম্মার নিকট তিনি প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করেন। অতঃপর মাওলানা সাইয়েদ আযীযুর রহমান হাসানী এবং মাওলানা মাহমুদ আলীর নিকট কুরআন মজীদ, উর্দু ও ফারসী পড়েন।

আরবী শিক্ষা ঃ শায়খ খলীল আরব আনসারী ইয়ামানী ও ডঃ তাকী উদ্দীন হেলালী মারাকেশীর নিকট নিয়মতান্ত্রিক আরবী শিক্ষা লাভ করেন এবং তাদেরই দীক্ষায় আরবী ভাষা ও সাহিত্যে বুৎপত্তি অর্জন করেন।

ইলমে তাফসীর শিক্ষা ঃ শায়খ খলীল আরব আনসারীর নিকট নির্বাচিত সূরাসমূহের তাফসীর এবং শায়খুত্ তাফসীর আল্লামা আহমাদ আলী লাহোরী (রহ.)-এর নিকট ১৩৫১ হিজরীতে লাহোরে অবস্থান করে পূর্ণ কুরআন কারীমের তাফসীর পড়েন।

সাধারণ শিক্ষা ঃ ১৯২৭ সালে তিনি লাখনৌ ইউনিভার্সিটির উলূমে শারকিয়্যাহ (প্রাচ্যবিদ্যা) বিভাগে ভর্তি হন। তখন তিনি ছিলেন উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব কনিষ্ঠ ছাত্র। তিনি সেখান থেকে সাহিত্যে স্নাতক ডিগ্রী লাভ করেন।

ইলমে হাদীছ ঃ ১৯২৯ সালে তিনি দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামার শায়খুল হাদীছ মাওলানা হায়দার হাসান খানের হাদীছের দরসে শরীক হন এবং তাঁর নিকট থেকে সহীহাইন, আবু দাউদ শরীফ ও সুনানে তিরমিযী পড়েন। অতঃপর ১৯৩২ সালে তিনি দারুল উলূম দেওবন্দে গমন করেন এবং সেখানে শায়খুল ইসলাম হযরত মাওলানা হুসাইন আহমাদ মাদানী (রহ.)-এর হাদীছের দরসে অংশগ্রহণ করেন।

ইলমে ফিকাহ ঃ দারুল উলূম দেওবন্দে মাওলানা এ'জায আলী সাহেব (রহ.) থেকে তিনি ইলমে ফিকাহর দরস গ্রহণ করেন।

ইলমে তাজবীদ ঃ ক্বারী আসগর আলী সাহেবের নিকট তিনি কেরাআতে হাফস পড়েন।

দর্শন ঃ সাইয়েদ সুলায়মান নদভী (রহ.)-এর নিকট দর্শন পড়েন। তিনি সাইয়েদ সাহেবের একজন বিশিষ্ট শাগরেদ ছিলেন। তাঁর ইলম ও কর্মপদ্ধতি দ্বারা তিনি উপকৃত হয়েছেন। তাছাড়া তিনি আল্লামা শিবলী (রহ.)-এর বক্তৃতাশৈলীর শুধু মূল্যায়নই করতেন না, বরং তার যথাযথ অনুসরণও করতেন।

সুলূক ও তরীকত ঃ ১৯৩১ সালে মাওলানা আহমাদ আলী লাহোরী (রহ.)-এর শায়খ মাওলানা গোলাম মুহাম্মাদ ভাওয়ালপুরী (রহ.)-এর নিকট বায়আত হন। অতঃপর ১৯৪৬ সালে আপন শায়খের নির্দেশে মাওলানা আবদুর রহীম রায়পুরী (রহ.)-এর খলীফা মাওলানা শাহ আবদুল কাদের রায়পুরী (রহ.)-এর হাতে বায়আত হন।

ইংরেজী শিক্ষা ঃ ১৯২৭ সাল থেকে ১৯৩০ সাল পর্যন্ত তিনি ইংরেজী শিক্ষার প্রতি গভীর মনোযোগী হন, যাতে ইসলামী বিষয়সমূহ এবং আরবী সভ্যতা-সংস্কৃতি, ইতিহাস ও অন্যান্য বিষয়ের ইংরেজীর গ্রন্থ সম্ভার থেকে সরাসরি জ্ঞান আহরণ করা সহজ হয়।

বিবাহ ঃ ১৯৩৪ সালে আপন মামাতো বোন, সাইয়েদ আহমাদ সায়ীদ (রহ.)-এর কন্যা, হযরত শাহ যিয়াউন নবী (রহ.)-এর পৌত্রীর সাথে তাঁর বিবাহ হয়। দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামার মুহতামিম ও শায়খুল হাদীছ মাওলানা হায়দার হাসান খান বিবাহের খুতবা পড়েন।

দৈহিক গঠন ও পোশাক ঃ হযরত মাওলানার দৈহিক আকৃতি ছিল মধ্যম। উচ্চতা প্রায় সাড়ে পাঁচ ফুট। গাঁয়ের রং ছিল ফর্সা। হস্তদ্বয় ছিল কোমল। অনুভূতি ছিল তীক্ষ্ণ। তিনি সর্বদা সাদা কাপড় পরতেন। খুবই সাদামাটা জামা ও পাজামা পরতেন। কখনো লম্বা, কখনো শিরস্ত্রাণ জাতীয় টুপী পরতেন। বেশীর ভাগ ঈদের নামাযে ও সফরে শেরওয়ানী পরতেন। ঈদের সময় মাথার উপর রুমাল ব্যবহার করতেন। জুব্বা, লাঠি, তাসবীহ ও পকেট ঘড়ি সাথে রাখতেন।

দুঃখ, কষ্ট ও আনন্দ ঃ হযরত মাওলানার খাস খাদেম হাজী আবদুর রাজ্জাক সাহেব বলেন– আমি ১৯৬০ সাল থেকে হযরতের সাথে বাড়িতে এবং সফরে থেকেছি। হযরতের বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল বিনয় ও নম্রতা। এই দীর্ঘ চল্লিশ বছরের সুদীর্ঘ সময়ে একবার কোন একটা কথায় অসন্তুষ্ট হয়ে শুধুমাত্র এতটুকু বলেছিলেন– "তাকলীফ হুয়ি" অর্থাৎ কষ্ট লাগল। আর এই দীর্ঘ সময়ে সবচেয়ে বড় আনন্দের মুহূর্ত ছিল ১৯৯৮ সালে যখন হেরেমে উপস্থিত হলে চাবি বহনকারী শায়বী সাহেব কাবা শরীফের চৌকাঠে চাবি রাখলেন এবং তালা খোলার ইশারা করলেন। অতঃপর তিনি তালা খুলে কাবা শরীফে প্রবেশের মর্যাদা লাভ করলেন।

দুশ্চিন্তার মুহূর্ত ঃ তিনি সব চেয়ে বেশী দুঃখ পেয়েছিলেন ১৯৬১ সালে তার বড় ভাই ডাঃ আবদুল আলী সাহেবের ইন্তেকালে। কারণ তিনি তখন বার্মা সফরে থাকায় জানাযায় উপস্থিত হতে পারেননি।

পছন্দনীয় খাবার ঃ বছরের ডিসেম্বর ও জানুয়ারী ছাড়া বাকী ১০ মাস বরফ গলানো ঠান্ডা পানি পান করতেন। সকালের নাস্তা ও আসরের পরে এক সাথে একাধিক কাপ চা খাওয়ার অভ্যাস ছিল। চায়ে মিষ্টি বেশী নিতেন এবং খুব গরম চা পান করতেন।

দৈনন্দিন কর্মসূচী ঃ প্রতিদিন রাতের শেষভাগে উঠে তাহারাত সেরে তাহাজ্জুদ আদায়ের পর ফজরের নামাযের পূর্ব পর্যন্ত আল্লাহ পাকের যিকিরে মশগুল থাকতেন। ফজরের পর একটু হাঁটাহাঁটি করা তাঁর অভ্যাস ছিল। জীবনের শেষ দিনগুলোতে অসুস্থতা, দুর্বলতা ও অনিদ্রার কারণে এসময়ে বিশ্রাম করতেন। সাতটা থেকে সাড়ে সাতটা পর্যন্ত নাশতা ও লোকজনের সাথে সাক্ষাতের সময় ছিল। অতঃপর চাশতের নামায, কুরআন মজীদ তেলাওয়াত শেষে দুই-তিনজন সঙ্গী নিয়ে লেখাপড়ার জন্য বসে যেতেন। সাড়ে বারটা পর্যন্ত বই-পত্র রচনা করতেন ও চিঠির জবাব দিতেন। যোহরের নামাযের পর খানা খেয়েই বিশ্রাম করতেন। আসরের নামাযের পূর্বে কখনো

চিঠিপত্র লেখা, কখনো সাক্ষাৎদান, কখনো কুরআন মজীদ তেলাওয়াতের অভ্যাস ছিল।

আসরের পরে মেহমানদেরকে সাক্ষাৎ দিতেন।.মাগরিবের নামাযের বিশ মিনিট আগে নামাযের প্রস্তুতি নিতেন। মাগরিবের নামাযের পরে অন্দর মহলে প্রবেশ করতেন। সফরে রওয়ানা হবার পূর্বে কবরস্তানে গিয়ে সূরা ফাতেহা পড়তেন। ইশার নামাযের পর খানা খেয়ে কিছুক্ষণের জন্য লোকদের সাথে বসতেন। অতঃপর কিছু সময় নদওয়ার উস্তাদ ও ছাত্রদের সাথে কথাবার্তা বলতেন। সাধারণত রাত দশটায় ঘুমাতেন।

রমযান ও হযরত মাওলানা ঃ রমযান মুবারক কুরআন পাক অবতরণের মাস, রহমত বরকত এবং ইবাদত বন্দেগীর বসন্তকাল। নবী করীম (সা.) রমযান মাসে খুবই গুরুত্বের সাথে আল্লাহ পাকের নৈকট্য লাভে সচেষ্ট হতেন। আল্লাহ প্রেমিক ওলী-আল্লাহগণও এ মাসের যথাযোগ্য কদর করতে ভুলতেন না। কুতুবুল ইরশাদ হযরত গংগুহী, শায়খুল ইসলাম হযরত মাদানী, হযরত মাওলানা শাহ আব্দুর রহীম রায়পুরী, হযরত মাওলানা আবদুল কাদের রায়পুরী, হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী, হযরত শায়খুল হাদীছ মাওলানা মুহাম্মাদ যাকারিয়া প্রমুখ বুযুর্গানেদ্বীন তাদের খানকাহে রমযান মাস অতিবাহিত করার জন্য যেসব কর্মসূচী প্রণয়ন করতেন তা সত্যিই আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ সাধনের উজ্জ্বল নমুনা। ঐ সব পরিবেশে মূর্দা প্রাণে নব জীবনের সঞ্চার হতো। আধ্যাত্মিকতার এ বৃষ্টিধারায় সবাই অবগাহন করতো এবং এক পাক পবিত্র নতুন জীবন নিয়ে স্ব-স্ব এলাকায় ফিরে যেত।

হযরত মাওলানা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী (রহ.) তার কর্মজীবনের শুরুতে সফরের আধিক্যের কারণে বিভিন্ন রমযানে বিভিন্ন স্থানে অবস্থান করতেন। কোন সময় রায়পুরের খানকায়, কোন সময় সাহারানপুরে হযরত শায়খুল হাদীছের খানকায়, কোন সময় অন্যান্য বুযুর্গদের সাহচর্যে রমযান মাস অতিবাহিত করতেন। অবশ্য একবার ১৯৪৬ সালে হযরত শায়খুল হাদীছের সাথে নিযামুদ্দীনে পুরো রমযান শরীফ অতিবাহিত করেন। সম্ভবত ৭০ এর দশকের পর হতে তিনি তার নিজের জন্মস্থান রায়রেবেলীর তাকিয়া কেলায় রমযান মাসে স্থায়ীভাবে অবস্থান করতে থাকেন। ঐ সময় হযরতের ভক্ত, মুরীদ এবং মুহিব্বীনদের একটি ছোট জামাত হযরতের সাথে তাকিয়া কেলার মসজিদের রমযান অতিবাহিত করার জন্য জমা হতেন। এ

দল আস্তে আস্তে বাড়তে থাকে এবং ৯০ এর দশকের পর হতে তা কয়েকশ'তে উন্নীত হয়েছিল। ঐ সময় পুরো রমযানে সালেকরা ভারতের এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ হতে হযরতের সোহবত হাসিল করার জন্য ছুটে আসতেন। তাকিয়া কেলায় রমযান অতিবাহিত করার সময় শেষ ১০ দিন তিনি অবশ্যই ই'তিকাফ করতেন। ঐ সময় তার ভক্ত মুরিদীন ও তালেবীন হযরতের কাছ থেকে ফয়েয হাসিল করার খুবই সুযোগ পেত। অবশ্য জীবনের শেষ রমযানে অসুস্থতার কারণে তিনি প্রায় ২০দিন দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামায় কাটিয়েছিলেন। নিম্নে রমযান মাসে হযরতের একটি দৈনিক রুটিন পেশ করা হচ্ছে। অবশ্য হযরতের জীবনের শেষের দিকে অসুস্থতার কারণে সময়সূচীর কিঞ্চিৎ পরিবর্তনও হতো।

রমযানের কর্মসূচী ঃ আযানের পরপর ফযরের নামায আদায় করতেন। ইশরাক আদায়ের পর হযরত যেহেতু হাফেয ছিলেন তাই কুরআন শরীফ অন্য কাউকে শোনাতেন। তারপর লিখতে বসতেন। বেলা ১১ টা থেকে আম মজলিসের কার্যক্রম শুরু হত। এ মজলিস হত কয়েকটি বিষয়ের উপর। তার ভিতর প্রশ্নোত্তর পর্বটি সবচেয়ে আকর্ষণীয় ছিল। এছাড়া 'ইযা হাব্বাত রীহুল ঈমান' আরবী কিতাবের দরস হত। যোহরের নামাযের পর শুরু হত হযরতের বিখ্যাত সীরাত বিষয়ক গ্রন্থ 'আস্-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ' গ্রন্থের আরবী দরস ও ব্যাখ্যা। এই দরস প্রায় ৪৫ মিনিট স্থায়ী হত।

এরপর তিনি নিজ কামরায় গিয়ে অন্যের তিলাওয়াত শুনতেন। তারপর চিঠিপত্রের জবাব দিতেন এবং দেশ বিদেশ থেকে আসা বিভিন্ন নতুন কিতাবের পাতা উল্টিয়ে দেখতেন ও বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা পড়তেন। আসরের নামাযের পর ফাযায়েলের কিতাব থেকে তালিম হতো এবং শেষ দিকে তাঁর নিজের লিখিত কিতাব আরকানে আরবাআ' থেকে রোযার অধ্যায় পড়ে শোনানো হতো। এরপর দু'আ হতো।

দু'আর পরে মসজিদ সংলগ্ন সাই নদীর কুলে বকুল গাছের ছায়ায় বসে কুরআন তিলাওয়াত শুনতেন। মাগরিবের আযান হলে সবাইকে নিয়ে মাদীনা শরীফের খেজুর দিয়ে ইফতার করতেন। মাগরিবের নামায শেষে সবাইকে নিয়ে একসঙ্গে বসে খানা খেতেন। খানার পর কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিতেন। ইশার আযান হলে ইশা ও তারাবীহর নামায পড়তেন। নামায শেষে বৈঠকখানায় পনের বিশ মিনিট বসে লোকজনের সাথে বিভিন্ন বিষয়ে কথা বলতেন।

এরপর বাসায় যেতেন। বাসাতেই সেহরী খেতেন। রমযানের শেষ দশদিন তিনি ইতিকাফ করতেন। ইতিকাফের জন্য সময়সূচীর সামান্য পরিবর্তন হতো।

হাস্য-কৌতুক ঃ হযরত মাওলানার স্বভাব নিরস ছিল না। বরং তাঁর রসবোধ ছিল অতি উচ্চাঙ্গের। একবার ইঞ্জিনিয়ার ইমতিয়ায (যিনি নদওয়া পরিবারের নির্মাণ কাজ দেখাশুনা করতেন) হযরতের পা দাবাচ্ছিলেন। তিনি ইঞ্জিনিয়ার সাহেবকে বললেন, আপনি ছেড়ে দিন। কারণ যেখানেই আপনার হাত লাগবে সেখানেই বিল্ডিং হয়ে যাবে। একবার নদওয়ার স্টাফ হাফেয আতিকুর রহমান সাহেবকে যখন ছাপাখানা থেকে বাবুর্চি খানার দায়িত্বে আনা হল, তখন তিনি হযরতের কাছে অনুযোগ করলেন আর তিনি হেসে বললেন, 'শুধু আইন আর খা' এর পার্থক্য। অর্থাৎ মাতবা' থেকে মাতবাখ হয়েছে।

হযরতের খাস খাদেম হাজী আব্দুর রাজ্জাক সাহেবের ব্যাপারে এক চিঠিতে লিখেছিলেন, "এই লোকটি আমার সারা জীবনের সাথী আর বৃদ্ধাবস্থার লাঠি"।

ইলমী ও দাওয়াতী জীবনের সূচনা ঃ ১৯৩৪ সালে তিনি দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামাতে শিক্ষক নিযুক্ত হন এবং তাফসীর, হাদীছ, আরবী আদব, ইতিহাস ও তর্কশাস্ত্রের কিতাবাদি পড়ান।

১৯৩৯ সালে দ্বীনী মারকাজসমূহ সম্পর্কে জানার জন্য সফর করেন। এই সফরে হযরত শাহ আব্দুল কাদের রায়পুরী (রহ.) ও মাওলানা মুহাম্মাদ ইলিয়াস কান্দলভী (রহ.)-এর সাথে পরিচয় হয়। ঐ সময় থেকে তাদের সাথে বিশেষ সম্পর্ক সৃষ্টি হয়। সাক্ষাতের পূর্বে এই দুই বুযুর্গের সাথে সম্পর্ক ছিল। কিন্তু সাক্ষাতের পরে তাদের সার্বিক দিক-নির্দেশনা ও দ্বীনের প্রচার-প্রসারের ব্যাপারে পৃষ্ঠপোষকতা আজীবন পেতে থাকেন। এ সম্পর্ক আজীবন অক্ষুণ্ন ছিল।

১৯৪৩ সালে তিনি আঞ্জুমানে তালীমাতে কুরআন নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। এতে কুরআনে কারীম ও সুন্নাতে নববীর দরসের ধারাবাহিকতা চালু হয় এবং তা খুব সমাদৃত হয়।

১৯৪৫ সালে নদওয়াতুল উলামার ব্যবস্থাপনা পরিষদের রোকন নির্বাচিত হন।

১৯৫১ সালে আল্লামা সুলায়মান নদভী (রহ.)-এর অনুমতিতে সহকারী পরিচালক নিযুক্ত হন।

১৯৫৪ সালে আল্লামা সুলায়মান নদভী (রহ.)-এর ইন্তেকালের পর সর্বসম্মতিক্রমে শিক্ষাসচিব নিযুক্ত হন।

১৯৫৯ সালে মজলিসে তাহকীকাত ও নাশরিয়্যাতে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করেন।

১৯৬১ সালে বড় ভাই ডাক্তার আব্দুল আলী সাহেবের ইন্তেকালের পর নদওয়াতুল উলামার নাযেম বা মহাপরিচালক নিযুক্ত হন।

সম্মান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষাকেন্দ্রসমূহের রুকনিয়্যাত ঃ

১৯৫৭ সালে দামেস্কের 'মাজমাউল লুগাতিল আরাবিয়া' বা আরবী একাডেমীর সদস্য নির্বাচিত হন।

১৯৬২ সালে রাবেতা আলমে ইসলামীর প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে মক্কা মুকাররমাতে প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। তাতে যোগদানের জন্য আমন্ত্রণ লাভ করেন। সউদ ইবনে আবদুল আযীয ও লিবিয়ার হাকীম ইদ্রিস সান্নুসীও এতে উপস্থিত ছিলেন। উক্ত সম্মেলনে হযরত মাওলানা ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করেন।

১৯৬২ সালে জামেয়া ইসলামিয়াঁ মদীনা মুনাওয়ারা প্রতিষ্ঠার সময় তাকে মজলিসে শূরার সদস্য বানানো হয়। মজলিসে শূরা কায়েম থাকা পর্যন্ত তিনি উক্ত পদে সমাসীন ছিলেন।

মরক্কোর রাবাতে অনুষ্ঠিত রাবেতায়ে জামেয়া ইসলামিয়াঁর সম্মেলনে রাবেতা আলমে ইসলামীর সেক্রেটারীর নেতৃত্বে অংশগ্রহণ করেন। অতঃপর নদওয়াতুল উলামার প্রতিনিধি হিসাবে তিনি স্বতন্ত্র সদস্য ছিলেন।

১৯৮১ সালে জর্দানের মাজমাউল লুগাতিল আরাবিয়ার (জর্দানের আরবী একাডেমীর) সদস্য করা হয়।

১৯৮১ সালে কাশ্মীর ইউনিভার্সিটির পক্ষ থেকে তাঁকে সাহিত্যে সম্মানসূচক পি.এইচ.ডি. ডিগ্রী প্রদান করা হয়।

১৯৮৩ সালে অক্সফোর্ডে ইসলামিক সেন্টার প্রতিষ্ঠার সময় তাকে আজীবন সভাপতিরূপে মনোনীত করা হয়।

১৯৮৪ সালে রাবেতায়ে আদবে ইসলামী আল আলামী প্রতিষ্ঠার সময় তাকে আজীবন সভাপতি মনোনীত করা হয়।

১৯৬৮ সালে সৌদী শিক্ষামন্ত্রণালয়ের দাওয়াতে শরীয়াহ্ অনুষদের পাঠ্যক্রম ও শিক্ষানীতি তৈরী করার জন্য রিয়াদ তাশরীফ নেন। তখন রিয়াদ বিশ্ববিদ্যালয় ও কুল্লিয়াতুল মুআল্লেমিনে (টিচার্স ট্রেনিং কলেজ) বক্তৃতা দেন।

১৯৩২ সালে নদওয়াতুল উলামা থেকে আরবী পত্রিকা 'আয-যিয়া' ও ১৯৪০ সালে উর্দু পত্রিকা 'আন-নদওয়া' বের করার ব্যাপারে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ১৯৪৮ সালে আঞ্জুমানে তা'লীমাতে ইসলামের পক্ষ থেকে 'তামীরে হায়াত' নামে উর্দু ভাষায় একটি পত্রিকা প্রকাশ শুরু করেন।

১৯৫৮-৫৯ সালে দামেশ্ক থেকে প্রকাশিত 'আল-মুসলিমুন' পত্রিকায় প্রবন্ধ লেখা শুরু করেন। প্রথম প্রবন্ধ ردة ولا ابا بكر শিরোনামে প্রকাশিত হয়। অতঃপর 'নয়া তুফান আওর উসকা মুকাবালা' নামে উর্দু তরজমায় তা প্রকাশিত হয়। এছাড়া উস্তাদ মুহিব্বুদ্দীন খতীবের পত্রিকা 'আল-ফাতাহ'তেও কতিপয় প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়।

১৯৬৩ সালে লাখনৌ থেকে নেদায়ে মিল্লাত প্রকাশ হওয়া শুরু হলে তিনি এর পৃষ্ঠপোষক হন। ১৯৫৫ সালে নদওয়া থেকে প্রকাশিত আরবী পত্রিকা البعث الإسلامي ও ১৯৫৯ সালে প্রকাশিত আরবী পত্রিকা 'আর-রায়েদ' এবং ১৯৬৩ সালে উর্দু পত্রিকা পাক্ষিক তা'মীরে হায়াতের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

মুসলিম বিশ্বে উল্লেখযোগ্য ইলমী ও আমলী খেদমতের স্বীকৃতি স্বরূপ ১৯৮০ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারী রিয়াদে অনুষ্ঠিত এক অনুষ্ঠানে আল্লামা নদভীকে শাহ্ ফয়সাল এওয়ার্ড প্রদান করা হয়। সৌদি আরবে এ সম্মানীর মূল্যমান দুই লক্ষ চল্লিশ হাজার রিয়াল। ভারতে যার মূল্যমান চব্বিশ লক্ষ রূপী। তিনি ফয়সাল এওয়ার্ডের অর্ধেক অর্থ আফগান উদ্বাস্তুদের মাঝে এবং বাকী অর্ধেক মক্কা মুকাররমার দু'টি প্রতিষ্ঠান– এদারায়ে হিফযুল কুরআন ও মাদরাসায়ে সওলাতিয়াতে বন্টন করে দেন।

আল্লামা সুলায়মান নদভী (রহ.) রচিত সীরাতুন্নবী ৫ম খণ্ডের ভূমিকা হযরত মাওলানা লিখেছিলেন। উক্ত কিতাব যখন পাকিস্তান থেকে প্রকাশিত হয় তখন প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হক হযরত মাওলানাকে একলাখ রূপী সম্মানী প্রদান করেছিলেন। হযরত মাওলানা অর্ধেক অর্থ দারুল মুসান্নিফীন আযমগড়ে এবং বাকী অর্ধেক অর্থ আল্লামা সাইয়েদ সুলায়মান নদভীর স্ত্রীকে প্রদান করেছিলেন।

১৯৯৯ সালে দুবাইয়ে এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানে ইসলামী বিশ্বের মহান ব্যক্তিত্বের এওয়ার্ড প্রদান করা হয়। এ থেকে প্রাপ্ত অর্থ হযরত মাওলানা উপমহাদেশের বিভিন্ন দ্বীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দান করে দেন। এর মূল্যমান ছিল প্রায় এক কোটি বিশ লাখ রূপী।

১৯৯৯ সালে অক্সফোর্ড ইসলামী সেন্টারের পক্ষ থেকে তারিখে দাওয়াত ও আযীমাত সম্পর্কিত আলোচনা সভায় সুলতান হাসান বলখিয়্যা হযরত মাওলানাকে ব্রুনাই ইন্টারন্যাশনাল এওয়ার্ড পুরস্কারে ভূষিত করেন। এ অর্থও তিনি দুস্থদের মাঝে বণ্টন করে দেন।

রুকনিয়্যাত ঃ ১৯৬১ সালের ৮ই জুন দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামার নাযেম নির্বাচিত হন।

- **সভাপতি ঃ** দ্বীনী তালীমী কাউন্সিল, উত্তর প্রদেশ।
- **সভাপতি ঃ** অল ইন্ডিয়া মুসলিম পারসনাল ল' বোর্ড।
- **সভাপতি ঃ** মজলিসে এন্তেজামী ও মজলিসে আমেলা, দারুল মুছান্নিফীন আযমগড়।
- **সভাপতি ঃ** ইসলামিক সেন্টার, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি লন্ডন।
- **সভাপতি ঃ** ফাউন্ডেশন ফর স্টাডিজ এন্ড রিসার্চ লুক্সেমবার্গ।
- **সভাপতি ঃ** মজলিসে তাহকীকাত ও নাশরিয়্যাতে ইসলাম লাখনৌ।
- **সভাপতি ঃ** রাবেতা আদবে ইসলামী আল-আলামী।
- **সদস্য ঃ** মুয়াসসাসাহ আল-বাইত, আম্মান, জর্দান।
- **প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ঃ** তাহরিকে পায়ামে ইনসানিয়্যাত, লাখনৌ।
- **প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ঃ** রাবেতা আলমে ইসলামী, মক্কা মুকাররমা।
- **সদস্য ঃ** মজলিসে শুরা, জামেয়া ইসলামিয়াঁ মদীনা মুনাওওয়ারা।
- **সদস্য ঃ** আরবী একাডেমী, দামেশ্ক, কায়রো ও জর্দান।
- **সদস্য ঃ** একাডেমী অফ লেবারারস, দামেশ্ক ইউনিভার্সিটি, দামেশ্ক।
- **সদস্য ঃ** মজলিসে আমেলা, মুতামার আলমে ইসলামী বৈরুত।

- **সদস্য ঃ** মজলিসে ইনতেজামী, ইসলামিক সেন্টার, জেনেভা।
- **সদস্য ঃ** মাজমাউল ফিক্‌হিল ইসলামী, রাবেতা আলমে ইসলামী, মক্কা মুকাররমা।
- **সদস্য ঃ** মজলিসে শূরা, দারুল উলূম দেওবন্দ।
- **সদস্য ঃ** মজলিসে আমেলা, ইসলামিক ইউনিভার্সিটিজ ফেডারেশন, মরক্কো।
- **সদস্য ঃ** একাডেমী অব আরবী ল্যাঙ্গুয়েজ, ওমান।
- **সদস্য ঃ** ন্যাশনাল ফাউন্ডেশন ফর ট্রানস্লেশন রিসার্চ এন্ড স্টাডিজ, তিউনিসিয়া।
- **ভিজিটিং প্রফেসর ঃ** দামেশ্‌ক ইউনিভার্সিটি। এ ছাড়াও বহু প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনের সভাপতির দায়িত্ব তাঁর উপর ন্যস্ত ছিল।

সফরসমূহ ঃ ১৯২৯ সালে দূর পথের প্রথম সফর করেন লাহোর। সেখানে ইলমী ও দ্বীনী বুযুর্গদের সাথে সাক্ষাৎ হয়। ইসলামের কবি ডঃ ইকবালের সাথেও সাক্ষাৎ করেন। তাঁর লিখিত উর্দু কবিতা 'চান্দ' এর আরবী অনুবাদ তাঁকে পেশ করেন।

- ১৯৩৫ সালে দলিত নেতা ডঃ আম্বেদকরকে ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার জন্য বোম্বে সফর করেন।
- ১৯৪৭ সালে হজ্জ উপলক্ষে প্রথম সফর করেন এবং কয়েকমাস হেজাযে অবস্থান করেন। এটাই তাঁর প্রথম বিদেশ সফর।
- ১৯৫০ সালে হজ্জের দ্বিতীয় সফর করেন। এ বছর মিসর, সুদান, সিরিয়া ও জর্দান সফর করেন।
- ১৯৫১ সালে মিসরে প্রথম সফর ছিল। মা-যা খাসিরাল আলামু বি ইনহিতাতিল মুসলিমীন বা ইনসানী দুনিয়া পর মুসলমানু কে উরুয ওয়া যাওয়াল কা আছর– মাওলানার এ কিতাব তাঁর পৌঁছার পুর্বেই তাকে পরিচয় করে দিয়েছিল। উক্ত সফরে ফিলিস্তিন, বায়তুল মুকাদ্দাস ও মসজিদে আকসা যিয়ারতে গিয়েছিলেন। ফেরার পথে জর্দানের আমীর শাহ আবদুল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ হয়।

- ১৯৫৬ সালে প্রথম তুরস্ক সফর করেন। এ বছর লেবাননও সফর করেন।
- ১৯৬০ সালে বার্মা সফর করেন।
- ১৯৬২ সালে প্রথম কুয়েত সফর করেন। অতঃপর উপসাগরীয় দেশসমূহ সফর করেন। জর্দান ও ইয়ামনও সফর করেন। এসব সফরের বিভিন্ন স্থানে তিনি দ্বীনী দাওয়াতের উপর সারগর্ভ বক্তৃতা করেন।
- ১৯৬৩ সালে ইউরোপে প্রথম সফর করেন। এ সফরে তিনি লন্ডন, প্যারিস, কেমব্রিজ, অক্সফোর্ড ও স্পেনের গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলো সফর করেন।
- ১৯৭৬ সালে মসজিদে আকসা সফর করেন।
- ১৯৭৭ সালে আমেরিকায় প্রথম সফর করেন। এখানে দুই মাস দশ দিন অবস্থান করেন। এ সময়ে আমেরিকার বিভিন্ন শহরে যান এবং দাওয়াতী ও দ্বীনী বক্তব্য প্রদান করেন। এ সফরে তিনি চোখও অপারেশন করান।
- ১৯৭৭ সালে আফগানিস্তান, ইরান, ইরাক ও লেবানন সফরে রাবেতা আলমে ইসলামী প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন।
- ১৯৮৫ সালে বেলজিয়াম।
- ১৯৮৭ সালে তাশকন্দ, সমরকন্দসহ অন্যান্য শহর।
- ১৯৭৩ ও ১৯৮৪ সালে জর্দান।
- ১৯৭৩ সালে স্পেন, ১৯৭৩ সালে আফগানিস্তান এবং ১৯৭৪, ৭৬, ৮৩, ৮৮, ৯৩ ও সর্বশেষ ১৯৯৯ সালের সংযুক্ত আরব আমীরাত।
- ১৯৭৭ ও ১৯৯৩ সালে উত্তর আমেরিকা।
- ১৯৬৩, ৬৪, ৬৯, ৮৩, ৮৬, ৮৭, ৮৯, ৯২ ও ১৯৯৩ সালে ইউরোপ।
- ১৯৭৩ সালে ইরান।
- ১৯৫৯, ৬৪, ৭৮, ৮৪ ও ১৯৮৬ সালে পাকিস্তান।
- ১৯৮৬ সালে বুখারা।
- ১৯৬৩ ও ১৯৮৫ সালে ব্রিটেন।
- ১৯৮৪ ও ৯৪ সালে বাংলাদেশ।

- ১৯৫৬, ৬৪, ৮৬, ৮৯, ৯৩ ও ১৯৯৬ সালে তুরস্ক।
- ১৯৮২ ও ১৯৮৬ সালে আলজেরিয়া।
- ১৯৪৭, ৫১, ৬২, ৬৫, ৬৭ ও ১৯৬৯ সালে হেজায। এরপর আরো অনেকবার।
- ১৯৭৯ ও ১৯৯৫ সালে কাতার।
- ১৯৭৬ ও ৮৬ সালে মরক্কো।
- ১৯৮২ সালে শ্রীলংকা।
- ১৯৯৩ সালে সমরকন্দ।
- ১৯৫১ সালে সুদান।
- ১৯৫১, ৫৬, ৬৪ ও ১৯৭৩ সালে সিরিয়া।
- ১৯৫৬ ও ১৯৭৩ সালে ইরাক।
- ১৯৫১, ৭৩, ৮৪ ও ১৯৯৮ সালে ওমান।
- ১৯৫১ সালে ফিলিস্তিন।
- ১৯৬২, ৭৮, ৮৩ ও ১৯৮৭ সালে কুয়েত।
- ১৯৫৬ ও ১৯৭৩ সালে লেবানন।
- ১৯২৯ সালে লাহোর।
- ১৯৮২ ও ১৯৮৭ সালে মালয়েশিয়া।
- এবং ১৯৫১ সালে মিসর ও ১৯৮৪ সালে ইয়ামান সফর করেন। এছাড়াও বিভিন্ন সময় তিনি আরও বহু দেশ সফর করেন।

==ooo==

অধ্যায়–১
পারিবারিক ঐতিহ্য

পরিবার ও বংশলতিকা

হযরত মাওলানা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী এমন এক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন, যে পরিবার দীর্ঘকাল ধরে ইলমী ও দ্বীনী খেদমত করে আসছিল। বলা যেতে পারে এ পরিবারের পুরো ইতিহাসে এমন কোন যুগ যায়নি, যাতে কোন সংস্কারক, লেখক ও মুবাল্লিগ জন্ম নেননি। মাঝখানে এমন মুজাদ্দিদ ও মুবাল্লিগগণও জন্মগ্রহণ করেছেন, যাঁরা শতাব্দীর পর শতাব্দী যাবত মুসলিম জাতির বুদ্ধিবৃত্তিক নেতৃত্ব দিয়েছেন এবং যাদের সংস্কার চিন্তা ও সংস্কারের আহ্বান নিয়ে যুগ যুগ ধরে দাওয়াত ও জিহাদের কর্মীরা দিক-নির্দেশনা লাভ করেছে।

হযরত মাওলানা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী (রহ.)-এর পিতৃ পরম্পরা মহানবী (সা.)-এর প্রিয় দৌহিত্র হযরত হাসান (রা.) পর্যন্ত পৌঁছে। এই সোনালী ধারার প্রথম ব্যক্তিত্ব, যিনি ভারতবর্ষে সাইয়েদ বংশের শুভ যোগসূত্র রচনা করেন, তিনি ছিলেন শায়খুল ইসলাম আমীর কুতবুদ্দীন মুহাম্মাদ মাদানী (রহ.)। তিনি ছিলেন শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী (রহ.)-এর ভাগিনা। তাঁর পিতৃপরম্পরা ছিল নিম্নরূপঃ আমীর কুতবুদ্দীন মুহাম্মাদ ইবনে রশীদুদ্দীন আহমাদ ইবনে ইউসুফ ইবনে ঈসা ইবনে হাসান ইবনে আবুল হাসান আলী ইবনে আবু যাফর ইবনে কাসেম ইবনে আবু মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ ইবনে হাসান আল আ'ওয়ার আল জাওয়াদ নাকীবুল কূফা ইবনে মুহাম্মাদ ছানী ইবনে আবু মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ আল আশতার ইবনে মুহাম্মাদ সাহেবুন নাফসিয যাকিয়্যা ইবনে আব্দুল্লাহ আলমাহয ইবনে হাসান মুছান্না ইবনে হাসান মুজতাবা (রা.) ইবনে আলী মুরতাযা (রা.)।

হযরত হাসান মুছান্না নিজ চাচা শহীদে কারবালা হযরত হুসাইন (রা.)-এর কনিষ্ঠা কন্যা হযরত ফাতেমা সুগরাকে বিয়ে করেছিলেন, সে হিসেবে এ পরিবারের সন্তানদেরকে হাসানী ও হুসাইনী বলা হয়। আহলে বায়তের অন্যান্য শাখার মত এ শাখার লোকদেরও বনু উমাইয়া ও আব্বাসী শাসকদের হাতে নিগৃহীত হতে হয়। মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী হযরত মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ, যিনি নাফসে যাকিয়্যা উপাধীতে ভূষিত

ছিলেন, মদীনা তায়্যিবায় শহীদ হন। ইমাম মুহাম্মাদ নাফসে যাকিয়্যার চাচাত ভাইদের বংশধরেরা আফ্রিকা ও আরবের বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে। তাদের বংশে অনেক প্রসিদ্ধ ইমাম ও বুযুর্গ জন্মগ্রহণ করেন।

আমীর কুতবুদ্দীন মুহাম্মাদ মাদানী ছিলেন অনেক উঁচু স্তরের বুযুর্গ। তিনি প্রথমে নিজ মামা হযরত শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী (রহ.)-এর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। তাঁর ইন্তেকালের পর তাঁর খলীফা শায়খ নাজমুদ্দীন কুবরার নিকট বায়আত হন এবং খেলাফত লাভ করেন। তিনি স্বপ্নের মাধ্যমে ভারতবর্ষে গিয়ে কুফর-শিরকের অন্ধকার দূরীভূত করার জন্য মহানবী (সা.)-এর নির্দেশ লাভ করেন। সে মতে হিজরী ষষ্ঠ শতাব্দীতে তিনি সহস্রাধিক মুরীদসহ ভারতবর্ষে আগমন করেন এবং কড়ামানিকপুরের আশেপাশে জিহাদ করে এ অন্ধকার এলাকাকে ইসলামের নূরে আলোকিত করেন। তিনি কড়ায় ইন্তেকাল করেন। সেখানেই তাঁকে সমাহিত করা হয়।

কড়ামানিকপুরে প্রায় শতাব্দীকাল যাবত হযরত সাইয়েদ কুতবুদ্দীন মাদানীর বংশধরের অত্যন্ত সুনাম ও সম্মানের সাথে বসবাস করতে থাকেন। অতঃপর এই বংশের এক মহান ব্যক্তিত্ব সাইয়েদ কুতবুদ্দীন মুহাম্মাদ (দ্বিতীয়) জাইসের কাযী নিযুক্ত হয়ে সেখানে চলে যান। তাঁর পুত্র সাইয়েদ আলাউদ্দীন নাসীরাবাদের কাযী হয়ে সেখানে গিয়ে বসতি স্থাপন করেন। তাঁর পৌত্র ছিলেন সাইয়েদ আহমাদ। তাঁর পুত্র সাইয়েদ মুহাম্মাদ মুয়াজ্জমের দুই পুত্র ছিলেন- সাইয়েদ মুহাম্মাদ ফুযায়েল ও সাইয়েদ মুহাম্মাদ ইসহাক। সাইয়েদ মুহাম্মাদ ফুযায়েলের পুত্র সাইয়েদ শাহ আলামুল্লাহ (রহ.) ছিলেন হযরত আদম বিন্নৌরী (রহ.)-এর একজন বিশিষ্ট খলীফা। তাঁরই পঞ্চম অধঃস্তন পুরুষ ছিলেন মুজাহিদে আযম হযরত সাইয়েদ আহমাদ শহীদ (রহ.)। হযরত মাওলানা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী (রহ.) ছিলেন সাইয়েদ মুহাম্মাদ ইসহাক (রহ.)-এর বংশধর।

সাইয়েদ শাহ আলামুল্লাহ (রহ.)

সাইয়েদ মুহাম্মাদ ফুযায়েলের পুত্র হযরত শাহ আলামুল্লাহ (রহ.) মক্কা-মদীনায় অবস্থানের নিয়তে নাসীরাবাদ থেকে রওয়ানা হয়ে রায়বেরেলী আসেন। এখানে এক বুযুর্গের পরামর্শে তিনি তাঁর ইচ্ছা পরিবর্তন করেন এবং সাই নদীর তীরে খোলামাঠে একটি ছাপড়া ঘর ও একটি মাটির মসজিদ নির্মাণ করে সেখানেই অবস্থানগ্রহণ করেন। নিকটস্থ গ্রাম লোহানীপুরের জমিদার দৌলতখান তাকে দশ বিঘা জমি দান করেন। এটাই পরবর্তীকালে দায়েরায়ে শাহ আলামুল্লাহ বা তাকিয়া নামে প্রসিদ্ধ হয়।

হযরত শাহ আলামুল্লাহর চাচাত ভাইদের বংশধরেরা নাসীরাবাদেই বসবাস করতে থাকেন। অতঃপর শাহ আলামুল্লাহ (রহ.)-এর পঞ্চম অধঃস্তন পুরুষ মাওলানা মুহাম্মাদ জাহের (রহ.)-এর দু'কন্যাকে পর্যায়ক্রমে বিয়ে করেন মাওলানা সাইয়েদ আব্দুল আলী নাসীরাবাদী। সে সময়েই তিনি নাসীরাবাদ থেকে রায়বেরেলীর দায়েরায়ে শাহ আলামুল্লাহ এসে বসতি স্থাপন করেন। এ পরিবারেই পরবর্তীকালে জন্মগ্রহণ করেন হযরত মাওলানা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী (রহ.)।

আমীর কুতবুদ্দীন মুহাম্মাদ মাদানী (রহ.) পর্যন্ত তাঁর বংশ লতিকা নিম্নরূপঃ

মাওলানা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী ইবনে মাওলানা সাইয়েদ আব্দুল হাই ইবনে ফখরুদ্দীন ইবনে আব্দুল আলী ইবনে আলী ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আকবর শাহ ইবনে মুহাম্মাদ শাহ ইবনে মুহাম্মাদ তাকী ইবনে আবদুর রহীম ইবনে হেদায়াতুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ ইসহাক ইবনে মুহাম্মাদ মুয়াজ্জম ইবনে কাযী আহমাদ ইবনে কাযী মাহমুদ ইবনে কাযী আলাউদ্দীন ইবনে আমীর কুতবুদ্দীন মুহাম্মাদ সানী ইবনে সদরুদ্দীন ইবনে যয়নুদ্দীন ইবনে আহমাদ ইবনে আলী ইবনে কিয়ামুদ্দীন ইবনে সদরুদ্দীন ইবনে রুকনুদ্দীন ইবনে আমীর নিযামুদ্দীন ইবনে শায়খুল ইসলাম আমীর কুতবুদ্দীন মুহাম্মাদ মাদানী।

আমীর কুতবুদ্দীন (রহ.)-এর সন্তানদের মধ্যে এত অধিক সংখ্যক বুযুর্গ, আলেম ও সুফীসাধক জন্ম নিয়েছেন যে, অন্যকোন বংশে এরূপ নজীর খুব কম পাওয়া যায়। তাঁর পৌত্র কাজী সাইয়েদ রুকনুদ্দীন একজন বড় মাপের বুযুর্গ ছিলেন। তাঁর সন্তানদের মধ্যে হযরত কাজী সাইয়েদ আহমাদ নাসীরাবাদী অত্যন্ত আত্মমর্যাদাশীল ও সাহেবে নেসবত বুযুর্গ ছিলেন। তাঁর সন্তানদের মধ্যে হযরত কাজী সাইয়েদ মুহাম্মাদ ফুযায়েল ছিলেন রিয়াজত-মুজাহাদা ও সুন্নাত পালনে অত্যন্ত উঁচু মর্যাদার অধিকারী। অপর পৌত্র হযরত সাইয়েদ মুহাম্মাদ ইসহাক (রহ.)ও আরেফে কামেল ছিলেন। তার পুত্র দেওয়ান খাজা আহমাদ সাহেব ছিলেন উঁচুদরের আলেম এবং সিলসিলাভুক্ত তরিকতের শায়খ। এই সোনালী ধারায় হযরত সাইয়েদ মুহাম্মাদ ফুযায়েলের পুত্র হযরত সাইয়েদ শাহ আলামুল্লাহ (রহ.) ছিলেন বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। তিনি হযরত সাইয়েদ আদম বিন-নূরী (রহ.)-এর বিশিষ্ট খলীফাগণের অন্যতম ছিলেন। সুন্নাত পালনে তাঁর নজীর পাওয়া যেত না। তাঁর সন্তানদের মধ্যে হযরত মাওলানা সাইয়েদ মুহাম্মাদজী, হযরত

শাহ লা'ল সাহেব, হযরত মাওলানা সাইয়েদ মুহাম্মাদ হায়া, হযরত মাওলানা সাইয়েদ মুহাম্মাদ সাবের, হযরত শাহ আবু সায়ীদ, হযরত শাহ মুহাম্মাদ ওয়াজিহ, হযরত মাওলানা সাইয়েদ কুতবুল হুদা মুহাদ্দিছ, হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ তাহের ও হযরত শাহ যিয়াউন্নবী রহমাতুল্লাহি আলায়হিম অত্যন্ত উঁচু স্তরের বুযুর্গ ছিলেন।

সাইয়েদ আহমাদ শহীদ (রহ.)

অবশ্য সবচেয়ে প্রসিদ্ধ ব্যক্তিত্ব হলেন হযরত সাইয়েদ আহমাদ শহীদ (রহ.)। তিনি হযরত শাহ সাহেবের চতুর্থ অধঃস্তন পুরুষ। তাঁর রূহানী ফয়েয ও তাওয়াজ্জুহের বরকতে এবং জিহাদী কর্ম প্রচেষ্টায় মুসলমানদের যে কল্যাণ সাধিত হয়েছে তা যিনি ইলম ও মারেফাতের আলোয় ধন্য হয়েছেন এমন কারো পক্ষে অস্বীকার করার উপায় নেই।

সাইয়েদ মুহাম্মাদ ইসহাক (রহ.)-এর পুত্র সাইয়েদ হেদায়াতুল্লাহ (রহ.) ছিলেন অত্যন্ত উঁচু দরের আলেম। তিনি সম্রাট শাহজাহানের সময়ে ধর্মীয় বিষয়ের সদরুস সুদূর ছিলেন। তাঁরই সন্তানদের মধ্যে মাওলানা সাইয়েদ আব্দুল আলী ছিলেন দুনিয়াত্যাগী সাধকপুরুষ। তিনি হযরত সাইয়েদ আহমাদ শহীদ (রহ.)-এর মুরীদ ও খলীফা ছিলেন। তাঁর মধ্যে এমনই খোদাভীরুতা ছিল যে, ডাকপিয়ন সামনে এলে তিনি আমলনামার কথা চিন্তা করে কাঁদতে থাকতেন। অংকন ও ক্যালিগ্রাফির বিশেষ রুচিবোধ ছিল তাঁর। যা কিছু উপার্জন করতেন তার সিংহভাগই সদকা করে দিতেন। এভাবে বদান্যতার জীবনযাপন করে মাত্র ৪৮ বছর বয়সে পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হয়ে তিনি ইন্তেকাল করেন। তাঁর জবানে সর্বশেষ উচ্চারিত শব্দ ছিল "হুয়ার রফীকুল আ'লা"।

দাদা ঃ হাকীম সাইয়েদ ফখরুদ্দীন (রহ.)

হযরতের দাদা মাওলানা হাকীম সাইয়েদ ফখরুদ্দীন খেয়ালী (রহ.) ছিলেন মাওলানা আব্দুল আলীর সন্তান। তিনি দায়েরায়ে শাহ আলামুল্লাহ রায়বেরেলীতে ১২৫৬ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর নানা মাওলানা সাইয়েদ মুহাম্মাদ তাহের (রহ.)-এর নিকট লালিত-পালিত হন। তিনি চিকিৎসাবিদ্যা ও কাব্যে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। তাঁর স্বভাবে ছিল অতিমাত্রায় নীরবতা, ধৈর্য ও স্থিরতা। অল্পেতুষ্টির গুণ তাঁর প্রতিটি কাজেই প্রকাশ পেত। অহমিকা ও বড়াই তাঁকে কখনই স্পর্শ করতে পারেনি। তিনি বায়আত

হয়েছিলেন নিজের ফুফা হযরত খাজা আহমাদ সাহেবের নিকট। ইজাযতও লাভ করেছিলেন। হযরত মাওলানা সাইয়েদ তাহের সাহেব তাঁকে বায়আতের ইজাযত দান করেছিলেন। কিন্তু তিনি কখনই পীর-মুরীদী করেননি। সর্বদা যিকির-শোগলে লিপ্ত থাকতেন। পড়াশোনা ও লেখালেখির সাথে বিশেষ সম্পর্ক ছিল। ইতিহাসের প্রতি খুবই ঝোঁক ছিল। দরস-তাদরিসের ধারাও চালু ছিল। তাঁর কতিপয় রচনা তাঁকে স্মরণীয় করে রেখেছে। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল 'মেহরে জাহাঁতাব'। তিনি নিজের কামালাত কিছুতেই প্রকাশ করতে দিতেন না। এজন্যই তাঁর জীবদ্দশায় তাঁকে খুব কম মানুষ জানতে পেরেছিল। ১০ই রমযানুল মোবারক ১৩২৬ হিজরী যিকির করতে করতে তিনি স্বীয় প্রভুর সান্নিধ্যে তাশরীফ নেন।

হযরতের নানা হযরত শাহ যিয়াউন্নবী হাসানী (রহ.) নিজ যুগে বুযুর্গীর প্রতীক এবং শুধু নিজ বংশেই নয়, বরং আশেপাশের কয়েকটি জেলার গণমানুষের আস্থার স্থল ছিলেন। সুন্নাতের অনুসরণ, নামাযে অত্যন্ত বিনয়, একাগ্রতা, ইখলাস ও নিষ্ঠার ব্যাপারে তিনি ছিলেন পুরো পরিবারের আলোচ্য ব্যক্তিত্ব। হযরতের মন-মস্তিষ্কে তাঁর প্রভাবও পড়েছিল জন্মগত ও অনিবার্যরূপে।

পিতা ঃ মাওলানা সাইয়েদ হাকীম আবৃদুল হাই (রহ.)

সম্মানিত পিতা মাওলানা হাকীম সাইয়েদ আবৃদুল হাই হাসানী (রহ.) একজন উঁচুস্তরের ঐতিহাসিক এবং হাদীছ ও ফিকাহে বিশেষ ব্যুৎপত্তি সম্পন্ন উঁচু মর্যাদার আলেম ছিলেন। আরবী ও উর্দূতে তাঁর সমান দখল ছিল। তাঁর গদ্য ছিল অতুলনীয়। চরিত্রমাধুর্য ছিল অতি উন্নত। তাঁর চরিত্রের সবচেয়ে উজ্জ্বল দিক হল– তিনি কাউকে কোনরূপ কষ্ট দিতে চাইতেন না। মানুষের মন জয় করাই ছিল তাঁর সহজাত বৈশিষ্ট্য। তিনি মাত্র ৫৩ বছর বয়স পান। কিন্তু রেখে যান বিশাল রচনা সম্ভার। 'নুযহাতুল খাওয়াতির' তাঁর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য রচনাকীর্তি।

মাতা ঃ খায়রুন্নেসা (রহ.)

মাতা মুহতারামা খায়রুন্নেসা (রহ.)ও ছিলেন নিজ যুগের অসাধারণ মহিলা। তিনি কুরআন মজীদের হাফেযা ছিলেন। কবিতা রচনার প্রতিও তাঁর বিশেষ ঝোঁক ছিল। দোয়া ও মুনাজাত ছিল তাঁর সার্বক্ষণিক কাজ।

পিতৃকুল ও মাতৃকুলের মাঝে সেতুবন্ধন

সাইয়েদ আব্দুল হাই (রহ.)-এর প্রথমা স্ত্রী ডাক্তার আব্দুল আলী (রহ.)-এর মাতা ১৯০১ সালে ইন্তেকাল করেন। অতঃপর সাইয়েদ যিয়াউন্নবী (রহ.)-এর কন্যা সাইয়েদা খায়রুন্নেসার সাথে তাঁর দ্বিতীয় বিবাহের পয়গাম দেওয়া হয়। সাইয়েদ আব্দুল হাই-এর পিতা সাইয়েদ ফখরুদ্দীনের পরিবার ও সাইয়েদ যিয়াউন্নবীর পরিবার একই সাইয়েদ বংশের দু'টি শাখার অন্তর্গত ছিল। সাইয়েদ যিয়াউন্নবীর পরিবারে ছিল সচ্ছলতা ও আভিজাত্য। অন্যদিকে সাইয়েদ ফখরুদ্দীনের পরিবার ছিল অসচ্ছল। এ পরিবারে কোন জমিদারী কিংবা সম্পত্তি ছিল না। সাইয়েদ বংশের এ শাখায় অনেক দ্বীনী ইলমের ধারা চলে আসছিল। এটি মৌলভী পরিবার হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিল। এ পরিবারে সম্পত্তির পরিবর্তে ছিল কিছু কিতাবাদি। দ্বীনী ইলম চর্চা এ পরিবারে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে চলে আসছিল। এটাই ছিল তাদের বড় সম্পত্তি।

মৌলভী ফখরুদ্দীন (রহ.) ছিলেন খুব দক্ষ চিকিৎসক ও উচুঁমানের লেখক। কিন্তু বৈষয়িক ও সাংসারিক ব্যাপারে একেবারেই উদাসীন। উপবাস-অনাহার তাঁর পরিবারে সাধারণ বিষয় ছিল। সাইয়েদ আব্দুল হাই (রহ.) নদওয়াতুল উলামার নায়েম হিসেবে মাসে ত্রিশ-চল্লিশ টাকা বেতন পেতেন। তাও এক পর্যায়ে ছেড়ে দেন। সুতরাং তাঁর পরিবারে চরম আর্থিক দৈন্যতা নেমে আসে। এমতাবস্থায় সাইয়েদ শাহ যিয়াউন্নবী (রহ.)-এর কন্যা সাইয়েদা খায়রুন্নেসা (রহ.)-এর সাথে তাঁর দ্বিতীয় বিবাহের প্রস্তাব উত্থাপন করা হলে বেগম জিয়াউন্নবী খুব দ্বিধাদ্বন্দ্বে পড়েন। কেননা দু'পরিবারের বাসস্থান ছিল পরস্পরে মিলিত। অতএব এক পরিবারের অবস্থা অন্য পরিবারের মোটেই অজানা ছিল না। তাছাড়া এ কন্যারই প্রথম প্রস্তাব এসেছিল তাঁরই আপন চাচাত ভাইয়ের পক্ষ থেকে। সে পরিবার ছিল জেলার ছোট খাট তালুকদার। উক্ত পরিবারের তুলনায় এ পরিবারকে প্রাধান্য দেওয়ার কোন যুক্তি তিনি খুঁজে পাচ্ছিলেন না। জেনে-শুনে নিজ কন্যাকে কষ্টে ফেলতে তার মন কিছুতেই সায় দিচ্ছিল না। কিন্তু সাইয়েদ আব্দুল হাই-এর প্রতি সাইয়েদ জিয়াউন্নবীর খুবই সুধারণা ও আস্থা ছিল। তাঁর ইলমী ও রূহানী উচ্চ মর্যাদা সম্পর্কে সাইয়েদ জিয়াউন্নবী সম্যক অবগত ছিলেন।

তাই তিনি কোনরূপ দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছাড়াই এ বিয়েতে সম্মত হন। তিনি নিজ বেগমকে সাফ জানিয়ে দেন যে, আমার নিকট দারিদ্র্য-ধনাঢ্যতার কোন

গুরুত্ব নেই। আসল দেখার বিষয় সজ্জনতা ও জ্ঞানের যোগ্যতা। এই টানাপোড়েনের সময়ই সাইয়েদা খায়রুন্নেসা এমন কয়েকটি স্বপ্ন দেখেন যাতে সাইয়েদ আব্দুল হাইয়ের ঘরের প্রতি ইংগিত ছিল। এ-ও ছিল যে, যদি দু'পরিবারের সেতুবন্ধন স্থাপিত হয় তাহলে আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে বিশেষ অনুগ্রহ আসবে। তিনি স্বপ্নে একটি আয়াত বার বার তেলাওয়াত করতে দেখলেন–

فلا تعلم نفس ما اخفى لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون

শেষ পর্যন্ত ১৯০৪ খৃঃ, মোতাবেক ১৩২২ হিজরীতে এ শুভবিবাহ অনুষ্ঠিত হয়।

জন্ম

বিবাহের পর বেশ কিছুদিন যাবত নেহায়েত অনটন ও অসচ্ছলতায় কাটে। অতপর সাইয়েদ আব্দুল হাই (রহ.) লাখনৌতে ডিস্পেন্সারী খোলেন। আল্লাহর মেহেরবাণীতে যথেষ্ট আয় হতে লাগল। অভাব অনটন কেটে যেতে লাগল। সাইয়েদ আব্দুল হাই-এর কাঁচাঘর পাকা হল। এ ঘরেই প্রথমে জন্মগ্রহণ করলেন সাইয়েদা আমাতুল আযীয (১৯০৬) ও সাইয়েদা আমাতুল্লাহ আয়েশা নামে দু'কন্যা। অতঃপর ৬ই মহররম ১৩৩৩ হিজরী, মোতাবেক ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এক পুত্র সন্তান নাম রাখা হয় আলী।

জন্মভূমি ঃ তাকিয়া কেলা

রায়বেরেলী শহর থেকে মাইল দেড়েক দূরে সাই নদীর তীরে ছোট্ট একটি জনপদ। নাম তাকিয়া কেলা। এখানে জন্মগ্রহণ করেছিলেন হযরত মাওলানা আবুল হাসান আলী নদভী (রহ.)। খালেস তাওহীদ, জেহাদী প্রেরণা ও বিদয়াতের প্রতি ঘৃণা ছিল এ জনপদের লোকদের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। সাড়ে তিনশত বছরের পুরোনো বসতি এ এলাকায় কখনই বেদআতের নাম নিশানা ছিল না। শুধু তাই নয়, এখানে জন্মগ্রহণ করেছেন এমনসব মনীষী ও বুযুর্গ, যারা তাওহীদের দাওয়াত, আধ্যাত্মিক সাধনা, সমাজ সংস্কার, তালীম, তাবলীগ, সুন্নাহ পুনরুজ্জীবন ও আল্লাহর বাণী বুলন্দ করণের মহান দায়িত্ব পালন করে শুধু ভারতবর্ষে নয়, জগৎজোড়া সুখ্যাতি অর্জন করেছেন।

এখানে সর্বপ্রথম বসতি স্থাপন করেছিলেন হযরত সাইয়েদ আদম বিনৌরী (রহ.)-এর বিশিষ্ট খলীফা হযরত মাওলানা শাহ আলামুল্লাহ হাসানী (রহ.) ১০৫০ হিজরীতে। রায়বেরেলী শহরের সাথে সংযোগ স্থাপনকারী রাস্তাটি কাঁচা ছিল এবং বর্ষাকালে চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়তো। তাকিয়াকেঁলায় বসতবাড়িও খুব বেশি একটা ছিল না। হযরত শাহ আলামুল্লাহ হাসানী (রহ.)-এর বংশধরেরাই মূলত এখানে বাস করতেন। মাওলানা আলী মিয়াঁ নিজেই বর্ণনা করেছেন, তাঁর শৈশবে সেখানে মাত্র কয়েকটি বাড়ী ছিল। এগুলো আবার দু'টি করে বিভক্ত ছিল।

এক বাড়ী থেকে অন্য বাড়ীতে যাওয়ার সরু গলিপথ ছিল। সবচেয়ে পশ্চিমে একটু দূরে দুইটি বাড়ী দেখা যেত। এ বংশের লোকজনের বাড়ী উত্তর পূর্ব দিক থেকে বিন্যস্ত ছিল। গ্রামে প্রবেশ করতে গেলে প্রথমে পড়ত বিশাল এক তেঁতুল গাছ, যার ছায়ায় এক বিরাট কাফেলা আশ্রয় নিতে পারত। এরই একপাশে হযরত মাওলানার দাদার বৈঠকখানা ছিল। কাঁচাঘর, খড়ের ছাউনি, এটিই ছিল হযরত মাওলানার দাদার দারুত তাসনীফ ও ডাক্তারখানা। লোকজনের সাথে সাক্ষাতের ঘরও ছিল এটি। এ বৈঠকখানার উল্টোদিকেই হযরতের পিতার ঘর ছিল। সাথেই ছিল এ বংশের সবচেয়ে প্রভাবশালী ব্যক্তি জেলার জমিদার, মহাজন ও অনারারী ম্যাজিস্ট্রেট মৌলভী সাইয়েদ খলিলুদ্দীন সাহেব ও তাঁর ছোটভাই সাইয়েদ আমীনুদ্দীন সাহেবের বাড়ী।

সাইয়েদ আব্দুল হাই সাহেবের বাড়ী থেকে এ বাড়ীতে যাওয়ার সরুপথ রয়েছে। দু'বাড়ীর লোকজনের যাতায়াত ছিল নিয়মিত। এরই সাথে সাইয়েদ খলিলুদ্দীন সাহেবের দেওয়ানখানা। এটি ছিল এ গ্রামের সবচেয়ে জমকালো বাড়ী ও সাধারণের মিলনস্থল। দু'ভাইয়ের জমিদারীর সকল বিষয় এখান থেকেই পরিচালিত হত। চাষী ও বর্গাতিরা এখানেই আসে। এলাকার সম্মানিত অতিথি ও বংশের মুরব্বীরা এখানে অবস্থান করেন। এরই সামনে তার চাচাত ভাই সাঈদ আহমদ সাহেব ও সাইয়েদ উবায়দুল্লাহ সাহেবের বাড়ি। এই চার ভাইয়ের সম্পত্তি যৌথ। জেলার জমিদারদের মধ্যে তারা বিশেষ মর্যাদার অধিকারী। দু'বাড়ীর মাঝখানে রয়েছে একটি খোলা মাঠ। গ্রামের ছেলেমেয়েরা এখানে খেলাধুলা করে। আবার বিভিন্ন উপলক্ষে

এখানেই অনুষ্ঠানাদি করা হয়। এ উদ্দেশ্যেই স্থানটি খালি রাখা হয়েছে। মাঠের পশ্চিমে মসজিদ ও দক্ষিণে পাকা সড়ক। আরো দক্ষিণে সাইয়েদ নাঈম সাহেবের বাড়ী। বামপাশে একটি উঁচু জায়গা দেখা যায়। হয়তো এখানে ঘরবাড়ী ছিল, এখন নেই। আরো একটু সামনে একটি অগভীর পুকুর। বছরের কয়েকমাস মোটেই পানি থাকে না। পুকুরের পাড়ে এক বিশাল তেঁতুল গাছ। গরমের দিনে লোকেরা এ গাছের নিচে চৌকি ফেলে বিশ্রাম নেয়।

এখান থেকে পূর্ব দিকে অনেক উঁচুতে রয়েছে তাকিয়ার সবচেয়ে পুরাতন বাড়ী এবং তাকিয়ার প্রতিষ্ঠাতা শাহ আলামুল্লাহ (রহ.) ও তাঁর আওলাদের বাড়ীসমূহ। এখানেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন সাইয়েদ আহমাদ শহীদ (রহ.) এবং এখানেই তিনি লালিত-পালিত হন। বর্তমানে এখানে হযরত সাইয়েদ আহমাদ শহীদ হেফযখানা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এরই দক্ষিণপার্শে যে বাংলোটি ছিল তাতেই টুংকের সম্মানিত মেহমানরা অবস্থান করতেন। বাংলোর সামনেই সেই ঐতিহাসিক মসজিদ যা ১০৮৩ হিজরীতে হযরত শাহ আলামুল্লাহ (রহ.)-এর পবিত্র হাতে নির্মিত হয়েছিল। মসজিদের ভিতে দেয়া হয়েছিল জমজমের পানি এবং ঠিক বায়তুল্লাহ শরীফের অবয়বে কোন মিনার ও গম্বুজ ছাড়াই তৈরী করা হয়েছিল। তবে সম্মানের খাতিরে উচ্চতা কয়েক ইঞ্চি কম রাখা হয়।

এটি খানকাহও ছিল, মাদরাসাও ছিল। আবার সাইয়েদ আহমাদ শহীদ (রহ.)-এর জিহাদের ট্রেনিংও হত এখানে। মুজাহিদরা থাকতেনও এখানে। মসজিদের বিপরীতে পূর্ব-দক্ষিণ কোণে একটি দেয়াল ঘেরা স্থান রয়েছে। বংশের লোকেরা এটিকে প্রাচীনকাল থেকে 'রওযা' বলে থাকে। এরই মধ্যে হযরত শাহ আলামুল্লাহ (রহ.), তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র সাইয়েদ আয়াতুল্লাহ শাহ সাহেবের স্ত্রী ও পুত্র সাইয়েদ মুহাম্মাদ আদল ওরফে শাহ লাল এবং এ বংশের আরো কয়েকজনের কবর রয়েছে। সব কবরই কাঁচা। কোন কবরেই নেমপ্লেট কিংবা পরিচিতিমূলক কোন চিহ্ন নেই।

যেহেতু এই স্থানটি বেশ উঁচু, এজন্য বন্যার পানি সাধারণতঃ সেখানে পৌঁছে না। তাই বন্যার সময় যাদের ইন্তেকাল হয়েছে, তাদেরই স্থান হয়েছে এখানে। অনেকদিন পরে হযরত হাকীম সাইয়েদ আব্দুল হাই হাসানী

(রহ.)-এর ইন্তেকাল হলে খান্দানের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এখানেই তাকে দাফন করা হয়। অতঃপর তাঁর বংশের আরো কয়েকজনকেও এখানে দাফন করা হয়। শেষ পর্যন্ত মাত্র একটি কবরের জায়গা খালি ছিল। সেখানেই চিরনিদ্রায় শুইয়ে দেয়া হয়েছে হযরত শাহ আলামুল্লাহ (রহ.)-এর বংশের সর্বশেষ উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্ক হযরত মাওলানা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী (রহ.)-কে।

মসজিদের উত্তর-পূর্ব কোণ বরাবর একটি চত্বরে হযরত শাহ আলামুল্লাহ (রহ.)-এর তৃতীয় পুত্র সাইয়েদ আবু হানিফা ও হযরত সাইয়েদ আহমাদ শহীদ (রহ.)-এর পিতা হযরত সাইয়েদ মুহাম্মাদ ইরফানের কবর। এসব কবরেরও কোন চিহ্ন নেই। মসজিদের পশ্চিমে রয়েছে সাইয়েদ বংশের সাধারণ কবরস্তান। উত্তরদিকে হযরত মাওলানা আলী মিয়াঁর পিতৃকুল ও মাতৃকুলের এবং দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে হযরত শাহ আলামুল্লাহ (রহ.)-এর চতুর্থ পুত্র সাইয়েদ মুহাম্মাদ নকশবন্দী ও তাঁর পরিবারের লোকেরা শায়িত রয়েছেন। আল্লাহপাকের অবারিত রহমতের ধারা এ পবিত্র ভূমিতে বর্ষিত হতে থাকুক।

মসজিদের অদূরেই সাই নদী প্রবহমান। দেখতে ছোট হলেও বর্ষাকালে তা প্রবল খরস্রোতা নদীতে রূপান্তরিত হয় এবং আশপাশের এলাকা প্লাবিত করে। গরমের দিনে নদীর তীরে হাওয়া খেতে আসে গ্রামের সকল স্তরের মানুষ। এ নদী যেন তাকিয়ার প্রতিটি বাসিন্দার জীবনের সাথে ঘনিষ্টভাবে সম্পৃক্ত।

==ooo==

অধ্যায়–২
শিক্ষা

প্রাথমিক শিক্ষা

মাওলানা আলী মিয়াঁর শিক্ষার বিসমিল্লাহ হয় রায়বেরেলীতেই। তবে তিনি কুরআন মজীদ খতম করেন লাখনৌর আমীনাবাদ মহল্লার বাজার ঝাউলাল মসজিদের মক্তবে। এ মহল্লা বর্তমানে মুহাম্মাদ আলী লেন নামে পরিচিত। এখানে হযরতের পিতা সাইয়েদ আব্দুল হাই সাহেবের বাসা ও ফার্মেসী ছিল। অতঃপর তিনি তাঁর চাচা সাইয়েদ আযীযুর রহমান নদভী ও মাওলানা গোলাম মুহাম্মাদ নদভী শিমলাভীর নিকট উর্দু পড়েন। ফার্সী পড়েন মৌলভী মাহমুদ আলী সাহেবের নিকট। উক্ত মৌলভী সাহেবের নিকট তিনি তার পিতার রচিত 'তালিমুল ইসলাম' ও 'নূরুল ঈমান' কিতাব দু'খানাও পড়েন। তাছাড়া শ্লেট ও কাগজে লেখাও শিখতে শুরু করেন তাঁর নিকট।

ইতোমধ্যে ১৫ জুমাদাল উখরা ১৩৪১ হিঃ, মোতাবেক ২১ ফেব্রুয়ারী ১৯২৩ খৃঃ শুক্রবার হযরতের পিতা হাকীম সাইয়েদ আব্দুল হাই মাত্র কয়েকদিন অসুস্থ থাকার পর ইন্তেকাল করেন। তখন আলী মিয়াঁর বয়স মাত্র নয় বছর। তিনি মাতার সাথে তাকিয়ায় ফিরে আসেন। কিন্তু অচিরেই তাঁর বড় ভাই ফার্মেসী খোলেন এবং ছোটভাই আলী মিয়াঁকে নিয়ে আসেন। তার ফার্সী শিক্ষা অব্যাহত থাকে। বড় ভাই ডাক্তার সাইয়েদ আব্দুল আলী সাহেবের নির্দেশনা অনুযায়ী তিনি ফার্সী শিক্ষা চালিয়ে যেতে থাকেন।

হযরতের এক চাচা সাইয়েদ মুহাম্মাদ ইসমাঈল ভাল ফার্সী জানতেন। তার কাছে তিনি বোস্তাঁ পড়েন। অংক শেখানো ও উর্দু রচনা অনুশীলনের জন্য নিকটবর্তী গ্রাম লোহানীপুর থেকে মাষ্টার মুহাম্মাদ যামান সাহেব আসতেন। মাস্টার মুহাম্মাদ যামান ছিলেন পাঠান বংশের লোক। তিনি রায়বেরেলীর এক আদালতে চাকরি করতেন। হযরতের মামা হাফেয উবায়দুল্লাহ সাহেব এই শিক্ষক ঠিক করে দিয়েছিলেন।

মায়ের তরবিয়ত

শৈশবকালে মায়ের তরবিয়ত ছিল হযরত মাওলানা আলী মিয়াঁর জীবনের অত্যন্ত কার্যকর পাথেয়। হযরত সাইয়েদ আব্দুল হাই (রহ.)-এর ইন্তে

কালের কারণে পরিবারে পুরুষ মুরব্বী কেউ ছিলেন না। তাই বালক আলী মিয়াঁর শৈশবের তত্ত্বাবধান ও নৈতিকতা গঠনের সকল দায়িত্ব পালন করেন শ্রদ্ধেয় মাতা। কুরআন মজীদের বড় বড় সূরাসমূহ সে সময়েই তাঁর মাতা তাঁকে মুখস্থ করান। হযরত নিজেই লিখেছেন– পিতার ইন্তেকালের কারণে আম্মা আমাকে অন্য মায়েদের তুলনায় অনেক বেশী আদর যত্ন করতেন। কিন্তু দু'টি ব্যাপারে তিনি অত্যন্ত কঠোর ছিলেন।

প্রথমত, নামাযের ব্যাপারে তিনি কিছুতেই শৈথিল্য করতে দিতেন না। আমি এশার নামায না পড়ে ঘুমিয়ে গেলে যতই গভীর ঘুম হোক না কেন, তিনি আমাকে জাগিয়ে নামায পড়িয়ে নিতেন। নামায না পড়ে কিছুতেই ঘুমুতে দিতেন না। তেমনি ফজরের সময়েও জাগিয়ে দিতেন এবং মসজিদে পাঠাতেন। অতঃপর কুরআন মজীদ তেলাওয়াতে বসিয়ে দিতেন।

দ্বিতীয়ত, যে বিষয়ে তিনি কোন মতেই শৈথিল্য করতেন না এবং আমার প্রতি চরম স্নেহ-মমতা তাঁকে নিবৃত্ত করতে পারতো না তা হলো, আমি যদি খাদেমের বাচ্চাদের কিংবা কাজকর্মে নিয়োজিত গরীব বালকদের সাথে রূঢ় বা অন্যায় আচরণ করতাম, তাহলে তিনি শুধুমাত্র দুঃখ প্রকাশ করিয়েই ক্ষান্ত হতেন না; বরং হাতজোড় করে মাফ চাইতে বাধ্য করতেন।

এ প্রসঙ্গে আরেকটি বিষয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বালক আলী মিয়াঁর মধ্যে তাঁর মাতা, সমবয়সী অন্যান্য বালকের মত মেধা ও প্রতিভা অনুভব করতেন না। সম্মানিতা মাতা এজন্য খুবই চিন্তিত ছিলেন এবং নিজের একমাত্র পুত্র সন্তানের ভবিষ্যত ভাল হবে না মনে করে নিরাশ হয়ে পড়তেন। তাই বালক আলী মিয়াঁর লালন-পালন শিক্ষা ও সাফল্যের জন্য তিনি মন খুলে দোয়া করতেন। শুধুমাত্র পুত্রের সাফল্য ও উজ্জ্বল ভবিষ্যত কামনায় তিনি যেসব গদ্য-পদ্য রচনা করেছেন, সমকালীন কোন মহিলার মধ্যে তা সাধারণতঃ দেখা যায় না।

হযরতের শ্রদ্ধেয় আম্মা বলেন– সে সময়ে আমি একদিন স্বপ্নে আমার পিতাকে (হযরতের নানা) দেখলাম, তিনি আমাকে তার পুরনো স্বপ্নের কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন। যাতে তিনি-

فلاتعلم نفس ما اخفى لهم من قرة اعين

এর সুসংবাদ শুনেছিলেন। তিনি বললেন- তুমি এত অস্থির হয়ে পড়ছ কেন? হযরত মাওলানা বলেন– আমার দ্বারা যা কিছু হয়েছে এবং আমি আল্লাহর নেক বান্দাদের নৈকট্য ও দুআ লাভ করেছি তা আমার আম্মারই

সেই ব্যাকুল দোয়ার ফল। তিনি আরো বলেন- যখন আমি কিছু লিখবার উপযুক্ত হলাম, তখন তিনি আমাকে জোর তাকীদ দিতেন আমি যেন বিসমিল্লাহর পর এই দোয়াটি অবশ্যই লিখি

اللّٰهم آتنى افضل ما توتى عبادک الصالحين

আমি যখন লাখনৌ যেতাম চিঠি-পত্রের মাধ্যমে তিনি আমাকে অনেক উপদেশ দিতেন। তখন তার সকল আশা-আকাঙ্ক্ষা, কামনা-বাসনা ও চিত্ত আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু ছিলাম আমি। আমাকে আমার পূর্বসূরীদের সঠিক স্থলাভিষিক্ত, আমার খ্যাতনামা পিতার সত্যিকার চিহ্ন, আপন খান্দানী বৈশিষ্ট্যের ধারক-বাহক, বরং ইসলামের নাম আলোকোজ্জ্বলকারী, দ্বীনের মুবাল্লিগ ও দায়ী হিসেবে দেখার আকাঙ্ক্ষা ছিল তার জীবনের সবচেয়ে বড় আকাংখা ও জীবন প্রদীপ; সব সময় কেবল তারই চিন্তা, সর্বদা তারই ধ্যান-জ্ঞান, সব সময় তারই দুআ ও তারই আলোচনা।

আমার লাখনৌ অবস্থান এবং আমার প্রাথমিক শিক্ষা লাভকালে তিনি আমাকে যেসব লম্বা ও বিস্তারিত চিঠি লিখেছিলেন সেসবের নির্বাচিত ভান্ডার আলহামদুলিল্লাহ আমার কাছে সংরক্ষিত আছে। এগুলো তাঁর আন্তরিক আবেগের দর্শন, বরং তাঁর কামালিয়াত ও আল্লাহপ্রদত্ত গুণাবলীর এলবাম বিশেষ। যা আল্লাহ তায়ালা একেবারে গায়বীভাবে তাঁকে দান করেছিলেন এবং যা ছিল তাঁর জীবনের আসল পুঁজি ও সম্পদ। অতীতে শিক্ষিত ও দ্বীনদার মুসলিম পিতামাতা তার সন্তানদেরকে যেসব চিঠিপত্র লিখেছেন তার বিস্তৃত ভান্ডারের মধ্যে আল্লাহর এই নেক বান্দীর, যদিও তিনি সীমিত লেখাপড়া শিখেছিলেন তা সত্ত্বেও তার লিখিত পত্রগুলো এক বিশেষ বৈশিষ্ট্যের দাবিদার। এগুলো ছাড়া তাঁর জীবনের আর কোন জ্ঞানগত ও ধর্মীয় স্মৃতি যদি নাও থাকত তবুও এগুলোই যথেষ্ট হত।

হযরত বলেন যে, আমাদের খান্দানে ইংরেজী লেখাপড়া তখন মহাধুমধামে ও জোরে শোরে চলছে। জমিদারী থেকে মুক্তি, যুগের চাহিদা, বড় বড় পদের লোভ, উন্নতিকারীদের উদাহরণ– এসবগুলিই ছিল-এর আন্দোলক ও হতবুদ্ধি করার জন্য যথেষ্ট। বড় বড় দৃঢ়চেতা পুরুষদের পা পর্যন্ত এই স্রোতে টলমল করছিল। স্বয়ং আম্মার আপন ভাগনে ব্যারিষ্টারী পড়ার জন্য বিলেত গিয়েছিলেন এবং কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হয়ে দেশে ফিরেছিলেন। একজন ভ্রাতুষ্পুত্রও আমেরিকা গিয়েছিলেন এবং সেসময়

সেখানে লেখাপড়া করছিলেন। তার চিঠি আসত এবং পড়ে শোনা হত। আমাদের আরেক আত্মীয় জার্মানী ও জাপান গিয়ে উঁচু ডিগ্রী নিয়ে এসেছিলেন। আরেক আত্মীয় ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসের জন্য নির্বাচিত হন। তিনিও লেখাপড়ার উদ্দেশ্যে লন্ডন গিয়েছিলেন এবং আমার কৈশোরেই সেখান থেকে ফিরে এসে বড় পদে যোগদান করেছিলেন।

আমি তখন লাখনৌতে অবস্থান করি। গোটা পরিবেশ ইংরেজী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার ব্যাপারে আহ্বান জানাচ্ছিল। আমার ভাই সাহেব আমার জন্য ধর্মীয় শিক্ষায় উপযুক্ত ও পারদর্শী হবার পথই বাছাই করে রেখেছিলেন। তাঁর নিজের ধারণা ছিল যে, আমাকে এই পথই বেছে নেওয়া উচিত। কোন কোন আত্মীয়-বন্ধুবান্ধব তাকে ভর্ৎসনা করেছিলেন এই বলে যে, এতিম ভাইটিকে আরবী পড়াচ্ছে এবং মোল্লা বানাচ্ছে।

আমার মুহতারাম ভাইজান এক বিশেষ মেযাজ ও খাস আন্দাযের লোক ছিলেন। অহেতুক তর্ক-বিতর্ক ও কথা কাটাকাটির সঙ্গে তাঁর কোন সম্পর্কই ছিল না। তিনি এসব কথার এমন এক জওয়াব দিতেন যার কোন উত্তর তাদের কাছে ছিল না। তিনি বলতেন যে, এর কোন দরকার নেই আমাদের। আব্বাজান জীবিত থাকলে তাকে যা পড়াতেন, আমিও তাই পড়াচ্ছি। ভাইজানের এই সিদ্ধান্ত ও আকাঙ্ক্ষার ওপর আম্মার প্রেরণা ও উৎসাহ, তাঁর ঈমানী শক্তি এবং পার্থিব সম্মান ও পদমর্যাদার প্রতি তাঁর নিরুত্তাপ মানসিকতা ও অনীহা সোনায় সোহাগা প্রমাণিত হয়েছিল।

কয়েকটি প্রশিক্ষণমূলক পত্র

এক সময় আমার স্বভাবে ধর্মীয় শিক্ষার অনীহা দেখা দেয় এবং ইংরেজী শিক্ষার প্রতি আগ্রহ জন্মে। ভাইজান কোন পত্রে কিংবা রায়বেরেলীর কোন সফরে আম্মাকে গিয়ে আমার এই মানসিকতা সম্পর্কে অভিযোগ করেন। এরপর আম্মা আমাকে যে পত্র লিখেন তা থেকে তাঁর আন্তরিক ধ্যান-ধারণা, অন্তর্গত প্রেরণা, ঈমানী শক্তি ও ধর্মের প্রতি তাঁর প্রেম ও ভালবাসার গভীরতা আঁচ করা যায়। সম্ভবত ১৯২৯ কিংবা ৩০ সালের কোন এক সময়ে লিখিত সন-তারিখবিহীন এই পত্রের একটি অংশ হুবহু এখানে উদ্ধৃত করা হচ্ছে।

"আলী! দুনিয়ার হালত খুবই বিপজ্জনক। এই সময় যারা আরবী লেখাপড়া শিখছে তাদের ঈমান-আকীদাই যখন ঠিক নেই, সেখানে যারা ইংরেজী পড়ছে তাদের কাছে আর কিইবা আশা করা চলে? আবদ ও তালহার

মত কয়জনকে পাবে? আলী! লোকেরা বিশ্বাস করে যে, যারা ইংরেজী পড়ছে তারা বড় বড় পদমর্যাদা লাভ করেছে।[১] কেউ ডেপুটি হচ্ছে, কেউ জজ, কমপক্ষে উকীল-ব্যারিষ্টার তো হবেই হবে। আমি এর সম্পূর্ণ বিরোধী।

আমি ইংরেজীওয়ালাদের জাহেল ভাবি এবং এই লেখাপড়াকে নিষ্ফল ও অকেজো মনে করি। বিশেষ করে এই সময়ে জানা নেই কি হবে এবং কোন ধরণের শিক্ষা প্রয়োজন। সে সময় অবশ্য প্রয়োজন বেশী ছিল। এই পদমর্যাদা তো চামারও লাভ করতে পারে। এটা সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত। এমন কে আছে যে এর থেকে বঞ্চিত? তোমাকে তো এমন কিছু হাসিল করতে হবে যা এই মুহূর্তে দুর্লভ, যা কেউ হাসিল করতে পারে না। যা দেখার জন্য আমার চোখ উদগ্রীব এবং যা শোনার জন্য, আমার কান অধীর একং যার আকাঙ্ক্ষায় মন আমার ছটফট করছে, কিন্তু যা আমি দেখতে চাইছি তা চোখে পড়ছে না।

"আফসোস! আমরা এমন এক সময় জন্মেছি। আলী! তুমি কারও কথা শুনো না। যদি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে চাও এবং আমার হক আদায় করতে চাও তাহলে সেইসব সিংহপুরুষদের দিকে তাকাও যাঁরা ধর্মীয় জ্ঞান অর্জনের জন্য সারাটা জীবন ব্যয় করেছেন। তাঁদের সম্মান ও মর্যাদা কি ছিল? শাহ ওয়ালী উল্লাহ সাহেব, শাহ আব্দুল কাদির সাহেব, মৌলভী মুহাম্মাদ ইবরাহীম সাহেব[২] এবং তোমাদের পূর্বপুরুষদের ভেতর খাজা আহমাদ[৩] ও মৌলভী মুহাম্মাদ আমীন সাহেব মরহুম যাদের জীবন ও মরণ

---

[১] ভাইজান সাইয়েদ আবদুল আলী পরিবারে এ নামেই পরিচিত ছিলেন। মাওলানা তালহা ছিলেন আমার ফুফা। তিনি দীর্ঘকাল যাবত লাহোর ওরিয়েন্টাল কলেজে অধ্যাপনার পর ১৯৭০ সালে করাচীতে ইনতেকাল করেন।

[২] মাওলানা মুহাম্মাদ ইবরাহীম ছিলেন প্রখ্যাত আহলে হাদীস আলেম। তিনি আমার নানা সাইয়েদ শাহ জিয়াউন্নবীর মুরীদ ছিলেন। তিনি ছিলেন একজন হক্কানী আলেম। তাঁর ওয়াযে খুবই প্রভাব হত এবং লোকে কাঁদত। তার একটি ওয়াজের দ্বারা আমাদের পরিবারের যুবকদের বিরাট সংশোধন ও পরিশুদ্ধি ঘটে এবং তাদের চরিত্রের আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়। ৬ই যিলহজ্জ ১৩১৯ হিজরী মক্কা মুআজ্জামায় তিনি ইনতেকাল করেন। জান্নাতুল মুআল্লায় তাঁর কবর অবস্থিত।

[৩] খাজা সাইয়েদ আহমদ নাসিরাবাদী ছিলেন সাইয়েদ আহমাদ শহীদের খলীফা এবং সাইয়েদ শাহ জিয়াউন্নবী ও হাকীম সাইয়েদ ফখরুদ্দীনের পীর ও মুরশিদ। কুরআন-সুন্নাহর প্রচারে ও তাওহীদী আদর্শের প্রসারে এবং মানুষের হেদায়েত ও সংস্কার সংশোধনে তার বিরাট অবদান রয়েছে। ১২৮৯ হিজরীতে তিনি ইন্তেকাল করেন।

ঈর্ষণীয় ছিল। শান-শওকতের সঙ্গে তাঁরা দুনিয়াতে থেকেছেন এবং সুন্দরভাবে তাঁরা দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন। এই সম্মান ও মর্যাদা কিভাবে লাভ করা যেতে পারে? ইংরেজী মর্যাদাধারী তোমাদের পরিবারে সকলেই এবং আরও হবে, কিন্তু অনুরূপ মর্যাদার অধিকারী কেউ নেই– এ মুহূর্তে এটার খুবই প্রয়োজন। তাঁদের ইংরেজীর প্রতি কোনরূপ আকর্ষণ কিংবা প্রীতি ছিল না। তাঁরা ইংরেজীতে অজ্ঞ ছিলেন। তাহলে এই মর্যাদা তাঁরা কিভাবে লাভ করলেন?

আলী! আমার একশটা সন্তান থাকলেও আমি তাদেরকে এই শিক্ষাই দিতাম। এখন কেবল তুমিই আছ। আল্লাহ তাআলা আমার নেক নিয়তের পুরস্কার দিন যেন, একশত সন্তানের গুণাবলী আমি তোমার থেকে পেতে পারি এবং এই জগতে ও পরগজতে সৌভাগ্য ও সুনামের অধিকারী হই, সুযোগ্য সন্তানের মা হিসেবে কথিত হই। আমীন! ছুম্মা আমীন! ইয়া রব্বাল আলামীন!

আমি আল্লাহর কাছে সব সময় দোয়া করি যেন তিনি তোমাকে হিম্মত দান করেন এবং তোমার মধ্যে সেই আগ্রহ জাগিয়ে দেন যাতে তুমি সেই মহৎ গুণাবলী অর্জন করতে পার এবং তিনি যেন তোমাকে যাবতীয় দায়িত্ব ও কর্তব্য সুচারুরূপে আদায় করার তাওফীক দেন। আমীন! এর চেয়ে বেশী আমার আর কিছুই চাইবার নেই। চাইবার ইচ্ছাও নেই। অবশ্য আল্লাহ তায়ালা তোমাকে যেন সেই মর্যাদায় উন্নীত করেন এবং তোমাকে দৃঢ়পদ রাখেন। আমীন!

আলী! তোমাকে আরও একটি উপদেশ দিচ্ছি এই শর্তে যে, তুমি তা মেনে চলবে। তোমার পূর্বপুরুষদের রেখে যাওয়া কিতাবগুলো কাজে লাগাও এবং এ ব্যাপারে পূর্ণ সচেতনতা অবলম্বন কর। কোন কিতাব যদি না থাকে তবে সেটি আবদুর মতামত সাপেক্ষে কিনে ফেল। অবশিষ্ট কিতাবাদি তোমার জন্য যথেষ্ট হবে। এর ভেতর দিয়ে তোমার সৌভাগ্য প্রকাশিত হবে এবং কিতাবগুলো নষ্ট হবে না আর বুযুর্গরাও খুশী হবেন। এই সুবাদে আমার অপার ইচ্ছা রয়েছে যে, তুমি এসব কিতাবের খেদমত করবে।

আমার আম্মার সবচে বড় আকাঙ্ক্ষা ও চিন্তা এই ছিল যে, আমি যেন আমার বড় ভাইয়ের নির্দেশনায় চলি, তিনি যা বলেন আমি যেন চোখ বুঁজে তা মেনে নিই এবং সে মুতাবিক কাজ করি। তিনি তাকে সকল গুণের আধার ও আমাদের খান্দানের মর্যাদার প্রতীক ভাবতেন।

আমাদের খান্দানে হযরত শাহ আব্দুল কাদিরের কুরআনুল কারীমের তরজমা ও তাঁর তাফসীর মুযীহুল কুরআনকে (যা প্রাচীন তরজমাসমূহের হাশিয়ায় মুদ্রিত হয়েছে) সর্বদাই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এবং একে মহিলাদের ও লেখাপড়া জানা পুরুষদের পড়াশোনার সিলেবাস গণ্য করা হত। মনে হয় ভাইজানের অব্যাহত তাকীদ সত্ত্বেও প্রতিদিন এটা পড়বার ও চোখ বুলাবার ক্ষেত্রে আমি অলসতা করতাম এবং বেশীর ভাগ সময় সাহিত্যমূলক ও হাল্কা ধরনের বই-পুস্তক পড়ার ভেতরই মগ্ন থাকতাম। সম্ভবত ভাইজান কোন পত্রে আম্মার নিকট এ ব্যাপারে অভিযোগ করে থাকবেন। অতঃপর আম্মা আমাকে যে দীর্ঘ পত্র পাঠিয়েছিলেন এখানে তার উদ্ধৃতি পেশ করা হচ্ছে।

"যখন তুমি এখানে ছিলে তখন আবদু বিশেষভাবে লিখেছিল যে, শাহ আব্দুল কাদির (রহ.)-এর তরজমা দৈনিক পড়বে এবং এ সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা, করবে। কিন্তু তুমি তার হুকুম তামিল করনি। আমি তাড়া করে এসেছি এবং প্রতিদিন এটা বলেছি আর তুমি তা এড়িয়ে গেছ এবং এ বই সে বই নিয়ে মেতে থেকেছ। আমার অত্যন্ত অপছন্দনীয় ছিল, কিন্তু এতটা খারাপ ভাবতে পারিনি। সেই চিঠি দেখে আমার যতটা কষ্ট হয়েছে তা আমি বলতে পারবো না। এমনিতেই তো তখনকার অবস্থাদৃষ্টে আমার নিজেরই এতমিনান ছিল না। কিন্তু এক্ষণে এই মুহূর্তে সমস্ত আশা-ভরসা বিপজ্জনক ও ভয়াবহরূপে দেখতে পাচ্ছি।

আলী! তোমার এই অযোগ্যতা ও অপদার্থতা আমাকে খুবই পীড়া দিচ্ছে। তোমা থেকে আমি এমনটি আশা করি না, আর এমন আশা ছিলও না। আমার ধারণা ছিল যে, তুমি তোমার প্রিয় ভাইজানের সমচিন্তার অনুগত হবে। আর এই ধারণাতেই আমার তুষ্টি ও প্রশান্তি ছিল। কিন্তু আফসোস! এমন ভাই, যে তোমাকে নিজের জানের চেয়েও ভালবাসে, স্নেহ করে এবং নিজের সকল শক্তি-সাধনা দিয়ে তোমাকে গড়ে তুলবার জন্য প্রস্তুত, তাঁর সকল চেষ্টা-সাধনা ব্যর্থ করে দেবে, তাঁর সমস্ত হক ভুলে যাবে এবং

বেপরোয়া ও স্বাধীন হয়ে যাবে। এতো তোমার সেই ভাই, যে তোমাকে এমন এক নাযুক মুহূর্তে আশ্রয় দিয়েছিল, তোমার সহায়তায় এগিয়ে এসেছিল, যখন একমাত্র আল্লাহ্ ভিন্ন আর কেউ দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল না।

আমি তোমার লেখাপড়ার ব্যাপারে অস্থিরতা প্রকাশ করতাম। সে নিজেই পেরেশান ছিল। তোমার জন্য সে নিজেই পরিশ্রম করেছে। তুমি যা কিছু লাভ করেছো তা তাঁরই বদান্যতা ও অনুগ্রহের ফসল। দেখ, এটা ইলম আর আমল তাকে বলে। তুমি সাহিত্যের ময়দানে যতই অগ্রসর হও না কেন তুমি কখনই আবদুর সমকক্ষ হতে পারবে না এবং তাঁর মধ্যে যেসব মহৎ গুণাবলী রয়েছে তাও তুমি অর্জন করতে পারবে না। কেননা এই মুহূর্তের ধ্যান-ধারণা তোমাকে সেই সুযোগই দেবে না।

আবদুর মত একজন আলেম, পণ্ডিত ও উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি যদি তুমি আরেকজন দেখতে চাও তাহলে দেখতে পাবে না। তোমাদের খান্দানের যা কিছু ভাল সবকিছুর সমাবেশ আবদুর ভেতর পাবে।

সামনে অগ্রসর হয়ে লেখাপড়ায় মনোনিবেশ, উদ্যমশীলতা ও চিরাচরিত ছাত্রসুলভ গুণাবলীর প্রতি উপদেশ দান করতে গিয়ে লিখেছেন ঃ

"সবকিছুর প্রতি আগ্রহ অর্থহীন ভেবো। যাদের এ ধরনের মন-মেজায তাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ো না। একজন ছাত্রকে কেবল পড়াশোনাই করা উচিত। পরিধেয় কাপড় ছেড়া হোক কিংবা জুতা ফাঁটা, এতে লজ্জার কিছু নেই, বরং-এর জন্য গর্ববোধ করা দরকার। এমন অবস্থাই কল্যাণ ও মঙ্গলের কারণ হয়। এসব কষ্টের মধ্যেই ইলমের কদর হয়। বুদ্ধিমান ও সৌভাগ্যবান সেই, যে দুর্লভ ও দুষ্প্রাপ্য বস্তু লাভ করে, আর তা হল শরীয়তের পাবন্দী। এক্ষণে ইলম সর্বসাধারণের জন্য সহজলভ্য হয়ে গেছে। যে কেউ তা সহজেই লাভ করতে পারে। দু-চারটে বই-পুস্তক কিংবা কিতাবাদি পড়ল, ব্যস! ছেলে আমার লায়েক হয়ে গেছে। হাজারও বিপদ-আপদ চোখের সামনে ভেসে বেড়ায়। এই চিঠি যদি মন চায় গভীর মনোযোগের সাথে দেখবে এবং বার বার পড়বে।"

আরও একটি পত্রে দ্বীনী ইলম তথা ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন ও আরবী শিক্ষার প্রতি পূর্ণ মনোনিবেশ প্রদান ও এক্ষেত্রে বিশিষ্টতা অর্জন এবং পূর্ববর্তী উলামায়ে কেরাম ও বুযুর্গদের পদাংক অনুসরণের ওপর জোর তাকীদ দিতে গিয়ে লিখেছেন–

"এখন আরবী শেখার জন্য পরিশ্রম কর। কিন্তু তা নিয়ম বহির্ভূতভাবে নয়। স্বাস্থ্যের দিকে অবশ্যই খেয়াল রাখবে। যদি শরীর ভাল থাকে তো সব ভাল, যা চাও হাসিল করতে পারবে। তুমি যতটা পরিশ্রম ইংরেজীর বেলায় করেছ আরবীর বেলায় তা করলে এতদিনে অনেক কিছুই হাসিল হয়ে যেত। মনোযোগ দিয়ে এখনও যেসব কিতাবাদি পড়নি, পড়তে পারনি সেগুলো পড়ে ফেল। যতটা সম্ভব আগের যুগের আলেম-উলামার মত যোগ্যতা সৃষ্টি কর। যেগুলো শরীয়ত বিরুদ্ধ নয় সেগুলোই শিখতে চেষ্টা কর। সমস্ত মাসআলা-মাসায়েল খুব ভালভাবে অবগত হও। এই মুহূর্তে এই ইলমেরই প্রয়োজন।

এখনকার আলেম-উলামারা তেমন কিছু জানে না এবং তারা ফেতনা সৃষ্টি করে। আমার অন্তরের কামনা, তুমি ইলমের ময়দানে সেই মর্যাদা অর্জন কর যে মর্যাদা বড় বড় আলেম-উলামা অর্জন করেছিলেন। যাঁদের দেখবার জন্য আমার চোখ ব্যাকুল ও উন্মুখ, যাঁদের কথা শোনার জন্য কান অধীর আগ্রহী এবং অন্তর বেকারার। আলী! এর চেয়ে বেশী আমার আর কোন আকাঙ্ক্ষা নেই, অভিলাষ নেই। আল্লাহ তাআলার দরবারে দোয়া করছি, তিনি যেন তোমাকে সে গুণাবলী দান করেন যাতে সে যুগ আবার ফিরে আসে। আমীন!"

আরেকটি পত্রে লিখেছেন

আলী! আল্লাহর অপার রহমতের কাছে আমার গভীর প্রত্যাশা যে, তুমি সম্মান ও সফলতা দৃষ্টে প্রভাবিত হবে না। কেননা অন্যের সম্মান ও সফলতা দৃষ্টে প্রভাবিত হওয়াই সাধারণ নিয়ম। এগুলো অস্থায়ী ও নশ্বর। ঈর্ষাযোগ্য তো তাই যা হাজারে একজন পায় আর এ পাওয়া আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়।

قسمت کیا ہر شخص کو قسام ازل نے

جو شخص کہ جس چیز قابل نظر آیا

বন্টনকারী মহান সত্তা নিজ হাতে করেছেন বন্টন
যাকে যার যোগ্য পেলেন তাকে তাই করেছেন অর্পণ।

"তোমার এ জন্য অত্যন্ত সাহস ও শক্তির সাথে গর্ব করা উচিত। আল্লাহর কাছে দোয়া করি, তিনি যেন তোমার মধ্যে এর প্রতি এমন আকর্ষণ সৃষ্টি করে দেন যাতে তুমি সবকিছুর উপরে একে প্রাধান্য দাও। তুমি যদি জজ হতে কিংবা এ ধরণের আরও কোন সম্মান বা পদমর্যাদা লাভ করতে যা সাধারণে পেয়ে থাকে তবুও আমি তার ভেতর হাজারো বিপদাশংকা অনুভব

করতাম। তিনি আমাকে সর্বপ্রকার মন্দের হাত থেকে নিরাপদ থাকার জন্য এমন সর্বোত্তম উপায় নির্বাচন করেছেন যাতে স্বয়ং রক্ষকও পাহারাদার হবে। আমার চিন্তার কোন দরকার হবে না, কেবল একটাই চিন্তা যেন আমার হৃদয় মানস সর্বদা এমন এক খুশিতে ভরপুর ও উদ্বেলিত থাকে যা কোন বড় থেকে বড় মর্যাদার অধিকারী লোকেরও নেই।" তাঁর বড় অভিলাষ ছিল যে, আমি নির্ভেজাল ধর্মীয় ওয়াজ-নসীহত করব, আল্লাহ ও তদীয় রাসূলের বিধিবিধান শোনাবার যোগ্য হব।

হাকীম মাওলানা সাইয়েদ আব্দুল আলী

সংক্ষিপ্ত পরিচয়

মাওলানা আলী মিয়াঁর বড় ভাই হাকীম সাইয়েদ আবদুল আলী ছিলেন প্রখ্যাত ঐতিহাসিক আলেমে দ্বীন, নাযেমে দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামা, হযরত মাওলানা হাকীম সাইয়েদ আবদুল হাই (রহ.) এর বড় সাহেবযাদা। তিনি ১৮৯৩ সালের পহেলা ডিসেম্বর জন্ম গ্রহণ করেন। মাত্র আট বছর বয়সে তিনি ১৯০১ সালে মাকে হারান। প্রাথমিক শিক্ষা নিজ নানা এবং দাদাবাড়ীতে শেষ করার পর তিনি মাধ্যমিক শিক্ষা লাভের জন্য নদুয়ায় ভর্তি হন। ঐ সময় তাঁর পিতাও লাখনৌতে অবস্থান করছিলেন। নদুয়ার দফতর ঐ সময় শাহজাহানপুর থেকে লাখনৌ আসে। সাইয়েদ আবদুল আলী ১৯১০ সালে দেওবন্দে যেয়ে হযরত শায়খুল হিন্দের দরসে হাদীছে শরীক হন। আল্লামা আনওয়ার শাহ সাহেবের নিকটও তিনি অধ্যয়ন করেন। তিনি সেখানে একবছর অবস্থান করার পর ১৯১২ সালে লাখনৌ ফিরে আসেন।

এরপর সাইয়েদ আব্দুল হাই সাহেব তাকে তাদের খান্দানী বিদ্যা ইলমে তিব বা চিকিৎসাশাস্ত্রে অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য তৎকালীন যুগের শ্রেষ্ঠ চিকিৎসাবিদ হাকীম আজমল খান এবং ডাক্তার মোখতার আহমাদখানের নিকট দিল্লী পাঠান। সেখানে তিনি ছয় মাস অবস্থান করে চিকিৎসা শাস্ত্রে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। দিল্লীতে তিনি আধুনিক চিকিৎসা শাস্ত্রের প্রতিও ঝুঁকে পড়েন। এবং ইংরেজী শিক্ষা ছাড়া আধুনিক চিকিৎসা শাস্ত্র অধ্যয়ন করা যে কষ্ট তা বুঝতে পারেন। ঐ সময় তার বয়স ২১/২২ বছর।

এরপর তিনি ইংরেজী শিক্ষা শুরু করেন এবং প্রথম ক্লাশ থেকে শুরু করে বি.এস.সি পাশ করে ১৯২০ সালে লাখনৌ মেডিকেল কলেজে ভর্তি হন। ভর্তির তৃতীয় বা চতুর্থ বছরে হঠাৎ করে ১৯২৩ সালের ২রা ফেব্রুয়ারী তার

পিতার ইন্তেকাল হয়। তিনি তখন কলেজের পক্ষ হতে মাদ্রাজের এক সফরে ছিলেন। বোম্বাই এসে তিনি পিতার ইন্তেকালের সংবাদ পান।

সাইয়েদ আবদুল হাই এর ইন্তেকালের ফলে সংসারের সকল দায়িত্বের বোঝা সাইয়েদ আবদুল আলী (রহ.) এর উপর এসে পড়ে। সংসারে অভাব অনটন পূর্ব হতেই লেগেছিল। পিতার ইন্তেকালে তা আরো ঘনীভূত হয়। একদিকে সংসার চালানো অন্যদিকে কলেজের বড় ধরনের খরচ চালানোর ভারে তিনি মুষড়ে পড়েন। পিতার বন্ধু বান্ধব ও আত্মীয় স্বজনরা এ ব্যাপারে তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসেন। কলেজ থেকে পাস করার পর হযরত মাওলানা আবদুল আলী সাহেব ১৯২৬ সলে লাখনৌতে চিকিৎসা পেশা শুরু করেন। হযরত শায়খুল ইসলাম মাদানী (রহ.)-এর হাতে বায়আত হন এবং হজ্জ্ব করেন। পিতার ইন্তেকালের পর ডাক্তার সাহেব ১৯২৩ সালে নদওয়ার রুকনে ইন্তেজামী, ১৯৩০ সালে নায়েবে নাযেম এবং ১৯৩১ সালে নযেমে নদওয়াতুল উলামা নির্বাচিত হন এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত দীর্ঘ তিরিশ বছর এ খেদমতে নিজকে নিয়োজিত রেখে ১৯৬১ সালের ৭ই মে লাখনৌতে ইন্তেকাল করেন।

বড় ভাই এর তরবিয়ত

যতদিন পর্যন্ত সাইয়েদ আব্দুল হাই সাহেব জীবিত ছিলেন ততদিন পর্যন্ত ভাই বোনদের সাথে তার মহব্বতের তেমন অনুভূতি হয়নি। পিতার ইন্তেকালের সাথে সাথে তার মধ্যে এক নতুন ব্যক্তিত্ব জেগে ওঠে। যার মধ্যে পিতৃসুলভ আচরণ লক্ষ করা গিয়েছিল। এ সময় তিনি এ সব ইয়াতীম ভাই বোন এবং বিধবা আম্মাজানের সকল প্রকার তত্ত্বাবধানকে নিজের সবচাইতে বড় দায়িত্ব মনে করেছিলেন। বিশেষ করে ছোট ভাই আলীকে মানুষের মত হিসেবে গড়ে তোলার জন্য তার চিন্তার অন্ত ছিল না। আলী মিয়াঁর তালীম এবং তরবিয়তে তিনি তার সকল অভিজ্ঞতা ও দূরদর্শিতা সফলভাবে কাজে লাগিয়েছিলেন।

লাখনৌতে বড় ভাই ডাক্তার আব্দুল আলী সাহেবের অবস্থান ও কাজকর্ম ভালভাবে শুরু হলে ছোট ভাই আলী মিয়াঁকে তার নিকটে নিয়ে আসেন। এখানে এসেও তার বোস্তাঁ পাঠ অব্যাহত থাকে। লাখনৌতে দু'ভাই অবস্থান করতেন নবাব নূরুল হাসান খানের বাড়িতে। অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণ বাড়ী ছিল এটি। লোকজনের সমাগমও হত প্রচুর পরিমাণে। এই পরিবেশে বড়

ভাই দু'টি বিষয়ের প্রতি অত্যন্ত কঠোরভাবে লক্ষ্য রাখতেন। প্রথমতঃ নামাযসমূহ যেন জামাআতের সাথে আদায় করা হয়। হযরত নিজেই বর্ণনা করেছেন– বড় ভাই মেডিকেল কলেজ থেকে সাধারণত মাগরিবের পরে ফিরতেন। এসেই তিনি যোহর, আসর ও মাগরিবের নামায জামাআতের সাথে আদায় করা হয়েছে কিনা তা জিজ্ঞাসা করতেন। আমি হাঁ সূচক জবাব দিতাম। কখনো সামান্য সন্দেহ হলে, আমাকে দ্বিতীয়বার নামায পড়তে বাধ্য করতেন।

দ্বিতীয় যে বিষয়ের প্রতি বড় ভাইয়ের বিশেষ লক্ষ্য ছিল, তা হলো ছোট ভাই আলী মিয়াঁ যেন নবাব বাড়ীর কর্মচারীদের সাথে বেশীক্ষণ সময় না কাটায় এবং তাদের সাথে খোলামেলা সম্পর্ক সৃষ্টি না করে। তাছাড়া কোন উপন্যাস ইত্যাদি যেন কারো কাছ থেকে নিয়ে না পড়ে। ছোট ভাইয়ের পাঠ করার জন্য তিনি নিজেই বই নির্বাচন করে দিতেন এবং পাঠ করাতেন। হযরত বলেন, খুব সম্ভব বড় ভাই আমাকে সর্বপ্রথম পড়তে দিয়েছিলেন সীরাতে খায়রুল বাশার, অতঃপর রহমাতুল্লিল আলামীন।

সাইয়েদ পরিবারের ঐতিহ্য অনুযায়ী বালক আলী মিয়াঁর জন্য জরুরী ছিল ফার্সী ভাষা ও সাহিত্যে ব্যুৎপত্তি অর্জন করা। পিতা সাইয়েদ আব্দুল হাই ও বড় ভাই ডাক্তার আব্দুল আলী ফার্সী ভাষা ও সাহিত্যে অনেক পারদর্শী ছিলেন। হযরত মাওলানা আলী মিয়াঁ তার আত্মজীবনীতে লিখেছেন– আমি আমার পিতাকে অনেক দিন যাবত দেখেছি তিনি আমার বড় ভাইয়ের কাছে পত্র লিখতেন ফার্সীতে। কিন্তু বড় ভাই ডাক্তার আব্দুল আলীর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল ভিন্ন। তিনি জানতেন যে, ভারতে ফার্সীর যুগ শেষ হতে চলেছে এবং আরবী ভাষার যুগ অতি অল্প কালের মধ্যে শুরু হবে। তাই তিনি ছোট ভাইয়ের ফার্সী শিক্ষা বেশী দূর এগুতে দেননি। তখন আলী মিয়াঁ মাওলানা মুহাম্মাদ ফারুক চিড়িয়াকোটীর নিকট ফার্সীতে এ পরিমাণ যোগ্যতা অর্জন করেন যে, তাসাউফের কিতাবাদি, মাকতুবাতে ইমামে রব্বানী, ইযালাতুল খেফা ইত্যাদি অধ্যয়ন করার যোগ্যতা অর্জন হয়েছেন।

ডাক্তার সাহেব আলী মিয়াঁর ফার্সী শিক্ষা এখানেই শেষ করে দেন এবং ইংরেজীর প্রাথমিক শিক্ষা শুরু করান। অপর দিকে আরবী শিক্ষার বিশেষ ব্যবস্থাও গ্রহণ করেন। এবং তার জন্য এমন এক পাণ্ডিত্যপূর্ণ পদ্ধতি গ্রহণ করেন যাকে আল্লাহ পাকের বিশেষ তাওফীক ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। ঐ সময়ের বাস্তব অবস্থা এটাই ইশারা দিচ্ছিল যে, আলী মিয়াঁকে স্বাভাবিক

নিয়মে নদওয়ায় ভর্তি করানো হবে। কারণ ডাক্তার সাহেব নিজেই ঐ সময় নদওয়ায় দায়িত্বশীল ব্যক্তিত্ব ছিলেন। কিন্তু এটি একটি কুদরতী ব্যবস্থাপনা ছিল এবং কুদরতের পক্ষ হতে হযরত মাওলানাকে সারা বিশ্বে যে ইসলাহী এবং সাংস্কৃতিক খেদমত আঞ্জাম দিতে হবে এবং যেভাবে আরবদের মাঝে বক্তব্য রাখতে হবে এবং তাদেরকে তাদের দায়িত্ব এবং কর্তব্যবোধ সম্পর্কে সজাগ করতে হবে, এ মহৎ চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ হয়েই ডাক্তার সাহেব আলী মিয়াঁকে দ্বীনী শিক্ষার পথে ধাবিত করেছিলেন।

আরবী শিক্ষার শুরুতে খান্দানের লোকেরা ডাক্তার সাহেবের এ সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করে বলেছিলেন আলীকে আধুনিক শিক্ষা দেয়া উচিত। তাকে আই. সি. এস. এর জন্য প্রস্তুত করা উচিত। জবাবে ডাক্তার সাহেব বলেছিলেন, আব্বাজান বেচে থাকলে আলীকে যা পড়াতেন আমি সে শিক্ষাই আলীর জন্য নির্বাচিত করেছি।

একবার লাহোরে হযরতের ফুফা মাওলানা সাইয়েদ তালহা সাহেব সেখানকার ওরিয়েন্টাল কলেজের তৎকালীন প্রিন্সিপ্যাল মৌলভী মুহাম্মদ শফী সাহেবের সাথে আলী মিয়াঁর পরিচয় করান এবং তার কাছ থেকে আলী মিয়াঁর পড়াশুনার ব্যাপারে পরামর্শ চান, যে আলীর কোন লাইনে পড়াশুনা করা উচিত। মুহাম্মাদ শফী সাহেব হযরত আলী মিয়াঁর ঐ সময়ের কিছু আরবী যোগ্যতা এবং কিছু লেখা-লেখি দেখে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, এ ছেলে যেন আরবীকেই তার জীবনের উদ্দেশ্য বানায় এবং এ ভাষাতেই যেন সে বিশেষজ্ঞ হয়।

আরবী রচনা এবং অনুশীলনে বুৎপত্তির জন্য ডাক্তার সাহেব এক বিশেষ কৌশল অবলম্বন করেন। হযরত সাইয়েদ আহমাদ শহীদের উপর আরবীতে প্রথম প্রবন্ধ হযরত ডাক্তার সাহেবের তত্ত্বাবধানেই তিনি রচনা করেন। এর ফলে কয়েকটি ফায়েদা হয়েছিল এক আরবীতে প্রবন্ধ রচনার অনুশীলন দুই হযরত সাইয়েদ আহমাদশহীদের সংস্কার আন্দোলনের উপর জ্ঞান লাভ এবং তার সাথে গভীর সম্পর্ক সৃষ্টি। ডাক্তার সাহেব তাঁকে হেদায়েত দিয়েছিলেন যে, প্রবন্ধ প্রস্তুত করার পূর্বে তিনি যেন ইতিহাস এবং জীবনী বিষয়ক বিখ্যাত গ্রন্থাবলী প্রথমে মোতালা'আ করে নেন এবং কিছু কিছু বিষয় নোট করতে থাকেন। এবং ঐ সব গ্রন্থের বিভিন্ন ভাষা, উপমা, পরিভাষা ইত্যাদি যেন ভালো করে আয়ত্ব করে নেন। এ প্রেক্ষাপটে তিনি ইবনে আসিরের আল-কামেল খুব ভাল করে অধ্যয়ন করেন।

এ গাইড লাইন পেয়ে হযরত আলী মিয়াঁ ঐ সময় হযরত সাইয়েদ সাহেবের উপর এমন এক প্রবন্ধ রচনা করেন যা পরবর্তী সময় তিনি তা তার প্রাণপ্রিয় উস্তাদ শায়খ তাকীউদ্দীন হিলালীর মাধ্যমে মিসরের বিখ্যাত আলেম আল্লামা রশিদ বেযার নিকট পাঠিয়ে দেন এবং আল-মানার পত্রিকায় তা প্রকাশিত হয়। পরে পৃথকভাবে পুস্তিকা আকারেও তা ছাপানো হয়। এ ছাড়া ডাক্তার সাহেব, মক্কা শরীফ হতে প্রকাশিত "উম্মুল কোরা" নামক আরবী পত্রিকার কিছু কিছু প্রবন্ধ আলী মিয়াঁর দ্বারা উর্দূতে তরমজা করান এবং তা "যমীনদার" পত্রিকায় ছাপা হয়।

ডাক্তার সাহেবের জেহেনে বড় প্রশস্ততা (Broad minded) এবং চিন্তাধারায় ছিল ব্যাপকতা। মুসলিম বিশ্বের অবস্থা সম্পর্কে তিনি সজাগ ছিলেন। এজন্য আরবী পত্র পত্রিকা খুব পড়তেন। অনেক পত্র পত্রিকা ঘরে আসতো। হযরত আলী মিয়াঁ এ সব পত্র পত্রিকা হতে খুব লাভবান হতেন। ডাক্তার সাহেব ছোট ভাইকে পথ প্রদর্শন করতেন। নতুন নতুন বাচন ভঙ্গি এবং পরিভাষার ব্যাখ্যা দিতেন। এভাবে আস্তে আস্তে হযরত আলী মিয়াঁ আরবী ভাষা এবং সাহিত্যের রস আস্বাদন করতে থাকেন।

ডাক্তার সাহেবের হযরত মুজাদ্দিদে আলফে ছানী, শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলভী, হযরত সাইয়েদ আহমাদশহীদ, ইমাম ইবনে তাইমিয়াঁ, ইমাম ইবনে কাইয়েম এর উপর বড় আকীদা ছিল এবং তাদের লিখিত কিতাব পত্রের সাথে গভীর সম্পর্ক ছিল। আলী মিয়াঁকে তিনি ঐ সব মনীষীদের গ্রন্থাবলী পড়তে তাকীদ করতেন।

ডাক্তার সাইয়েদ আব্দুল আলী (রহ.)-এর মাওলানা আলী মিয়াঁর ইসলাহ ও তরবিয়ত এবং সকল ধরণের দ্বীনী তরক্কীর সবসময় ইহতিমাম থাকত। এজন্য তিনি আলী মিয়াঁকে সর্ব প্রথম সীরাতের মাদরাসায় ভর্তি করেন। এবং সীরাত বিষয়ক কিতাব পত্র তাঁকে পড়তে দেন। ডাক্তার সাহেব সর্ব প্রথম নদওয়ার প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা মুহাম্মদ আলী ম;গিরি এবং শায়খুল হিন্দ হযরত মাওলানা মাহমুদুল হাসান (রহ.) এর নিকট বায়াত হবার ইচ্ছা পোষণ করেছিলেন কিন্তু সে সুযোগ না পাওয়ায় তাদের ইন্তেকালের পর শায়খুল ইসলাম হযরত মাওলানা হোসাইন আহমাদ মাদানীর কাছে তিনি বায়আত হন। হযরত মাদানী (রহ.) লাখনৌ এলে ডাক্তার সাহেবের বাসাতেও অবস্থান করতেন।

এ সুবাদে হযরত মাদানী আলী মিয়াঁকে মহব্বত করতেন। পরবর্তীতে ডাক্তার সহেব আলী মিয়াঁকে চার মাসের জন্য হযরত মাদানীর সহচর্য লাভের এবং দরসে হাদীছে অংশ গ্রহণ করার জন্যদেওবন্দে পাঠিয়ে দেন। ১৯২৮ সালে হযরত হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহ.) লাখনৌ তাশরীফ নিয়ে আসলে, ডাক্তার সাহেব নিজেও পাবন্দীর সাথে মজলিসে হাজিরা দিতেন এবং আলী মিয়াঁকেও নিজের সাথে জরুরী ভিত্তিতে নিয়ে যেতেন।

হযরত আলী মিয়াঁর দ্বীনী উন্নতি এবং ইসলাহী খেদমতের মকবুলিয়াতের জন্য ডাক্তার সহেব সব সময় চিন্তিত থাকতেন। নিজ শায়খ হযরত মাদানীকে তিনি এক পত্রে লিখেছিলেন যে, "মনে চায় যেভাবে হযরত সাইয়েদ আহমাদ শহীদ (রহ.) হতে আল্লাহ পাক ইসলাহী এবং জিহাদী খেদমত নিয়েছেন আলীর থেকে যেন তার চেয়েও বেশী খেদমত কবুল করেন।"

হযরত মাদানী (রহ.) পত্রের জবাবে ডাক্তার সাহেবকে লিখেছিলেন, "ঐ কারীম রাব্বুল আলামীন আলীকে যেন কল্যাণের চাবী এবং অকল্যাণের প্রতিরোধক বানান এবং হযরত সাইয়েদ সাহেবের সাংস্কারিক কর্মকাণ্ডের ধারক ও বাহক বানিয়ে ইলমে লাদুন্নি দান করেন, আলীর জন্য এই দু'আই করি।" ডাক্তার সাহেব আলী মিয়াঁর জন্য নতুন নতুন পদ্ধতি গ্রহণ করতেন। ১৯২৯ সালে আলী মিয়াঁ এক পরীক্ষায় খুব ভালো নম্বর পেলে ডাক্তার সাহেব তাকে তৎকালীন বিশ টাকা পুরস্কার দিয়ে বলেছিলেন তোমার শিক্ষক মণ্ডলী ও সহপাঠীদের দাওয়াত করো। পরেই আবার বলে ওঠেন, না না এতে তেমন ফায়েদা হবে না বরং এ টাকাটা মদীনা শরীফের মাদরাসা উলূমে শরইয়্যায় পাঠিয়ে দাও। হযরত তাই করেছিলেন।

লাখনৌতে একজন ডাক্তার ছিলেন তিনি মেডিকেল সার্টিফিকেট দিতে কোন সতর্কতা অবলম্বন করতেন না। একদিন তার উপর সমালোচনা শুরু হলে আলী মিয়াঁও তাতে শরীক হন। ডাক্তার সাহেব সাথে সাথেই আলী মিয়াঁকে বাধা দেন এবং বলেন যে, ছোট বেলায় তুমি সাংঘাতিক অসুস্থ হয়ে পড়লে এই ডাক্তারই তোমাকে অনেক সেবা দিয়ে সুস্থ করে তোলেন। অতএব তার প্রতি তোমার শুকরিয়া আদায় করা দরকার। তার ভালো দিকের আলোচনা করা দরকার। এভাবে ডাক্তার সাহেব আলী মিয়াঁর তরবিয়ত করতেন।

হযরত আলী মিয়াঁর বর্ণাঢ্য জীবন বিনির্মাণে বিভিন্ন ধরণের ব্যক্তিত্বের অবদান ছিল এতে কোন সন্দেহ নেই তবে এর মধ্যে চার জন ব্যক্তিত্বের অবদান ছিল বুনিয়াদী। যার সারাংশ এভাবে নেয়া যেতে পারে-

১) হযরত আলী মিয়াঁর মধ্যে ইখলাছ, লিল্লাহিয়াত, দ্বীনী মূল্যবোধ, দাওয়াতী জজবা, ইসলাহ ও সংস্কারের খেদমতের বুনিয়াদ পড়েছিল, হযরত সাইয়েদ আহমাদশহীদ বেরলভীর সীরাত এবং জিহাদী কার্যক্রমের প্রভাবে

২) ইতিহাস এবং আরবী সাহিত্যের জওক পয়দা হয়েছিল হযরতের স্বনামধন্য পিতা নাযেমে নদওয়াতুল উলামা হযরত মাওলানা সাইয়েদ আব্দুল হাই (রহ.)-এর প্রভাবে, পৈত্রিক সুত্রে।

৩) কবুলিয়াত, গ্রহণযোগ্যতা এবং সম্মান লাভ করেছিলেন তিনি তাঁর মহীয়সী মাতা খায়রুন নিসার সার্বক্ষণিক দিল নিংড়ানো দূআ এবং আহাজারির কারণে।

৪) আর আলী মিয়াঁর ঐতিহাসিক জীবন বিনির্মাণে সব চাইতে বড় অবদান রেখেছিলেন তারই যোগ্য বড় ভাই, ডাক্তার মাওলানা সাইয়েদ আবদুল আলী সাহেব। বড় ভাই এর তরবিয়তে, তার মধ্যে চিন্তার সমন্বয় এবং মেযাজের মধ্যে ভারসাম্যতা এসেছিল।

এ প্রসঙ্গে হযরত আলী মিয়াঁ তার আত্মজীবনীতে লিখেছেন যে, আল্লাহ তাআলা যা কিছু খেদমতের তাওফীক দিয়েছেন এবং আরবদের সামনে কথা বলার এবং তাদের দায় দায়িত্ব স্মরণ করিয়ে দেয়ার সুযোগ দিয়েছেন এ সবই আমার সম্মানীত পিতার ইখলাছ, আম্মাজানের দূআ, ভাই সাহেবের তরবিয়ত এবং শিক্ষক ও মাশায়েখের দূআ, মহব্বত ও শফকতেরই ফসল।

শায়খ খলীল আরবের তত্ত্বাবধান

বড় ভাই একদিকে ইংরেজী শিক্ষক নিযুক্ত করেন, অন্যদিকে আরবী ভাষার অসাধারণ উস্তাদ শায়খ খলিল ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে হুসাইন ইয়ামানী ভূপালীর নিকট আলী মিয়াঁকে ন্যস্ত করেন। শায়খ খলীলের পরিবার কয়েক পুরুষ ধরে আলী মিয়াঁর পরিবারের কয়েক পুরুষের উস্তাদ ছিলেন। শায়খ খলীলের দাদা আল্লামা হুসাইন ইবনে মুহসিন ছিলেন মাওলানা আলী মিয়াঁর পিতার হাদীছের উস্তাদ এবং শায়খ খলীলের পিতা শায়খ মুহাম্মাদ ছিলেন তাঁর সাহিত্যের উস্তাদ।

শায়খ খলীল আরব সাহেবের নিকট তিনি ১৯২৪ সালের শেষ দিকে আরবী শিক্ষা শুরু করেন। ইংরেজী ও আরবী শিক্ষা একই সাথে চলতে থাকলেও আরবী শিক্ষার প্রতিই বেশী জোর ছিল। ইংরেজী শিক্ষা ছিল নাম মাত্র। আরব সাহেবের নিকট তিনি ও আরব সাহেবের ছোট ভাই হুসাইন ইবনে মুহাম্মাদ এ দু'জনই পড়তেন। তাই আরব সাহেবের পুরো মনোযোগ তিনি পেতেন।

শায়খ খলীল আরব ছিলেন আরবী ভাষা ও সাহিত্যের সুপন্ডিত ও অভিজ্ঞ উস্তাদ। তাই তিনি তাঁর নিজস্ব সিলেবাস ও পদ্ধতি অনুযায়ী এ দু'জনকে আরবী শেখান। তিনি মাত্র তিন বছরে আরবী সাহিত্যের পর্ব শেষ করে দেন। আল-মুতালাআতুল আরাবিয়ার মত পুস্তিকা থেকে শুরু করে নাহজুল বালাগা, হামাসা ও দালায়েলুল ইজাযের মত উচ্চাঙ্গের গ্রন্থাবলীর পাঠ শেষ হয় এসময়ে। এভাবে বালক আলী মিয়াঁ আরবী সাহিত্য ও তার যাবতীয় আনুষঙ্গিক বিষয় আয়ত্ত করে নেন।

ব্যতিক্রমধর্মী শিক্ষা পদ্ধতি

তিনি নিজেই বলেন– "আমার শিক্ষা জীবনের গতিধারা অন্যদের তুলনায় ছিল একটু ভিন্ন প্রকৃতির। আমার শিক্ষা কার্যক্রমে আমি একটি বিরাট সুযোগকে কাজে লাগিয়েছিলাম। সেই সুযোগকে শুধু সুবর্ণ সুযোগ বলেই চুপ থাকতে চাই না; বরং আমি তাকে আখ্যা দেই এক ঐশিদান হিসাবে। আর সেটি হল– আমি আমার ছাত্রজীবনে একটি একটি করে বিষয় আলাদাভাবে পড়েছি। একই সাথে বিভিন্ন ধরনের বিষয় পড়ার সুযোগ আমার হয়নি। সুচিন্তাশীল অভিভাবক আল্লামা আরব সাহেব (রহ.) সর্বপ্রথম আমার আরবী সাহিত্যের পর্ব সেরে দেন। এ বিষয়ে পূর্ণতা অর্জন করতে যেয়ে আল-মুতালাআতুল আরাবিয়ার মত পুস্তিকা থেকে শুরু করে নাহজুল বালাগাহ, হামাসা ও দালায়েলুল ইজায-এর মত উচ্চাঙ্গের গ্রন্থাবলী একাধারে তিন বছর তিনি আমাকে পড়ান এবং আরবী সাহিত্য ও তার আনুষঙ্গিক বিষয়াবলী আয়ত্ত করে নিই। সুরুচী সম্পন্ন যোগ্য উস্তাদের সার্বক্ষণিক সান্নিধ্যের মাধ্যমে অল্প কিছুদিনের মধ্যে আরবী ভাষার সাথে আমার গড়ে ওঠে এক অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক।

আরব সাহেবের নিকট পড়বার সময়ই এক পর্যায়ে তিনি লাখনৌ জামেয়া মিল্লিয়া ইসলামিয়াঁর তাফসীরের উস্তাদ খাজা আব্দুল হাই ফারুকীর নিকট কয়েকটি সুরার তাফসীর পড়েন। তারপর তিনি মাওলানা উবায়দুল্লাহ সিন্ধীর

চিন্তাধারার সাথে প্রথম পরিচয় লাভ করেন। তাছাড়া এসময় বিশেষ করে রায়বেরেলীতে অবস্থানের সময়ে চাচা মাওলানা সৈয়দ তালহা সাহেবের নিকট নাহু-ছরফ পড়েন। মাওলানা তালহা সাহেব ছিলেন নাহু-ছরফের ইমাম তুল্য।

১৯২৭ সালে তিনি মাত্র ১৪ বছর বয়সে লাখনৌ ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হন এবং ১৯২৭ সালে ফাযেলে আদব সনদ লাভ করেন। এতে তিনি প্রথম বিভাগে প্রথম হন এবং স্বর্ণপদকের উপযুক্ত হন। কিন্তু ইউনিভার্সিটিতে ফান্ড সংকুলান না হওয়ায় তাঁকে পদক দেয়া হয়নি। অতঃপর তিনি ফাযেলে হাদীছের সনদও লাভ করেন। হযরত মাওলানার ভাষায় এই সনদের কোন মূল্যই ছিল না।

শায়খুল হাদীছ মাওলানা হায়দার হাসান খান

আরবী সাহিত্যের পর তিনি ফিকাহ তথা ইসলামী আইন নিয়ে অধ্যয়ন করেন। অতঃপর তিনি দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামায় শায়খুল হাদীছ মাওলানা হায়দার হাসান খান টুংকির হাদীছের দরসে নিয়মিত ছাত্র হন এবং দুই বছরে হাদীছ শাস্ত্র অধ্যয়ন শেষ করেন। তার নিকট তিনি বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ ও তিরমিযী শরীফ পড়েন। বায়যাবী শরীফের কিছু অংশও আলাদাভাবে তাঁর নিকট পড়েন। মানতেকের কয়েকটি পাঠও তিনি নিজ আগ্রহে আলী মিয়াঁকে পড়ান।

মাওলানা হায়দার হাসান খান ছিলেন মাওলানা আলী মিয়াঁর পিতার সহপাঠী। কেননা দু'জনেই ইমামে হাদীছ শায়খ হুসাইন ইবনে মুহসিন আনসারী ইয়ামেনী ভূপালীর ছাত্র। হাকীম সাইয়েদ আব্দুল হাই এর অনুরোধ ও পীড়াপীড়িতেই তিনি দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামায় তাদরীসের খেদমতে যোগ দেন। তাই আলী মিয়াঁর প্রতি তাঁর মুরব্বীসূলভ নয় বরং পিতৃসূলভ স্নেহ ও মনোযোগ। পানাহারের সময়ও তিনি আলী মিয়াঁকে কাছে রাখতেন। তাঁর ব্যক্তিগত খরচাদির হিসাব থাকত আলী মিয়াঁর নিকট। কোথাও যাবার সময় তিনি আলী মিয়াঁকেই সাথে রাখতেন।

তাঁর হাদীছের দরসের পদ্ধতি ছিল খালেস মুহাদ্দিছ সূলভ, গবেষণামূলক। তিনি ছিলেন ইয়ামানের মুহাদ্দিছগণের বৈশিষ্ট্যসমূহের অধিকারী এবং শায়খ হুসাইনের দরসের হুবহু প্রতিচ্ছবি। তিনি দরসের মধ্যে ছাত্রদের দ্বারা যাঁচাই, অনুসন্ধান ও গবেষণার পুরো কাজ নিতেন। ছাত্রদের নিছক শ্রোতা হয়ে থাকতে দিতেন না। বরং কিতাবসমূহ থেকে উদ্ধৃতি বের

করতে, রিজালের কিতাব ও জারাহ তা'দীলের বিষয় অনুসন্ধানে এবং মাসআলা লিখতেও তাদের শরীক রাখতেন, যাতে ছাত্রদের দৃষ্টিভঙ্গি প্রসারিত ও গভীর হয় এবং তাদের বাস্তব অভিজ্ঞতা হয়। তিনি ছিলেন হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী (রহ.) এর খলীফা। নামাযে তিনি বিগলিত ও আপ্লুত হয়ে পড়তেন। শেষ রাতে দীর্ঘ তাহাজ্জুদ ও দীর্ঘ সিদজায় কাটাতেন আর কান্নাকাটি করতেন। জীবনযাত্রা ছিল অতি সাধারণ। ছাত্র ও সাথীদের সাথে অকৃত্রিমতা এবং সকল কাজে অংশ নেওয়া ছিল তার সহজাত অভ্যাস। তিনি কাউকে হাদীছের সনদ দিতে হলে সাধারণত সুন্দর হাতের লেখা দেখে কোন ছাত্রকে দিয়ে লেখাতেন এবং নিজে দস্তখত করতেন। কিন্তু আলী মিয়াঁকে তিনি নিজ হাতে সনদ লিখে দেন যা প্রস্তুত করতে তার পুরো একদিনের মত ব্যয় হয়েছিল। এ ছিল আলী মিয়াঁর প্রতি তার বিশেষ স্নেহ ও মমতার প্রমাণ।

আল্লামা তাকী উদ্দীন হেলালী

প্রায় একই সময়ে দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামায় আরবী ভাষা ও সাহিত্যের দিকপাল আল্লামা তাকি উদ্দীন হেলালী উস্তাদ নিয়োজিত হন। আলী মিয়াঁ তখন তার বিশেষ খাদেম হিসেবে সর্বক্ষণ সাথে থাকতেন এবং আরবী ভাষা ও সাহিত্যের যে পাঠ তিনি হযরত খলিল আরব সাহেবের নিকট শুরু করেছিলেন তার পূর্ণতা হাসিল করেন।

এক সময়ে মাওলানা আলী মিয়াঁ ইংরেজী শিক্ষার প্রতি খুব ঝুঁকে পড়েন। তখনকার মেট্রিক ও ইন্টারমিডিয়েটের ইংরেজী সাহিত্য তিনি চর্চা করতে থাকেন। কিন্তু তাঁর মায়ের তাতে মোটেই সায় ছিল না। তিনি পুত্রকে এ থেকে নিবৃত্ত হতে এবং দ্বীনী শিক্ষায় আরো মনোযোগী হতে বললেন। অগত্যা তিনি ইংরেজী শিক্ষা মুলতবী করেন।

লাখনৌ ইউনিভার্সিটি থেকে ফাযেলে আদব সনদ লাভ করার পর তিনি লাহোর সফর করেন এবং মাওলানা উবায়দুল্লাহ সিন্ধীর বিশিষ্ট ছাত্র শায়খুত তাফসীর মাওলানা আহমাদ আলী লাহোরীর সাথে পরিচিত হন। কিন্তু তখন বেশীদিন তাঁর তাফসীরের দরসে থাকতে পারেননি। অতঃপর ১৯৩০ ও ১৯৩১ সালে দু'বার তিনি মাওলানা আহমাদ আলী লাহোরীর নিকট গমন করেন এবং তার দরসে শরীক হন। তাফসীর ব্যতীত মাওলানা লাহোরীর নিকট তিনি হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগার দরস নেন।

দারুল উলূম দেওবন্দে

১৯৩২ সালে তিনি হযরত মাওলানা হুসাইন আহমাদ মাদানী (রহ.)-এর নিকট হাদীছের দরস নেয়ার জন্য দারুল উলূম দেওবন্দে গমন করেন। সেখানে তিনি প্রায় চার মাস অবস্থান করে হযরত মাদানীর নিকট হাদীছের উপর বিশেষ করে দরস লাভ করেন। একই সময়ে তিনি হযরত মাওলানা এজায আলী (রহ.)-এর নিকট ফিকাহর দরস গ্রহণ করেন।

লাহোরের তফসীর প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ ঃ

দেওবন্দ থেকে ফিরে এসে তিনি লাহোরে যান এবং মাওলানা লাহোরীর তাফসীরের দরসে নিয়মিত ছাত্র হিসেবে ভর্তি হন। মাওলানা লাহোরীর তাফসীরের নিয়মিত দরস হত শাওয়াল থেকে যিকাআদাহ। এ দু'মাস দরস শেষে যে পরীক্ষা হয় তাতে তিনি প্রথম স্থান অধিকার করেন। মাদরাসা কাসেমুল উলূমে সনদ বিতরণ অনুষ্ঠান হয়। হযরত মাওলানা হুসাইন আহমাদ মাদানী (রহ.) প্রধান অতিথি হিসেবে সনদ বিতরণ করেন। এরই মধ্য দিয়ে মাওলানা আলী মিয়াঁর আনুষ্ঠানিক শিক্ষা জীবনের সমাপ্তি ঘটে।

বিবাহ

হযরত মাওলানা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী (রহ.)-এর বিবাহ হয় তাঁরই আপন মামাতো বোন সাইয়েদ আহমাদ সাঈদ সাহেবের কন্যা, শাহ যিয়াউন্নবীর পৌত্রী এবং মুন্সী সাইয়েদ আব্দুর রাজ্জাক সাহেবের দৌহিত্রীর সাথে। নদওয়ার শায়খুল হাদীছ হযরত মাওলানা হায়দার হাসান খান বিয়ের খুতবা পড়েন। বড় ভাই ডাঃ আব্দুল আলী অত্যন্ত ধুমধামের সাথে ছোট ভাইয়ের ওলীমা সম্পন্ন করেন, যাতে কোন ক্রমেই পিতার অভাব অনুভব না হয়। হযরত আলী মিয়াঁ চিরজীবনই নিঃসন্তান ছিলেন। অবশ্য তাঁর হাজার হাজার রূহানী সন্তান পৃথিবীময় ছড়িয়ে রয়েছে। ১৯৮৯ সালের ১৫ই ডিসেম্বর তাঁর স্ত্রী তৈয়েবুন্নেসা ইন্তেকাল করেন।

==ooo==

অধ্যায়—৩

অধ্যাপনা

শিক্ষক হিসেবে দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামায়

১৯৩৪ সাল। হযরত মাওলানা আলী মিয়াঁ তখন বিশ বছরের যুবক। নিয়মতান্ত্রিক লেখাপড়া শেষ করেছেন। এখন শুধু অধ্যয়ন এবং পরিশ্রমের পালা। যার কোন সীমা নেই। প্রকৃতপক্ষে সুনির্দিষ্ট শিক্ষা পদ্ধতি ও নেসাব হল; অধ্যয়ন, চিন্তা-ফিকির ও পূর্ববর্তীদের পরিশ্রমের ফসল থেকে লাভবান হওয়া এবং ইলমের বাগিচা থেকে উপকৃত হওয়ার একটি মাধ্যম মাত্র। তা মূলতঃ জ্ঞান-সমূদ্রে বিচরণের প্রথম পদক্ষেপ, মনযিলে মকসুদ নয়। এ কারণেই কোন কোন মণীষী প্রচলিত সিলেবাস সমাপ্তকারীদের জন্য "ফারেগ" শব্দের ব্যবহারকে অযথা ও ভুল ধারণা সৃষ্টিকারী বলে মনে করেন।

১৯৩১ সালের শেষের দিকে মাওলানা আলী মিয়াঁ একবার শায়খ তাকীউদ্দিন হেলালীর সাথে আজমগড় গিয়েছিলেন এবং "দারুল মুছান্নিফীন"-এ কিছুদিন অবস্থান করেছিলেন। সেখানকার নিরিবিলি ও শিক্ষার পরিবেশ প্রত্যক্ষ করে তিনি মুগ্ধ হন এবং তাঁর প্রচন্ড ইচ্ছা হয় জীবনের বাকী দিনগুলো সেখানেই কাটিয়ে দিবেন। মাওলানা সাইয়েদ সুলায়মান নদভী (রহ.)-এর নেগরানী ও নির্দেশনায় অধ্যয়ন ও লেখালেখির কাজ করবেন এবং সর্বনিম্ন আয়ের উপর (যা তৎকালীন জীবনযাপনের সাধারণ বিচারে এবং দ্রব্যমূল্য অনুসারে বিশ পঁচিশ টাকার বেশী ছিল না) তুষ্ট থাকবেন। তিনি তাঁর উস্তাদ হেলালী সাহেবের কাছে এ ইচ্ছার কথা ব্যক্ত করেন, যিনি তাঁর আরবী যোগ্যতা সম্পর্কে সম্যক অবগত ছিলেন। সম্ভবত হেলালী সাহেব সাইয়েদ সাহেবের সাথে এ বিষয়ে কথা বলেন, কিন্তু তিনি সাইয়েদ সাহেবের এ ব্যাপারে চিন্তাভাবনা এবং প্রতিক্রিয়া কি তা হযরত মাওলানার কাছে উল্লেখ করেননি। শুধু তাঁকে বলেছিলেন "তোমার জন্য দারুল উলূমই উপযুক্ত জায়গা।" এ প্রসঙ্গে হযরত মাওলানা তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন যে, "তখন পর্যন্ত লেখালেখি ও রচনার জগতে আমার উল্লেখযোগ্য কোন যোগ্যতার প্রকাশ ঘটেনি। আর দারুল মুছান্নিফীন হল রচনা ও গবেষণার অনেক উন্নত প্রতিষ্ঠান। তবে আসল কথা হল হুকমতে ইলাহী।

তিনি বলেন, দারুল মুছান্নিফীনকে যদি আমার কর্মক্ষেত্র হিসাবে নির্বাচন করা হত তবে আমার জীবনের ভিত্তি অন্যভাবে রচিত হত এবং আমার সমস্ত ব্যস্ততা ও অল্পবিস্তর যোগ্যতা শুধু লেখালেখি ও গবেষণার কাজেই সীমাবদ্ধ হয়ে যেত।

১৯৩২ সালে দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামা থেকে হযরত মাওলানা সাইয়েদ সুলায়মান নদভী (রহ.)-এর পরামর্শ ও নির্দেশনায় 'আয-যিয়া' নামে একটি আরবী পত্রিকা বের হয়। সম্পাদক নিযুক্ত হন মাওলানা মাসউদ আলম নদভী। মাওলানা আলী মিয়াঁ তাতে একজন নিয়মিত লেখক ও সহযোগী হিসাবে কাজ করতে থাকেন। তাঁর এই লেখালেখি ও সহযোগিতা ছিল সম্পূর্ণ অবৈতনিক। ১৯৩৪ সালে শায়খ তাকীউদ্দীন হেলালী নদওয়া ছেড়ে ইরাকে চলে গেলে মাওলানা মাসুদ আলম শায়খের সান্নিধ্যে যেতে চাইলেন। আর স্থলাভিষিক্ত করে যাওয়ার জন্য মনোনীত করলেন মাওলানা আলী মিয়াঁকে। মাওলানা আলী মিয়াঁ তখন লাহোরে হযরত মাওলানা লাহোরীর সান্নিধ্যে অবস্থান করছিলেন। মাওলানা মাসউদ আলম নদভী পত্র মারফত তাকে নদওয়ায় উক্ত পদে কাজ করার জন্য আহ্বান জানান। সে মতে ১৫ই জুলাই ১৯৩৪ সালে পরিচালনা পরিষদের বৈঠকে মাওলানা আলী মিয়াঁকে দারুল উলূমের একজন শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়। মাসিক সম্মানী ধার্য হয় চল্লিশ টাকা। প্রকৃতপক্ষে পত্রিকা সম্পাদনার কাজেই তাকে নিয়োগ দেওয়া হয়। তবে অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে কয়েকটি দরসও দিতে বলা হয়। নিয়মতান্ত্রিক মুদাররিস হিসেবে তাকে নিয়োগ দেয়া হয় ১২ জুলাই ১৯৩৫ সালে।

দারুল উলূমে আসার পর হযরত মাওলানাকে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীর কিছু কিতাব পড়াতে দেয়া হয়। ইতিপূর্বে যা অধিকাংশই হযরত মাওলানা আব্দুর রহমান কাশগড়ী (রহ.) পড়াচ্ছিলেন। তিনি দারুল উলূমের একজন শ্রেষ্ঠ পন্ডিত ব্যক্তি এবং আরবী ভাষায় দক্ষ কবি ও সাহিত্যিক ছিলেন। আল্লামা কাশগড়ী পরবর্তীকালে কলকাতা আলিয়া মাদরাসায় যোগদান করেন। ভারত বিভক্তির পর তিনি ঢাকা আলিয়ায় চলে আসেন। ঢাকায়ই তিনি ইন্তেকাল করেন।

প্রথম বছর তাকে কুরআন মজীদের প্রথম দশ পারা, তিরমিযী শরীফ ২য় খন্ড, খাজারীর 'তারিখুল উমামিল ইসলামিয়্যাহ' ১ম অংশ এবং হামাসার 'বাবুল আদব ওয়াল নিয়াবি ওয়াল মারাসি' পড়াতে দেয়া হয়। প্রাথমিক

শ্রেণীতে মিসরের আরবী পাঠ্যপুস্তক 'আল কেরাআতুর রাশীদা' অথবা কামেল কীলানির 'হেকায়াতুল আতফাল'-এর এক অংশও দেয়া হয়েছিল।

দারুল উলূমের প্রশাসনিক ভবনের উত্তর-পশ্চিমাংশের অসম্পূর্ণ গম্বুজের পাশের কামরায় হযরত মাওলানার থাকার ব্যবস্থা হয়, যেখানে পূর্বে দারুল উলূমের প্রখ্যাত মুহতামিম শামসুল ঊলামা মাওলানা হাফিজুল্লাহ সাহেব বান্দুলী (রহ.) (যিনি ছিলেন ফখরুল মুতাআখখিরীন মাওলানা আব্দুল হাই সাহেব ফিরিংগী মহল্লী (রহ.)-এর একজন বিশিষ্ট ছাত্র) দীর্ঘকাল অবস্থান করেছিলেন। এ কামরাতে মাওলানা মাসউদ আলম নদভীও থাকতেন। তার কারণে তা তাদের থাকার কামরাও ছিল আবার 'আয-যিয়া' (আরবী পত্রিকা)-এর দফতরও ছিল। তাদের দু'জনের মধ্যে এমন মিল ছিল যে, যেন বড়-ছোট ভাই, অন্তরঙ্গ বন্ধু, সব সময়ের সঙ্গী, সব কাজে পরিপূরক।

হযরত মাওলানার দরসে কুরআনের ক্লাসে বেশ কয়েকজন প্রতিভাবান ও মেধাবী ছাত্র ছিল। অধিকাংশই বয়সে তাঁর বড় কিংবা সমবয়সী ছিল। তারা একজন বিদগ্ধ ও অভিজ্ঞ উস্তাদের (মাওলানা কাশগড়ী রহঃ) কাছে কুরআনে কারীমের সে অংশটি পড়েছিল, যে অংশে আহকাম, আকায়েদ এবং ফিকহী আয়াত অপেক্ষাকৃত বেশী। তাই তাঁর জন্য অধ্যয়ন ও মেহনতের মাধ্যমে নিজেকে এ মূল্যবান দরসের উপযুক্ত প্রমাণের প্রয়োজন ছিল। মাওলানা মাসউদ আলম সাহেব ইখলাস ও সহমর্মিতা বশতঃ ছাত্রদের প্রতিক্রিয়া তাকে জানাতেন এবং মনে মনে চাইতেন, তিনি যেন অযোগ্য প্রমাণিত না হন।

ছাত্ররা এক রকম সন্তুষ্টি প্রকাশ করে কিছু প্রশংসাও করেছিল; কিন্তু তিনি ভদ্রতার সাথে ইঙ্গিত দিয়েছিলেন যে, আরো ব্যাপক অধ্যয়নের প্রয়োজন। মাসউদ সাহেব তাঁকে এ সম্পর্কে অবগত করান। তিনি কুতুবখানা থেকে তাফসীরের প্রাচীন বড় বড় কিতাব এবং গুরুত্বপূর্ণ ও বুনিয়াদী গ্রন্থাদি সংগ্রহ করলেন। কিছু কিছু তাফসীরের কিতাব যেমন- কাশশাফ, মাআলেমুত তানযীল এবং মাদারেক শব্দে শব্দে অধ্যয়ন করেন। তাফসীরের নতুন গ্রন্থসমূহ; যেমন- তাফসীরুল মানার ও মাওলানা আযাদ রচিত তরজুমানুল কুরআন থেকে তিনি পুরোপুরি সহায়তা নেন। দরসে ছাত্রদের প্রশ্নের জবাব প্রদানে আল্লামা আলূসী (রহ.)-এর রুহুল মা'আনী সবচেয়ে বেশী কাজে লাগত। আধুনিক জ্ঞান ও তুলনামূলক অধ্যয়নের জন্য মাওলানা আব্দুল মাজেদ দরিয়াবাদী (রহ.)-এর সাথে তিনি পত্র যোগাযোগ শুরু করেন এবং নতুন নতুন প্রশ্নের সমাধানে তাঁর সাহায্য কামনা করেন। এজন্য তিনি

কয়েকবার দরিয়াবাদ সফর করেন এবং মাওলানা দরিয়াবাদীর ইলমী মজলিসে অংশগ্রহণ করেন। তিনি অধ্যবসায় ও গভীর মনোযোগ সহকারে দরসের জন্য সর্বোত্তম প্রস্তুতি গ্রহণ করেন এবং আল্লাহর ইচ্ছায় শিক্ষা বছর শেষ হওয়ার পূর্বেই ছাত্রদের পুরোপুরি আশ্বস্ত করতে সক্ষম হন।

দারুল উলূমের সাধারণ পরিবেশ

এ সময় হেলালী সাহেবের উপস্থিতির কারণে, বিশেষ করে 'আয-যিয়া'-এর কার্যক্রম ও কিছু তরুণ উস্তাদের প্রভাবে (যাদের কাছে ছাত্রদের আসা-যাওয়া ছিল এবং তাদের কাছে ছাত্রদের প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রণ করার যোগ্যতাও ছিল) গোটা দারুল উলূমে আরবী ভাষা-সাহিত্য রচনা ও বক্তৃতা, উর্দূ সাহিত্য ও ইতিহাস অধ্যয়ন ও চর্চার এক সুন্দর পরিবেশ গড়ে ওঠে এবং এই মানসিকতাই প্রাধান্য বিস্তার করে। 'আয-যিয়া'-এর বদৌলতে মিসরের 'আল-ফাতাহ', সিরিয়ার 'আল-ইরফান', লেবাননের 'আস-সাফা', উস্তাদ আহমাদ হাসান আয-যায়্যাতের 'আর-রিসালাহ', ডঃ আহমাদ আমীনের 'আস-সাকাফা' (যাতে মিসরের প্রখ্যাত, নির্বাচিত কলামিস্ট ও সাহিত্যিক বৃন্দের রচনা ও প্রবন্ধ প্রকাশিত হত) দারুল উলূমে নিয়মিত আসত। 'আয-যিয়া' ভারতের একমাত্র আরবী পত্রিকা হওয়ার কারণে তাতে অনেক প্রখ্যাত ব্যক্তির আরবী কিতাব ও প্রবন্ধ, মন্তব্য ও সমালোচনার জন্য আসত।

হযরত মাওলানা লিখেছেন, "আমাদের তখনকার সেই ছোট কামরা ও ক্ষুদ্র পরিবেশকে মনে হচ্ছিল বিশাল ভারতীয় সমুদ্রে একটি আরবী দ্বীপ। এ ধরনের অধ্যয়ন ও পরিবেশের কারণে মিসর-সিরিয়ার কলামিষ্ট-সাহিত্যিক, গবেষক, প্রবন্ধকার ও সাংবাদিকগণ দারুল উলূমের শিক্ষা সমাপনকারী চিন্তাশীল ছাত্র-উস্তাদের সম্পর্কে এ পরিমাণে অবগত ও পরিচিত ছিলেন, যে পরিমাণে পরিচিত ছিলেন ভারতের প্রখ্যাত কবি, সাহিত্যিক, সমালোচক ও প্রাবন্ধিকগণের সাথে। বরং কিছু কিছু বৈশিষ্ট্যের কারণে অন্যদের তুলনায় দারুল উলূমের সাহিত্যিক ও কলামিস্টবৃন্দ বেশী পরিচিত ছিলেন। তাঁরা নির্দ্বিধায় তাদের গুণাবলী, দোষত্রুটি, দ্বীনী ও চিন্তাগত ভ্রান্তি সম্পর্কে পর্যালোচনা করতেন এবং মর্যাদা ও স্তর চিহ্নিত করতেন। হযরত মাওলানা বলেন, এর পুরোপুরি উপকার আমি তখন অনুভব করেছিলাম যখন ১৯৫১ সালে আমি মিসরে সফরে গেলাম। সেখানের কোন ব্যক্তিই আমার জন্য নতুন, যাদুকরী ও প্রভাব সৃষ্টিকারী ছিল না। সেখানে আমার কাছে নতুন কোন রহস্যও উন্মোচিত হয়নি। বহিঃর্বিশ্বের এসব রাষ্ট্রে (যাদের সভ্যতা ও

সাংস্কৃতিক উন্নতি এবং জ্ঞান বিজ্ঞানের উৎকর্ষতা মন-মস্তিষ্কে ছেয়ে থাকে) দ্বীনের একজন খাদেম ও মুবাল্লিগের জন্য এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরী বিষয় যে, কোথাও যাওয়ার পূর্বে সে সেখানকার শিল্প-সাহিত্য সম্পর্কে সমালোচনামূলক রচনা অধ্যয়ন করবে এবং সেখানকার শিরা-উপশিরা সম্পর্কে অবগত হবে।

এ সময়ের একটি আকর্ষণীয় ঘটনা। "আঞ্জুমানে ইসলাহ" আরবীতে একটি বড় ধরনের বিতর্ক প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। এর বিষয়বস্তু ছিল من هو اكبر رجل فى العالم الاسلامى মুসলিম বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি কে? তরুণ প্রতিযোগীরা অত্যন্ত আবেগ-উদ্দীপনার সাথে এতে অংশগ্রহণ করে, যেন মুসলিম বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি নির্বাচন এখনই করা প্রয়োজন এবং তার মস্তকে ভক্তি ও শ্রদ্ধার তাজ এখনই পরাতে হবে। এ বিতর্ক অনুষ্ঠানে সিরিয়ার একজন সাংবাদিক ইউনুস খায়রুদ্দীন দামেশ্‌কী উপস্থিত ছিলেন (যিনি দারুল উলূম পরিদর্শনে এসেছিলেন)। মাসউদ সাহেবের অভিমত এবং তখনকার অনুষ্ঠানের সভাপতি হযরত মাওলানার সিদ্ধান্ত অনুসারে আমীর শাকীব আরসালান মুসলিম বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হিসাবে নির্বাচিত হয়েছিলেন। প্রতিযোগীদের অধিকাংশই তার পক্ষে মতামত দিয়েছিলো। সে সময় হযরত আলী মিয়াঁ 'হাযেরুল আলামিল ইসলামী'-এর নতুন পাঠক ছিলেন এবং 'আল-ফাতাহ'য় প্রকাশিত আমীরের অগ্নিঝরা ও আবেগঘন প্রবন্ধ পাঠে অভ্যস্ত ছিলেন। এ কারণে তাঁর সাথী-সঙ্গীদের মন-মস্তিষ্কে আমীর শাকীবের নামই আসন গ্রহণ করেছিল। এ জলসার সংবাদ মিসরে পৌঁছে গিয়েছিল।

আমীর শাকীব আরসালান, মাসউদ সাহেবের কাছে ব্যক্তিগত পত্র লিখেছিলেন। তাতে তিনি তাঁর না দেখা ভক্তদের সুধারণার শুকরিয়া আদায় করেছিলেন, কিন্তু স্পষ্ট শব্দে বিনম্রতার সাথে লিখেছিলেন যে, এ দূর্লভ সম্পদ মূলতঃ বর্তমান যুগের প্রখ্যাত মুজাহিদ গাজী আব্‌দুল করীম আরীফীর ব্যক্তিত্বের সাথেই মানানসই। যিনি খোদা প্রদত্ত তীক্ষ্ণ মেধা ও জেহাদী প্রেরণার দ্বারা ফ্রান্স এবং স্পেনের অলিগলিকে আন্দোলিত করেছেন। আমীর সাকীব তাঁর "আস-সাইয়েদ রশীদ রেজা ওয়া আখা আরবাইনা সানাহ" (আল্লামা রশীদ রেজা ও চল্লিশ বছরের ভ্রাতৃত্ব) গ্রন্থে এ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানের উল্লেখ করেছেন। এর মাধ্যমে তখনকার নদওয়ার ছাত্রদের চিন্তা-চেতনার প্রসারতা, অধ্যয়ন ও রুচি অনুমান করা যায়।

আরবী শিক্ষার এক নতুন অভিজ্ঞতা

দারুল উলূমে আরবী ভাষা শিক্ষার পরিবেশ, শায়খ তাকীউদ্দীন হেলালীর শিক্ষা পদ্ধতি (যিনি কোন ভাষা শিক্ষার জন্য অন্য ভাষার সাহায্য নেয়াকে মৌলিকভাবে ভুল মনে করতেন) এবং উস্তাদ মুহাম্মাদ আল- আরাবীর দিবারাত্রির সাহচর্যের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ায় হযরত মাওলানা নদভীসহ অন্যদের ইচ্ছা হল, আরবী ভাষা শিক্ষার জন্য সরাসরি পদ্ধতির অনুসরণ করে দেখা যাক।

হযরত মাওলানা তাঁর বড় ভাইয়ের অনুমতি ও উৎসাহ এবং মুহতামিম সাহেবের মঞ্জুরী নিয়ে প্রাথমিক স্তরের একদল ছাত্রকে নিজের কাছে রাখলেন, অন্য আরেকদল ছাত্রকে দারুল উলূমের কিছু অভিজ্ঞ ও সম্মানিত উস্তাদের কাছে প্রাচীন পদ্ধতিতে সোপর্দ করা হল। অবশেষে হযরত মাওলানার বড় ভাই উভয় দলের পরীক্ষা নেন এবং হযরত মাওলানার দলকে বিজয়ী ঘোষণা করেন। এ পদ্ধতিতে ছাত্রদেরতো উপকার হয়েছিলই কিন্তু তার চেয়ে বেশী উপকার হয়েছিল হযরত মাওলানার নিজের। এরই মাধ্যমে আরবী ভাষায় কথা বলার সাবলীলতা এবং বক্তব্য রাখার অনুশীলন হয়েছিল। ফলে দাওয়াতের ময়দানে আল্লাহ তায়ালা হযরত মাওলানাকে যে খেদমতের সৌভাগ্য দান করেছিলেন তার ভিত্তি রচিত হয়েছিল এখান থেকেই।

কিছু স্বভাবগত কারণে, আবার কিছু পরিবেশের কারণে যে সময় দরসের ছাত্রদের সাথে হযরত মাওলানার হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল, (যা উপকার গ্রহণ ও প্রদানের অন্যতম শর্ত) পড়া গুলিয়ে ছাত্রদের মুখে তুলে দেয়ার এক প্রবল প্রেরণা তখন হযরত মাওলানার হৃদয়ে জেগে উঠেছিল। যা তিনি প্রিয় উস্তাদ শায়খ খলীল আরব থেকে লাভ করেছিলেন। সময় ও স্থানের কোন শর্ত ছিল না। মাদরাসার নিয়ম কানুন রক্ষা করে ছাত্রদের সর্বোতভাবে আরবী শিখানো ও অনুশীলনের উপর হযরত মাওলানা গুরুত্ব আরোপ করতেন এবং এর জন্য নতুন নতুন পদ্ধতি অবলম্বনে মেধা ও বুদ্ধি কাজে লাগাতেন। শায়খ তাকীউদ্দীন আল-হেলালীর ছোট ভাই উস্তাদ মুহাম্মাদ আল-আরাবী থেকে তিনি এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা নিতেন।

অন্যান্য দরস ও কিতাব

হযরত মাওলানা আরবী শিক্ষার ক্লাস ছাড়া অন্য ক্লাসগুলো অত্যন্ত সাফল্যের সাথে পরিচালনা করছিলেন। মাওলানা হায়দার হাসান খান (রহ.) তিরমিযীর ছাত্রদের কাছে তাদের প্রতিক্রিয়া জিজ্ঞেস করতেন। একবার তিনি ছাত্রদের প্রতিক্রিয়া অবগত হয়ে আশ্বস্ত হন এবং হযরত মাওলানার ব্যাপারে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। হযরত মাওলানা এক শ্রেণীতে মানতেকের ক্লাস নিতেন। নতুন ও পুরাতন মানতেকী পরিভাষার নিয়ম; যেমন- দালালাতে মুতাবেকী, দালালাতে তাজাম্মুনী, দালালাতে এলতেযামী ইত্যাদির উদাহরণ বাস্তব ও চাক্ষুস বিষয় দ্বারা দিতেন। মৌলভী ডেপুটি নাজির আহমাদ সাহেবের গ্রন্থ "মাবাদিউল হিকমাহ" থেকে তিনি এ ব্যাপারে সাহায্য নিতেন। সম্ভবত দ্বিতীয় বছরেই আরবী সাহিত্যের ইতিহাস ক্লাসটি হযরত মাওলানাকে সম্পূর্ণভাবে দেয়া হয়। সপ্তম শ্রেণীতে উস্তাদ আহমদ হাসান আয-যাইয়াতের তারিখুল আদাবিল আরাবি (আরবী সাহিত্যের ইতিহাস) গ্রন্থটি পাঠ্যভুক্ত ছিল। বিষয়টি হযরত মাওলানার প্রিয় ও পছন্দনীয় ছিল। তিনি লাগাতার বেশ ক'বছর এ বিষয়ে দরস দেন। দারুল উলূমের শিক্ষকতার শেষ কয়েক বছরে সহীহ বুখারীর কিতাবুল ওহী, কিতাবুল ঈমান এবং কিতাবুল ইলমের দরসও দেন। তিনি লেখেন, "এ সময় আমার মনে হত, যদি অধ্যয়ন ও মেহনতের সময় ও সুযোগ হয় তবে বুখারী শরীফ ইনশাআল্লাহ খুব ভালভাবে পড়াব।" আল্লাহর ইচ্ছায় এরপর হযরত মাওলানাকে এক বছর সম্পূর্ণ বুখারী শরীফ পড়ানোর দায়িত্ব দেয়া হয়। কিন্তু সফরের আধিক্য ও দৃষ্টিশক্তির দুর্বলতা হেতু এ ধারাবাহিকতা বজায় থাকেনি। এছাড়াও তিনি এক বছর হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগা পড়িয়েছিলেন।

প্রসঙ্গ ঃ দারুল উলূমের পরিবেশ, প্রতিষ্ঠাতা ও পথিকৃৎগণ

দুঃখের বিষয় সে সময় দারুল উলূমে দ্বীনী ও দাওয়াতী পরিবেশ ছিল না। তার আসল কারণ ছিল, যে সকল উস্তাদের দ্বারা ছাত্ররা প্রভাবিত ছিল তাদের রুচি ও মানসিকতায় দাওয়াতী মনোভাব ছিল না। হযরত মাওলানা ছাড়া যারা দ্বীনী ও দাওয়াতী চেতনা রাখতেন, সময়ের মূল্যায়ন করতেন, মা'মুলাতের পাবন্দ ছিলেন, তাদের মধ্যেও ছাত্রদের মাঝে দ্বীনী ও ইসলাহী প্রেরণা সৃষ্টি করার মত শক্তি ও যোগ্যতা ছিল না। সারা দারুল উলূমে জ্ঞানার্জন, সাহিত্যচর্চা, লিখন ও বক্তৃতা অনুশীলনের উষ্ণ আবহাওয়া বিরাজ করছিল। দারুল উলূমের সবচেয়ে আদর্শ ব্যক্তিত্ব, যাকে আদর্শ ও

অনুসরণযোগ্য মনে করা হত, যিনি ছাত্রদের স্বপ্নপুরুষ ছিলেন, তিনি ছিলেন আল্লামা শিবলী নোমানী (রহ.)। তাঁকে দারুল উলূমের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা ও নির্মাতা মনে করা হত। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, নদওয়ার জ্ঞান ও সাহিত্যের রূপ ও প্রকৃতি বিনির্মাণে বুনিয়াদি অবদান মাওলানা শিবলী নোমানীরই (রহ.)। তাঁর রচনা পদ্ধতিই তখন পর্যন্ত ভাবগম্ভীর ও জ্ঞানগর্ভ মতামত প্রকাশের সর্বাধিক উত্তম পদ্ধতি ছিল এবং এখন পর্যন্ত তা জীবন্ত ও দ্যেদীপ্যমান রয়েছে। আশা করা যায়, দীর্ঘকাল তা অম্লান থাকবে।

কিন্তু তার অর্থ এ নয় যে, একটি ঐতিহাসিক ও স্বীকৃত বাস্তবতাকে অস্বীকার করা হবে। মূলতঃ নদওয়াতুল উলামা আন্দোলন ছিল মাওলানা মুহাম্মদ আলী মুঙ্গেরী (রহ.)-এর স্বপ্ন ও তাঁর জীবনের একমাত্র আরাধনা। তিনিই তার প্রথম উদ্যোক্তা ও প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা। তাছাড়া নদওয়ার মাধ্যমে যে কৃষ্টির আবহ সৃষ্টি হয়েছে, নদওয়া দৃষ্টিভঙ্গীর প্রবক্তা ও নদওয়া ভাল যা কিছু ধারণ করে আছে তাতে মাওলানা শিবলী, মাওলানা হাকীম সাইয়েদ আব্দুল হাই, সদর ইয়ারজং মাওলানা হাবীবুর রহমান খান শিরওয়ানী এবং ফখরে নদওয়া মাওলানা সাইয়েদ সুলায়মান নদভী প্রমুখের তাতে অবদান ছিল এবং এরা সবাই তাঁর উত্তম নমুনা ও নিদর্শন ছিলেন। হযরত মাওলানা লেখেন, একটি শাখা তার মূল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া শুধুমাত্র তার প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা এবং উদ্যোক্তাদের বিস্মৃতই করে দেয় না; বরং তাদের সম্পর্কে অপরিচিতি ও সংকোচ উদ্রেক সৃষ্টির যে স্বাভাবিক ও স্বভাবগত প্রভাব সৃষ্টি করে এবং এতে যে বরকতহীনতা আসে তা বর্তমানে প্রচন্ডভাবে উপলব্ধি করছি।

মাওলানা সাইয়েদ সুলায়মান নদভী যিনি দ্বীনী চিন্তাধারায় অনেককে ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন, যার সমস্ত কর্মকান্ড, স্বাধীন মানসিকতা ও উদার দৃষ্টিভঙ্গি, গভীর অধ্যয়ন ও সমালোচনা শক্তির মাঝে সর্বদাই বংশীয় ও স্বভাবজাত ভদ্রতা প্রতিফলিত হত। যিনি নদওয়ার শুরু যুগে মাওলানা মুহাম্মাদ আলী মুঙ্গেরী (রহ.)-এর ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা পদে আসীন থাকা কালে শিক্ষা অর্জন করেছিলেন এবং যিনি নদওয়ার প্রতিষ্ঠা ও ক্রমবিকাশ নিকটে থেকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তিনি এ বাস্তবতাকে গভীরভাবে উপলব্ধি করেন এবং সুযোগ পেলেই এদিকে অন্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতেন। একবার শিক্ষা ভবনের দক্ষিণ সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় তিনি হযরত মাওলানাকে বললেন, মৌলভী আলী সাহেব, প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানেই এক বা একাধিক

উপযুক্ত ব্যক্তি থাকেন, যাদেরকে অনুসরণযোগ্য ও আইডিয়েল মনে করা হয়, যাদের অনুসরণে গর্ববোধ করা হয়। মুসলিম ইউনিভার্সিটি আলীগড়ে স্যার সাইয়েদ আহমাদ, নবাব মুহসিনুল মূলক, নবাব ওকারুল মূলককে আইডিয়েল মনে করা হয়। এ পর্যায়ে হযরত সাইয়েদ সাহেব দারুল উলূম দেওবন্দের নাম উচ্চারণ করেন এবং সেখানকার কয়েকজনের নাম বলেন। এরপর তিনি বলেন, আপনারা নদওয়ার ছাত্রদের সামনে আইডিয়েল কাউকে পেশ করুন

আইডিয়েল হিসেবে দারুল উলূমের চারজনের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে– মাওলানা সাইয়েদ মুহাম্মাদ আলী মুঙ্গেরী, মাওলানা সাইয়েদ আবদুল হাই, নবাব সাইয়েদ আলী হাসান খান। এরপর বলেন, আপনার পিতা এদের সবার সমস্ত গুণের সমন্বিতরূপ ছিলেন। তিনি আধ্যাত্মিকতায়ও সমৃদ্ধ ছিলেন, যোগ্য আলেমও ছিলেন, উর্দু-আরবীর প্রাঞ্জলভাষী ও সুসাহিত্যিক ছিলেন, বহু গ্রন্থ রচয়িতাও। তাকে ছাত্রদের সামনে আইডিয়েল হিসাবে পেশ করুন।

হযরত মাওলানা বলেন, সময়ের ব্যবধানে সাইয়েদ সাহেবের বলা শব্দগুলো কিছুটা হয়ত পরিবর্তিত হয়ে গেছে, কিন্তু ভাবার্থ একই রকম ছিল। অবস্থা এ রকম ছিল যে, সন্তান হেতু আমি পিতার গুণাগুণ ছাত্রদের সামনে উপস্থাপন করতে পারতাম না। যদি উপস্থাপন করতামও কেউ প্রভাবিত হতো না। শিক্ষকদের মধ্য থেকে মাওলানা আবদুস সালাম সাহেব কিদওয়ায়ী ছাড়া অন্যরা এ বাস্তবতার সাথে পরিচিত ছিলেন না, একে স্বীকারও করতেন না এবং সভা ও জলসায়-এর আলোচনাও করতেন না। ফলে প্রতিটি মেধাবী ছাত্রই মাওলানা শিবলীর অনুকরণে গ্রন্থ প্রণেতা, ঐতিহাসিক, সাহিত্যিক ও সমালোচক হওয়ার স্বপ্ন দেখতো এবং প্রাচীন দ্বীনী প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা কারিকুলাম ও শিক্ষা সিলেবাস এবং বাইরের মহান ব্যক্তিদের সম্পর্কে হয় অনবগত ছিল অথবা তাদের সম্পর্কে তুচ্ছ ও নিচু মানসিকতা পোষণ করত। মাওলানার বড় ভাইও এ পরিবেশে বেদনাবোধ করতেন এবং দ্বীনী ও রূহানী ব্যক্তিত্ব ও আলেমদের সাথে ছাত্রদের সম্পৃক্ত করতে চাইতেন। কিন্তু বহু বছরের প্রভাব, যার শিকড় বহু গভীরে প্রোথিত হয়েছিল। অল্প ক'বছরে তা উপড়ানো সম্ভব ছিল না। তাছাড়া সে সময় এমন কোন দ্বীনী দাওয়াত ও আন্দোলনের আত্মপ্রকাশও ঘটেনি যা তরুণ ছাত্রদের প্রভাবিত ও আকৃষ্ট করতে পারে এবং যার সাথে সম্পৃক্ততা ও অংশগ্রহণের পরামর্শ দেয়া যেতে পারে।

ছাত্রদের কিছু বৈশিষ্ট্য

সে সময়ের ছাত্রদের মাঝে যদিও স্বাধীনতা ও বেপরওয়া ভাব, আমলী দুর্বলতা এবং স্কুল-কলেজের ছাত্রদের অনুকরণপ্রিয়তা ছিল, কিন্তু উঁচু খান্দানের সাথে সম্পৃক্ততা, দ্বীনদার মুসলমান পরিবারের সন্তান হওয়াতে তাদের মাঝে তখনও পুরোনো আমলের রেওয়াজ ও ভদ্রতা বিদ্যমান ছিল। তাছাড়া বিহার ও উত্তর প্রদেশের সেসকল প্রখ্যাত ও মর্যাদাসম্পন্ন পরিবারের সাথে সম্পৃক্ততার কারণে– যাদের মাঝে স্ব স্ব যুগে বড় বড় উলামা-মাশায়েখ এবং যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গের জন্ম হয়েছে। মেধা, ভদ্রতা, সহনশীলতা ও সহমর্মিতা, আত্মোপলব্ধি, বড়দের সম্মান, উস্তাদদের প্রতি বিনয়-নম্র ব্যবহার ইত্যাদি গুণগুলি তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়েছিল। তারা অহেতুক ও মূল্যহীন আচরণ পরিহার করে চলত। নিচের জামাআতের ছাত্ররা উপর জামাআতের ছাত্রদের এক রকম উস্তাদের মর্যাদা দিত। উপর ক্লাসের ছাত্ররা নিচের ক্লাসের ছাত্রদের ভুল-ভ্রান্তি নিঃসংকোচে শুধরে দিত। অল্প পরিশ্রমে বড় ও ভাল ফলাফল করার যোগ্যতা তাদের ছিল। বাইরের বড় কোন ব্যক্তিত্বের প্রভাবে তাদের দৃষ্টি অবনমিত হত না। বিত্তবান, নেতা, পদস্থ কর্মকর্তাদের প্রভাব ও ভীতি তাদেরকে কাবু করত না। সে যুগে ছাত্রদের মাঝে কিছু দুর্বলতাও ছিল। আবার এমন কিছু সৌন্দর্যও ছিল যা আজকের যুগে দ্বীনী ও শিক্ষাগত উন্নতি ও বিশিষ্টতা সত্ত্বেও সাধারণতঃ গোচরীভূত হয় না।

মাওলানার দরসে কুরআন

হযরত মাওলানা বলেন– আমার শিক্ষকতাজীবন শুরু হয় দরসে কুরআনের মাধ্যমে। ১৯৩৪ সালের পর দারুল উলূমের গুরুত্বপূর্ণ ক্লাসগুলো আমাকে সোপর্দ করা হয়। ১৯৩৯-৪০ সালের মাঝামাঝি সময়ে আমি অনুভব করতে শুরু করি যে, ছাত্ররা কুরআন অধ্যয়ন ও তার থেকে সঠিক উপকারিতা অর্জনে অনেক প্রাথমিক জ্ঞান ও নীতিমালার সাথে অপরিচিত। এই অনবগতির কারণে তারা সঠিকভাবে কুরআনের উদ্দেশ্য, কুরআনিক শিক্ষা, কুরআনের আবেদন ও তার রূহ এবং তার উচ্চাঙ্গ সাহিত্য ও বালাগাত পুরোপুরি অনুধাবনে সক্ষম নয়, কিংবা তাদের জানার পরিধি সাধারণ ও প্রাথমিক পর্যায়ের। নিজের বাস্তব অভিজ্ঞতা এবং কয়েক বছর দরসে কুরআনের খেদমত আঞ্জাম দেয়ার পর আমি এই তাগাদা অনুভব করি যে, তাফসীরের উপরের ক্লাসের ছাত্রদের জন্য কিছু এমন প্রবন্ধ তৈরী করি যা

কুরআন গবেষণার জন্য সহযোগী, তার মর্যাদা ও মাহাত্ম্য প্রমাণে সহায়ক প্রমাণিত হয়। তাই ১৯৩৮-৩৯ সালে ধারাবাহিক কিছু লেখায় সচেষ্ট হই, যার শিরোনামগুলি ছিল নিম্নরূপঃ

১. কুরআনের ভাষায় কুরআনের পরিচিতি। ২. কুরআন শরীফ থেকে উপকারিতা অর্জনের শর্ত এবং তার প্রতিবন্ধকতা, ৩. কুরআনের এ'জায তথা অলৌকিকতা, ৪. কুরআনের মৌলিক আলোচ্য বিষয়, ৫. কুরআন মজীদের ভবিষ্যদ্বাণী, বিশেষতঃ রোমের বিজয়ী হওয়ার ভবিষ্যদ্বাণী, ৬. মৌলিক আকায়েদ, তাওহীদ, রেসালাত, পরকাল, ৭. আরকান চতুষ্টয় (এর সমাপ্তি অনেক পরে হয়েছে)

ছাত্ররা এসব বিষয়ের আলোচনা ক্লাসে লিখে নিত। পরে ১৯৪০ সালে যখন 'আন-নদওয়া' মাসিক ম্যাগাজিনের প্রকাশনা শুরু হয়, তখন তা ধারাবাহিক প্রকাশের ব্যবস্থা হয় এবং সর্বত্র সমাদৃত হয়। এরপর দীর্ঘ সময় এসব বিষয়ে কলম ধরা এবং প্রকাশের ব্যবস্থা করার আগ্রহ ছিল না। ধরে নেয়া হয়েছিল এসবের পান্ডুলিপি হারিয়ে গেছে। ১৯৮১ সালে হঠাৎ স্নেহভাজন মৌলভী সাইয়েদ মুহাম্মাদ তাহের (সহকারী নাযেম, নদওয়াতুল উলামা)-এর কামরায় অবস্থানকারী দারুল উলূমের ছাত্ররা এই পান্ডুলিপি আবিষ্কার করে। আমি তাতে দ্বিতীয়বার দৃষ্টি বুলাই এবং কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ 'জ্ঞান ও ইতিহাসের কষ্টি পাথরে কুরআন মজীদ এবং পূর্ববর্তী আসমানী গ্রন্থ' তেলাওয়াত ও চিন্তা-গবেষণার কিছু নমুনা' 'এক অভিজ্ঞতা ও এক পরামর্শ' সংযোজন করি এবং তা মৌলভী সাইয়েদ মুহাম্মাদ হামযা নদভী আমা থেকে নিয়ে 'কুরআনের নীতিমালা' নামে মাকতাবায়ে ইসলাম থেকে প্রকাশ করে। এ কিতাব কুরআন মজীদ অধ্যয়নকারীদের জন্য বিদগ্ধতা অর্জনে অত্যন্ত মূল্যবান এবং আরবী মাদরাসাগুলোতে পাঠ্যভুক্ত করার উপযোগী।

দামেশ্‌ক ইউনিভার্সিটিতে ভিজিটিং প্রফেসর হিসেবে

১৯৫৫ সালে দামেশ্‌ক ইউনিভার্সিটিতে শরীয়া বিভাগ খোলা হলে তার প্রথম বিভাগীয় প্রধান হন উস্তাদ মোস্তফা সুবায়ী। ডঃ মোস্তফা সুবায়ী মুসলিম বিশ্বের খ্যাতনামা উলামা ও মুসলিম পন্ডিত ব্যক্তিদেরকে তাঁর প্রতিষ্ঠানে উপস্থিত করার প্রবল আকাঙ্ক্ষা রাখতেন। ভারত উপমহাদেশ থেকে এ পদের জন্য হযরত মাওলানা আবুল হাসান আলী নদভী (রহ.)-কে দাওয়াত দেওয়া হয়। হযরত মাওলানা তাঁর বিভিন্ন ব্যস্ততার কারণে স্থায়ীভাবে

অধ্যাপনার পরিবর্তে ভিজিটিং প্রফেসর হিসেবে দাওয়াত কবুল করেন। কোন ভারতীয় আলেমের জন্য আরব দেশের ইউনিভার্সিটিতে প্রফেসর হিসেবে যোগ দেয়াটা শুধু হযরত আলী মিয়াঁর জন্য নয়; বরং উপমহাদেশীয় আলেম সমাজের জন্যও এক বিরল সম্মান বয়ে এনেছিল।

ইতিপূর্বে মাওলানা ১৯৫১ সালে দামেস্কে প্রথম সফর করেছিলেন। এটা ছিল তাঁর দ্বিতীয় সফর। তিনি দামেশ্‌ক উপস্থিত হন এবং ১৯৫৬ সালের ৪ঠা এপ্রিল থেকে ইউনিভার্সিটির কেন্দ্রীয় হলে লেকচার শুরু করেন। প্রথম লেকচার ছিল, 'আত-তাজদীদ ওয়াল মুজাদ্দেদুন ফি তারিখি ফিকরিল ইসলামী'। হযরত মাওলানার জন্য এ বিষয়টি নির্ধারণ করা এজন্য সহজ হয়েছিল যে, ঐ সময় তিনি লাখনৌতে 'তারিখে দাওয়াত ওয়া আযীমাত' বইখানি লেখা শুরু করেছিলেন। এর প্রথম খন্ড তৈরী হয়ে গিয়েছিল। ইউনিভার্সিটির দাওয়াত পাওয়ার সাথে সাথেই তিনি আরবী প্রবন্ধের অধিকাংশই তৈরী করে ফেলেন।

তিনি ঐ সময় প্রায় তিন মাস দামেস্কে অবস্থান করেছিলেন এবং মোট আটটি বিষয়ে লেকচার প্রদান করেছিলেন। তাঁর বক্তব্যের বিষয় ছিল 'ইসলামের ইতিহাসে সাংস্কারিক কার্যক্রম এবং তার বিশ্ববিশ্রুত ব্যক্তিবর্গ'। তিনি কয়েক শতাব্দীর বেশ ক'জন বিখ্যাত মুজাদ্দেদের কার্যক্রমের প্রেক্ষাপট তাঁর বক্তৃতায় তুলে ধরেন। তিনি অত্যন্ত সুনামের সাথে তাঁর এ সফর শেষ করেন। ঐ সময় ইখওয়ানের আলেম ডঃ সাঈদ রমযান সিরিয়ায় অবস্থান করছিলেন। হযরতের সাথে তাঁর ঘনিষ্ট পরিচয় হয়েছিল। হযরত মাওলানাকে তিনি খুবই কদর করতেন।

ভিজিটিং প্রফেসর হিসেবে মদীনা ইউনিভার্সিটিতে

১৯৬২ সালে মদীনা ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠিত হলেও এর দু'বছর আগে থেকে এই ইউনিভার্সিটির কার্যক্রম, চিন্তাধারা, সিলেবাস ইত্যাদি বিষয়ে সারা দুনিয়ার খ্যাতনামা ইসলামী চিন্তাবিদগণের দিক-নির্দেশনা নেয়ার জন্য সৌদী পত্রিকাসমূহে বিভিন্ন আলোচনা চলে আসছিল। এ ব্যাপারে ভারত থেকে হযরত মাওলানা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী (রহ.) পাকিস্তান থেকে জনাব আবুল আ'লা মওদুদীর নাম পত্র-পত্রিকায় জোরে-শোরে আসছিল। সুতরাং মদীনা ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠিত হলে অন্যদের সাথে এ বিখ্যাত দু'জন

ব্যক্তিত্বকে মজলিসে শূরায় স্থান দেয়া হয়। জনাব মাওলানা মওদূদী দু'বছর পর্যন্ত এর সদস্য ছিলেন এবং হযরত মাওলানা আলী মিয়াঁ ১৯৯৭ পর্যন্ত এর সদস্য ছিলেন।

ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর যেসব ইসলামী স্কলারকে এ ভার্সিটিতে অধ্যাপনার জন্য আহ্বান জানান হয়, তার মধ্যে হযরত আলী মিয়াঁ ছিলেন উল্লেখযোগ্য। গাড়ি, বাসা, ভাতা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধাসহ বর্তমানে প্রায় ৩০ হাজার রিয়ালের সম্মানজনক চাকুরীর দাওয়াত হযরত আলী মিয়াঁ শত ব্যস্ততার জন্য গ্রহণ করতে পারেননি। অবশ্য মদীনা ইউনিভার্সিটির প্রধান শায়খ মুহাম্মাদ বিন নাসের আল-আবুদী ও শায়খ আবদুল্লাহ বিন বায (রহ.)-এর অনুরোধে দু'মাসের জন্য ভিজিটিং প্রফেসর হিসেবে দাওয়াত কবুল করেন। ইতিপূর্বে তিনি অবশ্য মজলিসে শূরার বৈঠকে অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং মদীনা ভার্সিটির উদ্দেশ্য, নেসাবে তালিম ইত্যাদির উপর খুবই গুরুত্বপূর্ণ দিক-নির্দেশনা পেশ করেছিলেন।

১৯৬৩ সালের ১১ই মার্চ তিনি ভিজিটিং প্রফেসর হিসেবে মদীনা ভার্সিটিতে উপস্থিত হন এবং 'আন-নবুওয়াহ ওয়াল আম্বিয়া ফি যওইল কুরআন' শীর্ষক আলোচনাসহ ৮টি বক্তৃতা পেশ করেন। ৩০শে মার্চ থেকে তাঁর বক্তব্য শুরু হয়। শায়খ আবদুল্লাহ বিন বায ও অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তিগণও সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

==ooo==

অধ্যায়–৪
আধ্যাত্মিকতার সন্ধানে

হযরত মাওলানা আহমাদ আলী লাহোরীর খেদমতে

আল্লাহওয়ালাদের সোহবত হযরত আলী মিয়াঁ প্রথম জীবন থেকেই পেয়ে আসছিলেন। খানদানের মধ্যে বিদ্যমান বুযুর্গানে দ্বীনের সোহবতও তিনি লাভ করেছিলেন। কিন্তু তাঁর জীবনে যে মহান ব্যক্তিত্বের প্রভাব গভীরভাবে রেখাপাত করেছিল এবং যার সোহবতে তাঁর জীবনের মোড় পরিবর্তন হয়েছিল, তিনি হলেন শায়খুত তাফসীর হযরত মাওলানা আহমাদ আলী লাহোরী (রহ.)।

মাওলানা আলী মিয়াঁ তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন, "আমার জীবনের সবচেয়ে মোবারক ও পরম সৌভাগ্যের দিন ঐ দিন ছিল, যেদিন আমি আমার পরম প্রিয় মোরশেদ হযরত মাওলানা আহমাদ আলী লাহোরীর সন্ধান পেয়েছিলাম। হযরত লাহোরীর সন্ধান না পেলে আমার জীবন বর্তমান অবস্থা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন হত। আর সম্ভবতঃ সে জীবনের মধ্যে শুধু সাহিত্য ও ইতিহাস সংকলন এবং লেখালেখি ব্যতীত অন্য কোন দিকের আকর্ষণ, ঝোঁক ও মহব্বত পাওয়া যেত না। খোদাপ্রাপ্তি ও আল্লাহ পাকের মা'রেফাত হাসিলের কোন জযবাও সে জীবনে পাওয়া যেত না।

মোরশেদের সোহবতে খোদাপ্রাপ্তির জওক, আল্লাহ পাকের নামের মাধুর্য উপলব্ধি, তাঁর আশেকগণের মহব্বত এবং নিজের মধ্যে ইসলাহের প্রয়োজনীয়তার অনুভূতি সৃষ্টি হয়েছিল।

হযরত মাওলানা লাহোরীর সংক্ষিপ্ত পরিচয়

জন্ম ঃ শায়খুত তাফসীর হযরত মাওলানা আহমাদ আলী লাহোরী (রহ.) ২রা রমযান ১৩০৪ হিজরী পাকিস্তানের গোজরাওয়ালা জেলার 'কসবায়ে জালালে' নও মুসলিম শেখ হাবিবুল্লাহর ঘরে জন্মগ্রহণ করেন।

শিক্ষা ঃ প্রাথমিক শিক্ষা তিনি নিজ এলাকার মাদরাসায় সমাপ্ত করেন। ঐ সময় বিখ্যাত বিপ্লবী আলেম মাওলানা উবায়দুল্লাহ সিন্ধী দেওবন্দ থেকে ফারেগ হয়ে পাত্তাজে তাশরীফ আনেন। তিনি শেখ হাবীবুল্লাহর আত্মীয় ছিলেন। শেখ হাবীবুল্লাহ তাঁর নয় বছরের সন্তান আহমাদ আলীকে দ্বীন

ইসলামের জন্য ওয়াকফ করেন এবং মাওলানা সিন্ধীর হাতে তাকে তুলে দেন। হযরত মাওলানা উবায়দুল্লাহ তাকে নিয়ে দীনপুর তাশরীফ নিয়ে যান। সেখানে তিনি তাঁর মোরশেদের কাছে শিশু আহমাদ আলীকে বায়আত করান। এরপর তিনি শাগরেদকে নিয়ে আমরুত শরীফ ও গোট পীরঝান্ডায় নিজের কাছে রেখে তালীম দিতে থাকেন। তিনি ১৩২৭ হিজরীতে দরসে নেযামী সম্পন্ন করেন।

কর্মজীবন ঃ ফারেগ হওয়ার পর হযরত মাওলানা সিন্ধি স্থাপিত পীরঝান্ডার মাদরাসা দারুল ইরশাদে তিনি শিক্ষক নিযুক্ত হন এবং হযরত সিন্ধির মেয়েকে বিবাহ করেন। ১৯০৯ সালে মাওলানা সিন্ধি দ্বিতীয়বার দেওবন্দে আসলে দারুল ইরশাদের দায়িত্ব হযরত লাহোরীর উপর ন্যস্ত করা হয়। পরে অবশ্য তিনি হযরত সিন্ধি প্রতিষ্ঠিত অন্য এক মাদরাসায় দরস দেয়া শুরু করেন। প্রথম সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরপরই শিশু ও মা এক সপ্তাহের মধ্যে ইন্তেকাল করে। এরপর হযরত সিন্ধির এক বন্ধুর মেয়েকে তিনি বিবাহ করেন। ১৩৩০ হিজরীর মুহররম মাসে দারুল উলূম দেওবন্দের মসজিদে হযরত শায়খুল হিন্দ এ বিবাহ পড়ান।

ঐ সময় মাওলানা উবায়দুল্লাহ সিন্ধি দেওবন্দে এসে ফুযালায়ে জমিয়তুল আনছার প্রতিষ্ঠা করেন। তখন সিদ্ধান্ত হয় যে, আলীগড় থেকে পাঁচজন গ্রাজুয়েট ছাত্রকে কুরআনে হাকীমের বিপ্লবী শিক্ষার সাথে পরিচয় করাবার জন্য একটি বিশেষ প্রতিষ্ঠান খোলা হবে। এ বিভাগটি নায্যারাতুল মা'আরিফিল কুরআনিয়া নামে দিল্লীতে প্রতিষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রতিষ্ঠানে পাঁচজন বিজ্ঞ আলেমকে ও গ্রাজুয়েটদেরকে একত্রিত করা হয়। হযরত মাওলানা সিন্ধি মাওলানা আহমাদ আলী সাহেবকে দিল্লীতে তাঁর মাদরাসায় ডেকে আনেন এবং প্রথম বর্ষের ছাত্র হিসেবে ভর্তি করেন। ঐ সময় হযরত লাহোরী মাওলানা উবায়দুল্লাহ সিন্ধির দরসী বক্তৃতাগুলি লিপিবদ্ধ করার অনুমতি লাভ করেন।

দরসে কুরআন ঃ কুরআনের ১৩তম পারার দরস 'চলাকালে হযরত শায়খুল হিন্দের রাজনৈতিক মিশন নিয়ে মাওলানা সিন্ধি কাবুল চলে গেলে হযরত মাওলানা লাহোরী এ প্রতিষ্ঠানের সকল দায়িত্বভার নিজের কাঁধে তুলে নেন। তিনি দু'বছর ধরে দরসে কুরআন দিতে থাকেন। ঐ সময় ভারতে বৃটিশ বিরোধী আন্দোলন তুঙ্গে ওঠে। নাযযারাতুল মা'আরিফে দরসে কুরআন দেয়া অবস্থায় হযরত লাহোরী গ্রেফতার হন, যার ফলে মাদরাসা বন্ধ হয়ে

যায়। বেশ কয়েকমাস বিভিন্ন জেলখানায় আটক থাকার পর বৃটিশ সরকার তাকে মুক্তি দেয়। কিন্তু শর্ত জুড়ে দেয় যে, তিনি সিন্ধু এলাকায় যেতে পারবেন না। বরং লাহোর এলাকায় থাকার জন্য তাঁর উপর পাবন্দী লাগানো হয়।

লাহোরে অবস্থান ঃ লাহোরে আসার পর তিনি জুম'আর খুতবা দিতেন এবং একটি মসজিদে কুরআনের দরস দিতেন। ঐ সময় তিনি হজ্জ করেন। প্রথম হজ্জের পরে তিনি আরো ১৩ বার হজ্জ করেন। হজ্জের পরে তিনি এক মুহাজের কাফেলার আমীর হয়ে কাবুল উপস্থিত হন। মাওলানা উবায়দুল্লাহ সিন্ধি সেখানেই অবস্থান করছিলেন। উস্তাদে মোহতারামের সাথে তাঁর দেখা হয়। হযরত আহমাদ আলী ১৯২০ সালে লাহোরে ফিরে আসেন। ১৯২২ সালে তিনি কুরআনে হাকীমের প্রচার-প্রসারের জন্য 'আঞ্জুমানে খুদ্দামুদ্দীন' নামে একটি প্রতিষ্ঠান কায়েম করেন। এরপর ১৯২৪ সালে মাদরাসা কাসেমুল উলূম কায়েম করেন। ১৯৪৫ সালে আঞ্জুমানের পক্ষ হতে একটি মহিলা মাদরাসা ও ১৯৫৫ সালে সাপ্তাহিক খুদ্দামুদ্দীন পত্রিকা চালু হয়।

তাফসীর প্রশিক্ষণ ঃ শায়খুত তাফসীর হযরত লাহোরীর দরসে কুরআন গ্রন্থখানি খুবই প্রসিদ্ধ। তাঁর দরসে কুরআন ১৯২৭ সালে প্রকাশিত হয়। বর্তমানেও পাওয়া যায়। ইংরেজী শিক্ষিত সাধারণ শ্রেণী ও ফারেগুত তাহসীল উলামা উভয়ের জন্য পৃথক পৃথক দরস হত। ফারেগ আলেমগণের জন্য শাবান থেকে ৩ মাসব্যাপী একটি কোর্স পরিচালনা করতেন। তিনি ছিলেন উপমহাদেশের বিপ্লবী আলেম হযরত মাওলানা উবায়দুল্লাহ সিন্ধির বিশেষ মুখপাত্র। হযরত লাহোরী শাহ ওয়ালী উল্লাহর হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগা গ্রন্থের দরস দিতেন। তিনি ছিলেন ওয়ালীউল্লাহী চিন্তাধারার বিপ্লবী কণ্ঠস্বর। হযরত মাওলানা আলী মিয়াঁ তাঁর দরসে অংশগ্রহণ করেই তাকে চিনে ফেলেছিলেন।

ইন্তেকাল ঃ হযরত লাহোরী একজন মুজাহিদে মিল্লাত ছিলেন। তিনি ১৩৮১ হিজরীর ১৮ই রমযান, মোতাবেক ১৯৬২ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারী লাহোরে ইন্তেকাল করেন।

শায়খুত তাফসীর হযরত মাওলানা আহমাদ আলী লাহোরীর দরসে কুরআন (তাফসীরের ক্লাস) খুবই প্রসিদ্ধ ছিল। বড় বড় মাদরাসার ফারেগ আলেমগণ দাওরার সনদ হাসেল করার পর হযরত লাহোরীর খেদমতে হাজির হয়ে তাফসীরের দরস গ্রহণ করতেন। হযরত মাওলানা মাদানী (রহ.)

শায়খুত তাফসীরের দরস সম্পর্কে বলতেন, "আপনারা আট বছর ধরে দেওবন্দে ইলম অর্জন করেছেন, কিন্তু আপনাদের তাকমীল মাওলানা আহমাদ আলী লাহোরীর দরসে তাফসীর থেকে হতে হবে।

আল্লাহ পাকের এক সিংহ লাহোরের শিরাওয়ালা গেইটে বসে আল্লাহ আল্লাহ যিকিরের মাধ্যমে সারা বিশ্বের মানুষের অন্তর নিজের দিকে আকৃষ্ট করছেন। তিনি আল্লাহ পাকের এমন মকবুল বান্দা যে, "তাঁর দরসে কুরআনে অংশগ্রহণের অর্থই হলো জান্নাতের গ্যারান্টি।"

হযরত লাহোরী কুরআন পাকের প্রকৃত আশেক ছিলেন। দরসে কুরআন, কুরআন পাকের প্রচার-প্রসার ব্যতীত তাঁর হৃদয়ে প্রশান্তি আসতো না। এ ছিল তাঁর রূহের খাদ্য এবং ব্যথার প্রতিষেধক। এই দরসে ঠিকমত উপস্থিত না হওয়াকে তিনি গুনাহে কবীরা এবং কঠিন দোষ মনে করতেন। তিনি দরসের এমন পাগল ছিলেন যে, তাঁর একটি শিশুর ইন্তেকাল হওয়ার দিনও তিনি দরস বন্ধ করেননি। দরসের পর উপস্থিত মেহমানদেরকে এ ঘটনা শুনিয়ে তিনি বাচ্চার কাফন-দাফনের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েন।

প্রথম সাক্ষাৎ

১৩৫১ হিজরীর শাবানের শেষের দিকে অথবা রমযানের প্রথমাংশে হযরত আলী মিয়াঁ (১৯৩২ সালের শেষের দিকে) হযরত লাহোরীর দরসে তাফসীরে অংশগ্রহণ করার জন্য তাঁর খেদমতে উপস্থিত হন। অবশ্য ১৯৩০ সালেও একবার সাক্ষাৎ হয়েছিল। সে ঘটনাও এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

১৯২৯ সালের মে মাসের কথা। সময় ছিল গরমের। হযরত আলী মিয়াঁ সদ্য ফারেগ হয়েছিলেন। ইতিপূর্বে তিনি কোন দূর-দূরান্তের সফরও করেননি। ঠিক ঐ মুহূর্তে তাঁর ফুফুআম্মার চিঠি আসে তাঁর আম্মার কাছে। চিঠিতে আলী মিয়াঁকে গরমের ছুটিতে লাহোরে তাদের বাসায় বেড়াতে যাওয়ার অনুরোধ করা হয়। এটাই ছিল হযরতের জীবনে সর্বপ্রথম ও ঐতিহাসিক সফর। এ সফরেই তিনি আল্লামা ইকবালসহ খ্যাতনামা সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক এবং বড় বড় মনীষীদের মজলিসে গমন করেন। হযরত লাহোরীর কথা তিনি ইতিপূর্বে শুনেছিলেন এবং এ সফরে হযরতের সাথে দেখা করার জন্য মানসিকভাবে তৈরী হয়েছিলেন। একই সময়ে তাঁর বড় ভাই ডাঃ সাইয়েদ আবদুল আলী সাহেবের চিঠি আসে হযরত আলী মিয়াঁর ফুফার কাছে। চিঠিতে আলী মিয়াঁকে অবশ্যই হযরত লাহোরীর সোহবতে হাজির করার জন্য তাকিদ করা হয়।

মে মাসের শেষ সপ্তাহের দিকে বিজ্ঞ ফুপা সাইয়েদ তালহা সাহেব আলী মিয়াঁকে হযরত লাহোরীর খেদমতে নিয়ে যান। ঐ সময় তাঁর বয়স ছিল ১৫/১৬ বছর। তাঁর পরিচয়ে দু'টি কথা বলা হতো। প্রথমতঃ এ ছেলেটি নাযেমে নদওয়াতুল উলামা হযরত মাওলানা সাইয়েদ আবদুল হাই (রহ.)-এর সাহেবজাদা। দ্বিতীয়তঃ এ ছেলেটি আরবী ভাষা লেখা এবং বলায় খুবই পারদর্শী। হযরত মাওলানা আহমাদ আলী লাহোরী ঐ সময় নওজোয়ান আলী মিয়াঁকে অত্যন্ত স্নেহ ও মহব্বতের সাথে গ্রহণ করেন। আলী মিয়াঁর অন্তরের নরম জমিতে হযরতের মহব্বত ও ভক্তির বীজ ঐ সময় থেকেই অংকুরিত হয়। ফলে দ্বিতীয় বা তৃতীয় বারও গরমের ছুটিতে তিনি দরসে তাফসীরে অংশগ্রহণ করার জন্য লাহোর গমন করেন। কিন্তু মাদরাসার ফারেগ ছাত্রদের জন্য রমযান, শাওয়াল ও জিলকদ তিন মাসব্যাপী যে দরস হত সে সময় তা ছিল না। ঐ সময় শুধু ফজরের নামাযের পর সাধারণ দরস হত এবং মাগরিবের নামাযের পর কেবল ইংরেজী শিক্ষিত লোকদের দরস হত। এরপরও হযরত লাহোরী আলী মিয়াঁকে নির্দিষ্ট একটি সময় দেন। এ থেকে হযরত আলী মিয়াঁর মধ্যে ইলমে মা'রেফাতের স্ফুরণ ঘটতে শুরু করে এবং দ্বীনী জযবা সৃষ্টি হয়।

হযরত আলী মিয়াঁ তাঁর 'পুরানে চেরাগের' প্রথম খণ্ডে লিখেছেন যে, হযরত লাহোরীর তাফসীরের খোলাসা বা সারমর্ম ছিল তিনটি মৌলিক বিষয়–

প্রথমতঃ আকীদায়ে তাওহীদের ব্যাখ্যা। এ ব্যাপারে তাঁর আলোচনার পদ্ধতি ছিল মাওলানা ইসমাঈল শহীদের আলোচনার মত। হযরতের আলোচনা যেহেতু আমাদের খানদানী মাসলাকের আলোচনা তাই তার মাধুর্য অন্তরে খুবই দৃঢ়ভাবে আসন গ্রহণ করেছিল।

দ্বিতীয়তঃ আহলুল্লাহ ও বুযুর্গানে দ্বীনের আলোচনা। হযরত লাহোরী তাঁর তাফসীরের দরসে মাঝে মধ্যে নিজের সিলসিলার আকাবিরের বিভিন্ন চমকপ্রদ ঘটনা খুবই আবেগের সাথে বর্ণনা করতেন। তাঁর শায়খ ও পীর ছিলেন যথাক্রমে মাওলানা সাইয়েদ তাজ মাহমুদ সাহেব আমরূহী ও খলীফা গোলাম মুহাম্মাদ সাহেব দীনপুরী (রহ.)। হযরত লাহোরী যখন এ দুই বুযুর্গের আলোচনা করতেন তখন মনে হত তাঁর সংগৃহীত ভান্ডারের মুখ খুলে গেছে। শ্রোতাদের অন্তরে এসব আলোচনার ব্যাপক প্রভাব না পড়ে পারতো না।

তৃতীয়তঃ জিহাদের জযবা ও ইংরেজদের সাথে দুশমনী বিষয়ক আলোচনা। হযরত আলী মিয়াঁর জীবন ঐ সময় পর্যন্ত গড়ে উঠেছিল নদওয়ার খালেছ ইলমী ও আদবী পরিবেশে। খান্দানের মধ্যেও এ ধরনের আলোচনা কমে গিয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে হযরত লাহোরীর দরসে তাফসীর থেকেই হযরত আলী মিয়াঁ ইসলাহ ও সুলূকের এই নতুন জগতের সন্ধান পান।

১৯৩২ সালে হযরত আলী মিয়াঁ হযরত লাহোরীর হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগার দরসে অংশগ্রহণ করার জন্য হাজির হন। হযরত লাহোরীর দরসে কুরআন, জুম'আর খোতবা ও সাধারণ সমাবেশে আহলুল্লাহগণের আলোচনা চালু থাকতো এবং মনে হত যে, এটাই মাওলানার আসল আগ্রহ আসল দাওয়াত। এর সাথে সাথে হযরত লাহোরীর সোহবতে বার বার উপস্থিত হওয়ার এবং তাঁর সরল, অনাড়ম্বর জীবনধারা কাছে থেকে দেখার সুযোগ আলী মিয়াঁর হয়েছিল। এতদিন তিনি যা শুধু শুনেই আসছিলেন এবার তাঁর বাস্তব চিত্র হযরত লাহোরীর মাঝে খুঁজে পেয়ে তাঁর ভক্ত ও অনুরক্ত হয়ে পড়েন।

দ্বিতীয় সাক্ষাৎ ও প্রথম বায়আত

১৯৩১ সাল। দরসে তাফসীরে অংশগ্রহণের পর পরই হযরত আলী মিয়াঁর অন্তরে হযরত লাহোরীর প্রতি শ্রদ্ধাবোধ ও আযমত বসে যায়। তখন তিনি হযরত লাহোরীর হাতে নিজের রূহানী, ইসলাহী এবং তাকমীলের লাগাম ন্যস্ত করার জন্য চিন্তাভাবনা করতে থাকেন। অবশেষে একদিন তিনি হযরত লাহোরীর কাছে নিজের মনের কথা খুলে বলেন এবং তাঁর হাতে বায়আত হওয়ার আরজু পেশ করেন। কিন্তু হযরত লাহোরী নিজের পরিবর্তে তাঁর শায়খ হযরত খলীফা গোলাম মোহাম্মাদ সাহেব ভাওয়ালপুরীর খেদমতে কানপুর জেলার দীনপুরে একটি পরিচিতিমূলক পত্র দিয়ে আলী মিয়াঁকে পাঠিয়ে দেন।

দীনপুরের পরিবেশ ছিল খুবই সুন্দর। দীনপুর যথার্থই দীনপুর ছিল। কাদেরিয়া তরীকায় দিন-রাত মসজিদ, খানকাহ্ ও বস্তি আল্লাহর যিকিরে মুখরিত থাকতো। এটি ছিল একটি ছোট গ্রাম। সেখানে হযরত আলী মিয়াঁ খলীফা সাহেবের হাতে বায়আত হওয়ার পরও হযরত লাহোরীকে নিজের পীর ও মোরশেদ মনে করতেন এবং হযরত লাহোরীও তাকে নিজের প্রিয়

শাগরেদে রশীদ মনে করতেন। ১৯৩৪ সালের এপ্রিল মাসের দিকে হযরত লাহোরী হযরত আলী মিয়াঁকে নিজের কাছে কিছুদিন অবস্থান করার জন্য ইঙ্গিত দিলে তিনি নিরিবিলি পরিবেশে শায়খের সোহবতে থেকে যিকির-আযকার ও আত্মশুদ্ধির ক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নতি লাভের আশায় হযরত লাহোরীর খেদমতে হাজির হন। ঐ সময় হযরত লাহোরী তাঁকে লাহোরের শাহী মসজিদের একটি নীরব কামরায় অবস্থান করার এবং ইলমী কাজ ও কিতাবপত্র অধ্যয়ন করা থেকে বিরত থাকার পরামর্শ দেন। ঐ সময় তিনি প্রায় তিন মাস পর্যন্ত হযরতের খেদমতে অবস্থান করেছিলেন। শুধু যিকিরের শোগল আর তেলাওয়াত ব্যতীত অন্য কোন মা'মুলাত ছিল না। কারো সাথে কোন কথা বলারও অনুমতি ছিল না। মাগরিবের পর থেকে ইশা পর্যন্ত যিকিরে মগ্ন থাকতেন।

ইজাযাত ও খেলাফত

লাহোর থেকে ফিরে আসার পর হযরত আলী মিয়াঁ দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামায় অধ্যাপনা ও কিতাবপত্র রচনায় মশগুল হন। মারকাযে নিযামুদ্দীনের সাথে যোগাযোগ এবং বুযুর্গানে দেওবন্দ, সাহারানপুর ও রায়পুরের সাথে ভক্তি ও মহব্বত সত্ত্বেও হযরত মাওলানা আহমাদ আলী লাহোরী (রহ.)-এর সাথে তাঁর রূহানী যোগাযোগ সব সময় চালু রাখেন। হযরত লাহোরীও তাঁর এই যোগ্য শাগরেদকে সব সময় মহব্বতের নজরে দেখতেন। ১৯৪৬ সালে হজ্জের সফর থেকে ফিরে এসে এক চিঠিতে হযরত লাহোরী আলী মিয়াঁকে লাহোরে আসার হুকুম দেন। হযরত আলী মিয়াঁ বলেন, চিঠি পেয়ে আমি লাহোরে হযরতের খেদমতে হাজির হই। ঐ সময় একদিন আমাকে নিরিবিলি ডেকে নিয়ে নিজের কাদেরিয়া সিলসিলায় ইজাযত দান করেন। অবশ্য এই ইজাযত দেয়ার পূর্বে হযরত লাহোরী হজ্জের সময় তাঁর এ প্রিয় শাগরেদের জন্য মসজিদে খায়েফে ও মীনা ময়দানে খুবই গুরুত্বের সাথে দু'আ করেছিলেন।

হযরত মাওলানা আবদুল কাদের রায়পুরী (রহ.)-এর খেদমতে

দেশ বিভক্তির পর পাকিস্তানে গিয়ে নিজের পুরানো রূহানী কেন্দ্র হতে ফায়েদা লাভ করা হযরত আলী মিয়াঁর পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ে; তাই তিনি এই রূহানী সফর ও ইসলাহী কার্যক্রম জারী রাখার জন্য নতুন রূহানী ব্যক্তিত্বের সন্ধান করতে থাকেন। এ ব্যাপারে শায়খুল হাদীছ হযরত মাওলানা

জাকারিয়া (রহ.) তাঁকে ঐ সময়ের বিখ্যাত বুযুর্গ আলেম হযরত রায়পুরী (রহ.)-এর খেদমতে হাজির হওয়ার জন্য তাকীদ করতে থাকেন। সেমতে তিনি হযরত রায়পুরীর সাথে সম্পর্ক স্থাপনের চিন্তাভাবনা করতে থাকেন।

হযরত রায়পুরী (রহ.)-এর সংক্ষিপ্ত পরিচয়

জন্ম ঃ হযরত মাওলানা আবদুল কাদের রায়পুরী সম্ভবত ১২৯০ হিজরী, মোতাবেক ১৮৭৩ ইং সালের দিকে পশ্চিম পাঞ্জাবের সারগোদা জেলার ঢুড়িয়া নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন।

শিক্ষা ঃ প্রাথমিক শিক্ষা তিনি তাঁর চাচা হাফেয ইয়াসীন সাহেবের নিকট লাভ করেন। অতপর মাওলানা কলিমুল্লাহর নিকট হেফয শেষ করেন। তারপর ঢুড়িয়ার নিকটে ভারত শরীফ এবং ঝাউরিয়া মাদরাসা হতে বুনিয়াদী ইলম হাসেল করেন।

উচ্চশিক্ষা ঃ প্রাথমিক ও বুনিয়াদী শিক্ষা লাভ করার পর তিনি কুরআন-হাদীছের উচ্চ শিক্ষা লাভ করার জন্য ভারতে আসেন এবং সাহারানপুর, দিল্লী, পানিপথ, রামপুর, বেরেলী প্রভৃতি স্থানে অত্যন্ত মুজাহাদার সাথে আর্থিক অভাব-অনটনের মধ্য দিয়ে ইলম হাসেল করেন। সম্ভবত ১৯০১ বা ০২ সালে বেরেলীতে থাকা অবস্থায় তাঁর দরসিয়াত পূর্ণ হয়।

কর্মজীবন ঃ দরসিয়াত হতে ফারেগ হওয়ার পর তিনি বেরেলীর এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের সাহেবযাদার শিক্ষক নিযুক্ত হন। কয়েকমাস পর সেখান থেকে তিনি বিজনৌরে তাঁর এক সাথীর মাধ্যমে আফযলগড়ে হাজির হন এবং ছয় মাস যাবত হাকিমী পেশায় লিপ্ত থাকেন।

আধ্যাত্মিক সাধনা ঃ বেরেলী ও অন্যান্য জায়গায় থাকা অবস্থাতেই হযরত রায়পুরীর দিলের মধ্যে আল্লাহ পাকের মহব্বতের বীজ অংকুরিত হয়। সে সময় হতেই তিনি আল্লাহওয়ালা শায়খের তালাশ শুরু করেন। তিনি ইমাম গাজ্জালী (রহ.)-এর আল-মুনকেজ মিনাদদলাল গ্রন্থখানি অধ্যয়ন করে অভিভূত হন এবং দেখতে পান যে, ইমাম গাজ্জালী (রহ.) নিজের রূহানী পিপাসা ও তলব মিটানোর জন্য নেযামিয়াঁ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের পদ ছেড়ে দিয়ে আল্লাহওয়ালাদের সোহবত হাসেল করার জন্য কি রকম ব্যাকুল হয়েছিলেন। হযরতের চিন্তাধারার মধ্যেও বিরাট পরিবর্তন আসে। তিনি বুঝতে পারেন যে, আমরা যা কিছু দরস-তাদরীস করছি এর মধ্যে হাকীকত কিছুই নেই, সবই শাব্দিক ও মৌখিক। এর মধ্যে আল্লাহ পাকের

মারেফাত ও মহব্বত কিছুই নেই। তাই তিনি একজন হক্কানী পীরের খোঁজে সারাক্ষণ পেরেশান থাকতেন। ঐ সময় হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজেরে মক্কী (রহ.)-এর 'তুহফাতুল উশশাক' গ্রন্থখানা পড়ে তিনি আরো এশকের সাগরে হাবুডুবু খেতে থাকেন এবং তাঁর পেরেসানী বাড়তে থাকে।

তখন কুতুবে আলম হযরত মাওলানা রশীদ আহমাদ গংগুহীর রুশদ ও হেদায়েতের সূর্য সারা হিন্দুস্তানকে আলোকিত করে রেখেছিল। হযরত হাজী সাহেবের কিতাবপত্র অধ্যয়ন ও আকাবেরে উলামায়ে দেওবন্দের উপর ভালো ধারণা রাখার এবং সুন্নতের উপর পাবন্দ থাকার কারণে এ মোবারক সিলসিলার সাথেই তাঁর মুনাসাবাত বা চিন্তা-চেতনার সামঞ্জস্য হয়ে যায়। তৎকালে হযরত গংগুহীর বিখ্যাত খলীফা হযরত মাওলানা শাহ আব্দুর রহীম রায়পুরী সাহেব পূর্ব পাঞ্জাবে সফরে যেতেন। হযরতের কয়েকজন মুরীদের সাথে মাওলানা আব্দুল কাদের রায়পুরীর দেখা-সাক্ষাৎ হয়।

তিনি আফযালগড় হতে হযরত মাওলানা শাহ আব্দুর রহীম (রহ.)-এর কাছে নিজের মনের আবেগের কথা জানিয়ে পত্র লেখেন। হযরত শাহ আব্দুর রহীম জবাবে বলেন যে, আমি কোন ব্যক্তিত্বই নই, আমার মধ্যে কিছু নেই, আপনি হযরত গংগুহীর কাছে মুরীদ হন। হযরত মাওলানা আব্দুল কাদের সাহেব ইতিপূর্বে একবার হযরত গাংগুহীর দরবারে হাজির হয়ে ছিলেন, কিন্তু তাঁর জালালাতে শান এবং উঁচু মরতবা প্রত্যক্ষ করে এ সিদ্ধান্ত নিয়ে ছিলেন যে এত বড় শায়খের কাছ থেকে ফায়েদা হাসেল করার সুযোগ খুবই কম মিলবে। তিনি আরো চিন্তা করেছিলেন যে, এখানে বড় সনদ ও বড় শায়খ উদ্দেশ্য নয়; বরং আসল ব্যাপার হল মুনাসাবাত ও ফায়েদা হাসেল করা। আল্লাহ পাক হযরত মাওলানা আবদুল কাদের রায়পুরীকে বিশেষভাবে রাস্তা দেখিয়েছিলেন, তাই তিনি হযরত মাওলানা শাহ আব্দুর রহীম রায়পুরীকেই নিজের ইসলাহ ও তারবিয়তের শায়খ নির্বাচন করেছিলেন এবং তাঁর কদমেই নিজেকে সোপর্দ করেন।

চিঠিপত্রের মাধ্যমে তিনি শাহ সাহেবকে তা জানিয়ে দেন এবং (১৯০৫ সাল) ১৩২৩ হিজরীর দিকে রায়পুরে হাজির হয়ে দিনরাত হযরতের সোহবতে সময় কাটাতে থাকেন। হযরত শাহ সাহেবের অনুরোধে জীবনভর রায়পুরে থাকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ১৯১০ সালে তিনি শায়খের সাথে প্রথম হজ্জ করেন। ১৯২৭ সালে দ্বিতীয় বার হজ্জ করেন। ইসলামের দাওয়াত এবং পয়গাম নিয়ে তিনি বিভিন্ন সময় সফর করতেন। দীর্ঘ ১৪ বছর তিনি কঠোর

মোজাহাদা করে খেলাফত লাভে ধন্য হন। হযরত শাহ আবদুর রহীম রায়পুরী (রহ.) ইন্তেকালের পূর্বে আব্দুল কাদের (রহ.)-কে স্বীয় স্থলাভিষিক্ত করেন। তিনি ১৯১৯ সালের ২৯শে জানুয়ারী ইন্তেকাল করেন। অতপর হযরত আবদুল কাদের রায়পুরী (রহ.) নিজ শায়খের স্থলাভিষিক্ত হয়ে তাযকিয়া ও সুলূকের কাজ আঞ্জাম দিতে থাকেন।

ইন্তেকাল ঃ এ উপলক্ষে তিনি একবার তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানেও সফর করেছিলেন। এছাড়া পাকিস্তানে তাঁর মুরীদ ও ভক্তের সংখ্যা কম ছিল না। তাই তিনি কয়েকবার পাকিস্তানে সফর করেছিলেন। ১৯৬২ সালের ১লা মে তিনি লাহোর হাজির হন। দাওয়াতী ও ইসলাহী সফর চলতে থাকে। ইতিমধ্যে ৮ই আগষ্ট হতে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং ১৬ই আগষ্ট বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত সাড়ে ১১টার দিকে লাহোরে ইন্তেকাল করেন। লাহোরে প্রথম জানাযা অনুষ্ঠিত হয়, অতঃপর লায়লপুর, সারগোদা এবং সবশেষে ঢুঁড়িয়া নামক স্থানে জানাযা শেষে ফজরের নামাযের পূর্ব মুহূর্তে হযরতের দাফনের কাজ শেষ হয়।

প্রথম সাক্ষাৎ

ইতিপূর্বে হযরত আলী মিয়াঁর চিরজীবনের সাথী হযরত মাওলানা মনযুর নোমানী (রহ.) ১৯৩৯ সালের ডিসেম্বর মাসে মাওলানা আলী মিয়াঁ এবং হাজী আবদুল ওয়াহেদ সাহেবকে নিয়ে হযরত রায়পুরীর খেদমতে উপস্থিত হলে তিনি যখন আলী মিয়াঁর সাথে মোয়ানাকা করেন তখন বলেছিলেন যে, আমি তো আপনার অপেক্ষায়ই ছিলাম।

তখন হযরত রায়পুরীকে কাছে থেকে দেখার এবং রায়পুরের খানকাহ ও সেখানকার পরিবেশ দেখার সুযোগ হয়েছিল। হযরত আলী মিয়াঁ হযরত রায়পুরীর মাঝে খুঁজে পান নিজের রূহানী তৃষ্ণা নিবারণের সামগ্রী। ঐ সময় তিনি রায়পুরে মাত্র ২/১ দিন অবস্থান করলেও হযরত রায়পুরীর মহব্বত তাঁর অন্তরে বসে গিয়েছিল।

হযরত মাওলানা ইলিয়াস সাহেবের সাথে পরিচয় হওয়ার পর শায়খুল হাদীছ হযরত মাওলানা যাকারিয়া সাহেবের সাথে মাওলানা আলী মিয়াঁর পরিচয় হয়। এক চিঠিতে তিনি আলী মিয়াঁকে লিখেছিলেন যে, "আমার অন্তরে আপনার রায়পুরের সফরের গুরুত্ব অনেক বেশী। আমি তো এ ব্যাপারে বার বার আপনাকে অনুরোধ করেছি। আহলে দিল ব্যক্তিরা এখন

রায়পুরেই যেতে পারে। সুযোগ পেলেই কয়েক দিনের জন্য একাগ্রতার সাথে থাকার জন্য রায়পুরীর খেদমতে হাজিরা দিবেন। অপর এক চিঠিতে বলেন, "ইঞ্জিনের জন্য আগুনের প্রয়োজন, আর লিল্লাহী আগুন এসব দরবারেই পাওয়া যায়।

রায়পুরের খানকাহ

সাহারানপুর শহর থেকে ২০/২১ মাইল দূরে শুয়ালাক পাহাড়ের পাদদেশে রায়পুর নামে একটি বস্তি রয়েছে। এটি এমন একটি অজগাঁ ছিল যেখানে পৌঁছবার জন্য একটি পাকা সড়কও ছিল না, পাশে কোন রেল স্টেশনও ছিল না। পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন এমন একটি পল্লীতে পূর্ণ একাগ্রতার সাথে তাআল্লুক মাআল্লাহর নিসবত কায়েম করার জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ভক্তবৃন্দরা ছুটে আসতেন। যেখানে হযরত মাওলানা শাহ আব্দুর রহীম রায়পুরী (রহ.)-এর সুযোগ্য খলীফা হযরত মাওলানা শাহ আবদুল কাদের রায়পুরী অবস্থান করতেন। রায়পুরের খানকাহ ছিল নীরব, তবে এসকল যিন্দা খানকাগুলো হতেই তখনকার যুগের মুসলমানদের দ্বীনী, ঈমানী এবং সামাজিক দিক-নির্দেশনা দেয়া হচ্ছিল।

মোর্শেদের দেলে আলী মিয়াঁর মাকাম

নিয়মতান্ত্রিক ইসলাহী সম্পর্ক স্থাপনের পর হযরত আলী মিয়াঁর রায়পুরে যাতায়াতের সিলসিলা শুরু হয়ে যায় এবং উভয়ের মধ্যে এ সম্পর্ক এমন রূপ লাভ করে যা অন্যদের জন্য ঈর্ষার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

হযরত রায়পুরী হযরত আলী মিয়াঁকে এত মহব্বত করতেন যে, চিঠিতে তিনি তাঁকে সাইয়েদী ওয়া মাওলায়ী (আমার নেতা, আমার সর্দার) বলে সম্বোধন করতেন। হযরত আলী মিয়াঁ হযরত রায়পুরীকে সাইয়েদী ওয়া মুরশিদী সম্বোধন করে পত্র লিখলে হযরত রায়পুরী তাঁর জবাবে লেখেন যে, হযরত "আপনি আমাকে কি সাইয়েদী ওয়া মাওলায়ী লেখেন? আমি তো আপনার খাদেম।" অপর এক চিঠিতে হযরত রায়পুরী নিজেকে মাওলানা রূমী ও হযরত মাওলানাকে শামছে তিবরিজ হিসেবে উল্লেখ করেন।

মোটকথা এ সম্পর্ক আস্তে আস্তে বাড়তে থাকে। অবশেষে হযরত রায়পুরী লাখনৌ সফরের সময় ১৯৪৮ সালের ২৪ শে এপ্রিল রায়বেরেলীর তাকিয়া কেলায় হযরতের বাড়িতে উপস্থিত হন।

ঐ সময় তিনি একদিন হযরত সাইয়েদ আহমাদ শহীদের মসজিদের সামনে হযরত আলী মিয়াঁকে ডেকে বলেছিলেন, আমি আপনাকে চার সিলসিলারই বিশেষ করে সাইয়েদ সাহেবের সিলসিলায় ইজাযত দিচ্ছি।

১৯৫০ সালে হযরত আলী মিয়াঁ স্বীয় মোরশেদ হযরত মাওলানা রায়পুরীর সাথে হজ্জ করেন। এটা ছিল মাওলানা আলী মিয়াঁর দ্বিতীয় হজ্জ। এ হজ্জের সফর সম্পর্কে হযরত রায়পুরী বলতেন, "এ সফর আমি তোমার জন্যই করছি। ৪ঠা সেপ্টেম্বর ১৯৫০ সালে তিনি বোম্বাই হতে ইসলামী জাহাজে রওয়ানা হন। এই হজ্জের পর হযরতের জীবনের সবচেয়ে মোবারক দিন ছিল ঐদিন যেদিন তিনি কাবা শরীফের চাবি হেফাযতকারী শায়বী সাহেবের দাওয়াতে তিনি ও তাঁর সাথী-সঙ্গীরা পবিত্র কাবা ঘরে প্রবেশের সুযোগ পান। এ সুযোগ তাঁর পীর মোরশেদ হযরত রায়পুরীও পেয়েছিলেন। হযরত আলী মিয়াঁ তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন যে, রাবেতা আলমে ইসলামীর সদস্য হওয়ার কারণে এ সুযোগ পরবর্তী সময়ে আরো দু'বার হলেও তাতে তিনি সফলকাম হননি। শুধু তাঁর পীর মোরশেদের দু'আ ও আল্লাহপাকের মেহেরবানীতে এ হজ্জের সফরেই এই সৌভাগ্য লাভ করেন। শুধু তাই নয়, তিনি দীর্ঘ সময় ধরে হযরত রায়পুরীর সোহবত শুধু এ সফরেই লাভ করেছিলেন।

নামাযের সময় হযরত রায়পুরীর অবস্থান হেরেম শরীফের একটি তাবুতে থাকতো। দুপুরে তিনি সেখানেই খেতেন। হযরত আলী মিয়াঁর তাবলীগী এজতেমা এবং উলামা ও বিশেষ ব্যক্তিবর্গের সাথে আলাপ আলোচনার কারণে তাবুতে ফিরতে প্রায়ই বেশ দেরী হয়ে যেত। তিনি ফিরে এসে দেখতেন তাঁর পীর ও মোরশেদ বসে আছেন আর সামনে রুমালে রুটি পড়ে আছে। তিনি আলী মিয়াঁকে দেখেই বলে উঠতেন, "আলী মিয়াঁ তোমার খানারও হুঁশ নেই; এই দেখ, আমি তোমার জন্য চাপাতি-রুটি নিয়ে বসে আছি, কেননা সাধারণ রুটি তোমার স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। মদীনা শরীফে যাওয়ার সময় হলে তিনি হযরত আলী মিয়াঁকে বলেছিলেন, "এখন থেকে তুমি আমার সাথে থাকবে, শায়খের মেহমানী শেষ।" (ঐ সময় আলী মিয়াঁ শায়খের পক্ষ থেকে বদলী হজ্জ করছিলেন)

মদীনাতে তিনি নিজ শায়খের সাথেই ছিলেন। ১৯৫০ সালের ২রা নভেম্বর হযরত রায়পুরী নিজের সাথী-সঙ্গীসহ জাহাজে আরোহণ করেন। হযরত রায়পুরীর একজন খাদেম বলেন যে, লঞ্চ থেকে যত সময় আলী

মিয়াঁকে দেখা যাচ্ছিল ততক্ষণ পর্যন্ত হযরত রায়পুরী তাঁর দিকে তাকিয়ে ছিলেন। হযরত রায়পুরী তাঁর এ মুরীদকে কেমন মহব্বত ও শফকতের নজরে দেখতেন তা উক্ত ঘটনা দ্বারা ভালভাবে বুঝা যায়। হযরত আলী মিয়াঁ সৌদী আরব ও অন্যান্য দেশে সফরের কর্মসূচী থাকার কারণে হযরতের সাথে ফিরে আসতে পারেননি।

হযরত থানভীর সোহবতে মাওলানা নদভী

হাকিমুল উম্মত মুজাদ্দেদে মিল্লাত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী ১৯৩৮ সালের আগষ্ট মাসে চিকিৎসার জন্য লাখনৌ তাশরীফ নিয়ে আসেন। ঐ সময় মাওলানা আলী মিয়াঁর বড় ভাই ডাঃ সাইয়েদ আব্দুল আলী সাহেব আলী মিয়াঁকে নিয়ে প্রতিদিন হযরত থানভীর খেদমতে হাজির হতেন। ঐ সময় হযরত থানভীর ভাগিনা মাওলানা জাফর আহমাদ উসমানী (রহ.) আল-কওলুল মানসূর গ্রন্থ প্রণয়ন করছিলেন। এ গ্রন্থ হযরত থানভীর খুবই প্রিয় ছিল। ঐ গ্রন্থে অনেক আরবী ইবারত ঠিক করার দায়িত্ব তিনি হযরত আলী মিয়াঁর উপর ন্যস্ত করেন। এর ফলে আলী মিয়াঁ হযরত থানভীর নেক নজরে পড়েন এবং হযরত থানভীর বিশেষ দোয়া লাভে ধন্য হন। একদিন হযরত থানভী (রহ.) পায়ে হেঁটে হযরত আলী মিয়াঁর বড় ভাইয়ের বাড়িতে উপস্থিত হন এবং কিছু সময় অবস্থান করেন।

এই তিনজন বুযুর্গ ব্যতীতও তিনি তাঁর যামানার প্রায় সকল বিখ্যাত বুযুর্গানে দ্বীনের সোহবতে যাওয়া আসা করতেন এবং তাঁদের থেকে ফয়েয হাসিল করতেন।

যিকরে ইলাহী ও মুজাহাদা

হযরত মাওলানা আবুল হাসান আলী নদভী (রহ.) যখন সুলুক ও মারেফাতের পথে পদচারণা শুরু করেন তখন হতে তিনি যিকরে ইলাহিকে নিজের প্রাণ হিসেবে গ্রহণ করেন। তাহাজ্জুদ হতে ফারেগ হওয়ার পর তিনি 'নফি-ইসবাতের' যিকির করতেন। যৌবনকালে মাগরিব বাদ যিকিরের নিয়ম ছিল। অধ্যাপনার যামানায় তিনি কুরআন পাক হেফয করা শুরু করেন। সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত হেফয করতেন। তেলাওয়াতের মা'মুল ছিল পৃথক। ইশরাক হতে ফারেগ হওয়ার পর মুখস্ত কুরআন শোনাতেন এবং দেখে দেখেও তেলাওয়াত করতেন। তারপর নিজ পিতার লেখা কিতাব 'তাহযীবুল আখলাক' মোতালা'আ করতেন। ঐ সময় দেড়-দু'ঘন্টা বুখারী শরীফ

শোনারও নিয়ম হয়ে গিয়েছিল। তাকিয়া কেলায় অবস্থান কালে মাওলানা আবদুল্লাহ আব্বাস নদভী এই দায়িত্ব পালন করতেন।

হযরতের পুরো জীবন ছিল মুজাহাদার এক উজ্জ্বল নমুনা। নদওয়ার জীবনে অধিকাংশ সময় এমন হতো যে, নাশতারই সুযোগ হতো না। নাস্তা ছাড়াই সবক পড়ানো শুরু করতেন। প্রচন্ড গরমের দিনেও সফরের ধারাবাহিকতায় তেমন একটা ছেদ পড়ত না। অন্যের খাতিরে নিজের স্বাস্থ্যের প্রতি তিনি লক্ষ্য রাখতে পারতেন না।

নিজের ইচ্ছাশক্তি ও সিদ্ধান্তকে মুরুব্বীর ইচ্ছার নিকট সঁপে দেয়া ব্যতীত সুলুকের লাইনে কেউই অগ্রসর হতে পারেনি। তিনি পুরো জীবন এটি পালন করে দেখিয়ে গিয়েছেন।

তিনি নিজের ইলমী ও ফিকরী অসাধারণত্বের পরেও সব সময় নিজের ইচ্ছাকে অগ্রাহ্য করে মুরব্বীদের পরামর্শের উপর চলতেন। তিনি বড় ভাই ডাঃ আব্দুল আলী সাহেবের নির্দেশনা অক্ষরে অক্ষরে পালন করতেন। একবার এক গুরুত্বপুর্ণ সফরের প্রোগ্রাম ছিল। হযরত রায়পুরীর খেয়াল ছিল তখন সফর না করার। হযরত আলী মিয়াঁ সাথে সাথে হযরতের কথা মেনে নেন। হযরত রায়পুরী তখন আলী মিয়াঁর চেহারার দিকে নজর করে দেখেন আলী মিয়াঁ নারাজ হয়েছে কিনা। কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ! হযরত আলী মিয়াঁ অন্তর থেকেই তা মেনে নিয়েছিলেন। ফলে তাঁর চেহারায় কোন আছর পড়েনি। হযরত রায়পুরী এ অবস্থা দেখে খুবই খুশী হন।

হযরত রায়পুরীর ইন্তেকালের পর তিনি সব সময় হযরত শায়খুল হাদীছ সাহেবের সাথে পরামর্শ করে চলতেন। আসলে মুরব্বীদের কথা মেনে চলাই মানুষের উন্নতির সিঁড়ি।

বাতেনী অবস্থা

হযরত মাওলানা আলী মিয়াঁ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের এশক ও মুহাব্বতে ডুবে থাকতেন। মাঝে মাঝে তিনি বিভিন্ন কবিতা শোনাতেন। তিনি আল্লামা ইকবালের কবিতা থেকে বিভিন্ন কবিতা পড়তেন। আল্লামা ইকবালের সাথে তাঁর গভীর হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক ছিল।

হযরত আলী মিয়াঁর মধ্যে তাওহীদ ও সুন্নাতের কেমন মহব্বত ছিল তা তাঁর সাথে সফরে যাঁরা থাকতেন তারাই অধিক বুঝতে পারতেন। তিনি বেশী

বেশী বলতেন– مولای انی إلی فضلک لفقیر তিনি ওয়াজের মধ্যে আকীদা-বিশ্বাসের উপর খুবই জোর দিতেন। হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর ওয়াজ, হযরত ইয়াকুব (আঃ)-এর অসিয়ত, হযরত আব্দুল কাদের জিলানী, শায়খ শরফুদ্দীন মানেরী প্রমুখ মনীষী তাওহীদ সম্পর্কে যেসব ঘটনা লিখেছেন, তিনি সেগুলিই বেশী বেশী বয়ান করতেন। শেষের দিকে এ বিষয়টি এতবেশী প্রাধান্য পেয়েছিল যে, তিনি কোন ব্যক্তিকে বায়আত করানোর সময় বায়আতের শব্দের পর আকীদায়ে তাওহীদ গ্রহণ করার এবং তার উপর দৃঢ় থাকার উপদেশ দিতেন এবং শিরক, বিদআত ও কুসংস্কার থেকে বেঁচে থাকার তালকীন করতেন।

সকল কাজে সুন্নাতের কঠোর অনুসরণ ছিল হযরতের জীবনের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। হযরত আলী মিয়াঁর মধ্যে যে বৈশিষ্ট্যটি প্রত্যক্ষ করা যেত এবং যা তাঁকে বিশেষভাবে বৈশিষ্ট্যমন্ডিত করেছিল, তাহল উম্মতে মুসলিমার প্রতি তাঁর অকৃত্রিম ভালবাসা। মুসলিম বিশ্ব তাঁকে "মুফাক্কিরে ইসলাম" উপাধীতে ভূষিত করেছিল। তিনি এ উম্মতের জন্য এতটাই ব্যাকুল থাকতেন যে, মাঝে মাঝে বিনিদ্র রাত কাটাতেন। উম্মতে মুসলিমাকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচানোর চিন্তা-ভাবনা তাঁর জীবনের একমাত্র লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়েছিল। তাই তিনি এই ব্যথা নিয়ে সমগ্র পৃথিবীর আনাচে-কানাচে ঘুরে বেড়াতেন।

ফানাইয়াত (আত্মবিলোপ)

হযরত আলী মিয়াঁ এতবড় আলেম ও চিন্তাবিদ হওয়ার পরও কোন সময় নিজের প্রশংসা বা আত্মগৌরবে বিভোর হয়ে কোন বাক্য বলেননি। তিনি সব সময় নিজেকে গোপন রাখতে ভালবাসতেন। একবার কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি হযরত রায়পুরীর খেদমতে বসা ছিলেন। ঐ সময় হযরত রায়পুরী চুপ ছিলেন। মজলিস চলছিল। খাদেমরা এজন্য পেরেশান হচ্ছিল যে, হযরত কিছু কথা বললে নুতন আগন্তুকরা ফায়েদা পেত। একজন খাদেম জিজ্ঞাসা করল, "হযরত সবরের অর্থ কি?"

হযরত চুপচাপ বসে থাকলেন। জিজ্ঞাসাকারী মনে করলেন, হযরত বোধ হয় শুনতে পাননি। পুনরায় উচ্চস্বরে জিজ্ঞাসা করলেন, হযরত, "সবরের অর্থ কি?" তখন হযরত বললেন, "আলী মিয়াঁর কাছে জিজ্ঞাসা কর।" আলী মিয়াঁ বললেন, আমিতো এটার শুধু জাহেরী অর্থ বলতে পারি। হযরত রায়পুরী বললেন, আমি তো তাও পারি না। বে-নফসি আর কাকে বলে!

এই অবস্থায়ই হযরত আলী মিয়াঁ পুরো জীবন কাটিয়েছেন। দেখা গেছে কেউ আসুক বা না আসুক কখনও ইশারাও করেননি যে, আমার কাছে মুরীদ হও। শুরুতে কেউ মুরীদ হতে এলে তিনি তাকে অন্যান্য মাশায়েখের খেদমতে পাঠাতেন। কেউ নাছোড়বান্দা হলে হযরত বায়আত করে নিতেন।

হযরত মাওলানা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী জীবনে অনেক কাজই করেছেন ও তাঁর জীবনের সাথে পৃথিবীর বড় বড় সংস্থার যোগাযোগ ছিল; কিন্তু ঘূর্ণাক্ষরেও তাঁর মুখ থেকে কেউ কোন দিন একথা বলতে শুনেনি যে, আমি এ কাজ করেছি, এটা আমার কীর্তি। সম্ভবত আমি ও আমরা এ দু'টি শব্দ হযরত আলী মিয়াঁর অভিধানে ছিল না। আল্লাহ পাকের রেযামন্দী ও মহব্বতের সাগরে আমি ও আমরা এ দু'টি শব্দ হারিয়ে গিয়েছিল। কোন সময় আল্লাহ পাকের নেয়ামতের শোকর আদায় করতে গিয়ে মুখ খুললে শোনা যেত, আল্লাহ পাকের তাওফীকে এ কাজ হয়েছে। এসব আমার আব্বাজানের ইখলাস ও ভাই সাহেবের তারবিয়তের ফল, আম্মাজানের দু'আর ফসল, বুযুর্গানে দ্বীনের সোহবত ও শায়খের তাওয়াজ্জুহর প্রতিক্রিয়া; অন্যথায় আমি গ্রাম্য এলাকায় অবস্থানকারী একজন সাধারণ মানুষ। আমার মুখস্থশক্তিও কম। কবিতা –

کہاں میں اور کہاں یہ نکہت گل

نسیم صبح تیری مہربانی

এ কথা বলতে বলতে তাঁর চক্ষুদ্বয় অশ্রুসিক্ত হয়ে পড়তো। বিশেষ করে নিজের বড় ভাই ও মুরব্বী ডাক্তার আব্দুল আলী সাহেবের প্রসঙ্গ এলে তিনি কেঁদে ফেলতেন। বিভিন্ন এলাকা থেকে খোশখবরীর চিঠি আসতো। কখনো কখনো তাঁর কোন বই সম্পর্কে প্রশংসা পত্র আসতো। কেউ কেউ মুখে হযরতের এবং তাঁর লেখনীর উপর খোশখবরী শুনালেও হযরত তা কোন দিন তাঁর লেখায়ও আনতেন না বা কাউকে বলতেনও না, শুধু বলতেন, আমি এর যোগ্য নই। এগুণটি তাঁর মধ্যে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ছিল। এই গুণকে তিনি সালেকের জন্য জরুরী মনে করতেন। তিনি বলতেন, নিজের অযোগ্যতার অনুভূতি ও নিজেকে ছোট মনে করা এবং নিজেকে যোগ্য মনে না করা এই রাস্তার সবচেয়ে বড় কথা এবং এরই মধ্যে রয়েছে সালেকের হেফাযত, তারাক্কী ও উন্নতি।

বায়আত

হযরত মাওলানা বলতেন, বায়আত করা বা সিলসিলায় দাখেল হওয়া নিছক কোন রীতি বা প্রথা নয় যে, এর জন্য কোন মামুলাত আদায় করতে হবে না বা এর জন্য কোন মুজাহাদারও প্রয়োজন নেই। শুধু বরকত লাভ এবং বিখ্যাত হওয়ার উদ্দেশ্যে বায়আত হওয়াকে তিনি পছন্দ করতেন না। বরং তিনি বলতেন– এটা একটা প্রতিজ্ঞা, চুক্তি এবং নতুন দ্বীনী ও ঈমানী জীবন শুরু করার পদক্ষেপ মাত্র। যার ফলে জীবনে কিছু পরিবর্তন, কিছু নিয়মনীতি ও দায়িত্ববোধ এসে যাওয়া সহজ হয়ে যায়।

এ সম্পর্কে তিনি তাঁর মুরীদীন এবং মুহিব্বীনদেরকে যেসমস্ত প্রয়োজনীয় ও অতীব গুরুত্বপূর্ণ হেদায়েত দান করতেন তার কিছুটা এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে ঃ

(১) সর্বপ্রথম জরুরী কথা এই যে, বায়আত হওয়া ও সিলসিলায় দাখেল হওয়ার অর্থ হল, কালেমার উপর নতুন পাঠ, ইসলামী প্রতিজ্ঞা চুক্তি ও বায়আতকে দ্বীনী ও ঈমানী জীবন শুরু করার এবং সে অনুযায়ী রাসূলের হুকুম মোতাবেক জীবনযাপন করার একটি চুক্তি মনে করতে হবে।

(২) সবচেয়ে বড় কথা এই যে, আকীদা বিশুদ্ধ ও পরিপক্ক করতে হবে। কালেমার উপর ঈমান রাখতে হবে এবং মুখেও স্বীকার করতে হবে যে, আল্লাহ ব্যতীত জীবন-মরণ, শেফা-বিমারী, সন্তান দেয়া, রিযিক দেয়া, তাকদীরের ভালো-মন্দ করার শক্তি আর কারো নেই। আল্লাহ ব্যতীত কেউ ইবাদতের উপযুক্ত নয়। তাঁকে ব্যতীত কাউকে সেজদা করা যায় না। বন্দেগীর শুধু আকৃতি ধারণ করলে চলবে না। আল্লাহ ব্যতীত কাউকে বালা-মুসিবত দূরকারী, হাজত পুরনকারী ভাবা যাবে না।

(৩) সাইয়েদুল মুরসালীন খাতামুন নাবিয়্যিনকে আল্লাহ পাকের আখেরী নবী, হেদায়েতের মাধ্যম, শাফাআতের ওসীলা, মহব্বত এবং অনুসরণ করার ক্ষেত্রে সবচেয়ে হকদার মনে করতে হবে। সকল ক্ষেত্রে মহানবীর শিক্ষা পালন করার চেষ্টা করা প্রয়োজন। মহানবী (সা.)-এর সীরাত অনুযায়ী জীবন গড়ার চেষ্টা করা এবং তাঁর হাদীছসমূহ ও সীরাতের কিতাবসমূহ মোতালাআ করার শওক পয়দা করার চেষ্টা করা উচিত।

(৪) জীবনকে ইসলামী কাঠামোতে ঢেলে সাজানো এবং জীবনের সঠিক উদ্দেশ্য বুঝবার জন্য "দসতুরে হায়াত" গ্রন্থখানা মোতালাআয় রাখবে। সাথে সাথে হযরত হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহ.)-এর মাওয়ায়েয ও মালফুযাত মোতালাআ করবে।

(৫) সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হলো নামাযসমূহ নিষ্ঠার সাথে আদায় করা এবং সুন্নাতের পাবন্দী করা। নামাযের মধ্যে অলসতা ও গাফলতির ক্ষতিপুরণ কোন কিছুতেই হয় না। নামায জামাআতের সাথে মসজিদে আদায় করতে হবে। মহিলারা নামায সঠিক সময়ে পড়বে। মহিলাদের নামায সাধারণতঃ ব্যস্ততার কারণে এবং সাংসারিক ঝামেলার কারণে সঠিক সময়ে পড়া হয়ে ওঠে না। এটি ঠিক নয়।

(৬) দ্বীনী ও দুনিয়াবী উভয় কাজে সওয়াব এবং রেযায়ে ইলাহীর নিয়তের অনুশীলন করা প্রয়োজন। জীবনের সকল ক্ষেত্রে আখলাকের অনুশীলন করা প্রয়োজন, যেন তাতে ইবাদতের সওয়াব পাওয়া যায়। আর সকল কাজ যথাসম্ভব শরীয়ত মোতাবেক এবং সুন্নাত অনুযায়ী করা উচিত। চারিত্রিক ও মেধাগত দুর্বলতা, হিংসা-বিদ্বেষ, অতিরিক্ত ক্রোধ, বেশী কথা বলা, ধন-সম্পদ ও দুনিয়ার মহব্বত পরিত্যাগ করা উচিত।

(৭) যতদূর সম্ভব কুরআনে পাক তেলাওয়াতের অভ্যাস গড়ে তোলা প্রয়োজন।

(৮) ফজরের নামাযের পূর্বে বা মাগরিবের নামাযের পর অথবা বাদ ইশা (যে সময় সহজ হয় এবং নিয়মিত করা যায়) এক তাসবীহ দুরূদ শরীফ, এক তাসবীহ কালেমায়ে সুওম পড়বে। আর আল্লাহ পাক তাওফীক দিলে শেষ রাতে কয়েক রাকআত তাহাজ্জুদ নামায পড়ার চেষ্টা করবে এবং নিজের সিলসিলার মাশায়েখ ও বুযুর্গদের জন্য দু'আ করবে।

সালেকীনদের তরবিয়ত ও মা'মুলাত

হযরত মাওলানা আলী মিয়াঁ (রহ.) তালেবীন ও সালেকীনের তরবিয়তের ব্যাপারে তাদের জওক, ব্যস্ততা, স্বাস্থ্য, ধারণ ক্ষমতা, যোগ্যতা ও উন্নতির দিকে খেয়াল রাখতেন। তিনি সকল অবস্থার দিকে লক্ষ্য রেখে যিকিরের তালকীন করতেন এবং সহজতার দিকে বিশেষ খেয়াল রাখতেন। প্রাথমিকভাবে শুধু তিন তাসবীহ আদায়ের মা'মুলাত দিতেন। কেউ বেশী চাইলে অনুমতি দিতেন না। কাউকে সূরায়ে ইখলাসের দু'এক তাসবীহের

অনুমতি দিতেন। কাউকে মোয়ামালা পরিশুদ্ধ করতে, ফারায়েযসমূহের পাবন্দী করতে এবং তিনি যেসকল দ্বীনী কাজে লিপ্ত আছেন সেগুলিতে নিয়ত খালেস রাখতে পরামর্শ দিতেন। অধিকাংশ তালেবকে ৫০০ বার কলবী যিকির করার আমল দিতেন অথবা প্রয়োজন অনুযায়ী বা যোগ্যতানুসারে যিকরে জেহরীর তালকীন করতেন। কেউ বায়আত হলেই তাকে ২৪ ঘন্টার মা'মুলাত বাতিয়ে দিতেন।

হযরত মাওলানা আলী মিয়াঁ (রহ.) মা'মুলাতের পাবন্দী করাকে খুবই জরুরী মনে করতেন। এক চিঠিতে তিনি তাঁর একজন মুরীদকে লিখেছিলেন, "মা'মুলাতের পাবন্দী করবে, কেননা এর দ্বারা কাজের মধ্যে বরকত ও নুরানিয়াত আসবে। অধিকাংশ সময় বায়আতের শব্দাবলী বলার পর পরই তালেবীনের অবস্থার পরিবর্তন হয়ে যেত। এরকম বহু ঘটনা রয়েছে যে, হযরতের হাতে বায়আত হওয়ার পর ব্যক্তির জীবনের আমূল পরিবর্তন হয়েছে। এক ব্যক্তি বায়আত হওয়া পছন্দ করতো না। হযরত মাওলানা এমন ব্যক্তিত্ব ছিলেন যার হাতে এমন আলেম ও সাধারণ লোকেরাও বায়আত হত যারা সুলূক এবং তাসাউফের পথ পছন্দ করত না। কিন্তু তারা হযরতের চিন্তা ধারায় উদ্বুদ্ধ হয়ে এবং তাঁর মহব্বতের সাগরে হাবুডুবু খেয়ে হযরতের কাছে বায়আত হয়ে নতুন জীবন লাভ করতেন। এদিকে লক্ষ্য করেই হযরত রসিকতার ছলে বলতেন, আমার খানকাহ "আধুনিক খানকাহ"।

বায়আতের পর সাধারণ মানুষদের বলতেন– ওলী, আবদাল, কুতুব কারো থেকে কিছু হয় না, যা কিছু হয় আল্লাহ থেকে। তিনি বায়আতের মধ্যে যে সকল কথার অঙ্গীকার নিতেন তা নিম্নরূপ–

لا اله الا الله محمد رسول الله

আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ বা মাবুদ নেই, মুহাম্মাদ (সা.) আল্লাহ পাকের সত্য রাসূল।

আয় আল্লাহ! আমি তওবা করছি কুফর থেকে, শিরক থেকে, বেদআত থেকে, যেনা থেকে, চুরি থেকে, পরের মাল আত্মসাৎ করা থেকে, কারো উপর অপবাদ লাগানো থেকে, নামায ছেড়ে দেয়া থেকে, মিথ্যা বলা থেকে এবং সকল গুনাহ থেকে, যে গুনাহ আমি সারা জীবন করেছি– ছোট হোক বা বড়। আরো অঙ্গীকার করছি যে, রাসূলে পাক (সা.)-এর তাবেদারী করব

এবং আপনার সকল হুকুম মানব। আয় আল্লাহ! আমাদের তওবা কবুল করুন। আমাদের গুনাহ খাতা মার্জনা করুন। আমাদের নেক আমল করার এবং আপনার রাসুল (সা.)-এর অনুসরণ করার তাওফীক দিন।

এরপর হাত ছেড়ে দিতেন এবং বলতেন, এই বিশ্বাস রাখতে হবে যে, আল্লাহ পাকই এই পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা, তিনিই শাসক, তিনিই বিধানদাতা এবং রক্ষণাবেক্ষণকারী। তিনিই দুনিয়া সৃষ্টি করেছেন এবং তিনিই চালান। তাঁর হুকুম ব্যতীত বৃক্ষের পাতা নড়তে পারে না এবং ক্ষুদ্র জিনিস উড়তেও পারে না। তিনিই রুজি দান করেন। তিনিই সুস্থতা দেন, তিনিই ইজ্জত দেন, তিনিই বেইজ্জত করেন।

বায়আত হওয়ার পর সালেকরা চিঠিপত্রের মাধ্যমে বা তাঁর খেদমতে উপস্থিত হয়ে নিজেদের হালাত জানিয়ে ব্যবস্থাপত্র নিতেন। হযরত তাদের আত্মশুদ্ধির এই মোবারক রাস্তার সঠিক পথ প্রদর্শন করতেন। হযরত মাওলানা আলী মিয়াঁ (রহ.) তাঁর সাথে সম্পর্কিত সালেকীন ও তালেবীনদের মধ্যে যাদেরকে ভালো মনে করেছেন তাদেরকে ইযাযত ও খেলাফত দিয়ে গিয়েছেন।

==০০০==

অধ্যায়–৫

মাওলানা আলী মিয়াঁ ও তাবলীগী জামাআত

নতুন দ্বীনী ব্যক্তিত্বের সন্ধান

১৯৩৯ সালে হযরত মাওলানা আলী মিয়াঁর সাড়া জাগানো গ্রন্থ "সীরাতে সাইয়েদ আহমাদ শহীদ" প্রকাশিত হলে তিনি গ্রন্থখানি তাঁর সাথী বিখ্যাত আলেম ও আল-ফুরকান সম্পাদক হযরত মাওলানা মনযুর নোমানী সাহেবের নিকট পাঠিয়ে দেন। হযরত নোমানী (রহ.) কিতাবখানি পড়ে এতই মুগ্ধ হন যে, সাথে সাথে লেখককে পত্র লিখে মোবারকবাদ দেন এবং একটি আবেগ প্রকাশ করেন যে, আসুন আমরা কোন নতুন দ্বীনী আন্দোলন গড়ে তুলি। হযরত আলী মিয়াঁ নোমানী সাহেবের এ আহবানে সাড়া দিয়ে তাঁর এক বিশেষ বন্ধু হাজী আব্দুল ওয়াহেদসহ পরামর্শ করার জন্য নোমানী সাহেবের সাথে মিলিত হন। পরামর্শে এ ব্যাপারে তিন জনেই একমত হন যে,তাঁরা প্রথমে কয়েকটি দ্বীনী মারকায পরিদর্শন করবেন। সেসকল স্থানের কোন কাজ তাঁদের পছন্দমত হলে তাঁরা সেখানেও সহযোগিতা করবেন এবং তাদেরকে যামানার নতুন চাহিদা অনুযায়ী কাজ করতে অনুপ্রাণিত করা হবে। এ উদ্দেশ্যে সাহারানপুর, দেওবন্দ, থানাভবন, রায়পুর, নিযামুদ্দীন, দিল্লী প্রভৃতি স্থানের দ্বীনী মারকাযসমূহ সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ করার প্রোগাম নেওয়া হয়।

এর কয়েক মাস পূর্বে মাওলানা ইলিয়াস সাহেবের দাওয়াত ও তাবলীগের উপর মাওলানা মওদূদী সাহেবের একটি শক্তিশালী প্রবন্ধ মাসিক তর্জমানুল কুরআন পত্রিকায় "একটি গুরুত্বপূর্ণ দ্বীনী আন্দোলন" নামে প্রকাশিত হয়েছিল। জনাব মওদুদী স্বয়ং নিযামুদ্দীন ও মেওয়াত সফর করেছিলেন। সেখান থেকে ফিরে এসে তিনি নিজে কিছু পরামর্শ দিয়ে এই দ্বীনী প্রচেষ্টার পরিচয় করিয়েছিলেন এবং এ সম্পর্কে তাঁর গভীর অনুভূতি প্রকাশ করেছিলেন।

উল্লেখ্য, সমসাময়িক হওয়ার সুবাদে জামায়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা মওদুদী সাহেবের প্রতি এক সময় হযরত মাওলানা আলী মিয়াঁ সুধারণা পোষণ করতেন। বিশেষ করে পশ্চিমা সভ্যতা ও জীবনদর্শন এবং

বস্তুবাদের সমালোচনায় মাওলানা মুওদুদী সাহেবের ক্ষুরধার লেখনী মাওলানা আলী মিয়াঁকে আকৃষ্ট করে।

১৯৪০ সালের দিকে তাদের মধ্যে পত্র যোগাযোগ শুরু হয়। এক পর্যায়ে উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা গড়ে ওঠে ফলে জামায়াতে ইসলামীর অনেক কর্মসূচীতে তিনি অংশগ্রহণ করতে থাকেন। কিন্তু কিছু বিষয় তাঁর মনে সংশয়ের জন্ম দেয়। মওদুদী সাহেবের ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে অতিরঞ্জিত মনোভাব, পূর্বসূরী বুযুর্গানে দ্বীন ও মনীষীগণের মওদুদী সাহেবের লাগামহীন সমালোচনা ও মওদুদী সাহেবের মধ্যে রূহানিয়াত, সুন্নাতের পাবন্দি, ইসলাহে নাফস ও তাআল্লুক মাআল্লাহর অভাব ছাড়াও ইসলামের মৌলিক কিছু বিষয়ে ভুল ব্যাখ্যার ফলে তিনি মওদুদী সাহেবের সংস্রব ত্যাগ করেন। জামায়াতে ইসলামী ও মওদুদী সাহেব সম্পর্কে তাঁর ধারণা পাল্টে যায়।

পরবর্তীকালে মওদুদী সাহেবের 'কুরআন মজীদ কি চার বুনিয়াদী ইস্তি লাহেঁ' বইয়ের জবাবে তিনি 'আসরে হাযের মে দ্বীন কি তাফহীম ওয়া তাশরীহ' শীর্ষক বই লেখেন।

যাই হোক, হযরত আলী মিয়াঁ এ প্রবন্ধটি পড়ে খুবই অনুপ্রাণিত হন। তিনি হযরত মাওলানা সাইয়েদ সুলায়মান নদভী (রহ.)-এর সাথে পানিপথ ও কর্নালের এক সফরে থানেশ্বরে সেখানকার ডেপুটি কমিশনার হাফেয আবদুল মজীদ সাহেবের বাসায় হযরত মাওলানা ইলিয়াস সাহেবের নাম এবং তাঁর তাবলীগী প্রচেষ্টার কথা সর্বপ্রথম শুনেছিলেন। অবশ্য হযরতজীর সাথে মাওলানা মনযুর নোমানী সাহেবের পরিচয় ইতিপূর্বেই হয়েছিল।

১৯৩৯ সালের শেষ দিকে তাঁরা তিনজন সর্বপ্রথম সাহারানপুর রওয়ানা হন। সেখান থেকে ঐ যামানার বিখ্যাত শায়খ হযরত মাওলানা আবদুল কাদের রায়পুরীর খেদমতে উপস্থিত হন। হযরত রায়পুরী তাদেরকে অভ্যর্থনা জানান এবং খুবই খুশী হন। হযরত রায়পুরীকে এ সফরের উদ্দেশ্য জানানো হলে তিনি বলেন যে, আমার বয়সতো অনেক বেশী, আমি দুর্বল হয়ে পড়েছি, তবে এ কাজের জন্য দু'আ ও সহযোগিতা থাকবে। তিনি একজন নওমুসলিম মাওলানাকে দিয়ে আগন্তুকদের সাহায্য করেন, যিনি অনেক সামাজিক কাজের সাথে জড়িত ছিলেন। অবশ্য তিনি পরামর্শ দেন যে, আপনারা সর্বপ্রথম নিযামুদ্দীন গিয়ে হযরত মাওলানা ইলিয়াস সাহেবের সাথে মোলাকাত করুন এবং তাঁর তাবলীগী মেহনত দেখুন। যদি এ কাজ

সম্পর্কে আপনারা নিশ্চিন্ত হন তবে এ কাজেই লেগে যান। হযরত আলী মিয়াঁ রায়পুর থেকে দেওবন্দ হয়ে সোজা দিল্লী হাজির হন। সেখান থেকে মেওয়াতও সফর করেন।

এ সফর থেকে ফিরে এসে তিনি এক প্রবন্ধে লেখেন যে, এ সফরে সব চেয়ে আশ্চর্য যে, বিষয় আমরা প্রত্যক্ষ করেছি তা হল মেওয়াত এলাকায় হযরত মাওলানা ইলিয়াস সাহেবের তাবলীগী কাজের ব্যবস্থাপনা। আমরা যা কিছু দেখেছি তা বিংশ শতাব্দীর কোন দৃশ্য নয় ; বরং তা প্রথম হিজরী শতাব্দীর দৃশ্যাবলী মনে হচ্ছিল। মহানবী (সা.)-এর যামানার মানুষের অবস্থা এবং তাদের ইসলাম গ্রহণের যে সকল জযবার কথা আমরা সীরাত গ্রন্থসমূহে পড়েছিলাম, মেওয়াতের গোড়গানোর জামে মসজিদ, কসবায়ে নূহ ও শাহপুরের গলিসমূহে তার একটি নমুনা আমরা দেখে এসেছি। বাস্তবতা এই যে, এই চিশতী দরবেশ ও মুজাদ্দেদ আলেম বস্তি নিযামুদ্দীনে হযরত নিযামুদ্দীন আউলিয়ার মাযারের পাশে বসে হযরত খাজা মঈনুদ্দীন আজমীরীর ইসলাম প্রচার এবং হযরত মুজাদ্দেদী সেরহিন্দী ও সাইয়েদ আহমাদ শহীদ বেরেলভীর ইসলামের হেফাযতের আদর্শ পুনরুজ্জীবিত করছেন।

১৯৪০ সালের জানুয়ারী মাসে তিনি যখন নিযামুদ্দীন হাজির হন তখন হযরত মাওলানা ইলিয়াস সাহেব (রহ.) সাহারানপুরে কোন এক তাবলীগী এজতেমায় গিয়েছিলেন। মারকায থেকে তাকে জানানো হয় যে, হযরতজী ১/২ দিন পর নেযামুদ্দিন ফিরে আসবেন। ঐ সময় নিযামুদ্দীনের কাজের দায়িত্বে ছিলেন মাওলানা এহতেশামুল হাসান কান্দলভী (রহ.)। তিনি এ সময়টা কাজে লাগানোর জন্য হযরত মাওলানাকে মেওয়াতের নূহ এলাকার এক এজতেমায় পাঠিয়ে দেন। দিল্লী এসে হাজী আব্দুল ওয়াহেদের সঙ্গে তাঁর এক বন্ধুর সাথে সাক্ষাৎ করতে যান। ঠিক ঐ মুহূর্তে নিযামুদ্দীনে হযরতজীর সাথে সাক্ষাৎ করার এক জযবা তাকে পাগল করে তোলে। তাঁর অন্তরে এক ধরনের ঝড় বইতে থাকে।

তিনি তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন– তখন আমার অবস্থা এমন হয়েছিল যে, মনে হচ্ছিল আমি দরজা খুলে নিযামুদ্দীনের দিকে দৌড় দিই। সেই সাথে দু'আ এবং আল্লাহপাকের সাথে সম্পর্কের এক ঢেউ আমার অন্তরকে ঘিরে ফেলেছিল, যা সাধারণত কোন বিশেষ সময়ে হয়ে থাকে। এরপর তিনি নিযামুদ্দীনে ফিরে আসেন। অল্পক্ষণ পর হযরতজী তাশরীফ নিয়ে আসেন

এবং হযরত আলী মিয়াঁর সাথে এমনভাবে মিলিত হন যেন বহু বছরের পরিচিত মানুষ, অথবা মনে হচ্ছিল তিনি আলী মিয়াঁর অপেক্ষায় প্রহর গুণছিলেন। বিশেষ করে হযরতজী যখন বুঝতে পারলেন যে, আলী মিয়াঁ সীরাতে সাইয়েদ আহমাদ শহীদের লেখক এবং শহীদ বেরেলভীর সাথে তাঁর খান্দানী সম্পর্ক রয়েছে, তখন তিনি শফকত-মহববত ও মেহমানদারিতে আরো এক ধাপ এগিয়ে যান। সর্বপ্রথম যে বিষয় মাওলানা আলী মিয়াঁকে আকর্ষণ করেছিল, তা হল হযরতজীর তাঁর প্রতি বিশেষ স্নেহ ও মহব্বতের নজর এবং হযরতজীর অন্তরে বিশেষ অবস্থান। প্রথম সাক্ষাৎ হওয়া সত্ত্বেও কোন অপরিচিত ভাব পরিলক্ষিত হয়নি।

দ্বিতীয় দিন সকালে মজলিসের অবস্থা ঐ একই ছিল। তৃতীয় দিন মাওলানা আলী মিয়াঁ যখন বিদায় নিচ্ছিলেন তখন হযরতজী (রহ.) দীর্ঘক্ষণ তাঁর জন্য দু'আ করেন। যার প্রতিক্রিয়া হযরত আলী মিয়াঁর উপর পড়ে। ফলে তিনি অতিশীঘ্রই হযরতজীর খেদমতে ফিরে আসার নিয়ত করেন।

লাখনৌর আশেপাশে দাওয়াতী কাজের সুচনা

হযরত মাওলানা আলী মিয়াঁ লাখনৌ এসেই মেওয়াতের নূহ এলাকায় যে ধরনের মেহনত দেখে এসেছিলেন এবং নিযামুদ্দীনে হযরতজীর সোহবতে যা কিছু বুঝে ছিলেন, সেই অনুযায়ী শহরের আশপাশে কাজ শুরু করেন। ঐ সময় পর্যন্ত শহরের সাথে হযরতের তেমন কোন সম্পর্ক ছিল না। শুধুমাত্র তাঁর সাথে ব্যক্তিগতভাবে জড়িত কয়েকজন ছাত্রকে সাথে নিয়ে তিনি এ কাজ শুরু করেন। লাখনৌ শহরের গরীব মহল্লাগুলিতে যাতায়াত শুরু করেন এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে দ্বীন-ঈমানের হারিয়ে যাওয়া সম্পদ পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করেন ; সাথে সাথে হযরতজীর নিকট পত্র দিয়ে অবস্থাদি জানাতে থাকেন।

১৯৪০ সালের মার্চ মাসে হযরতজীর প্রথম পত্র আসে। দ্বিতীয় পত্র আসে এপ্রিলে। এরপর চিঠিপত্র আসার ধারাবাহিকতা শুরু হয়ে যায়। এ সকল চিঠিতে হযরতজী (রহ.) আলী মিয়াঁর কাজে খুশি প্রকাশ করেন এবং তাঁকে অনেক বড় মর্যাদায় ভূষিত করেন। তিনি চিঠিপত্রে তাঁকে এমনভাবে সম্বোধন করতেন যা অন্যের জন্য ঈর্ষার কারণ হয়ে দাঁড়াতো। ১৯৪০ ইং সালের মার্চ থেকে ১৯৪৪ ইং সালের মার্চ পর্যন্ত হযরত আলী মিয়াঁর কাছে ৩৪ খানা চিঠি আসে। এ সকল চিঠিসহ অন্যান্য পত্রাদি মাকাতিবে ইলিয়াস নামে প্রকাশিত হয়েছে। চিঠিগুলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সমষ্টি। যার মধ্যে

হযরতজী (রহ.)-এর উম্মতের জন্য পেরেশানী, ঈমানী শক্তি, ইসলামী জাগরণ, দ্বীনের চিন্তাভাবনা, তায়াল্লুক মাআল্লাহ ইত্যাদি বিষয়ের ঈমানদীপ্ত নূরানী চিত্র খুঁজে পাওয়া যায়।

হযরতজীর সঙ্গে সম্পর্কের কারণ

হযরতজীর সাথে আলী মিয়াঁর গভীর সম্পর্কের কারণ এই ছিল যে, তিনি ইতিপূর্বে মাকতুবাতে ইমামে রব্বানী, ইযালাতুল খেফা, সীরাতেমুস্তাকীম, মানসাবে ইমামত গ্রন্থাদি পড়েছিলেন। ফলে, ইতিহাস ও সাহিত্যের প্রতি তাঁর মধ্যে আগ্রহ ও তা মোতালাআ সত্ত্বেও এই যোগ্যতা সৃষ্টি হয়েছিল যে, তিনি এই দুই দাওয়াতী প্রোগ্রাম ও প্রচেষ্টার কর্মপদ্ধতির মধ্যে পার্থক্য করতে শিখেছিলেন। কারণ একটির সম্পর্ক শুধু মেধা, মোতালাআ, কোন বিশেষ দর্শন, আন্দোলন ইত্যাদির সাথে। অপরপক্ষে দ্বিতীয় আন্দোলনের মূলপুঁজি হলো ইবাদাত, ইনাবাত, দু'আ, কুরআনের উপর গভীর চিন্তা-ফিকির, সীরাতে নববীর আশেকানা মোতালাআ এবং উম্মতের জন্য বিশেষ চিন্তাভাবনা।

মাওলানা ইলিয়াস (রহ.) দ্বীনের জন্য, উম্মতের জন্য সব সময় ব্যাকুল ও পেরেশান থাকতেন। অপরদিকে মাওলানা আলী মিয়াঁর উপর ছিল হযরতজীর বিশেষ মনোযোগ ও মহব্বত। ফলে অল্পদিনের মধ্যে তিনি হযরতজীর নয়নমণি হয়ে যান।

ঐসময় পর্যন্ত দ্বীনী মাদরাসার ছাত্র-শিক্ষকগণ এ কাজের দিকে আকৃষ্ট হয়নি। হযরতজীর এ কাজের উপর তখনও অনেকের শরহে সদর হয়নি। ঐমুহূর্তে দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামার মতো ঐতিহাসিক দরসগাহের একজন শিক্ষক ও ছাত্রদের এ কাজে অংশগ্রহণ করা এবং বার বার হযরতজীর খেদমতে হাজির হওয়া হযরতজীর নিকট খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এর ফলে এ প্রতিষ্ঠানের উপর তাঁর নেকদৃষ্টি পতিত হয়েছিল। এ প্রতিষ্ঠান তাঁর নেক দু'আয় ধন্য হয়। এর ফলে দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামার শুধু ফায়েদাই হয়নি, বরং দারুল উলূমের মধ্যে এক নতুন জাগরণের সৃষ্টি হয়, এক নতুন অধ্যায়ের সুত্রপাত হয়। মাওলানা আলী মিয়াঁ তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন, "একবার আমি হযরতজীর কাছে আরজ করেছিলাম যে, আমরা নদওয়ার পক্ষ থেকে উলামা ও মাশায়েখের কাছে সহযোগিতার হাত বাড়িয়েছিলাম, কিন্তু উল্লেখযোগ্য সাড়া পাওয়া যায়নি। আপনিই সর্বপ্রথম

আমাদের উপর শফকতের হাত রেখেছেন। হযরতজী এ কথা শুনে কেঁদে ফেলেছিলেন এবং বলেছিলেন, আপনি এটা কি বলছেন! আপনিতো মাশাআল্লাহ দ্বীনদার পরিবারের মানুষ। আমিতো মনে করি আলীগড়ের লোকদেরকেও দূরে রাখা উচিত হবে না। প্রকৃতপক্ষে রাসূলের সত্যিকার নায়েব এবং হকের দায়ীদের মেজায যেমনটি হওয়া উচিত সে অনুযায়ী মাওলানা ইলিয়াস (রহ.)-এর মধ্যেও শোকর, স্বীকারোক্তি, শফকত ও মহব্বতের জযবা পরিপূর্ণ মাত্রায় ছিল।

তাবলীগী মেহনতের মাধ্যমে ছাত্রদের চরিত্রগঠন

দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামার ছাত্র-শিক্ষকদের মধ্যে মাওলানা মুহাম্মাদ নাযেম সাহেব নদভী লাখনৌর এই তাবলীগী কাজে প্রাণখোলা সহযোগিতা করেছিলেন। হযরত আলী মিয়াঁ বৃহস্পতিবার লাখনৌ থেকে ৮ মাইল দূরবর্তী মালহর এলাকায় ছাত্র-শিক্ষকদের নিয়ে চলে যেতেন। জুমআর দিন জামআত তৈরী হত। তারা আশপাশের এলাকায় কাজ করতেন। এই মেহনতে দ্বীনী ও ইসলাহী ফায়েদা, নামাযের একাগ্রতায় উন্নতি, যিকির ও রাত্রি জাগরণের ফায়েদা ছাড়াও ছাত্রদের কুরআন-হাদীছের ভাষায় বুৎপত্তি লাভে অদম্য স্পৃহা সৃষ্টি হত।

এ ছাড়া সরলতা, মেহনত, ওস্তাদের সাথে ব্যক্তিগত সম্পর্ক নিজের আত্মশুদ্ধির দূর্বলতার ইলম, সাধারণ মানুষের বেদ্বীনী হালাত প্রভৃতি বিষয়ে দায়িত্ববোধের অনুভূতি সৃষ্টি হয়। বিশেষ করে এই মেহনতে জড়িয়ে হযরত মাওলানার সাথে কিছু ছাত্রের এমন গভীর সম্পর্কের সৃষ্টি হয় যে, তারা পরবর্তী সময়ে দারুল উলূমের উন্নতিতে যথেষ্ট প্রভাব ফেলেছিল। হযরতজী (রহ.) দ্বীনী মাদ্রাসার ছাত্রদের এ মেহনতের কথা শুনে খুবই খুবই খুশী প্রকাশ করতেন, দু'আ দিতেন এবং চিঠি পত্রের মাধ্যমে হযরত আলী মিয়াঁকে মোবারক বাদ দিতেন ও সাহস জোগাতেন।

সপ্তাহে বা মাসে নওজোয়ান ছাত্ররা যখন জামাতে বের হত তখন তারা বিভিন্ন ধরণের গল্প গুজবের সুযোগ পেত। অথচ একাজের একাজের একটি বিশেষ আদব ছিল বেহুদা বিষয় থেকে বেঁচে থাকা। তাই হযরত আলী মিয়াঁ ছাত্রদেরকে জামাতে বের হওয়ার সময় শুধু মাত্র আরবীতে কথা বলার হুকুম দিতেন। এর দ্বারা দু টো ফায়দা হত। কম কথা বলা এবং কুরআন হাদীসের ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করা।

এক চিঠিতে হযরতজীকে এ ব্যাপারে জানান হলে হযরতজী (রহ.) মাওলানা আলী মিয়াঁকে এক চিঠিতে লিখেন যে, "আরবী ভাষার সুন্নাতকে জিন্দা করার খবরে খুশী হয়েছি। অন্যান্য মাদরাসাকেও এ মেহনতের দিকে আকৃষ্ট করার কাজে আপনাকে আল্লাহ্ পাক মাধ্যম বানান, এই দু'আ করি।" হযরতজী সব সময় মাওলানা আলী মিয়াঁ ও তাঁর চিঠির অপেক্ষায় থাকতেন এবং তাঁর খেদমতে হাজির হলে তিনি খুবই খুশী হতেন। এক চিঠিতে তিনি ইরশাদ করেন, আপনার আগমনের সংবাদে অন্তর ভরে যায়। হক তা'আলা আমাদেরকে আপনার ব্যক্তিত্ব থেকে ফায়েদা নেয়ার তাওফীক দান করুন। অন্য চিঠিতে লেখেন যে, আপনার পত্রাবলী আমাদের হৃদয়ের তালা খোলার চাবিস্বরূপ।

হযরত আলী মিয়াঁর অবস্থাও ছিল এই যে, তিনি এক-দুই মাস পর পর হযরতজীর খেদমতে হাজিরা দেয়ার চেষ্টা করতেন এবং মেওয়াতের বিভিন্ন এজতেমায় শরিক হতেন। ঐসব সফরে অধিকাংশ সময় মাওলানা হাফেয ইমরান খান সাহেব নদভী (মুহ্তামিম দারুল উলূম) শরীক থাকতেন। ফলে জনাব খান সাহেব হযরতজীর নেক নজরে পড়েন এবং পরবর্তী সময়ে ভূপালে এই মেহনতের সূচনা তাঁর দ্বারাই সম্ভব হয়।

লাখনৌ শহরে তাবলীগের কাজ ও হযরতজীর আগমন

কিছুকাল পর্যন্ত এই দাওয়াতের মেহনত নদওয়ার উলামা, তালাবা ও শহরের আশপাশের এলাকায় সীমাবদ্ধ থাকার পর হযরত আলী মিয়াঁ এই শহরের ধর্মপ্রাণ লোকদের মধ্যে এই কাজের পরিচয় করান। ফলে লাখনৌ থেকে বড় বড় জামাআত নিযামুদ্দীন ও মেওয়াত যাওয়া শুরু করে এবং এই কাজে অংশগ্রহণকারীদের জীবনে অভাবনীয় পরিবর্তন ও উন্নতি পরিলক্ষিত হতে থাকে। এমনকি লাখনৌ শহরের অবস্থা এতই উন্নত হয়ে যায় যে, হযরতজী মাওলানা ইলিয়াস (রহ.)-এর পদধূলিতে ধন্য হওয়ার উপযুক্ত হয়ে যায়। সেমতে ১৯৪৩ সালে জুলাই মাসে তিনি লাখনৌ আসার দাওয়াত কবুল করেন। ১৮ই জুলাই তিনি জনাব হাফেয ফখরুদ্দীন সাহেব, মাওলানা এহতেশামুল হাসান কান্দলভী, মুহাম্মাদ শফী সাহেব কুরায়শী ও হাজী নাসীম সাহেবসহ লাখনৌ তাশরীফ নিয়ে আসেন। নদওয়ার অদূরে মতিমহলের পুলের পূর্বে এক সবুজ ময়দানে হযরতজী ও তাঁর সাথীরা নফল নামায পড়ে দীর্ঘক্ষণ দু'আয় মশগুল হন। হযরত আল্লামা সাইয়েদ সুলায়মান নদভী একদিন পূর্বেই এসে ছিলেন এবং ৮/৯ দিন হযরতজীর সাথে ছিলেন।

দ্বিতীয় দিন হযরত শায়খুল হাদীছ সাহেব এবং মাদরাসা মাজাহিরে উলূমের শিক্ষক হযরত মাওলানা আব্দুল হক মাদানী ও হযরত মাওলানা মনযুর নোমানী তাশরীফ নিয়ে আসেন। আফসোসের বিষয় এই যে, ঐ সময় (১৯৪৩ সালে) ছাত্রদের এক স্ট্রাইকের কারণে দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামা বন্ধ ছিল এবং পরিবেশ ছিল ভিন্নরূপ। ফলে ছাত্র বেশ কম ছিল। কিন্তু হযরতজীর আসার কারণে দারুল উলূমের নতুন যাত্রা শুরু হয় এবং নূরানী পরিবেশ সৃষ্টি হয়। দারুল উলূমের যিম্মাদার ব্যক্তিদের সাথে বিশেষ করে নাযেমে নদওয়াতুল উলামা, মাওলানা আলী মিয়াঁর বড় ভাই ডাক্তার সাইয়েদ আব্দুল আলী সাহেব এবং মাওলানা সাইয়েদ সুলায়মান নদভী (রহ.)-এর সাথে হযরতজীর গভীর সম্পর্ক কায়েম হয়। মাওলানা আলী মিয়াঁ বলেন, একদিন হযরতজী আমাকে বললেন, আমাকে এমন স্থানে নিয়ে চলো যেখান থেকে পুরো দারুল উলূম দেখা যায়। তখন আমি তাকে মাদরাসার ছাদের উপর নিয়ে গেলাম যেখান থেকে পার্শ্ববর্তী নদীর দৃশ্য এবং দারুল উলূমের মসজিদ, শিবলী দারুল ইকামাহ ও অন্যান্য বিল্ডিং নজরে আসে।

এ সময় হযরতজী ও আলী মিয়াঁ ব্যতীত আর কেউ সেখানে ছিলেন না। হঠাৎ হযরতজী তাঁকে বললেন, আমি দারুল উলূমের কিছু খেদমত করতে চাই, বলুন কি খেদমত করতে পারি? মাওলানা আলী মিয়াঁ তখন হযরতজীকে বলেছিলেন, শুধু এতটুকু চাই যে, আপনি মাদরাসা মাজাহিরে উলূম যেভাবে দেখাশুনা করেন নদওয়াকেও সেই একই নজরে দেখবেন। হযরতজী নদওয়ার জন্য দু'আ করেন এবং নীচে নেমে আসেন।

রায়বেরেলী আগমন

লাখনৌ আগমনের শেষ দিন রাতের গাড়িতে হযরতজী (রহ.) হযরত শায়খুল হাদীছ, হাফেয ফখরুদ্দীন সাহেব এবং আরো কিছু সাথী শুভাকাঙ্ক্ষীসহ রায়বেরেলী তাশরীফ নিয়ে যান। সেখানে পৌঁছে দায়েরায়ে শাহ আলামুল্লায় রাতের বাকী অংশ এবং পরবর্তী আধাদিন অতিবাহিত করেন। হযরত সাইয়েদ আহমাদ শহীদ বেরেলভী (রহ.)-এর মসজিদে হাজির হয়ে তিনি খুবই খুশী হন এবং তেলাওয়াতে মশগুল হয়ে যান। হযরত শায়খুল হাদীছের দিকে ফিরে এই বস্তির প্রতিষ্ঠাতা এবং এই খান্দানের বড় বুযুর্গ হযরত শাহ আলামুল্লাহ সম্পর্কে উঁচু মন্তব্য করেন এবং নিজের প্রতিক্রিয়ার কথা জানান। দুপুরের গাড়ীতেই তিনি লাখনৌ হয়ে কানপুরের পথে দিল্লী ফিরে যান।

হযরতজীর মুখপাত্র রূপে

হযরতজী (রহ.) মাওলানা আলী মিয়াঁকে তাঁর তরজুমান বা মুখপাত্র করেছিলেন। লাখনৌতে এক বিশেষ মজলিসে হযরতজীর তাকরীর হয়। সেখানে শহরের উচ্চ শিক্ষিত লোকজন এবং কয়েকজন উকিল উপস্থিত ছিলেন। ঐ সময় হযরত আলী মিয়াঁ বুঝতে পারছিলেন যে, মেহমানরা হযরতজীর কথা ভাল করে বুঝতে পারছেন না; তাই তিনি দাঁড়িয়ে যান এবং হযরতজীর কথার সারাংশ ভালো করে বুঝিয়ে দেন। এতে হযরতজী ও উপস্থিত ব্যক্তিগণ খুবই খুশী হন। হযরতজী এই বয়ান ছাপিয়ে প্রকাশ করারও আগ্রহ প্রকাশ করেন।

একবার হযরত আলী মিয়াঁ রাতে সফর করে ভোরের দিকে নিযামুদ্দীন পৌঁছেন। হযরতজী মাওলানাকে ফজরের নামায পড়াবার হুকুম করেন। সালাম ফিরাবার সাথে সাথে বয়ান করার হুকুম দেন। ঐ সময় মজলিসে ডাঃ যাকির হোসাইন খান, কুরাইশী সাহেব, মালিক দ্বীন মুহাম্মাদ (বড় ব্যবসায়ী) উপস্থিত ছিলেন। মাওলানা আলী মিয়াঁ বললেন, হযরত আমার মাথায় কিছুই নেই, আমি কি বয়ান করব? হযরতজী বলেছিলেন, শুরুতো করুন। তারপর তিনি বয়ান করেন এবং হযরতজী আলী মিয়াঁর বয়ানের দিকে মুতাওয়াজ্জোহ হয়ে বসে থাকেন।

হযরত আলী মিয়াঁ হযরতজীর সোহবত, তাঁর চিঠি ও ইরশাদাতসমূহের আলোকে এই দাওয়াতী মেহনতের উপর 'এক আহাম দ্বীনী দাওয়াত' নামে একখানি ছোট পুস্তিকা রচনা করেন। হযরতজী রেসালাখানা শব্দে শব্দে শোনেন। তিনি দু' একটি শব্দের সামান্য পরিবর্তন করেন এবং খুব দু'আ করেন। এ জন্যই হযরতজী (রহ.) আলী মিয়াঁকে সবসময় কাছে কাছে রাখতেন। একবার যিম্মাদাররা হযরত আলী মিয়াঁকে নিযামুদ্দীনের আশপাশে কোথাও গাশতে পাঠিয়ে দেন। হযরতজী এ খবর পেয়ে বলে উঠেছিলেন, এক ব্যক্তিই আমার কথাবার্তা কিছু বুঝে, তোমরা তাকেও বাইরে পাঠিয়ে দিয়েছো, এখন আমি কার সাথে কথা বলব?

তাবলীগে আত্মনিয়োগ এবং দারুল উলূম থেকে দীর্ঘ ছুটি গ্রহণ

দাওয়াতী প্রোগ্রাম ও বারবার নিযামুদ্দীন যাতায়াতের ফলে দারুল উলূমের অধ্যাপনার কাজে বেশ অসুবিধা দেখা দিতে লাগল। তাছাড়া মাদরাসার চার দেয়ালের মধ্যে ধরাবাঁধা নিয়মের গণ্ডীতে নিজেকে সম্পূর্ণ আবদ্ধ রাখার মনোবৃত্তিও তাঁর শেষ হয়ে আসছিল। তাই মাওলানা অলী মিয়াঁ

১৯৪২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে মাদরাসার চাকুরী ছেড়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেন। কিন্তু এ ব্যাপারে তাঁর রূহানী মুরব্বী হযরত মাওলানা ইলিয়াস সাহেবের অনুমতি নেয়ার প্রয়োজন উপলব্ধি করে তিনি নিযামুদ্দীন হাজির হন এবং হযরতজীর নিকট স্বাধীনভাবে দ্বীনের খেদমত করার বিষয়ে পরামর্শ চান। একই সাথে নিজের মনোভাবের কথা জানান। হযরতজী ইরশাদ করেছিলেন, আমাদের বুযুর্গরা পূর্বের চাকুরীর চেয়ে ভালো চাকুরী না পাওয়া পর্যন্ত চাকুরী ছাড়ার অনুমতি দেন না। দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার একই কথার পুনরাবৃত্তি করলে হযরতজী একই জবাব দিতে থাকেন। সম্ভবত তিনি আলী মিয়াঁর উদ্দেশ্যকে পরীক্ষা করছিলেন যে, এ ব্যাপারে তিনি দৃঢ়পদ কি-না।

ফজরের নামাযান্তে বয়ানের পর হযরতজী মাওলানাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি নদওয়া থেকে কত টাকা পান? মাওলানা জবাবে বলেছিলেন, মাসিক পঞ্চাশ টাকা পাই। এ কথা শুনে হযরতজী বড় দৃঢ়তার সাথে বলেছিলেন, এ রকম হাজার পঞ্চাশ টাকা আপনার গোলামদের পায়ের উপর কুরবানী হবে। এই কথা বলে তিনি অনুমতি দিয়ে দেন। অবশ্য পরে তিনি ১৯৪৩ ইং সালের ১ লা ডিসেম্বর থেকে পুনরায় দারুল উলূমে ছবক পড়ানো শুরু করেন। ১৯৪৫ সালের ৫ই নভেম্বর থেকে স্থায়ীভাবে দারুল উলূমের চাকুরী ছেড়ে দেন এবং দাওয়াতী মেহনতের সাথে বিভিন্ন সামাজিক ও অন্যান্য কাজ করতে থাকেন।

হযরতজীর ইন্তেকালের দিন

হযরতজীর (রহ.) হুকুমে মাওলানা আলী মিয়াঁ করাচী ও হায়দ্রাবাদের সফর থেকে ফিরে দিল্লী উপস্থিত হন। কিন্তু নদওয়া থেকে প্রায় দেড় মাস অনুপস্থিত থাকার কারণে তিনি সোজা লাখনৌ চলে আসেন। এ দিকে হযরতজী (রহ.) ঐ সময় ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়েন। অবস্থা দিন দিন খারাপের দিকে যাচ্ছিল। সম্ভবত তিনি ১৯৪৪ ইং সনের জুনের প্রথম দিকে দীর্ঘ অবস্থানের নিয়তে হযরতজীর খেদমতে হাজির হন। ঐ সময় হযরত মাওলানা জাফর আহমাদ উসমানীও নিযামুদ্দীনে অবস্থান করছিলেন। ২১ শে জুন শায়খুল হাদীছ হযরত মাওলানা যাকারিয়া সাহেব তাশরীফ নিয়ে আসেন। ঐ মাসেই মেওয়াতের নূহে 'মুয়িনুল ইসলাম মাদরাসার' জলসায় আলী মিয়াঁ শরীক হন। হযরতজী কয়েকবার আলী মিয়াঁকে ডেকে বলেন যে, আমার জীবনের আর কোন আশা নেই। একদিন বাদ মাগরিব আলী মিয়াঁর ডাক পড়ে। অত্যন্ত স্নেহ ও মমতার সাথে মাথায় হাত রাখেন এবং চুলের

মধ্যে হাত ঘোরাতে থাকেন। তারপর ঐ দুর্বল অবস্থায় উঠে বসে হযরত আলী মিয়াঁর কপালে চুমু দেন এবং বলেন, তুমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছো, তোমার সাহায্যকারী কেউই নেই। এভাবে তাকে সান্ত্বনা দেন।

একদিন হঠাৎ আলী মিয়াঁকে ডেকে হযরতজী বলেন, আপনার কান আমার ঠোঁটের কাছে নিয়ে আসুন। এরপর বলেন যে, মানুষদেরকে যিকিরের তাকীদ করুন এবং মাওলানা আব্দুল কাদের রায়পুরী (রহ.)-এর মজলিসে বসার জন্য বলুন। এটা ১৯৪৪ সালের ৮ই জুলাইর ঘটনা। ১২ ও ১৩ই জুলাই-এর মাঝ রাতে হযরতজীর জীবনের শেষ সময় এসে যায় এবং ফজরের আযানের পূর্বেই হযরতজী ইন্তেকাল করেন। জীবনের ক্লান্ত মুজাহিদ সম্ভবত আরামের ঘুম কোন সময় ঘুমাতে পারেননি। তাই নিজের মনযিলে মাকছুদে গিয়ে প্রশান্তির ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েন। হযরত আলী মিয়াঁর উপর এই ঘটনার দারুন প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। কাফন-দাফনের পর তিনি নিজেকে সামলাতে না পেরে বাদশাহ হুমায়ুনের মাকবারার দিকে চলে যান এবং সেখান থেকে ইশার পর ফিরে আসেন।

হযরতজী (রহ.)-এর ইন্তেকালের পর হযরত আলী মিয়াঁসহ অন্যান্য আকাবিরের সামনেই সাহেবজাদা হযরত মাওলানা ইউসুফ সাহেবকে জামাআতের আমীর বানানো হয়। হযরত আলী মিয়াঁ দ্বিতীয় হযরতজীর পরামর্শ অনুযায়ী দাওয়াতের কাজে ব্যস্ত থাকেন এবং নিযামুদ্দীনের সাথে তাঁর এই সম্পর্ক বরাবর কায়েম থাকে।

লাখনৌর দ্বীনী পরিসরে তাবলীগের মাকবুলিয়াত

১৯৪৪ থেকে ৫২-৫৩ পর্যন্ত লাখনৌর সাধারণ শিক্ষিত শ্রেণী, আইনজীবী শ্রেণী, পেশাদার গোষ্ঠী, আলেম সম্প্রদায় ও ইউনিভার্সিটির শিক্ষিত শ্রেণীর দৃষ্টি এ কাজের দিকে দ্রুত গতিতে বাড়ছিল। তখন লাখনৌ থেকে বিহারের পূর্বসীমান্ত কাটিহার ও পূর্ণিয়া জেলা পর্যন্ত এবং পাঞ্জাব ও কাশ্মীর পর্যন্ত হযরত মাওলানা মনযুর নোমানী (রহ.)-এর সাথে হযরত আলী মিয়াঁ বহু দাওয়াতী সফর করেন।

এসব সফরের মধ্যে ১৯৪৫ সালের সীমান্ত প্রদেশ সফর, '৪৬ সালের হাজারা জেলার মারি সফর, পুনছ ও কাশ্মীরের সফর এবং সুবাদাবাদের সফর বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৯৪৫ সালের জানুয়ারী মাসে মেওয়াতের গুরুত্বপূর্ণ জলসায় যোগদান ছিল তাঁর দাওয়াতী সফরের বিশেষ অংশ। এ ছাড়া ভূপাল, লাখনৌ, কানপুর বসতি, সিতাপুর প্রভৃতি তাবলীগী এজতেমায়

হযরত আলী মিয়াঁ শরীক থাকেন এবং বয়ানও করেন। ১৯৪৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে হযরতজী মাওলানা ইউসুফ সাহেব এক বড় জামাআতসহ হযরত আলী মিয়াঁর বাড়ী রায়বেরেলীর দায়েরায়ে শাহ আলামুল্লাহতে উপস্থিত হন। একদিন পূর্বে হযরত মাওলানা আব্দুল কাদের রায়পুরী ও শায়খুল হাদীছ হযরত মাওলানা যাকারিয়া সাহেব লাখনৌ তাশরীফ এনেছিলেন। পরদিন এসব মেহমান একটি বাসে করে রায়বেরেলী পৌঁছেন। এছাড়া হযরত মাওলানা মনযুর নোমানী, মাওলানা আব্দুল বারী নদভী, মুহাম্মাদ শফী সাহেব কুরায়শীও উপস্থিত ছিলেন। একদিন একরাত মেহমানগণ উপস্থিত ছিলেন। তখন বৃহস্পতিবারের এজতেমা নদওয়ার মসজিদে হত। বাদ মাগরিব বেশির ভাগ বয়ান মাওলানা মনযুর নোমানী ও মাওলানা আলী মিয়াঁ করতেন। সীরাতের কোন একখানি কিতাবের দরসও হত। তাছাড়া জামাআতের তাশকীল ও অন্যান্য প্রোগ্রাম চলতো। শেষ রাত্রে মসজিদে নফল নামায ও যিকিরের ফলে এক আশ্চর্য রকমের নূরানী অবস্থা সৃষ্টি হত।

১৯৫১ সালে তিনি দীর্ঘ এক বছর ভারতের বাইরে মধ্যপ্রাচ্যে দাওয়াতের কাজ করে লাখনৌ ফিরে এসে জামাআতের অবস্থা আরো সুসংহত পেয়ে খুশী হন। তখন জামাআতের ভাইদের মধ্যে স্বার্থত্যাগ, নম্রতা ও একে অপরের খেদমত করার জযবা সৃষ্টি হচ্ছিল। শহরের সকল শ্রেণীর লোকজন এই মেহনতের সাথে যুক্ত হচ্ছিল। মাদরাসার ছাত্র-শিক্ষকগণও এতে অংশ গ্রহণ করতেন। ফজরের পর তরবিয়তী তাকরীর হত। এই তাকরীর সাধারণতঃ আলী মিয়াঁই করতেন। যেসকল ছাত্র বছরের পর বছর এসব সাপ্তাহিক এজতেমায় শরীক হতো তারা ফারেগ হওয়ার পর নিজের এলাকায় এবং বিদেশী ছেলেরা দেশে গিয়ে দাওয়াতী কাজ শুরু করতো। তারাও নদওয়ার ছাত্র জীবনের এই মেহনতের প্রতিক্রিয়া জানিয়ে চিঠিপত্র দিত। ১৯৪৫ সাল থেকে এই এজতেমা কাছারী রোডের বর্তমান মারকাযে স্থানান্তরিত হয়।

হিজাযে দাওয়াতী কাজের জন্য আলী মিয়াঁর নির্বাচন

সৌদী আরবে হযরতজী (রহ.)-এর দাওয়াতী কাজের পরিচয় তাঁর ১৯৩৮ সালের সৌদী সফরের সময় হয়ে গিয়েছিল। তাঁর অন্তরের একান্ত কামনা ছিল যে, ভারতে কাজ কিছু এগিয়ে চললে সৌদী আরবে গিয়ে এই কাজের বুনিয়াদ পত্তন করবেন। হযরতজী (রহ.)-এর মত তাঁর সাহেবজাদা

মাওলানা ইউসুফ সাহেবের মধ্যেও এ জযবা পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান ছিল। তিনি ১৯৪৬ সালেই জামাআতের কিছু বিশিষ্ট ব্যক্তিকে সৌদী আরব পাঠিয়ে দেন, যাদের মধ্যে হযরত মাওলানা উবায়দুল্লাহ্ সাহেব বলিয়াভী উল্লেখযোগ্য ছিলেন। তিনি বড় হযরতজীর বিশেষ তরবিয়ত পেয়েছিলেন। হযরত মাওলানা উবায়দুল্লাহ্ সাহেব অনেক ধৈর্যের সাথে দাওয়াতের কাজ করে এক বছরের মধ্যে শুধুমাত্র মুহাজির ও প্রবাসী লোকদের মধ্যে এবং ভারতীয় হাজীদের মধ্যে এ কাজের পরিচয় করাতে সক্ষম হন। কিন্তু সৌদী আরবের আলেম-উলামা ও শিক্ষিত শ্রেণীর কাছে এ দাওয়াত পেশ করার জন্য আরবী ভাষায় দক্ষ ও দাওয়াতী কাজের সাথে মনে-প্রাণে সম্পৃক্ত, খালেছ দায়ী আলেমের প্রয়োজন ছিল। কেননা প্রত্যেক কাজের একটা ভিন্ন ধারা রয়েছে।

উচ্চ শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে ও ইলমী হালকায় কাজ করার জন্য সেই ধারারই লোকের প্রয়োজন ছিল। হযরত মাওলানা উবায়দুল্লাহ্ সাহেব এ ব্যাপারটি বুঝতে পেরে মাওলানা মুহাম্মাদ ইউসুফ (রহ.)-এর নিকট বার বার চিঠি লিখে জানাতে থাকেন যে, এখানে এমন কোন ব্যক্তিত্বকে পাঠান যিনি শিক্ষিত মহলে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে এ দাওয়াতের পরিচয় করাতে পারেন এবং যার প্রতিক্রিয়া এখানকার শিক্ষিত যুবক, আহলে ইলম তথা সমগ্র শ্রেণীর উপর পড়ে। এ কাজের জন্য স্বয়ং মাওলানা উবায়দুল্লাহ্ সাহেব সম্ভবত নিযামুদ্দীনে মাওলানা আলী মিয়াঁর নাম প্রস্তাব করেছিলেন। কেননা তিনি আলী মিয়াঁর আরবী সাহিত্যে ব্যুৎপত্তি সম্পর্কে পূর্বেই অবগত ছিলেন। ফলে হযরত মাওলানাকেই এ কাজের সবচেয়ে উপযুক্ত মনে করে হযরত শায়খুল হাদীছ সাহেবের পরামর্শে ছয় মাসের জন্য সৌদী আরবে পাঠানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

হযরত আলী মিয়াঁ তাঁর আম্মা, স্ত্রী, এক বোন ও ভাগ্নে মাওলানা মুহাম্মাদ সানী হাসানীকে নিয়ে ১৯৪৭ সালের ৯ জুলাই করাচী থেকে জাহাজে রওয়ানা হয়ে ১৯শে জুলাই (২৯শে শাবান) জেদ্দা পৌঁছেন। হজ্জের বেশ দেরী থাকায় তিনি প্রথম মদীনা শরীফে উপস্থিত হন। মাওলানা মুহাম্মাদ সানি সাহেব সাথে থাকার কারণে তিনি সকল সাংসারিক ঝামেলা থেকে মুক্ত হয়ে পুরো সময় দাওয়াত ও তাবলীগের কাজে ব্যয় করতে থাকেন।

কোন দায়ী যিনি নতুন কোন দেশে দাওয়াতের কাজ শুরু করবেন, তাঁর জন্য দু'টি বিষয়ের একটি অত্যন্ত জরুরী। প্রথমত খান্দানী পরিচিতি, দ্বিতীয়ত ব্যক্তিত্ব। এদু'য়ের একটি হলেও তার কথা শোনা হয়। প্রথম বিষয়

তো ভারতে আলী মিয়াঁর জন্য সহজ ছিল। বিরাট খান্দানী পরিচিতি বিদ্যমান ছিল। কিন্তু সৌদী আরবে তিনি নতুন ছিলেন, তখনও পর্যন্ত তাঁর কোন পরিচিতি গড়ে ওঠেনি। এজন্য এ সফরের পূর্বেই হযরত আলী মিয়াঁ তাঁর লিখিত এবং দিল্লীতে এশিয়ান কন্‌ফারেন্সে পঠিত একখানি আরবী পুস্তিকা (الى ممثلي البلاد العربية) সাথে নিয়েছিলেন। পুস্তিকাখানির সাহিত্যমান খুবই উন্নত ছিল এবং দাওয়াতের তরীকাও ছিল উন্নত মানের। সৌদী আরবে তখনও পর্যন্ত দাওয়াতী ও ইসলাহী রসে আরবী পত্রপত্রিকা কমই পাওয়া যেত। মিসর থেকে প্রকাশিত পত্রপত্রিকাতেও ছিল শুধু সাহিত্য ও আধুনিকতা। আরবরা তখন তাদের নিজস্ব সভ্যতা-সংস্কৃতি নিয়ে ব্যস্ত। তিনি যে সমাজের মধ্যে দ্বীনী দাওয়াতের কাজ চালাবেন, সে সমাজের সামনে তাঁর ইমেজ যথার্থভাবেই গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং বড় বড় জ্ঞানী ও শিক্ষিত মানুষের সাথে ওঠাবসা করার সুযোগ পেয়েছিলেন। তাঁর আরবী ভাষা ও সাহিত্যের পান্ডিত্যের মাধ্যমে আরবের সে সময়ের সুধী সমাজে এই নবাগত ভারতীয় ইসলাম প্রচারক এবং আরবী সাহিত্যিক সবার নিকট সমভাবে সমাদৃত হয়েছিলেন। ফলে উচুঁ শ্রেণীতেও দাওয়াতের কাজ করা তাঁর জন্য খুবই সহজ হয়ে পড়ে।

হযরত মাওলানা ৩রা রমযান থেকে ২০শে জিলক্বদ প্রায় ৩ মাস মদীনা শরীফে ছিলেন। মসজিদে নববীতে তারাবীহ নামাযের পর উলামা সমাবেশে, জুমআর নামাযের পর 'মাদরাসা শরীয়াহ'-এর একটি হলে এবং শহরের বিভিন্ন এলাকার সমাবেশে বক্তব্য পেশ করেন। তাছাড়া গাশ্‌ত বা ঘুরে-ফিরে দ্বীনী কাজের জন্য সদস্য সংগ্রহসহ তাবলীগের সমস্ত কর্মসূচীকে দ্রুত এগিয়ে নিতে সক্ষম হন।

জিলকদের শেষের দিকে তিনি মক্কা শরীফে উপস্থিত হন। সেখানকার বড় বড় আলেমের সাথে হযরতের সম্পর্ক সৃষ্টি হয়। যাদের মধ্যে আল্লামা সাইয়েদ আলভী মালেকী, শায়খ আমীন কাতবী, শায়খ হাসান মুশ্‌শাত, শায়খ ইবনে আরাবী, শায়খ মাহমুদ শাওবিল এবং শায়খ আবদুর রাজ্জাক হামযা বিশেষভাবে প্রসিদ্ধ। সে সময় আরবের যুব সম্প্রদায়, সাহিত্যিক, লেখক ও সাংবাদিকরা আলেমদের গন্ডি থেকে দূরে থাকতো এবং সঠিক দ্বীনী আন্দোলন সম্পর্কে তারা নেতিবাচক মনোভাব পোষণ করতো।

মক্কা শরীফে দীর্ঘ অবস্থানের একটা বড় ফায়েদা ছিল শায়খ উমর ইবনুল হাসান আল শায়খ এর সাথে মাওলানা আলী মিয়াঁর পরিচয়। এই পরিচয় দাওয়াতের কাজে ও জামাআতের পক্ষে খুবই সহায়ক হয়েছিল। তিনি শায়খ

মুহাম্মাদ আব্দুল ওহাব (রহ.)-এর বংশধর ছিলেন। সৌদী সরকারের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় কাযীউল কুযাত ও শায়খুল ইসলাম শায়খ আবদুল্লাহ বিন হাসানের আপন ভাই রিয়াদের "হাইয়াতে আমর বিল মারুফ ওয়া নাহী আনিল মুনকার"-এর প্রধান ছিলেন। আল্লাহ পাকের মেহেরবানীতে তাঁর সাথে হযরত আলী মিয়াঁর গভীর সম্পর্ক হয়ে যায়। তিনি আলী মিয়াঁর আরবী পুস্তিকা মনোযোগ সহকারে পড়েন। তাঁর সাথে এ সম্পর্ক ঐসব লোকের ষড়যন্ত্র ধুলিস্যাৎ করে দিত যারা এই দাওয়াতী কাজের বিরুদ্ধে বিভিন্ন রকমের কুৎসা রটাবার প্রয়াস পেত। শায়খ নিজেই তাদের বিরুদ্ধে লড়তেন। শায়খ উমর এ কাজের ব্যাপারে এতটাই নিশ্চিন্ত হয়ে যান যে, তিনি নিজেই জামাআতের সাহায্য করতেন। তাঁর এই সাহায্য তাঁর ইন্তেকাল পর্যন্ত অব্যাহত ছিল।

সৌদী আরবে অবস্থান কালেই হযরত মাওলানা উপলব্ধি করেছিলেন যে, আরবদের অবস্থা খুবই করুণ। তারা তাদের আসল অবস্থান থেকে দ্রুত গতিতে পাশ্চাত্যের দিকে ছুটে চলেছে। তিনি ব্যথিত চিত্তে ধ্বংসের হাত থেকে তাদের বাঁচানোর জন্য বিভিন্ন সমাবেশে দাওয়াতী কার্যক্রম জোরদার করেন এবং এ বিষয়ে তাঁর স্পষ্ট বক্তব্য তুলে ধরেন। তাঁর এ আবেগপূর্ণ আবেদন আরবের শিক্ষিত ও সুধী সমাজের মনোজগতে এক বিরাট বিপ্লব এনে দেয়। তারা সম্বিত ফিরে পায় এবং নিজেদের ভুল বুঝতে পারে।

হযরত আলী মিয়াঁ এ ব্যাপারে এতটাই পেরেশান হয়ে পড়েন যে, হকের আওয়াজকে কি করে সৌদির আমীর-উমারাদের কাছে পৌঁছাবেন তাঁর উপায় সন্ধান করতে থাকেন। তাঁর সফর শেষ পর্যায়ে এসে গিয়েছিল। তিনি অনেক চিন্তা-ভাবনার পর সৌদী বাদশাহর নিকট অত্যন্ত আবেগের সাথে একখানি পত্র লেখেন। উক্ত পত্রে তিনি আরবদের তৎকালীন অবস্থার কথা উল্লেখ করে আর কিভাবে এই কওমকে ইসলামের মূল ধারায় ফিরিয়ে আনা যায় তার বিস্তারিত আলোচনা করেন। পত্রে তিনি হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীযের রাজত্বকালের খায়ের-বরকতের কথা উল্লেখ করেন। সর্বোপরি সারা দুনিয়ার মুসলমান সৌদী আরবের কাছে কি চায়, কি আশা করে ইত্যাদি বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেন। তিনি বাদশাহদের দায়-দায়িত্ব স্মরণ করিয়ে দেন। এ চিঠি তিনি মাওলানা উবায়দুল্লাহ সাহেবের মাধ্যমে শায়খ উমর বিন হাসানের কাছে পৌঁছে দেন। শায়খ উমর এই চিঠি সৌদী বাদশাহকে পড়ে শোনান।

আরব বিশ্বে দীর্ঘ দাওয়াতী সফর

এ সফর শুরু হয় ১৯৫০ সালের ৪ঠা সেপ্টেম্বরে হযরত রায়পুরীর সঙ্গে হজ্জের সফরের সময়। হজ্জের সফর শেষ হলে হযরত রায়পুরীকে বিদায় দিয়ে তিনি তাঁর কয়েকজন সাথী নিয়ে মক্কা মোকাররমায় অবস্থান করতে থাকেন এবং দাওয়াতী প্রোগ্রাম চালাতে থাকেন।

সে সময় তিনি দাওয়াতী কাজ নিয়ে আরব বিশ্বের প্রাচীন কেন্দ্রীয় মারকায মিসর সফর করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। তিনি সকল রকমের প্রস্তুতি নিয়ে ১৯৫১ সালের ২০ জানুয়ারী ইসলাহী ও দাওয়াতী ছোট কাফেলা নিয়ে জেদ্দা থেকে ইটালীর ওনডা জাহাজে সুয়েজ অভিমুখে রওয়ানা হন এবং মিসর উপস্থিত হন। মিসরে তিনি প্রায় ছয়মাসব্যাপী তাঁর দাওয়াতী মিশনকে খুব কাজে লাগিয়ে তৎকালীন মিসরের সকল শ্রেণীর মানুষের মধ্যে এক নতুন জীবনের প্রেরণা জাগাতে সক্ষম হন। মিসরের পর তিনি সুদান ও দামেশ্‌ক সফর করেন। এ সকল স্থানে তিনি তাঁর খোদাপ্রদত্ত যোগ্যতা দিয়ে আহলে আরবদের আধুনিক শিক্ষিত, ছাত্র, শিক্ষক, সাহিত্যিক ও সাংবাদিকদের মাঝে ব্যাপক ধর্মীয় আলোড়ন সৃষ্টি করেন। এ সফরেও মাওলানা মুয়িনুল্লাহ নদভী ও মাওলানা মুহাম্মাদ রাবে সাহেব এবং মাওলানা উবায়দুল্লাহ বলিয়াভী তাঁর সাথে ছিলেন। মোটকথা তিনি সমাজের উঁচু শ্রেণীর মধ্যে দাওয়াতী ও ইসলাহী মিশনের আকর্ষণ সৃষ্টি করতে সমর্থ হন।

১৯৫১ সালের আগস্ট মাসে তিনি দামেশ্‌ক পৌঁছেন। সেখান থেকে মদীনা ও মক্কায় আসেন এবং পাঁচমাস অবস্থান করেন। অবশেষে এ দীর্ঘ এক বছরের সফর শেষ করে ১৯৫১ সালের অক্টোবর মাসে ভারতে ফিরে আসেন।

==ooo==

অধ্যায়—৬

দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামা ও মাওলানা আলী মিয়াঁ

নদওয়াতুল উলামার প্রতিষ্ঠা ও প্রেক্ষাপট

হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীর শুরুর দিকে এবং ঈসায়ী উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে মুসলিম বিশ্ব বিশৃংখলা ও অনৈক্যের বিভীষিকায় চরম নৈরাশ্য আর বিপর্যয়ের দারপ্রান্তে উপনীত হয়েছিল। এমত পরিস্থিতি থেকে মুসলিম উম্মাহকে রক্ষার একমাত্র উপায় ছিল পরিবর্তনশীল আধুনিকতা ও নিত্য নতুন সমস্যা আর নবতর প্রশ্নগুলোর সুষ্ঠু সমাধান দেয়ার মত যোগ্যতাসম্পন্ন আলেমে দ্বীন তৈরী করা (যারা মুসলিম মিল্লাতের প্রকৃত দিশারী) এবং সেজন্য যথোপযুক্ত শিক্ষা কারিকুলামের মাধ্যমে যুবকদেরকে প্রস্তুত করা।

তখন সমাজে অবাঞ্ছিত বিষয়গুলোর দ্রুত প্রসার ঘটছিল। মুসলমানদের জীবনযাত্রা দু'টি সমান্তরাল ধারায় আটকা পড়ে গিয়েছিল। একদিকে ছিল আলেম সমাজ, যাঁরা আরবী মাদরাসাগুলো থেকে প্রাচীন ধাঁচের শিক্ষাপদ্ধতিতে লেখাপড়া করে বের হয়েছিলেন। অন্যদিকে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত শ্রেণী, যারা কলেজ- ইউনিভার্সিটির আধুনিকতায় লালিত-পালিত হয়ে বের হয়েছিলেন।

এ উভয় শ্রেণী ছিল পরস্পরের নিকট অপরিচিত ও দুর্বোধ্য! পরস্পরের এই দুরত্ব দিন দিন বেড়েই চলছিল। ফলে ক্রমেই এমন একটা আশংকা স্পষ্ট হয়ে দেখা দিচ্ছিল যে, এ উভয়পক্ষের দূরত্বে এমন একটা বিচ্ছিন্নতার সাগর সৃষ্টি হবে যার দ্রুত কোন বিহিত না করলে এ দু'শ্রেণীর মাঝে কোন সেতুবন্ধন রচনা করা সম্ভব হয়ে উঠবে না।

সমস্যা শুধু এ দুই শ্রেণীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। মুসলিম মিল্লাত বিভিন্ন দল-উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। মাযহাবী ফেরকা, বিভিন্ন মাসআলাকে অবলম্বন করে দলবদ্ধতা এবং এক্ষেত্রে একে অপরকে নিকৃষ্ট ও পাপী মনে করা, পরস্পর ঝগড়া-ফ্যাসাদ ছাড়াও একে অপরকে অত্যন্ত কুদৃষ্টিতে দেখতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিল। এ সমস্ত বিষয়ের উপর প্রকাশ্যভাবে দিন-তারিখ ধার্য করে ব্যাপক প্রস্তুতির মাধ্যমে 'মুনাযারা' বা তর্কযুদ্ধ অনুষ্ঠিত

হতো। এসব 'মুজাদালা-মুনাযারা' বা পরস্পর ঝগড়া-ফ্যাসাদ আর তর্ক-বিতর্কের বাজার বেশ সরগরম হয়ে উঠেছিল। কখনো কখনো এসব অনুষ্ঠান চরম আক্রমণাত্মক ও আত্মঘাতি রূপ পরিগ্রহ করতো।

অবস্থা শুধু নেতিবাচক আর নৈরাশ্যজনকই ছিল না, বরং এক দল অন্যদলকে ফাসেক ও কাফের বলে ঘোষণা দেয়ার মত চরম ধৃষ্টতাও দেখাতে শুরু করে। মাদরাসা শিক্ষায় যে সিলেবাস নির্ধারিত ছিল তার সামান্য রদবদল করার কোন সুযোগ আছে বলে মনে করা যেতো না। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সাধারণত চিন্তাধারার প্রশস্ততা ছিল না। আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান, চিন্তাধারা ও ইলমী গবেষণার কোন সুযোগ সেখানে ছিল না। দ্বীনী সার্কেলের অচঞ্চল-গতিহীন আর স্থবিরতায় নিমজ্জমান জীবনযাত্রা তখনই কিছুটা প্রাণবন্ত হতো যখন আলেম সমাজ কোন উপলক্ষে রাজনীতির ময়দানে নেমে আসতেন। মুসলিম উম্মাহর জীবনযাত্রায় যারা অতন্দ্র প্রহরী হবার কথা, সে আলেম সমাজ পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের ধ্বংসাত্মক আক্রমণ ও বিষাক্ত ছোবল থেকে মুসলিম যুব সমাজকে রক্ষা করার গুরু দায়িত্বকে একান্ত হেলাচ্ছলে এড়িয়ে যাচ্ছিলেন। শুধু তাই নয়, শিক্ষিত শ্রেণী ছিল তখন পাশ্চাত্যের তল্পিবাহক। তারা দেশীয় চিন্তা-চেতনা ও কৃষ্টি-কালচার ধ্বংস করার প্রধান হোতাদের দয়া-অনুকম্পার উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিল।

হিজরী ১৩১০, ঈসায়ী ১৮৯২ সালের এই নাজুক ও নিদারুণ ক্রান্তিকালে সময়ের এক আলোকবর্তিকা, বিচক্ষণ ও দূরদর্শী আলেম মাওলানা সাইয়েদ মুহাম্মাদ আলী মুঙ্গেরী (রহ.)-এর একান্ত প্রচেষ্টায় মাদরাসা ফয়যে আম কানপুরের বাৎসরিক সম্মেলনে দস্তারবন্দীর (পাগড়ী প্রদান) সময় 'আঞ্জুমানে নদওয়াতুল উলামা' নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়।

নদওয়াতুল উলামার প্রতিষ্ঠাতা
মাওলানা মুহাম্মাদ আলী মুঙ্গেরী (রহ.)

(১৮৪৬-১৯২৭)

জন্ম ঃ মাওলানা মুহাম্মাদ আলী মুঙ্গেরী (রহ.) ২রা শাবান ১২৬২ হিজরী, মোতাবেক ১৮৪৬ সালের ২৮শে জুলাই উত্তর ভারতের কানপুরে জন্মগ্রহণ করেন। মাত্র দু'বছর বয়সে তিনি পিতৃহারা হন। ফলে শিশুকালে তিনি তাঁর দাদা সাইয়েদ শাহ্ গওস আলী (রহ.)-এর তত্ত্বাবধানে প্রতিপালিত হন।

প্রাথমিক শিক্ষা ঃ তিনি কুরআন শরীফ নিজ চাচা সাইয়েদ জহুর আলীর নিকট ও ফারসীর প্রাথমিক গ্রন্থাদি মাওলানা সাইয়েদ আব্দুল ওয়াহেদ বিলগ্রামীর নিকট অধ্যয়ন করেন। তিনি কুরআন শরীফ হিফয করা শুরু করেছিলেন, কিন্তু শারীরিক অসুস্থতার কারণে এ মোবারক সিলসিলা চালু রাখতে পারেননি।

উচ্চশিক্ষাঃ হযরত মাওলানা মুঙ্গেরী উচ্চ শিক্ষার জন্য ১২৭৭ হিজরীতে কানপুরের ফয়যে আম মাদরাসায় ভর্তি হন। সেখানে তিনি উপমহাদেশের বিখ্যাত আলেম হযরত মাওলানা ইনায়েত আহমাদ কাকুরীর নিকট বিভিন্ন কিতাবপত্র অধ্যয়ন করেন। দু'বছর পর তিনি হজ্জে তাশরীফ নিয়ে গেলে হযরত মুঙ্গেরী মাওলানা ইনায়েত আহমাদ (রহ.)-এর বিখ্যাত সাগরেদ উস্তাযুল উলামা হযরত মাওলানা লুতফুল্লাহ আলীগড়ী ও মাওলানা সাইয়েদ হোসাইন শাহ সাহেবের নিকট ইলম হাসেল করতে থাকেন।

বিবাহঃ মাদরাসা ফয়যে আমে অবস্থান কালে তিনি তাঁর মায়ের অনুরোধে মুযাফ্ফরনগর জেলার খাতুয়ালী হতে দু'মাইল দুরে মুহীউদ্দীনপুরে তাঁরই আত্মীয়ের খান্দানে ২২ বছর বয়সে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন এবং সেখানে দু'বছর অবস্থান করেন।

দরসিয়াতের তাকমীল ঃ ঐ সময় হযরত মাওলানা লুৎফুল্লাহ আলীগড়ী কানপুর হতে আলীগড়ে এসে দরস-তাদরীস শুরু করেন। হযরত মুঙ্গেরী এ সংবাদ পেয়ে সোজা আলীগড়ে এসে পুনরায় উস্তাদের দরসে হাজির হন এবং সিহাহসিত্তাসহ দরসিয়াতের কিতাবাদি সমাপ্ত করেন। হযরত ফযলে রহমান গঞ্জমুরাদাবাদীর নিকট বায়আত হওয়ার পর তাঁর ইলমের পিপাসা নতুনভাবে জাগ্রত হয় ফলে তিনি সে যুগের বিশিষ্ট মুহাদ্দিছ হযরত মাওলানা আহমাদ আলী সাহারানপুরীর নিকট দীর্ঘ এগারো মাস অবস্থান করে সিহাহসিত্তার সনদ হাসেল করেন। হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ আলী ছাত্র জীবনে অন্যান্য ছাত্রদের পড়াতেন। মানতেক, ফালসাফার প্রতি তার তেমন কোন আর্কষণ ছিল না। কুরআন হাদীছের প্রতি তার আগ্রহ ছিল বেশী।

আধ্যাত্মিক সাধনা ঃ ছোটকাল হতেই হযরত মাওলানা আল্লাহওয়ালাদের সোহবত লাভের আশায় পেরেশান থাকতেন। প্রথম দিকে তিনি যথাক্রমে হাফেয মুহাম্মাদ সাহেব ও মাওলানা কারামত আলী (রহ.)-এর সোহবতে নিজেকে সোপর্দ করেন এবং কঠোর রিয়াযত মুজাহাদা সহকারে আধ্যাত্মিক জগতের সিড়িগুলি দ্রুত অতিক্রম করতে সক্ষম হন।

মাওলানা ফযলে রহমান গঞ্জমুরাদাবাদীর খেদমতে ঃ মাওলানা কারামত আলী (রহ.)-এর ইন্তেকালের পর হযরত মুঙ্গেরী আর একজন আল্লাহওয়ালার সন্ধানে নিজেকে ব্যাপৃত রাখেন। ফলে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন তাকে শীঘ্রই একজন আদর্শ কামেল পীরের সোহবত নসীব করেন। যার সোহবতের বরকতে হযরত মুঙ্গেরী অল্প দিনের মধ্যে রূহানী জগতের উচ্চ মার্গে বিচরণ করতে সক্ষম হন। এ বুযুর্গ ছিলেন হযরত মাওলানা ফযলে রহমান গঞ্জমুরাদাবাদী। তিনি ভারত উপমহাদেশের একজন বিখ্যাত বুযুর্গ ও আলেম ছিলেন। হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ আলী মুঙ্গেরী তাঁর হাতে বায়আত হয়ে মাঝে মাঝে তাঁর সোহবতে আসা-যাওয়া করতে থাকেন।

ইজাযত ও খেলাফত ঃ সাহারানপুর হতে ফিরে আসার সময় তিনি গঞ্জমুরাদাবাদে নিজের মোর্শেদের সোহবতে হাযির হয়ে তার থেকে সিহাহসিত্তা হাদীছের সনদ লাভ করেন। ঐ সময় হযরত মাওলানা ফযলে রহমান গঞ্জমুরাদাবাদী তাকে খেলাফত দান করেন।

কর্মজীবন ঃ গঞ্জমুরাদাবাদ হতে ফিরে আসার পর তিনি কানপুরের এক মসজিদে দরস দেয়া শুরু করেন। পরে তিনি কানপুরের বিখ্যাত মাদরাসা ফয়যে আমে ২/৩ বছর শিক্ষাকতা করেন।

নদওয়াতুল উলামা ও দারুল উলূম প্রতিষ্ঠা ঃ হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ আলী মুঙ্গেরী (রহ.) উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকের উপমহাদেশীয় উলামা সমাজ, দ্বীনী মাদরাসা এবং বিভিন্ন ইসলামী আন্দোলনের সাথে জড়িত ব্যক্তিবর্গের নৈরাশ্যজনক অবস্থা কাছ থেকে উপলব্ধি করছিলেন। অন্যদিকে পাশ্চাত্যের ইসলাম বিদ্বেষী আগ্রাসনের ঢেউ ভারতের মুসলমানদের দ্বীনী ও ঈমানী চিন্তা-চেতনাকে ভূলুণ্ঠিত করে চলছিল। এ আগ্রাসনের মোকাবেলায় যে ধরনের ব্যক্তিত্ব তৈরীর প্রয়োজন ছিল তৎকালীন দ্বীনী প্রতিষ্ঠানগুলি সে ধরনের যোগ্য ব্যক্তিত্ব গঠনের কাজ আঞ্জাম দিতে হিমসিম খাচ্ছিলো। এ চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করার জন্য তিনি আল্লাহ পাকের উপর ভরসা করে কানপুরের ফয়যে আম মাদরাসার দস্তারবন্দীর সময় উপস্থিত বিখ্যাত উলামায়ে কেরামের পরামর্শে উপমহাদেশীয় মুসলমানদের সভ্যতা-সংস্কৃতি ও দ্বীনী চিন্তা-চেতনা হেফাযতের উদ্দেশ্যে "নদওয়াতুল উলামা" নামে একটি প্রতিষ্ঠান কায়েম করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

মাওলানা মুহাম্মাদ আলী (রহ.) ১৮৯৮ সালের ২৬শে সেপ্টেম্বর নদওয়াতুল উলামার চিন্তা-চেতনাকে বাস্তবে রূপ দেয়ার জন্য যোগ্য লোক তৈরীর উদ্দেশ্যে নদওয়ার পক্ষ হতে "দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামা" নামে একটি দ্বীনী মাদরাসার ভিত্তি স্থাপন করেন। তিনি এ প্রতিষ্ঠানের প্রথম নাযেম নিযুক্ত হন।

দারুল উলূম হতে বিদায় ঃ দীর্ঘ কয়েক বছর সফলতার সাথে নদওয়াতুল উলামার খেদমতের সাথে সাথে দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামা পরিচালনার পর বিভিন্ন কারণে বিশেষ করে তাঁর পীর ও মোরশেদ হযরত মাওলানা ফযলে রহমান গঞ্জমুরাদাবাদীর ইন্তেকালের পর বিহার ও তার আশেপাশে দাওয়াত ও ইসলাহের ময়দানে এবং ইসলাম বিধ্বংসী কাদিয়ানী ও ঈসায়ী ফেৎনা নির্মূল করার উদ্দেশ্যে তিনি ১৯০৩ সালের ১৯শে জুলাই নদওয়া হতে তাঁর কয়েকজন বিশিষ্ট মুরীদানের আকুল আবেদনে সাড়া দিয়ে বিহারের মুঙ্গেরে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। অবশ্য তিনি তাঁর এ নতুন ময়দানে পদচারণার পরও নদওয়ার সাথে আমৃত্যু সম্পর্ক অটুট রেখেছিলেন।

ইন্তেকাল ঃ হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ আলী মুঙ্গেরী প্রায় অর্ধশতাব্দী কাল ব্যাপী সফলতার সাথে দ্বীনের খেদমত আঞ্জাম দিয়ে ১৯২৭ সালের ১৩ই সেপ্টেম্বর বাদ যোহর মুঙ্গেরে ইন্তেকাল করেন।

নদুয়াতুল উলামার কর্মতৎপরতা ঃ এক বছর পর ১৬, ১৭ ও ১৮ই শাওয়াল ১৩১১ হিজরী, মোতাবেক ২২, ২৩ ও ২৪শে এপ্রিল ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে মাদরাসা ফয়যে আমের ঐ দস্তারবন্দীর সময়ই কানপুরে 'নদওয়াতুল উলামা'র প্রথম সম্মেলনটি বড় আড়ম্বরপূর্ণ ভাবেই অনুষ্ঠিত হয়। বিশিষ্ট চিন্তাবিদ, বুদ্ধিজীবী, ইসলাম দরদী ব্যক্তিবর্গ সেদিন এক জায়গায় জমায়েত হয়েছিলেন এবং তাঁরা আবহমান সমস্যার সুষ্ঠু সমাধানের একটি পথ খুঁজে পেতে চাচ্ছিলেন। এটি ছিল একটি ঐতিহাসিক ও বৈপ্লবিক পদক্ষেপ; এখানে সাধারণ জ্ঞানী-গুণী, বুদ্ধিজীবী, চিন্তাবিদ ও বিচক্ষণ ব্যক্তিদের সাথে উলামায়ে দ্বীন, আধুনিক শিক্ষিতদের সাথে হানাফী মাযহাবের বিশ্ববরেণ্য আলেম, আহলে হাদীছদের সাথে দুনিয়াত্যাগী নির্জনবাসী পীর-বুযুর্গ, আমীর-উমরাহ প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ আর পণ্ডিত বুদ্ধিজীবীদের সাথে, কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সারিবদ্ধভাবে দুর্নিবার এক বিজয় কাফেলা হয়ে মজবুত প্রাচীরের মত উঠে দাঁড়িয়ে ছিলেন।

সংগঠনটির নাম 'নদওয়াতুল উলামা' এ জন্য রাখা হয়েছিল যে, এ সংগঠন মূলতঃ আলেম সমাজেরই চিন্তা-চেতনায় এবং তাদের ডাকেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। আর তাঁরাই এর প্রাণ বলে বিবেচিত হয়েছিলেন। এ সংগঠন যে কয়টি প্রতিজ্ঞা সামনে রেখে যাত্রা শুরু করেছিল তাছিল নিম্নরূপ– (১) মুসলমানদের পারস্পরিক ঐক্য, (২) ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গীর অধীনে ইহ ও পারলৌকিক সফলতার জন্য বিভিন্ন রকম সাংগঠনিক ইসলাহী ও শিক্ষাগত পদক্ষেপ গ্রহণ, (৩) উচ্চতর আদর্শ ও মযবুত কর্মসূচী গ্রহণ, (৪) কুসংস্কার ও কুপ্রথার মূলোৎপাটন, (৫) মুসলমানদের কর্মকাণ্ডের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের জন্য বিভিন্ন মাসলাকের (পথ ও মতের) বিশুদ্ধ আক্বীদা-বিশ্বাসের (আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামায়াত) আলেমদের এক মিলিত প্লাটফরম তৈরী (৬) ইসলামী শরীয়ার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সামনে রেখে দ্বীনী শিক্ষার সিলেবাসে এমন পরিবর্তন-পরিবর্ধন আনা যা বর্তমান চাহিদা পূরণে কার্যকরীভাবে সক্ষম হয়। (৭) উলামায়ে কেরামের দ্বীনী অবস্থার উন্নয়ন এবং তাদের চিন্তা-ভাবনা ও জ্ঞান-বিদ্যার পরিধির ব্যাপক সম্প্রসারণ এবং (৮) এমন আলেম তৈরী করা যারা প্রাচীন ও আধুনিক উভয় দিক থেকে নির্ভরযোগ্য ও মর্যাদার উপযুক্ত হয়ে গড়ে উঠবে। তাঁরা মুসলমানদের ধর্মীয় ও অন্যান্য চিন্তা-চেতনা ও আক্বীদা-বিশ্বাসের এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দেয়ার মত যোগ্যতা অর্জন করতে পারে, যেদিকটায় বেশ কিছুকাল ধরে শূন্যতা বিরাজ করছিল।

এই সমস্ত ব্যক্তি কোন নির্দিষ্ট একটি এলাকার নাগরিক ছিলেন না। বরং বিভিন্ন অঞ্চলের অনেক দূর থেকেই পরস্পর পরস্পরের সাথে সম্পর্ক রাখতেন। কিন্তু জাতির ঘোর দুরবস্থা আর অধঃপতনোন্মুখতা তাঁদেরকে মারাত্মকভাবে মর্মাহত ও ব্যথিত করে তুলেছিল। তাঁরা সবাই এ অবস্থা পরিবর্তনের জন্য আন্তরিকভাবে আশা করতেন, ব্যাকুল হয়ে খুঁজতেন একটি মজবুত অবলম্বন। এটা সেই সময়ের কথা, যখন একদিকে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির আগ্রাসন ইসলামী ঐতিহ্যকে ধ্বংস করে দিচ্ছিল, অন্যদিকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের কেন্দ্রগুলো বিপর্যয়ের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছিল। লাইব্রেরী আর গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলো পোকামাকড়ে দখল করে নিয়েছিল। তার একমাত্র কারণ, মুসলমানরা পরস্পর ঝগড়া-বিবাদ আর দ্বন্দ্ব-কলহে লিপ্ত হয়েছিল। এর অনিবার্য ফলস্বরূপ পাশ্চাত্য শিক্ষাব্যবস্থা, চিন্তা-চেতনা, মন-মস্তিষ্ককে যেভাবে ধোলাই করে ফেলেছিল, সে তুলনায় মুসলমানদের শিক্ষা-সভ্যতা, কৃষ্টি-কালচার রক্ষায় শিক্ষা পদ্ধতির কার্যকারিতা অনেকটা দুর্বল প্রতীয়মান হয়েছিল।

১৩১১ হিজরী, মোতাবেক ১৮৯৪ ঈসায়ীতে যে সংস্কার আন্দোলনের গোড়াপত্তন হয়েছিল, 'নদওয়াতুল উলামা' সংগঠনের মাধ্যমে যে সংস্কার আন্দোলনের অগ্রযাত্রা শুরু হয়েছিল, তা সফলতার সাথেই অগ্রসর হচ্ছিল নির্দিষ্ট মঞ্জিলের দিকে। এই সংগঠনের বার্ষিক সম্মেলন অত্যন্ত সুশৃংখলভাবে এবং ব্যাপক প্রস্তুতির মাধ্যমে আড়ম্বরতার সাথে হিন্দুস্তানের প্রধান প্রধান শহরগুলোতে অনুষ্ঠিত হতে থাকে। এর আলোচনা গোটা হিন্দুস্তানে মানুষের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ে। শুধু এই পর্যন্তই শেষ নয়, এমন একটা পরিবেশ ও সুযোগ সৃষ্টি হয়ে যায় যে, তাঁরা ১৩১৬ হিজরীতে (১৮৯৮ খৃঃ) লাখনৌতে নিজেদের চিন্তাধারা, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অনুসারে একটি সময়োপযোগী দ্বীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান 'দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামা' প্রতিষ্ঠা করেন। যেখান থেকে প্রতি বছর বহু সংখ্যক নামীদামী আলেম, গবেষক, চিন্তাবিদ, লেখক, সাহিত্যিক, কলামিষ্ট, ভাষাবিদ ও দ্বীনের দাঈ হয়ে বের হয়েছেন। যারা নদওয়ার নাম বিশ্বের আনাচে-কানাচে পৌঁছে দিয়েছেন এবং নিজেদের জন্য বিশ্ব দরবারে এক বিশেষ সম্মান ও মর্যাদার আসন দখল করে নিতে সক্ষম হয়েছেন।

নদওয়ার এই গ্রহণযোগ্যতার পেছনে বেশ কিছু কারণ নিহিত ছিল। প্রথমতঃ এটা ছিল সময়ের দাবী অনুযায়ী জাতিকে সমস্যা থেকে উত্তরণের বাস্তবমুখী পদক্ষেপ। নদওয়া জাতিকে দেখাচ্ছিল সফলতার রাজপথ। দ্বিতীয়তঃ এই নদওয়া ধর্মীয় ও জাগতিক উভয় দিকের চাহিদা পূরণে কার্যকরী ভূমিকা রাখতে সক্ষম ছিল। উপরন্তু যুগশ্রেষ্ঠ বুযুর্গ হযরত মাওলানা ফযলে রহমান গঞ্জমুরাদাবাদী (রহ.), শায়খুল আরব ওয়াল আযম হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজেরে মক্কী (রহ.)-এর আন্তরিক দু'আ, উস্তাযুল উলামা মাওলানা লুৎফুল্লাহ আলীগড়ীসহ তৎকালীন আলেম সমাজের গৌরব মাওলানা আব্দুল হাই লাখনৌভীর সুযোগ্য শিষ্যবৃন্দের স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন, মাওলানা সাইয়েদ মুহাম্মাদ আলী মুঙ্গেরী (রহ.)-এর মত আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্বের অক্লান্ত পরিশ্রম, শাহ সুলায়মান ফুলওয়ারীর প্রভাব সৃষ্টিকারী বক্তৃতামাধুরী, মাওলানা শিবলী নোমানীর ব্যাপক অধ্যয়ন, জ্ঞানগভীরতা, মাওলানা মসীহুজ্জামান খান সাহেবের বিচক্ষণতা ও দূরদর্শীতা, মাওলানা সাইয়েদ জহুরুল ইসলাম ফতেহপুরীর গভীর অন্তর্দৃষ্টি, মাওলানা আবু মুহাম্মাদ ইব্রাহীম আরবীর ঐকান্তিকতা আর দরদ, মাওলানা মুহাম্মাদ হুসাইন ইলাহাবাদী, মাওলানা আব্দুল হক হক্কানী সাহেব ও মাওলানা সানাউল্লাহ

অমৃতসরীর জ্ঞান-প্রজ্ঞা, মাওলানা হাবীবুর রহমান খান শিরওয়ানী সাহেবের (সহ-সভাপতি ইয়ারজঙ্গ বাহাদুর) হৃদ্যতা ও প্রভাব-প্রতিপত্তিসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব, মুন্সি আতহার আলী রঈসে কাকুরী ও মাওলানা খলীলুর রহমান সাহারানপুরীর শ্রম-সাধনা ও বুদ্ধিমত্তা, মাওলানা হাকীম সাইয়েদ আব্দুল হাই সাহেবের ধৈর্য, সহনশীলতা আর পাণ্ডিত্য, হুসামুল মুলক শামসুদ্দৌলা নওয়াব সাইয়েদ আলী হাসান খান সাহেবের মধ্যপন্থা নীতি ও বুদ্ধিগত কৌশল, ডাক্তার হাকীম সাইয়েদ আব্দুল আলী সাহেব (রহ.)-এর ধর্মীয় উদার দৃষ্টিভঙ্গী, পুরাতন আর আধুনিক জ্ঞানের গভীরতা ও সংস্কার (যিনি ৩০ বছর নদওয়াতুল উলামায় মহাপরিচালকের দায়িত্ব পালন করেছেন), মাওলানা সাইয়েদ জহুর আহমাদ ও মৌলভী মুহাম্মাদ নাসিম সাহেবের আইনী কঠোরতা আর নিয়মতান্ত্রিকতা, সফলতাপূর্ণ মধ্যস্থতা আর মীমাংসার কিংবদন্তী, মাওলানা গোলাম মুহাম্মাদ সাহেব, মাওলানা সাইয়েদ সুলায়মান নদভী (রহ.)-এর নদওয়ার প্রতিনিধিত্ব, দ্বীনী ও ইলমী দিক-নির্দেশনা এবং বিশ্বে মান-মর্যাদাপূর্ণ আসন দখলে কৃতিত্ব, মাওলানা মাসউদ আলম নদভী সাহেবের জ্ঞান-গরিমা ও বাস্তব অভিজ্ঞতা ইত্যাকার গুণাগুণ ঐ সংস্কার আন্দোলনের দুর্গ নদওয়াতুল উলামায বিদ্যমান ছিল। যার প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া দিন দিন উদ্ভাসিত হচ্ছিল। আর অনুভূত হচ্ছিল যে, মুসলিম মিল্লাতের পুনর্জাগরণ এই সর্বমুখী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমেই আসতে পারে।

নদওয়াতুল উলামার সাথে মাওলানা আলী মিয়াঁর সম্পর্ক

পহেলা আগষ্ট ১৯৩৪ সালে হযরত মাওলানা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী (রহ.) দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামায় একজন শিক্ষক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন এবং ৩১ ডিসেম্বর ১৯৯৯ সালে ইন্তেকাল করেন। পূর্ণ পঁয়ষট্টি বছর তিনি ও নদওয়া পরস্পর জড়িয়ে থাকেন। এ দীর্ঘ সময়ে তিনি একজন শিক্ষক হিসাবে পাঠদানের খেদমত আঞ্জাম দেন। তিনি সহকারী শিক্ষাসচিবের দায়িত্ব পালন করেন। এরপর শিক্ষাসচিবের পদে আসীন হন। অতঃপর পরিচালক হিসেবে নদওয়াতুল উলামার সকল বিভাগের জিম্মাদারী বহন করেন এবং জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত এই পদে বহাল থাকেন। শুরুতে তিনি নদওয়াতুল উলামায় শিক্ষাপ্রাপ্ত, নদভী চেতনাসম্পন্ন আলেম, মুফাসসির ও সাহিত্যিক হিসেবে পরিচিত হতেন। কিন্তু দুনিয়া এমন যুগও প্রত্যক্ষ করেছে যখন নদওয়া তাঁর নামেই পরিচিত হতে থাকে এবং মুসলিম বিশ্বের শিক্ষিত সমাজে সবাইকে ছাড়িয়ে তিনি আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে উঠে

আসে। তাঁর প্রচেষ্টায় যেই নূরানী পরিবেশ ও দ্বীনী প্রাঙ্গণ গড়ে উঠেছিল তার রোশনীতে আজো নদওয়ার প্রতিটি অঙ্গণ দেদীপ্যমান ও সেই অনুগ্রহবারিতে এখানকার প্রতিটি পত্র-পল্লব, সবুজ-শ্যামল ও সজীবতায় ভরপুর।

লাখনৌতে হযরত মাওলানা হোসাইন আহমাদ মাদানী (রহ.)-এর সভাপতিত্বে ১৯৪৯ সালে জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের বার্ষিক কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। হযরত মাদানী (রহ.)-এর সাথে বিশেষ সম্পর্কের কারণে ডাক্তার সাইয়েদ আবদুল আলী (রহ.) এ কনফারেন্সের আহ্বায়ক ছিলেন। এ সময় মাওলানা আলী মিয়াঁ বিভিন্ন যুগের আরবী শিক্ষার সিলেবাস সম্পর্কে একটি চার্ট তৈরী করেন। এতে হিন্দুস্তানের পুরো ইসলামী শিক্ষার ইতিহাস এসে যায়। যেসকল উলামায়ে কেরাম হাদীছে নববীতে গভীরতা ও দক্ষতা রাখতেন এবং মুহাদ্দিছ হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন তিনি তাদেরও একটি তালিকা তৈরী করেন। যুক্তিবিদ্যা, তর্কশাস্ত্র, দর্শন, জ্যোতির্বিদ্যা ও গণিতশাস্ত্রে অভিজ্ঞ উলামায়ে কেরামের নাম, জন্ম ও মৃত্যু তারিখ, তাদের প্রসিদ্ধ গ্রন্থাবলী, প্রবন্ধ ও কবিতার নামও তালিকাভুক্ত করেন। শিক্ষা সিলেবাস কোন যুগে কি ছিল এবং শিক্ষার মান কিভাবে পরিবর্তন হয়েছে এ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ পেশ করেন।

এতে হিন্দুস্তানের শিক্ষার ইতিহাস বিভিন্নভাবে উপস্থাপন করা হয়। হিন্দুস্তানের কোথায় কোথায় মাদরাসা ছিল, কোথায় খানকাহ ছিল তা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়। এ চার্টটি দারুল উলূমের আব্বাসীয়া হলে ঝুলিয়ে দেয়া হয়। কনফারেন্সে অংশগ্রহণকারী উলামায়ে কেরাম ও শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গ সেখানে এসে তা পর্যবেক্ষণ করেন। এটি ছিল মাওলানা আলী মিয়াঁর এক উল্লেখযোগ্য ইলমী অবদান।

১৯৪৮ সালে যখন হযরত মাওলানা সহকারী শিক্ষাসচিব নিযুক্ত হন তখন হিন্দুস্তানে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল। এ সময়ই

ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين

এর উর্দু অনুবাদ প্রকাশ পায়। এরপর মিসর থেকে মূল আরবীতে 'লাজনাতুত তালীফ ওয়াত তারজমা' এ গ্রন্থ প্রকাশ করে। হযরত সাইয়েদ সুলায়মান নদভী (রহ.)-এর মৃত্যুর পর ১৯৫৪ সালে তিনি শিক্ষাসচিব মনোনীত হন। লেখালেখির ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকে। দারুল উলূমের উস্তাদদের সংশোধন ও শ্রেণীকক্ষে গিয়ে তাদের ক্লাসের খোঁজ-খবর নেয়া

এবং তাদের মতামত ও পরামর্শ অনুযায়ী সিলেবাসে পরিবর্তন ও সংযোজনের কাজও সমানতালে চলছিল। হেজাযের দ্বিতীয় সফর থেকে ফিরে তাঁর প্রিয়ভাজন ও নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিত্ব হযরত মাওলানা মুয়ীনুল্লাহ সাহেব কনস্ট্রাকশনের দায়িত্ব নিজ কাঁধে তুলে নেন এবং সফরে ও নদওয়ায় অবস্থানকালে তাঁর সার্বক্ষণিক সাহচর্য গ্রহণ করেন।

হযরত মাওলানা মুয়ীনুল্লাহ সাহেবকে আল্লাহ তা'আলা চতুর্মুখী যোগ্যতা দান করেছিলেন। মাওলানা আলী মিয়াঁ (রহ.) নদওয়াতুল উলামার পরিচালক হওয়ার পর নিয়মতান্ত্রিকভাবে না হলেও কার্যত তিনিই নদওয়ার ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব আঞ্জাম দেন। বিল্ডিং নির্মাণ, মসজিদে বৈদ্যুতিক পাখার ব্যবস্থা, রাস্তাঘাট নির্মাণ ও সংস্কার, শিক্ষকদের কোয়ার্টার নির্মাণ, মযবুত বৈদ্যুতিক খুঁটি তৈরী এসব মাওলানা মুয়ীনুল্লাহ সাহেবের অবদান। হযরত মাওলানা আলী মিয়াঁ পরিচালক হওয়ার পর মাদরাসার ব্যবস্থাপনা ও আর্থিক যোগানের দায়িত্ব মাওলানা মুয়ীনুল্লাহ সাহেব গ্রহণ করেন এবং অত্যন্ত সুন্দরভাবে তা আঞ্জাম দেন। হযরত মাওলানার জনপ্রিয়তাকে ওসীলা করে নদওয়ার জন্য বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টিতে তাঁর ভূমিকাই ছিল সবচেয়ে বেশি। ডাক্তার সাইয়েদ আব্দুল আলী যখন রোগাক্রান্ত হন মূলতঃ তখন থেকেই হযরত মাওলানা আলী মিয়াঁ পরিচালনার দায়িত্ব পালন করেন এবং তাঁরই পরামর্শে তিনি মুয়ীনুল্লাহ সাহেবকে তাঁর দক্ষিণ হস্ত ও নির্ভরতার প্রতীক মনে করতেন। ক্রমান্বয়ে ছাত্রদের সংখ্যা বাড়ছিল। একে একে রাহমানিয়া হল, সুলায়মানিয়া হল, শিবলী হলের পার্শ্বের তিনতলা ছাত্রাবাস নির্মিত হয়। এরপর অন্যসব বিল্ডিং নির্মিত হয়। দেখতে দেখতেই ডালপালা ছড়িয়ে নদওয়ার চেহারায় নতুন জীবনের ছায়া ফুটে ওঠে।

হযরত মাওলানা আলী মিয়াঁ পরিচালক থাকাকালে পুরো হিন্দুস্তানে নদওয়া শুধু একটি মাদরাসা হিসাবেই পরিচিত ছিল না, বরং চেতনা ও চিন্তাধারার এক বিপ্লবী ও স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত প্রতিষ্ঠান ছিল। অবশ্য ছাত্রসংখ্যা খুব কম ছিল। কারণ সামর্থ্য নেই এমন ছাত্রদের বৃত্তি ও ফ্রী থাকার ব্যবস্থা ছিল না এবং দেশের বিভিন্ন অঞ্চল ঘুরে চাঁদা আদায় করার নির্ধারিত কোন লোকও ছিল না। হায়দারাবাদ ও অন্যান্য কিছু এলাকার বিত্তবানদের সাহায্যই মাদরাসার আয় ছিল। আর এটা জানা কথা যে, মাদরাসায় সামর্থ্যবান ছাত্রদের সংখ্যা সব সময়ই কম, সামর্থ্য নেই এমন ছাত্রদের সংখ্যাই বেশি। বিত্তবান, উচ্চবিত্ত ও উচ্চমধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলেরা

সাধারণত স্কুল, কলেজে পড়াশুনা করে। মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত পরিবারের ছেলেরাই মাদরাসায় পড়তে আসে। অর্থ ব্যয় করে তাদের পড়াশোনার সুবিধা থাকে না। এদের জন্য নদওয়ায় সুযোগ খুব কম ছিল। ছাত্র সংখ্যার স্বল্পতা বিভিন্ন ধরনের খারাপ ধারণার জন্ম দিত। কোন কোন মহল প্রচার করছিল, জাতি নদওয়ার সিলেবাস গ্রহণ করেনি; বরং ইসলামী ইতিহাসের পতন যুগে প্রণীত পুরাতন দরসে নেযামীর সিলেবাসই জাতির কাছে গ্রহণযোগ্য ও সমাদৃত। অথচ বাস্তবতা হল, দারুল উলূম নদওয়া সূচনা লগ্ন থেকেই বিশেষ ধারায় চলছিল এবং জনসাধারণ থেকে চাদাঁ আদায়ের জন্য এর বিশেষ কোন ব্যবস্থা ছিল না। তাছাড়া এমন ব্যক্তিত্বেরও অভাব ছিল যারা দ্বীনদার ও পণ্ডিত ব্যক্তি হিসাবে সর্বসাধারণের কাছে সমাদৃত। আর যারা ছিলেন, তাদের ব্যাপারে পূর্ণ নির্ভরতার সাথে বলা যায় যে, তাঁরা স্বীয় সাবজেক্টে শ্রেষ্ঠতম আলেম ছিলেন।

হযরত মাওলানা হায়দার হাসান খান (রহ.), মাওলানা শিবলী, মাওলানা মুহাম্মাদ নাযেম নদভী, মাওলানা আবদুস সালাম কাদওয়ায়ী (রহ.) প্রমুখ যুগশ্রেষ্ঠ আলেম ও পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। কিন্তু তাদের সাথে সর্বসাধারণের সম্পর্ক ছিল না। হযরত মাওলানা আলী মিয়াঁ (রহ.) প্রাচীনপন্থী ও প্রগতিবাদী উভয়শ্রেণীর আস্থা অর্জন করেন। তিনি সত্যিকারের নদভী চিন্তা-ধারা ও চেতনার নমুনা ছিলেন। নদওয়ার প্রতিষ্ঠাতাগণ যে ধরনের যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব গড়তে চেয়েছিলেন হযরত মাওলানা ছিলেন তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তিনি সাইয়েদ সুলায়মান নদভীর মত নদভী চিন্তাধারা থেকে চুল পরিমাণও না হটে নতুন প্রজন্মের জন্য আদর্শ পথ-নির্দেশক ছিলেন। মাওলানা মুয়ীনুল্লাহ সাহেব (রহ.) যখন হযরত মাওলানার জনপ্রিয়তা, ইলমী ও রূহানিয়তকে কাজে লাগিয়ে লোকদেরকে দ্বীনী শিক্ষার জন্য নদওয়ার প্রতি আকৃষ্ট করেন, তখন দলে দলে ছাত্র নদওয়ায় আসতে থাকে। এতে নদওয়ার উদারসূলভ চিন্তাধারা ব্যাপকতা লাভ করে এবং সর্বমহল এর প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকার করে।

মোটকথা, হযরত মাওলানা আলী মিয়াঁ পরিচালক থাকাকালে 'নদওয়া' স্বীয় চিন্তাধারা ও শিক্ষার মানে অধিষ্ঠিত থেকেও মুসলিম বিশ্বে পূর্ণ গ্রহণ-যোগ্যতা অর্জন করে, স্বদেশের হৃদয়বান ও ন্যায় নিষ্ঠাবান মুসলমানগণ এর স্বীকৃতি প্রদান করে। কিছু লোক যারা নদওয়ার মূল চিন্তাধারার সাথে পরিচিত নয়, যাদের জ্ঞানের পরিধি সীমিত, তারা নদওয়ার নামে কিছু

অপপ্রচারের চেষ্টা করে, যেমন বলা হত–নদওয়াকে দেওবন্দের পদ্ধতিতে সাজানো হচ্ছে। অথচ এক দিনের জন্যও নদওয়া অন্য কোন মাদরাসার সিলেবাস অথবা শিক্ষাপদ্ধতি গ্রহণ করেনি এবং অনদভী চিন্তাধারার অনুসরণ করেনি। অতীত বছরগুলোতে নদওয়াকে একটি 'এ্যারাবিক কলেজ' নামে প্রচারের প্রচেষ্টা চালানো শুরু হয়। যখন এ ধারণার অপনোদন করা হয় তখন লোকেরা কঠোরভাবে এর বিরোধিতা শুরু করে।

হযরত মাওলানাকে আল্লাহ তা'আলা সার্বজনীনতা ও মুসলিম বিশ্বে জনপ্রিয়তা দান করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে তিনিই নদভী চিন্তাধারার সাথে মানুষকে পরিচিত করিয়েছেন। নিঃসন্দেহে তিনি বুযুর্গানে দ্বীন থেকে পাওয়া আধ্যাত্মিকতার ফয়েযে নদওয়াকে সিক্ত করেছেন। তাঁর দু'আর প্রভাব অনস্বীকার্য। তিনি আধ্যাত্মিকতা, খোদাভীতি ও পরকালভীতির যে প্রাণ জাগ্রত করার প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন তাতে কিছুটা অতৃপ্তি ও পিপাসা ছিল সত্য, কিন্তু চেতনার বিনির্মাণে, চিন্তাধারা ও ইলমী স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে, নদওয়ার বুনিয়াদি উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে এবং সিলেবাসের পরিবর্তন-পরিবর্ধন ও উন্নয়নে এক বিন্দুও অতৃপ্তি, অসম্পূর্ণতা ও অসামঞ্জস্যতা থাকেনি। বরং অন্যান্য প্রতিষ্ঠান কোন না কোন উপায়ে নদওয়ার সিলেবাসের কাছাকাছি আসার চেষ্টা করেছে অথবা নাম পরিবর্তন করে ঐ কাঠামো অবলম্বনের চেষ্টা করেছে। মোটকথা, প্রশ্ন উত্থাপনকারী আগের হোক বা পরের হোক তাদের কথা সম্পূর্ণ বাস্তবতা বিবর্জিত ছিল। আসল সত্য তাই যা হযরত মাওলানা তার পরিচালক থাকাকালে সামর্থ্যের সবটুকু দিয়ে পরিচিত করিয়েছেন, প্রচার করেছেন, যার উর্ধ্বগতি ও অগ্রসরতা কামনা করেছেন। দ্বীনী খেদমতের যে ধারাবাহিকতা তিনি শুরু করেছিলেন, সদকায়ে জারিয়া হিসাবে তার সওয়াব ও পুরস্কার ইনশাআল্লাহ তিনি পেতে থাকবেন। হযরত মাওলানা তাঁর এ কথাগুলি নিজের আত্মজীবনী "কারওয়ানে জিন্দেগী"-এর প্রথম খণ্ডে এভাবে উল্লেখ করেছেন। পাঠকের সুবিধার্থে হুবহু নিম্নে তা তুলে ধরা হল

"দ্বীন ও আকায়েদের ক্ষেত্রে খালেস দ্বীনের উপরই নদওয়াতুল উলামার মত ও পথের ভিত্তি, সর্বপ্রকার দোষ-ত্রুটি ও মলিনতা থেকে পবিত্র, ব্যাখ্যা ও বিকৃতি থেকে মুক্ত, মিশ্রণ ও ভণ্ডামী থেকে দূরে এবং সবদিক থেকে পরিপূর্ণ ও নিরাপদ।

দ্বীনের অনুধাবন, তার ব্যাখ্যা ও প্রকাশের ক্ষেত্রে নদওয়ার নীতি হল, ইসলামের প্রাথমিক, নির্মল ও পরিচ্ছন্ন উৎসধারাকে অবলম্বন এবং মূলের দিকে ফেরার মানসিকতা।

আমল ও আখলাকের ক্ষেত্রে এর নীতি হল, দ্বীনের মগজ ও মৌল জিনিসকে গ্রহণ করা, তার উপর দৃঢ়তার সাথে কায়েম থাকা। আহকামে শরইয়্যার উপর আমল, হাকীকতে দ্বীন ও রূহে দ্বীনের সাথে নৈকট্য এবং তাকওয়া ও আত্মসংশোধনকে সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান।

ইতিহাস বিচারের ক্ষেত্রে তার ভিত্তি এই সিদ্ধান্তের উপর যে, ইসলামের উত্থান ও বিকাশের যুগ সবচেয়ে উত্তম ও মর্যাদাবান যুগ। নবুয়তের ছায়াতলে ও রেসালাতের আদর্শে যারা দীক্ষা লাভ করেছেন এবং কুরআন ও ঈমানের শিক্ষালয় থেকে তৈরী হয়ে বের হয়েছেন, তাঁরাই সবচেয়ে বেশী আদর্শবান ও অনুসরণযোগ্য। আমাদের সৌভাগ্য ও নাজাত, সফলতা ও কামিয়াবী এতেই সীমাবদ্ধ। অতএব বেশী বেশী তাঁদের জ্ঞান ও ইলম আমরা আহরণ করব এবং তাঁদের পদচিহ্ন অনুসরণ করে চলার চেষ্টা করব।

বিদ্যার্জন ও শিক্ষা দর্শনের ক্ষেত্রে নদওয়ার দৃষ্টিভঙ্গি হল, জ্ঞান মূলত সবই এক ধরনের; পুরাতন ও নতুন, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের শব্দ দ্বারা জ্ঞানকে বিভাজন করা যায় না। যদি কোন বিভাজন সম্ভব হয়, তবে তা হবে শুদ্ধ ও অশুদ্ধ, উপকারী ও অপকারী হিসাবে, আহরণের মাধ্যম ও উদ্দেশ্যের বিচারে। জ্ঞানদান ও জ্ঞান আহরণে, গ্রহণ ও বর্জনে নদওয়ার নীতি সেই বিজ্ঞোচিত নববী শিক্ষার উপর ভিত্তিশীল যা মহানবী (সা.) সাহাবায়ে কেরামকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন, "জ্ঞান মুমিনের হারানো সম্পদ, যেখানেই সে তা পায়, সেই তার সবচেয়ে বেশী হকদার" এবং প্রজ্ঞাময় সেই পুরাতন উক্তির উপর যে, خذ ماصفا ودع ماكدر যা কিছু পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন তা নিয়ে নাও এবং যা কিছু অপবিত্র ও অস্বচ্ছ তা পরিহার কর।

ইসলামের শত্রুদের মোকাবেলায় এবং আজকের প্রগতিবাদী ধর্মহীন শক্তির প্রতিরোধে নদওয়ার দৃষ্টিভঙ্গি আল্লাহর এ বাণীর উপর যে,

واعدّوا لهم ما استطعتم من قوّة

তাদের মোকাবেলায় যথাসম্ভব সবটুকু শক্তি তোমরা অর্জন কর।

দাওয়াত ইলাল্লাহ, ইসলামের সৌন্দর্য ও মাহাত্ম্যের ব্যাখ্যা, বিবেক ও বুদ্ধিকে তার হক্কানিয়্যাতের ও সত্যতার উপর নিশ্চিত করার জন্য নদওয়ার পদক্ষেপ হল, সেই বিজ্ঞোচিত উপদেশের উপর যে,

كلموا الناس على قدر عقولهم اتريدون ان يكذب الله و رسوله

মানুষের সাথে কথা বল তাদের বিবেকের পরিধি অনুসারে। তোমরা কি চাও, আল্লাহ ও তাঁর রাসুলকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা হোক।

আকায়েদ ও মৌলিক নীতিমালার ক্ষেত্রে নদওয়া আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের পথের অনুসরণ এবং সকলের মতামত ও গবেষণালব্ধ সিদ্ধান্তের আওতাধীন থাকাকে জরুরী মনে করে। ফুরূয়ী ও ফিকহী মাসায়েলের ক্ষেত্রে এর দৃষ্টিভঙ্গি হল, যতটুকু সম্ভব ইখতিলাফী মাসায়েল ও ঐসকল পথ পরিহার করা যদ্বারা পারস্পরিক দলাদলি এবং উম্মতের মাঝে বিভক্তি এসে যায়। সলফে সালেহীনের প্রতি সুধারণা পোষণ করতে হবে এবং তাঁদের কাজের সঠিক ও সুন্দর ব্যাখ্যা দিতে হবে। ইসলামের স্বার্থকে সামগ্রিক স্বার্থের উপর প্রাধান্য দিতে হবে।

সংক্ষেপ কথা হল, নদওয়া হাকীমুল ইসলাম শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলভী (রহ.)-এর চিন্তাধারার সাথে বেশী ঘনিষ্ট ও সামঞ্জস্যপূর্ণ। এই হিসাবে নদওয়াতুল উলামা সাধারণ একটি প্রতিষ্ঠানই নয়; বরং পরিপূর্ণ ও বহুমুখী এক বিপ্লবী চেতনায় উদ্দীপ্ত প্রতিষ্ঠান, চিন্তাধারার একটি নতুন সঙ্গমস্থল।

নদওয়াতুল উলামার দ্বীনী মাসলাক, জ্ঞানার্জন ও ইতিহাস পর্যালোচনার দৃষ্টিভঙ্গি, চিন্তাধারা এবং এ আন্দোলনের প্রকৃতি বুঝাতে এবং নদওয়াতুল উলামার প্রতিষ্ঠাতাগণের গভীর দৃষ্টি ও দূরদৃষ্টি সম্পর্কে ধারণা দিতে যেয়ে হযরত মাওলানা আলী মিয়াঁ বলেন, "মুসলমানরা হিন্দুস্তানে এসে যে ইসলামী-হিন্দুস্তানী কৃষ্টি ও সভ্যতার জন্ম দিয়েছে সে কৃষ্টি ও সভ্যতার মাঝে আড়ম্বরতাও আছে, বিনয়-নম্রতাও আছে, সাহসিকতাও আছে, নৈতিকতাও আছে, গভীরতাও আছে, কাঠিন্যও আছে, সিক্ততাও আছে, আবার সহিষ্ণুতাও আছে। তাঁর আঁচলে উলূমে শরীয়তও আছে, হেকমতও আছে, সাহিত্য ও কবিতাও আছে, দারিদ্র ও দরবেশীও আছে, সুক্ষ্মদর্শিতাও আছে, আবার সৌখিনতাও আছে। তার প্রিয় ময়দান কেল্লাও আবার কুতুবখানাও। এখানে মাদরাসাও আছে, খানকাহও আছে। আবার গবেষণা ও রচনার পরিসরও আছে। তাতে গাম্ভীর্য আছে, আবার কৌতুকও আছে। তার মতামত প্রকাশের ও যোগ্যতার স্বাক্ষর রাখার মাধ্যম– আরবী, উর্দু, ফার্সী, হিন্দী প্রতিটি ভাষাই।

আরবী ভাষা, সাহিত্য, ব্যাকরণ ও ফিকাহ-এর নতুন গ্রন্থসমূহ প্রণয়নে মাওলানার অবদান

নতুন সিলেবাসের প্রয়োজনীয়তা

নদওয়াতুল উলামা আন্দোলন সূচিত হয় সুনির্দিষ্ট শিক্ষানীতি, অভিজ্ঞতা ও অধ্যয়নের উপর ভিত্তি করেই। দ্বীনী শিক্ষা ব্যবস্থায় নতুন প্রাণ সঞ্চারের এবং পরিবর্তনশীল যুগ ও পরিবর্তিত সমাজ ব্যবস্থার বৈধ ও স্বভাবগত চাহিদার সাথে দ্বীনী শিক্ষাকে সঙ্গতিপূর্ণ করতে চেয়েছিল এ আন্দোলন। তাছাড়া কিতাবের পরিবর্তে সাবজেক্টের সাথে, মাসায়েলের পরিবর্তে মাকসাদের সাথে, মুতাআখখিরীনের শাব্দিক বিতর্ক, মস্তিষ্ক প্রসূত ভাবনা এবং ব্যাখ্যাগ্রন্থ ও টীকায় মেধা ব্যয়ের পরিবর্তে মুতাকাদ্দেমীনের জ্ঞান নিঃসৃত ও রুচিশীল পদ্ধতি পুনর্গঠনে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিল। এ জামাআত সাথে সাথে আরবী ভাষাকে একটি জীবন্ত ও জাগ্রত ভাষারূপে পাঠদানের ব্যবস্থা করার প্রয়াসী ছিল। যাতে করে আরবদের মাঝে দাওয়াত ও পূনর্গঠনের কাজ করা যায় এবং ছাত্র, শিক্ষক ও শিক্ষা সমাপ্তকারীদের মাঝে আরবী পঠন-পাঠন, লিখন ও বক্তৃতার যোগ্যতা সৃষ্টি হয়। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নে এবং শিক্ষকদের সামনে এর উদাহরণ পেশ করার জন্য ১৩১৬ হিজরী লাখনৌতে দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামা নামে এর প্রধান মারকায প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রয়োজন ছিল দু'টি জিনিসের

এক, এমন সিলেবাস প্রণয়ন যা এসব বৈশিষ্ট্য ধারণ করবে এবং সেসব গ্রন্থের প্রয়োজনীয়তা হ্রাস করবে যা তার মান ও উদ্দেশ্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়, বরং বাধ্য হয়ে তা গ্রহণ করা হয়েছিল। যে সিলেবাস এই বিদ্যাপীঠের দৃষ্টিভঙ্গি ও উদ্দেশ্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয় এবং যা ছাত্রদের জ্ঞান ও রুচিকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করে তা অবলম্বন করা এক ধরনের স্ববিরোধিতা এবং যে মহান উদ্দেশ্যে এ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল তা ব্যর্থ করার প্রচেষ্টার নামান্তর।

দ্বিতীয় মৌলিক প্রয়োজন ছিল– সেসকল উস্তাদ তৈরী ও প্রস্তুত করা যারা এ আন্দোলন ও প্রতিষ্ঠানের চিন্তাধারা ও মানসিকতার সাথে শুধু পুরোপুরি একমতই নয়; বরং তাঁরা প্রত্যেকে এর একজন আহবায়ক ও বাস্তব নমুনা হবেন। যারা নিজেদের সমস্ত যোগ্যতা, সহযোগিতা ও আন্তরিক প্রচেষ্টা এ শিক্ষা পদ্ধতির সাফল্য অর্জনে ব্যয় করবেন এবং অন্য সকল শিক্ষা ব্যবস্থার

মোকাবেলায় এর স্বাতন্ত্র্য তুলে ধরবেন। শুরুতেই এ শিক্ষা ব্যবস্থা ও সিলেবাসের সাথে পরিচিত ও অভিজ্ঞ শিক্ষক পাওয়া না গেলেও এজন্য প্রয়োজন ছিল অত্যন্ত সতর্কতার সাথে অভিজ্ঞলোক খুঁজে বের করা এবং সূক্ষ্মভাবে তাদেরকে যাঁচাই-বাছাই করা।

কিন্তু এ এক তিক্ত ঐতিহাসিক বাস্তবতা যে, নদওয়াতুল উলামা তার প্রারম্ভিক যুগে প্রতিকূল ও রুগ্ন অবস্থা অতিবাহিত করে। অল্পকালের মধ্যে আভ্যন্তরীণ মতানৈক্য দেখা যায় এবং তার শক্তি ও সময়ের বড় অংশই অর্থনৈতিক সুবিধা সৃষ্টি, কনস্ট্রাকশন, পারস্পরিক মতভেদ দূরীকরণে, দেশের মাঝে পরিচিত হতে ও দ্বীনী হালকাতে বিশ্বাসভাজন হতে ব্যয় হয়েছিল। এর ফলে চাহিদা ও প্রয়োজন অনুসারে নতুন সিলেবাস প্রণয়ন এবং উপযুক্ত শিক্ষকমণ্ডলী তৈরীর সুযোগ ঘটেনি। তাই দরসে নেযামীর পুরাতন সিলেবাসের এক বড় অংশ এর শিক্ষা ব্যবস্থায় গৃহিত হয়।

উস্তাদগণের বৃহত্তর অংশও পুরাতন পদ্ধতির মাদরাসা থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত এবং পুরাতন সিলেবাস পাঠদানে অভ্যস্ত ছিল। এ কারণেই প্রাথমিক সময়ে দারুল উলূম নিজ দেশে ও বহির্বিশ্বে নিজের সঠিক যোগ্যতা প্রমাণ করতে পারেনি এবং বড় কোন অবদান রাখতে ব্যর্থ হয়। এ প্রতিষ্ঠানের কিছু সংখ্যক মহান শিক্ষার্থী যে ব্যতিক্রমী উদাহরণ ছিলেন তাঁরা ব্যক্তিগত অধ্যয়ন ও পরিশ্রম এবং কোন মহান ব্যক্তি বা উস্তাদের সাহচর্যের বদৌলতে স্বাতন্ত্র্য অর্জন করেছিলেন এবং পুরাতন সিলেবাস পড়েও (যাতে কিছু নতুন কিতাবও ছিল এবং নামকাওয়াস্তে আধুনিক বিষয় অন্তর্ভুক্ত ছিল) উদার চিন্তা-চেতনা, গভীর জ্ঞান, উচ্চাঙ্গের উর্দু আরবী সাহিত্য রুচি, গবেষণা ও বিশ্লেষণ ক্ষমতা, রচনা ও সংকলনের উদাহরণ সৃষ্টি করেছিলেন।

এ অবস্থা দারুল উলূমের ষষ্ঠ পরিচালক মৌলভী হাকিম ডাক্তার সাইয়েদ আব্দুল আলী সাহেব (বি.এস.সি. এম.বি.বি.এস) (হযরত মাওলানার বড় ভাই) পরিচালক পদে আসীন হওয়া পর্যন্ত ছিল। ডাক্তার সাহেব দীর্ঘ তিরিশ বছর নদওয়াতুল উলামার পরিচালক ছিলেন। এ দীর্ঘ সময়ে তিনি নদওয়াতুল উলামার ব্যবস্থাপনা পরিষদের অসাধারণ সহযোগিতা লাভ করেছিলেন এবং তাদের আস্থা অর্জনে সমর্থ হয়েছিলেন। এ সময়ে ছাত্রদের দু'টি স্ট্রাইক ছাড়া নদওয়াতুল উলামা সকল ধরনের হাঙ্গামা ও বিশৃংখলা মুক্ত থাকে। ডাক্তার সাহেব পুরাতন ও আধুনিক, প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের জ্ঞানের সমন্বিত রূপ ছিলেন। তিনি একাধারে নদওয়াতুল উলামার শিক্ষাসমাপক, দারুল উলূম দেওবন্দের

বিশিষ্ট আলেম, সায়েন্সের মেধাবী ছাত্র ও ডিগ্রীপ্রাপ্ত ছিলেন। দু'টি রাজকীয় পদক লাভ করেছিলেন। তিনি প্রাচীন ও আধুনিক চিকিৎসা বিদ্যার একজন প্রখ্যাত চিকিৎসক ছিলেন। সাথে সাথে ছিলেন শান্ত স্বভাবী। সায়েন্সের সুশৃংখল ছাত্রজীবন এবং যুগের অবস্থা ও প্রেক্ষিত অনুসারে আধুনিক ও গবেষণাধর্মী অধ্যয়ন তাঁকে বাস্তববাদী বানিয়েছিল। বিশেষ করে তাঁর প্রতি শিক্ষাসচিব মাওলানা সাইয়েদ সুলায়মান নদভীর পূর্ণ সহযোগিতা ও আস্থা ছিল। এছাড়া মাওলানা মাসউদ আলম সাহেব যিনি দারুল উলূমের কাজে বিশেষ আন্তরিকতা রাখতেন। অর্থসচিব মুনশী এহতেশাম আলী সাহেব যিনি নদওয়ার কার্যনির্বাহী পরিষদের প্রবীণ সদস্য এবং প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। নবাব সদর ইয়ারজং বাহাদুর, মাওলানা হাবীবুর রহমান খান শেরওয়ানী প্রমুখ উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিবর্গ তাঁর গুণমুগ্ধ, সহায়ক ও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। এসব কারণে সে সময় ও পরিবেশ সিলেবাস সংশোধন, উন্নয়ন ও তাতে পরিবর্তন-পরিবর্ধন আনয়নে এবং অন্যান্য উন্নয়নমূলক কাজের সমাপ্তির জন্য সবদিক থেকে উপযুক্ত ও অনুকূল ছিল।

ডাক্তার সাহেব সর্বপ্রথম আরবী ভাষা ও ব্যাকরণ শিক্ষার পরিবর্তন ও সংস্কার শুরু করেন। যদিও আরবী ভাষা ও সাহিত্য উন্নয়নে নদওয়ার প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে মাওলানা সাইয়েদ মুহাম্মাদ আলী মুঙ্গেরী (রহ.) স্বীয় লেখনী ও বক্তৃতায় এর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তার উপর খুব জোর দিয়েছিলেন এবং তার সুষ্ঠু ও মানসম্পন্ন শিক্ষার জন্য তিনি কোন কোন আরবী সাহিত্যিকের শরণাপন্ন হয়েছিলেন। কিন্তু এ দীর্ঘ সময়ে আরবী ভাষা শিক্ষার জন্য নদওয়ার শিক্ষাসমাপক আলেমদের কলমে একটি মাত্র গ্রন্থ "দুরুসুল আদব" ১ম ও ২য় (মাওলানা সাইয়েদ সুলায়মান নদভী রচিত) প্রকাশ পেয়েছিল। এ কিতাবটি শুধু নদওয়ার সিলেবাসেই অন্তর্ভুক্ত হয়নি; বরং অন্যান্য মাদরাসায়ও পাঠ্য তালিকাভুক্ত হয়েছে। ভারতে এ ধরনের প্রচেষ্টা এটাই ছিল প্রথম। কিন্তু এর পরের গ্রন্থগুলো প্রণীত হয়নি, যেগুলো আরবী গদ্য ও পদ্যের সিলেবাসে পূর্ণতা আনবে, আরবী সাহিত্যের বিভিন্ন শাখা ও ভঙ্গিমার মাধ্যমে ছাত্রদের পরিচিত করবে এবং বক্তৃতা ও লেখনীর মাধ্যমে নিজ ভাবনা ও বক্তব্য প্রকাশের যোগ্যতা সৃষ্টি করবে। দীর্ঘকাল দুরুসুল আদব ও মাকামাতে হারারীর মাঝে (যা নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্যের কারণে সাহিত্যের ছাত্রদের জন্য সব সময়ের জন্যই উপযোগী ও গুরুত্বপূর্ণ) আর কোন পাঠ্যগ্রন্থ ছিল না। বাধ্য হয়ে প্রাচীন গদ্যের কিছু গ্রন্থের সাহায্য নেয়া

হয়েছে। দীর্ঘকাল "এখওয়ানুস সাফা" (যা মূলতঃ সাহিত্যের গ্রন্থ নয়) পাঠ্য তালিকাভুক্ত ছিল। কিছুদিন মুহাম্মাদ তালাআত হারবের "তারিখু দুওয়ালিল আরব ওয়াল ইসলাম" এবং "সিরাতে মুগলতায়ী" পড়ানো হয়। আল্লামা যামাখশারী (রহ.)-এর "আতওয়াকুয যাহাব"ও পাঠ্যভুক্ত ছিল। পদ্যের জন্য "দিওয়ানে আবুল আতাহিয়াহ" পাঠ্যভুক্ত ছিল এবং এ নির্বাচন খারাপও ছিল না। এর পরের স্থান ছিল গদ্যে "হারীরী" এবং পদ্যে "হামাসা" ও "মুআল্লাকাত"।

আরবী ভাষা ও সাহিত্যের সিলেবাসে সংস্কারের সূচনা

মাওলানা সাইয়েদ আব্দুল আলী সাহেব (হযরত মাওলানার বড় ভাই) সর্বপ্রথম মিসরের শিক্ষামন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রণীত আরবী পাঠ্যপুস্তক সিলেবাসভুক্ত করার ইচ্ছা করেন। সেসময় সিলেবাসে সামান্যতম পরিবর্তনও ব্যবস্থাপনা পরিষদের মঞ্জুরী ছাড়া সম্ভব ছিল না। সাইয়েদ সাহেব এবং উস্তাদ খলীল আরব সাহেব এর উদ্যোক্তা ছিলেন এবং তাঁরা মাওলানা সাইয়েদ সুলায়মান নদভীর সমর্থন পাবেন বলে আশা করছিলেন।

সাইয়েদ সাহেব এ ব্যাপারে খুব সুন্দর একটি ঘটনা বলতেন। তিনি বলেন, নিয়ম অনুযায়ী "কাকুরী কুঠিতে" (মুনশী এহতেশাম আলী সাহেবের নিবাস) ব্যবস্থাপনা পরিষদের বৈঠক ছিল। মাওলানা শেরওয়ানী (নবাব সদর ইয়ার জং) সভাপতিত্ব করছিলেন। খলীল আরব সাহেব ভুলে গিয়েছিলেন বা কোন জরুরী কাজে আটকা পড়েছিলেন, তিনি বৈঠকে আসেননি। সাইয়েদ সাহেব প্রস্তাব পেশ করলেন যে, "আল-কেরাআতুর রাশীদা" সিলেবাসভুক্ত করা হোক। শেরওয়ানী সাহেব বলেন, এ প্রস্তাব সমর্থন করেই সাইয়েদ সাহেব চুপ থাকলেন। মুনশী এহতেশাম আলী সাহেব বললেন, আমি সমর্থন করি। বিপক্ষে কেউ হাত তুললেন না। প্রস্তাব পাশ হয়ে গেল। সাইয়েদ সাহেব বললেন, আমি মুনশী সাহেবকে (তিনি আরবী জানতেন না, আলেমও ছিলেন না) জিজ্ঞাসা করলাম আপনি এ প্রস্তাব কিভাবে সমর্থন করলেন? তিনি বললেন, "এ প্রস্তাব তোমার পক্ষ থেকে এসেছে আর তোমার উপর আস্থা আছে বলেই আমি তোমাকে সমর্থন করেছি।"

এ ঘটনা থেকে বুঝা যায় যে, সিলেবাস পরিবর্তন কত মুশকিল ও কঠিন ছিল। "আল কেরাআতুর রশীদা" এর পুরো সিরিজ পাঠ্যভুক্ত হওয়ার কিছু

পরেই মিসরের প্রখ্যাত শিশু সাহিত্য রচয়িতা কামেল কিলানীর "হেদায়াতুল আতফাল" সিরিজ পাঠ্যভুক্ত হয়।

হেদায়াতুল আতফাল" শিশুদের পছন্দ অনুযায়ী ও ভাষা শিক্ষার আধুনিক নিয়মে লিখিত, সহজ ও প্রাঞ্জল ভাষা, ধাপে ধাপে অগ্রসরতা, মজার মজার ঘটনা ও ছবি দ্বারা সাজানো; তবে দ্বীনী রূহানিয়াত ও চারিত্রিক শিক্ষা থেকে সম্পূর্ণ শূন্য ছিল। সারা বইতে কোথাও আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উল্লেখ নেই। বিভিন্ন প্রাণীর ঘটনা ও ছবিতে ভরা বইটিকে সহজেই খৃষ্টান লেখকের নামে চালানো যেত। কিন্তু এতসব দোষত্রুটি সত্ত্বেও এ ছিল ভাষা শিক্ষার জন্য সফল ও বাচ্চাদের জন্য আকর্ষণীয় ও সুন্দর একটি বই।

'মুখতারাত' সংকলন

আরবী ভাষা-সাহিত্যের সিলেবাস আধুনিকায়নের জন্য প্রয়োজন ছিল প্রথমে 'হেদায়াতুল আতফাল' ও 'আল কেরাআতুর রাশিদার' পরিবর্তে এমন বই তৈরী করা যা ভাষার মৌলিক নিয়মাবলী, শিশুদের মানসিকতা ও আধুনিক শিক্ষার অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ হওয়ার সাথে সাথে ইসলামের নৈতিক ও চারিত্রিক শিক্ষা, মহান ইসলামী ব্যক্তিত্বদের পরিচিতি এবং ইসলামের কৃষ্টি-সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতিবিম্ব বলে প্রমাণিত হবে। কিন্তু বাস্তবতা সব সময় ভাবনা ও চাহিদার অনুকূল হয় না। হযরত মাওলানা তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন, "আমার সর্বপ্রথম ইচ্ছা হল আমি আরবীতে এমন সব গদ্য ও পদ্যের সমন্বয়ে একটি সংকলন তৈরী করি, যা সাহিত্যের প্রথম যুগ থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত সব যুগেই উচ্চাঙ্গের সাহিত্য হিসেবে সমভাবে স্বীকৃত হবে। যা কাব্যিক ছন্দ, লৌকিকতা ও কৃত্রিমতা মুক্ত, যা হৃদয়ের আবেগ-উচ্ছ্বাস, সুস্থচিন্তা এবং সদুদ্দেশ্যের প্রতিচ্ছবি এবং যা আরবী ভাষাকে শুধু একটি রূপ ও ঢঙ্গে প্রকাশ করবে না। এমনই এক গ্রন্থ মাকামাতে হারীরী যা গোটা ভারতের পাঠ্য তালিকা ও শিক্ষাঙ্গনে ছয়শত বছর আধিপত্য করেছে। এই মৌলিক চিন্তা বাস্তবায়নে প্রথমে মুখতারাত সংকলনের প্রয়োজন অনুভূত হয় এবং এর উপর ভিত্তি করেই পরে মানসুরাত (গদ্য) সংকলন ও অন্যান্য গ্রন্থ রচনা করা হয়। অবশেষে ১৯৮১ সালের ১৭-১৯ এপ্রিল দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামাতে–

الندوة العالمية للأدب الاسلامى

শীর্ষক এক আন্তর্জাতিক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। যাতে প্রচুর সংখ্যক আরবী সাহিত্যিক, গুণীজন, অনেক গুরুত্বপূর্ণ ও বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং বিভিন্ন আরবী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহিত্য বিভাগের প্রধানগণ অংশগ্রহণ করেন।

হযরত মাওলানা লেখেন যে, আমি হাদীছ পড়ার সময়ই লক্ষ্য করেছিলাম, সহীহ হাদীছ গ্রন্থে এমন অনেক দীর্ঘ রেওয়ায়েত আছে যাতে সাহাবী কিংবা সাহাবিয়াগণ হুযুরের (সা.)-এর বা নিজের কোন সফরের ঘটনা, সফরের অবস্থা, জীবনের গুরুত্বপূর্ণ কোন ঘটনা বিস্তারিতভাবে, অকৃত্রিম ও নিঃসংকোচে বর্ণনা করেছেন এবং তাতে আবেগ-অনুভূতির রূপ ও চিত্র নিজস্ব সৌন্দর্য নিয়ে ফুটে উঠেছে। হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণিত হাদীছে হিজরত, হাদীছে ইফক, হযরত হালীমা সাদিয়া (রা.) বর্ণিত দুগ্ধ পানের ঘটনা, হযরত কাব ইবনে মালিক (রা.) বর্ণিত তাবুক যুদ্ধ ও তাদের পরীক্ষা ইত্যাদি এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এসব হাদীছে আরবী ভাষা ও আরব সাহিত্যিকদের বর্ণনা শক্তি সর্বোচ্চ মানের। আরবী ভাষা, আরবী ভাষার প্রকাশ ভঙ্গী ও আরবী প্রবাদ-প্রবচন-বাগধারার উৎকৃষ্ট নমুনা কুরআনে কারীমে ছাড়া আরবী ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে কোথাও পাওয়া যাবে না। এমনিভাবে ঐসকল হাদীছও উল্লেখযোগ্য, যেখানে প্রাঞ্জলভাষী ও বাগ্মী কোন সাহাবী হুযুর (সা.)-এর শারীরিক সৌন্দর্যের বা অন্য কোন প্রখ্যাত সাহাবীর দৈহিক রূপের বিবরণ দিয়েছেন।

যখন আয-যিয়া-এর প্রকাশনা শুরু হয় তখন হযরত মাওলানা প্রথম সংখ্যায় আল-আদাবুন নববী (নবী সাহিত্য) শিরোনামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। ১৯৫৭ সালে দামেস্কের বিশ্ববিখ্যাত ও প্রাচীন গবেষণা প্রতিষ্ঠান 'আল-মাজমাউল ইলমী' হযরত মাওলানাকে ভারতবর্ষ থেকে একমাত্র সদস্য হিসাবে নির্বাচন করে এবং তাদের পত্রিকায় প্রকাশের জন্য আরবী ভাষার যে কোন দিক নিয়ে একটি প্রবন্ধ রচনার অনুরোধ করে। হযরত মাওলানা "আরবী ভাষার লাইব্রেরী নতুন করে মন্থন করা জরুরী" শিরোনামে আরবী সাহিত্য ও তার ইতিহাসকে পুনর্বিন্যাস করা ও তার সেসকল মণিমুক্তা খুঁজে বের করার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে প্রবন্ধ রচনা করেন এবং এর জন্য সাহিত্যে ব্যাপক ও উদার দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলার পরামর্শ দেন। এটা হযরত মাওলানার এক সময়ের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল এবং প্রত্যেক ভাষার ক্ষেত্রেই তিনি এ দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করেছেন। তারিখে দাওয়াত ও আযীমাত (অনুবাদ- ইসলামী রেনেসাঁর অগ্রপথিক)-এর ৩য় খণ্ডে মাওলানা মাখদুম বিহারীর 'মাকতুবাতে

ছেছদী'-এর সাহিত্য মাধুরী সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি একথা উল্লেখ করেছেন, সদর ইয়ারজং-এর ভূমিকাতেও এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

বড় ভাইয়ের অনুমতিক্রমে হযরত মাওলানা সংকলনের কাজ শুরু করেন। ১৩৫৯ হিজরী (১৯৪০ সালে) এমন এক সংকলন প্রস্তুত হয় যা দারুল উলূমের মাধ্যমিক ষষ্ঠ শ্রেণীর মানসম্পন্ন, যার পরে কঠিন ইবারত আয়ত্ত করার যোগ্যতা সৃষ্টির জন্য এবং অন্যান্য দ্বীনী মাদরাসাগুলোর সাথে মিল রক্ষার জন্য শুধু মাকামাতে হারীরী পড়ানোর প্রয়োজন অবশিষ্ট থাকে। তিনি সংকলনে ঐসকল দীর্ঘ হাদীছ ও সীরাতের বর্ণনা ছাড়াও ভাষার মাধুর্যতা ও প্রাঞ্জল বর্ণনার উৎকৃষ্ট উদাহরণ রূপে বিবেচিত অনেক গদ্য-পদ্যকে এবং এমন ব্যক্তিবর্গের আলোচনা স্থান দিয়েছেন, যাদেরকে সাহিত্যাঙ্গণে সাহিত্যিক বা কবি হিসেবে কল্পনাও করা হয় না। এটি তাদের প্রতি এক ধরনের 'অপবাদ' যা সুধারণার ফলাফল। যেমন– শায়খ মহীউদ্দীন ইবনে আরাবী (শায়খে আকবর), হযরত হাসান বসরী, ইবনুস সাম্মাক মাসউদী, ইমাম গাজালী, ইবনে জাওযী, ইবনে হিব্বান আল বাসতী, হাফেয ইবনে তাইমিয়াঁ, আল্লামা ইবনে কাইয়িম, ইবনে খালদুন, শাহ ওয়ালী উল্লাহ প্রমুখ।

সংকলন তৈরীর পর এক-দু'বছর তিনি ক্লাসে ছাত্রদের তা লিখিয়ে দিতেন। কিন্তু এতে প্রচুর সময় ব্যয় হত। তাই তা ছাপানোর প্রয়োজন অনুভব করেন। শিক্ষাসচিব মাওলানা সাইয়েদ সুলায়মান নদভী (রহ.) সম্মতি প্রদান করেন। তৎকালে আরবী টাইপ হিন্দুস্তানে শুধুমাত্র দু'জায়গায় ছিল–'দায়েরাতুল মাআরেফ' হায়দারাবাদ ও 'মাতবায়ে কায়্যিমা' বোম্বাই। অবশেষে লাখনৌর নিযামী প্রেসে তা ছাপানোর ব্যবস্থা হয় এবং তার স্বত্ত্বাধিকারী মির্যা মুহাম্মাদ জাওয়াদ এমন নিপুণ কারিগর দ্বারা কেতাবাত করালেন যাকে স্বাভাবিক দৃষ্টিতে টাইপের ছাপা মনে হত। ছাপানোর পূর্বে মাওলানা আব্দুল হাফিয বলিয়াবী (মেসবাহুল লোগাত প্রণেতা এবং দারুল উলূমের আরবী সাহিত্যের উস্তাদ)-কে হযরত মাওলানা কঠিন শব্দগুলোর বিশ্লেষণ ও প্রয়োজনীয় টীকা সংযোজনের অনুরোধ করেন। তাঁরা অত্যন্ত উৎসাহের সাথে এ কাজে এগিয়ে আসেন এবং মেধা ও পরিশ্রম ব্যয় করে এ খেদমত আঞ্জাম দেন। রমযানুল মোবারক ১৩৬১ হিজরী, মোতাবেক

১৯৪২ সালে এ সংকলন প্রথম বের হয়। কিছুদিন পরেই হযরত মাওলানা বন্ধুবর মাওলানা আব্দুস সালাম সাহেবের পরামর্শে ছাত্রদের সুবিধার্থে এ গ্রন্থ দু'খণ্ডে বিভক্ত করেন।

১৯৫৬ সালে দামেশ্‌ক ইউনিভার্সিটির দাওয়াতে হযরত মাওলানা (রহ.) যখন দামেশ্‌ক গমন করেন তখন সুযোগের সদ্ব্যবহার করে 'আল-মাতবাআতুল জাদীদা' তে নদওয়াতুল উলামার পক্ষে এর প্রথম খণ্ড অত্যন্ত সুন্দর টাইপে প্রকাশ করেন এবং তার স্টক হিন্দুস্তানে পাঠিয়ে দেন। চার-পাঁচ বছর পরে ১৯৬২ সালে ২য় খণ্ড 'দায়েরাতুল মাআরেফ' হায়দারাবাদ থেকে ছাপানোর সুযোগ হয়। ১৩৮৫ হিজরী (১৯৬৫ সালে) বৈরুতের মাকতাবাতু দারিল ফিকরিল হাদীছ, লেবানন এ বইখানি দৃষ্টি নন্দন ছাপা ও উন্নত কাগজে এক ভলিউমে প্রকাশ করে। এতে প্রথমবারের মত বইখানি আরব বিশ্বে প্রচারের ও সাগ্রহে পাঠের উপযোগী হয় এবং এ বছরই তা দামেশ্‌ক ইউনির্ভাসিটির শারইয়্যাহ অনুষদের আরবী সাহিত্যের সিলেবাসভুক্ত হয়। একজন হিন্দুস্থানী লেখকের জন্য এটা বড় সম্মান ছিল যে, নির্ভেজাল আরবী ভাষা ও সাহিত্যের উপর লিখিত তাঁর কোন বই আরব ইউনির্ভাসিটির পাঠ্যতালিকাভুক্ত হল।

ঐ সময় বিশিষ্ট আরবী সাহিত্যিক ও প্রবন্ধকার (যাকে হযরত মাওলানা তাঁর দক্ষ রচনাশৈলী ও শক্তিমান লেখনীর কারণে মিসরের অনেক প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও কলামিষ্টের উপর প্রাধান্য দিতেন, সাহিত্যাঙ্গণে যার খ্যাতি ক্রমশঃ বিস্তৃতি লাভ করছিল) দামেস্কের হাইকোর্টের বিচারক এবং বাগদাদ ইউনিভার্সিটির আরবী সাহিত্য বিভাগের সাবেক প্রফেসর উস্তাদ আলী তানতাবীর দৃষ্টিও এ গ্রন্থের উপর পড়ে। তিনি 'মুখতারাত' এর ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং অন্যদের প্রাচীন সংকলন পদ্ধতির সমালোচনা করেন। তিনি বলেন, আরবী সাহিত্যের ঐতিহাসিক গ্রন্থ রচয়িতাগণ কিভাবে ঐসব সাহিত্যিক ও প্রাবন্ধিকের গোলাম হয়ে আছে এবং আমাদের ছাত্র ও তরুণদেরকেও সেই চার দেয়ালের মাঝে আবদ্ধ করে রেখেছে, যারা সাহিত্য রচনাকে জীবনের আসল সত্য ও আত্মিক সৌন্দর্যের ভাষ্যরূপে গ্রহণ করার পরিবর্তে কথার ফুলঝুরি, শাব্দিক অলংকরণ, শৈল্পিক নৈপুণ্য ও ভেল্কি প্রদর্শনের আখড়ায় পরিণত করেছে?

মুখতারাত খুব দ্রুত গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে। তবে তা অনেকাংশেই আধুনিক অঙ্গনে ও ইউনিভার্সিটির বি.এ. এমএ. ক্লাসের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

শায়খ উবায়েদ মুহাম্মাদ আরব সাহেবের (খলীল আরব সাহেবের সহোদর, তিনি আরবী সাহিত্যের সিলেবাস বিন্যাসের অধিকাংশ কমিটির মেম্বার ছিলেন এবং যিনি কোন আরব রাষ্ট্র প্রধানের পক্ষ থেকে প্রথম পদক লাভ করেন) ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় আলীগড় ও ইলাহাবাদ থেকে নিয়ে হায়দারাবাদ ও মাদ্রাজের ইউনির্ভাসিটির কোর্সে এ বইখানি অন্তর্ভুক্ত হয়। অবশ্য আমাদের পুরোনো মাদরাসাগুলোতে তা বহু কষ্টে স্থান পায়, কিন্তু স্থান হতে না হতেই আবার ছাঁটাই করা হয়। তাদের পদক্ষেপ–

انظر الى ما قال و لاتنظر الى من قال

অর্থাৎ "কি বলা হচ্ছে তা দেখ, কে বলছে তা দেখ না" এর পরিবর্তে

انظر الى من قال ولاتنظر الى ما قال

অর্থাৎ "কে বলেছে তা দেখ, কি বলছে তা দেখ না" এর উপর। হযরত মাওলানা লেখেন, তবে এটা জেনে খুবই উৎসাহবোধ করছি ও আনন্দিত হয়েছি যে, আমাদের মুহতারাম উস্তাদ ও আরবী সাহিত্যের সবচেয়ে বড় শিক্ষক মাওলানা এজায আলী সাহেব তা পছন্দ করেছেন। এটা তখনকার কথা যার কিছুদিন আগে তিনি নিজেই 'নফহাতুল আরব' নামে একটি সংকলন তৈরী করেছিলেন এবং 'নফহাতুল ইয়ামান' এর স্থানে সমস্ত মাদরাসাতে (বিশেষ করে যেসব মাদরাসা দেওবন্দের অনুসারী ছিল) পাঠ্যভুক্ত হয়। কিছুকাল পরে এ মুখতারাতের উপর সৌদী আরবের শিক্ষামন্ত্রণালয়ের একজন পদস্থ কর্মকর্তার নজর পড়ে। তিনি তা কলেজের সিলেবাসভুক্ত করার সুপারিশ করেন এবং বিশ হাজার কপির অর্ডার দেন। ১৩৯৮ হিজরী, ১৯৭৮ সালে "দারুশ শুরুক জিদ্দা" তা প্রকাশ ও প্রচারের ব্যবস্থা করে।

আল কেরাআতুর রাশেদা

হযরত মাওলানার বেশ কয়েক বছর নিচের ক্লাসগুলোতে মিসরের শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রস্তুতকৃত "আল কেরাআতুর রশীদা" (القراءة الرشيدة) সিরিজ পড়ানোর সুযোগ ঘটে। বইটি ভাষাগত শুদ্ধতা, পাঠের নিয়মনীতি, শিশুদের পছন্দ, বয়স ও সাধারণ জ্ঞান সবদিক থেকেই সফল এবং দ্বীনী রূহ ও চারিত্রিক শিক্ষা থেকেও খালি নয়; কিন্তু বইটি মূলতঃ মিসরের শিশুদের (যাদের একটি বড় অংশ খৃষ্টান ও কিবতী) জন্য সংকলন করা হয়েছিল।

তাতে ঘটনাক্রমে এবং অনেকটা প্রয়োজনে আঞ্চলিক ও দেশীয় ছাপ ছিল। বেশীরভাগ পাঠেই মিসরের আশপাশের অঞ্চল, প্রাচীন নিদর্শন ও

মিসরের ব্যক্তিত্বদের সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। যেমন– জাযিরাতুর রওযা, আল-আহরাম, আল-কানাতিরিল খাইরিয়্যাহ, হিওয়ার বাইনা মিসর ওয়াল এসকান্দারিয়্যাহ, আঞ্চলিক উৎসব ও মাহফিল, যেমন– ঈদু ওফাইন নীল। ব্যক্তিত্বদের মধ্যে মুহাম্মাদ আলী পাশা সম্পর্কে স্বতন্ত্র অধ্যায় আছে। সবচেয়ে বড়কথা, তাতে মিসরের জাতীয় সংগীতও আছে, যাতে মিসরের বড়ত্ব ও মহিমা কীর্তন করা হয়েছে এবং তার বিশেষত্ব বর্ণনা করা হয়েছে। আরবী মাদরাসার হিন্দুস্থানী মুসলমান শিশুদের জন্য এ সংগীতে কি মাধুর্য ও আকর্ষণ থাকতে পারে? এমনিভাবে "ঈদু ওফাইন নীল" যাতে মিসরের খৃষ্টানরা দারুণ আকর্ষণ অনুভব করে, হিন্দুস্তানের অবস্থার সাথে এর কি সামঞ্জস্য রয়েছে? হযরত মাওলানা বলেন, ধীরে ধীরে অন্তরে এ খেয়াল আসতে শুরু করে যে, এর স্থান পূরণের জন্য আরবী শিশু পাঠ্যের নতুন সিরিজ লেখা প্রয়োজন। ভাই সাহেবের উপস্থিতি, সাইয়েদ সাহেবের স্নেহ এবং সেসময়ে দারুল উলূমের মুহতামিম মাওলানা ইমরান খান সাহেব থাকাতে এ বিষয়ে পুরোপুরি নিশ্চয়তা ছিল যে, যদি এ সিরিজ তৈরী হয়ে যায় তবে সিলেবাসভুক্ত হতে সময় লাগবে না। সুতরাং তিনি আল্লাহর নাম নিয়ে কাজ শুরু করে দেন। সম্ভবত ১৯৪৪ সালের কাছাকাছি সময়ে রচনার কাজ শুরু হয় এবং দু'বছরের মধ্যেই তার তিনটি খণ্ড তৈরী হয়ে যায়।

বইতে খুব সতর্কতার সাথে লক্ষ্য রাখা হয় যে, যাতে কোন পাঠই যেন দ্বীনী উপদেশ থেকে খালি না যায় এবং এ থেকে যেন কোন দ্বীনী বা আখলাকী রেজাল্ট বের হয় অথবা কোন দ্বীনী শিক্ষা বা শিষ্টাচারের প্রতি নির্দেশনা হয়। এ পদ্ধতিতে ছাত্ররা টেরও না পায় যে, কোন জিনিস উপর থেকে বা বাহির থেকে আমদানী করা হচ্ছে। উদাহরণ হিসাবে ২য় খণ্ডের ماذا (কোর্তার কাহিনী) تاريخ القميص (রুটির এক টুকরা) كسرة من الخبز (তুমি কি হতে চাও) تحب ان تكون (সাতজনের একজন হও) كن احد السبعة দ্রষ্টব্য। সাধারণ জ্ঞান হিসাবে আল-আইন, আল-আসাদ, আল-জামাল, আল-কাতেরা, জিসমুন নাবাত, আল-বাখেরা ইত্যাদি সবক। ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর মধ্য থেকে رسالة الى رسول الله الحنين الى الشهادة فى بيت الى ابو الانصارى ইত্যাদি সবক, বড় ব্যক্তিত্বদের মধ্যে খলীফা উমর ইবনে আব্দুল আযীয, ইমাম মালেক, সুলতান মাহমুদ গজনবী, শেরশাহ সূরী, সুলতান মুজাফ্ফর হালিম, আওরঙ্গজেব আলমগীর এবং আলেমদের মধ্যে

থেকে ইমাম গাজালী, ইবনে তাইমিয়াঁ, মোল্লা নিযামুদ্দীন ফিরিঙ্গী মহল্লী ও শাহ আবদুল আযীয সাহেবকে নেয়া হয়েছে। শিক্ষা কেন্দ্র থেকে জামেয়া আযহার, দারুল উলূম দেওবন্দ, মাযাহেরুল উলূম ও নদওয়াকে নেয়া হয়েছে। কুতুব মিনারের ভাষায় المنارة تحدث (মিনারের আত্মকথা) শিরোনামে হিন্দুস্তানের ইসলামী শাসনের ইতিহাসকে অত্যন্ত আকর্ষণীয় ভঙ্গিমায় উপস্থাপন করা হয়েছে, যাতে হিন্দুস্তানের ইসলামী ইতিহাসের সারবস্তু এবং সহস্র পৃষ্ঠার সার সংক্ষেপ এসে গেছে। من النجوم الى الارض শিরোনামে ইসলামী ইতিহাসের সেই আলোকচ্ছটা কিঞ্চিত তুলে ধরা হয়েছে, যা দর্শকের দৃষ্টিতে একটি নক্ষত্রের মত ধরা পড়ে। এই সিরিজ লাখনৌ থেকে ছাপার পরে প্রথমে দারুল উলূম নদওয়াতে অতঃপর অন্য সব মাদরাসায় পাঠ্যভুক্ত হয়ে যায় এবং পাকিস্তানেও ছেপে সেখানকার মাদরাসার সিলেবাসভুক্ত হয়।

কাসাসুন নাবিয়্যীন লিল আতফাল

হযরত মাওলানা যেই খেদমত ও আল্লাহর তাওফীকের সবচেয়ে বেশী শুকরিয়া আদায় করতেন এবং যাকে মাগফেরাতের ওসীলা ও আখেরাতের সম্বল মনে করতেন তা হল কাসাসুন নাবিয়্যিন সিরিজ। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে দারুল উলূমে কামেল কিলানী রচিত "হেকায়াতুল আতফাল" সিরিজ পাঠ্যভুক্ত ছিল। তৎকালে আরব বিশ্বের সর্বত্র তা জনপ্রিয় ও সমাদৃত ছিল। হযরত মাওলানা বলেন, "আমারও এ কিতাব পড়াতে হয়েছে। আমাকেও এর জন্য খালেছ প্রগতিবাদী হয়ে যেতে হত এবং বিভিন্ন জীবজন্তুর ছবি সামনে নিয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা পড়াতে হতো। কিন্তু মাখদুম ও মুহতারাম মাওলানা আবদুল মাজেদ দরিয়াবাদী (যার দ্বীনী সম্ভ্রমবোধ ও অনুভূতি আলেমদের গর্বের বিষয় ছিল) বিশেষ করে এদিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি ১৯৪২ সালে আমার কাছে লিখিত এক পত্রে এ বই পাঠ্যভুক্ত হওয়াতে সমালোচনা করেন।

এ কাজ সম্ভবত ৪৩-৪৪ সনের মাঝামাঝিতে শুরু হয়েছিল এবং এর ধারাবাহিকতা সফরে ও নিজ গৃহে অবস্থানকালে ট্রেনে, রাস্তার পার্শ্বে, পরিবহণের অপেক্ষায় থাকা কালে, লাহোর, সোহাওয়া ও নিযামুদ্দীনে অবস্থান কালে চলাফেরায় মানসিক বিক্ষিপ্ততার অবস্থাতেও জারি ছিল এবং আল্লাহর তাওফীকে এক সময় তা সমাপ্ত হয়।

হযরত মাওলানা বলেন, এটি শুরু করার পর মনে হত আল্লাহ তা আমার জন্য এ কাজ এত সহজ করে দিয়েছেন যে, যখনই চাইতাম সাধারণ কথাবার্তা বলার মতো অনায়াসে লিখতে পারতাম।

পুরো বইতে তিনটি বিষয় অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়েছে– এক, বই কুরআনের ভাষায় লেখা। স্থানে স্থানে কুরআনের আয়াত অলংকার রূপে জুড়ে দেওয়া হয়েছে।

দুই, শব্দ ভাণ্ডার (Vocabulary) কম, কিন্তু পুনঃ উল্লেখ ও পুনঃ আবৃত্তির দ্বারা স্মৃতিতে অংকন করে দেয়া হয়েছে।

তিন, ইসলামের বুনিয়াদি আকায়েদ (তাওহীদ, রিসালাত ও পরকাল)-এর শিক্ষা ও আলোচনা প্রসঙ্গত এসে গেছে।

চার, ঘটনা বিশদ লেখা হয়েছে এবং তাতে এমন পথ-নির্দেশনা রয়েছে যাতে কুফর ও শিরকের প্রতি ঘৃণা, তাওহীদ ও ঈমানের মুহাব্বত ও আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামের প্রতি শ্রদ্ধা শিশুদের হৃদয়ের গভীরে প্রোথিত হয়ে যায় এবং এসবই হয় অবচেতন মনে।

এ কিতাবে শিশুদের আকায়েদ শুদ্ধ করা ও তাদের মন-মানসিকতা গড়ে তোলার খোরাক আছে। তাই এর প্রতি মাওলানা আব্দুল মাজেদ দরিয়াবাদী (রহ.)-এর দৃষ্টি পড়ে সর্বপ্রথম। তিনি এর উপর মতামত পেশ করতে গিয়ে বলেন, এ কিতাবের মাধ্যমে শিশুদের ইলমে কালাম তৈরী হয়ে গিয়েছে। মাওলানা মাসউদ আলম সাহেব তার ভূমিকায় লেখেন, "এ কিতাবে ভাষা সাহিত্য ও দ্বীনকে এমনভাবে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে, যেমন নখ গোশতের সাথে মিশে থাকে।" মাওলানা আব্দুল মাজেদ (রহ.) এ কিতাবের এত মূল্যায়ন করেছিলেন যে, তিনি চাইতেন হযরত মাওলানা সব কাজ ছেড়ে এর পিছনে সময় ব্যয় করুন। কিন্তু ৩য় খণ্ড শেষে (হযরত মূসা (আ.) সম্পর্কিত) এ ধারাবাহিকতা বন্ধ হয়ে যায়।

কিতাবের ২য় এডিশন যখন মিসর থেকে ছাপা হয়েছিল, তখন হযরত মাওলানা চেয়েছিলেন, যেন সাইয়েদ কুতুব এর ভূমিকা লেখেন। তিনি ভূমিকা লেখেন এবং তাতে হৃদয় খুলে বইটির প্রশংসা করেন।

এ কিতাব মিসরের পর বৈরুতের প্রসিদ্ধ প্রকাশনা সংস্থা 'মুআসসাতুর রিসালাহ'-এর পক্ষ থেকে কয়েক হাজার কপি প্রকাশ পায় এবং সৌদি আরবের বহু প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠ্যভুক্ত হয়। হিন্দুস্তান ও

পাকিস্তানের বহু মাদরাসা, স্কুল ও কলেজে আরবী শাখায় তা সিলেবাসভুক্ত হয়। হযরত মাওলানা বলেন, যদি আমার কোন কিতাব পাঠ্যভুক্ত না হওয়াতে আশ্চর্যবোধ এবং বন্ধুসুলভ অভিযোগ করার সুযোগ থাকে, তবে তা এ কিতাব সম্পর্কে। এ কিতাব একই সাথে ভাষার দক্ষতা সৃষ্টি ও দ্বীনী মূল্যবোধ জাগ্রত করে। কিন্তু আত্মকেন্দ্রিকতা ও আত্মপ্রীতি অনেক বড় বড় সত্যকে ঢেকে দেয়। অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছি, এ ব্যাপারে আধুনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং আধুনিক শিক্ষিত শ্রেণী অনেক বেশী উদার ও প্রসারিত দৃষ্টিসম্পন্ন প্রমাণিত হয়েছে।

মাওলানা আব্দুল মাজেদ সাহেবের মত ব্যক্তির তাগাদা, অনুরোধ এবং কিতাব সম্পর্কে তার উঁচু দৃষ্টিভঙ্গি সত্ত্বেও প্রায় ত্রিশ বছর অতিবাহিত হয়ে যায়, কিন্তু তৃতীয় খণ্ডের পর ৪র্থ খণ্ড লেখার এবং অবশিষ্ট নবীদের সম্পর্কে বিশেষ করে খাতামুন্নাবিয়্যিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মোবারক জীবনচরিত সম্পর্কে (আরবী ভাষায় শিশুদের জন্য যে গ্রন্থের স্বল্পতা প্রচণ্ডভাবে অনুভূত হত) লেখার জন্য হযরত মাওলানা সুযোগ করে উঠতে পারছিলেন না।

১৩৯৫ হিজরী, ১৯৭৬ সনে রমযান মাসে হঠাৎ করে এ ব্যাপারে তিনি জেগে ওঠেন এবং হযরত মূসা (আ.)-এর পর আগমনকারী নবীদের সর্ম্পকে লিখতে শুরু করেন। প্রথমে শিশুদের ভাষা ও বুঝার ঐ স্তরে নামতে সমস্যা হচ্ছিল, যা কাসাসুন নাবিয়্যিন লিল আতফালের জন্য তিনি অবলম্বন করেছিলেন। মনে হচ্ছিল সেই ভাষা ও স্টাইলে লিখতে ভুলে গেছেন। কিন্তু কিছু চেষ্টার পর কলমের গতি ফিরে আসে এবং আল্লাহর তাওফীকে ৪র্থ খণ্ডের রচনা সমাপ্ত হয়। এ খণ্ড হযরত শুয়াইব (আ.) থেকে শুরু হয় এবং ঈসা (আ.)-এ শেষ হয়। এবার সমাপ্তি টানার পালা। আল্লাহ তা'আলা এরও তাওফীক দেন এবং জিলকদ ১৩৯৭ হিজরী, অক্টোবর ১৯৭৭ সনে খাতামুন নাবিয়্যিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনচরিত আলোচনার মধ্য দিয়ে এর শুভ সমাপ্তি হয়। এ দু'খণ্ডও "মুআসসাতুর রেসালাহ" বৈরুত থেকে প্রকাশ পায় এবং জনপ্রিয়তা অর্জন করে।

৫ম খণ্ডের বিষয়বস্তু সামনে রেখেই হযরত মাওলানা আরো বিস্তারিত-ভাবে তাঁর বিখ্যাত সীরাত গ্রন্থ السيرة النبوية (অনুবাদ, নবীয়ে রহমত) রচনা করেন, যা দারুশ শুরুক জিদ্দা থেকে ছেপে সৌদি আরব ও অন্যান্য রাষ্ট্রের

ইউনিভার্সিটি ও কলেজে সিলেবাসভুক্ত হয় এবং বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায় অনুদিত হয়ে বিশ্বের আনাচে-কানাচে আলোড়ন সৃষ্টি করে। মূলতঃ কাসাসুন নাবিয়্যিনের সিরিজই এ বিশাল গ্রন্থ রচনার উদ্দীপক ও নিয়ামক হিসেবে কাজ করেছিল।

সিলেবাস প্রণয়নের অন্যান্য প্রচেষ্টা

নতুন সিলেবাস প্রণয়নের যে কাজ কোন সুনির্দিষ্ট প্লান ছাড়াই ব্যক্তিগতভাবে শুরু হয়েছিল তা কোননা কোনভাবে অব্যাহত ছিল। মুখতারাত ও আল কেরাআতুর রাশেদার মধ্যবর্তী শূন্যতা পূরণের জন্য মাওলানা সাইয়েদ মুহাম্মাদ রাবে নদভী (বর্তমান পরিচালক, দারুল উলূম নদওয়া) মানসুরাত (গদ্য) সংকলন করেন। যাতে এমন অনেক উৎকৃষ্ট সাহিত্য নিদর্শন অন্তর্ভুক্ত হয় যা তুলনামূলকভাবে মুখতারাতের সাহিত্য নিদর্শনের চেয়ে সহজ, কিন্তু ছাত্রদের জন্য উপযোগী ছিল। এ গ্রন্থ নির্বাচনে তার সাহিত্য রুচি ও অধ্যয়নের সুস্পষ্ট ছাপ ফুটে ওঠে এবং তা পাঠ্যতালিকাভুক্ত হওয়ারও যোগ্য। এছাড়া তিনি الادب العربي بين نقد وعرض নামে তৃতীয় আরেকটি গ্রন্থ রচনা করেন। যাতে তিনি আরবী গদ্যের নির্বাচিত অংশ নিয়ে তার সৌন্দর্য ও বিশেষত্বের প্রতি ইশারা করেছেন এবং ছাত্রদের মাঝে সাহিত্য সুধা আহরণের ও সাহিত্যের মান নির্ণয়ের যোগ্যতা সৃষ্টির প্রয়াস চালিয়েছেন। অন্যদিকে মাওলানা আব্দুল মাজেদ নদভীর কলমে 'মুআল্লিমুল ইনশা' সংকলনের কাজ আরম্ভ হয়, যা লেখনী ও রচনা অনুশীলনের সহায়ক হয়। তিনিও অত্যন্ত পরিশ্রম ও মেধা ব্যয় করে এর দু'খণ্ড সমাপ্ত করেন।

এমনিভাবে ইসলামের ইতিহাসের জন্যও নতুন গ্রন্থের প্রয়োজন ছিল। মাওলানা মাহবুবুর রহমান আযহারী (উস্তাদ, দারুল উলূম নদওয়া) আল মুহওয়ারাতুল আরাবিয়াহ নামে প্রাথমিক শ্রেণীর জন্য আরবী কথ্য ভাষায় ব্যবহৃত বিভিন্ন পরিভাষা ও প্রবাদ-প্রবচন নিয়ে একটি সহপাঠ্য গ্রন্থ রচনা করেন। তাও সিলেবাসভুক্ত করা হয়। আরবী ব্যাকরণে মিযান-মুনশাইব ও নাহবেমীরের স্থলাভিষিক্ততার জন্য আধুনিক নীতিমালার সংযোজনে উর্দুতে মৌলভী মোস্তফা ও মৌলভী আব্দুল মাজেদ সাহেব 'তামরীনুন নাহু', মোলভী মুরীন উল্লাহ সাহেব নদবী 'তামরীনুস সরফ' ও মৌলভী সায়ীদুর

রহমান সাহেব নদভী 'ইলমুত তাসরীফ' রচনা করেন এবং তা পাঠ্যভুক্ত হয়। নতুন সিলেবাস প্রণয়নের ক্ষেত্রে একটি জরুরী ও উল্লেখযোগ্য কাজ করেছিলেন মাওলানা মুহাম্মাদ রাবে নদভী (সম্ভবত সাইয়েদ আব্দুল আলী সাহেবের উৎসাহে)। তিনি মুসলিম বিশ্বের ভূগোল নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। শুধু হাদীছ ও সীরাত নয়, বরং আরবী সাহিত্য ও ইতিহাসের ছাত্রও যখন নিজস্ব পাঠ অধ্যয়নে বসে, মনে হয় সে একটি অন্ধকার সুড়ঙ্গে প্রবেশ করছে। ডানে-বায়ে-সামনে-পিছনে কিছুই তার গোচরে আসে না। হাজারো স্থানের নাম হাদীছ, সীরাত ও জাহেলী যুগের কাব্যে পাওয়া যায়, অথচ এ সম্পর্কে সে কিছুই জানে না। এই না জানার কারণে বহু ঐতিহাসিক সত্য, সীরাত ও হাদীছের ঘটনাবলীর গুরুত্ব এবং তার পরিবেশ ও প্রেক্ষাপট বুঝা থেকে অসম্পূর্ণতা থেকে যায়, একজন অনুভূতিশীল ছাত্রের জন্য যা জানা অত্যন্ত জরুরী, একজন ভাল শিক্ষক ও উস্তাদের জন্য তা ছিল আরো গুরুত্বপুর্ণ। এ কাজে তিনি অত্যন্ত যোগ্যতা ও পরিশ্রম ব্যয় করে ম্যাপ তৈরী করেন। হাদীছ ও সীরাতের ঘটনাবলীর দিকে প্রয়োজনীয় ইঙ্গিত করেন এবং আরবী কবিতা উল্লেখ করে তাতে বর্ণিত স্থান নির্দেশ করেন। কিন্তু আফসোস! দ্বীনী মাদরাসাগুলো এ কাজের তেমন কোন মূল্যায়ন করেনি।

আরবী ভাষা ও সাহিত্যের নতুন গ্রন্থাদি প্রণয়নের পর হযরত মাওলানা আলী মিয়াঁ (রহ.) ইলমে ফিকাহর দিকে নজর দেন। তিনি বলেন, আমার অনেক দিনের ইচ্ছা ছিল, যেসকল কিশোর ছেলেরা অল্প বয়সে ফিকাহর কিতাব পড়তে বাধ্য হয় এবং মানতেক ইত্যাদি পুরাতন পদ্ধতি অবলম্বন না করেই অপ্রাপ্ত বয়সে নূরুল ইযা, কুদুরী পড়তে অপারগ হয়, তাদের জন্য এমন কোন কিতাব লিখব, যাতে ইবারতের সাবলীলতা, অনুচ্ছেদ বিভক্তি, উদাহরণ ও ব্যাখ্যামূলক আলোচনায় বয়সের প্রতি লক্ষ্য রাখা হবে। মাসায়েলের ক্ষেত্রে আমলী ও প্রয়োজনীয় মাসায়েল নির্বাচন করা হবে এবং যা আরবীতে ফিকাহর প্রথম কিতাব হিসেবে পড়ানো হবে। আমি নিজেই এ কাজ আরম্ভ করেছিলাম, কিন্তু সম্পূর্ণ করতে পারিনি। আলহামদুলিল্লাহ, গত বছর স্নেহাস্পদ মৌলভী শফীকুর রহমান নদভী الفقه الميسر (সহজ ফিকাহ) নামে একটি কিতাব তৈরী করেছে এবং তা সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞগণ পছন্দ করেছেন। এখন তা দারুল উলূমের পাঠ্যভুক্ত।

এদিকে বেশ কয়েকবছর পূর্বে মাওলানা মুহাম্মাদ উয়াইস নদভী শাহ ওয়ালী উল্লাহ সাহেব (রহ.)-এর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'আল-আক্বীদাতুল হাসানাহ' প্রয়োজনীয় টীকাসহ 'আল-আক্বীদাতুস সুন্নিয়াহ' নামে বিন্যস্ত করেছেন। হযরত মাওলানা তাতে লম্বা ভূমিকা লিখেছেন। এভাবে ইলমে কালামের পরিচিতি এবং আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামায়াতের আকায়েদের ব্যাখ্যার জন্য একটি ভাল গ্রন্থ রচিত হয়। মানতেক, দর্শন, আকায়েদ ও উসূলে ফিকাহ বিষয়ে হযরত মাওলানার এরূপ নতুন গ্রন্থ রচনার আগ্রহ ছিল, যা দ্বারা দ্বীনী মাদরাসাসমূহের পাঠ্যপুস্তকসমূহ পূর্ণাঙ্গরূপ লাভ করতো এবং উম্মতের চাহিদা অনুযায়ী নেসাব তৈরী করা সহজ হতো।

দ্বীনী মাদরাসাগুলোর জন্য আরেকটি চিন্তার বিষয় ছিল আমাদের প্রাচীন দ্বীনী সিলেবাসে (আজকের দরসে নিযামী মাদরাসাগুলোর সূচনাকাল পর্যন্ত) যুগের পরিবর্তন, উন্নতি ও অগ্রগতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে পরিবর্তন-পরিবর্ধন, সংযোজন ও বিয়োজন করা হয়েছিল। এতে যেমন পাঠ্যপুস্তক রদবদল করা হয়েছে, তেমনি সনদের মানও পুনর্মূল্যায়ন করা হয়েছে। এটা হয়েছে এমন এক যুগে যখন এ উপমহাদেশের ধর্মও এক ছিল, শাসনও এক ছিল, দ্বীনী ভাষা (আরবী) ও প্রশাসনিক ভাষা (ফারসী) এক ছিল, সভ্যতা-কৃষ্টিও এক ছিল, আইনও (হানাফী ফিকাহ অনুসারে) এক ছিল, ক্ষমতাও একই বিশ্বাসভাবাপন্ন (হানাফী মাযহাব অনুসারী) সুন্নী লোকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু যখন হিন্দুস্তানের পরিবেশ পরিস্থিতি সম্পূর্ণ বদলে গেল, প্রশাসনিক শক্তি, সভ্যতা-কৃষ্টি, ভাষা, আইন সব পরিবর্তন হয়ে গেল এবং উন্নয়ন ও অগ্রগতির পরিধি বিস্তৃত, গভীর ও প্রশস্ত হয়ে গেল, তখন এ সিলেবাস এক জায়গায় এসে এমনভাবে থমকে গেল যে, তার কোন একটি কিতাবের পরিবর্তনকে বিদআত ও পুর্বসূরী উলামায়ে কেরামের পথ থেকে বিচ্যুতির প্রতিরূপ হিসেবে সাব্যস্ত হল।

অথচ বাস্তবতা হল, আমাদের বুযুর্গগণ যাঁরা হিন্দুস্থানে শিক্ষার সূচনাপরিবেশ সৃষ্টি করেছেন এবং যাঁরা দ্বীনী শিক্ষার জিম্মাদার ছিলেন, নিজেদের সঠিক নির্বাচন ও যুগ পরিচিতি, বরং মিল্লাত ও জাতির প্রয়োজনীয়তার সঠিক উপলব্ধির প্রমাণ প্রত্যেক যুগে এমনভাবে দিয়েছেন, আজকের উলামায়ে কেরাম ও মাদরাসার পরিচালকগণ যা অনুধাবন করতেও অপারগ; অথচ জাতির প্রয়োজনে এবং আধুনিক চাহিদাকে সামনে রেখে সময়ের উন্নতি ও অগ্রগতির সাথে এ সিলেবাসের পাল্লা দেওয়ার প্রয়োজন এখন সবচেয়ে বেশী।

নদওয়ার ৮৫ বর্ষপূর্তি উপলক্ষে
শিক্ষা সম্মেলন

নদওয়াতুল উলামা সংগঠন প্রতিষ্ঠার পর থেকে নিয়ম ছিল ভারতের কোন কেন্দ্রীয় স্থানে এর বার্ষিক সভা অনুষ্ঠিত হওয়া। এতে বিশিষ্ট উলামায়ে কেরাম, উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গ ও দেশের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ সমবেত হতেন এবং উচ্চমানের বক্তৃতা হত। এতে নদওয়াতুল উলামার লক্ষ্য উদ্দেশ্য প্রচার প্রসার ব্যতীত মুসলমানদের দ্বীনি জীবন ও শিক্ষার উন্নতিতে আলোড়ন সৃষ্টি হত। কিন্তু ১৯২৭ সালে অমৃতসরের সভার পর বার্ষিক সভার ধারাবাহিকতা বন্ধ হয়ে যায়। অতঃপর অর্ধ শতাব্দীকাল পার হয়ে গেল।

আরববিশ্বে নদওয়াতুল উলামার শিক্ষাপ্রাপ্তগণের দাওয়াতী ভূমিকা, তাদের রচনাবলীর ব্যাপক প্রসার, আরবী সাময়িকী 'আল বা'ছুল ইসলামী' ও 'আর রায়েদ' এর চালু হওয়া এবং ভারতের সাথে মধ্যপ্রাচ্যের নতুন রাজনৈতিক শিক্ষাগত ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক স্থাপনের ফলে খুব বেশী প্রয়োজন অনুভূত হচ্ছিল ইসলামী দেশসমূহের শিক্ষাবিদ, আরবদেশসমূহের বুদ্ধিজীবী, ইসলামী পুনর্জাগরণের জন্য প্রচেষ্টাকারী আন্দোলন ও দলসমূহের নেতৃবৃন্দ একদিকে এসব সংস্কার প্রচেষ্টা ও অভিজ্ঞতাসমূহের সাথে পরিচিত হওয়া যা ভারতভূমিতে সম্পন্ন হয়েছে, অন্যদিকে ভারতীয় উলামায়ে কেরামের সে কীর্তিসমূহ অবহিত হওয়া যা তারা একটি নতুন দেশে (যার নিজস্ব সভ্যতা, ধর্ম ও দর্শন ছিল) নিজ জাতীয় স্বাতন্ত্র রক্ষা, ইসলামের প্রচার প্রসার এবং ইসলামী শাস্ত্রসমূহের ভাণ্ডারে সংযোজন ও ইসলামী চিন্তাধারার নবায়ন ও পুনর্জাগরনের ক্ষেত্রে রচনা করেছেন। তৃতীয়তঃ নদওয়াতুল উলামার ভারসাম্যপূর্ণ শিক্ষাদর্শন এবং প্রাচীন ও আধুনিকের সমন্বয় প্রচেষ্টার সাথে পরিচিত করানোর জন্যও একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনের প্রয়োজন ছিল, যাতে ইসলামী দেশসমূহের বিশেষ করে আরব রাষ্ট্রসমূহের চিন্তাবিদ ও বুদ্ধিজীবীদের দাওয়াত করতে হবে।

১৯৪৬ সালে ডক্টর জাকির হুসাইন খান (পরবর্তীকালে ভারতের প্রেসিডেন্ট) এর আমন্ত্রনে দিল্লীতে জামেয়া মিল্লিয়া ইসলামিয়াঁর রজত জয়ন্তী অনুষ্ঠানে হযরত মাওলানা আবুল হাসান আলী নদভী (রহ.) 'নবী (সা.) যুগে শিক্ষা ব্যবস্থা' শিরোনামে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। উক্ত সভা থেকেই হযরত মাওলানার মধ্যে এ আকাংক্ষা সৃষ্টি হয়েছিল যে, ভারতের দ্বীনী শিক্ষার প্রতিনিধিদের পক্ষ থেকেও এমন একটি প্রতিনিধিত্বমূলক ও প্রভাবশালী

সম্মেলন করতে হবে যেখানে দ্বীনি শাস্ত্রসমূহের উন্নতি ও তার প্রস্তাবাদি নিয়ে অতীতের পর্যালোচনা ভবিষ্যতের জন্য রূপরেখা প্রস্তুত করতে হবে। এজন্য খোদায়ীভাবে হযরত মাওলানা আলী মিয়াঁর সামনে ছিল নদওয়াতুল উলামার কেন্দ্র ও প্লাটফর্ম। এটিকেই সাজানো ও কাজে লাগানো তারপক্ষে সহজ ছিল।

'এছাড়া আরেকটি উদ্দেশ্য ছিল এই যে, ভারতের ধর্ম নিরপেক্ষ সরকার ও সেখানকার সংখ্যাগুরু অধিবাসী ও বিভিন্ন সম্প্রদায় দেখবে যে, মুসলমানরা আন্তর্জাতিক ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ। তারা কোন একটি নির্দিষ্ট দেশে সীমবদ্ধ নয়। তারা অতীতে ও বর্তমানে সেসব দেশ থেকে যেখানকার ভাষা আরবী এবং যাদের ইতিহাস শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে দ্বীনি শিক্ষার সেবা ও উন্নয়নের ইতিহাস রয়েছে, শুধুমাত্র গ্রহণ করেনি, প্রদানও করেছে এবং ইসলামী চিন্তাধারাকে নবায়ন করার জন্য তারা নেতৃত্বের দায়িত্বও কখনো কখনো পালন করেছে। এখানকার মাদরাসাসমূহ এবং তা থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ ও তার পরিচালকবৃন্দকে আরব দেশসমূহে সম্মানের দৃষ্টিতে দেখা হয় এবং তাদেরকে শিক্ষাসভাসমূহে শেষ সারিতে নয়, বরং প্রথম সারিতে ও বিশেষ স্থানে আসীন করা হয়। এসব জানার প্রয়োজন এজন্যও যে, এসব বাস্তবতা প্রকাশিত হওয়ার পর দেশের কর্তাব্যক্তিরা দ্বীনি শিক্ষাকেন্দ্রসমূহের সাথে সমীহ আচরণ করবেন এবং এসব দেশের সাথে প্রতিষ্ঠিত সম্পর্কের খাতিরে দেশের মাদরাসাগুলোর প্রতি সুনজরে তাকাবেন। সুতরাং এ ধরনের একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন শুধু নদওয়ার জন্য নয় বরং গোটা ভারতের দ্বীনি মাদরাসাগুলোর স্বার্থেই প্রয়োজন ছিল। এ আন্তর্জাতিক সম্মেলনের প্রয়োজনীয়তা নদওয়াতুল উলামার দায়িত্বশীলরা দীর্ঘদিন ধরে অনুভব করে আসছিলেন।

১৯৬৩ সাল থেকে বিভিন্নজনের লেখা ও বক্তৃতায় বিষয়টি উল্লিখিত হতে থাকে। কিন্তু তা বেশীদূর অগ্রসর হতে পারেনি। ১৯৭৪ সালের ২৩শে মার্চ নদওয়াতুল উলামার ম্যানেজিং কমিটির সভায় এ ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়। হযরত মাওলানা আবদুল মাজেদ দরিয়াবাদী (রহ.)-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সভায় সিদ্ধান্ত হয় যে, ১৯৭৫ সালের নভেম্বর মাসে নদওয়াতুল উলামার পচাঁশিতম বার্ষিকী শিক্ষা মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। সম্মেলন ব্যবস্থাপনার দায়িত্বশীল মনোনীত করা হয় মাওলানা হাফেজ মুহাম্মদ ইমরান খাঁন নদভীকে। সম্মেলনের সভাপতি নির্বাচনে দ্বিধাদ্বন্দ দেখা দেয়। অবশেষে

হজ্জের সময় হযরত মাওলানা মনযুর নো'মানী (রহ.)-এর প্রস্তাবক্রমে আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের রেকটর ডক্টর আবদুল হালীম মাহমুদকে নির্বাচিত করা হয়। নদওয়াতুল উলামার নাজেম হযরত মাওলানা আলী মিয়াঁ সর্ব প্রথম এ সম্মেলনের দাওয়াতনামা প্রেরণ করেন রাবেতা আলমে ইসলামীর সেক্রেটারী জেনারেল শায়খ মুহাম্মদ সালেহ্ কায্যাযের নিকট। তিনি দাওয়াত কবুল করেন এবং প্রতিশ্রুতি দেন যে, রাবেতার একটি প্রতিনিধিদল সম্মেলনে অংশ গ্রহণ করবে।

হযরত মাওলানা সাইয়েদ আলী মিয়াঁ তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন, এতদুপলক্ষে বেশ কয়েকটি জটিলতার সম্মুখীন হতে হয়। সম্মেলনের তারিখ ধার্য হয় ৩১শে অক্টোবর থেকে ৩রা নভেম্বর ১৯৭৫। হঠাৎ করে ১৯৭৫ সালের জুন মাসে গোটা ভারতে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করা হয়। ইতোমধ্যে সম্মেলনের ব্যাপক প্রচার করা হয়েছে। বিদেশী মেহমানদের দাওয়াত করা হয়েছে। আরব রাষ্ট্রসমূহ, বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করা হয়েছে। সুতরাং সম্মেলন মুলতবী করা কোন মতেই সম্ভব ছিল না। এদিকে ভারত সরকার বিদেশী মেহমানদের ভিসা প্রদানে কড়াকড়ি আরোপ করে কি না সে বিষয়ে দুশ্চিন্তা দেখা দেয়। কিন্তু ভারত সরকার তা করেনি। তখন ভারতের প্রেসিডেন্ট ছিলেন জনাব ফখরুদ্দীন আলী আহমদ। তিনি ভারতের দ্বীনদার শ্রেনীর সাথে সুসম্পর্ক রাখতেন। মাওলানা আলী মিয়াঁর সাথে তাঁর ব্যক্তিগত পরিচয়ও ছিল। সম্মেলনে তাঁকে দাওয়াত না দেওয়া যেমন অনভিপ্রেত ছিল, তেমনি তাঁর আগমনে যেসব প্রটোকল মেনে চলতে হত। তাতে সম্মেলনের দ্বীনি পরিবেশ বিঘ্ন হওয়ার আশংকা ছিল। আল্লাহর অশেষ মেহেরবানীতে প্রেসিডেন্ট শুধু বানী প্রেরণ করে ক্ষান্ত রইলেন। কেননা তার রাষ্ট্রীয় কাজে খুবই ব্যস্ততা ছিল। উত্তর প্রদেশের মূখ্যমন্ত্রী হীমঅতিনন্দন ভোগনাজী এতদুপক্ষে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে সকল প্রকারের সহযোগিতার প্রস্তাব দেন। এমনকি বিভিন্ন দেশ থেকে আগমনকারী মন্ত্রীবর্গ ও উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মকর্তাগণকে ভারতের রাষ্ট্রীয় মেহমান হিসেবে অভ্যর্থনা, আপ্যায়ন ও আবাসনের ব্যবস্থা করার প্রস্তাব দেন। কিন্তু নদওয়ার পক্ষ থেতে তা কবুল করতে অপারগতা জানানো হয়। তবে নদওয়ার আগমনের রাস্তা মেরামত ও পানি সরবরাহের দায়িত্ব রাজ্য সরকার গ্রহণ করে এবং সুচারুরূপে তা পালন করে।

সম্মেলনের সকল প্রস্তুতির মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় ছিল এই যে, একদল ই'তেকাফকারীকে শুধু সম্মেলনের সাফল্য ও উদ্দেশ্য পূরণের জন্য দুয়া ও যিকিরে মশগুল রাখা হয়। তাবলীগী জামায়াতের আমীর হযরত মাওলানা ইনআমুল হাসান ও শায়খুল হাদীছ হযরত মাওলানা মুহাম্মদ যাকারিয়া (রহ.)-এর পরামর্শ ও ইংগিতে এ ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

৩০শে অক্টোবরের মধ্যেই শায়খুল আযহারসহ বিদেশী মেহমানরা আগমন করেন। ৩১শে অক্টোবর শুক্রবার কারী অদুদ আবদুল হাই সাহেবের কুরআন মজীদ তেলাওয়াতের মাধ্যমে সম্মেলন শুরু হয়। অতঃপর নদওয়ার সঙ্গীত পাঠ করা হয়। অতঃপর ভারতের প্রেসিডেন্ট এবং বিভিন্ন দেশ ও প্রতিষ্ঠানের প্রধানদের পাঠানো বাণী পড়ে শোনানো হয়। এরপর স্বাগত ভাষণ হয়। হযরত মাওলানা আলী মিয়াঁর দৃষ্টিশক্তির ক্ষীণতার কারণে স্বগত ভাষণের আরবীপাঠ উপস্থাপন করেন মাওলানা সাইয়েদ ওয়াজিহ রশীদ নদভী এবং উর্দু পাঠ উপস্থাপন করেন সম্মেলনের ব্যবস্থাপক মাওলানা হাফেজ মুহাম্মদ ইমরান খান নদভী। স্বাগত ভাষণের পর শায়খুল আযহার সভাপতির ভাষণ দেন। ইতোমধ্যে জুমআর নামাজের সময় হয়ে যায়। প্রথম অধিবেশনের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। এসময়ে শ্রোতার সংখ্যা প্রায় ষাট হাজার দাঁড়ায়।

সেদিন জুমআর নামাজে ইমামতি করেন শায়খুল আযহার। বিকালে শিক্ষা প্রদর্শনী উদ্বোধন করেন মিসরের মন্ত্রী ডক্টর মুহাম্মদ হুসাইন যাহাবী। মাগরিবের পরে দ্বিতীয় অধিবেশন হয়। এতে দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামার শিক্ষাসচিব মাওলানা আবদুস সালাম কিদওয়াই নদভী নদওয়াতুল উলামার পঁচাশি বছরের রিপোর্ট ও ভবিষ্যত কর্মসূচী পেশ করেন।

চারদিনব্যাপী সম্মেলনের মাঝখানে অন্যান্য মজলিসে তাহকীকাত ওয়া নাশরিয়াতে ইসলামের পরিচিতি সভা, শিক্ষা বিষয়ে ভাষণ ও প্রবন্ধ, রাশিয়ার প্রতিনিধি মীর শরফুদ্দীন মুহাম্মদ-এর উর্দু তাকরীর, নদওয়ার ছাত্রদের সংগঠন জমিয়তে আল ইসলাহ-এর সম্বর্ধনা, সংবাদ ও সাহিত্য বিষয়ক প্রদর্শনী। দ্বীনি তা'লীমী কাউন্সেলের নৈশভোজ। শহরবাসীদের পক্ষ থেকে মেহমানদেরকে সম্বর্ধনা প্রদান এবং জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের পক্ষ থেকে গুলমার্গ হোটেলে সম্বর্ধনা ও নৈশভোজ। সম্মেলনে প্রচুর সংখ্যক আরব মেহমান উপস্থিত থাকলেও নদওয়াতুল উলামা কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত করে রেখেছিলেন যে, চাঁদার নামও নেয়া হবে না। সে মতে বিরাট সুযোগ থাকা সত্ত্বেও আর্থিক সহায়তার কথা ভুলক্রমেও উচ্চারণ করা হয়নি।

৩রা নভেম্বর দিবাগত রাতে মাওলানা সাইয়েদ মিন্নাতুল্লাহ রহমানীর সভাপতিত্বে শেষ অধিবেশন হয়। সভাপতির ভাষণ ও দুয়ার মাধ্যমে নদওয়াতুল উলামার পঁচাশিতম বার্ষিক সম্মেলন সমাপ্ত হয়।

কাদিয়ানী বিরোধী আন্তর্জাতিক সম্মেলন

কাদিয়ানী মতবাদ ইসলামী উম্মতের স্থায়িত্ব ও দ্বীনিঐক্যের বিরুদ্ধে এক গভীর চক্রান্ত এবং বৃটিশ শাসনের অন্যতম পরিকল্পনা। নদওয়াতুল উলামার প্রতিষ্ঠাতা হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ আলী মুঙ্গেরী (রহ.) কাদিয়ানী ফিতনা নির্মূলের জন্য বিহার এলকায় যথেষ্ট কাজ করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে হযরত মাওলানা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী (রহ.) ইসলাম বিরোধী চক্রান্ত ও তার বিরুদ্ধে মুসলিম মনীষীগণের সংস্কারমূলক কার্যক্রম অধ্যয়ন ও পর্যালোচনার পর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে, কাদিয়ানী ফেতনা এই উম্মতের বিরুদ্ধে সবচেয়ে মারাত্মক। তিনি আল্লামা ইকবালের সঙ্গে ঐকমত্য পোষণ করতেন যে, দ্বীন ও শরীয়তের স্থায়িত্ব কিতাব ও সুন্নাহর সঙ্গে সম্পর্কিত হলেও উম্মতের স্থায়িত্ব ও ঐক্য খতমে নবুওয়ত আকীদার সাথে জড়িত এবং এর উপর নির্ভরশীল। এজন্য তিনি কাদিয়ানী ফিতনা সম্পর্কে আরব বিশ্বকে অবহিত করার জন্য আরবীতে আল-কাদিয়ানিয়াত নামে একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেছিলেন।

ভারতবর্ষ, ইউরোপ, আমেরিকা, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা এবং যে সব দেশে এ দ্বীনী ইলম ও উলামায়ে কেরামের স্বল্পতা রয়েছে সে সব দেশে কাদিয়ানী মতবাদ ছড়িয়ে পড়তে থাকে। বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক স্থানে তাদের কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তারা জোরদার কার্যক্রম চালায়। ফলে কাদিয়ানী মতবাদ দ্রুত প্রসার লাভ করতে থাকে। এবং যুবকশ্রেণী তাদের ভ্রান্ত মতবাদে আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। দারুল উলুম নদওয়াতুল উলামার প্রতিষ্ঠাতা হযরত মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মাদ আলী মুঙ্গেরী এ ফেতনা সম্পর্কে অত্যন্ত চিন্তিত ও উদ্বিগ্ন ছিলেন। তিনি তার বাসস্থান বিহারে এ ফেতনার মোকাবেলা করেন এবং তাতে সফল হন। যেহেতু দারুল উলুম নদওয়াতুল উলামা একটি আন্তর্জাতিক মানের দ্বীনী প্রতিষ্ঠান ও দ্বীনী চেতনা ও চিন্তাধারা লালনের কেন্দ্র, এজন্য হযরত মাওলানা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী নদওয়ায় একটি আন্তর্জাতিক মানের সম্মেলন অনুষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন এবং তাতে আরব ও ইসলামী বিশ্বের প্রখ্যাত মনীষীগণের অংশ গ্রহণের জরুরী ব্যবস্থা করেন।

সেমতে, ১৯৯৭ সালের ১২ ও ১৩ই নভেম্বর এক আর্ন্তজাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ভারতবর্ষের ইতিহাসে এ সম্মেলন ছিল এক অসাধারণ ও উল্লেখযোগ্য অধ্যায়। সংবাদ মাধ্যমগুলোর প্রতিবেদন অনুযায়ী এতে প্রায় ছয়লক্ষ শ্রোতা শরীক হন। এতে সভাপতিত্ব করেন মসজিদুল হারামের ইমাম শায়খ মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ আস-সুবাইল। তিনি তাঁর বিশেষ বিমানে লাখনৌ আসেন। তারঁ সাথে ছিলেন মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যাঞ্চেলর ডঃ সালেহ আব্দুল্লাহ আল আবুদীসহ একটি প্রতিনিধি দল। এ প্রতিনিধি দলের সকল সদস্যই ছিলেন ফকীহ ও আলেম।

তাছাড়া সৌদী আরবের শরীয়া বিষয়ক মন্ত্রী ডঃ আব্দুল্লাহ আব্দুল মুহসেন তুর্কী এর নায়েব ডঃ আদনান ওয়াযযান উম্মুল কোরা বিশ্ববিদ্যালয়ের দু'জন অধ্যাপক প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ দারুশ শুরুক ও দারুল মারেফা- এর ডাইরেক্টর জেনারেল হযরত সাইয়েদ মুহসেন আহমদ বারুম, ইসলামী বিশ্বের প্রখ্যাত রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও কায়েরোর মজলিসে ইসলামীর প্রধান অধ্যাপক কাসেম শরীফ, রাবেতা আলমে ইসলামীর উপ-মহাসচিব অর্ধশতাধিক গ্রন্থের লেখক অধ্যাপক মুহাম্মাদ নাছের আল-আবুদী, ইস্তাম্বুল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শায়খ মুহাম্মদ আমিন সিরাজ সহ পাচঁজন সদস্য, অধ্যাপক হামদী আরসালান, শায়খ নুরুদ্দীন বেলানীয়া, ইন্দোনেশিয়া থেকে অধ্যাপক আমিনুল্লাহ, অধ্যাপক আব্দুর রহমান, অধ্যাপক সুফিয়ান, মালয়েশিয়া থেকে ডঃ আবুবকর, অধ্যাপক আহমদ ফাহমী নদভী, ডঃ জাহেদ আরশাদ প্রমুখ এতে অংশ গ্রহণ করেন।

তাদের আগমনে সম্মেলন যেন আরবদেশের সম্মেলনে পরিণত হয়। বক্তৃতা হয় আরবীতে। পরে উর্দুতে তার তরজমা হয়। ভারতের প্রায় সকল প্রদেশ থেকে উলামায়ে কেরাম, ইসলামী চিন্তাবিদ, মাদ্রাসা সমুহের মুহতামিমগণ, দ্বীনী দাওয়াতের সাথে জড়িত ব্যক্তিবর্গ, গবেষক, প্রচারক এবং প্রায় ১৭টি দেশের প্রতিনিধি অংশ নেন।

হযরত মাওলানা আলী মিয়াঁ উদ্বোধনী ভাষণ দেন। এতে তিনি সম্মেলনের উদ্দেশ্য ও প্রেক্ষাপট বর্ণনা করেন এবং বলেন কাদিয়ানী মতবাদ নবুওয়তে মুহাম্মাদীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও ইসলামের বিরুদ্ধে ঘৃন্যতম চক্রান্ত। অতঃপর শায়খ মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ আস সুবাইল এক জোরালো বক্তৃতা দেন। অতপর অন্য বক্তাগণ বক্তৃতা করেন। অধ্যাপক কামেল শরীফ বলেন আমি অসংখ্য সমাবেশে অংশ গ্রহণ করেছি। কিন্তু এত ভাবগাম্ভীর্যপূর্ণ

সমাবেশ আর কোথাও দেখিনি। দ্বিতীয় অধিবেশনে মক্কার মাদ্রাসায়ে সৌলতিয়ার নাযেম, ভারতের প্রধান প্রধান মাদ্রাসার দায়িত্বশীলগণ ও প্রতিনিধিগণ বক্তৃতা করেন। তৃতীয় ও শেষ অধিবেশনে মসজিদুল আকসার সাবেক ইমাম ডঃ মুহাম্মাদ সিয়ামও উপস্থিত ছিলেন এবং বক্তৃতা করেন। শায়খ সুবাইলের দোয়ার মাধ্যমে সম্মেলন সমাপ্ত হয়। তিনি জুমার নামাযে ইমামতিও করেন।

দীর্ঘ অর্ধ শতাব্দীরও বেশী সময় ধরে এ মহামনীষী দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামার উন্নয়নে জীবনকে উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন। তাঁর অবদানে সমৃদ্ধ হয়ে নদওয়া আজ সমগ্র পৃথিবীতে তার চিন্তাধারা এবং আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করতে এবং পৃথিবীর জ্ঞানী সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়েছে। বিশেষ করে একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় মুসলিম যুবা-তরুণনদের হাতে তিনি একটি সুচিন্তিত রূপরেখা তুলে দিতে সমর্থ হয়েছেন।

==ooo==

অধ্যায়–৭

দ্বীনী সংগঠনসমূহ ও মাওলানা আলী মিয়াঁ

মুফাক্কিরে ইসলাম হযরত মাওলানা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী (রহ.) ছিলেন মুসলিম উম্মার একজন সত্যিকারের অভিভাবক। তাঁর সাধনা ও আত্মত্যাগ এ উম্মাহকে দিয়েছে নবজাগরণের এক অমিয় সুধা। তিনি ছিলেন বিরল প্রতিভার অধিকারী। জীবনে তিনি বহু কাজ করেছেন। বহু সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানের তিনি সভাপতি বা রোকন ছিলেন। তিনি জড়িত ছিলেন এমন কয়েকটি দ্বীনী সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হল। এখানে প্রতিষ্ঠানের বিশদ আলোচনা করা মুখ্য উদ্দেশ্য নয়, বরং হযরত মাওলানার সাথে এসকল প্রতিষ্ঠানের সম্পর্ক কেমন ছিল এবং তিনি এ সকল প্রতিষ্ঠানের কি ধরনের সহযোগিতা করেছিলেন তারই সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে।

দ্বীনী মাদরাসা

হযরত মাওলানা আলী মিয়াঁ নদভী দ্বীনী মাদরাসাসমূহকে নিজের আশা আকাঙ্খার কেন্দ্র মনে করতেন। তাঁর দৃষ্টিতে মাদরাসা ছিল মুসলমানদের টিকে থাকবার প্রধান অবলম্বন ও ইসলামের দূর্গ। দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামা, দারুল উলূম দেওবন্দ, জামেয়া মিল্লিয়া ও মাদরাসা মাজাহিরে উলূম সাহারানপুরসহ বিভিন্ন মাদরাসার ছাত্রদের সামনে বক্তৃতা করার সময় তিনি অন্তরের যে গভীরতা দিয়ে মাদরাসার বড়ত্ব প্রকাশ এবং মাদরাসা ফারেগ ছাত্রদের যেভাবে উৎসাহিত করতেন তাতে বুঝা যায় যে, তাঁর নিকট মাদরাসার গুরুত্ব কত ছিল। মাদরাসা বলতে তিনি শুধু নদওয়াকে বুঝতেন না বরং তার মহানুভব অন্তর গোটা ভারতের মাদরাসাগুলিকে একটি সুতায় গ্রথিত মাল্য মনে করত। তিনি প্রতিটি মাদরাসাকে নিজের মাদরাসা মনে করতেন।

তিনি বিভিন্ন মাদরাসায় হাযির হওয়ার জন্য দূর-দূরান্তে সফর করতেন। মাদরাসাগুলিকে আর্থিক সহযোগিতার ব্যবস্থা করতেন তাঁর ব্যথিত অন্তর মাদরাসাগুলিকে একটি জীবন্ত প্রতিষ্ঠান হিসেবে এবং ইসলামের পাওয়ার হাউজ হিসেবে দেখার জন্য চাতকের মত চেয়ে থাকতো।

হযরত মাওলানা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী (রহ.) দ্বীনী মাদরাসার পরিচয় দিতে গিয়ে দারুল উলূম দেওবন্দের উলামা ও তোলাবা সম্মেলনে বলেছিলেন, "মাদরাসা হলো এক মহান কর্মশালা, যেখানে মানুষ গড়ার সাধনা হয়। যেখানে দ্বীনের দায়ী ও ইসলামের সিপাহী তৈরী হয়। মাদরাসা হলো ইসলামী বিশ্বের বিদ্যুৎকেন্দ্র, যেখান থেকে ইসলামী জনপদে, বরং সমগ্র মানব বসতিতে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়। মাদরাসা হলো মন ও মস্তিষ্ক এবং অন্তর ও অন্তর্দৃষ্টি তৈরীর কারখানা। মাদরাসা হলো গোটা বিশ্বের গতি-প্রকৃতি নির্ধারণ এবং সমগ্র মানব জীবনের কার্মকান্ড নিয়ন্ত্রণের মহান কেন্দ্র। সমগ্র বিশ্বের উপর তার সিদ্ধান্ত কার্যকর হয়, বিশ্বের কোন সিদ্ধান্ত তার উপর কার্যকর হয় না।

মাদরাসার সম্পর্ক বিশেষ কোন যুগ, সমাজ এবং বিশেষ কোন ভাষা ও সংস্কৃতির সঙ্গে নয়, নয় বিশেষ কোন কৃষ্টি ও সভ্যতার সঙ্গে। সুতরাং যুগ ও সমাজের পরিবর্তন, ভাষা ও সংস্কৃতির বিলুপ্তি, কিংবা সভ্যতার প্রাচীনতা মাদরাসার গতি ও ব্যাপ্তিকে কখনো প্রভাবিত করতে পারে না। আমরা যাকে মাদরাসা বলি, একদিকে তার সম্পর্ক হলো সরাসরি মুহাম্মাদী নবুয়তের সঙ্গে যা বিশ্বজনীন, সার্বজনীন ও সর্বকালীন। অন্যদিকে তার সম্পর্ক হলো মানুষ ও মানবতার সাথে এবং সেই গতিশীল জীবনের সাথে যা সাগরমুখী নদীর মতই চিরপ্রবাহমান। মাদরাসা হলো নবুয়তে মুহাম্মাদীর চিরন্তনতা ও মানবজীবনের গতিশীলতার মিলন মোহনা। সুতরাং আধুনিক ও প্রাচীনের বিতর্ক এবং পরিবেশ ও প্রতিবেশের সীমাবদ্ধতা এখানে কল্পনা করাও সম্ভব নয়।

বন্ধুগণ! মাদরাসার পরিচয় প্রসঙ্গে যদি বলা হয় যে, তা বিগত যুগের স্মারক কিংবা ইতিহাসের ধারক তাহলে এর চেয়ে আপত্তিকর ও অপমানজনক বিষয় আর কিছু হতে পারে না। আমি তো এটাকে মাদরাসার স্বভাব সত্তার আমূল বিকৃতি মনে করি। মাদরাসাকে আমি মনে করি সবচে' সুরক্ষিত ও শক্তিশালী কেন্দ্র এবং গতি ও প্রগতির উচ্ছলতায় এবং উদ্যম ও প্রাণচাঞ্চল্যে পরিপূর্ণ একটি প্রতিষ্ঠান। এর এক প্রান্তের সংযোগ হলো নবুয়তে মুহাম্মাদীর সঙ্গে, অন্য প্রান্তের সংযোগ হলো জীবন ও জগতের সাথে। মাদরাসা একদিকে নবুয়তে মুহাম্মাদীর চিরন্তন ঝরণাধারা থেকে পানি

সঞ্চয় করে, অন্যদিকে জীবনের ফসলভূমিতে পানি সিঞ্চন করে। এটা দ্বীনী মাদরাসার সর্বক্ষণের দায় ও দায়িত্ব। মুহূর্তের জন্য যদি সে তার দায়িত্ব ও কর্তব্যে অবহেলা করে তাহলে জীবনের ফসলভূমি শুকিয়ে যাবে, মানুষ ও মানবতা নির্জীব হয়ে পড়বে এবং জীবন ও জগতের সব কিছুতে স্থবিরতা দেখা দেবে।

নবুয়তে মুহাম্মাদীর ঝরণাধারা যেমন কখনো শুকোবে না, তেমনি মানবতার পিপাসাও কখনো দূর হবে না। নবুয়তে মুহাম্মাদীর কল্যাণ ও বদান্যতায় যেমন কৃপণতা ও দানবিমুখতা নেই, তেমনি মানবতার প্রয়োজন ও প্রার্থনারও বিরাম নেই। এদিক থেকে বারবার ধ্বনিত হয় 'আল্লাহ্ দেন, আমি বিতরণ করি'- এই আশ্বাস বাণী, ওদিক থেকে উচ্চারিত হয় 'দাও, আরো দাও'- চাহিদার কাতর ধ্বনি। দুনিয়াতে মাদরাসার চেয়ে কর্মচঞ্চল ও ব্যস্ত সচল প্রতিষ্ঠান আর কী হতে পারে! জীবনের সমস্যা ও প্রয়োজন অসংখ্য, জীবনের চাহিদা ও পরিবর্তন অসংখ্য, জীবনের বিচ্যুতি ও পদস্খলন অসংখ্য, জীবনের আশা ও উচ্চাকাঙ্খা অসংখ্য এবং জীবনের প্রতারণা ও প্রতারক অসংখ্য। মাদরাসা যখন এমন সমস্যাসংকুল ও প্রয়োজনবহুল জীবনের নিয়ন্ত্রণভার গ্রহণ করেছে তখন তার অবসর যাপনের অবকাশ কোথায়?

দুনিয়াতে যে কোন মানুষ কাজ ছেড়ে আরাম করতে পারে। যে কোন প্রতিষ্ঠান অবসর যাপন করতে পারে। পৃথিবীতে সবার ছুটি ভোগ করার অধিকার আছে, কিন্তু মাদরাসার নেই কোন ছুটি। প্রতিদিন তার কর্মদিন, প্রতি মুহূর্ত তার ব্যস্ততার মুহূর্ত। দুনিয়ার যে কোন মুসাফির চাইতে পারে একটু আরাম, একটু বিশ্রাম, কিন্তু জীবনের সদা চলমান কাফেলায় মাদরাসা নামের যে মুসাফির, তার কপালে নেই কোন আরাম, তাকে চলতে হবে অবিরাম। জীবনের গতি কখনো যদি মুহূর্তের জন্য থেমে যেতো, চাহিদা ও প্রয়োজনের সাময়িক অবসান হতো, তাহলে মাদরাসারও সুযোগ ছিলো চলার পথে একটু দম ফেলার, একটু জিরিয়ে নেয়ার। কিন্তু জীবন যেখানে সদা গতিশীল, জীবনের চাহিদা ও প্রয়োজন যেখানে পরিবর্তনশীল সেখানে মাদরাসার কর্মচঞ্চলতায় স্থিরতা ও স্থবিরতার অবকাশ কোথায়? তাকে তো

পদে পদে জীবনকে শাসন করতে হবে, জীবনের ভুল-বিচ্যুতি নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। নতুন নতুন সমস্যা ও জিজ্ঞাসার সমাধান দিতে হবে। পরিবর্তিত পরিস্থিতির সামনে স্থির হয়ে দাঁড়াতে হবে এবং নতুন নতুন ফেতনার সফল মোকাবেলা করতে হবে।

মাদরাসা যদি জীবন-কাফেলা থেকে পিছিয়ে পড়ে, কিংবা কোন মঞ্জিলে এসে ক্লান্ত হয়ে বসে পড়ে এবং তন্দ্রায় ঢলে পড়ে তাহলে জীবনকে সঙ্গ দেবে কে? মানবতাকে পথ দেখাবে কে? ঝড়-তুফানের অন্ধকারে নবুয়তের আলো দেখাবে কে? হতাশা ও নিরাশার মুখে পয়গামে মোহাম্মদীর চিরন্তন সান্ত্বনা বাণী শোনাবে কে? মাদরাসা যদি কর্মে অবহেলা ও দায়িত্বে শিথিলতা করে, মাদরাসা যদি জীবনের নেতৃত্ব ত্যাগ করে এবং গতিহীন ও স্থবির হয়ে পড়ে তাহলে তা হবে জীবন ও জগতের সাথে এবং মানুষ ও মানবতার সাথে বিশ্বাস ভঙ্গের শামিল, যা দায়িত্বশীল ও কর্তব্য সচেতন কোন মাদরাসা কল্পনাও করতে পারে না।"

পরিবর্তিত সময়ে সমাজকে সঠিক নেতৃত্ব ও দিক নির্দেশনা দিতে হলে দ্বীনী মাদরাসার তোলাবার কি ধরণের যোগ্যতা অর্জন করতে হবে সে সম্পর্কে এক দিক নির্দেশনামূলক ভাষণে হযরত মাওলানা (রহ.) বলেন, "আমার প্রিয় বন্ধুগণ! এত দিনে সময় ও সমাজ এবং পরিবেশ-পরিস্থিতি অনেক বদলে গেছে। এখন যদি আমাদের আল-ইছলাহ আঞ্জুমানের উদ্দেশ্য হয় শুধু মাঝারি মানের কিছু লেখক-গবেষক 'উৎপাদন', যারা সময়ের পরিবর্তন ও প্রবণতা অনুসরণ করে এবং সমকালীন বুদ্ধিজীবীদের কলমের লেখা ও চিন্তার রেখা অনুধাবন করে তার মোকাবেলায় কিছু বলতে বা লিখতে পারে, তাহলে আমার কাছে শুনুন, চলমান সময়ের জন্য তা মোটেই পর্যাপ্ত নয়। সময়ের দাবী ও চাহিদা এখন অনেক ব্যাপক ও বিস্তৃত।

সময়ের দাবী ও চাহিদা সর্বদা একই মান ও পরিমাণে স্থির থাকে না। বরং পরিবেশ-পরিস্থিতি, মানুষের যোগ্যতা ও সামর্থ এবং রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তনের বিচারে চাহিদার মান ও পরিমাণ নির্ধারিত হয়ে থাকে এবং সে অনুযায়ী উলামায়ে উম্মতের কাছে পথের দিশা ও দিক নির্দেশনা দাবী করে থাকে। সময় এখন কোন দ্বীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে শুধু এজন্য ছাড়পত্র দিতে প্রস্তুত নয় যে, এখানে উর্দূ ভাষার কিছু ভালো লেখক বা বক্তা তৈরী হচ্ছে এবং মাঝারি মানের সাহিত্যিক, চিন্তাবিদ ও আলেম তৈরী হচ্ছে।

শুনুন ভাইসব! মুসলিম সমাজের চিন্তা-জগতে আজ এক ব্যাপক নৈরাজ্য ও নৈরাশ্য ছড়িয়ে পড়েছে। এই উম্মাহ এবং এই দ্বীনের মাঝে যে চিরন্তন যোগ্যতা গচ্ছিত রাখা হয়েছে সেই যোগ্যতা ও ভবিষ্যত সম্ভাবনা সম্পর্কে যুবসমাজ এবং আধুনিক শিক্ষিত মহলে ভয়ানক অনাস্থা-অনিশ্চয়তা দানা বেঁধে উঠেছে। সর্বোপরি দ্বীনের ধারক-বাহক আলেমদের নতুন প্রজন্মে মারাত্মক হতাশা ও হীনম্মন্যতা শিকড় গেড়ে বসেছে। এগুলো দূর করে যুগ ও সমাজের লাগাম টেনে ধরার জন্য, দ্বীন ও শরীয়তকে নয়া যামানার নয়া তুফান থেকে রক্ষা করার জন্য এখন আগের চেয়ে অনেক বেশী প্রস্তুতি গ্রহণের প্রয়োজন। অনেক বড় ইলমী জিহাদ ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিজয় অর্জনের প্রয়োজন।

এখন প্রয়োজন আরো বেশী আত্মনিবেদনের, আত্মবিসর্জনের এবং আরো উর্ধ্বাকাশে উড্ডয়নের। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, আমাদের পূর্বসূরীগণ অনেক কালজয়ী কীর্তি ও অবদান রেখে গেছেন, বিশেষত আমাদের নদওয়াতুল উলামার প্রথম কাতারের লেখক-গবেষক ও চিন্তাবিদগণ তাদের সময় ও সমাজকে অনেক কিছু দিয়েছেন এবং নতুন প্রজন্মকে ইসলাম ও ইসলামী উম্মাহর ভবিষ্যত সম্ভাবনা সম্পর্কে যথেষ্ট আশ্বস্ত করতে পেরেছেন। যে সব সমস্যা ও জিজ্ঞাসা তখন জ্বলন্ত ছিলো সেগুলোর উপর চিন্তা-গবেষণার যে ফসল এবং যে বুদ্ধিবৃত্তিক অবদান তাঁরা রেখে গেছেন, তা সে যুগের জন্য খুবই কার্যকর ও যুগান্তকারী ছিলো। কিন্তু সেগুলোর চর্বিত চর্বন এখন বিশেষ কোন কৃতিত্ব বলে গণ্য হবে না এবং তাতে যুগ ও সমাজের হতাশা দূর হবে না।

জ্ঞান ও গবেষণার ক্ষেত্র এখন অনেক ব্যাপক ও বিস্তৃত হয়ে পড়েছে। ইলমের যে প্রাচীন ভান্ডার ও গুপ্ত সম্পদ পূর্ববর্তী আলেমদের কল্পনায়ও ছিলো না, আধুনিক প্রকাশনা বিপ্লবের এবং বৃহৎ প্রকাশনা সংস্থাগুলোর নিরলস প্রচেষ্টায় তা এখন দিনের আলোতে চলে এসেছে। আগে যে সব কিতাবের শুধু নাম শুনেছি এখন তা গ্রন্থাগারের তাকে তাকে শোভা পায়। তাছাড়া চিন্তার পথ ও পন্থা এবং অস্থির চিত্তকে আশ্বস্ত করার উপায়-উপকরণের এত পরিবর্তন ঘটেছে যে, পুরোনো পথ ও পন্থার অনুকরণ করা এখন কিছুতেই সম্ভব নয়। পুরোনো বহু আলোচনা এখন তার গুরুত্ব হারিয়ে ফেলেছে। একটা সময় ছিলো যখন মাওলানা শিবলী নোমানীর 'আল-জিযয়া ফিল ইসলাম'কে মনে করা হতো মহা আলোড়ন সৃষ্টিকারী কিতাব।

'এক নজরে আওরঙ্গজেব' তো ছিল রীতিমত এক বুদ্ধিবৃত্তিক বিজয়। একইভাবে 'আলেকজান্দ্রিয়ার গ্রন্থাগার' ছিল ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে দাঁতভাঙ্গা জবাব। কিন্তু এসব এখন এতই গুরুত্বহীন যে, এ সম্পর্কে বলার বা লেখার নতুন কিছু নেই এবং যুগ ও সমাজের তাতে তেমন কোন আগ্রহ নেই। এ যুগে কোন কীর্তি ও কর্ম রেখে যেতে হলে এবং প্রতিভা ও যোগ্যতার স্বীকৃতি পেতে হলে আরো ব্যাপক ও বিস্তৃত জ্ঞান-গবেষণা ও ইলমী সাধনার প্রয়োজন। কেননা সময়ের কাফেলা অনেক পথ পাড়ি দিয়ে চলে গেছে অনেক সামনে।

এটা ঠিক যে, পূর্ববর্তীদের রেখে যাওয়া এই জ্ঞানসম্পদও অবশ্যই শ্রদ্ধার সাথে স্মরণযোগ্য। এর সাথে জড়িয়ে আছে স্মৃতি এবং ইতিহাস-ঐতিহ্য। এগুলো এখন আমাদের অস্তিত্বেরই অংশ। কিন্তু সময় বড় নির্দয়। যামানা বড় বে-রহম। ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব যত বিশাল হোক, প্রতিভার প্রভা যত সমুজ্জ্বল হোক এবং জামাত ও সম্প্রদায় যত ঐতিহ্যবাহী হোক, সময় কারো সামনেই মাথা নোয়াতে রাজী নয়। যুগের স্বভাবধর্ম এই যে, যদি যোগ্যতা বলে তার স্বীকৃতি আদায় না করা হয়, আগে বেড়ে সে কাউকে স্বীকার করে না। কোন কিছুর ধারাবাহিকতা বা প্রাচীনতা সময়ের শ্রদ্ধা লাভের জন্য যথেষ্ট নয়। সময় এমনই বাস্তববাদী, এমনই শীতল ও নিরপেক্ষ যে, তার হাতে নতুন কিছু তুলে না দিলে এবং তার ঘাড়ে ভারী কোন বোঝা চাপিয়ে না দিলে সে মাথা নোয়াতে চায় না। সময়ের স্বীকৃতি ও শ্রদ্ধাঞ্জলি লাভ করা এতসহজ নয় এবং শুধু ঐতিহ্যের দোহাই যথেষ্ট নয়। সুতরাং সময়ের স্বীকৃতি পেতে হলে, ব্যক্তিত্বের প্রভাব বিস্তার করতে হলে এবং আত্মগর্বী সমাজের মন-মগজে যথাযোগ্য স্থান পেতে হলে প্রতিভা ও যোগ্যতার আরো বড় প্রমাণ দিতে হবে এবং ব্যক্তিত্বের উচ্চতা আরো বাড়াতে হবে, যে উচ্চতা ছাড়িয়ে যাবে হিমালয়ের শৃঙ্গকে।"

আরেক ভাষণে ছাত্রদের উদ্দেশ্যে হযরত মাওলানা (রহ.) বলেন, "এখন সমস্ত মাদরাসায় একটি শূন্যতা বিরাজ করছে। তা এই যে, আসাতিজা ও তালাবা- এই দুয়ের মাঝে কোন সম্পর্ক নেই, ন্যূনতম যোগাযোগ নেই। বরং উভয়ের মাঝে এক বিরাট ফারাক ও ব্যবধান সৃষ্টি হয়ে গিয়েছে। তারা এখন শুধু দরসের ছাত্র এবং দরসের আসাতেযা হয়ে পড়েছেন। এই সম্পর্কহীনতা ও ব্যবধান অবশ্যই দূর করতে হবে। উভয়ের মাঝে আত্মার সম্পর্ক এবং হৃদয়ের বাঁধন সৃষ্টি করতে হবে। মাদারিসের অস্তিত্ব, ইলমের অগ্রগতি এবং তালিবে ইলমের কামিয়াঁবি এখানেই রয়েছে নিহিত।"

মুসলিম পারসোনাল ল' বোর্ড

ভারত স্বাধীন হওয়ার পর হতেই ইসলাম বিদ্বেষী কিছু কিছু পার্টির পক্ষ থেকে এমনকি মুসলমান নামধারী কিছু লোকের মধ্য থেকেও ভারতের সকল সম্প্রদায়ের জন্য একই ধরনের পরিভাষা, আইন, ইউনিফর্ম, সিভিল কোড চালু করার দাবী উঠতে থাকে। এ দাবীর প্রধান উদ্দেশ্য এই ছিল যে; মুসলমানদের শরীয়ত সম্মত যেসকল আইন ইত্যাদি রয়েছে তা শেষ করে দিয়ে হিন্দুয়ানী রুসুম-রেওয়াজের মধ্যে মুসলমানদেরকে নিমজ্জিত করা। এটা ছিল ভারতীয় মুসলমানদের উপর একটি বড় ধরনের ষড়যন্ত্র। ভারতীয় উলামা এবং মাশায়েখের মধ্যে এ ষড়যন্ত্র মোকাবলায় যারা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন তাদের মধ্যে বিহার, উড়িষ্যার আমীরে শরীয়ত হযরত মাওলানা মিন্নাতুল্লাহর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি এ ব্যাপারে হযরত মাওলানার সাথে পরামর্শ করে ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে দারুল উলূম দেওবন্দ, মুসলিম মজলিস মশওয়ারাত, জামাতে ইসলামী, নদওয়া প্রভৃতি ইসলামী ফোরামগুলির সাথে মতবিনিময় করে ১৯৭২ সালে বোম্বাইতে মুসলিম পার্সনাল ল' কনভেনশান আহ্বান করেন। এতে আহলে হাদীছ, বেরেলভী, শিয়া, বাহরা ফেরকা প্রভৃতি দলের মুখপাত্ররাও অংশ গ্রহণ করেন।

উক্ত কনভেশনে দারুল উলূম দেওবন্দের মুহতামিম হযরত মাওলানা ক্বারী তৈয়ব সাহেবকে সভাপতি এবং হযরত মাওলানা মিন্নাতুল্লাহ সাহেবকে সেক্রেটারী করে মুসলিম পার্সোনাল ল' বোর্ড নামে একটি সর্বভারতীয় সংগঠন প্রতিষ্ঠা করা হয়। কনভেনশনে হযরত মাওলানা মিন্নাতুল্লাহ সাহেব সভাপতিত্ব করেন। এ কনভেনশনে হযরত মাওলানা আলী মিয়াঁও উপস্থিত ছিলেন। আলীগড়ের দ্বিতীয় কনভেনশন হযরত মাওলানা আলী মিয়াঁই উদ্বোধন করেন এবং জোরালো ভাষায় ভারত সরকারকে এ ধরনের ষড়যন্ত্র হতে দূরে থাকার আহ্বান জানান। ১৯৮৩ সনে বোর্ডের সভাপতি হযরত মাওলানা ক্বারী তৈয়ব সাহেব (রহ.) ইন্তেকাল করলে সর্বসম্মতভাবে তাকে এ আন্দোলনের সভাপতি করা হয়। তিনি ১৯৮৩ থেকে মৃত্যু পর্যন্ত দীর্ঘ প্রায় ১৭ বছর ধরে এ বোর্ডের নেতৃত্ব ও অভিভাবকত্বের দায়িত্ব পালন করে গেছেন।

মুসলিম পারসোনাল ল' বোর্ডের এই আন্দোলন ছিল ভারতের ইতিহাসে মুসলমানদের সব চেয়ে বড় এবং সুসংহত আন্দোলন। আন্দোলনের প্রধান হিসেবে হযরত মাওলানা আলী মিয়াঁ জেনারেল সেক্রেটারী হযরত মাওলানা

মিন্নাতুল্লাহকে নিয়ে তৎকালীন প্রধান মন্ত্রী রাজীবগান্ধীর সাথে দেখা করেন এবং মুসলমানদের জন্য সম্পূর্ণ পৃথক পারিবারিক আইনের প্রয়োজনীয়তার গুরুত্ব বোঝাতে সক্ষম হন। কিছু টালবাহানার পর হযরত মাওলানার প্রজ্ঞা ও হিকমতের কাছে হার মেনে আর সময় নষ্ট না করে রাজীব গান্ধী বিনা বাক্য ব্যয়ে পার্লামেন্টে বিল মঞ্জুরীর ব্যবস্থা করেন। মোটকথা এটা ছিল ভারতীয় পার্লামেন্টে সংখ্যালঘু মুসলমানদের সমস্যার ব্যাপারে হযরত আলী মিয়াঁর অসাধারণ বিজয়; অথচ তিনি পার্লামেন্টের কোন সদস্য ছিলেন না। ঠিক এমনিভাবে ভারতের স্কুলগুলির সকল ছাত্রছাত্রীর জন্য হিন্দুদের প্রতিমা পুজার ধ্যান-ধারণা সম্বলিত জাতীয় সঙ্গীত বন্দে মাতরম পাঠ বাধ্যতামূলক করা হলে এবং শাহবানু মামলায় ভারতীয় সুপ্রিম কোর্ট মুসলিম পারসোসনাল ল' বোর্ডের বিরুদ্ধে যে রায় ঘোষণা করেছিল তার বিরুদ্ধে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন।

পায়ামে ইনসানিয়াত

হযরত মাওলানা আবুল হাসান আলী নদভী (রহ.) ভালো করে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, ভারতের বিশাল অমুসলিম জনগোষ্ঠীর সাথে দৈহিক এবং রাজনৈতিক শক্তি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হওয়াটা মুসলমানদের জন্য আত্মঘাতি পদক্ষেপ এবং জান-মাল, আবরু-ইজ্জত তথা সমস্ত কিছুতে চরম নিরাপত্তাহীনতা ডেকে আনা ছাড়া আর কিছুই নয়। তাই তিনি ভারতীয় মুসলমানদের অস্তিত্ব রক্ষার একমাত্র উপায় হিসাবে প্রতিবেশী অমুসলিম ভাইদের মানবতা ও সহমর্মিতার প্রতি উদ্বুদ্ধ করার এবং নিজেদের নৈতিক চরিত্রের শ্রেষ্ঠতার মাধ্যমে তাদের উপর প্রভাব ফেলার কৌশল অবলম্বন করেছিলেন। এ ব্যাপারে তিনি তার স্বধর্মীয় ভাইদের পক্ষ থেকে অনেক বিরূপ মন্তব্য শোনার পরও এ চিন্তাধারা লালন করে সামনে এগিয়ে যান।

১৯৫১ সালে লাখনৌর আমীনুদ্দৌলা পার্কে এক হিন্দু-মুসলিম জনসভার মাধ্যমে তিনি তার এ মানবতাবাদী দাওয়াতি কার্যক্রমের সূচনা করেন। খোদা পুরস্তি আওর নফস পুরস্তি নামে তিনি এক আবেগময়ী ভাষণ দেন। পিনপতন নীরবতার মাঝে সকলে তাঁর বক্তব্য শুনে অভিভূত হয়ে পড়েন। এরপর তিনি সারা ভারতে এই পয়গাম নিয়ে সফর করেন। ১৯৫৪ সালে লাখনৌর গঙ্গা প্রসাদ মেমোরিয়াল হলে পয়ামে ইনসানিয়াতের সভা হয়। আস্তে আস্তে ১৯৭৪-এ এসে পয়ামে ইনসানিয়াত আন্দোলনের রূপ ধারণ করে। কিন্তু বিশেষ কারণে পয়ামে ইনসানিয়াতকে হযরত মাওলানা সাংগঠনিকরূপ দেননি। এর জন্য কোন কমিটিও ছিল না, কোন ফান্ডও ছিল না। তিনি

নিজেই ছিলেন এ আন্দোলনের ভিত্তি। হযরতের ভাতিজা মুহাম্মাদ মিয়াঁ, তামীরে হায়াত সম্পাদক ইসহাক জলিস নদভী, মাওলানা আবদুল করীম পারেখ, কাজী আব্দুল হামিদ প্রমুখ হযরতের সাথে এ ধরনের প্রোগ্রামে সাথী হতেন।

পয়ামে ইনসানিয়াতের প্রোগ্রামে কি ধরণের ফায়দা হয়েছিল তার প্রমাণ হিসেবে দু'টি ঘটনা এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে। প্রথম ঘটনাঃ হযরত আলী মিয়াঁ বলেন যে একবার আমি সিওনে এই ধরনের মজলিসে বক্তৃতা করে বসার উদ্যোগ নিতেই চারিদিক থেকে আওয়াজ আসতে থাকে আরো বলুন, আরো বলুন। ঐ সময় একজন বয়স্ক হিন্দু ভদ্রলোক ওয়াণ্ডারফুল! ওয়াণ্ডারফুল!! বলতে বলতে স্টেজে গিয়ে মাইক হাতে নিয়ে বলতে থাকে– আমি জীবনে দুটি বক্তৃতা শুনে অনুপ্রাণিত হয়েছি। এক, সি.আর দাসের বক্তৃতা। দুই, আজ মাওলানা সাহেবের বক্তৃতা। মাওলানা সাহেব আপনি শুধু মুসলমানদের নন, আমাদেরও হক আছে আপনার কাছে। ভবিষ্যতে আপনাকে এখানে আসার জন্য কষ্ট দেব।

দ্বিতীয় ঘটনা এই যে, আসামের গোহাটী ইউনিভার্সিটির ইংরেজী বিভাগের প্রফেসর ডাঃ তারাচরণ রুস্তমী একবার বাসে ভ্রমণ করছিলেন। পথে তিনি সমুচা কিনেছিলেন। সমুচার প্যাকেটটা ছিল হিন্দিতে লেখা পয়ামে ইনসানিয়াতের অঙ্গীকারনামা। তিনি এ অঙ্গীকার নামা পড়ে অভিভূত হন এবং হযরত মাওলানাকে চিঠি লিখে তার প্রতিক্রিয়া জানান। জবাবে হযরত মাওলানা রুস্তমী মহাশয়ের জজবাকে গুরুত্ব দিয়ে তার কাছে পয়ামে ইনসানিয়াতের হিন্দিতে লেখা লিফলেটসমূহের একটি প্যাকেট পাঠিয়ে দেন। সেগুলি পড়ে তিনি আরো অনুপ্রাণিত হন।

অতঃপর গোপনে হযরত মাওলানার সাথে সাক্ষাৎ করতে নদওয়া আসেন এবং কয়েকদিন সাধারণ মেহমানের মত অবস্থান করেন। তিনি হযরত মাওলানাকে দেখেন, বুঝেন ও পরীক্ষা করেন এবং আসামে ফিরে গিয়ে হযরতকে এক পত্রে লেখেন যে, আপনার বক্তৃতার দ্বারা আমি ইসলামের সে সকল বিষয় অবগত হয়েছি, যা এতদিন আমার অগোচরে ছিল। এরপর আমি গোপনে আপনার খেদমতে হাজির হয়ে সেগুলিকে আপনার বাস্তব জীবনেও প্রত্যক্ষ করি এবং আপনার লেখনীর চাইতে জীবন থেকে বেশী প্রভাবিত হয়েছি। এখন ইসলাম গ্রহণ করা ছাড়া আমার আর উপায় নেই। এরপর তিনি সপরিবারে মুসলমান হয়ে যান।

রাবেতায়ে আদবে ইসলামী

হযরত মাওলানা আলী মিয়াঁ ভাষা ও সাহিত্যকে দাওয়াতের অন্যতম বাহন বা মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন এবং এর উন্নতি ও প্রসারের জন্য আন্তর্জাতিকভাবে ১৯৮৫ সালের জানুয়ারী মাসে রাবেতায়ে আদবে ইসলামী নামে একটি আন্দোলনের সূচনা করেন। এ আন্দোলনের আসল স্থপতি ছিলেন ইমাম মুহাম্মাদ বিন সাউদ ইউনিভার্সিটির ইমাম মুহাম্মাদ বিন সউদ ইউনিভার্সিটির আরবী সাহিত্য বিভাগের প্রধান ডঃ আবদুর রহমান রাফাত বাশা এবং সেখানকার কয়েকজন অধ্যাপক। জনাব আবদুর রহমান বাশা হযরত মাওলানার আরবী সাহিত্যের পাঠ্য কিতাব মুখতারাত গ্রন্থের ভূমিকা পড়ে এ ব্যাপারে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। ফলে তিনি এবং তাঁর কয়েকজন সাহিত্য প্রেমিক বন্ধু নিয়ে মক্কা মুকাররমায় হযরতের খেদমতে হাজির হয়ে এ আন্দোলনের উপর ব্যাপক আলোচনা করেন । আলোচনা সভায় হযরত মাওলানাকে এ প্রতিষ্ঠানের সভাপতি এবং নদুয়ার বর্তমান নাযেম হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ রাবে' সাহেবকে সাধারণ সম্পাদক মনোনীত করা হয় এবং এর হেড অফিস লাখনৌ রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

রবেতা আদবে ইসলামির পাটনা সম্মেলনে হযরত মাওলানা যে বক্তব্য রেখেছিলেন তার কিছু অংশ এখানে তুলে ধরা হল–

সাহিত্যকে সঠিক কাজে লাগাতে হবে
নাশকতার মাধ্যমে বানানো যাবে না

সাহিত্যকে সঠিক কাজে লাগাতে হবে। নাশকতা, বিভ্রান্তি সৃষ্টি, বিনোদন ও প্রবৃত্তিপূজার উপকারণ বানানো যাবে না। কেননা সাহিত্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য ও শক্তি হল তা গতি প্রবণতা, মনোভাব, চিন্তাধারা, নৈতিকতা ও পরিবর্তনের নিয়ামত হয়। এজন্য তা অত্যন্ত উপকারীও হতে পারে। ক্ষতিকরও হতে পারে। প্রতি যুগেই সাহিত্যকে কাজে লাগানো হয়েছে। এর নির্মাণ ও ধ্বংসের নিদর্শনও আমাদের সামনেই রয়েছে। বস্তুরাজির নাম, অর্থ ও উদ্দেশ্যের নামেরও অনেক গুরুত্ব রয়েছে। এসব নাম নির্বাচনে জাতির মনোভাব, সংস্কৃতি ও ভাষার বৈশিষ্ট্য দৃষ্টিগোচর হয়। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ভাষাসমূহে যে কোন চিন্তাধারা, নাজুক ও পবিত্র অনুভূতি, বিশ্বাস ও মনেবৃত্তি প্রকাশে আদব এর

মত অন্য শব্দ পাওয়া যায় না। আরবরা এটিকেই গ্রহণ করেছে। কেননা আদব কখনই নৈতিকতা থেকে পৃথক হতে পারে না। আমাদেরকে সেই সম্পর্ক রক্ষা করতে হবে।

সংস্কার মূলক প্রচেষ্টা সমূহ ও তার সদয় সম্পর্কিত সংস্কারকগণের কর্মকান্ড থেকে জানা যায় যে, তারা সবাই সাহিত্যের শক্তিকে কাজে লাগিয়েছেন। এমনকি ফরাসী বিপ্লবের পিছনেও এমন সাহিত্যিকদের দেখা যায়, যারা গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার জন্য তাদের লেখনী দ্বারা জনমত সৃষ্টি করেছিলেন সাহিত্যের মাধ্যমে যে ইতিবাচক বা নেতিবাচক, গঠনমূলক বা ধ্বংসাত্মক বিষয় অনুপ্রবিষ্ট করা যায়, তা অন্যান্য মাধ্যমে সম্ভব হয় না। এজন্য আমাদের দৃষ্টিতে সেই সব ব্যক্তির বিরাট মর্যাদা ও সম্মান যারা সাহিত্যের মাধ্যমে বিভ্রান্ত লোকদের সুপথে আনয়নের চেষ্টা করেন তাদেরকে ইসলামের দিকে ঝুঁকিয়েছেন। ইসলামের শিক্ষা সম্পর্কে তাদের মনে যেসব সন্দেহ সৃষ্টি হচ্ছিল, তা দূর করে তাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস ও প্রত্যয় বহাল করেছেন।

লেখনীর শক্তি, কথার প্রভাব এবং তার সমাদৃত হওয়া ও দীর্ঘস্থায়ী হওয়ার জন্য সবচেয়ে প্রয়োজনীয় ও সহায়ক উপাদান হল– লেখকের আন্তরিকতা, তার বিশ্বাষ ও মনের আবেগ ও কোন সত্য প্রকাশে তার মনের অস্থিরতা। যদি বর্ণনার সৌকর্যের সাথে মনের আবেগ যুক্ত হয়। তাহলে তাতে এমন শক্তি ও গতি সৃষ্টি হয় যে, তা হাজার হাজার মনে দাগ কাটে এবং শত শত বছর অতিবাহিত হওয়ার পরেও তা সজীব সতেজ থাকে, তার প্রভাব শক্তি ও অক্ষুণ্ন থাকে।

সাইয়েদুল মুরসালীন খাতেমুননাবীয়্যীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে উম্মী হওয়া সত্ত্বেও তার প্রতি ওহীর সূচনা করা হয়েছিল। ইকরা শব্দ দিয়ে। এথেকে প্রমাণিত হয় যে, জ্ঞান চর্চার সাথে এ উম্মতের সর্বদা সম্পর্ক থাকবে। এটি তাদের অন্যতম দায়িত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব। কিন্তু ইলমকে ইসমের সাথে সংযুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। পড় কিন্তু আল্লাহর নামে। ইসম থেকে যখন ইলমের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে এবং তা থেকে স্বাধীন হয়ে যাবে। তখন তা নিছক ক্ষতিকর ও ধ্বংসাত্মক হয়ে যাবে। পাশ্চাত্যের ও বর্তমান যুগের সবচেয়ে বড় ট্রাজেডি এটিই।

সাহিত্যের দুটি বিভাগ– গদ্য ও পদ্য। আধুনিক ইউরোপীয় সাহিত্য গঠনমূলক পথের পরিবর্তে ধ্বংসাত্মক পথ অবলম্বন করেছে। ফলে ধর্মহীনতা, অশ্লীলতা ও উলঙ্গপনা এখন সভ্যতা ও সংস্কৃতির উপর পরিব্যাপ্ত হয়ে গেছে। এই ধ্বংসাত্মক কাজে পদ্য সাহিত্যের বিশেষ ভূমিকা নেই। এজন্য গদ্য সাহিত্য সরাসরি দায়ী। ইউরোপীয় সাহিত্যিকদের শিষ্যত্ব ও অনুকরণ শুরু করেছে প্রাচ্যের সাহিত্যিকরা। এজন্য ভারতসহ দূর প্রাচ্যের শিক্ষিত শ্রেণীর একটি বিরাট অংশ ধর্মহীন বা ধর্মবিমুখ হয়ে গেছে। এতে গ্রীক দর্শনের বিরাট প্রভাব রয়েছে। কেননা গ্রীক দর্শনে জীবন দর্শনকে ধর্ম থেকে পৃথক ভোগবিলাসিতাকে জীবনের উদ্দেশ বানানো হয়েছে। এর ফলে খৃষ্টধর্ম ও ইউরোপ বিশৃংখলার শিকার হয়েছে। এ সাহিত্য পরবর্তী কালে ইউরোপ থেকে প্রাচ্যের দিকে দ্রুত বেগে ধাবিত হয়েছে। এর ফলে উপমহাদেশের লোকদের নৈতিকতা ও ধার্মিকতার অধঃপতন এসেছে। এ ব্যাপারে ধর্মহীন ও স্বাধীন সাহিত্যের বিরুদ্ধে মীর আকবর হুসাইন ইলাহাবাদীর সমালোচনা মূলক ও সত্য সন্ধানী কবিতা রয়েছে। এতে পশ্চিমা সভ্যতার গভীর ও সূক্ষ্ম সমালোচনা রয়েছে।

এক বছর পর ১৯৮৬ সালের জানুয়ারী মাসে এর প্রথম কনফারেন্স লাখনৌতে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে ইসলামী সাহিত্যের ভিত্তি মজবুত করা, ইসলামী সাহিত্যের সমালোচনা বিভাগের নিয়মকানুন তৈরী করা, নতুন গল্প সাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগ, জীবনী সাহিত্যের ইসলামী নিয়ম নীতি প্রণয়ন করা, ইসলামী সাহিত্যের ইতিহাস নতুনভাবে প্রণয়ন করা, ইসলামী সাহিত্যিকদের আদর্শ জমা করা, শিশু সাহিত্যের দিকে মনোযোগ দেয়া, ইসলামী সাহিত্যের মর্যাদা মেনে নেয়ার এবং সারা পৃথিবীর মুসলিম সাহিত্যিকদের সাথে সু-সম্পর্ক কায়েম করা ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা হয়।

এ আন্দোলনের দ্বিতীয় কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয় ইস্তাম্বুলে। এরপর ভূ-পাল, দিল্লী, লাহোর, পুনা, চট্টগ্রাম, আযমগড় প্রভৃতি স্থানে এ আন্দোলনের বার্ষিক কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে এবং নিয়মিত পত্র-পত্রিকা বের হচ্ছে। হযরত মাওলানার তত্তাবধানে এ প্রতিষ্ঠান বিশ্ব ব্যাপী বড় ধরনের খেদমত আঞ্জাম দিতে সমর্থ হয়েছে।

শিবলী একাডেমী

হযরত মাওলানা শিবলী নো'মানী প্রতিষ্ঠিত, দারুল মুসান্নিফীন বা শিবলী একাডেমীর (আযমগড়) সাথে হযরত মাওলানার গভীর সম্পর্ক ছিল। মাওলানা সাইয়েদ সুলায়মান নদভী ও মাওলানা মাসউদ আলম নদভীর সাথে গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্কের কারণে হযরত মাওলানা দারুল মুসান্নিফীনের কাজে অগ্রগামী ছিলেন এবং মনোযোগ রাখতেন। তিনি এ প্রতিষ্ঠানের সার্বিক উন্নতিতে খুশীও প্রকাশ করতেন। তিনি এবং তাঁর বড় ভাই এ প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন মজলিসের সদস্য ছিলেন। মাওলানা আব্দুল মাজেদ দরিয়াবাদীর পর হযরত মাওলানাকে মজলিসে আমেলার সভাপতি বানানো হয়।

ডাঃ সাইয়েদ মাহমুদ এবং মাওলানা শাহ মঈনুদ্দীন আহমদ নদভীর ইন্তে কালের পর তিনিই ছিলেন এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান আকর্ষণ। তিনি নিয়মিত দারুল মুসান্নেফিনের জলসায় হাযির হতেন। এ প্রতিষ্ঠানের আন্তর্জাতিক সেমিনারসমূহকে কামিয়াঁব করার জন্য তিনি পূর্ণ শক্তি নিয়োগ করেছিলেন। এই প্রতিষ্ঠান থেকে তিনি তাঁর আব্বার রচিত গ্রন্থ– গুলে রাআনা এবং আস-সিফাতুল ইসলামিয়াঁ ফিল হিন্দের উর্দূ তরজমা প্রকাশ করেন। তাঁর নিজের বিখ্যাত গ্রন্থ তারিখে দাওয়াত ওয়া আযীমাত প্রথম এবং দ্বিতীয় খন্ডের প্রথম সংস্করণ এ প্রতিষ্ঠান থেকেই প্রকাশিত হয়। এ প্রতিষ্ঠান হতে প্রকাশিত মাসিক পত্রিকা মা'আরিফ নিয়মিত পড়তেন। পত্রিকা বের হতে দেরী হলে তিনি ব্যথিত হতেন। ইন্তেকালের কিছুদিন পূর্বে তাঁকে তার সবচাইতে প্রিয় মাসিক পত্রিকার নাম জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি জবাবে মা'আরিফের নাম উচ্চারণ করেছিলেন।

হযরত মাওলানা দারুল মুসান্নিফীনকে আর্থিক সহযোগিতারও চেষ্টা করতেন। ইউপির সাবেক মুখ্যমন্ত্রী বহগুনার নদওয়াকে দেয়া এক লাখ রুপীর বাজেটকে তিনি দারুল মুসান্নিফীনকে দেয়ার ব্যবস্থা করেন। হযরত সাইয়েদ সুলায়মান নদভীর সিরাত গ্রন্থের সপ্তম খন্ডের ভূমিকা তিনি

লিখেছিলেন। পাকিস্তানের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট জেনারেল যিয়া এ গ্রন্থ পড়ে খুশী হয়ে হযরত মাওলানাকে ১ লাখ রূপি হাদীয়া করার উদ্যোগ নিলে তিনি বলেছিলেন এ হাদিয়ার প্রকৃত হকদার হচ্ছে দারুল মুসান্নিফীন এবং সাইয়েদ সাহেবের বেগম সাহেবা। সুতরাং উক্ত হাদিয়া অর্ধেক অর্ধেক করে উভয়কে দেয়া হয়। এছাড়া দুবাই এবং ব্রুনাই পুরস্কারের কিছু আর্থিক হাদিয়া তিনি দারুল মুসান্নিফিনকেও দিয়েছিলেন। রাবেতা আলমে ইসলামী হতেও তিনি কিছু আর্থিক সহযোগিতা দারুল মুসান্নিফীনের জন্য করিয়ে দিয়েছিলেন। মোটকথা হযরত মাওলানা এ প্রতিষ্ঠানকে কখনই ভোলেননি। আমৃত্যু তিনি এ প্রতিষ্ঠানের খেদমত করে গিয়েছেন।

দ্বীনী তা'লীমী কাউন্সিল

ভারত বিভাগের পর সরকারী প্রচেষ্টাতেই হিন্দু সংস্কৃতির পুনর্জাগরণের কাজ পুরোদমে শুরু হয়ে গিয়েছিল। এসবের লক্ষ্য ছিল ক্রমান্বয়ে মুসলমানদের আকীদা বিশ্বাস, সভ্যতা, সংস্কৃতির শেষ চিহ্নটুকুও মুছে ফেলা। মুসলমানরাও স্রোতের গড্ডালিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে হিন্দুয়ানী সভ্যতার দিকে দ্রুত ছুটে চলছিল। বিশেষ করে নূতন প্রজন্মের যুবক-যুবতীরা ইসলামী শিক্ষা ও চেতনা হারিয়ে হিন্দু সমাজের আদর্শে নিজেদের বিলীন করে ফেলছিল। কিন্তু এ নৈতিক দুর্যোগের সফল মোকাবেলা করার রাস্তা খুঁজে পাচ্ছিলেন না ভারতের চিন্তাশীল ইসলাম প্রিয় সমাজ।

ঠিক ঐ মুহূর্তে বস্তি জেলার কাজী আদিল আব্বাসী নামক একজন মর্দে মুজাহিদ মুষ্টি চাঁদার ভিত্তিতে মসজিদ ভিত্তিক সকাল সন্ধ্যা দ্বীনী শিক্ষার একটা সীমিত উদ্যোগ গ্রহণ করেন, যা বেশ উপযোগী প্রমাণিত হয়। হযরত আলী মিয়াঁ (রহ.) কারোর মধ্যে কোন সদগুণ দেখলে তিনি তাকে আরো উদ্বুদ্ধ করতেন ও সকল রকম সহযোগিতা করতেন। অতএব তিনি কাজী সাহেবের এই সীমিত আন্দোলনকে প্রথমে প্রদেশব্যাপী, পরবর্তীতে সারা ভারতে ছড়িয়ে দেন। ১৯৫৯ সালের ৩০ ও ৩১সে ডিসেম্বর এবং ১৯৬০ সালের পহেলা জানুয়ারী কাজী সাহেবের আহবানে বস্তিতে তিনদিনব্যাপী এক প্রাদেশিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। তার সভাপতির ভাষণটি ছিল দ্বীনী শিক্ষা আন্দোলনের ক্ষেত্রে এক দিক-নির্দেশক ও মাইলফলক। সম্মেলনে দ্বীনী তালীমী কাউন্সিল নামে একটি সংস্থা গঠন করা হয়। সর্বসম্মতিক্রমে হযরত আলী মিয়াঁ তার সভাপতি মনোনীত হন।

এ আন্দোলনের সাথে সীতাপুরের উকিল জাফর আহমাদ সাহেবও জড়িয়ে পড়েন। কাজী সাহেবের সাথে তাঁর সম্পর্ক খুবই ভাল ছিল। ১৯৮০ সালে তার পর দু'জন কর্মী ইন্তেকাল করলে ইলাহাবাদের একজন মুখলেছ কর্মী রিয়াজ উদ্দীন সাহেব এ প্রতিষ্ঠানের হাল ধরেন। তাঁর ইন্তেকালের পর লাখনৌর একজন সমাজদরদী হযরতের গুণগ্রাহী ডাঃ ইশতিয়াক হোসেন কুরাইশী সেক্রেটারী নির্বাচিত হন। বর্তমানে জনাব কাজী আদিল উদ্দীন আব্বাসী সাহেবের ভাগনে ডাঃ মাসউদুল হাসান সেক্রেটারী হিসেবে এবং ডাঃ ইশতিয়াক সাহেব সভাপতি হিসেবে আছেন।

হযরত মাওলানা এ আন্দোলনের স্থপতি জনাব কাজী আদিল উদ্দীন আব্বাসীর জীবদ্দশায় তাঁর ইখলাস, আমল, দূরদর্শিতার খুবই কদর করতেন। ইন্তেকালের পরও তিনি তাঁর আত্মীয় স্বজনদের খোঁজ-খবর নিতেন। হযরত মাওলানা এ প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অসুবিধা দূর করার জন্য রাবেতা আলমে ইসলামী থেকে ভাতারও ব্যবস্থা করেছিলেন। আমৃত্যু তিনি এ প্রতিষ্ঠানের অভিভাবক ছিলেন।

রাবেতায়ে আলমে ইসলামী

১৯৬০ সালের দিকে আরব বিশ্বের উপর কম্বিং বিমান হামলা শুরু হয়। ঐ সময় সৌদী আরব সময় উপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করে এবং একটি আন্তর্জাতিক মানের সংস্থা গঠন করে। যার নাম রাখা হয় রাবেতায়ে আলমে ইসলামী (ইসলামী বিশ্বের মৈত্রী সংঘ)। এ সংস্থার উদ্দেশ্য ছিল সারা বিশ্বের মুসলমানদের দ্বীনী এবং আর্থ সামাজিক কাজে সহযোগিতা করা। সাহায্য সহযোগিতার নামে খৃষ্টান এনজিওরা যেভাবে মুসলমানদের মুরতাদ করে ফেলছে এবং সেবা ও সহযোগিতার নামে মুসলমান যুবক-যুবতীদের ঈমান হরন করে চলছে তারই মোকাবেলা করার উদ্দেশ্যে ঐ সংস্থা তার কাজ শুরু করে। ১৩৮১ হিজরীর ১৮ জিলহজ্জ মরহুম শাহ সৌদ বিন আবদুল আযীযের সভাপতিত্বে এর প্রথম অধিবেশন মক্কা শরীফে অনুষ্ঠিত হয়। ঘটনাক্রমে ঐ সময় মাওলানা আলী মিয়াঁ মক্কা শরীফে অবস্থান করছিলেন। ঐ অনুষ্ঠানে হযরতকে দাওয়াত দেয়া হয় এবং তাঁকে রাবেতার মেম্বার মনোনীত করা হয়।

ভারত থেকে আরো একজন রাবেতার সদস্য নেয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলে হযরত মাওলানা আলী মিয়াঁ, বিখ্যাত আলেমেদ্বীন হযরত মাওলানা মনযুর নোমানী সাহেবের নাম পেশ করেন এবং হযরত নো'মানী রাবেতার সদস্য নির্বাচিত হন। রাবেতার সদস্যদের উপর হযরতের বিশেষ প্রভাব ছিল। রাবেতার সভাপতি শায়খ ইবরাহীম অনুপস্থিত থাকলে মাওলানা আলী মিয়াঁকেই সভাপতির দায়িত্ব দেয়া হত। এক বছর তিনি রাবেতার মিটিং এ উপস্থিত হতে পারেননি। ঐ সময়ের রাবেতা প্রধান শেখ ছালেহ বলেছিলেন, খোদার কসম, শায়খ আবুল হাসান না থাকায় রাবেতার মিটিং ফিকে হয়ে গিয়েছে। তিনি থাকলে জলসার মধ্যে আযমত এবং নুরানিয়াত অনুভূত হত। আরেক বছর জলসার পূর্বে শেখ নাসের আবদী বলেছিলেন– কোনই অসুবিধা নেই, শায়খ আবুল হাসান প্রথম বৈঠকে উপস্থিত না হতে পারলে তৃতীয় দিনের বৈঠকে হাযির হতে পারেন। নিসন্দেহে তাঁর এক ঘন্টার উপস্থিতি রাবেতার জলসাকে ভারী করে দেয়। রাবেতার জন্য এটা বিরাট সৌভাগ্য হবে যে শায়খ অল্প সময়ের জন্য হলেও মিটিং এ উপস্থিত হয়েছেন।

অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

বৃটেনের অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি পৃথিবী বিখ্যাত। ঐ ইউনিভার্সিটিতে একটি ইসলামিক সেন্টার কায়েম করার জন্য সেখানকার মুসলিম বুদ্ধিজীবীরা বহুদিন হতে চেষ্টা করে আসছিলেন। ইউনিভার্সিটির সাতশত বছরের ইতিহাসে এ বিভাগ বাস্তবায়ন করার প্রথমবারের মত যখন সুযোগ আসে তখন লন্ডনে অবস্থানরত বিখ্যাত ঐতিহাসিক জনাব প্রফেসর খালীক আহমাদ নেযামী ১৯৮৩ সালে হযরত আলী মিয়াঁকে এ সেন্টারের উদ্বোধন করার দাওয়াত দেন।

ইসলামী বিষয়ে অধ্যয়ন, গবেষণা এবং পশ্চিমা বুদ্ধিজীবি ও সত্য সন্ধানীদেরকে ইসলামের সাথে পরিচিত করার লক্ষ্যে ঈসায়ী শিক্ষা কেন্দ্রে এ ধরণের একটি বিভাগ প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই প্রচেষ্টায় খালীক আহমাদ নেযামী সাহেবের সাহেবজাদা ফারহান নেযামীর বিশেষ বন্ধু সেন্ট ক্রস কলেজের শিক্ষক ও ভাইস প্রিন্সিপাল ডঃ ডিজি ব্রাউনিং ছিলেন অগ্রণী ভূমিকায়। তাঁর ইচ্ছা ছিল যে, মাওলানা আলী মিয়াঁর মত ব্যক্তিত্ব এই কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার সাথে জড়িত থাকবেন, এর লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও গঠনতন্ত্র প্রণয়নে সাহায্য করবেন এবং ইসলাম ও পাশ্চাত্য বিষয়ে প্রবন্ধ পড়বেন।

বহু বছর হতে হযরত আলী মিয়াঁ (রহ.) তাঁর চিন্তাধারাকে পাশ্চাত্য সমাজের সামনে পেশ করার সুযোগ খুঁজছিলেন এবং রাব্বুল আলামীনের কাছে দোয়া করছিলেন। এ দাওয়াতনামা পাওয়ার পর তাঁর অন্তরের সে আকাঙ্ক্ষা পুরো হওয়ার সুযোগ হয়। তিনি এ সুযোগ কাজে লাগান এবং সেখানকার উন্নতির জন্য তাঁর সকল প্রচেষ্টা জারী রাখেন।

তিনি ১৯৮৩ সালের ২০ ও ২১শে জুলাই লন্ডন রওয়ানা হন, হিথরো এয়ার পোর্টে ডঃ ব্রাউনিং এবং ফারহান নেযামী তাকে অভ্যর্থনা জানান। ২২শে জুলাই সকাল দশটায় জলসা শুরু হয়। তিনি প্রথমে আরবীতে সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা করেন এবং ফারহান নেযামী তাঁর মূল প্রবন্ধ ইংরেজীতে ভাষান্তর করে শুনান।

২৩ ও ২৪ জুলাই এই ইসলামিক সেন্টারের আসল বিষয়গুলি চূড়ান্ত করা হয়। ডাঃ ফারহান নেজামীকে ডাইরেক্টর এবং ডঃ ব্রাউনিংকে রেজিস্ট্রার করা হয়। অস্থায়ী গঠনতন্ত্র তৈরী করা হয় এবং এর ইসলামী চরিত্র বহাল রাখার জন্য এ নিয়ম করা হয় যে কমিটির রোকনদের মধ্যে আধিক্য থাকবে মুসলমান বুদ্ধিজীবীদের। এ সিদ্ধান্ত এ জন্য নেয়া হয় যে, এ প্রতিষ্ঠান যেন অন্য কোন উদ্দেশ্যে এবং কোন বিশেষ দলের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হতে না পারে।

==ooo==

অধ্যায়–৮

বহির্বিশ্বে হযরত মাওলানা আলী মিয়াঁ

হযরত মাওলানা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী (রহ.)-এর পুরো জীবনটাই ছিল সফর। দ্বীনী দাওয়াত ও পয়গাম নিয়ে উম্মতের দরদে তিনি ভারতের আনাচে-কানাচে ঘুরে বেড়াতেন। কোন স্থান হতে ডাক এলে তিনি আর বসে থাকতে পারতেন না। দ্বীনের উপর কোন স্থানে হামলা হলে তিনি ছুটে যেতেন সে এলাকায়। তার এই দ্বীনী ও দাওয়াতী সফর শুধু ভারতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না; বরং তিনি সারা পৃথিবীতে তাঁর এই সফর জারী রেখেছিলেন। আলোচ্য অধ্যায়ে বহির্বিশ্বে হযরত মাওলানার প্রধান দাওয়াতী কার্যক্রমগুলির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া হল।

এশিয়া ও আফ্রিকা

সৌদী আরব (১৯৪৭)

হযরতজী মাওলানা ইলিয়াস (রহ.)-এর ইন্তেকালের পর আরব বিশ্বের শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী এবং সাহিত্যিক মহলের মধ্যে দাওয়াতের কাজ পরিচিত করার উদ্দেশ্যে নিযামুদ্দীন মারকায হতে হযরত মাওলানাকে সৌদী আরবে পাঠানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। ইতিপূর্বে অবশ্য হযরত মাওলানা উবায়দুল্লাহ বলিয়াভী সাহেব (রহ.) এ কাজেই সৌদী আরবে অবস্থান করছিলেন। অবশ্য কাজ তখন শুধুমাত্র ভারত ও পাকিস্তান প্রবাসী মুসলমানদের মধ্যে এবং সাধারণ আরবদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। আরবী ভাষা ও সাহিত্যের ময়দানে হযরত মাওলানার পদচারণার জন্য এ নির্বাচন খুবই ফলপ্রসূ হয়েছিল।

হযরত মাওলানা (রহ.) ১৯৪৭ সালের ১৯শে জুলাই, ১৩৬৬ হিজরী ২৯শে শাবান এ উদ্দেশ্যে জেদ্দা পৌঁছেন। রমযান শুরু হয়ে যায়। হযরত মাওলানা প্রথমে তিনমাস মদীনায় অবস্থান করেন এবং মদীনার উচ্চ শিক্ষিত সমাজে দাওয়াতের কাজের পরিচয় তুলে ধরেন। ২০শে জিলকদ তিনি হজ্জের উদ্দেশ্যে মক্কা শরীফ রওয়ানা হন। হজ্জের পর মক্কা শরীফেও তিনমাস অবস্থান করে দাওয়াতের কাজকে সুধী সমাজের সামনে তুলে ধরেন। হযরত মাওলানা সেখানকার আরবী সাহিত্যের বড় বড় আলেম এবং জ্ঞানী সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি তার ব্যক্তিত্বকে তাদের সামনে তুলে ধরতে সমর্থ হন।

১৯৫০ সালের ৪ঠা সেপ্টেম্বর তিনি ২য় বার হজ্জের জন্য তাঁর পীর ও মুর্শেদের সাথে সৌদি আরব রওয়ানা হন। হজ্জের পর তিনি বেশ কয়েক মাস মদীনা ও মক্কা শরীফে অবস্থান করেন। ঐ সময় তিনি সৌদী আরবে পশ্চিমা সভ্যতা ও সংস্কৃতির ব্যাপক প্রভাবের উপস্থিতি উপলব্ধি করেন। ফলে তিনি তাঁর সকল মজলিসে মুসলমানদের জন্য পশ্চিমা জীবন ব্যবস্থা গ্রহণ করাটা আত্মঘাতী কাজ হবে বলে আরব দুনিয়াকে সতর্ক করেন। তিনি সৌদি সাহিত্যিক ও কলামিষ্টদের বিভিন্ন সেমিনারেও ভাষণ দেন। সৌদি রেডিওতেও হযরত মাওলানা প্রাণ খুলে আরব দুনিয়ার সামনে তাঁর চিন্তাধারা পেশ করতে সমর্থ হন।

মিসর (১৯৫১)

মাওলানা আলী মিয়াঁ সৌদি সফরে এ বিষয় ভালভাবে উপলব্ধি করেছিলেন যে, সৌদি আরবের শিক্ষিত শ্রেণী ও বুদ্ধিজীবীরা মিশরের সাহিত্যকে নিজেদের আইডিয়াল হিসেবে বেছে নিয়েছে। তাই তিনি তাঁর সৌদি আরবের দ্বিতীয় সফরের চারমাস পর ১৯৫১ সালের ২০শে জানুয়ারী মিশর রওয়ানা হন। তিনি মিশরে প্রায় ছয়মাস অবস্থান করেন। মিশরে অবস্থানকালে তিনি সেখানকার সকল শ্রেণীর মানুষের সাথে মত বিনিময় করেন। তাঁর এই সফর ছিল দাওয়াতী ও ইলমী। তিনি সেখানকার নামকরা আলেম, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী এবং লেখকদের সাথে পরিচিত হন। এসকল মনীষীর মধ্যে ডঃ আহমাদ আমীন, ডঃ ত্বহা হুসাইন, আব্বাস মাহমুদ, ডঃ মুহাম্মাদ হুসাইন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

বিখ্যাত আলেমদের মধ্যে ছিলেন শায়খুল আজহার, শায়খ আব্দুল মজীদ সালীম, শায়খ মাহমুদ. শায়খ আহমাদ মুহাম্মাদ, আহমাদ বিন আব্দুর রহমান প্রমুখ। বিশিষ্ট চিন্তাবিদ ও দায়ীদের মধ্যে উস্তাদ মুহিববুদ্দিন খতীব, সাইয়েদ কুতুব, আহমাদ শেরবাসী, মুহাম্মাদ গাজ্জালী, সাইদ রামাযান প্রমুখের সাথেও তিনি মত বিনিময় করেন।

বিখ্যাত সংগঠনের নেতৃবৃন্দের মধ্যে ইখওয়ানুল মুসলিমীন, জমিয়তে শুব্বানুল মুসলিমীন প্রভৃতি সংগঠনের নেতৃবৃন্দের সাথেও তিনি মত বিনিময় করেন। তাঁর এ সফরের ডায়েরী আরবী ও উর্দুতে প্রকাশিত হয়। ঐসময় তিনি আল্লামা ইকবালের চিন্তাধারাকে আরব বিশ্বে তুলে ধরেন। এ ছাড়া اسمعي يا مصر নামক প্রবন্ধ সেখানকার আরবী পত্রিকায় প্রকাশ করেন।

ইখওয়ানুল মুসলিমীন

মিশর সফরের সময় তাঁর বিশেষ আবেগ এই ছিল যে, তিনি মিশরের বিখ্যাত ইসলামী ও দাওয়াতী সংগঠন ইখওয়ানুল মুসলিমীনকে কাছে থেকে দেখবেন, এর সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জন করবেন ও শায়খ হাসানুল বান্নার পুরনো সাথীদের ও তাঁর দীক্ষাপ্রাপ্ত অনুসারী ও ছাত্রদের সাথেও মত বিনিময় করবেন এবং এ সংগঠনের নিয়মনীতি সম্পর্কে জানবেন।

শায়খ হাসানুল বান্না ১৯৪৯ সালে শাহাদাতবরণ করেন। তাঁর সংগী-সাথীরা প্রায় সবাই জীবিত ছিলেন। ঐ সময় তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ মা-যা খাসিরাল আলামু বি ইনহিতাতিল মুসলিমীন" প্রকাশিত হয়েছিল। এ গ্রন্থের কারণে তিনি তাঁর পরিচয় ও অবস্থান আরব বিশ্বের শিক্ষিত সমাজে ফুটিয়ে তুলতে পেরেছিলেন। ইখওয়ানের কাছে এ গ্রন্থ খানা ছিল খুবই প্রিয় এবং তারা তাদের তরবিয়তী কোর্সে এ গ্রন্থখানিকে স্থান দিয়েছিল। তিনি তাদের বিভিন্ন মজলিসে বক্তৃতা করেন এবং ইখওয়ানের বিশিষ্ট সাহিত্যিক শায়খ গাজ্জালীর সাথে মিশরের প্রত্যন্ত এলাকা সফর করেন।

তিনি ইখওয়ানের কর্মীদের সহজ জীবন যাপন, বাস্তব কর্মজীবন ও পাশ্চাত্যের বিষাক্ত ছোবলে জর্জরিত সমাজে দ্বীনের আলো জ্বালিয়ে রাখার জযবাকে মর্যাদার দৃষ্টিতে দেখেন এবং তাদেরকে মোবারকবাদ জানান।

সুদান

১৯৫১ সালের ২৩ শে জুন তিনি কায়রো থেকে সুদান রওয়ানা হন। ৭ই জুন খুরতুম উপস্থিত হন। সেখানে তিনি সুদানের বিখ্যাত দ্বীনী ও রূহানী ব্যক্তিত্ব সাইয়েদ মীর গনি পাশার বিশ্বাসভাজন শায়খ তৈয়ব আব্দুল মাকসুদের নিকট অবস্থান করেন এবং দাওয়াতী প্রোগ্রামসমূহ চালু করেন। উল্লেখ্য, এ সফরে তাঁর সাথে নিযামুদ্দীন মারকাযের হযরত মাওলানা উবায়দুল্লাহ বলিয়াভীও ছিলেন।

তিনি খুরতুমের বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব উস্তাদ ইসমাইল ও সাইয়েদ আলী মীর গনি পাশাসহ উলামা ও শিক্ষিত সমাজের সর্বস্তরের লোকদের সাথে মত বিনিময় করেন। তিনি এসব অনুষ্ঠানে সুদানী ভাইদেরকে আফ্রিকায় ইসলাম প্রচারের এবং ইসলাম ও মুসলমানদের ভবিষ্যত নির্ধারণে ব্যাপক ভূমিকা রাখার দাওয়াত দিয়ে দিক নির্দেশনা মূলক পরামর্শ দেন। তিনি সুদানে ১০ দিন অবস্থান করেছিলেন।

দামেশ্‌ক

হযরত মাওলানা আলী মিয়াঁ ১৯৫১ সালের সুদানে ১০ দিন অবস্থান করে দামেশ্‌ক আগমন করেন। দামেশ্‌ক ছিল সাহাবায়ে কেরামের মাজার এবং বড় বড় উলামা-মাশায়েখের জন্মভূমি। হযরত মাওলানা সিরিয়াতে প্রায় দেড়মাস অবস্থান করেছিলেন। এর মধ্যে শুধু দামেস্কেই ২৪ দিন ছিলেন। খুব বেশিদিন সিরিয়াতে অবস্থান না করলেও হযরতের এ সফর ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ অল্প সময়ে তাঁর কর্মব্যস্ততা ছিল খুবই । বিশেষ করে দামেস্কের উলামা-মাশায়খ এবং সুধী সমাজের সামনে তিনি তাঁর আল্লাহ প্রদত্ত নেয়ামতসমূহের যথাযোগ্য প্রয়োগ করতে এবং তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সমর্থ হন। তিনি সিরিয়ার ইলমী প্রতিষ্ঠান, সাহিত্য কেন্দ্রসমুহ,কেন্দ্রীয় একাডেমী 'আল মাজমাউল ইলমী' ঐতিহাসিক মাদরাসা 'দারুল হাদীছ' (যেখানে ইমাম নববী (রহ.) দরস দিতেন) প্রত্যক্ষ করেন। তিনি সিরিয়ার পার্লামেন্টের এক অধিবেশনেও বিশেষ মেহমান হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। এ সফরে তিনি বায়তুল মোকাদ্দাসও পরিদর্শন করেন এবং এটি সে সফরের একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় ছিল। দামেস্কের সুধী সমাজের সামনে ফিলিস্তিন ট্রাজেডি শীর্ষক একটি প্রবন্ধও পাঠ করেন।

এছাড়া তিনি দামেশ্‌ক ইউনিভার্সিটির ডঃ মোস্তফা সুবায়ীর দাওয়াতে ১৯৫৬ সালে সেখানকার ভিজিটিং প্রফেসর হিসেবে যোগদান করেন এবং সেখানে তিনমাস অবস্থান করেন। এ সময় দামেশ্‌ক রেডিও তাঁর দুইটি ভাষণ প্রচার করে।

মক্কা শরীফ

দামেশ্‌ক থেকে ১৯৫১ সালের ১২ই আগষ্ট তিনি বিমান যোগে মদীনা শরীফ ফিরে আসেন এবং কয়েকদিন পর্যন্ত মদীনায় অবস্থান করে মক্কা মোকাররমা চলে আসেন। এখানে তিনি আরও ৫ মাস অবস্থান করে দ্বিতীয় হজ্জ সম্পাদন করেন।

হজ্জের পর তাঁর পুরনো বন্ধু-বান্ধবদের সাথে পূর্বের সফরে যে সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল তা নতুন করে উজ্জীবিত হয়ে উঠে। বুস্তানে বুখারীতে এজতেমার সময় যাদের সাথে হযরতের পরিচয় হয়েছিল, এ সফরে সে পরিচয়ে নতুন মাত্রা যোগ হয়। এ সফরে সৌদি রেডিও তাঁর দুইটি বক্তব্য প্রচার করে। এর মধ্যে একটি ছিল "মিন গারে হেরা"। এ বক্তব্যে তিনি

ইসলামের সুবহে সাদেক শুরু হলে দুনিয়াব্যাপী কিভাবে ইসলামের আলো ছড়িয়ে পড়ে ছিল, বিক্ষিপ্ত মানবতা কিভাবে সুশৃংখলভাবে সংঘবদ্ধ হয়েছিল এবং সে যুগের সমস্যাক্লিষ্ট মানবতার সুষ্ঠু সমাধানের মূল চাবিকাঠি কি ছিল তার উপর বিশদভাবে আলোকপাত করেন।

দরসগাহে নবুওয়ত বিভিন্ন প্রয়োজনে কি ধরনের মডেল মানুষ তৈরী করেছে, তাদেরকে জীবনের বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে কিভাবে ফিট করেছে এবং তারা দুনিয়াতে কি ধরনের বিপ্লব সৃষ্টি করেছিল সৌদি রেডিওতে প্রথম ভাষণে তিনি সে প্রসঙ্গেও আলোচনা করেন।

সৌদি রেডিও প্রচারিত তাঁর দ্বিতীয় ভাষণের বিষয়ববস্তু ছিল, "আল্লামা ইকবালের জীবন-কর্ম ও বিপ্লবী আহ্বান।" এ বক্তব্যের মাধ্যমে তিনি আল্লামা ইকবালকে আরব বিশ্বের সর্বসাধারণের নিকট পরিচিত করে তোলেন।

এই সফরে তিনি তায়েফ ও ওয়াদিয়ে ফাতেমা সফর করেন এবং দ্বীনী, দাওয়াতী ও ইলমী প্রোগ্রাম সফল করেন। এই সহাশ সফর শেষ করে ১৯৫১ তিনি দেশে ফিরে আসেন।

লেবানন

দামেস্কের এই সফরেই তিনি সুযোগ করে লেবানন সফর করেন। মাত্র কয়েক ঘন্টার দূরত্ব দামেশ্ক থেকে লেবানন। এ সুযোগ তিনি হাতছাড়া করেননি। ইখওয়ান সংগঠনের এক বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে তিনি লেবানন হাজির হন। এখানে তিনি চারদিন অবস্থান করেন এবং ঐতিহাসিক স্থাপনা ও স্থানগুলো পরিদর্শন করেন। ইমাম আওযায়ী (রহ.)-এর মাযার যিয়ারত করেন। এছাড়াও এ সফরে তিনি দ্বীনী প্রতিষ্ঠান, ইসলামী ব্যক্তিত্ব, ইসলামী আন্দোলনের বিভিন্ন দায়িত্বশীলের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। এসময় তিনি বিখ্যাত নওমুসলিম দার্শনিক Road to Mecca এর লেখক মুহাম্মাদ আসাদের সাথে সাক্ষাৎ করেন।

তুরস্ক (১৯৫৬)

দামেশ্ক ইউনিভার্সিটির প্রবন্ধ পাঠ থেকে অবসর হয়ে তিনি ১৯৫৬ সালের ১২ই জুন দু'সপ্তাহের জন্য তুরস্ক সফরে রওয়ানা হন। তিনি হালাব শহরে এক রাত অবস্থান করেন এবং সেখানের ইখওয়ানুল মুসলিমীনের এক

সমাবেশে অংশগ্রহণ করে বক্তব্য পেশ করেন। বক্তৃতার বিষয়বস্তু ছিল حاجتنا الى ايمان جديد এ বক্তৃতায় তিনি আরব জাতীয়তাবাদের ব্যাপক সমালোচনা করেন। শ্রোতাদের মধ্যে এ বক্তব্য বিরাট প্রভাব সৃষ্টি করে।

হালাব থেকে তিনি তুরস্কের সীমান্ত অঞ্চল হায়দার পাশা দিয়ে তুরস্কে প্রবেশ করেন। এ দুই সপ্তাহে তিনি তুরস্কের ঐতিহাসিক স্থান ইস্তাম্বুল সফর করেন। এছাড়া আংগুরা, কওনিয়া (মাওলানা রুমীর জন্মস্থান) প্রভৃতি স্থানও সফর করেন।

বাগদাদ

জুলাই মাসের কোন এক তারিখে তিনি বাগদাদ এবং করাচী হয়ে দেশে ফিরে আসার সিদ্ধান্ত নেন। বাগদাদে ঐসময় হযরতের শ্রদ্ধেয় উস্তাদ ড. তকীউদ্দিন হেলালী অবস্থান করছিলেন। দীর্ঘ ২৩ বছর পর প্রাণপ্রিয় এই উস্তাদের সাক্ষাতে তিনি যারপরনাই আনন্দিত হন। হযরত হেলালীর দৃষ্টিশক্তি কমে যাওয়ায় তিনি আলী মিয়াঁকে না দেখতে পারলেও তাঁর কণ্ঠ শুনে তিনি যেন পরম তৃপ্তি লাভ করেন। প্রিয় শাগরেদকে তিনি দাওয়াত দেন এবং আপ্যায়ন করেন।

এ সফরে তিনি জমিয়াঁতু ইনফাযে ফিলিস্তীনের দফতরে অবস্থান করেন এবং সেখানকার সুধী সমাজের সামনে বক্তব্য রাখেন। মাওলানা আলী মিয়াঁ তাঁর খান্দানের উর্ধ্বতন পূর্বপুরুষ হযরত শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী (রহ.) সহ অন্যান্য বুযুর্গানে দ্বীনের মাযার যিয়ারত করেন।

পাকিস্তান (১৯৫৩)

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হবার পর প্রথমবার ১৯৫৩ সালে মাওলানা আলী মিয়াঁ পাকিস্তান যাওয়ার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে দিল্লী থেকে ফিরে আসেন। খতমে নবুওয়ত আন্দোলনের কারণে পাকিস্তানের পরিস্থিতি সেসময় ভাল ছিল না। এরপর ১৯৫৪ সালের মে মাসে তিনি তাঁর পীর ও মোর্শেদ হযরত মাওলানা রায়পুরীর সাথে রমযান অতিবাহিত করেন।

ঐ সফরে মাওলানা আলী মিয়াঁ তাঁর প্রিয় দোস্ত মাওলানা মাসউদ আলম নদভীর সাথে সাক্ষাৎ করতে পারেননি। মাওলানা মাসউদ আলম নদভী (রহ.) তাঁর লাহোরে উপস্থিত হওয়ার দুইমাস পূর্বে ইন্তেকাল করেন। অবশ্য তাঁর অপর দোস্ত, বহু বছরের সাথী মাওলানা মুহাম্মাদ নাযেম সাহেব নদভী

উপস্থিত ছিলেন। তিনি কোন সময় লাহোর উপস্থিত হলে জনাব নাযেম নদভী সুদূর ভাওয়ালপুর হতে কয়েকদিনের জন্য মাওলানা আলী মিয়াঁর সাথে সময় কাটাতেন। লাখনৌ ও রায়বেরেলীর পর লাহোর ছিল তাঁর সবচেয়ে প্রিয় শহর। এ শহরেই তিনি তাঁর ছাত্রজীবনের একটি সুন্দর অধ্যায় অতিবাহিত করেন। বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে এখানে তিনি কয়েক মাস করে সময় কাটিয়েছিলেন। তার শৈশব, যৌবন, ইলমী ইস্তেফাদা এবং রূহানী পিপাসা মিটাবার অনেক স্মৃতি এ শহরটির সাথে জড়িত। ১৯৫৫ সালে তিনি দ্বিতীয়বার লাহোর সফর করেন।

রেঙ্গুন (১৯৬০)

তিনি ১৯৬০ সালের ১৮ই ডিসেম্বর রেঙ্গুন সফর করেন। ভারতের গুজরাট, সুরাট প্রভৃতি স্থানের মুসলমান ব্যবসায়ীরা অত্যন্ত সফলতার সাথে রেঙ্গুনে ব্যবসা-বাণিজ্য করতেন। শুধু তাই নয়, তাঁরা ভারতের দ্বীনী ইদারাগুলিতে দান করতেও ভুলতেন না। ঐ সময় রেঙ্গুনে অবস্থানরত দেওবন্দের একজন বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব ক্বারী আব্দুর রহমান সাহেব মাওলানা আলী মিয়াঁকে রেঙ্গুন সফরের জন্য দাওয়াত দেন। রেঙ্গুনের মুসলমানদের মধ্যে এক নতুন দ্বীনী দাওয়াতী চেতনা সৃষ্টি করা এ সফরের উদ্দেশ্য ছিল। তিনি রেঙ্গুন উপস্থিত হলে তাকে জাঁকজমকের সাথে অভ্যর্থনা জানানো হয়। স্বাধীন বার্মায় ইতিপূর্বে কোন আলেমের জন্য এমন ধরনের অভ্যর্থনা জানানোর নজীর খুঁজে পাওয়া যায়নি। ক্বারী আবদুর রহমান কাসেমী, মাওলানা ইবরাহীম সাহেব মাজাহেরী এবং মুফতী মাহুদ দাউদ সাহেব মাজাহেরী তাকে অভ্যর্থনা জানান।

রেঙ্গুনে তিনি প্রায় একমাস অবস্থান করেন। তিনি বার্মার মুসলমানদের ইসলামের হেফাজত ও প্রচারের বিরাট দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দেন। বার্মী ভাষার উপর যোগ্যতা সৃষ্টি করার পরামর্শ দেন এবং তিনি বার্মার মুসলমানদের সাবধান করে দেন যে, যদি তাঁরা এ দায়িত্ব পালনে অবহেলা করেন তবে জাতির অপূরণীয় ক্ষতি হবে।

তাঁর এ কথাগুলি অক্ষরে অক্ষরে সত্য প্রমাণিত হয়েছিল। তাঁর বার্মা হতে ফিরে আসার কিছুদিন পরই সামরিক শক্তি বার্মা দখল করে কম্যুনিজম চালু করে এবং বার্মার মুসলমানদের উপর নির্যাতনের স্টিম রোলার চালিয়ে দেয়।

কুয়েত (১৯৬২)

মাওলানা আলী মিয়াঁ নদভী ১৯৬২ সালের ২৪শে জানুয়ারী কয়েকজন মুখলেস বন্ধুর দাওয়াতে কুয়েত উপস্থিত হন। তিনি সেখানে তিন সপ্তাহ অবস্থান করেন। এ সফরে তিনি কুয়েতের বড় বড় মসজিদে জুমআর খুতবা প্রদান করেন এবং আরব সুধীসমাজের সামনে কুয়েতের মত তেল সমৃদ্ধ দেশের মানুষদের দায়িত্ব কর্তব্য স্মরণ করিয়ে দেন। তিনি কুয়েত রেডিওতে 'ইসমায়ী ইয়া জাহরাতুস সাহরা' নামে বক্তৃতা করেন। এ বক্তৃতায় তিনি বর্তমান সভ্যতায় কুয়েত কি দায়িত্ব পালন করতে পারে এবং পৃথিবীকে কি উপহার দিতে পারে তার প্রতি কুয়েতবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এ সফরে তিনি কুয়েতের আমীর শায়খ আবদুল্লাহ সালেম অসাবাহ এর নিকট একটি গুরুত্বপুর্ণ চিঠি পেশ করেন। হযরত মাওলানার পরিচয় আরব জাহানে পূর্বেই হয়ে গিয়েছিল, ফলে তাকে কুয়েতের শায়খ, আলেম-উলামা সকলেই খুবই সম্মান করেন এবং এ সম্মানিত মেহমান থেকে তাঁরা লাভবান হওয়ার চেষ্টা করেন।

আফগানিস্তান, ইরান, লেবানন, সিরিয়া ও জর্দান সফর

হযরত মাওলানা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী (রঃ) রাবেতা আলমে ইসলামীর প্রতিনিধি দলের অন্যতম সদস্য হিসেবে ১৯৭৩ সালে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দেশ যেমন-আফগানিস্তান, ইরান, লেবানন, সিরিয়া ও ইরাক সফর করেন। এ সফরের সময়সীমা ছিল ৪ ঠা জুন থেকে ২০ শে আগষ্ট। উদ্দেশ্য ছিল সংশ্লিষ্ট দেশসমূহের মুসলমানদের সাধারণ অবস্থা, তাদের সাংস্কৃতিক ও আর্থ-সামাজিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করা এবং তাদের সামনে রাবেতার পরিচিতি তুলে ধরা। এ সফরের শেষে তিনি "দরিয়ায়ে কাবুল ছে দরিয়ায়ে ইয়ারমুক" নামে একটি ভ্রমণ কাহিনীমূলক বইও লেখেন। বইটির বাংলা তরজমা 'কাবুল থেকে আম্মান' প্রকাশিত হয়েছে।

শ্রীলংকা (১৯৮২)

১৯৮২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে রাবেতা আল-আলমে ইসলামীর সেক্রেটারী জেনারেল শায়খ মুহাম্মাদ আলী আল-হারাকানের অনুরোধে এবং শ্রীলংকার নাযিমিয়াঁ ইউনিভার্সিটির দাওয়াতে তিনি প্রথমবার ১৯৮২ সালের

৯ই মে, সুইস এয়ার যোগে বোম্বে থেকে কলম্বো হাজির হন। কলম্বো এয়ারপোর্টে ইউনিভার্সিটির প্রতিষ্ঠাতা, শ্রীলংকার মুসলমানদের মধ্যে বিশিষ্ট ব্যবসায়ী জনাব আলহাজ মুহাম্মাদ নাযিম সাহেবসহ গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

জনাব মুহাম্মাদ নাযিম সাহেব মাওলানা আলী মিয়াঁর একটি পুস্তিকা 'রিদ্দাতুন ওয়ালা আবা বাকরিন লাহা' পড়ে এ ধরনের প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার জন্য অনুপ্রাণিত হন। ফলে এ প্রতিষ্ঠানের পাঠ্যক্রম এবং চিন্তাধারা হযরত মাওলানার চিন্তাধারার সাথে সামঞ্জস্যশীল ছিল। আলমে ইসলামের সবচেয়ে বড় প্রয়োজন হল শিক্ষিত শ্রেণীর চিন্তা ও আদর্শের পরিবর্তন। তাই শ্রীলংকার মুসলমান ছাত্র ও বুদ্ধিজীবীদের দ্বীন ও ঈমানের হেফাযতের উদ্দেশ্যে এ প্রতিষ্ঠানের গোড়াপত্তন করা হয়। এ সফরে হযরত আলী মিয়াঁ এ ভার্সিটির লাইব্রেরী বিল্ডিংয়ের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। হাজী সাহেব এ প্রতিষ্ঠানের সিংহভাগ অর্থ নিজেই দান করেছেন। এ প্রতিষ্ঠান শুরু করার প্রায় আট বছর পরে প্রথম সনদ বিতরণ অনুষ্ঠানে তাকে দাওয়াত দেয়া হয়েছিল। এ কনভেনশনে শ্রীলংকার পররাষ্ট্র মন্ত্রী, কুটনীতিকবৃন্দ, রাষ্ট্রদূতগণ উপস্থিত ছিলেন। তিনি আরবীতে ভাষণ দেন। এ ছাড়া ছাত্র-শিক্ষদের উদ্দেশ্যে তিনি বক্তৃতা করেন। সেখানকার তাবলীগী মারকাযে হযরতের বয়ান হয় এবং জমিয়াঁতুল উলামায়ে আরকানের সামনেও তিনি বক্তব্য রাখেন।

তখন শ্রীলংকার মুসলমানদের অবস্থা খুবই ভালো ছিল। মুসলমানদের সংখ্যা তখন ছিল প্রায় ১২ লাখ। শ্রীলংকার মোট লোক সংখ্যা ছিল ১ কোটি ৪০ লাখ। শতকরা প্রায় ৯ ভাগ মুসলমান। শ্রীলংকার বাসিন্দারা চেহারা রঙ ইত্যাদিতে ভারতের কেরালা, মাদ্রাজ এলাকার সাথে মিশে যায়। আবাদীও একই ধরনের,' কয়েক মাইল পর্যন্ত শুধু নারিকেলের সারি। জুমআর দিন এক ঘন্টার জন্য সবকিছু বন্ধ থাকতো। দেড়ঘন্টা ব্যাপী রেডিওতে মুসলমানদের বিভিন্ন বিষয়ে প্রোগ্রাম চালু ছিল।

বাংলাদেশ (১৯৮৪)

হযরত মাওলানা আলী মিয়াঁ নদভী প্রথমবার ১৯৮৪ সালের ৯ ই মার্চ বাংলাদেশ সফরে আসেন। হযরতের কয়েকখানা কিতাবের অনুবাদ ইতিমধ্যেই ইসলামিক ফাউণ্ডেশন থেকে বের হয়েছিল। ফলে এ দেশের আলেম সমাজ ও শিক্ষিত শ্রেণীর কাছে তিনি পরিচিত হয়ে ওঠেন। হযরত

মাওলানা সুলতান জওক, মাওলানা আবু সাইদ মুহাম্মাদ ওমর আলী, ইসলামিক ফাউণ্ডেশনের তৎকালীন ডিজি আবুল ফায়েদ মুহাম্মাদ ইয়াহইয়া, মাওলানা মুহীউদ্দীন খান প্রমুখের দাওয়াতে তিনি এ সফর করেন। ১৯ শে মার্চ পর্যন্ত তাঁর এ দশদিনব্যাপী সফরেই তিনি ঢাকা, কিশোরগঞ্জ, চট্রগ্রাম, কক্সবাজার, সিলেট প্রভৃতি এলাকা সফর করেন। ঢাকার সফরে তিনি সোনারগাঁয়ে উপস্থিত হন এবং হযরত শায়খ আবু তাওয়ামার মাজারে ফাতেহা পাঠ করেন। ১৬ ই মার্চ বায়তুল মোকাররমে জুম'আর খোতবা দেন এবং নামাযের পূর্বে বয়ান করেন।

এ সফরে তিনি বিভিন্ন মাদরাসা ও ইসলামী সংগঠন এবং বিশেষ করে ইসলামিক ফাউণ্ডেশনের পক্ষ থেকে হোটেল পূর্বাণীতে দেয়া অভ্যর্থনা জল্সায় গুরুত্বপূর্ণ বক্তৃতা করেন। এসব বক্তৃতায় তাঁর মর্মবাণী ছিল নিম্নরূপঃ

১. আপনাদেরকে বাংলাভাষা ও সাহিত্যের নিয়ন্ত্রণভার হাতে নিতে হবে। ২. উলামা ও বুদ্ধিজীবী সমাজকে সজাগ ও হুঁশিয়ার থাকতে হবে। ৩. আপনাদের নিজস্ব কৃষ্টি-কালচার, নিজেদের কবি-সাহিত্যিক এবং বুদ্ধিজীবীদেরকে জনগণের সামনে বিশেষ করে নুতন প্রজন্মের সামনে তুলে ধরতে হবে। এ প্রসঙ্গে আমাদের জাতীয় কবি নজরুল ইসলামের কথা তিনি তুলে ধরেন। রবি ঠাকুরের পরিবর্তে কবি নজরুলকে সারা দুনিয়াতে পরিচয় করিয়ে দেয়ার দায়িত্ব এ দেশের মুসলমানদের উপর রয়েছে বলেও তিনি উল্লেখ করে বলেন, আপনাদেরকেই এ দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। অন্যথায় এ জাতি সভ্যতা ও সংস্কৃতির দিক দিয়ে দেউলিয়া হয়ে পড়বে। ঢাকায় অবস্থান কালে তিনি বিশিষ্ট দানবীর আল্হাজ বশীরুদ্দিন সাহেবের বাসায় অবস্থান করেন। ২০শে মার্চ তিনি ঢাকা থেকে কলকাতা রওয়ানা হন। এ ভাষণসমূহ তোহফায়ে মাশরেক নামক গ্রন্থে সংকলন করা হয়েছে, যা ইসলামী ফাউন্ডেশন থেকে প্রাচ্যের উপহার নামে অনুদিত হয়েছে।

১৯৯৪ সালে তিনি তার বাংলাদেশী গুণগ্রাহী বিশেষ করে রাবেতায়ে আদবে ইসলামীর (আন্তর্জাতিক ইসলামী সাহিত্য) বাংলাদেশ ব্যুরোর চেয়ারম্যান মাওলানা সুলতান যওক সাহেবের দাওয়াতে দ্বিতীয়বার বাংলাদেশ সফরে আসেন।

মালয়েশিয়া (১৯৮৭)

হযরত মাওলানা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী (রঃ) ১৯৮৭ সালের ২রা এপ্রিল মালায়েশিয়ার রাজধানী কুয়ালালামপুর উপস্থিত হন। মালয়েশিয়ার কিছু ছাত্র ইতিপূর্বে নদওয়ায় পড়াশোনা করে দেশে ফিরে গিয়ে তাঁর চিন্তা-চেতনা ও পয়গাম ছড়িয়ে দিয়েছিল। সেখানকার উলামা ও শিক্ষিত সমাজ হযরতের রচনাবলী পড়ে তাঁকে নিজেদের কাছে পাওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েন। ফলে সেখানকার ইসলামী সংগঠন A, B, I, M এবং নদভী ছাত্রদের পক্ষ থেকে দাওয়াতনামা আসে এবং তিনি তা কবুল করেন।

৩রা এপ্রিল মালয়েশিয়ার একটি প্রদেশ তেরেঙ্গানুতে প্রথম প্রোগ্রাম রাখা হয়। তেরেঙ্গানুর রাজধানী কুয়ালা তেরেঙ্গানুতে হযরতের মজলিস রাখা হয়। সেখানকার বিশিষ্ট দায়ী শায়খ আব্দুল হাদীর তত্ত্বাবধানে জল্‌সা অনুষ্ঠিত হয়। জুম'আর নামাযের পূর্বে তিনি আরবীতে বয়ান করেন। আলোচ্য বিষয় ছিল 'ইলাল ইসলামে মিন জাদীদ' আলোচনায় তিনি মালায়ী মুসলমানদের সাবধান করে দেন যে, মালায়েশিয়ার এ উন্নতি ও তরক্কি সব বিফল হয়ে যাবে যদি তাঁরা ইসলাম থেকে দূরে সরে যান।

৪ঠা এপ্রিল জাতীয় ইউনিভার্সিটির শরীয়ত ফ্যাকাল্টির উদ্যোগে ভার্সিটির অডিটরিয়ামে শিক্ষক, গবেষক এবং ছাত্রদের সামনে তিনি এক গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন। বক্তব্যের আসল বিষয় ছিল, মুসলিম দেশগুলির শাসক শ্রেণী এবং সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব চলছে তার কারণ হল, দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা, সভ্যতা, সংস্কৃতি মুসলমানদের আক্বিদা এবং বিশ্বাসের খেলাপ হওয়া। আপনারা এদেশের শিক্ষিত সমাজের মাঝে দ্বীনের জাগরণ আনুন।

৬ই এপ্রিল তিনি কাদাহ এলাকা সফর করেন। মা'হাদুত তারবিয়াতিল ইসলামিয়াঁ যেখানে নদভী ছাত্রদের বিরাট সমাগম ছিল, সেখানে বক্তৃতা করেন। দ্বিতীয় দিন শুধু ছাত্র-শিক্ষকদের সামনে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন এবং আল্ মা'হাদুল আলী লিদ্দাওয়ার ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন।

৭ই এপ্রিল যোহরের পূর্বে মালয়েশিয়া ইউনিভার্সিটিতে প্রোগ্রাম রাখা হয়। আছর বাদ তিনি তাবলীগী মারকাজে এবং এ,বি,আই, এম (ছাত্র সংগঠন)-এর সম্মেলনে বয়ান করেন।

৮ই এপ্রিল মাওলানা আলী মিয়াঁ মালয়েশিয়ার আন্তর্জাতিক ইউনিভার্সিটি পরিদর্শন করেন এবং ছাত্র-শিক্ষক সমাবেশে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন। ভার্সিটির ভাইস চ্যান্সেলর বিখ্যাত আরব পণ্ডিত ডঃ আব্দুর রউফ মিসরী তাঁকে অভ্যর্থনা জানান।

আছর বাদ তিনি হিজবুল ইসলামীর মারকাজে এক বিরাট সমাবেশে দ্বীনী দাওয়াতী কাজের জন্য মহব্বতের পদ্ধতিগুলি গ্রহণ করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। ৯ই এপ্রিল তিনি ভারতে ফিরে আসেন।

উযবেকিস্তান-১৯৯৩

হযরত মাওলানা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী (রহ.) প্রায় সারা পৃথিবী দেখার পরও এশিয়ার দ্বীনী ও ইলমী প্রাণকেন্দ্র রাশিয়ার বুখারা, সমরখন্দ, তাশখন্দ ইত্যাদি ঐতিহাসিক স্থানসমূহ দেখার সুযোগ না পাওয়ায় মনে মনে খুবই আক্ষেপ করতেন। আল্লাহপাক তার জন্য এ সফরের এক কুদরতী ব্যবস্থা করেন।

লন্ডনের অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির ইসলামিক সেন্টারের পক্ষ হতে হযরত ইমাম বুখারীর মাযারের পাশে একটি ইসলামী গবেষণা কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। সেন্টারের পূর্বের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৯৯৩ সালের ২৩শে অক্টোবর সমরখন্দে এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শুরু হয়। এ মোবারক কনফারেন্সে সেন্টারের পক্ষ হতে হযরত মাওলানাকে দাওয়াত দেয়া হয়। তিনি মাওলানা রাবে নদভী ও মাওলানা উসমান সাহেবকে নিয়ে ২২শে অক্টোবর দিল্লী হতে উযবেক এয়ার যোগে তাশখন্দে পৌঁছে যান। সেখান হতে বিমানে চল্লিশ মিনিটে সমরখন্দ পৌঁছে যান এবং ২৩শে অক্টোবরের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। ঐ সময় ডাঃ আব্দুল্লাহ উমর নাসীফ অক্সফোর্ড ইসলামিক সেন্টারের ডাঃ ফারহান নেযামী মো'তামার ইসলামীর জেনারেল সেক্রেটারী এবং শায়খ আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহসহ সারা পৃথিবীর জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিত্বরা উপস্থিত ছিলেন। হযরত মাওলানা সেখানে হযরত ইমাম বুখারী এবং তাঁর ঐতিহাসিক হাদীছ গ্রন্থের উপর আরবীতে প্রবন্ধ পাঠ করেন।

২৪শে অক্টোবর তিনি সমরখন্দ হতে ১৫ কিলোমিটার দুরে ইমাম বুখারীর মাযার যিয়ারত করেন। ২৫শে অক্টোবর তিনি মাইক্রোবাস যোগে সমরখন্দ হতে ৩০০ কিমি. দূরে ইমাম বুখারীর কর্মস্থল বুখারায় উপস্থিত হন। ঐ সময় তার সাথে শায়খ আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহসহ অরো অনেক

আলেম উলামা ছিলেন। বুখারার সুলতান এবং সেখানকার কিছু কুচক্রী আলেম উলামার চক্রান্তের কারণে মহামান্য ইমামকে নিজ এলাকা ত্যাগে বাধ্য করা হয়েছিল। ফলে তিনি বুখারার পরিবর্তে সমরখন্দের কাছে খরতঙ্গ নামক এলাকায় মাদফুন হন।

হযরত মাওলানা ও তার সাথী সংগীরা সিলসিলায়ে নকশবন্দিয়ার প্রতিষ্ঠাতা হযরত খাজা বাহাউদ্দীন নকশবন্দী (রহ.)-এর মাদরাসা ও বুখারার ঐতিহাসিক স্থানসমূহ পরিদর্শন করেন। ২৬শে অক্টোবর তিনি সমরখন্দ হতে তাশখন্দ, দিল্লি হয়ে সন্ধ্যায় আল্লাহ পাকের মেহেরবাণীতে নিরাপদে লাখনৌ ফিরে আসেন।

ইউরোপ (১৯৬৩)

হযরত মাওলানা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী (রঃ) ১৯৬৩ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর হতে নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত ইউরোপের প্রথম সফর শেষ করেন। এ সফরে ডাঃ মুহাম্মাদ ইশতিয়াক হুসাইন কুরাইশীকে হযরতের সাথী হিসেবে নির্বাচিত করা হয়, যিনি ইতিপূর্বে ডাক্তারী পড়ার জন্য লন্ডনে অবস্থান করেছিলেন। এ সফরের আসল উদ্যোক্তা ছিলেন বিখ্যাত দায়ী ডাঃ সাঈদ রমযান। তিনি তার জেনেভার ইসলামিক সেন্টারে ইউরোপের আরব এবং মুসলমান ছাত্রদের একটি শিক্ষা শিবিরে হযরত মাওলানাকে দাওয়াত দিয়েছিলেন। হযরত মাওলানা এ প্রতিষ্ঠানের রোকন ছিলেন। এ সফরে জেনেভা, লুজান, বার্লিন, প্যারিস, লণ্ডন, ক্যামব্রিজ, অক্সফোর্ড, গ্লাসকো, এডিনবরা, এবং স্পেনের গ্রানাডা, টলেডো ও কর্ডোভা যান।

এডিনবরা ইউনিভার্সিটির ইসলামী মজলিসে, লণ্ডন ইউনিভার্সিটির ইউনিয়ন হলে হযরত মাওলানার বক্তৃতা হয়। বি,বি,সি হতে হযরত মাওলানার দু'টি বক্তৃতা প্রচারিত হয়। লণ্ডন ভ্রমণের প্রতিক্রিয়া এবং "আরবী ভাষার উন্নতি, সম্ভবনা ও মুসলিম দেশসমূহের সাথে এর সম্পর্ক" নামে লণ্ডন ইউনিভার্সিটি হলের বক্তৃতা ছিল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বক্তব্যটি আরবীতে 'বাইনাল মাশারিকি ওয়াল মাগারিব' নামে এবং তার ইংরেজী তরজমা 'Between East and west' নামে তৈরী করা হয়। একজন নওমুসলিম ছাত্র মুস্তফা ইয়ানুস ইংরেজী তরজমাটি খুবই বলিষ্ঠতার সাথে পাঠ

করেন। ঐ সময় অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির আরবী বিভাগের প্রধান, ক্যামব্রিজ ইউনিভার্সিটির ডঃ আরবেরী প্রমুখ পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের সাথে হযরত মাওলানা মতবিনিময় করেন।

লণ্ডনে অবস্থানকালে তিনি বৃটিশ মিউজিয়াম লাইব্রেরী এবং ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরী হতে উপকৃত হওয়ার সুযোগ পান। "মুসলিম মামালেক মে ইসলামিয়াঁত ওয়া মাগারিবিয়াত কা কাশমাকাশ" গ্রন্থের ভূমিকা তিনি লণ্ডনের এ সফরেই লিপিবদ্ধ করেন।

স্পেন

এ সফরেই তিনি স্পেন সফর করেন। মুসলমানদের কয়েকশ বছর রাজত্বের গৌরবময় ইতিহাসের কথা স্মরণ করে তিনি শোকে অভিভূত হয়ে পড়েন। কর্ডোভা মসজিদে হাজির হয়ে তিনি আল্লামা ইকবালের কবিতা আওড়াতে থাকেন। তিনি মসজিদে প্রবেশ করে "কুল জাআল হাক্কু" এই আয়াত লিখিতভাবে দেখতে পান। তিনি গাইডকে ফাঁকি দিয়ে সেখানে দু'রাকাত নামায পড়েন। অতঃপর মসজিদ হতে বের হয়ে আজান দিয়ে আসরের নামায আদায় করেন।

গ্রানাডা সফরে জুম'আর নামাযের সময় হয়ে গেলে তিনি কিছু আরব ছাত্রদের জুম'আর নামাযের দাওয়াত দেন এবং একজন আরব নওজোয়ানের কামরায় জুম'আর নামায আদায় করেন। তিনি অনেক দুঃখের সাথে আরব মুসলমানদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, আফসোস! স্পেনের মানুষদের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছানোর সুযোগ আমাদের হলো না। প্রয়োজন ছিল স্পেনিক ভাষা শিখে স্পেনবাসীদের বলে দেওয়া যে, তোমরা মুসলমান-দেরকে দেশ থেকে বের করে কি সর্বনাশ করেছ, তোমরা অবনতির কোন স্তরে পৌঁছে গিয়েছো। মুসলমানরা স্পেনে থাকলে আজ স্পেনের অবস্থা কি হত। ১৯৬৩ সালে হযরত মাওলানা (রঃ) ইউরোপে অবস্থানকালে তাঁর ভাতিজা মুহাম্মাদুল হাসানীর নিকট সেখানকার অবস্থা জানিয়ে বেশ কয়েকটি চিঠি দিয়েছিলেন। সে চিঠিগুলো মাকাতিবে ইউরোপ নামে উর্দুতে ছাপা হয়েছে। চিঠিগুলি পড়লে ইউরোপ সম্পর্কে হযরত মাওলানার মনোভাবের একটা সুস্পষ্ট ধারণা করা যায়।

ইউরোপ (দ্বিতীয় সফর ১৯৬৪)

১৯৬৪ সালের অক্টোবর মাসে দ্বিতীয়বার তিনি জনাব ডাঃ সাঈদ রমযানের জেনেভার ইসলামী সেন্টারের দাওয়াতে জেনেভা হাজির হন। পরে লণ্ডন সফর করেন। এ সফরে তিনি জার্মানের বার্লিন,আখুন, মিউনিখ প্রভৃতি স্থান সফর করেন। এ সফরে লণ্ডনের বেকার স্ট্রীটের ইসলামী সেন্টারে মুসলিম ছাত্র এবং বুদ্ধিজীবীদের সমাবেশে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন। ২৭ শে অক্টোবর বার্লিনের ইউনিভার্সিটি অফ ইঞ্জিনিয়ারিং-এর সমাবেশে আরবীতে বক্তৃতা করেন। জার্মান ভাষায় এ বক্তৃতার তরজমা করা হয়।

ইউরোপ (তৃতীয় সফর ১৯৮৩)

১৯৮৩ সালের ২১ শে জুলাই তিনি তৃতীয়বার লণ্ডন সফর করেন। এ সফরের উদ্দেশ্য ছিল অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির ইসলামিক সেন্টারের শুভ উদ্বোধন করা। বিখ্যাত ঐতিহাসিক প্রফেসর খালেক নেজামী সাহেবের হাওয়াতে তিনি এ সফর করেন। সেন্টারের উদ্বোধন করার পর এ প্রতিষ্ঠানের গঠনতন্ত্র, উদ্দেশ্য ইত্যাদি মৌলিক বিষয়ে তিনি গুরুত্বপূর্ণ দিক নির্দেশনা দেন এবং এ প্রতিষ্ঠানের সঠিক উন্নয়নে সহযোগিতা করেন। তিনি উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ইসলাম ওয়াল মাগরিব নামে একটি প্রবন্ধ পড়েন। এর পর তিনি এ প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন বৈঠকে অংশগ্রহণ করার উদ্দেশ্যে ১৯৮৬ ও ১৯৮৭ সালেও লণ্ডন সফর করেন।

আমেরিকা (১৯৯৭)

হযতর মাওলানা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী (রঃ) ১৯৯৭ সালের মে মাসে আমেরিকার মুসলিম ছাত্রদের বিখ্যাত সংগঠন এম,এস,এ Muslim students association of America and Canada এর বার্ষিক সম্মেলনে এর দাওয়াতে প্রথমবার আমেরিকা ও কানাডা সফর করেন। তাঁর এ সফর ছিল সম্পূর্ণ দাওয়াতী। পাশ্চাত্য সভ্যতার পাদপীঠ আমেরিকাবাসীদের কাছে বিশেষ করে সেখানকার প্রবাসী ভাইদের কাছে দ্বীনের দাওয়াত পৌঁছে দেয়ার এবং তাদের দায়-দায়িত্ব বুঝিয়ে দেয়ার জন্য তিনি এ দাওয়াত কবুল করেন।

২৮ শে মে তিনি বোম্বে হতে নিউইয়র্কের কেনেডী এয়ার পোর্টে উপস্থিত হন। নিউইয়র্কে কয়েকঘন্টা অবস্থান করে "ইণ্ডিয়ানা পোলিশ" এর মেলবোর্ন-এ উপস্থিত হন। সেখানেই উক্ত সংগঠনের চৌদ্দতম বার্ষিক

কনভেনশন শুরু হয়ে গিয়েছিল। ২৮শে মে সন্ধ্যা ৭টায় তিনি উক্ত সম্মেলনে ইসলামী সংগঠনের কর্মীদের পারস্পরিক সম্পর্কের উপর গুরুত্বপূর্ণ বক্তৃতা করেন। আরবদের সমাবেশেও তিনি বক্তৃতা করেন।

এ জরুরী প্রোগ্রাম থেকে অবসর হওয়ার পরে এম,এস,এ-এর তত্ত্বাবধানে আমেরিকা ও কানাডার বিভিন্ন অংগরাজ্যে ৩ সপ্তাহব্যাপী তাঁর সফরের প্রোগ্রাম তৈরী হয়। এ উপলক্ষে তিনি নিউইয়র্ক সিটি, জারসি সিটি, ফ্লাডেলফিয়া, বাল্টিমোর, ওয়াশিংটন, বোষ্টন, শিকাগো, সানফ্রানসিসকো, লসএঞ্জেলস এবং কানাডার টরেন্টো এবং মন্ট্রিল প্রভৃতি প্রসিদ্ধ স্থান সফর করেন। এসব স্থানে তিনি প্রবাসী হিন্দুস্তানী, পাকিস্তানী এবং আরব মুসলমানদের সামনে অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী বক্তব্য পেশ করেন। এ সফরে তিনি আমেরিকার বিখ্যাত পাঁচটি ইউনিভার্সিটি যথা- কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি, হারভার্ড ইউনিভার্সিটি, ডেট্রয়েট ইউনিভার্সিটি, উত্তর কালিফোর্নিয়া ইউনিভার্সিটি, (লস এনজেলস) এর উটা ইউনিভার্সিটি (সালটালেক সিটি) তে বক্তৃতা করার সুযোগ পান। এ ছাড়া জাতিসংঘের নামায হলে, টরেন্টো ও ডেট্রয়েটের জামে মসজিদে জুম'আর খুতবা প্রদান করেন।

ঐ সকল বক্তৃতা তিনি পাশ্চাত্য সভ্যতার অন্তঃসারশূণ্য ধোঁকাবাজীর খপ্পরে পড়ে নিজের মহামূল্যবান ঈমান ও আমলকে না হারাবার উদাত্ত আহবান জানান। হযরত মাওলানা তাঁর এ সকল বয়ানে নিজের জীবনের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা, দূরদর্শিতা এবং ইসলামী স্পিরিটকে কাজে লাগিয়ে আমেরিকায় অবস্থানরত মুসলমানদের সামনে নতুন পৃথিবী আমেরিকার রঙ করা আধুনিক সভ্যতার পোষ্টমর্টেম করেন। হযরত আলী মিয়াঁর এসব বক্তৃতা আরবী, ইংরেজী এবং উর্দুতে সংকলিত হয়েছে। এসব বক্তৃতায় তিনি দু'টি বিষয়ের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন।

একঃ পশ্চিমা সভ্যতার সমালোচনা, তার অসারতা ও এর সৃষ্ট সমস্যাবলীর ব্যাখ্যা।

দুইঃ আমেরিকায় অবস্থানকারী মুসলমানদের নিজেদের মর্যাদা ও পয়গাম এবং ব্যক্তিত্বের হেফাযতের তাকিদ করেন।

তিনি আমেরিকাবাসীদের উদ্দেশ্যে বলেন, "আমেরিকায় মেশিনের বাহার, জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতি খুবই হচ্ছে, কিন্তু মানবতার অপমৃত্যু ঘটছে।

এ মাটি যদি দ্বীনে ফিতরতের নেয়ামত পেত তাহলে দুনিয়ার ইতিহাস অন্যরকম হত। আমেরিকা একই সাথে সৌভাগ্যশালীও আবার দুর্ভাগ্যশালীও। সৌভাগ্যশালী এ জন্য যে, আল্লাহ পাক এ দেশকে অসংখ্য নেয়ামত দান করেছেন। বিশাল সামরিক শক্তি ও সরঞ্জামাদি এ দেশের রয়েছে। এ দিক দিয়ে এ দেশ সৌভাগ্যশালী। অপর পক্ষে হতভাগ্য দেশ এজন্য যে, এ দেশের ভাগ্যে দ্বীন ইসলামের নেয়ামত জোটেনি। এ দেশ বস্তুবাদের দিকে যেভাবে ঝুঁকে পড়েছে, চারিত্রিক উৎকর্ষতার দিকে সেরূপ প্রচেষ্টা চালায়নি।

প্রবাসী মুসলমানদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, আপনারা সকল বস্তুবাদের মোকাবেলায় ঈমানের হেফাযত এবং ভবিষ্যৎ বংশধরদের ঈমানী নেয়ামতকে প্রাধান্য দিন। এ দায়িত্ব পালন করতে না পারলে আপনাদের এখানে একদিনের জন্যও থাকা ঠিক হবে না। আর যদি আপনারা নিশ্চিন্ত হন যে, আপনারা এখানে আল্লাহ পাকের রেজা অনুযায়ী জীবনযাপন করছেন, আপনাদের দিল যদি সাক্ষ্য দেয় যে, আপনারা এখানে আপনাদের ঈমান বাঁচাতে পারছেন এবং বাচ্চাদের ভবিষ্যৎও হেফাযত করতে পারছেন, তাহলে আপনাদের এদেশে থাকা শুধু জায়েয নয়; বরং উপকারী এবং মোবারকও হতে পারে।

এসব মজলিসে মহিলাদের বসার জন্য পৃথক ব্যবস্থা থাকতো। মহিলাদের লক্ষ্য করে তিনি বলেছিলেন,"মা ও বোনেরা! ইসলাম পারিবারিক এবং দাম্পত্য জীবনকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে থাকে, আপনারা সেই জীবনের ভিত্তি স্বরূপ। আপনাদের ইসলামের উপর পুরোপুরী চলার উপরই নির্ভর করছে এদেশের লাখো-কোটি মানুষের ইসলাম গ্রহণ করার সৌভাগ্য। পশ্চিমা সভ্যতায় পরিবারকে ধ্বংস করা হয়েছে। দাম্পত্য ও পারিবারিক জীবনের মধুময় সম্পর্ক চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেছে। আপনারা এ দেশের বুকে পারিবারিক জীবনের মডেল স্থাপন করুন। আপনাদের পারিবারিক জীবনের নমুনা দেখে এদেশের বোনেরা ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিতে অনুপ্রাণিত হবে বলে আমি আশা করি।

চোখের অপারেশন

হযরত মাওলানা বহুদিন থেকে চোখের অসুখে ভুগছিলেন। ডাক্তারদের পরামর্শে ১৯৬৪ সালের জুলাই মাসে বোম্বেতে তাঁর বাম চোখে প্রথম অপারেশন হয়। কিন্তু সে অপারেশন সফল হয়নি। অপারেশনের পরে যে

ধরনের বিশ্রাম নেয়ার প্রয়োজন ছিল এবং যে সতর্কতা অবলম্বনের দরকার ছিল বিভিন্ন ব্যস্ততার কারণে তাও সম্ভব হয়ে উঠেনি। ফলে চোখের অবস্থা দিন দিন খারাপের দিকে যেতে থাকে।

১৯৬৫ সালের ২২শে জুন হযরত মাওলানা এ অবস্থায় দ্বীনী তা'লীম কাউন্সিলের প্রোগ্রামে মিরাঠ সফরের সময় একদিন সকালে অনুভব করেন যে, বাম চোখের জ্যোতি একেবারেই শেষ। লাখনৌ ফিরে এসে ২৬ শে জুন তিনি সীতাপুরের বিখ্যাত চক্ষু হাসপাতালে ভর্তি হন। চিকিৎসার পর একটু ভালো লাগলে তিনি লাখনৌ ফিরে আসেন এবং লেখাপড়ার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। ১৯৬৫ সালের ৫ ই ডিসেম্বর চোখের অবস্থা মারাত্মক হয়ে পড়লে তিনি পুনরায় ৭ই ডিসেম্বর সিতাপুর হাসপাতালে ভর্তি হন। ঐ সময় হযরতের বাম চোখে ৫টি অপারেশন হয়। প্রচণ্ড ব্যথায় ঐ সময় হযরত মাওলানা ছটফট করতেন। এটা ছিল তাঁর জীবনের একটি করুণ অধ্যায়। হযরতের বৃদ্ধা আম্মা ও অন্যান্য আত্মীয়স্বজন অস্থির হয়ে পড়েন। ২/৩ মাস থাকার পর তিনি হাসপাতাল ত্যাগ করেন। পরে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা করানোর ফলে ব্যাথা কিছুটা উপশম হয়। হযরতের ডান চোখের অবস্থাও ভালো ছিল না। তিনি ঐ সময় হতে নিজে লিখতে এবং পড়তে পারতেন না। খুবই কষ্ট করে তাঁর সফর এবং অন্যের সাহায্যে লেখাপড়ার কাজ চালু ছিল। এ অবস্থা প্রায় ১৩/১৪ বছর জারী ছিল।

১৯৭৭ সালে আমেরিকা সফরের সময় হযরত মাওলানার ডান চোখ অপারেশনের ব্যাপারে বহু এস্তেখারা, দু'আ এবং পরামর্শের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। ঐ সময় আমেরিকার ফ্লাডিলফিয়ার বিখ্যাত চক্ষু বিশারদ ডাঃ শায় খুবই নামকরা ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তাঁর কাছে হযরতের বড় ধরনের পরিচিতি তুলে ধরা হয়ে ছিল। ডাঃ শায় নিজেও খুবই আগ্রহের সাথে একাজে অংশগ্রহণ করেন।

১৯৭৭ সালে অনেক চিন্তা-ভাবনার পর তিনি ২৯ শে জুন ডাঃ শায় এর আই ইনস্টিটিউটে ভর্তি হন এবং বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর পহেলা জুলাই অপারেশন হয়। আল্লাহ পাকের অসীম রহমতে এ অপারেশন কামিয়াঁব হয়। তিনি দীর্ঘ ১৩/১৪ বছর পর নতুন জীবন লাভ করেন। এ অপারেশনের সময় হযরতের ভাগিনা নদওয়ার বর্তমান নাযেম হযরত মাওলানা রাবে সাহেব উপস্থিত ছিলেন। আমেরিকায় হযরতের গুণগ্রাহীরা তাদের অন্তর হযরতের সেবায় উজাড় করে দেন। ঠিক অপারেশনের সময় শায়খুল হাদীছ হযরত

মাওলানা যাকারিয়া (রহ.)-এর মাধ্যমে বায়তুল্লাহ শরীফে দোয়ার ব্যবস্থা করা হয়। ১২ দিন পর তিনি হাসপাতাল ত্যাগ করেন। এক সপ্তাহ পরে ডাক্তার শায়-এর কাছে চক্ষু পরীক্ষার পর কিছুটা আরামের জন্য তিনি তৃতীয় বার শিকাগো যান। ২ রা আগষ্ট শিকাগো থেকে চোখ দেখানোর জন্য পুনরায় ফিলাডিলফিয়া আসেন এবং ডাক্তার শায়-এর সাথে দেখা করেন। ডাক্তার শায় বাকি সেলাইগুলো কেটে দেন।

অপারেশন সম্পূর্ণ কামিয়াঁব হওয়ায় হযরত মাওলানা তাকে ধন্যবাদ জানান। উল্লেখ্য ডাক্তার শায় এ অপারেশনের কোন ফিস গ্রহণ করেননি এবং অন্যান্য খরচপত্র খুবই কম নিয়েছিলেন। প্রায় সোয়া ২মাস সফর শেষে ১৯৭৭ সালে ৯ আগষ্ট তিনি আল্লাহ পাকের রহমতে নিরাপদে লাখনৌ ফিরে আসেন।

==ooo==

অধ্যায়–৯

একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় মাওলানা নদভীর রূপরেখা

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মানব জাতির ইহ ও পরকালীন মুক্তি ও কল্যাণের একমাত্র নিয়ামক হিসেবে যে বিধিনিষেধ আম্বিয়ায়ে কেরামের মাধ্যমে দান করেছেন তার সর্বশেষ ও চূড়ান্ত রূপ আল-কুরআন নাযিল হয়েছে সাইয়েদুল মুরসালীন খাতামুন নাবিয়্যিন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি।

কুরআন মজীদের বিধান ও মহানবী (সা.)-এর আদর্শ অনুসরণ করে মুসলিম জাতি গোটা বিশ্বে শান্তির বার্তা পৌঁছে দিয়েছিল। বিশ্বব্যাপী মুসলমানদের প্রাধান্য ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত ও স্বীকৃত হয়েছিল।

মরু আরবের এক নিভৃত কুটিরে জন্ম নেওয়া মুহাম্মাদ (সা.) ইবনে আব্দুল্লাহকে সারা বিশ্ব মেনে নিয়েছিল মানবজাতির সর্বাধিক কল্যাণকামী ও হিতাকাঙ্ক্ষী মহান পুরুষ হিসেবে। কিন্তু কালক্রমে মুসলিম জাতির অগ্রযাত্রা স্থগিত হয়ে যায়। আদর্শবিচ্যুতি ও কর্মস্থবিরতার কারণে তাদের নিম্নগামিতা শুরু হয়। বিশ্বনেতৃত্ব ও মানবপরিচালনার জন্য সৃষ্ট মুসলিম মিল্লাত এখন সকল ক্ষেত্রে পশ্চাদপদ।

এমত পরিস্থিতি থেকে ইসলামী উম্মাহকে পুনরায় বিশ্ব নেতৃত্বের আসনে ফিরিয়ে আনার উপায় সম্পর্কে হযরত মাওলানা আবুল হাসান আলী নদভী (রহ.) তাঁর কালজয়ী রচনা 'মা যা খাছিরাল আলামু বি ইনহিতাতিল মুসলিমীন' গ্রন্থে যে রূপরেখা উপস্থাপন করেছেন এখানে তার সার সংক্ষেপ তুলে ধরা হল।

মুসলিম বিশ্বের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা

বিশ্ব মানবতার সকল অশান্তি ও অকল্যাণের মাত্র একটিই সমাধান রয়েছে। তাহল বিশ্ব নেতৃত্ব ও পরিচালনা সেই পাপিষ্ঠ ও মানবতার রক্তে রঞ্জিত হাত থেকে বেরিয়ে আসতে হবে, যা মানব জাতিকে চিরতরে নিমজ্জিত করার অঙ্গীকার করে রেখেছে। আমানতদার, দায়িত্বশীল, খোদাভীরু

অভিজ্ঞদের হাতে এ নেতৃত্ব আসতে হবে, যাদেরকে মানবজাতির পরিচালনার জন্য আদিকাল থেকেই সৃষ্টি করা হয়েছে। ফলপ্রসূ ও কার্যকর বিপ্লব শুধুমাত্র এই যে, বৃটেন, আমেরিকা, রাশিয়া ও তাদের দোসর প্রাচ্য ও এশিয়ার জাতিসমূহ তথা জাহেলিয়াতের বলয় থেকে বিশ্ব নেতৃত্ব ও মানবজাতির কর্তৃত্ব চলে আসতে হবে সেই জাতির হাতে, যার নেতৃত্ব রয়েছে মানবজাতির মহান নেতা বনিআদমের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়াসাল্লামের হাতে। তার কাছেই রয়েছে বিশ্বকে পুনঃনির্মাণ ও মানবতার পুনর্জাগরণের নীতিমালা ও শিক্ষা। যার ঈমান বিশ্বকে বর্তমানের জাহেলিয়াত থেকে ঠিক তেমনি উদ্ধার করতে সক্ষম, যেমনটি সক্ষম ছিল চৌদ্দশত বছর পূর্বে।

ঈমানের নবায়ন

কিন্তু এই মহান কাজের জন্য ইসলামী জাহানকে আত্মপ্রসতি ও আত্ম পরিবর্তন সাধন করতে হবে। এজন্য প্রথম প্রসতি এই যে, ইসলামী জাহানকে ইসলামের প্রতি নতুন ও টাটকা ঈমান আনতে হবে। ইসলামী জাহানের জন্য নতুন ধর্ম, নতুন পয়গম্বর, নতুন শরীয়ত ও নতুন শিক্ষার মোটেই প্রয়োজন নেই। সূর্যের মত ইসলাম কখনও পুরাতন ছিল না, পুরাতন নয়ও। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নবুয়ত স্থায়ী ও চূড়ান্ত। তাঁর আনীত ধর্ম সংরক্ষিত রয়েছে। তাঁর শিক্ষা সদা সজীব। কিন্তু এতে কোন সন্দেহ নেই যে, ইসলামী জাহানকে নতুন করে ঈমান আনতে হবে। নতুন ফিতনা, নতুন শক্তি, নতুন প্রচারণা ও নতুন আহকামসমূহের মোকাবেলা দুর্বল ঈমান ও নিছক আচার-অনুষ্ঠান দ্বারা সম্ভব নয়। ড্যাম হয়ে যাওয়া কোন ভবন নতুন প্লাবন ও নতুন ঢেউ সহ্য করতে পারে না। তাছাড়া কোন মতবাদের প্রবক্তার জন্য জরুরী হল নিজের মতবাদের প্রতি তার অটল বিশ্বাস থাকতে হবে। তার মধ্যে এমন একজন ব্যক্তির মত আনন্দ ও ফূর্তি থাকতে হবে, যে কোন নতুন ভান্ডার লাভ করেছে। ইসলামী জাহান যদি বিশ্ব মানবতার মধ্যে নতুন প্রাণ ও নতুন জীবন সৃষ্টি করতে চায় এবং বিশ্বকে বর্তমানের বস্তুপূজা ও সংশয় সন্দেহ থেকে উদ্ধার করতে চায়, তাহলে প্রথমে নিজেদের মধ্যে ঈমানের নবায়ন ঘটাতে হবে।

অভ্যন্তরীণ প্রস্তুতি

ইসলামী জাহান যদি এ মহান দায়িত্ব পালন করতে চায়,তাহলে মুসলমানদের আভ্যন্তরীণ প্রস্তুতি এবং নিজেদের ভিতরকার অবস্থা পরিবর্তন করতে হবে। ধর্মবিবর্জিত পাশ্চাত্যের মোকাবেলা করতে হলে তা শুধুমাত্র অন্তঃসারশূন্য সভ্যতা ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডদ্বারা সম্ভব নয়। তেমনি পাশ্চাত্য ভাষায় পারদর্শিতা ও পশ্চিমা জীবনধারা আয়ত্ত করার মাধ্যমেও তা সম্ভব হবে না। কেননা জাতীয় উন্নতি ও অগ্রগতির সাথে এসবের কোন সম্পর্ক নেই। বরং পাশ্চাত্যে নৈতিকতা, ধর্মপরায়ণতা ও স্রষ্টামুখীতার যে তীব্র অভাব বিরাজ করছে, মুসলমানদেরকে সেই অভাব পূরণ করতে হবে। ইসলামের প্রাণশক্তি, মুসলমানদের নৈতিক দৃঢ়তা ও ধর্মবিশ্বাসের অবিচলতাই এক্ষেত্রে প্রধান সহায়ক হবে। তাই মুসলমানদের ঈমানী শক্তি বৃদ্ধি করতে হবে। পার্থিব জীবনের মোহ পরিত্যাগ করতে হবে। প্রবৃত্তির তাড়না নিয়ন্ত্রিত রাখতে হবে। মুসলমানদের মধ্যে শাহাদাতের আগ্রহ এবং জান্নাতের আশা তীব্র করতে হবে। পার্থিব সম্পদের ক্ষণস্থায়িত্ব ও তুচ্ছতা তাঁদের মনে বদ্ধমূল করতে হবে। আল্লাহর পথে তাঁরা সকল বিপদ–মুসিবত আনন্দের সাথে বরণ করে নিতে প্রস্তুত থাকবে। প্রকৃতপক্ষে একজন বিধর্মীর সাথে মুসলমানের পার্থক্য থাকবে এখানেই। এমন মুসলমানের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে।

ইসলামী জাহানে এমন দীর্ঘকাল অতিবাহিত হয়ে গেছে যখন মুসলমানদের এই রূহানী শক্তির কোন মূল্যায়ন করা হয়নি। ফলে মুসলমানদের মধ্যে এ শক্তি স্তিমিত হতে হতে এক পর্যায়ে তার অস্তিত্ব সন্দেহজনক হয়ে গেছে।

সুতরাং বর্তমানে ইসলামী জাহানের নেতৃবৃন্দ, চিন্তাশীল ব্যক্তিবর্গ ও সংগঠনসমূহের জন্য জরুরী হল, মুসলমানদের অন্তরে ঈমানের বীজ পুনরায় বপনের চেষ্টা করা, দ্বীনী চেতনা উজ্জীবিত করা। নবী করীম (সা.) প্রথমেই যে নীতিমালা অনুযায়ী মানুষদেরকে ইসলামের প্রতি আহবান জানিয়েছিলেন, সেই নীতিমালা ও দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে মুসলমানদেরকে ঈমানের পথে আহবান জানাতে হবে। আল্লাহ, রাসূল ও পরকালের বিশ্বাসের মাত্রা প্রবলতর করার

জন্য শিক্ষা ও দীক্ষা দিতে হবে। এজন্য ইসলামের প্রাথমিক যুগে যেসব পন্থা অবলম্বন করা হয়েছিল, এখনও তা-ই অবলম্বন করতে হবে। একই সাথে আধুনিক যুগে যেসব উপকরণ ও মাধ্যম সৃষ্টি হয়েছে, তা-ও ব্যবহার করতে হবে।

চেতনার দীক্ষা

কোন জাতির জন্য সবচেয়ে ক্ষতিকর হল, তাদের মধ্যে সঠিক চেতনার অভাব। যে জাতি সকল প্রকারের যোগ্যতার অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও ভালমন্দের পার্থক্য করতে পারে না, শত্রু-মিত্র চিনতে পারে না, অতীতের অভিজ্ঞতা কাজে লাগাতে পারে না, পরিচালক ও নেতৃবৃন্দের কার্যকলাপের জবাবদিহিতা আদায় করতে পারে না, দুষ্টদের দমন করতে পারে না, স্বার্থপর নেতাদের বাগাড়ম্বরে মুগ্ধ হয়ে যায় এবং বারবার প্রতারিত হয়, সে জাতি কখনই উন্নতি লাভ করতে সক্ষম হয় না।

পশ্চিমা জাতিগুলোর মধ্যে নৈতিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধের দারুণ শূন্যতা বিরাজ করলেও তাদের মধ্যে নাগরিক চেতনা ও রাজনৈতিক সচেতনতা পূর্ণরূপে বিদ্যমান। তারা তাদের নেতৃত্বের আসনে এমন ব্যক্তিদের অধিষ্ঠিত হতে দেয় না, যারা অযোগ্য কিংবা জাতীয় স্বার্থে আপোষকামী।

সুতরাং ইসলামী জাহানের জন্য নেহায়েত প্রয়োজন হলো, মুসলিম মিল্লাতের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে ইসলামী চেতনা সৃষ্টি করা এবং দ্বীনী মূল্যবোধ জাগিয়ে তোলা। শিক্ষার প্রসার ও শিক্ষিত লোকের সংখ্যা বৃদ্ধির দ্বারা চেতনার উপস্থিতি প্রমাণিত হয় না। যদিও শিক্ষার ব্যাপকতা ও শিক্ষার প্রসার চেতনা জাগ্রত করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে, কিন্তু ব্যাপকভাবে চেতনা সৃষ্টির জন্য সুশৃংখল ও ব্যাপক নিয়মতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনা প্রয়োজন।

ইসলাম একটি আসমানী ধর্ম। অহী ও নবুওয়াতই ইসলামের ভিত্তি। ইসলাম তার অনুসারীদের মধ্যে এক বিশেষ চেতনা সৃষ্টি করেছে, যা সবচেয়ে পরিপূর্ণ, প্রশস্ত ও গভীর চেতনা। ইসলাম তার অনুসারীদের জন্য এক বিশেষ চিন্তা পদ্ধতি সৃষ্টি করেছে, যা জাহেলী চিন্তাধারা থেকে ভিন্নতর। ইসলাম তার অনুসারীদের মধ্যে এমন এক চেতনা ও আত্মপোলব্ধি দান করেছে, যা ব্যাপক ও সম্প্রসারণশীল হওয়া সত্ত্বেও সাংঘর্ষিক ও নীতিবিরুদ্ধ চিন্তাধারা এবং যুক্তিপদ্ধতির সাথে আপোষ করে না।

ইসলামী চেতনার দীক্ষা লাভের কারণে সাহাবায়ে কেরাম কোন অন্যায়ও ভুল সিদ্ধান্তকে প্রশ্রয় দিতেন না। এমনকি স্বয়ং খলীফার কাজেও তাঁরা আপত্তি তুলতে দ্বিধাবোধ করতেন না। এ কারণে বনু উমাইয়া শাসকগণকে পদে পদে প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হত সাহাবায়ে কেরামের পক্ষ থেকে। যতদিন সাহাবায়ে কেরামের কেউ জীবিত ছিলেন, ততদিন বনু উমাইয়া শাসকদের পক্ষে নির্বিঘ্নে ক্ষমতা চালানো সম্ভব হয়নি।

প্রকৃতপক্ষে যে কোন বিপ্লব সফল হওয়ার জন্য জনগণের মধ্যে চেতনার অনুভূতি একান্ত প্রয়োজন। যখন কোন সমাজ বা দেশের চেতনা জাগ্রত হয় এবং মানুষের মন কোনদিকে ঝুঁকে পড়ে, তখন সে জনতার, যে প্লাবন সৃষ্টি হয় তা রোধ করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। ফ্রান্স বিপ্লব সম্ভব করে তুলেছিলেন বুদ্ধিজীবী শ্রেণী। তারা জনমত গড়ে তুলেছিলেন বিরাট পরিবর্তনের পক্ষে। একারণেই সেখানে বিপ্লব সংঘটিত হয়েছিল।

পশ্চিমা বিশ্বে শত অধঃপতন ও অনৈতিকতা সত্ত্বেও যে কারণে বিশ্বব্যাপী তাদের প্রাধান্য বিস্তার অব্যাহত রয়েছে, তা হলো নাগরিক জীবনের দায়িত্বশীলদের সচেতনতা ও রাজনৈতিক অনুভূতি। এখন পর্যন্ত ইংরেজ ও আমেরিকানদের মধ্যে এমন ব্যক্তি খুঁজেও পাওয়া মুশকিল, যে জাতীয় স্বার্থে জলাঞ্জলি দেয়, কিংবা রাষ্ট্রীয় তথ্য ফাঁস করে দেয় অথবা অকেজো যুদ্ধাস্ত্র খরিদ করে। পশ্চিমাদের অনৈতিকতা তাদের ব্যক্তিগত পর্যায় পর্যন্ত সীমিত। সেখানকার নেতৃবৃন্দ মিথ্যাচার করেন, প্রতারণা করেন, অন্য কোন জাতিকে বশীভূত করতে কৌশল অবলম্বন করেন। কিন্তু এসবই তাদের জাতীয় স্বার্থে, ব্যক্তিগত স্বার্থে নয়। অবশ্য ইসলামে এসব অপকর্মের কোন অবকাশ নেই। ব্যক্তি কিংবা সমষ্টি কারো সাথেই, কারো স্বার্থেই অনৈতিক আচরণ ইসলামে সমর্থিত নয়। কিন্তু পশ্চিমা কোন ব্যক্তি যা কিছুই করে তা সচেতনতা ও এক বিশেষ নৈতিক দর্শনের অধীনে। পক্ষান্তরে প্রাচ্যের কোন ব্যক্তি যা করে তা অবচেতন ও ব্যক্তিগত স্বার্থের অধীনে করে।

মুসলিম দেশগুলোর শাসক ও নেতৃবৃন্দের জন্য অসম্ভব নয় ব্যক্তিগত স্বার্থ কিংবা আরাম–আয়েশের জন্য নিজের দেশকে বন্ধক রাখা, কিংবা কারো কাছে দাসখত দেওয়া, কিংবা নিজের দেশের জনগণকে ছাগল-গরুর মত বিক্রি করে দেওয়া, কিংবা দেশকে এমন যুদ্ধে জড়িয়ে ফেলা যাতে দেশের কিংবা জনগণের কোন স্বার্থ নেই, বরং ক্ষতি রয়েছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়

হলো, এতদসত্ত্বেও তাদের ক্ষমতা কিংবা নেতৃত্ব বহাল থাকে। জনগণ এমন নেতাদেরই জয়গান করে, তাদের নামে জিন্দাবাদ ধ্বনি তোলে। নেহায়েত অসচেতন কিংবা আত্মভোলা না হলে কোন জাতির পক্ষে এমনটি সম্ভব হয় কি?

এমন অনেক মুসলিম দেশ রয়েছে, যেখানে মানবাধিকার বলতে কিছুই নেই। জনগণের সাথে জন্তু-জানোয়ারের মত আচরণ করা হয়। জনগণ শুধু ক্লেশ করার জন্য আর শাসক ও অভিজাত শ্রেণী শুধু ভোগবিলাসের জন্য। সেখানে প্রকাশ্যে আল্লাহর নাফরমানী করা হয়, মানবতার মর্যাদা ভুলুণ্ঠিত করা হয়, শরীয়তের বিধান পদানত করা হয়। কিন্তু জনগণের মধ্যে কোন ক্ষোভ নেই, দুঃখ নেই, কারো অন্তরে ব্যথা অনুভূত হয় না। প্রকৃতপক্ষে মানবীয় চেতনা ও ইসলামী মূল্যবোধের অভাবেই এমন ভয়ানক অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে।

তাই ইসলামী জাহানের জন্য বিরাট খেদমত হবে এই যে, মুসলমানদের মধ্যে সঠিক চেতনা সৃষ্টি করতে হবে। যে চেতনা কোন অন্যায়-অত্যাচার সহ্য করবে না, ধর্ম ও নৈতিকতায় কোন বিচ্যুতি মেনে নেবে না, ভুল-শুদ্ধ, নিষ্ঠা-শঠতা, শত্রু-মিত্র ও কল্যাণ-অকল্যাণের মধ্যে অনায়াসে পার্থক্য করতে সক্ষম হবে। কোন অপরাধী ক্ষোভ ও ভর্ৎসনা থেকে রেহাই পাবে না। নিষ্ঠাবান পাবে স্বীকৃতি ও প্রশংসা। জনগণ তাদের সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় বিষয়াদিতে সজ্ঞানতা ও পরিপক্বতার সাথে সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম ও যোগ্য হবে। যতদিন পর্যন্ত এরূপ চেতনা সৃষ্টি না হবে, কোন ইসলামী দেশ ও জাতির কর্মদ্যোম, যোগ্যতা, দ্বীনী জাগরণ এবং ধর্মীয় জীবনের দৃশ্য ও আচার-অনুষ্ঠান কোনই কার্যকর ভূমিকা রাখবে না।

ব্যক্তি ও গোষ্ঠীস্বার্থ বিসর্জন

ইসলামে ব্যক্তিস্বার্থের কোন অবকাশ নেই। এতে ব্যক্তিগত প্রাধান্য বা গোষ্ঠীগত প্রাধান্য ও ব্যক্তি স্বার্থের কোন স্থান নেই। তেমনি ইউরোপ-আমেরিকায় সংগঠন বা দলের স্বার্থরক্ষার যে ব্যবস্থা চালু রয়েছে তারও কোন অনুমোদন ইসলামে নেই। নতুন ইসলামী নেতৃত্বের জন্য তাই সকল প্রকার ব্যক্তিস্বার্থ, দলীয় স্বার্থ ও আঞ্চলিক স্বার্থ বিসর্জন দিতে হবে। সকল প্রকার সংকীর্ণতার উর্ধ্বে স্থান দিতে হবে মুসলিম মিল্লাতের সামষ্টিক স্বার্থকে।

প্রযুক্তিগত ও সামরিক প্রস্তুতি

ইসলামী জাহানের দায়িত্ব এখানেই শেষ নয়। যদি ইসলামের বাণী প্রচার করতে হয় এবং বিশ্বের নেতৃত্ব ও পরিচালনার দায়িত্ব পালন করতে হয়, তাহলে বিশেষ শক্তি, প্রশিক্ষণ, প্রযুক্তি ও বিজ্ঞান এবং বাণিজ্য ও সমরবিদ্যায় পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে। ইসলামী জাহানকে সকল ক্ষেত্র ও প্রয়োজনে পশ্চিমাদের প্রতি মুখাপেক্ষিতা থেকে মুক্ত হয়ে স্বনির্ভর হতে হবে। খাদ্য ও বস্ত্র শিল্পে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করতে হবে, যুদ্ধাস্ত্রও নিজেদেরই নির্মাণ করতে হবে। খনিজ সম্পদ আহরণে অন্যের সহযোগিতার উপর নির্ভরশীল হলে চলবে না। নিজেদের প্রশাসন ও প্রতিষ্ঠানসমূহ নিজেদেরই সম্পদ ও লোক দিয়ে চালাতে হবে। মুসলিম দেশগুলোর সমুদ্রসীমায় মুসলমানদের নৌবহর থাকতে হবে। শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে নিজেদেরই নির্মিত জাহাজ, গোলাবারুদ ও অস্ত্র দিয়ে। আমদানীর চেয়ে রপ্তানি হতে হবে বেশি। পশ্চিমা দেশগুলো থেকে ঋণ গ্রহণের প্রয়োজন যেন না পড়ে। কারো পতাকাতলে আশ্রয় গ্রহণের কিংবা কোন বলয়ে অন্তর্ভুক্তিতে যেন বাধ্য হতে না হয়।

ইসলামী জাহান যতদিন প্রর্যন্ত জ্ঞান-বিজ্ঞান, রাজনীতি, প্রযুক্তি ও বাণিজ্যে পাশ্চাত্যের প্রতি মুখাপেক্ষী থাকবে, পাশ্চাত্য ততদিন ইসলামী দেশগুলোর রক্ত চুষতে থাকবে। মুসলিম বিশ্বেরই উৎপাদিত ফসলাদি পশ্চিমাদের কারখানার কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হতে থাকবে, মুসলিম বিশ্বের বাজার ছেয়ে যাবে পশ্চিমাদের উৎপাদিত পণ্যে। ইসলামী দেশগুলো যতদিন পর্যন্ত পশ্চিমাদের নিকট থেকে ঋণ নিতে থাকবে, নিজেদের প্রশাসন পরিচালনায়, গুরুত্ব পূর্ণ ও কীপোস্টগুলো পূরণে, নিজেদের সৈন্যদের ট্রেনিং দিতে পশ্চিমাদের লোকদের অনুগ্রহের দাস থাকবে, সেখানকার বাণিজ্য ও শিল্পপণ্য আমদানী, তাদেরকে বুদ্ধিজীবী, মুরব্বী ও পৃষ্ঠপোষক মনে করবে; ততদিন পর্যন্ত ইসলামী জাহানের পক্ষে পাশ্চাত্যের মোকাবেলা করা তো দূরের কথা, তাদের প্রতি চোখ তুলে তাকানোও সম্ভব নয়।

জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে ইসলামী বিশ্ব নিকট অতীতে খুবই উদাসীনতা ও অবহেলার পরিচয় দিয়েছে। যার ফলে দীর্ঘকাল যাবত ইসলামী বিশ্বকে হেয়তার জীবন যাপন করতে হয়েছে। অতঃপর এতে আধিপত্য ও

প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে পশ্চিমাদের। পশ্চিমারা এ সুযোগে বিশ্বব্যাপী ধ্বংসলীলা ও খুনখারাবী ছড়িয়েছে। যদি এখনও ইসলামী দেশগুলো বিজ্ঞান-প্রযুক্তিতে অগ্রসর না হয় এবং নিজেদের ব্যাপারে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করতে ভুল করে, তাহলে তাদের ভাগ্যে থাকবে বঞ্চনা ও নিগ্রহ এবং বিশ্ব মানবতার দুর্ভোগের মেয়াদ আরো বৃদ্ধি পাবে।

নতুন শিক্ষাব্যবস্থা

ইসলামী জাহানের জন্য প্রয়োজন এমনভাবে নতুন শিক্ষাব্যবস্থা চালু করা যা হবে ইসলামের প্রাণশক্তি ও পয়গামের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। ইসলামী বিশ্ব প্রাচীন বিশ্বে নিজেদের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিক্ষার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করেছিল এবং বিশ্বের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও কৃষ্টি কালচারের শিরা-উপশিরায় প্রবাহিত হয়েছিল। পৃথিবীর সাহিত্য ও দর্শনের গভীরে ইসলামই মজবুত অবস্থান নিয়েছিল। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে সভ্য দুনিয়া ইসলামী দর্শনের আঙ্গিকে চিন্তা করতো, ইসলামী ধারায় সাহিত্য রচনা করতো, ইসলামের ভাষায়ই গ্রন্থ সংকলন করতো। ইরান, তুর্কিস্তান, আফ্গানিস্তান ও ভারতের লেখক, সাহিত্যিকগণ কোন গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করতে চাইলে আরবিতে লিখতেন। অনেকে মূলগ্রন্থ আরবিতে লিখে তার সার সংক্ষেপ ফার্সিতে প্রস্তুত করতেন। যেমন ইমাম গায্যালী কিমিয়ায়ে সাআদাতে করেছেন। যদিও আব্বাসী যুগে প্রবর্তিত এই শিক্ষা আন্দোলন গ্রীক ও অনারব প্রভাবিত ছিল এবং ইসলামী স্পিরিট ও ইসলামী চিন্তাধারার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ছিল না। তাছাড়া শিক্ষা ও ধর্মীয় দিক দিয়ে তাতে বেশ কিছু দূর্বলতা ছিল, তথাপি শক্তি ও সজীবতার কারণে তা সারা দুনিয়াতে স্রোতের মত ছড়িয়ে পড়েছিল এবং প্রাচীন শিক্ষা ব্যবস্থা তার সামনে থমকে দাঁড়িয়ে ছিল।

অতঃপর ইউরোপের অগ্রগতি ও উন্নতির যুগ এল। ইউরোপ নিজস্ব অভিজ্ঞতা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা দ্বারা এই প্রাচীন ব্যবস্থাকে যাদুঘরে স্থানান্তরিত করে এবং তার পরিবর্তে নতুন শিক্ষাব্যবস্থা প্রণয়ন করে। ইউরোপীয় দর্শন, চিন্তাধারা ও মনোবিজ্ঞানের সাথে পুরোপুরি সামঞ্জস্য রক্ষা করে এই শিক্ষাব্যবস্থা প্রণীত হয়েছিল। এই শিক্ষা পরিবেশ থেকে যেসব শিক্ষার্থী বের হত তাদের শিরায়-উপশিরায় এক বিশেষ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হত। বিশ্ব দ্বিতীয়বারের মত এ শিক্ষাব্যবস্থার নিকট আত্মসমর্পন করে। ইসলামী

বিশ্বকেও স্বাভাবিক নিয়মেই এ শিক্ষাব্যবস্থার প্রতি আনুগত্য স্বীকার করতে হল। কেননা দীর্ঘকাল ধরে এখানে জ্ঞানের নিম্নগামিতা ও চিন্তার জড়তায় রুগ্ন অবস্থা বিরাজ করছিল। মুসলমানদের পেয়ে বসেছিল হীনম্মন্যতায়। তারা নিজেদের পরিত্রাণের একমাত্র উপায় ইউরোপের অনুকরণেই নিহিত বলে মনে করত। তাই সকল দুর্বলতা ও ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও মুসলিম বিশ্ব এ শিক্ষাব্যবস্থাই গ্রহণ করল যা অদ্যাবধি ইসলামী জাহানের সর্বত্র চালু রয়েছে।

স্বাভাবিক নিয়মেই ইসলামী ভাবধারা ও নতুন ভাবধারার মধ্যে টানাপোড়েন শুরু হল। ইসলামী নৈতিকতা ও পাশ্চাত্য নৈতিক ধারার মধ্যে রশি টানাটানি হতে লাগল। বস্তুরাজির মূল্য ও মর্যাদা নির্ধারণে নতুন মাপকাঠি ও পুরাতন মাপকাঠির মধ্যে যুদ্ধ শুরু হল। এ শিক্ষা ব্যবস্থার ফল দাঁড়াল এই যে, শিক্ষিত ও বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর মধ্যে সংশয়বাদিতা, শঠতা, অস্থিরতা, জীবনের প্রতি মায়া, প্রবৃত্তি পূজা ও বিলম্বিত উপকারের চেয়ে তাৎক্ষণিক উপকারকে প্রাধান্য দেওয়ার মানসিকতা সৃষ্টি হল। পশ্চিমা সভ্যতার অনিবার্য অনুসঙ্গ স্বরূপ আরো যেসব দূষণীয় দিক রয়েছে, তা সবই সৃষ্টি হল।

ইসলামী বিশ্ব যদি নতুন করে জীবন শুরু করতে চায় তাহলে শুধুমাত্র শিক্ষায় স্বয়ংসম্পূর্ণতা নয়; বরং শিক্ষা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানে প্রাধান্য ও শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে হবে। এটি কোন সহজ কাজ নয়। এর জন্য গভীর চিন্তাভাবনা প্রয়োজন। এজন্য ব্যাপকভাবে রচনা সংকলন এবং বিভিন্ন শাস্ত্র নতুনভাবে বিন্যস্ত করার কাজ শুরু করা প্রয়োজন। এ কাজের যিনি নেতৃত্ব দেবেন তিনি আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানে এ পরিমাণ অবগতি ও গভীর দৃষ্টি রাখবেন যা যাঁচাই ও সমালোচনার পর্যায়ে পৌঁছে। একই সাথে ইসলামের আসল উৎস থেকে পূর্ণরূপে জ্ঞান আহরণ করে থাকবেন এবং ইসলামী প্রাণশক্তি ও চেতনায় উজ্জীবিত হবেন। একাজ এতই কঠিন ও শ্রমসাপেক্ষ যে, কোন সংগঠন বা সংস্থার পক্ষেও তা সম্পন্ন করা দুরূহ ব্যাপার। এটি ইসলামী রাষ্ট্রসমূহের কাজ। এ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রথম নিয়মতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান ও সেটআপের প্রয়োজন হবে।

এমন বিশেষজ্ঞদের নির্বাচন করতে হবে, যারা প্রতিটি বিষয়ে পান্ডিত্য রাখেন। তাঁরা এমন শিক্ষা কারিকুলাম প্রণয়ন করবেন, যাতে একদিকে থাকবে কিতাব ও সুন্নাহর অপরিহার্য ও দ্বীনের অপরিবর্তনীয় বিষয়াদি; অন্যদিকে প্রয়োজনীয় আধুনিক বিদ্যাসমূহ। তাঁরা মুসলমানদের নতুন

প্রজন্মের জন্য আধুনিক বিদ্যাসমূহ নতুনভাবে বিন্যস্ত করবেন যা ইসলামের মূলনীতি ও ইসলামের মৌলিক চেতনার ভিত্তিতে হবে। তাতে এমন প্রতিটি বিষয় থাকবে, যা নতুন প্রজন্মের জন্য প্রয়োজনীয় যা দ্বারা তারা নিজেদের জীবনকে সাজাতে পারবে এবং নিজেদের প্রয়োজনাদি মেটাতে, স্বাধীনতা-সর্বভৌমত্ব রক্ষা করতে ও নিজেদের সম্পদ কাজে লাগাতে পাশ্চাত্যের মুখাপেক্ষী হবে না। তারা নিজেদের অর্থব্যবস্থা নতুন করে সাজাবে এবং ইসলামী ভাবধারার আলোকে এমনভাবে পরিচালনা করবে যে, প্রশাসন ব্যবস্থা ও অর্থব্যবস্থায় ইসলামী ব্যবস্থাপনার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয় এবং অর্থসংক্রান্ত যেসব সমস্যার সমাধানে পশ্চিমা বিশ্ব হার মেনেছে ও অসহায়ত্ব স্বীকার করেছে, সেগুলোর সমাধান করবে। এই আধ্যাত্মিক কারিগরি ও সামরিক প্রস্তুতি এবং শিক্ষায় স্বয়ংসম্পূর্ণতার মাধ্যমেই মুসলিম বিশ্ব উন্নতি ও অগ্রগতি অর্জন করতে পারবে, বিশ্ববাসীর কাছে নিজেদের বার্তা পৌঁছাতে পারবে এবং ধ্বংসোন্মুখ পৃথিবীকে রক্ষা করতে সক্ষম হবে। অতএব বিশ্বব্যাপী ইসলামী জাহানের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠায় আরব জাহানের গুরুত্ব ও দায়িত্ব অনেক বেশি।

কেননা খাতামুন্নাবিয়্যীন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরব ভূমিতে আগমন করার কারণে বিশ্ব মুসলিমের কাছে আরবদের প্রতি শ্রদ্ধা ও সমীহ অপরিসীম। মহানবী (সা.) ঘোষণা করে গিয়েছেন যে, কুরাইশ বংশ থেকেই ইমামগণ হবেন। তাই আরবদেরই এগিয়ে আসতে হবে। আরবদেরই প্রস্তুত হতে হবে। মনে রাখতে হবে আরব জাহানের প্রধান শক্তি হল ঈমান। তাই ইসলামের প্রতি তাদের ঈমান ও নিষ্ঠা জোরদার ও নবায়ন করতে হবে। একই সাথে সামরিক, প্রযুক্তিগত ও আর্থিক স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করতে হবে। নিজেদের মধ্যকার বিভেদ ভুলে যেতে হবে। তবেই কল্যাণ, তবেই মুসলিম জাহান পুনরায় বিশ্বব্যাপী নিজেদের প্রাধান্য ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হবে। আর এতে করে বিশ্বমানবতার সার্বিক কল্যাণ সাধিত হবে।

নতুন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা

সাথে সাথে আজ ইসলামী দুনিয়ার জন্য এমন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন যা নতুন ইসলামী সভ্যতার জন্ম দেবে, যে সভ্যতা আমাদের শিক্ষিত শ্রেণীকে ইউরোপীয় জীবনধারার নাগপাশ থেকে ছিনিয়ে পুনরায় ইসলামের দিকে, সার্বজনীন ইসলামী আদর্শের দিকে ফিরিয়ে আনবে।

তাদের কেউ তো বুঝে শুনে আসবে, কিন্তু অনেকেই সময়ের আবহাওয়ায় প্রভাবিত হয়ে আসবে। যে সভ্যতা যুবকদের চেতনায় নতুনভাবে ইসলামের বুনিয়াদকে প্রতিষ্ঠিত করবে, তাদের হৃদয় ও আত্মার খোরাক হবে। এ কাজের জন্য ইসলামী দুনিয়ার প্রান্তে প্রান্তে এমন দৃঢ়চেতা ব্যক্তিত্বের প্রয়োজন যারা শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত এ লড়াইয়ের ময়দান থেকে পিছু হটবে না।

আমি আমার ব্যাপারে স্পষ্ট করে বলতে চাই যে, আমি কস্মিনকালেও ঐ সকল লোকদের দলভুক্ত নই যারা দ্বীন ও রাজনীতির মাঝে বিভাজন সৃষ্টি করে। আমি না তাদের দলভুক্ত যারা পূর্বেকার সমস্ত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ থেকে হটে গিয়ে ইসলামের এমন ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে, যার দ্বারা ইসলাম যে কোন সমাজ ব্যবস্থা এবং যে কোন অবস্থার সাথে (চাই তা ইসলাম থেকে যতদুরে সরে গিয়ে হোক না কেন) ফিট হয়ে যায় এবং সব ধরনের সোসাইটিতে খাপ খায়। আমার তাদের সাথেও কোন সম্পর্ক নেই যারা রাজনীতিকে কুরআনে উল্লিখিত অভিশপ্ত বৃক্ষ والشجرة الملعونة فى القـــرأن. এর মতলব মনে করে। আমি ঐ সমস্ত লোকদের প্রথম সারিতে যারা মুসলিম জাতির মাঝে বিশুদ্ধ রাজনৈতিক চেতনা উজ্জীবিত করার প্রত্যাশী এবং প্রতিটি রাষ্ট্রের শাসন ক্ষমতায় যোগ্য নেতৃত্ব দেখার অভিলাষী। আমি তাদের দলভুক্ত যাদের বিশ্বাস, ইসলামী সমাজ ততক্ষণ পর্যন্ত কায়েম হতে পারে না, যে পর্যন্ত না ইসলামী নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা হয় এবং ইসলামী আইনই রাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থার বুনিয়াদ হয়। আমি এর একজন একনিষ্ঠ দা'ঈ এবং যিন্দেগীর আখেরী নিঃশ্বাস পর্যন্ত এর উপর অবিচল থাকব।

==ooo==

অধ্যায়–১০

আরব জাতীয়তাবাদের প্লাবন ও দ্বীনী মূল্যবোধের দাবী

পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ইসলামকে সকল যুগেই নিজেদের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ও বিপজ্জনক শত্রু মনে করেছে। তারা সবকিছুই সহ্য করতে পারে, কিন্তু মুসলমানদের ঐক্য সহ্য করতে পারে না। ইহুদীদের কুচক্রী মস্তিষ্ক আর খৃষ্টানদের সরঞ্জামাদি একত্রিত হয়ে ইসলামী জাহানকে টুকরো টুকরো করে ফেলার পরিকল্পনা নিয়েছিল এক শতাব্দীকাল পূর্বেই। যা বাস্তবায়িত হতে থাকে পর্যায়ক্রমে। সর্বপ্রথম তারা তুর্কিদেরকে আরবদের থেকে বিচ্ছিন্ন করে। মুসলমানদেরই হাতে ইসলামী খেলাফতের অবসান ঘটায় স্থায়ীভাবে। আরবদেরকে প্রথমে তুর্কীদের মোকাবেলার জন্য আরব জাতীয়তাবাদের শ্লোগান তোলে। এই শ্লোগানকে একটি নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের রূপ দেওয়া হয়। ফিলিস্তিনের আরব বাসিন্দাদেরকে তাদের বাড়ীঘর থেকে উচ্ছেদ করে সেখানে ইহুদীদের বসতী স্থাপন করা হয়। ইহুদীদের জন্য ইসরাইল রাষ্ট্র কায়েম করা হয় এবং তাদের পাহারাদারীর দায়িত্বও পালন করছে পশ্চিমা শক্তি।

পশ্চিমাদের আশংকা ঃ

পশ্চিমাদের আশংকা ছিল ইসলামী জাহানের সাথে যদি আরবদের যোগাযোগ ও সম্পর্ক থাকে, তাহলে বিশ্বের মানচিত্রে মুসলমানরা এক মহাশক্তি হয়ে আবির্ভূত হবে। তাই প্রতিষ্ঠা করা হয় আরব লীগ, আর মৃত্যু ঘটান হয় 'ওয়ার্ল্ড মুসলিম লীগ'–এর। আরব জাতীয়তাবাদকে আরব সংস্কৃতির একটি অংশ প্রমাণ করার জন্য মিসরের কিবতী এবং ইরাক, সিরিয়া ও লেবাননের ইহুদী-খৃস্টান লেখক-সাহিত্যিকরা সর্বশক্তি নিয়োগ করে। তুর্কি খেলাফতের অবসানের পর তারা নতুন আরবী সাহিত্যের আবিষ্কার করে। এ সাহিত্যের মূলনীতি ছিল সেকুলারিজম ও খৃস্টানদের প্রাচীন মতবাদ– ঈশ্বরের প্রাপ্য ঈশ্বরকে দাও, রাষ্ট্রের প্রাপ্য রাষ্ট্রকে দাও। রাষ্ট্রের সাথে গীর্জার কোন সম্পর্ক নেই। ধর্ম মানুষের নিজস্ব ও ব্যক্তিগত ব্যাপার। মানুষ তার নিজের রচিত খোদাকে যেভাবে ইচ্ছা উপাসনা করুক। তবে রাষ্ট্র ও প্রশাসনের নাম

নিতে পারবে না। এ আন্দোলন সমাদৃত হওয়ার পর দ্বিতীয় স্তরে আসে দেশ পূঁজা। যেসব ইহুদী ও খৃষ্টান লেখক সাহিত্যিক ইউরোপ-আমেরিকায় বসতি স্থাপন করেছিল, তারা তাদের জন্মভূমি সিরিয়া ও লেবাননের কথা এমনভাবে স্মরণ করে যেমন কোন নিষ্ঠাবান খোদাপ্রেমী আল্লাহর স্মরণে বিভোর থাকে। এই আরব বংশোদ্ভূত আমেরিকান কবিরা 'বিরহ সাহিত্য' নামে গদ্য-পদ্যের এক বিরাট স্তুপ গড়ে তোলে। এতে অনেক প্রসিদ্ধ সাহিত্যিকের আবির্ভাব হয়। যেমন-খলীল জিবরান, আবু আইলিয়া মাযী, ফরহাত মিখাইল নাইমা প্রমুখ। এরা নিজেদের পুর্বপুরুষদের আবাস ভূমিকে পূঁজনীয় সাব্যস্ত করে। এ সাহিত্যের প্রভাব পড়ে আরবের উঠতি যুবকদের উপর।

ইউরোপের শিল্প বিপ্লবের ফলে এ ধারণা প্রসার লাভ করে যে, ধর্ম হল জনগণের পায়ের বেড়ি; প্রতিটি ব্যক্তি যে কোন নৈতিক বিধি মেনে চলতে পারে। কথা এখানেই শেষ নয়। আরব জাতীয়তাবাদের বিষ যখন সকলের শিরা-উপশিরায় ছড়িয়ে পড়ে, তখন তা-ই একটি ধর্মে পরিণত হয় এবং তা ইসলামের সমান্তরাল ধর্ম বলেও পরিগণিত হয়। পক্ষান্তরে মুসলিম বিজেতা ও হযরত আমর ইবনুল আস (রা.)-এর কোন অবদানেরই স্বীকৃতি দেয়া হত না। অথচ তিনিই মিসরকে কিনানা ভূমি থেকে ইসলামী ভূমিতে রূপান্তরিত করেছিলেন। তদস্থানে মিসরের ফেরাউনদের গুণগান করা হত। জামাল আব্দুন নাসের প্রকাশ্যভাবে নিজেদের সাত হাজার বছরের সভ্যতার জন্য গর্ব প্রকাশ করেন।

পশ্চিমা বুদ্ধিজীবীদের কৌশল

ইসলামের ব্যাপারে খৃষ্টান ঐতিহাসিক ও ইহুদী বুদ্ধিজীবীদের আচরণ ছিল এই যে, তারা ভিতর থেকে ইসলামী আকায়েদের শিকড় কেটে দিতে থাকে। কিন্তু বাহ্যিক দৃষ্টিতে মনে হবে তারা সাধারণ মূলনীতি অনুযায়ী বক্তব্য রাখেন। তাদের শিল্প ছিল এই যে, নেহায়েত মুর্খতাসুলভ ও হাস্যকর বিষয়কে তারা ইতিবাচক ভঙ্গিতে বর্ণনা করত। ফলে শ্রোতারা টেরই পেত না, তারা কী উদ্দেশ্যে এভাবে বলে। যেমন হিট্টি তার আরবের ইতিহাস গ্রন্থে কুরআন মজীদ সম্পর্কে বলেন, এ হল মুসলমানদের ধর্মীয় গ্রন্থ। এতে এমন দু'টি অনুচ্ছেদ রয়েছে যা সৌন্দর্য ও সত্যতার ধারক বলে মনে হয়। অর্থাৎ পুরো কুরআন মজীদই অনর্থক। তবে ঘটনাক্রমে দু'টি আয়াত সত্য ও সুন্দর মনে হয়।

আরব বার্থ পার্টির প্রতিষ্ঠাতা সেক্রেটারী জেনারেল প্রফেসর মিশেল আফলাক ছিলেন সিরীয় বংশোদ্ভূত খৃস্টান। শেষ বয়সে তিনি ইরাকে আসেন। এখানেই তার মৃত্যু হয়। তিনি ১৯৫৬ সালে পার্টির বার্ষিক রিপোর্টে বলেন –

আরবরা প্রতি যুগেই নিজেদের জীবনের সঙ্গী হয়েছে। এর প্রাচীন ইতিহাসে কখনই তারা পিছিয়ে থাকেনি। এমনকি মরুভূমির বেদুঈনরা তাদের অশিক্ষার অন্ধকার পরিবেশেও তখনকার ধারণা ও কল্পনা অনুযায়ী ধর্মকে নিজেদের উন্নতির সোপান বানিয়েছে। কিন্তু আরবরা উন্নতির পথে এগিয়ে চলেছে। উন্নয়ন ও প্রগতি তাদের সহজাত প্রবৃত্তি। তারা ইতিহাসের কোন বাঁকেই থেমে যায় না, দিকভ্রান্ত হয় না। কিন্তু মরুভূমি থেকে বেরিয়ে তাদেরকে জীবনের রাজপথে আসতে হবে।

(আল জায়গুল আরবী দামেশক জুন, ৫৮)

আরব জাতীয়তাবাদ

প্রকৃতপক্ষে আরব জাতীয়তাবাদ আন্দোলনের প্রথম দিককার নেতৃবৃন্দ ও প্রবক্তারা ছিলেন খৃস্টান বুদ্ধিজীবী এবং সেইসব কবি-সাহিত্যিক, তুর্কিদের সাথে যাদের ধর্মবিশ্বাস ও ইসলামী ভ্রাতৃত্বের কোন সম্পর্ক ছিল না। তারা ছিলেন সেই পশ্চিমা সংস্কৃতির ধারক, যার ভিত্তি ছিল জাতীয় মর্যাদা ও জাতিবন্দনার চেতনার উপর। এ সময়ে এ আন্দোলনের নেতা ছিলেন ডক্টর কারস নেম্বার, ইবরাহীম বায়েজী ও উস্তাদ নজীব আজেরদী নামে জনৈক লেবাননী খৃষ্টান। অতঃপর আসে জাতীয়তাবাদের পশ্চিমা ভাবধারা, যা ছিল একটি স্বতন্ত্র চিন্তা-দর্শন এবং এতে ধর্মের মতই চেতনা, উদ্দীপনা, ভাবগাম্ভীর্য ও শ্রদ্ধাবোধ পরিলক্ষিত হয়।

লেবাননী মুসলমান বুদ্ধিজীবী নাসেরুদ্দীন তাঁর বহুল প্রচারিত গ্রন্থ 'কাযিয়্যাতুল আরব' এ লিখেছেন- একজন স্বাধীনচেতা, সজ্ঞান, ভদ্র, সজ্জন, হৃদয়বান, আত্মমর্যাদাশীল উদার মুসলমানের নিকট ঈমানের প্রশ্নের চেয়ে আরবদের প্রশ্ন কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। দেশের প্রতি বিশ্বাস তেমনই হতে হবে, যেমনটি হয় আল্লাহর প্রতি। আরব জাতীয়তাবাদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সম্পর্কে তিনি লিখেছেন– আরব জাতীয়তাবাদ অশিক্ষা, দারিদ্র্য, ব্যাধি, অবিচার অত্যাচার, সকল প্রকার অনিয়ম এবং আরব পক্ষপাতিত্ব ব্যতীত সকল প্রকারের পক্ষপাতিত্বের বিরুদ্ধে লড়াই করবে। এ জাতীয়তাবাদ ধর্ম ও রাজনীতির ভিন্নতায় বিশ্বাস করে। এতে ধর্মীয় ব্যক্তিদের রাজনীতির অনুমতি

থাকবে না। একজন আরবের জন্য এতে এ শিক্ষা থাকবে যে, সে যেখানেই থাকুক না কেন, দু'টি বিষয়ে সে পুরো পক্ষপাতিত্ব করবে– নিজ জাতীয়তার জন্য এবং ন্যায় ও সত্যতার জন্য। তিনি আরও লিখেছেন– আরব জাতীয়তাবাদ স্বয়ং একটি ধর্ম। কেননা খৃষ্ট ধর্ম ও ইসলাম ধর্মের আগমনের পূর্বেও তা পৃথিবীতে বিদ্যমান ছিল। এতে আসমানী ধর্মের নৈতিকতা, আচরণ ও মাহাত্ম্য বর্তমান রয়েছে। আরবরা যতদিন পর্যন্ত আরব জাতীয়তাবাদকে তাদের ধর্ম হিসেবে গণ্য না করবে ততদিন পর্যন্ত তারা উন্নতি লাভ করতে পারবে না। মুসলমানরা যেমন তাদের নবী ও কুরআন মজীদের প্রতি, ক্যাথলিক খৃষ্টানরা যেমন বাইবেলের প্রতি, প্রটেসট্যান্টরা যেমন লুথারের সংস্কারমূলক শিক্ষার প্রতি, ফরাসীয়রা যেমন বিপ্লবের প্রতি এবং রাশিয়ানরা যেমন সমাজতন্ত্রের প্রতি মোহান্ধ, আরবদের তেমনি আরব জাতীয়তাবাদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও উদ্দীপ্ত হতে হবে। সেন্ট পিটারের আহ্বানে খৃষ্টানরা যেমন ক্রুসেডে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, আরবদেরও তেমনি আরব জাতীয়তাবাদের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে।

মোটকথা আরব মুসলমানরা মধ্যপ্রাচ্যের সংখ্যালঘু অথচ ধূর্ত খৃষ্টানদের চক্রান্তের শিকার হল। খৃষ্টানরা মনে করে এভাবেই তারা আরব বিশ্বের নেতৃত্ব অর্জন করতে এবং মধ্যপ্রাচ্যকে ইসলামী জাহান থেকে বিচ্ছিন্ন করতে সক্ষম হবে।

মিসরের অভ্যুত্থান

খৃষ্টান ও ইহুদীদের চক্রান্তের বিষ ১৯৫২ সালের পর গোটা মধ্যপ্রাচ্যে ছড়িয়ে পড়ে। এসময়ে বাদশাহ ফারুককে দেশান্তরিত করে মিসরের সেনাবাহিনী ক্ষমতা দখল করেছিল। মিসরে যখন বিপ্লব সংঘটিত হয়, তখন মুসলমানরা আন্তরিকভাবে তাকে স্বাগত জানিয়েছিল। কেননা রাজতন্ত্রের খারাপ দিকগুলো জনগণের কাছে খুবই স্পষ্ট ছিল। বাদশাহর বিলাসিতার কাহিনী হাটে-বাজারে আলোচিত হত। তোষামোদীদের প্রশংসা, সাংবাদিকদের শঠতাপূর্ণ কলমবাজি এবং সাহিত্যিকদের উক্তিসমূহ থেকে অনুমিত হত যে, তারা সবাই থিয়েটারের অভিনেতা। হযরত মাওলানা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী (রহ.) যখন প্রথমবারের মত মিসরে গেলেন, তখন ছিল বাদশাহ ফারুক ইবনে ফুয়াদের শাসনকাল। বাদশাহর রাজকীয় ব্যয়ের কথা লোকেরা নির্ভয়ে আলোচনা করত। বস্তুতঃ তার

দোষত্রুটি ও কুকর্ম গোপন থাকবার মত ছিল না। মিসরে বিপ্লব সংঘটিত হলে এবং রাজতন্ত্রের অবসান হলে এটিকে যারা মিসরের জন্য শুভ সূচনা মনে করেছিলেন, হযরত মাওলানা আবুল হাসান আলী নদভী ছিলেন তাদের অন্যতম। তিনি এ বিষয়ে ذهب عصرالف وليلة (আলিফ লায়লায় যুগের অবসান হল) শীর্ষক অত্যন্ত শক্তিশালী নিবন্ধ লিখলেন। উস্তাদ আহমাদ হাসান যায়্যাত-এর 'আর-রিসালায়' এটি প্রকাশিত হল। তা থেকে মিম্বারুশশারক-এ পুনর্মুদ্রিত হল।

সাময়িক আনন্দ

কিন্তু ইসলামী জাহানের দুর্ভাগ্য যে, এই আনন্দ সাময়িক বলে প্রমাণিত হল। সেনা অভ্যুত্থানের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন জেনারেল নজীব। তিনি এক বছর যাবত মিসরের প্রেসিডেন্ট ছিলেন। প্রথম সাক্ষাৎকারে সাংবাদিকরা তাকে প্রশ্ন করেন- আপনি কাকে আদর্শ মনে করেন? তিনি জবাব দিলেন, গান্ধিজীকে। মুসলমানরা এটি শুনে হতবাক হল। তাদের কামনা ছিল- তিনি হযরত নবী করিম (সা.)-এর উসওয়ায়ে হাসানা-ই আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করবেন এবং খোলাফায়ে রাশেদীনকে অনুসরণীয় বলে বক্তব্য রাখবেন। পরে জানা গেল, বিপ্লবের প্রকৃত নেতা জামাল আবদুন নাসের এবং তার পৃষ্ঠপোষকতা করছে সোভিয়েট ইউনিয়ন। মিসরের এই বিপ্লবী সরকারের কেবলা মক্কা নয়, মস্কো। ফলে পশ্চিমা শক্তিগুলো যা চেয়েছিল, তা-ই শুরু হয়ে গেল। আলেম সমাজের পক্ষে কোন প্রতিবাদ হতে পারল না। বিপ্লবের নেতার বক্তব্য ছিল اشتري الفتوي بفرخة অর্থাৎ আলেমদের কোন মূল্য আমার নিকট নেই। তাদের ফতোয়া আমি এক মুরগীর বাচ্চা দিয়ে কিনে নেব। রেডিও মিসরের 'ছওতুল আরব' প্রোগ্রামে এক একজন শিল্পী, বুদ্ধিজীবী তার সকল বঞ্চনা ও অনগ্রগতির জন্য মাতম করতে থাকত এবং বলত আরব জাতীয়তাবাদের উপর পূর্ণ আস্থা অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত মুক্তি আসবে না। অথচ মুসলমানদের আন্তরিক ও যথার্থ বিশ্বাস হল– ঈমান-আকীদা মজবুত ও শুদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত আল্লাহর সাহায্য আসবে না। মোটকথা এই ছিল বাস্তব পরিস্থিতি এবং হযরত মাওলানা আবুল হাসান আলী নদভী (রহ.) তা প্রত্যক্ষভাবে অবগত ছিলেন।

নদওয়ার ভূমিকা

এ সময়ে আরবী মাসিক 'আল-বা'ছুল ইসলামী' অসাধারণ ভূমিকা পালন করে। মাওলানা মুহাম্মাদ মিয়াঁ (রহ.)-এর কলমে এমন তেজোদীপ্ত নিবন্ধসমূহ প্রকাশিত হয় যে, মিসর সরকারকে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রতিবাদ জানাতে হয় এবং মুহাম্মাদ মিয়াঁকে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। মিসর, দামেশ্ক ও বাগদাদে এ মাসিকের প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। তবে ইংল্যান্ডে যেসব মিসরী যুবক পড়াশোনা করত, তারা আল-বা'ছুল ইসলামীর সম্পাদকীয়গুলো কপি করে ব্যক্তিগত পত্রের আকারে মিসর ও সিরিয়ায় প্রেরণ করত।

হযরত মাওলানা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী (রহ.)-এর সাথে সেখানকার উলামায়ে কেরাম বিশেষকরে ইসলামী বিপ্লব প্রত্যাশীদের পত্রযোগাযোগ ছিল। মক্কা মুকাররমায় তাদের সাথে সাক্ষাৎও হত। এমত পরিস্থিতি অবগতির ভিত্তিতে তিনি এক দীর্ঘ নিবন্ধ লেখেন যা ছোট এক পুস্তিকার আকার ধারণ করে। ردة ولا ابابكرلها (ধর্মান্তর ফিতনা ছড়িয়ে পড়েছে, অথচ তার মোকাবেলায় কোন আবু বকর নেই) শীর্ষক এ পুস্তিকা সিরিয়ার যুব সমাজ লক্ষাধিক কপি প্রকাশ করে এবং হজ্জের সময়ে মিনা ও আরাফাতে বন্টন করে। তাছাড়া তাঁর আরেকটি পুস্তিকা اسمعوها صريحة مني ايها العرب (হে আরব! আমা থেকে পরিষ্কার শুনে রাখুন) লক্ষাধিক কপি ছেপে বন্টন করা হয়।

এ সময়ে মিসরের মু'তামারে ইসলামী একটি সম্মেলন করতে চায়। এর সেক্রেটারী ছিল আনওয়ার সাদাত। উদ্দেশ্য ছিল জামাল আবদুন নাসেরের বিরুদ্ধে যেসব ভুল ধারণা সারাবিশ্বে ছড়িয়ে ছিল, তা বন্ধ করা। এজন্য মিসরের রাষ্ট্রদূত নিজেই এসে হযরত মাওলানাকে দাওয়াতনামা পৌঁছে দেন।

অতঃপর মু'তামারুল ইসলামীর নাম পরিবর্তন করে মাজমাউল বুহূছিল ইসলামিয়্যা রাখা হয়। তাওফীক আবীযা ছিলেন তার সেক্রেটারী। তাওফীক আবীযা চিন্তা করলেন যে, ভারতে তো একমাত্র মাওলানা আলী মিয়াঁই প্রখ্যাত আলেম ও চিন্তাবিদ নন। আমরা অন্যান্য মাদরাসার আলেমদেরকে সরাসরি দাওয়াত দিয়ে জামাল আবদুন নাসেরের কীর্তিসমূহ সম্পর্কে পরিচিত করাই না কেন? সে মতে মাজমাউল বুহূছের নামে মিসরে এক সম্মেলন আহ্বান করা হল। ভারতের পররাষ্ট্র সচিব হযরত মাওলানাকে বললেন,

আপনি অংশগ্রহণ করুন এবং আপনি যাকে নির্বাচিত করবেন তাকেও দাওয়াত দিন। হযরত মাওলানা আলী মিয়াঁ স্পষ্ট ভাষায় তা প্রত্যাখ্যান করেন। অতঃপর তাওফীক আবীযা কয়েকজন আলেমকে সরাসরি দাওয়াত দেন।

হযরত মাওলানা আলী মিয়াঁ নদভীর এ আচরণ ছিল এক চিন্তাধারা ও বিশ্বাসের ফল এবং মিসর সরকার উলামায়ে কেরাম এবং দ্বীনী দাওয়াত ও জিহাদের কর্মীদের সাথে যে আচরণ করেছিল তারই প্রতিক্রিয়া। জামাল আবদুন নাসের ক্ষমতারোহণের পর থেকেই ইখওয়ানের নেতাদেরকে বিনা অপরাধে হত্যা করতে শুরু করে। সত্যের বাণী বুলন্দ করার দায়ে জেলখানায় তাদের সাথে ঠিক সেই আচরণ করে, ইসরাইল সরকার আরব যুবকদের সাথে যা করেছিল। হিটলারের সময়ে জার্মানীতে নির্যাতনের যেসব পদ্ধতি আবিস্কৃত হয়েছিল, সাইয়েদ কুতুব ও তাঁর বোন আমীনা কুতুবের উপর তা প্রয়োগ করা হয়। এসব কাহিনী অনেক বিস্তৃত। এমত পরিস্থিতিতে মিসর সরকারের দাওয়াত কবুল করার অর্থ দাঁড়াত তার অন্যায় অবিচারসমূহের প্রতি মৌন সমর্থন জানান।

মাওলানা আলী মিয়াঁর বক্তব্য

হযরত মাওলানা আলী মিয়াঁ নদভীর প্রেসিডেন্ট জামাল আবদুন নাসেরের বিরোধিতায় উঠে পড়ে লেগে যাওয়া এবং আল বা'ছুল ইসলামীর অনন্য ভূমিকা পালন ছিল আরব বিশ্বের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে প্রত্যক্ষভাবে ও গভীরভাবে জানবার ফলে। প্রকৃতপক্ষে এটি কোন ব্যক্তিবিশেষ কিংবা গোষ্ঠী বিশেষের ব্যাপার ছিল না। এ ছিল নবুওতে মুহাম্মাদীর প্রতি বিদ্রোহ এবং ইসলাম থেকে কার্যতঃ বেরিয়ে যাওয়ার বিষয়। হযরত মাওলানা নদভীর ভূমিকার জন্য ভারতেই বিভিন্ন মহল থেকে প্রশ্ন উঠতে থাকে। বলা হতে থাকে- অন্য একটি দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয় নিয়ে আমাদের মাথা ঘামানোর কি প্রয়োজন? কিন্তু বস্তুতঃ এটি কোন বিশেষ দেশের ব্যাপার ছিল না। ধর্মচ্যুতি ও ধর্মান্তরের ঘটনা ঘটতে থাকবে; অথচ তার প্রতিবাদও করা হবে না, হযরত মাওলানার নিকট তা কোনমতেই গ্রহণ যোগ্য ছিল না। তাই তিনি "প্রেসিডেন্ট নাসেরের বিরোধিতা কেন" শীর্ষক এক নিবন্ধে এ ব্যাপারে ব্যাখ্যা দেন। নেদায়ে মিল্লাত-এর ৪ আগষ্ট ১৯৬৭ সংখ্যায় এটি প্রকাশিত হয়। তাতে তিনি বলেন– আমি আমার কর্মপন্থার জন্য কোনরূপ দুঃখ প্রকাশ কিংবা ব্যাখ্যা প্রদানের প্রয়োজন বোধ করি না। তবে কতিপয় ভুল ধারণা

নিরসন করতে চাই। প্রেসিডেন্ট নাসেরের সাথে আমার বিরোধিতার মূল কারণ– তিনি বর্তমানে আরব জাতীয়তাবাদের প্রধান প্রবক্তা। আর এটি হলো পাশ্চাত্যের জাতীয়তাবাদ দর্শনের আরবীয় সংস্করণ। আমি এটিকে বিশ্বব্যাপী ইসলামী ভ্রাতৃত্ব ও ইসলামী সার্বজনীনতার পরিপন্থী মনে করি।

সিরিয়ার কয়েকজন বার্থ নেতা ও ইরাকের কতিপয় জাতীয়তাবাদী বুদ্ধিজীবী ও কলামিষ্ট এ ব্যাপারে প্রেসিডেন্ট নাসেরের চেয়েও কট্টর। তারা আরব জাতীয়তাবাদকে একটি দর্শন হিসেবে এবং ইসলামের সমান্তরাল একটি ব্যবস্থা হিসেবে উপস্থাপন করে। তথাপি তাদেরকে আমি আরব জাহান ও আরব জাতির নতুন প্রজন্মের জন্য এত বেশী বিপজ্জনক মনে করি না। প্রেসিডেন্ট নাসের আরব জাতীয়তাবাদের নিছক একজন প্রবক্তা নন। তিনি আরব জাহানের গতি প্রকৃতি, চিন্তাধারা, রুচি ও জীবনবোধে মৌলিক পরিবর্তন সাধন করতে চাইছেন, যা প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে চলতে থাকবে। তুরস্কের কামাল পাশা ব্যতীত কোন ইসলামী দেশ বা নেতা এত ব্যাপক পরিবর্তন সাধন করেনি। তিনি বস্তুবাদ ও ধর্মহীনতার দিকে আরব জাতিকে নিয়ে যেতে চাইছেন। কিন্তু আমাদের ভারতের অনেক আলেম আরব বিশ্বের বর্তমান পরিবর্তনসমূহের ও সাম্প্রতিক ঘটনাবলী সম্পর্কে অবগত না থাকার কারণে তেমন উদ্বেগ প্রকাশ করছেন না। অথচ খোদ সোভিয়েত ইউনিয়নই মিসরের বর্তমান পরিবর্তনকে সমাজতন্ত্র বলে স্বীকৃতি দিয়েছে। তাই এটি প্রকৃতপক্ষে কমিউনিজমের আরব সংস্করণ। সমাজতন্ত্রের আকারে এখন প্রথম পর্যায় অতিক্রম করছে।

মসজিদ ও মাদরাসাগুলোকে সোশালিস্ট পার্টির নিয়ন্ত্রণে নেওয়া হচ্ছে। ফলে গত দশ-বারো বছর ধরে নতুন প্রজন্মকে যে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে, তার ফলে তাদের মধ্যকার দ্বীনী মনোভাব দুর্বল হয়ে পড়ছে। এই পরিবর্তন যেখানেই সাধিত হোক না কেন তা খুবই বিজপজ্জনক। কিন্তু এটি এমন এক পবিত্র ভূমিতে সংঘটিত হয়েছে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরামের পবিত্র সত্তা যেখানকার মাটির সাথে মিশে আছে। ইবরাহীম (আ.)-এর বংশধরেরা যদি বায়তুল্লাহর তওয়াফ বাদ দিয়ে মস্কোর উদ্দেশ্যে ইহরাম বাঁধে ও ক্রেমলিনের চারপাশে ঘোরাঘুরি করে, তাহলে মুসলমান মাত্রেরই দুঃখিত ও ক্ষুব্ধ হওয়ার কথা।

আমার জন্য দুর্ভাগ্য হোক কিংবা সৌভাগ্য, আমি আরব বিশ্বের দুর্বলতা ও সমস্যা সম্পর্কে প্রত্যক্ষভাবে জানবার সুযোগ লাভ করেছি, যা আমাদের ভারতের অনেক আলেমের পক্ষে সম্ভব হয়নি। আমি প্রথমবারের মত

আরবভূমিতে গিয়েছি, ১৯৪৭ সালে। কিন্তু আরব ভূমিতে পা রাখবার আগে থেকেই সেখানকার রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক অবস্থা সম্পর্কে এত পরিষ্কার ধারণা অর্জন করেছি যে, আমি আরব দেশগুলোতে কখনই নিজেকে অপরিচিত বা একাকীত্ব অনুভব করিনি। এরপর আমি বার বার আরব দেশগুলোতে সফর করেছি। আরবরাও উদারতা বশতঃ আমাকে তাদের অবস্থাদি সম্পর্কে মন্তব্য ও পর্যালোচনা করার সুযোগ দিয়েছে।

এইসব বিপ্লবী নেতা ও একনায়কদের কারণে আরব বিশ্বের বিশেষ করে মিসর, সিরিয়া, ইরাক, আলজেরিয়া, লিবিয়া ও সুদানের জনগণ মানসিক যাতনার শিকার। ইসলামের আবির্ভাবের পরে এমনটি আর কখনোই হয়নি। এখন আরব বিশ্ব এক চূড়ান্ত সন্ধিক্ষণে অবস্থান করছে। যদি বর্তমান বিপ্লবী নেতৃত্বসমূহ খোদা না করুন সফলতা লাভ করে, তাহলে আরব বিশ্ব ইসলাম থেকে এত দুরে সরে যাবে যে, পুনরায় তাকে ইসলামে দিকে আনার জন্য কোন অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন মুজাদ্দিদের প্রয়োজন পড়বে। তাই বর্তমান পরিস্থিতি কোন সত্যপ্রিয় সচেতন ব্যক্তির পক্ষে মেনে নেওয়া সম্ভব নয়।

হযরত মাওলানা আবুল হাসান আলী নদভী এভাবে দীর্ঘ প্রবন্ধে তার মনোভাব ব্যক্ত করেন এবং আরব জাতীয়তাবাদের কুফল সম্পর্কে সবাইকে সচেতন করেন।

==ooo==

অধ্যায়–১১
চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও অনন্যতা

[হযরত মাওলানা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী (রহ.) ছিলেন অসংখ্য সদগুণের আধার। তাঁর চরিত্রে এমন মাধুর্য ও সৌন্দর্য ছিল, যা তাঁর মহত্ব ও অসাধারণত্বের প্রমাণ বহন করত। নিম্নে তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের কতিপয় দিক উল্লেখ করা হল।]

উম্মতের জন্য দরদ-ব্যথা

হযরত মাওলানা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী (রহ.) উম্মতের জন্য সবসময় পেরেশান থাকতেন। তিনি কাউকে দ্বীন ও মিল্লাতের ক্ষতি করতে দেখলে বা দ্বীনের যুক্তিযুক্ত কোন হক নষ্ট করতে দেখলে বা দ্বীনের উপর কোন হামলা হলে ভীষণ পেরেশান হতেন এবং প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতেন। তিনি এ ব্যাপারে কারো পরওয়া করতেন না। আরবদের সাথে তাঁর বিশেষ মহব্বত থাকা সত্ত্বেও তিনি আরব জাতীয়তাবাদের কঠোর সমালোচনা করেছিলেন এবং তুর্কীদের সাথে মহব্বত থাকা সত্ত্বেও সেখানকার ইসলাম বিদ্বেষী, নাস্তিক্যবাদের ধ্বজাধারী সরকারের ভীষণ সমালোচনা করেছিলেন। এ ব্যাপারে তিনি তাঁর কলমকে বিশেষভাবে ব্যবহার করেছিলেন। ভারত সরকার ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতিকে অনৈসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে রূপান্তরের চেষ্টা চালালে হযরত মাওলানা তার কঠোর বিরোধিতা করেন। এর বিরুদ্ধে সমাবেশে বক্তৃতা করেন, প্রবন্ধ লেখেন। ভারতের মুসলমানরা সংখ্যালঘু হবার কারণে তিনি এ বিষয়ের উপর আন্দোলন গড়ে তোলেন যে, প্রত্যেক ধর্মের লোকেরা তাদের নিজ নিজ ধর্ম, সভ্যতা-সংস্কৃতির উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে স্বাধীনভাবে বসবাস করবে। সরকার এর উপর কোন হস্তক্ষেপ করতে পারে না।

তিনি আরব বাদশাহ ও সুলতানদের সাথে দেখা করে তাদেরকে নসীহত করেন। তিনি তাদের দেশের ভুলত্রুটিগুলোর দিকে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। বিশেষ করে সৌদী, জর্দান, মরক্কো প্রভৃতি দেশের বাদশাদের সাথে সাক্ষাৎ করে তাদেরকে দেশের খেদমতের জন্য এবং সত্যের বাণী সমুন্নত করার জন্য উপদেশ দেন। ঐসব সাক্ষাতের সময় তিনি সম্পূর্ণ নির্ভীকভাবে কথা বলতেন।

চিত্তের উদারতা

হযরত মাওলানার অন্তর ছিল আকাশের মত উদার। দ্বীন ও মিল্লাতের নির্মাণের কাজে অংশগ্রহণকারী সকল ধরনের মানুষকে তিনি তাঁর অন্তরে স্থান দিতেন। তাদের মধ্যে কোন ভাল দিক থাকলে তা মেনে নিতেন এবং তার কদর করতেন। তিনি যাদের সঙ্গে মিশতেন তাদের মধ্যে কোন মৌলিক ত্রুটি আছে কিনা তা প্রথমেই পরীক্ষা করে নিতেন। ফলে ফেকহী মাসলাকের বিভিন্নতা, চিন্তাধারার পার্থক্য এবং ভিন্ন ভিন্ন কার্যপদ্ধতি, মত ও পথ মাওলানার সাথে তাদের দূরত্ব সৃষ্টি করার সুযোগ পেত না। এ কারণেই তিনি দারুল উলূম দেওবন্দ, মাজাহিরে উলূম সাহারানপুর, মাদ্‌রাসাতুল ইসলাহ সরাইমীর, জামেয়া সালাফিয়া বেনারস, এমনিভাবে জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ, জামায়াতে ইসলামীসহ অন্যান্য সবার গঠনমূলক কর্মকাণ্ড এবং প্রচেষ্টাসমূহকে তিনি দ্বীনেরই সহায়ক হিসেবে দেখতেন। ঐসব সংগঠনের দায়িত্বশীলদের সাথে তিনি ভ্রাতৃত্বসুলভ আচরণ করতেন এবং যথাসম্ভব সহযোগিতা করতেন। অবশ্য তার অর্থ এই ছিল না যে, তাঁর কোন ব্যক্তিগত মন্তব্য ছিল না। বরং তিনি উম্মতের ভবিষ্যৎ উন্নতির দিকে লক্ষ্য করে ছোট খাট ও ব্যক্তিগত স্বার্থ উপেক্ষা করে জাতীয় স্বার্থের দিকে বেশী লক্ষ্য দিতেন।

কাউকে কষ্ট না দেয়া

হযরত মাওলানার একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল কারো অন্তরে কষ্ট না দেয়া। এ গুণটি তাঁর মধ্যে এত প্রবল ছিল যে, তাকে কেউ তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য বা ঘৃণা করলেও তিনি তার জবাব তো দিতেনইনা, বরং নিজের সাথীদেরও কোন প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ না করার জন্য পরামর্শ দিতেন।

অন্যদের খারাপ জানা বা তাদের অকল্যাণ কামনা করা এবং প্রতিশোধ নেয়ার প্রবণতা মাওলানার মাঝে অনুপস্থিত ছিল। তিনি অন্যদের ত্রুটি-বিচ্যুতি অনুসন্ধান করা থেকে বহু দূরে থাকতেন। এমনকি তিনি তাঁর বিরোধীদের নামও মুখে আনতেন না। অনেক সময় এ বিষয়ে তাঁর খাদেমরা এই মনে করে ধোঁকায় পড়ে যেত যে, তিনি হয়ত এ বিষয়ে বা এ বিরোধী ব্যক্তি সম্পর্কে কিছুই জানেন না। অথচ পরে বুঝা যেত যে, এ বিষয়ে তিনি সবকিছু অবগত আছেন। কিন্তু তিনি তা প্রকাশ করতেন না। এ ধরনের মানসিকতার কারণে তাঁর অনেক বিরোধীও অবশেষে ভুল বুঝতে পেরে তাঁর ঘনিষ্ট মিত্র হয়ে যেত।

ইখলাসের মূর্ত প্রতীক

প্রায় শতাব্দী ব্যাপী কর্মজীবনের যে উজ্জ্বল দিকটি হযরত মাওলানা আলী মিয়াঁর মধ্যে সবচেয়ে বেশী প্রত্যক্ষ করা গেছে এবং উম্মতের দৃষ্টি প্রভাবিত হয়েছে, তা ছিল তাঁর ইখলাছ ও লিল্লাহিয়াত। তিনি ইখলাছকে সফলতার চাবিকাঠি মনে করতেন এবং ঈমানী ফেরাসাতকে কামিয়াঁবীর গ্যারান্টি মনে করতেন। একবার তিনি ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী নরসীমা রাওকে সতর্ক করে বলেছিলেন, "রাওজী! সবচেয়ে বড় রাজনীতি হল ইখলাছের রাজনীতি।" তিনি অটল বিহারী বাজপেয়ীকে একবার বলেছিলেন, "অটলজী! খোদা পাকের কাছে কোন রাজনীতি চলেনা, খুলুস চলে। খুলুসের সাথে কাজ করুন, কামিয়াঁবী আপনার কদম চুম্বন করবে, উন্নতির রাস্তা খুলবে এবং বিজয় আর সফলতা আপনার নিত্য দিনের সঙ্গী হবে।" হযরত মাওলানা খুলুসের শক্তি উপলব্ধি করতেন। তিনি ছিলেন একজন পাক্কা মুমিন। তিনি ঈমানী ফেরাসাতের দৌলতে সমৃদ্ধ ছিলেন। আগত বিপদ তিনি পূর্বেই টের পেয়ে যেতেন। আর খুলুসের শক্তির উপর বিশ্বাস, আল্লাহ পাকের জাতের উপর নির্ভর ও দু'আর প্রতিক্রিয়ার উপর ভরসা করে ময়দানে নেমে আসতেন এবং কামিয়াঁবীর স্তরসমূহ এভাবে অতিক্রম করে যেতেন যে, বড় বড় রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হয়রান হয়ে যেত এবং খুলুসের হাতে রাজনীতির পরাজয়কে তারা মেনে নিতে বাধ্য হত।

আত্মত্যাগী মহাপুরুষ

হযরত মাওলানা আলী মিয়াঁ ছিলেন আত্মত্যাগের মহিমায় উজ্জীবিত। ভোগের জিন্দেগী তাঁকে কোন সময় স্পর্শ করতে পারেনি। তিনি আর্থিক দিক দিয়ে কোন সময় সচ্ছল ছিলেন না। হালাল উপায়ে কোন অর্থ আসলে তা থেকে লোভ সংবরণ করা সাধারণ মানুষের পক্ষে তো সম্ভবই নয়; বরং এখানে বড় বড় পীর-মাশায়খ ও আলেমদেরও পদস্খলন ঘটে যাওয়া অসম্ভব কিছু নয়। আল্লাহ পাক হযরত আলী মিয়াঁর উপর অকল্পনীয় এহসান করে তাকে ধনের মহব্বত ও পদের মহব্বতের মত মারাত্মক রূহানী ব্যাধি থেকে মুক্ত থাকার তাওফীক দিয়েছিলেন। তাঁর দরজায় বড় বড় আন্তর্জাতিক পদ এবং পুরস্কার করাঘাত করেছিল, কিন্তু তিনি ছিলেন একেবারেই নির্লিপ্ত।

তিনি দামেশ্ক ইউনিভার্সিটি ও মদীনা ইউনিভার্সিটির হাজার হাজার টাকার বেতনের চাকুরী গ্রহণ না করে শুধু ভিজিটিং প্রফেসর হিসেবে সময় দিয়েছিলেন। রাবেতায়ে আলমে ইসলামীর বড় বড় সুযোগও তিনি ধরার চেষ্টা

করেননি। একবার সৌদি আরবের শায়খ ওমর বিন হাসান মাওলানা আব্দুল্লাহ আব্বাস নদ্ভীর মাধ্যমে হযরতের নিকট চল্লিশটি আশরাফী ভর্তি থলি পাঠিয়ে দিলে তিনি তা থেকে একটি রেখে বাকীগুলি ফেরত দেন। ১৯৮০ সালে সৌদী আরবের শাহ ফয়সল পুরস্কারের দুই লক্ষ রিয়াল তিনি আফগান মুজাহিদীন ও অন্যান্য খাতে দান করে দেন। তেমনি ১৯৮৯ সালে বছরের সেরা ব্যাক্তিত্ব হিসেবে দুবাই পুরস্কারের দশ লাখ দিরহামের সকল টাকা তিনি ভারতের বিভিন্ন দ্বীনী প্রতিষ্ঠানে দান করে দেন। ঠিক এমনিভাবে ব্রুনাই সুলতানের পুরস্কারের অর্থও তিনি মানবতার সেবায় বিলিয়ে দেন।

মোট কথা, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাকে দুনিয়ার ভোগবিলাস থেকে পাক-পবিত্র রেখেছিলেন। নদওয়ার পঞ্চান্ন টাকার সাধারণ বেতন এবং পরবর্তীতে বিনা বেতনে পড়ানোর জযবা ও আর্থিক অভাব-অনটনে নিজের হাতের ঘড়ি বিক্রি করার অবস্থাতেও হযরত আলী মিয়াঁ তাঁর 'শানে ইসতিগনা' বা দুনিয়ার প্রতি নিরাসক্তির এই মহান চরিত্র ভুলুণ্ঠিত হতে দেননি; বরং নদওয়ার সাধারণ পরিবেশে আমৃত্যু মুজাহাদার সাথে জীবন কাটিয়ে গেছেন।

নম্রতা

নম্রতা ছিল হযরত মাওলানার চরিত্রের অন্যতম ভূষণ। ছোট-বড়, ধনী-গরীব সকলের সাথে তিনি নম্র ব্যবহার করতেন। তিনি ছিলেন নবী করীম (সা.)-এর এই হাদীসের পূর্ণ মূর্তপ্রতীক ঃ "যে ব্যক্তি আল্লাহ পাকের জন্য নম্রতা অবলম্বন করে আল্লাহ পাক তাকে উচ্চ মর্যাদা দান করেন।" তাঁকে কেউ কোন সময় অহংকার করতে দেখেনি। এ কাজ আমি করেছি বা আমরা করেছি এ ধরনের শব্দ তার অভিধানে ছিল না। কিন্তু আল্লাহ পাক তাঁকে বিভিন্ন ধরনের খেদমতের জন্য কবুল করে নিয়েছিলেন। এদিক দিয়ে বিচার করলে বুঝা যায় তিনি একটি দেশের সম্পদই ছিলেন না; বরং তিনি ছিলেন সমগ্র পৃথিবীর এক মহান ব্যক্তিত্ব। সারা পৃথিবীর নাম করা ব্যক্তিত্ব হওয়ার পরও নিজের আচার-আচরণে তিনি কোন সময় তা প্রকাশ করতেন না।

তিনি মাঝে মাঝে তাঁর চেয়ে ছোটদের সাথেও এমন ব্যবহার করতেন, যেন তাদের থেকে কিছু শিখছেন।

মেহমানদারী

মেহমানদারীর অভ্যাস ছিল হযরতের খান্দানী স্বভাব। হযরত মাওলানার নিকট শত শত মেহমান আসতো। তিনি তাঁদের মর্যাদা অনুযায়ী সকলকে মেহমানদারী করাতেন। রায়বেরেলী ও নদওয়ায় তিনি প্রায়ই মেহমানদের সাথে খানা খেতেন। নদওয়ায় বেশ কয়েকজন উস্তাদকেও হযরতের সাথে খানা খেতে দেখেছি। কোন মেহমান এলে হযরত প্রথমেই তাদের খানাপিনা ও আরাম-আয়েশের খোঁজ-খবর নিতেন, এতমিনান না হওয়া পর্যন্ত পেরেশান থাকতেন। কোন মেহমান আসার সাথে সাথে তিনি তাদেরকে চা ইত্যাদি দিয়ে আপ্যায়ন করানোর জন্য খাদেমদেরকে নির্দেশ দিতেন। শুধু নির্দেশ দিয়েই তিনি ক্ষান্ত হতেন না, কিছুক্ষণ পরেই আবার জিজ্ঞাসা করতেন অমুক মেহমানকে আপ্যায়ন করা হয়েছে কিনা। অনেক সময় মেহমানদের ফিরে যাওয়ার পথ খরচ আছে কিনা তা গোপনে জিজ্ঞাসা করতেন। বড় মেহমান হলে প্রয়োজন বোধে জিজ্ঞাসা ছাড়াই কিছু হাদিয়া দিতেন। তাঁর দরবারে মেহমানদের দরজা ছিল সব সময়ই খোলা। এখানে হিন্দু, মুসলমানসহ বিভিন্ন ধর্মের লোকেরাও হযরতের মেহমান হত এবং তাঁর মেহমানদারীতে খুশী হয়ে ফিরে যেত।

কুরআনের মুহাব্বত

হযরতের বিভিন্ন মা'মুলাতের মধ্যে কুরআনে পাকের তেলাওয়াত ছিল অতীব গুরুত্বপূর্ণ। তিনি প্রতিদিন সকালে কমপক্ষে এক পারা করে তেলাওয়াত করতেন। তেলাওয়াতের সময় এরকম মনে হত যে, কুরআনে পাকের এক একটি শব্দ ও আয়াত তাঁর হৃদয়ের গহীনে প্রবেশ করছে। তিনি ছোট বেলায় হেফয করার সুযোগ পাননি, তাই চল্লিশ বছর বয়সের পর আস্তে আস্তে হেফয করে ফেলেন এবং নিয়মিত তেলাওয়াত করতে থাকেন। জীবনের শেষের দিকে যখন তাঁর তেলাওয়াত করার শক্তি কমে গিয়েছিল, তখন তিনি তাঁর কয়েকজন হাফেয শাগরেদের কাছ থেকে প্রতিদিন তেলাওয়াত শুনতেন। তিনি যখন সুস্থ ছিলেন তখন নফল নামাযে নিয়মিত কুরআন পড়তেন। হাঁড়িতে ভাত ফুটে যাওয়ার পর যে ধরনের আওয়াজ বের হয়, নামাযে কুরআন তেলাওয়াতের সময় হযরতের বুকের ভিতর থেকে ঠিক তেমন ধরনের আওয়াজ বের হত।

নামায ও জামাআতের এহতেমাম

হযরত মাওলানা নামাযের জামাআতের খুবই এহতেমাম করতেন। আযানের ১৫/২০ মিনিট পূর্বেই তিনি নামাযের প্রস্তুতি নিতেন এবং আযান শুনেই মসজিদে রওয়ানা হওয়ার চেষ্টা করতেন। আযানের পর নিজের আবাসস্থলে থাকা তিনি নিজের জন্যও পছন্দ করতেন না, অপরের জন্যও না। একবার তিনি পায়ে হেঁটে নদওয়া হতে গোয়েন রোডে গিয়েছিলেন। সেখানে ইশার জামাআত পাওয়ার আশা ছিল। কিন্তু তিনি সেখানে পৌঁছে দেখেন জামাআত শেষ। তখন তিনি আর একটি মসজিদে গেলেন, সেখানেও জামাআত শেষ হয়ে গিয়েছিল। তখন তিনি অস্থির হয়ে পড়লেন। এক ব্যক্তি আর একটি মসজিদের নাম উল্লেখ করে বললো যে, ওখানে জামাআত আরো দেরিতে হয়। তিনি তখন ঐ মসজিদে গিয়ে জামাআত পেলেন। জামাআত পেয়ে তিনি যে কত খুশী হয়েছিলেন তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না।

হযরত মাওলানা নদভী (রহ.) যখন সীতাপুর হাসপাতালে ভীষণ অসুস্থ অবস্থায় ছিলেন তখনও তিনি জামাআতের সাথে নামায পড়তেন। শরয়ী ওযরের কারণে জামাআতে নামায না পড়ার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও তিনি সবসময় আযীমাতের উপর আমল করতেন। নদওয়ার শিক্ষাসচিব হযরত মাওলানা আব্দুল্লাহ আব্বাস নদভী বলেন, একবার আমি এবং নদওয়ার সাবেক নায়েবে নাজেম মাওলানা মুয়িনুল্লাহ নদভী (রহ.) হযরতের সাথে সফর করছিলাম। ট্রেন লাখনৌ হয়ে দিল্লী যাচ্ছিল। আমরা ইশার নামায নদওয়ায় পড়ে স্টেশনে এসেছিলাম। তখন রমযান মাস ছিল। হযরত বললেন যে, নদওয়া থেকে স্টেশন পুরো আবাদী এলাকা, অতএব এখনও আমরা মুসাফির হইনি, তাই তারাবীহ পড়তে হবে। ট্রেনের মধ্যে বিশ রাকাআত তারাবীহ হযরত মাওলানাই পড়ালেন। যার মধ্যে সূরায়ে বাকারা শেষ করেন। এখানেও তিনি আযীমাতের উপরে আমল করেন। অর্থাৎ সুযোগ থাকা সত্ত্বেও তিনি তারাবীহ বাদ দেননি। এটা ছিল তাঁর যৌবন কালের অবস্থা।

জীবনের শেষ দিকে যখন তাঁর রয়স ৭০ বা ৮০ তে পৌঁছেছিল, তখন বিভিন্ন রকম অসুখ-বিসুখ তাকে ঘিরে রেখেছিল। 'বিছানা থেকে শরীর পৃথক করা যাবে না– ডাক্তারদের এ উপদেশ থাকা সত্ত্বেও তখন তিনি নিজের কিছু খাছ খাদেমকে নিয়ে জামাআতে নামায পড়তেন। জীবনের শেষ কয়েকবছর তিনি বিশেষ করে ফজরের নামায নিজের অবস্থান স্থলে জামাতের সাথে

পড়তেন। অন্যান্য চার ওয়াক্ত নামায মসজিদে গিয়ে পড়তেন। ফরয ও বেতের দাঁড়িয়ে পড়তেন এবং বাকী নামায বসে পড়তেন। জীবনের একেবারে শেষের দিকে যখন মসজিদে আসার শক্তি ছিল না তখন নিজের কামরায় জামাআত সহকারে নামায আদায় করার চেষ্টা করতেন।

তিনি জুম'আর নামাযের খুবই এহতেমাম করতেন। আযানের পর পরই মসজিদে চলে যেতেন। জুম'আর দিন সূরায়ে কাহাফ অবশ্যই তেলাওয়াত করতেন।

দুঃস্থ মানবতার সেবা

দুঃস্থ মানবতার সেবা করা হযরতের এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল। তিনি গরীব-দুঃখী-অসহায় পরিবারকে সাহায্য করা নিজের দায়িত্ব মনে করতেন। বেশ কিছু লোককে তিনি মাসিক ভাতা দিতেন। অনেক গরীব-অসহায় তালেবে ইলমদের নিকট তিনি মানি অর্ডারে টাকা-পয়সা পাঠাতেন। রায়বেরেলী অবস্থান কালে এ ধরনের অসহায় মানুষদের ভীড় জমে যেত। ঐ সময় কেউ খালি হাতে ফেরত যেত না। তারা চাতকের মত চেয়ে থাকত হযরত কবে রায়বেরেলী আসবেন। রমযানুল মোবারকে তাঁর এই জযবা আরো বেড়ে যেতো।

রোগীদের সেবা করা তাঁর এক বড় গুণ ছিল। খানদানের কোন দূরের বা নিকটের আত্মীয়-স্বজন অসুস্থ হলে তিনি তাদের কাছে ছুটে যেতেন। রোগী হাসপাতালে থাকলে তিনি হাসপাতালে গিয়ে সেবা করতেন, খোঁজখবর নিতেন। কেউ ইন্তেকাল করলে তিনি জানাযা পড়াতেন এবং দাফন-কাফনে শরীক হতেন। বেশ কয়েকটি রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে পুরস্কার হিসেবে দেয়া বিপুল পরিমাণ অর্থ তিনি সেবা খাতে ব্যয় করেন।

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও অনাড়ম্বর জীবন

হযরত মাওলানা আবুল হাসান আলী নদভী (রহ.) শত ব্যস্ততার মধ্যেও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার দিকে বিশেষ খেয়াল রাখতেন। নাযাফাত বা পরিচ্ছন্নতা ছিল তাঁর মজ্জাগত স্বভাব। চুল-দাঁড়ি ঠিকঠাক রাখা, লেবাস-পোষাক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা এবং কামরা ইত্যাদি সুন্দর রাখার দিকে তিনি খুবই গুরুত্ব দিতেন। সাধারণতঃ আলেম-উলামা ও দরবেশ শ্রেণীর মানুষ এদিকে লক্ষ্য করেন না বিধায় হযরত আলী মিয়াঁ সবাইকে এ ব্যাপারে সতর্ক করতেন।

তাঁর জীবন ছিল সহজ, সরল, সাদাসিধে-অনাড়ম্বর। লেবাস-পোশাকে তাঁর কোন জৌলুশ প্রকাশিত হত না। তিনি কোন সময় অহংকারীর মত চলতেন না। দেশে হোক, বিদেশে হোক একই ধরনের সাদা পাজামা-পাঞ্জাবী পরতেন। শেরওয়ানীর বোতামগুলো লাগানো থাকতো। ছোট-বড় সকল প্রোগ্রামে তিনি শেরওয়ানী পরতে ভুলতেন না। তাঁর মধ্যে কোন তাকাল্লুফী বা লৌকিকতা ছিল না। সকল কাজ ছিল গোছানো, পরিপাটি, সুশৃংখল। তিনি জাঁকজমক ভালোবাসতেন না। তিনি পাগড়ী নিয়মিত পরতেন না, তবে টুপীর উপর মাঝে মাঝে রুমাল ব্যবহার করতেন। পেশাব-পায়খানার সময় তিনি পৃথক কাপড় পরে নিতেন এবং পরে ওযু করতেন। হুযুরে পাক (সঃ)-এর পাক-পবিত্রতা ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার এ সুন্নতের দিকে হযরতের সজাগ দৃষ্টি ছিল।

মুরব্বী মান্যতা

রূহানিয়াত ও আধ্যাত্মিকতার সাধনায় উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য প্রধান শর্ত হল আত্মমত বিলোপ এবং শায়খে কামিলের পূর্ণ ইত্তেবা ও আনুগত্য। তাসাওউফ তথা ইহসান ও তাযকিয়ার ইতিহাসে শায়খ ও মুরীদের মাঝে এ সম্পর্কে হাজারও চমকপ্রদ ঘটনা ও নযীর রয়েছে। এক্ষেত্রে আমাদের জন্য হযরত মাওলানা আলী মিয়াঁ (রহ.) এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ও নমুনা রেখে গেছেন। বস্তুত এ বৈশিষ্ট্যটি তাকে পৃথিবীতে বড় হওয়ার জন্য বিরাট সহায়ক শক্তি হিসেবে দেখা দিয়েছিল। উদাহরণ স্বরূপ শুধু একটা ঘটনা এখানে উল্লেখ করা হল।

হযরত মাওলানা আলী মিয়াঁর নিজের ভাষায় শুনুন– ১৩৬৮ হিজরীর ঘটনা একজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তির পক্ষ হতে আমাকে দ্বিতীয় বার হজ্বের সফরের দাওয়াত দেওয়া হয়। পরবর্তী দিন প্রাত ভ্রমনের সময় আমি আমার মুরশিদ হযরত রায়পুরী (রহ.)-এর খেদমতে বিষয়টি উত্থাপন করে তাঁর পরামর্শ প্রার্থনা করি। হযরত হঠাৎ বলে উঠেন, আমি যদি নিষেধ করি তাহলে অপনার কি প্রতিক্রিয়া হবে? আমি বললাম, জ্বী না। হযরত আমার চেহারার দিকে তাকালেন। আলহামদুলিল্লাহ, চেহারায় কোন প্রতিক্রিয়া ছিল না। এখানেই সেই প্রসঙ্গের ইতি হল।

কিন্তু কিছুদিন পর সাওয়ালের ১০ তারিখে হযরত রায়পুরী আমাকে বললেন, আমি হজ্বে যাচ্ছি। তুমিও তৈরী হও। আমি হয়রান হলাম। কেননা, আমার তখন কোন ইন্তেযাম ছিল না। কিন্তু আল্লাহ মেহেরবান। হযরত

শায়খুল হাদীছ (রহ.) তার মৃতা কন্যার হজ্জে বদলের জন্য আমাকে নির্বাচন করলেন এবং সকল ব্যবস্থাপনা সুসম্পন্ন করলেন। পানির জাহাজে সফর কালে হযরত শায়খ একদিন আমাকে বললেন, এ হজ্জের সফর আমি তোমাকে সঙ্গদানের জন্য করেছি। হযরতের কথায় সফর মূলতবী করার এবং তবিয়তে কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়া না হওয়ার এটা ছিল সুন্দর এক পুরস্কার।

শায়খে কামেলের পক্ষ থেকে মুরীদানকে মাঝে মধ্যে এ ধরণের পরীক্ষা করা হয়ে থাকে। আল্লাহ পাকের অশেষ মেহেরবানী যে এক্ষেত্রে ইত্তেবা ও আনুগত্যের এবং শয়খের ইচ্ছাকে অগ্রাধিকার প্রদানের তাওফিক হয়েছিল।

হযরত মাওলানা আলী নদভী (রহ.) আরো লিখেছেন এ সফরে কাবা শরীফের চাবি রক্ষক শায়েবী সাহেব হঠাৎ একদিন আমাকে বায়তুল্লাহ শরীফে দাখেল হওয়ার দাওয়াত দিলেন আর বললেন; আপনি যাকে যাকে খুশি সাথে নিতে পারেন। এটাকে আমি হযরত শায়খ রায়পুরী (রহ.)-এরই কারামত মনে করি। কেননা পরবর্তীকালে বার বার বায়তুল্লায় উপস্থিতির সৌভাগ্য হওয়া সত্ত্বেও এ সুযোগ আর কখনো হয়নি। এমনকি দুই-দুইবার সরকারী মেহমান হিসেবেও আয়োজন করা হয়েছিল। কিন্তু একবার প্রচন্ড ভীড়ের কারণে আর একবার বিলম্বে পৌঁছার কারণে আমি দাখিল হতে পারিনি।

এছাড়াও হযরত মাওলানা আলী নদভী (রহ.) এর গোটা জীবন এভাবে কেটেছে যে, শায়খের এবং বড়দের ইজাযত ও অনুমোদন ছাড়া কখনো কোন কাজ করেননি। এই ভেবে আত্মপ্রতারণা এবং ওয়াসওয়াসার শিকার হননি যে, এটা তো দ্বীনী কাজ, এটাতো নেক কাজ।

জামেয়া ইসলামিয়াঁ মদীনা মুনাওয়ারার মজলিসে শূরার সদস্যপদ এবং রাবেতা আলমের ইসলামী মক্কা মুকাররমার প্রতিষ্ঠা পরিষদের সদস্যপদ যে কোন বিবেচনায় অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ বিষয় ছিল। আর এ দু'টোই ছিল তার প্রতি বছর একাধিকবার বায়তুল্লায় উপস্থিত হওয়ার উপলক্ষ। তা সত্ত্বেও মহামান্য বাদশাহর পক্ষ হতে শাহী প্রস্তাব পাওয়ার পর হযরত মাওলানা আলী নদভী (রহ.) প্রথমে হযরত শায়খের পরামর্শে এবং পরে হযরত রায়পুরী (রহ.) এর ইজাযত গ্রহণ করেছেন।

হযরত মাওলানা আলী মিয়াঁ (রহ.) যখন ইচ্ছা করলেন যে, ওয়াযিফা গ্রহণ না করেই নদওয়ার খেদমত করে যাবেন এবং জীবিকার ব্যাপারে আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুলের জীবন যাপন করবেন কিন্তু নিজের ইচ্ছায় তিনি

কোন সিদ্ধান্ত নিলেন না। বরং হযরত মাওলানা ইলিয়াস (রহ.)এর খেদমতে বিষয়টি পেশ করলেন। হযরত মাওলানা ইলিয়াস (রহ.) বললেন, অমাদের অকাবিরের নীতি হল- জীবিকার বিকল্প ব্যাবস্থা না হওয়া পর্যন্ত তারা এ ধরনের পরামর্শ দিতেন না।

পরে একদিন হযরতজী (রহ.) হযরত মাওলানা আলী নদভী কে জিজ্ঞাসা করলেন, নদওয়া আপনাকে কত দেয়? তিনি বললেন, ৫৪ টাকা। এ কথা শুনামাত্র হযরতজী (রহ.) হযরতজী (রহ.) খুব জোশের সাথে বলতে লাগলেন, হযরত এমন হাজারো ৫৪ টাকাতো আপনার গোলামদেরই পায়ের তলে লুটোপুটি খাবে। এরপর হযরত মাওলানা আলী নদভী (রহ.) আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করে অযীফা নেয়া বন্ধ করে দিলেন। এর ফলাফল দুনিয়া প্রত্যক্ষ করেছে। মোটকথা শায়খের পূর্ণ ইত্তেবা ও আনুগত্যই ছিল হযরত মাওলানা আলী নদভী (রহ.) এর জীবনে কামিয়াঁবীর আসল রহস্য এবং বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

হযরত মাওলানা বলেন, "আজ আমাদের তালিবে ইলম এবং আহলে ইলম তবকায় রিজালের যে মহাদূর্ভিক্ষ এবং আদর্শ ও নমূনার যে মহা সংকট দেখা দিয়েছে তার প্রধান কারণ হল আমরা উস্তাদ শায়খ ও মুরব্বীর হাতে নিজেকে সোপর্দ করতে পারি না। আমরা নিজেদের মতের উপর নির্ভর করে চলি। তাই অনেক সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও ধীরে ধীরে আমরা হারিয়ে যাই।"

শোকরগুযারি

হযরত মাওলানা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী (রহ.) বিশ্ব জোড়া খ্যাতি অর্জন করলেও তিনি তাঁর প্রতি কেউ কোন ইহসান করলে তা কখনো ভুলতেন না। বরং বার বার তা বিভিন্ন মজলিসে পুনর্ব্যক্ত করতেন এবং আল্লাহ পাকের শোকর আদায় করতেন। তিনি নিজের ব্যক্তিত্বের অহংকার প্রদর্শন না করে বরং তার বড় হওয়ার মূলে, আল্লাহপাকের মেহেরবানী, বড় ভাই ও মায়ের তরবিয়ত এবং আসাতেযায়ে কেরামের শফকত ও মহব্বতই যে কাজ করেছে তা অকপটে স্বীকার করতেন। তার শুকরিয়া আদায় করতেন এবং অশ্রুসিক্ত হয়ে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে তার বড় হওয়ার কারণসমূহ সে দিকেই নেসবত করতেন।

==ooo==

অধ্যায়–১২

মাওলানা আলী মিয়াঁ ও দেশী-বিদেশী পুরস্কারসমূহ

হযরত মাওলানা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী জীবদ্দশায় বেশ কয়েকটি আন্তর্জাতিক ও দেশী পুরস্কার ও সম্মাননা লাভ করেন। ভারত সরকারের দেয়া একটি পুরস্কার তিনি গ্রহণ করতে অপারগতা প্রকাশ করেন। ২০০০ সালে দিল্লী হতে হযরত মাওলানা আলী মিয়াঁকে মরনোত্তর শাহ ওয়ালী উল্লাহ এওয়ার্ড দেওয়া হয়। উল্লেখযোগ্য কয়েকটি পুরস্কারের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিম্নে দেওয়া হল –

শাহ ফয়সল এওয়ার্ড (১৯৮০)

সর্বপ্রথম ও সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিল শাহ ফয়সল পুরস্কার। মুসলিম বিশ্বে ফয়সল পুরস্কারের মর্যাদা সাধারণভাবে নোবেল প্রাইজের মত। নিয়ম অনুযায়ী পুরস্কার কমিটির পক্ষ থেকে মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, ব্যক্তিত্ব ও সংস্থার নিকট এমর্মে মতামত চাওয়া হয় যে, আপনার/ আপনাদের মতে এ পুরস্কার লাভের যোগ্য কে? যার পক্ষে অধিক মতামত পাওয়া যায়, তার নামেই সিদ্ধান্ত হয়। পুরস্কারের পরিমাণ নগদ দুই লাখ রিয়াল, একটি পদক ও সনদপত্র। সনদপত্রে পুরস্কার প্রাপকের অসাধারণ কর্মকান্ড ও অবদানের স্বীকৃতি থাকে। একটি অনুষ্ঠানে এ পুরস্কার দেওয়া হয়। সৌদী বাদশাহ, যুবরাজ, মন্ত্রীবর্গ এবং বিশিষ্ট আলেম ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এতে অংশগ্রহণ করেন।

২৪শে সফর ১৪০০হিজরী, মোতাবেক ১৪ই জানুয়ারী ১৯৮০ খৃঃ থেকে ২৬ই সফর ১৪০০ হিঃ, মোতাবেক ১৬ই জানুয়ারী ১৯৮০ খৃঃ পর্যন্ত নির্বাচন কমিটির মিটিং হয় এবং পুরস্কার প্রাপকদের নামের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হয়। পুরস্কার কমিটির সভাপতি আমীর খালেদ ফয়সল ইবনে আবদুল আযীযের পক্ষ থেকে টেলিগ্রাম আসে দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামা লাখনৌতে। এতে হযরত মাওলানাকে রিয়াদে এসে উক্ত পুরস্কার গ্রহণের আমন্ত্রণ জানানো হয়। একই সাথে সৌদী আরব থেকে বেশ কয়েকটি অভিনন্দন বার্তাও আসে। সর্বপ্রথম অভিনন্দনের টেলিগ্রাম আসে শায়খুল হাদীছ হযরত

মাওলানা যাকারিয়া (রহ.)-এর পক্ষ থেকে। সৌদী রেডিও মারফত অবগত হয়ে জনৈক ভক্ত তা হযরত শায়খুল হাদীছকে অবহিত করলে তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁর পক্ষ থেকে হযরত মাওলানা নদভীকে মোবারকবাদ জানিয়ে টেলিগ্রাম করার নির্দেশ দেন। কেননা তিনি আশংকা করেছিলেন যে, মাওলানা আলী মিয়াঁ নদভী এ পুরস্কার গ্রহণে অস্বীকৃতি জানাতে পারেন। তাই টেলিগ্রামের মাধ্যমে হযরত শায়খুল হাদীছের মনোভাবের প্রতি মাওলানা আলী মিয়াঁ নদভীকে ইঙ্গিত দেওয়া হয়।

সৌদী আরব সরকারের শিক্ষামন্ত্রী শায়খ হাসান আবদুল্লাহর পক্ষ থেকে হযরত মাওলানা আলী মিয়াঁর নিকট এক বিশেষ টেলিগ্রাম আসে। তাতে তিনি হযরত মাওলানাকে এমর্মে অনুরোধ করেন যে, আপনি আমার খাতিরে পুরস্কার গ্রহণ করবেন। কিন্তু এতসব সত্ত্বেও হযরত মাওলানা আলী মিয়াঁ মনস্থির করেন যে, ডক্টর আবদুল্লাহ আব্বাস নদভীকে তাঁর প্রতিনিধি নিযুক্ত করবেন। ডক্টর নদভীই তাঁর পক্ষ থেকে পদক ও পুরস্কার গ্রহণ করবেন।

এতদুপলক্ষে পুরস্কার কমিটির সভাপতির নামে হযরত মাওলানা আলী মিয়াঁ নদভী এক পত্র প্রেরণ করেন। এতে তিনি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের পর লেখেন–উত্তম হত দ্বীনের সেবকদের পুরস্কার তাদের দুনিয়া থেকে চলে যাওয়ার পরে পাওয়া। কিন্তু আমার অজ্ঞাতসারে এ ঘোষণা হয়েছে। এখন আমার পক্ষে মরহুম বাদশাহ ফয়সল (যার সাথে এ পুরস্কার সম্পৃক্ত) এর ইসলামের মহান খেদমতসমূহের স্বীকৃতি ও সম্মানের খাতিরে এ পুরস্কার গ্রহণ না করে এবং এমর্মে দু'আ না করে উপায় নেই যে, পুরস্কার যেসব ইঙ্গিত ও তাৎপর্য বহন করে তা যেন সম্পন্ন হয়। আমি স্বয়ং উপস্থিত হতে পারছি না। আমার দ্বীনী ভাই ডক্টর আবদুল্লাহ আব্বাস নদভীকে আমি আমার প্রতিনিধি নিযুক্ত করছি। তিনি তা গ্রহণ করবেন এবং আমার পক্ষ থেকে সালাম ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করবেন।

তিনি আরো লিখলেন- এ পুরস্কারের দু'টি দিক রয়েছে। একটি হল অন্তর্নিহিত তাৎপর্য। অর্থাৎ সম্মান ও স্বীকৃতি। আমি তা শরম ও লজ্জার সাথে গ্রহণ করছি। আরেকটি হল আর্থিক দিক। অর্থাৎ এর সাথে যে নগদ অর্থ পাওয়া যাবে। এ ব্যাপারে আমি আপনাদের অনুমতি প্রার্থনা করছি যে, আমি উক্ত অর্থ নিজের বিবেচনা অনুযায়ী ইসলামের স্বার্থে ও দ্বীনী খেদমতের খাতে ব্যয় করব। ডক্টর আবদুল্লাহ আব্বাস নদভী উক্ত খাতসমূহের ঘোষণা দেবেন।

পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান হয় ১২ই ফেব্রুয়ারী ১৯৮০ রিয়াদের ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলের ফয়সল হলে রাত আটটায়। বাদশাহ খালেদ ইবনে আবদুল আযীযের ব্যক্তিগত প্রতিনিধি হিসেবে যুবরাজ ফাহাদ ইবনে আবদুল আযীয (বর্তমান বাদশাহ) অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। কয়েকজন যুবরাজ, মন্ত্রীবর্গ ও রিয়াদের গভর্ণর এতে অংশ গ্রহণ করেন। ফাহাদ ইবনে আবদুল আযীয পুরস্কার প্রদান করেন। পুরস্কার প্রাপকদের জীবনালেখ্যও পাঠ করা হয়। অনুষ্ঠানে ঘোষণা করা হয় যে, সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে ডক্টর আবদুল্লাহ আব্বাস নদভীকে নিযুক্ত করেছেন। তিনি হযরত নদভীর পক্ষে পদক, সনদ ও পুরস্কার গ্রহণ করবেন। সেমতে ডঃ আব্দুল্লাহ নদভী তা গ্রহণ করেন। তিনি হযরত মাওলানার পত্র পাঠ করে শোনালেন এবং ঘোষণা করলেন যে, পুরস্কারের অর্থের অর্ধেক আফগান শরণার্থীদের জন্য, এক চতুর্থাংশ জামায়াতে তাহফীজুল কুরআনিল কারীমের জন্য, যার তত্ত্বাবধায়ক শায়খ সালেহ কাযযায (সাবেক সেক্রেটারী জেনারেল, রাবেতা আলমে ইসলামী) এবং অপর এক চতুর্থাংশ মক্কার মাদরাসায়ে সৌলতিয়ার জন্য ব্যয় করা হবে।

একই অনুষ্ঠানে আরো একজনকে সাহিত্য ও গবেষণা কর্মের জন্য পুরস্কার প্রদান করা হয়। তিনি ছিলেন ইন্দোনেশিয়ার সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও রাবেতার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ডক্টর মুহাম্মাদ নাসের। তিনি স্বয়ং উপস্থিত থেকে পুরস্কার গ্রহণ করেন।

এ উপলক্ষে হযরত মাওলানার অজ্ঞাতসারেই দারুল মুসান্নিফীনের নাজেম সাইয়েদ সাবাহুদ্দীন আব্দুর রহমান এক সম্বর্ধনা সভার আয়োজন করেন। সম্বর্ধনার জবাবে হযরত মাওলানা তাঁর প্রথম জীবনের ঘটনা স্মরণ করেন, যখন ১৯৩১ সালে তিনি নিজ উস্তাদ আল্লামা তাকিউদ্দীন হেলালীর সাথে দারুল মুসান্নিফীনে আগমন করেছিলেন এবং যৎসামান্য সম্মানীর বিনিময়ে এখানে কাজ করার ইচ্ছা ব্যক্ত করেছিলেন। কিন্তু তখন তাঁকে উপযুক্ত বিবেচনা করা হয়নি; অথচ এখন তাঁকে সে প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকেই সম্বর্ধনা দেওয়া হচ্ছে। তেমনি দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামার পক্ষ থেকেও একটি সম্বর্ধনা সভার আয়োজন করা হয়।

কাশ্মীর ইউনিভার্সিটির সম্মানজনক ডিগ্রী (১৯৮১)

১৯৮১ সালে কাশ্মীর ইউনিভার্সিটির পক্ষ থেকে হযরত মাওলানা আবুল হাসান আলী নদভীকে ডক্টর অব লিটারেচারের সম্মানজনক ডিগ্রী প্রদান করা হয়। ১৬ই অক্টোবর ১৯৮১ হযরত মাওলানা যখন হজ্জ ও রাবেতার সভা

থেকে দেশে ফিরে আসেন তখন তিনি এ সংবাদ পান। ডিগ্রি প্রদানের তারিখ ছিল ২৯শে অক্টোবর ১৯৮১। এ ব্যাপারে জম্মু কাশ্মীরের গভর্ণর বি.কে.নেহেরু কাশ্মীর ইউনিভার্সিটির ভাইস চ্যান্সেলর অহীদুদ্দীন মালিক ও প্রফেসর আলী আহমাদ সরওয়ারের পক্ষ থেকে হযরত মাওলানার নিকট পত্র ও টেলিফোন আসে এবং অবিলম্বে সম্মতি জ্ঞাপনের অনুরোধ জানানো হয়। হযরত মাওলানা বলেন আমার জন্য এ আকস্মিক সংবাদ ছিল একেবারেই অপ্রত্যাশিত। তাই তিনি দ্বিধাদ্বন্দ্বে পড়ে যান। অতঃপর নিজের ঘনিষ্ঠজনদের সাথে পরামর্শের পর এ শর্তে সম্মত হন যে, অনুষ্ঠানটি হতে হবে নিছক একাডেমিক ও সাহিত্যকেন্দ্রিক। কোন প্রকারের রাজনীতির সাথে দূরতম সম্পর্কও থাকতে পারবে না। ইতিপূর্বে সাইয়েদ সুলায়মান নদভী, নওয়াব সদর ইয়ার জঙ্গ, মাওলানা হাবিবুর রহমান খান শিরওয়ানী ও আবদুল মাজেদ দরিয়াবাদীকে আলীগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটির পক্ষ থেকে এরূপ ডিগ্রী দেওয়া হয়েছিল। তাঁরা তা গ্রহণ করেছিলেন। হযরত মাওলানা এসব নজীর স্মরণ করেই সম্মত হয়েছিলেন। তাছাড়া তিনি চিন্তা করলেন, এই সুযোগে তিনি আধুনিক শিক্ষাবিদ, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও বুদ্ধিজিবী এবং দেশের কর্মকর্তাদের সামনে জ্ঞানী ও বিদ্বানদের সম্পর্কে নিজের মনোভাব ও পরামর্শ পেশ করতে পারবেন। একজন দায়ী হিসাবে এ সুযোগ হাতছাড়া করা তিনি সমীচীন মনে করলেন না।

২৯শে অক্টোবর ১৯৮১ কনভোকেশন হল সভাপতি ছিলেন গভর্ণর বি.কে. নেহেরু এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শেখ মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ। অনুষ্ঠানে ইউনিভার্সিটি গ্রান্টস কমিশনের চেয়ারম্যান ডক্টর মাধূরী আরশগও উপস্থিত ছিলেন তাকেও ডক্টরেট দেওয়া হয়েছিল।

এতদুপলক্ষে হযরত মাওলানা যে বক্তৃতা পেশ করেন তার শিরোনাম ছিল 'ইলম কা মাকাম আওর আহলে ইলম কি জিম্মাদারিয়া'। যেহেতু এটি ছিল বিদ্যায়তনিক অনুষ্ঠান তাই তিনি সুযোগের সদ্ব্যবহার করেন এভাবে যে, বক্তৃতার শুরুতে তিনি প্রথমে ওহীর আলোচনা করলেন, যাতে একজন উম্মী বা নিরক্ষর ব্যক্তির (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ভাষায় একটি নিরক্ষর জাতির সামনে এ সত্য ঘোষণা করা হল যে, জ্ঞানের যাত্রা শুরু করা উচিত সর্বজ্ঞ প্রজ্ঞাময় স্রষ্টার নির্দেশনা মোতাবেক। কেননা এ অভিযাত্রা অতি দীর্ঘ পথের জটিল ও দুর্গম। অতঃপর এ ওয়াহীতে কলমের কথাও ভুলে যাওয়া হয়নি। অথচ গোটা মক্কায় তা পাওয়া যেত না। ঘোষণা করা হল যে, জ্ঞান ও বিদ্যার সম্পর্ক কলমের সাথে এবং এই উম্মী নবীর (সা.) নবুওয়াত প্রাপ্তির

ফলে যে জাতির উন্মেষ ঘটবে তা কলম দ্বারা পূর্ণ সহযোগিতা নেবে। অতঃপর এ বিপ্লবী ও অবিনশ্বর সত্যও বর্ণনা করা হয়েছে যে, জ্ঞানের কোন শেষ নেই। অতঃপর তিনি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের দায়িত্বের উপর আলোকপাত করেন এবং বলেন-বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের প্রথম কাজ চরিত্র গঠন। তিনি আরো বলেন বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের উচিত নিজ শিক্ষার্থী ও স্নাতকদের এমন চরিত্র গঠন করা যে, তারা নিজেদের বিবেককে ইকবালের ভাষায়, এক মুষ্টি গমের বিনিময়ে বিক্রি করতে সম্মত হবে না। বর্তমান কালের দর্শন ব্যবস্থার মতে বাজারে প্রত্যেকটি বস্তুর নির্ধারিত মূল্য রয়েছে। কোন বস্তু যদি স্বল্পমূল্যে খরিদ করা না যায় তাহলে অধিক মূল্যে খরিদ করা যাবে। একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকৃত সাফল্য হল, তা চরিত্র গঠনের কাজ করবে। তা এমন বিদ্বান ব্যক্তি সৃষ্টি করবে যারা নিজেদের বিবেককে বিকিয়ে দেবে না– যাদেরকে বিশ্বের কোন শক্তি, কোন ধ্বংসাত্মক দর্শন, কোন অসার আন্দোলন কোন মূল্যেই খরিদ করতে পারবে না।

দ্বিতীয় কর্তব্য হলো, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ থেকে এমন যুবকরা বের হবে, যারা নিজেদের জীবনকে ন্যায়, সততা, জ্ঞান ও সৎপথের জন্য উৎসর্গ করতে প্রস্তুত থাকবে। যারা অন্যের জন্য উপোস থাকতে তেমনই আনন্দ অনুভব করবে, কেউ কেউ উদরপূর্তিতে যেমনটি অনুভব করে থাকে। যারা তাদের যৌবনের শ্রেষ্ঠ সামর্থ্য মস্তিষ্কের সর্বোচ্চ যোগ্যতা ও নিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোত্তম দান (যা তাদের ঝুলিতে ভরে দেওয়া হয়েছে) মানবতাকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য ব্যয় করবে।

উন্নত মানবীয় জীবনযাপনের মৌলিক উপায়হল খোদাভীতি, মানবপ্রেম, আত্মসংবরণের সাহস ও যোগ্যতা, ব্যক্তিস্বার্থের উপর সামষ্টিক স্বার্থকে প্রাধান্য দেওয়া অভ্যাস, মানবতার সম্মান, মানবীয় জীবন, সম্পদ, সম্মান ও মর্যাদা রক্ষার উদ্যম, প্রাপ্ত দাবীর চেয়ে দায়িত্ব পালনকে অগ্রাধিকার নিপীড়িত ও দুর্বলদের সাহায্য-সহযোগিতা, অত্যাচারী ও শক্তিমানদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের সাহস, যেসব মানুষের সম্পদ ও পদবী ছাড়া কোন পুঁজি নেই তাদের প্রতি নির্ভয়, সর্বক্ষেত্রে এবং নিজ সম্প্রদায় ও গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সত্য কথা বলার সাহস, নিজের ও অপরের সাথে আচরণে সমতা ও ন্যায় বিচার কোন সর্বজ্ঞ ও সর্বদ্রষ্টা শক্তির তত্ত্বাবধানের বিশ্বাস এবং তার নিকট জবাদিহিতা ও হিসাবের আশংকা এই হল বিশুদ্ধ সুস্থ, নিরাপদ ও সফল জীবন যাপনের মৌলিক শর্ত এবং একটি সুখী সুন্দর সমাজ ও একটি শক্তিশালী সার্বভৌম সম্মানিত রাষ্ট্রের প্রকৃত চাহিদা এবং তা রক্ষার গ্যারান্টি।

এসবের শিক্ষা এবং এজন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা বিদ্যায়তনগুলোর প্রাথমিক দায়িত্ব। এরূপ উপলক্ষসমূহে আমাদের দেখতে হবে এ দায়িত্ব সম্পাদনে আমাদের বিদ্যায়তনগুলো কতটুকু সফল এবং তা থেকে সফলতা অর্জনে আমরা কি কি পরিকল্পনা নিয়েছি, কি কি ব্যবস্থার কথা চিন্তা করেছি।

হযরত মাওলানার বক্তৃতার পর যখন গভর্ণর বি.কে. নেহরু বক্তৃতার জন্য দাঁড়ালেন, তখন তিনি বললেন আমি অনেক সনদ বিতরণ সভায় অংশগ্রহণ করেছি, কিন্তু এমন প্রেরণাদায়ক ভাষণ শুনিনি। এ ভাষণ উর্দুতে ছেপে কাশ্মিরের মুখ্যমন্ত্রী শেখ মুহাম্মাদ আবদুল্লাহর নিকট পাঠানো হলে তিনি এক জবাবী পত্র লেখেন। তাতে তিনি বলেন, উক্ত সভায় আপনার আগমন ও সুচিন্তিত উপায়ে সমকালীন সমস্যাবলীর সত্যাশ্রয়ী পর্যালোচনার প্রতিধ্বনি এখনো শোনা যাচ্ছে। ইসলামী শিক্ষার আলোকে সমকালীন জীবনের ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক জটিলতার চিত্রায়ন আপনি যেভাবে করেন, তা একমাত্র আপনারই কীর্তি" ইত্যাদি।

প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হকের পুরস্কার (১৯৮৬)

পাকিস্তানের সাবেক প্রেসিডেন্ট জেনারেল জিয়াউল হক হযরত মাওলানা নদভী (রহ.)-কে অত্যন্ত ভক্তিশ্রদ্ধা করতেন। হযরত মাওলানা তাঁর 'পুরানে চেরাগ' গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন যে, বাদশাহ ফয়সল ও প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হকের মত অন্য কোন রাষ্ট্রপ্রধানের সাথে আমার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল না। হযরত মাওলানা পাকিস্তান সফরে গেলে প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হক তাঁর সাথে সাক্ষাৎ লাভে নিজেকে ধন্য মনে করতেন। এমনকি কোন কারণে হযরত মাওলানা যদি ইসলামাবাদে না যেতে পারতেন, তাহলে প্রেসিডেন্ট নিজেই এগিয়ে এসে সাক্ষাৎ করতেন।

হযরত আল্লামা সাইয়েদ সুলায়মান নদভী (রহ.)-এর বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থ সীরাতুন্নবী (সা.)-এর সপ্তম খণ্ডের ভূমিকা লিখেছেন হযরত মাওলানা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী (রহ.)। প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হক এ ভূমিকা পাঠ করে খুবই অভিভূত হন এবং হযরত মাওলানার জন্য পাকিস্তান সরকারের পক্ষ থেকে এক লাখ রূপিয়া পুরস্কারের ঘোষণা দেন। কিন্তু হযরত মাওলানা তার চিরাচরিত রীতি অনুযায়ী প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হককে পত্র লিখে জানান যে, মেহেরবানী করে এ অর্থের অর্ধেক এ গ্রন্থের প্রকাশক দারুল মুসান্নিফীন আজমগড়কে এবং অবশিষ্ট অর্ধেক করাচীতে অবস্থানরত আল্লামা সাইয়েদ সুলায়মান নদভী (রহ.)-এর পরিবারের সদস্যদের দিয়ে দিন।

অতঃপর ১৯৮৬ সালের জুন মাসে করাচীতে হযরত মাওলানার সাথে প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হকের সাক্ষাৎ হলে তিনি হযরত মাওলানাকে বলেন– আপনি যদি পুরস্কারের অর্থ গ্রহণ করতেন, তাহলে আমি খুব আনন্দিত হতাম। হযরত মাওলানা পুনরায় তা অস্বীকার করেন।

দুবাই আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্ব পুরস্কার (১৯৯৯)

সংযুক্ত আরব আমিরাতের রাজধানী দুবাইতে প্রতি বছর রমযানুল মোবারকে বিভিন্ন ইসলামী দেশ থেকে কুরআনের হাফেযদের নির্বাচন করে ২১শে রমযান তাদেরকে দাওয়াত দিয়ে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হয়। যারা বিজয়ী হন, তাদেরকে বিরাট বিরাট পুরস্কারে ভূষিত করা হয়। তাছাড়া বাইরে থেকে যারা এতে অংশগ্রহণ করে তাদেরও সম্মান জানানো হয়। এ উপলক্ষে ইসলামী বিশ্বের কোন ব্যক্তিত্বকে নির্বাচন করে আন্তর্জাতিক পুরস্কারে ভূষিত করা হয়। এ পুরস্কার নিজ হাতে প্রদান করেন দুবাইয়ের যুবরাজ ও আরব আমিরাতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী শায়খ মুহাম্মাদ ইবনে রাশেদ।

এজন্য শায়খ মুহাম্মাদ ইবনে রাশেদ দুবাইতে একটি কমিটি মনোনীত করেছেন। উক্ত কমিটির দায়িত্ব হলো আল-আজহার ইউনিভার্সিটি থেকে শুরু করে আল-আইন ইউনিভার্সিটি পর্যন্ত আরবের সকল বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ করে তাদের মতামত নেয়া। সেমতে ১৯৯৯ খৃষ্টাব্দে সকল বিশ্ববিদ্যালয় ও ইসলামী প্রতিষ্ঠানের মতামত চাওয়া হলে সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত হয় যে, বর্তমানে ইসলামী বিশ্বের ইলমী ও দ্বীনী ব্যক্তিত্ব শায়খ আবুল হাসান আলী নদভীই এ পুরস্কারের যোগ্য। লাখনৌতে যখন এ সংবাদ পৌঁছে তখন হযরত মাওলানার শরীর খুব খারাপ। তাছাড়া রমযান মাসের কারণে তিনি সফর করতে অস্বীকৃতি জানালেন। মাওলানা তাকিউদ্দীন নদভী তখন দুবাইয়ের আল-আইন ইউনিভার্সিটির হাদীসের অধ্যাপক ছিলেন। পুরস্কার কমিটির সভাপতি ও অন্যান্য সদস্য মাওলানা তাকিউদ্দীন সাহেবকে অনুরোধ করেন যে, তিনি যেন যে কোন প্রকারে হযরত মাওলানাকে সফরে রাজী করান। সে মতে তিনি টেলিফোনে প্রথমে মাওলানা মুহাম্মাদ রাবে নদভী ও মাওলানা সায়ীদুর রহমান আজমীর সাথে এবং পরে সরাসরি হযরত মাওলানার সাথে আলাপ করে তাঁকে রাজী করান। কিন্তু ১০ই রমযানের পর হযরত মাওলানার শরীর আবার খারাপ হয়ে যায়। এমনকি রোযা রাখাও দুষ্কর হয়ে পড়ে।

হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ রাবে সাহেব পুনরায় জানিয়ে দেন যে, হযরতের পক্ষে সফর করা সম্ভব হবে না। কিন্তু পুরস্কার কমিটি মনে করল, হযরতের অনুপস্থিতির কারণে অনুষ্ঠানের শোভা নষ্ট হয়ে যাবে। তাই দুবাই সরকার বিশেষ বিমান পাঠিয়ে হলেও হযরত মাওলানাকে দুবাই নেওয়ার পরিকল্পনা করে। সেমতে ২০শে রমযান বুধবার লাখনৌ এয়ারপোর্টে বিমান এসে পৌঁছে এবং হযরত মাওলানা ও তাঁর সাথীবর্গ সেদিনই দুবাই পৌঁছেন। পরের দিন এশার নামাযের পর দুবাইয়ের এক বিশেষ হলে অনুষ্ঠান শুরু হয়। রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তা, উলামায়ে কেরাম ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এতে অংশগ্রহণ করেন। যুবরাজ নিজেও উপস্থিত ছিলেন। প্রথমে হযরত মাওলানার জীবন ও কর্ম সম্পর্কে কয়েকজন বক্তা দীর্ঘ বক্তৃতা করেন। অতঃপর যথাসময়ে হযরত মাওলানা অনুষ্ঠানে উপস্থিত হন এবং দুবাইয়ের যুবরাজ পুরস্কার ঘোষণা করেন।

হযরত মাওলানা এতদুপলক্ষে খুব সংক্ষিপ্ত অথচ ঐতিহাসিক বক্তব্য রাখেন। তিনি এ সম্মাননার জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করার পর ঘোষণা করেন যে, পুরস্কারের অর্থ দ্বীনী প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য বরাদ্দ করা হবে। এতে শ্রোতারা করতালি দিয়ে অভিনন্দন জানান। আরবদের উদ্দেশ্য করে হযরত মাওলানা বলেন– আমার জন্ম ভারতের ছোট্ট একটি পল্লীতে। আমার মাতাপিতার চেষ্টায় আল্লাহ তা'আলা আমাকে এমন অবস্থানে এনেছেন যে, আপনারা আমাকে সম্মাননা প্রদান করছেন। এজন্য আমি আপনাদের প্রতি কৃতজ্ঞ। কিন্তু আমি আপনাদের জন্য একটি বার্তা নিয়ে এসেছি যা আল্লামা ইকবালের ভাষায় –

"আরব বিশ্বের প্রাণশক্তি হলেন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম"। একথা শুনেই পুরো অনুষ্ঠানে পিনপতন নিস্তব্ধতা নেমে আসে। শ্রোতাদের চোখে পানি এসে যায়। অনুষ্ঠান শেষ হলে পরের দিন গরীব মসজিদে তিনি জুমআর নামায আদায় করেন। নামাযের আগে বিশ মিনিটের সংক্ষিপ্ত বক্তব্যও রাখেন। রাতে সুলতান ইবনে যায়দ আল-নাহিয়ান দেখা করতে আসেন এবং নিজ পিতা যায়দ আল-নাহিয়ানের সালাম পৌঁছে দেন। পরের দিন ২২শে রমযান হযরত মাওলানা তাঁর সাথীবর্গসহ লাখনৌ ফিরে আসেন।

কাবা শরীফের চাবি (১৯৯৬)

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে যখন কাউকে সম্মান ও মর্যাদায় ভূষিত করা হয় তখন তা এত বিপুল ও বিশাল হয় যে, স্বয়ং নভোমন্ডলও বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যায়; ফেরেশতারাও উক্ত মাটির মানুষ আদম সন্তানকে ঈর্ষার চোখে দেখতে থাকে। ইতিহাসের পাতায় উক্ত ঘটনার মুহূর্তগুলো স্বর্ণাক্ষরে অংকিত থাকে ।

এমন একটি ঘটনা ঘটেছিল ৮ই শাবান ১৪১৭ হিজরী, মোতাবেক ১৮ই ডিসেম্বর ১৯৯৬ বুধবার ভোরে বায়তুল্লাহ শরীফের দরজার নিকট। হযরত মাওলানা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী সৌদী আরব সরকারের দাওয়াতে রাবেতা আলমে ইসলামীর মক্কা শাখা এবং রাবেতা মসজিদ বিষয়ক আন্তর্জাতিক কমিটির মিটিং-এ যোগদানের জন্য ১লা শাবান ১৪১৭ হিজরী, মোতাবেক ১২ই ডিসেম্বর ১৯৯৬ মক্কা মুকাররমায় গমন করেন। সেখানে রাবেতার মিটিংয়ে যোগদানের পর ৮ই শাবান বায়তুল্লাহ শরীফে প্রবেশ করার জন্য উক্ত কমিটির সদস্যদের অনুমতি প্রদান করা হয়। হযরত মাওলানা এ সৌভাগ্য ইতিপূর্বে বেশ কয়েকবার লাভ করেছিলেন। তাই এবার খুব একটা আগ্রহ ছিল না। কেননা তখন তাঁর শারীরিক দুর্বলতা বেড়ে গিয়েছে; তাছাড়া অনেক ভীড় হবে, এবং ভোর সাড়ে ছয়টায় তাকে ওষুধ সেবন করতে হয়। তাই সে সময়ে তার পক্ষে ভীড়ের মধ্যে যাওয়া কষ্টকর। তথাপি তিনি চিন্তা করলেন, এ সুযোগ বার বার আসে না। বয়সের ভারে তাঁর শরীরের যে অবস্থা তাতে আর কয়বারই বা মক্কা শরীফে আসতে পারবেন তা বলা যায় না। সুতরাং তিনি যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। সঙ্গে ছিলেন উছমান সাহেব, হাজী আবদুর রাজ্জাক ও মাওলানা বেলাল হাসানী। প্রথমে তিনি অত্যন্ত ভীড়ের কারণে কাবা শরীফ থেকে একটু দূরে দাঁড়িয়ে রইলেন। অতঃপর কাবা শরীফের দরজার সাথে লাগানো সিঁড়িতে গিয়ে বসলেন। কেননা কাবার চাবিবাহক শায়বি সাহেব তখনো আসেননি। শায়বী সাহেব হলেন হযরত উছমান ইবনে তালহা (রা.)-এর বংশধর। হযরত উছমান ইবনে তালহা শায়বী (রা.)-কে স্বয়ং মহানবী (সা.) কাবা শরীফের চাবি অর্পন করেছিলেন এবং কেয়ামত পর্যন্ত তাঁর সন্তানেরা উক্ত চাবি বহন করবে বলে ঘোষণা করেছিলেন। সেমতে আজ পর্যন্ত এ পবিত্র ও সম্মানিত আমানত ও সম্মান পর্যায়ক্রমে তাঁরই বংশধরেরা বহন করে এসেছেন। মহা পরাক্রমশালী সম্রাট হোক কিংবা সাধারণ যিয়ারতকারী হোক কাবা শরীফে

প্রবেশ করতে হলে কাবা তালা ও দরজা খোলার সৌভাগ্য ও সম্মান শুধু তাদেরই হয়। কিছুক্ষণ পর শায়বী সাহেব আগমন করলেন এবং সালাম ও দু'আর পর হযরত মাওলানাকে পিছন দিক থেকে জড়িয়ে ধরে অত্যন্ত সম্মানের সাথে উপরে নিয়ে গেলেন, তখনো তিনি অনুমান করতে পারেননি যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁকে এ সৌভাগ্য ও মহা সম্মানের জন্য নির্বাচন করেছেন। সিঁড়ির শেষ প্রান্তে পৌঁছে এবং কাবা শরীফের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে শায়বী সাহেব হঠাৎ কাবা শরীফের পবিত্র চাবি হযরত মাওলানার সামনে ধরে বললেন–

أنت شيخ العالم وشيخ الحرم أيضا إفتح الباب بيدك لتبرك

একথা বলেই তিনি চাবিটি কাবার চৌকাঠের উপর রেখে দিলেন এবং হযরত মাওলানাকে দরজা খোলার জন্য ইংগিত করলেন।

সেমতে তিনি মুসলিম বিশ্বের বিশিষ্ট উলামায়ে কেরাম ও নেতৃবৃন্দের উপস্থিতিতে (যারা রাবেতার মিটিং-এ অংশগ্রহণের জন্য আগমন করেছিলেন) নিজ হাতে কাবা শরীফের দরজা খুললেন এবং সর্বপ্রথম তিনিই প্রবেশ করলেন। অতঃপর সৌদী আরবের সাবেক শাসক সৌদ ইবনে আবদুল আযীযের পৌত্র মাশআল ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে সাউদ । (যিনি অন্যতম যিয়ারতকারী ছিলেন) হযরত মাওলানাকে দু'আ করতে অনুরোধ করেন। হযরত মাওলানা দু'রাকাআত নামায আদায়ের পর সবাইকে নিয়ে দু'আ করেন। কাবা শরীফ থেকে বের হবার পর রাবেতার বিশিষ্ট উলামায়ে কেরাম তাঁকে প্রাণখোলা মোবারকবাদ দিতে থাকেন। শায়খ মুহাম্মাদ আবদুহ ইয়ামানী বলেন –

انت شيخ ا لكعبة يا ابا الحسن مبروك

আরব-অনারবের উলামায়ে কেরামও তাকে মোবারকবাদ দিতে থাকেন। ভারতীয় পত্রপত্রিকায় এটিকে ভারতের সম্মান সাব্যস্ত করে প্রতিবেদনসমূহ প্রকাশিত হয়। বিভিন্ন স্থান থেকে হযরত মাওলানাকে অভিনন্দন জানিয়ে নদওয়ায় পত্র আসতে থাকে। অনেকে কবিতাও রচনা করেন। উল্লেখ্য হযরত মাওলানাকে কাবা শরীফের চাবি প্রদানের জন্য প্রিন্স মাশআলই প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন। কেননা তিনি হযরত মাওলানার রচনাবলী অত্যন্ত আগ্রহের সাথে পড়াশোনা করতেন এবং এর ফলে হযরত মাওলানার প্রতি তাঁর অগাধ অকৃত্রিম ভক্তি ছিল।

ব্রুনাই এওয়ার্ড (১৯৯৬)

১৯৯৬ সাল থেকে ইসলামী শাস্ত্রসমূহের কোন একটি শাখায় বিশেষ অবদানের জন্য অক্সফোর্ড সেন্টার অফ ইসলামিক স্টাডিজ এর মাধ্যমে কোন ব্যক্তিত্বকে ব্রুনাই সুলতান আলহাজ্জ হাসান বলখিয়া পুরস্কার প্রদান করা হয়। ইসলামী ফেকাহের খেদমতের জন্য আল্লামা ইউসুফ কারজাভী, হাদীছ শরীফের খেদমতের জন্য আল্লামা আব্দুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ (রহ.) ও তাফসীরের খেদমতের জন্য মিসরের একজন প্রখ্যাত আলেমকে এক এক বছর এ পুরস্কার দেয়া হয়েছিল। ১৯৯৯ খৃষ্টাব্দ মোতাবেক ১৪২০ হিজরীতে ইসলামী ব্যক্তিত্বসমূহের ইতিহাস রচনা ও বিশ্লেষণে বিশেষ অবদান ও ভূমিকার স্বীকৃতিস্বরূপ হযরত মাওলানা আবুল হাসান আলী নদভীকে এ পুরস্কারের জন্য নির্বাচিত করা হয়। মার্চ মাসের দিকে তাঁর নাম নির্বাচনের ঘোষণা দেওয়া হয় এবং অক্সফোর্ড সেন্টার অব ইসলামিক স্টাডিজের সহসভাপতি ডক্টর আব্দুল্লাহ উমর নাসীফ ও ডক্টর ফারহান নেযামী টেলিফোনে হযরত মাওলানাকে সংবাদ ও অভিনন্দন জানান। পুরস্কার প্রদানের তারিখ নির্ধারিত হয় ২০শে জুলাই। ব্রুনাই গিয়ে অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে পুরস্কার গ্রহণ করাই নিয়ম। কিন্তু অক্সফোর্ড সেন্টারের দায়িত্বশীলগণ হযরত মাওলানার অসুস্থতার কথা বিবেচনা করে অনুষ্ঠানের স্থান নির্ধারণ করেননি। তারিখ নিকটবর্তী হয়ে গেলে স্বয়ং হযরত মাওলানার অবস্থানস্থল নদওয়াতুল উলামা লাখনৌকে নির্ধারণ করা হয়। এজন্য ব্রুনাইয়ের একজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও ব্রুনাই সরকারের সিনিয়র মন্ত্রী জনাব পায়হান আব্দুল আযীযকে সুলতান আলহাজ্জ হাসান বলখিয়ার প্রতিনিধি মনোনীত করা হয়। তিনি নদওয়ায় উপস্থিত হবেন বলে হযরত মাওলানাকে জানান হয়। সিদ্ধান্ত হয় যে, তিনি ২০শে জুলাই সকাল ১০টায় লাখনৌ পৌঁছুবেন। ১২টায় পুরস্কার প্রদানের অনুষ্ঠান হবে। তারপর তিনি হযরত মাওলানার সাথে দুপুরের খাবার খেয়ে আসরের সময় দিল্লী ফিরে যাবেন।

সেমতে লাখনৌতে সকল প্রস্তুতি গ্রহণ শুরু হয়ে যায়। কিন্তু হঠাৎ জানা যায় যে, ভারত সরকার তার নিরাপত্তার অজুহাত তুলে তাকে লাখনৌ যেতে আপত্তি জানায়। হযরত মাওলানার সাথে সাক্ষাত করতে কিংবা কোন সম্মানজনক অনুষ্ঠানে কোন রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের কোন ব্যক্তির আগমনে বাঁধা সৃষ্টির ঘটনা এ ছিল প্রথম। অথচ ব্রুনাইয়ের সাথে ভারত সরকারের সুসম্পর্ক ছিল। কিছুদিন যাবত সাম্প্রদায়িক ও সংকীর্ণ মনোভাবের লোকেরা হযরত মাওলানার নামে নানা দুর্নাম ছড়াতে থাকে। বিশেষ করে তখন কেন্দ্র ও

প্রদেশ উভয় স্থানে এমন ব্যক্তিরাই ক্ষমতাসীন ছিল। এজন্য তাদের নিকট এটি মোটেই পছন্দ হয়নি যে, হযরত মাওলানাকে এভাবে এ ধরণের সম্মান জানান হোক।

অথচ লাখনৌর পরিস্থিতি তখন মোটেই এরূপ ছিল না যে, একজন বিদেশী মেহমান একজন ভারতীয় মণীষীকে সম্মান জানাতে আসবেন আর তার নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবে। কেননা এ সম্মান শুধু হযরত মাওলানার ছিল না, বরং তা ভারতেরও সম্মান ছিল। এজন্য ভারত সরকারের উচিত ছিল রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ব্রুনাই সরকারের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা।

যাই হোক ব্রুনাই হাই কমিশন শেষ পর্যন্ত এ সিদ্ধান্ত করে যে হযরত মাওলানা দিল্লী গিয়ে এ পুরস্কার গ্রহণ করবেন। কিন্তু হযরত মাওলানার স্বাস্থ্য এতই খারাপ ছিল যে, তার পক্ষে দিল্লী পর্যন্ত সফর করাও সম্ভব ছিল না। তাই তিনি অপারগতা প্রকাশ করেন। ব্রুনাই হাই কমিশন তখন হযরত মাওলানার কোন নিকটাত্মীয়কে প্রতিনিধি মনোনীত করার প্রস্তাব দেন। সেমতে হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ রাবে' হাসানীর নেতৃত্বে ছয়জনের একটি প্রতিনিধি দল ১৯শে জুলাই দিল্লী পৌঁছে। ২০শে জুলাই দিল্লীর রিজেন্সি হোটেলের হল রুমে এ অনুষ্ঠান হয়। অক্সফোর্ড ইসলামিক সেন্টারের ডাইরেক্টর ডক্টর ফরহান নেযামী, ব্রুনাই ইউনিভার্সিটির ভাইস চ্যান্সেলর পায়হান আবু বকর, শায়খে আজহারী আর রহমান প্রমুখ এতে অংশ গ্রহণ করেন। ডক্টর ফরহান নেযামী উদ্বোধনী ভাষণ দেন।

অতঃপর পায়হান আবদুল আজীজ ভাষণ দেন। এতে তিনি পুরস্কারের তাৎপর্য ও উদ্দেশ্য তুলে ধরেন। তিনি নদওয়ায় উপস্থিত হতে না পারার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন এবং ভবিষ্যতে সুযোগমত নদওয়ায় উপস্থিত হবেন বলে আশা প্রকাশ করেন। অতঃপর একটি একটি করে দু'টি পদক ও পুরস্কারের নগদ অর্থের খাম মাওলানা মুহাম্মাদ রাবে' হাসানীর হাতে তুলে দেওয়া হয়। পদকে হযরত মাওলানার নাম, সুলতান বলখিয়ার নাম ও অক্সফোর্ড সেন্টারের নাম খোদাই করা ছিল। মাওলানা মুহাম্মাদ রাবে' তখন মন্ত্রী মহোদয়কে হযরত মাওলানার পত্র হস্তান্তর করেন।

সেদিনই ভারতীয় পত্র পত্রিকায় পুরস্কারের সংবাদ ছাপা হয় এবং ভারত সরকারের আচরণে ক্ষোভ প্রকাশ করা হয়। এ পুরস্কারের মূল্যমান ছিল ভারতীয় মুদ্রায় ২০ লাখ রূপী। এ অর্থ তিনি শুভানুধ্যায়ী ও দ্বীনী প্রতিষ্ঠান সমূহের জন্য দান করে যান।

==ooo==

অধ্যায়–১৩

ইন্তেকাল ও পত্রপত্রিকার মন্তব্য

জীবনের শেষ দিনগুলো

১৪১৯ হিজরী, মোতাবেক ১৯৯৯ইং সালের মার্চ মাসে কোরবানীর সময়ে হযরত মাওলানা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী স্ট্রোকে আক্রান্ত হন। তখন তা সামাল দিয়ে উঠলেও নিকটজনেরা ভাবতে লাগলেন যে, এ হলো সাময়িক সেরে ওঠা। যে কোন মুহূর্তে এ অমূল্য সম্পদ আমাদের কাছ থেকে হারিয়ে যেতে পারে। স্বয়ং হযরতও অনেক সময় ব্যথা ও দরদভরা কণ্ঠে বলে উঠতেন- "হে আল্লাহ তোমার সাক্ষাৎ চাই।" কখনো বলতেন- "এবার আমিও চলি।" "হে খোদা! খাতেমা বিল খাইর কর।" কখনো বলতেন- "হে আল্লাহ! আমাকে তোমার সান্নিধ্যে তুলে নাও- এভাবে অসহায়ত্বের সাথে আর কতদিন।" জনৈক খাদেমকে বিভিন্ন সময়ে বলতেন- "তোমাদের উপর অনেক বোঝা চাপিয়েছি- আর মাত্র কয়েকটি দিন।" কখনো বলতেন- "এবার আমি চলি- আর মাত্র ক'টা দিন, আর মাত্র ক'টা দিন।"

শাবানের শুরুতে হযরত মাওলানার খাদেম ও চিকিৎসকদের মনে যে প্রশ্নটি ঘুরপাক খাচ্ছিল তা হল- হযরত এবার রমযান মাস কোথায় কাটাবেন? ভক্তদের পীড়াপীড়ি ছিল- হযরত এবার নদওয়ায় রমযান মাসটি কাটান। অবশেষে হযরতের ইচ্ছা ও মনোভাবের উপর ছেড়ে দেয়া হয়।

তিনি বললেন- রমযানের পূর্বে রায়বেরেলী যেতে হবে। সেমতে ২৭শে শাবান তাকিয়া গেলেন। ২৮ তারিখ সেখানে অবস্থান করে তিনি অভ্যাসের ব্যত্যয় ঘটিয়ে মাওলানা সাইয়েদ বেলাল হাসানীকে বললেন- আমাকে মসজিদে নিয়ে যাও। মসজিদের আঙ্গিনায় জায়নামায বিছিয়ে দেওয়া হল। তিনি দু'রাকাআত নামায আদায় করলেন। অতঃপর মসজিদের ভিতরে গেলেন। সেখানেও দু'রাকআত নামায আদায় করলেন। অতঃপর বললেন- নদীর দিকে নিয়ে চল। সেখানে নবনির্মিত সিঁড়ি ঘাটের উপর দাঁড়িয়ে একবার চারিদিকে নজর বুলিয়ে বললেন- মাশাআল্লাহ্! মাশাআল্লাহ্!

এরপর মসজিদের পিছনের দিকে নিতে বললেন। যেখানে সাইয়েদ আহমাদ শহীদ (রহ.)-এর সময় থেকে একটি পাথর বিদ্যমান রয়েছে। কিন্তু ক্লান্ত হয়ে যাবার চিন্তায় আর সে ইচ্ছা পূরণ হল না। মসজিদ থেকে বের হতেই হযরত শাহ আলামুল্লাহ (রহ.)-এর রওযা। সেখানেই হযরতের পিতামাতা, ভাই-বোনসহ আরো অনেক বুযুর্গ চিরনিদ্রায় শায়িত রয়েছেন। সিঁড়ির পাশে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ ধরে মরহুমদের উদ্দেশ্যে সওয়াব রেসানী করলেন। এরপর সেখান থেকে ফিরে ক্লান্তি সত্ত্বেও বাড়ীর ভিতরে গেলেন। সেখানে বাড়ীর মহিলারা সকলেই সমবেত ছিলেন। সাথে হযরতের ভাগ্নে হযরত মাওলানা সাইয়েদ মুহাম্মাদ রাবে হাসানী সাহেবও ছিলেন। পনের মিনিট পর বাড়ী থেকে বের হয়ে বাংলোয় আসলেন। যোহর নামাযের পর একটু বিশ্রাম নিয়ে আসরের নামায সময়ের শুরুতেই আদায় করলেন। অতঃপর বাড়ীর ভিতরে গিয়ে পরিবারের সদস্যদের সাথে সাক্ষাৎ করলেন। তারপর লাক্ষ্ণৌ রওয়ানা হলেন।

প্রথম রমযান শুরু হলে তিনি বললেন- জানি না পুরো রমযান পাই কিনা। 'হে আল্লাহ্! তুমি পুরো রমযানের বরকত দিয়ে ধন্য কর।' তারপর তিনি বললেন- ওষুধে যা করতে পারে না, রমযানে তা সিদ্ধ হয়।

রমযানের শেষ দশক রায়বেরেলিতে কাটাবার ব্যাপারে তিনি চিকিৎসকদের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে রেখেছিলেন। ডাক্তার নজর, ডাক্তার আব্দুল মাবুদ, ডাক্তার সাইয়েদ কমরুদ্দীন ও ডাক্তার কর্নেল শামছী এ পরামর্শে শরীক ছিলেন।

২০শে রমযান ১৪২০, মোতাবেক ২৯শে ডিসেম্বর ১৯৯৯ইং বিরাট এক বহর নিয়ে রায়বেরেলী রওয়ানা হলেন। এখানে ই'তেকাফকারী লোকজনে মসজিদ ভরে গেল। প্রথমদিন তিনি জিজ্ঞাসা করলেন- মসজিদে কতজন লোক? মৌলবী সাইয়েদ বেলাল হাসানী বললেন- মসজিদ ভরে গেছে। হযরত বললেন- প্রতিষ্ঠাতার ইখলাস! শেষদিনের রাতে তারাবীহের পরে যথারীতি মজলিসে উপস্থিত থেকে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিলেন। হযরতের যেসব গ্রন্থ দামেশ্ক থেকে ছেপে এসেছিল, তা দেখে তিনি বললেন- এসব আল্লাহ তা'আলাই লিখিয়েছেন। হযরতের এক খাদেম বাইরের দেশ সফর করে এসেছিলেন। তিনি জানালেন যে, জনৈক বিত্তশালী ব্যক্তি তুরস্কের এক প্রকাশক ও অনুবাদককে সাতাইশ হাজার ডলার দিয়েছেন হযরতের সকল

রচনা প্রকাশ করে তুর্কিদের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণের জন্য। হযরত খুব আনন্দ প্রকাশ করলেন। মজলিসে العاقبة للمتقين সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বললেন- পরিণাম শুভও হয়, অশুভও হয়। শেষে প্রশ্ন করলেন- কাল কি জুম'আতুল বিদা?

অনন্ত জীবনের উদ্দেশ্যে

২২ শে রমযান ১৪২০ হিজরী, মোতাবেক ৩১শে ডিসেম্বর ১৯৯৯ শুক্রবার তিনি নিত্যদিনের মত সকল কর্মকান্ড পালন করেন। সাড়ে নয়টায় ঘুম থেকে জেগে ইস্তেঞ্জা করেন। অযু করে নফল নামায আদায় করেন। অতঃপর কুরআন শরীফ তেলাওয়াত করেন। তেলাওয়াতের সেজদাও করেন।

লাক্ষ্ণৌতে কুরআন মজীদ খতম করেছিলেন। শেষদিনে তেরতম পারা পাঠ করেন। মৌলবী সাইয়েদ জা'ফর মাসউদ হাসানী উপস্থিত হয়ে, হযরত মাওলানা তাকিয়ায় আগমন করায়, তাকিয়ার লোকজনের আনন্দের কথা তাঁকে জানান এবং বলেন, আপনি আগমন করলে এখানে বসন্তের আগমন হয়। হযরত বললেন- এ হলো তাকিয়ার বিশেষত্ব, যা ইনশাআল্লাহ অব্যাহত থাকবে। কিছুক্ষণ পর লাক্ষ্ণৌ থেকে ডাক্তার আব্দুল মা'বুদ খানও উপস্থিত হন। হযরত বললেন- এত প্রকট শীতের মধ্যেও আপনি এসে গেলেন। তিনি বললেন- আমিতো হযরতের সাথে ওয়াদা করেছিলাম। তিনি এ-ও বললেন, আমি সাথে করে অক্সিজেন ও মনিটরও নিয়ে এসেছি, যাতে হযরতের কোন কষ্ট না হয়। একথা শুনে হযরত মুচকি হাসলেন।

অনেক বছর ধরে হযরতের চুল ছাঁটতেন সাবের। তিনি এসে হযরতের চুল ছেঁটে দিলেন। অতঃপর গোসলের প্রস্তুতি নিলেন। হযরতের খাদেম যাকাউল্লাহ খান বলেনঃ গোসলখানায় যাওয়ার পূর্বে হযরত প্রশ্ন করলেন- আজ কি ২২শে রমযান? আবার বললেন- জুম'আর নামায কি পনের মিনিট দেরী করে পড়া যায়? হযরতের খাদেম আলহাজ্জ আব্দুর রায্যাক বললেন- হযরত বললে দেরী করা যাবে। সাড়ে এগারটায় গোসল খানায় গেলেন। পনের মিনিটে গোসল সেরে কাপড় পরলেন। শেরওয়ানীর বোতাম লাগিয়ে দিলেন সাইয়েদ বেলাল হাসানী। অতঃপর তিনি বললেন- তোমরা প্রস্তুত হয়ে যাও। নামায পনের মিনিট দেরী করাবে। আমি এখন সূরা কাহাফ তেলাওয়াত করব। এ সূরা তেলাওয়াতের অভ্যাস তাঁর আট বছর বয়স

থেকে। একথা বলে তিনি বিছানায় বসলেন। কিন্তু সূরা কাহাফের পরিবর্তে সূরা ইয়াসীন পাঠ করতে লাগলেন। দশ-বারো আয়াত হয়ে থাকবে। হঠাৎ করে বাকরুদ্ধ হয়ে গেলেন। আয়াতটি ছিল فبشره بمغفرة وأجر كريم। যেভাবে বসেছিলেন তা থেকে একটু পিছন দিকে হেলে পড়লেন। মৌলবী বেলাল হাসানী মাথা এবং খাস খাদেম হাজী আব্দুর রায্যাক পা ধরে খাটে শুইয়ে দিলেন। ডাক্তার সাইয়েদ কমরুদ্দীন ও ডাক্তার আব্দুল মা'বুদ খান নিকটেই ছিলেন। তারা অক্সিজেন লাগালেন। শিরায় ইন্‌জেকশন দেয়া গেল না; তাই কোমরে দেয়া হল। ডাক্তার সাইয়েদ কমরুদ্দীন বুকে একটি ইন্‌জেকশন দিলেন। হাত দিয়ে বুকে মালিশ করলেন এবং মুখ দিয়ে বাতাস দেওয়ার চেষ্টা করলেন। কিন্তু আল্লাহর পথের মুসাফির এসকল মেডিক্যাল চেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়ে নিজ প্রভুর সান্নিধ্যে গিয়ে উপস্থিত হলেন। (ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন)

তখন বারোটা বাজতে দশ মিনিট বাকী। এ শোক সংবাদ দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়ল এবং ভক্ত-অনুরক্ত, শুভানুধ্যায়ী ও স্বজনরা দলে দলে উন্মাদ হয়ে রায়বেরেলী পৌঁছাতে লাগল। মৌলবী সাইয়েদ হামযা হাসানী নদভী এই নাযুক ক্ষেত্রে গোসল, কাফন, জানাযা ও দাফনের সকল কাজ সম্পন্ন করেন।

গোসল দেওয়ার কাজে নিম্নোক্ত ব্যক্তিবর্গ অংশগ্রহণ করেন। মৌলবী সাইদ বানু নদভী যিনি (দক্ষিণ আফ্রিকা) রমযান মাস হযরতের সাহচর্যে কাটাবার জন্য এসেছিলেন। তিনি হযরতের একজন খলীফাও। খাস খাদেম আলহাজ্জ আব্দুর রায্যাক, সাইয়েদ হাসান আসকারী, তারেক সাহেব (মদীনা), মৌলবী সাইয়েদ বেলাল হাসানী নদভী, হযরতের বিশিষ্ট অনুলেখক মৌলবী নেসারুল হক নদভী, মৌলবী নেয়ায আহমাদ নদভী প্রমুখ। এ ক্ষেত্রে মাওলানা সাইয়েদ মুহাম্মাদ রাবে হাসানী নদভী, মৌলবী সাইয়েদ সালমান হুসায়নী নদভী ও মৌলবী আব্দুল্লাহ হাসানী নদভীও উপস্থিত ছিলেন। তাছাড়া খাদেম আব্দুল মুইদ প্রতাপগড়ী, মাহ্‌মুদ হাসানী, মুহাম্মাদ মুয়ায কান্ধলবী, সাইয়েদ শারেক ও খাদেম মেসবাহুদ্দীন সিদ্দীকী উপস্থিত থেকে সহযোগিতা করতে থাকেন। তাছাড়া মৌলবী সাইয়েদ হামযা হাসানী, সাইয়েদ জাফর মাসউদ হাসানী, সাইয়েদ আম্মার হাসানী এবং পরিবারের আরো অনেক সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

মাগরিবের পরে সাতটা থেকে পৌনে দশটা পর্যন্ত শেষবারের মত দেখার জন্য লোকদের ভিড় লেগে থাকে। সময় যতই এগিয়ে চলল, ততই ভিড় বাড়তে লাগল। জানাযার নামায দশটায় হবে বলে পূর্বেই ঘোষণা করা হয়েছিল। সেমতে ঠিক পৌনে দশটায় জানাযা উঠানো হয়। দু'মিনিটের পথ অতিক্রম করতে পঁচিশ মিনিট লেগে যায়। মসজিদের ভিতরে মিম্বরের পাশেই জানাযা রাখা হয়। মাওলানা সাইয়েদ মুহাম্মাদ রাবে হাসানী জানাযার নামাযে ইমামতি করেন।

সাড়ে দশটায় হযরতের লাশ মোবারক কবরে নামানো হয়। তাঁকে সমাহিত করা হয় শাহ আলামুল্লাহ কবরস্তানে। এখানে সর্বশেষ কবরের জায়গাটি তাঁর জন্যই নির্ধারিত ছিল।

হযরত মাওলানা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী (রহ.)- এর ইন্তেকালের পর বিভিন্ন সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ও পত্র-পত্রিকার বিশেষ সংখ্যা

হযরত মাওলানা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী রহমাতুল্লাহি আলাইহির ইন্তেকাল হয় ২২শে রমযান ১৪২১ হিজরী, মোতাবেক ৩১শে ডিসেম্বর ১৯৯৯ইং শুক্রবার। প্রচন্ড শীত ও আবহাওয়ার তীব্র প্রতিকূলতা অগ্রাহ্য করে প্রায় দুই লাখ মানুষ তাঁর নামাযে জানাযায় অংশগ্রহণ করে। মক্কা মুকাররমা, মদীনা মুনাওয়ারা, দুবাই, শারজা, আম্মানসহ আরও অনেক জায়গায় তাঁর গায়েবানা জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। সৌদী আরবে সরকারীভাবে খাদেমুল হারামাইন শরীফাইনের নির্দেশে মক্কা-মদীনায় "লাইলাতুল কদরে" গায়েবানা জানাযা অনুষ্ঠিত হয়।

এ ছাড়াও রাবাত, আলজেরিয়া, মৌরিতানিয়া, লিবিয়া, সিঙ্গাপুর, কুয়ালালামপুর, (মালয়েশিয়া) কাদাহ (মালয়েশিয়া) জাকার্তা (ইন্দোনেশিয়া) অষ্ট্রেলিয়াসহ পৃথিবীর বহু জায়গায় শোকসভা অনুষ্ঠিত হয়। যার বিস্তারিত বিবরণ এখানে উদ্ধৃত করা কঠিন। বিভিন্ন প্রচার মাধ্যম ও পত্রপত্রিকায় যেসমস্ত খবর বিশেষভাবে পরিবেশন করা হয়েছে শুধু তা-ই সংক্ষিপ্তভাবে নিম্নে উল্লেখ করা হচ্ছে।

লাখনৌতে অনুষ্ঠিত শোকসভা

আল্লামা নদভীর ইন্তেকালে গোটা লাখনৌতে নেমে এসেছিল শোকের ছায়া। লাখনৌর মানুষ তাদের প্রিয় মানুষকে হারিয়ে যে নিদারুণ দহনে দগ্ধ হয় তাঁর অভিব্যক্তি ঘটায় বিভিন্ন স্মরণসভার মধ্য দিয়ে।

"ইদারায়ে দারুল মুবাল্লিগীন লাখনৌর" আহ্বানে ৯ ফেব্রুয়ারী ২০০০ ইং তারিখে একটি বড় ধরনের স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার আলোচ্য বিষয় ছিল "সত্য ও ন্যায়ের দূত"। এ সভায় মাওলানা আব্দুল্লাহ আব্বাস নদভী, মাওলানা সাইয়েদ রাবে হাসানী নদভী, মাওলানা আব্দুল আলীম ফারুকী, ডক্টর মাসউদুল হাসান উসমানী প্রমুখ বিদগ্ধ ব্যক্তিগণ অত্যন্ত আবেগপূর্ণ ভাষায় মাওলানা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভীর জীবনের বিভিন্ন দিক আলোচনা করেন। বিশেষভাবে আল্লামা নদভী (রহ.)-এর জ্ঞান, প্রজ্ঞা, ইসলামের পথে মানুষকে দাওয়াত ও আহ্বান এবং আত্মশুদ্ধির প্রসঙ্গসমূহ আলোচিত হয়। এ ছাড়াও বক্তারা আরব ও বহির্বিশ্বের রাষ্ট্রপ্রধান ও ক্ষমতাধর ব্যক্তিদের সাথে মাওলানার নিঃস্বার্থ সম্পর্কের উপর বিশেষভাবে আলোকপাত করেন।

'আঞ্জুমানে মুহাম্মাদীয়া ওয়েল ফেয়ার সোসাইটি' নাজিরাবাদ লাখনৌর আয়োজনে এক বিশাল সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত স্মরণসভায় মাওলানা সাইয়েদ মুহাম্মাদ রাবে হাসানী নদভী, মাওলানা সাঈদুর রহমান আজমী নদভী, মাওলানা মুহাম্মাদ যাকারিয়া নদভী এবং ডক্টর কলবে সাদেক প্রমুখ মাওলানা আবুল হাসান আলী নদভীর আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্ব, তাঁর দাওয়াতী কাজসহ জীবনের প্রতিটি দিক নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

লাখনৌতে আরো যেসব সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে তারমধ্যে মাওলানা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী স্মরণ কমিটির উদ্যোগে বিজনৌর এলাকায়, গোলাগঞ্জের ক্রিশ্চান কলেজ মাঠে এবং ইসলামী যুব সংঘের উদ্যোগে আহমাদাবাদের জামেয়া সাইয়েদ আহমাদ শহীদ-এ ও মাওলানা মুহাম্মাদ আলী জওহর ফাউন্ডেশন মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত সভা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এসব আলোচনা সভায় "মাওলানা নদভী ও দেশ প্রেম", "সাহিত্যের দিকপাল" "হেদায়েতের পরশপাথর" ইত্যাদি আকর্ষণীয় শিরোনামে তাত্ত্বিক ও সারগর্ভ আলোচনা হয়।

আলিগড়ের আলোচনা সভা

আলিগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটির আরবী বিভাগ ২৩ এবং ২৪ শে ফেব্রুয়ারী ২০০০ ইং দুই দিনব্যাপী "মাওলানা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী (রহ.) হিন্দুস্তানের আরবী ও ইসলামী সাহিত্যের অগ্রনায়ক" শিরোনামে এক বিরাট আলোচনা সভার আয়োজন করে।

উক্ত আলোচনা সভায় দেশবরেণ্য আলেম, পন্ডিত, বুদ্ধিজীবী, কবি, সাহিত্যিক-সাংবাদিকসহ বিদগ্ধজন উপস্থিত হয়ে আল্লামা নদভী স্মরণে প্রবন্ধ-নিবন্ধ ও আবেগাকুল কবিতা পাঠ করেন। এ আলোচনায় যাঁরা অংশ নেন তাদের মধ্যে মাওলানা সাঈদুর রহমান আজমী নদভী বর্তমান নদওয়াতুল উলামার পরিচালক, ডঃ মাহমূদুর রহমান সাহেব ভাইস চ্যান্সেলর আলিগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটি, প্রফেসর কাফীল আহমাদ, ডঃ মুহাম্মাদ সালাহউদ্দিন উমরী, প্রফেসর মুহাম্মাদ রাশেদ নদভী ও প্রফেসর মুহাম্মাদ সালেম কুদওয়ায়ী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের আলোচনা সভা

আলিগড় ইউনিভার্সিটির আরবী বিভাগের উক্ত আলোচনা সভার কিছুদিন পর ৯ই আগষ্ট ২০০০ ইং তারিখে ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ আরও একটা আলোচনা সভার আয়োজন করে। দুই দিনব্যাপী এ আলোচনা সভায় হযরত মাওলানা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভীর ব্যক্তিত্ব নিয়ে আলোচনা করা হয়।

এ আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন মাওলানা নিযামুদ্দীন সাহেব জেনারেল সেক্রেটারী 'ইন্ডিয়ান মুসলিম পার্সোনাল ল' বোর্ড', মাওলানা মাসউদ আলম কাসেমী, প্রধান ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়, মুফতী যফীর উদ্দিন সাহেব দারুল উলূম দেওবন্দ, ডক্টর ইশতিয়াক হোসাইন কোরাইশী লাখনৌ, মাওলানা সাইয়েদ সালমান আল-হুসাইনী নদভী, মাওলানা আতীক আহমাদ বস্তভী, মাওলানা আবু সুবহান রূহুল কুদ্স নদভীসহ অনেক যুগশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী-গুণী-বুদ্ধিজীবী।

শোকের ছায়া দিল্লীতে

মাওলানা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভীর ইন্তেকালের পরই দিল্লীতে পয়ামে ইনসানিয়াতের উদ্দ্যোগে এক বিরাট শোকসভার আয়োজন করা হয়। ভারতের উপরাষ্ট্রপতি শ্রী কৃষাণ কান্তের সভাপতিত্বে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

মাননীয় ভাইস প্রেসিডেন্ট ছাড়াও সাবেক প্রধানমন্ত্রী ভি.পি. সিং. বর্তমান প্রধান মন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী এক জরুরী সফরে দিল্লীর বাইরে যাওয়ার কারণে তাঁর স্থলাভিষিক্ত কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মাননীয় রাজনাথ সিং এ সভায় উপস্থিত ছিলেন। নদওয়ার বর্তমান নাজেম মাওলানা রাবে হাসানী নদভী, মাওলানা আব্দুল্লাহ আব্বাস নদভী, মাওলানা আব্দুল করীম প্রমুখ বিশেষ ব্যক্তিগণ উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন।

এ ছাড়াও দিল্লী ইউনিভার্সিটি, জওহর লাল নেহেরু ইউনিভার্সিটি, জামেয়া মিল্লিয়া ইসলামিয়াঁ এবং হামদর্দ ইউনিভার্সিটির আয়োজনে শোকসভায় প্রফেসর-ছাত্র-শিক্ষক ও সাধারণ জনতার ঢল নেমেছিল ।

দিল্লীর দ্বিতীয় সেমিনার

রাবেতা আদবে ইসলামিয়াঁর দিল্লীস্থ আঞ্চলিক শাখার উদ্যোগে আরও এক সেমিনারের আয়োজন করা হয়। উক্ত সেমিনারে আলোচনা করেন দিল্লীস্থ রাবেতার চেয়ারম্যান প্রফেসর মুহাম্মাদ ইজতেবা নদভী, সহকারী চেয়ারম্যান প্রফেসর সাইয়েদ জিয়াউল হাসান নদভী, প্রফেসর শফীক আহমাদ খান নদভী। বক্তাগণ মাওলানা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী (রহ.)-কে এক আদর্শ পুরুষ হিসেবে আখ্যায়িত করেন।

এ ক্ষেত্রে জামেয়া মিল্লিয়া ইসলামিয়াঁর কনফারেন্স হলে আয়োজিত মিল্লিয়া ইসলামিক ইউনিভার্সিটির ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের আলোচনাও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এখানে বক্তব্য রাখেন খাজা হাসান সানী নেযামী, প্রফেসর নেসার আহমাদ ফারুকী, প্রফেসর জাফর আহমাদ নিযামী প্রমুখ মনীষী।

বোম্বে

২৮ শে মার্চ ২০০০ ইং তারিখে আঞ্জুমানে ইসলাম বোম্বের উদ্যোগে "মাওলানা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী (রহ.) জীবন ও কর্ম" শীর্ষক এক মনোজ্ঞ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনায় অংশ নেন মাওলানা মুহাম্মাদ সালেম কাসেমী, মাওলানা জিয়াউদ্দীন এসলাহী, মাওলানা তকীউদ্দীন নদভী মাজাহেরী, ডঃ মুহাম্মাদ ইসহাক, মাওলানা শামীম তারেক প্রমুখ মনীষী।

আওরঙ্গাবাদ

জামেয়া কাশেফুল উলূম আওরঙ্গবাদে ২৯ শে এপ্রিল ২০০০ ইং এক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। এতে মাওলানা রাবে হাসানী নদভী, মাওলানা ওয়াজেহ রশীদ নদভী, মাওলানা আব্দুল করীম পারেখ, প্রফেসর মুহাম্মাদ ইজতিবা নদভী, মাওলানা মুহাম্মাদ সালেম কাসেমীসহ আরও অনেক আলেম ও বুদ্ধিজীবী উপস্থিত ছিলেন।

রায়বেরেলি

রায়বেরেলির ন্যাশনাল ইন্টার কলেজে মাওলানা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে মাওলানা মুহাম্মাদ রাবে হাসানী নদভী, মাওলানা আব্দুল করীম, মাওলানা কলবে সাদেক, মাওলানা আব্দুল্লাহ মুগিসীসহ অনেকে বক্তৃতা করেন।

কলকাতা

কলকাতায় মাদরাসা দারুল উলূমের উদ্যোগে মাওলানা আলী মিয়াঁ নদভীর ইন্তেকালের পর বিশেষ সিম্পোজিয়াম অনুষ্ঠিত হয় কলকাতা মুসলিম ইন্সটিটিউট হলে। এতে মাওলানা সাঈদুর রহমান আজমী নদভী, মাওলানা আবু মাহফুযুল করীম মা'সুমী বলেন- "আল্লামা নদভীর গোটা জীবন ও জীবনের প্রতিটি দিক ব্যতিক্রমী বৈশিষ্ট্যে ভরপুর। তাঁর প্রতিটি কাজে মুসলিম উম্মাহর প্রতি এক নীরব আহ্বান আর বার্তা নিহিত। আজ জাতির এই ক্রান্তি কালে আল্লামা নদভীর আদর্শ ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দেয়ার প্রয়োজন।" অনুষ্ঠানে আরও অনেকে বক্তৃতা করেন।

কাশ্মীর

কাশ্মীরের শ্রীনগরে আঞ্জুমানে নসরতে ইসলামের উদ্যোগে মওলভী মুহাম্মাদ উমর ফারুকের তত্ত্বাবধানে এক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।

দেরাদুন

দেরাদুন শহরের ইসলামী যুব সংঘের উদ্যোগে মাওলানা আলী মিয়াঁ নদভীর স্মরণে "তিনি ছিলেন আদর্শ মহীরুহ" শীর্ষক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

আন্তর্জাতিক অঙ্গনে শোকের প্রকাশ

নেপাল

নেপালের জামেয়া নূরুল ইসলাম জলপাপুরে এবং জামেয়া নূরুল উলূমে পৃথক দুটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। এতে মাওলানা আবুল হাসান আলী নদভীর ইসলামী চেতনা সম্পর্কে আলোচনা হয়।

আমিরাত

৮ই জুন ২০০০ ইং তারিখে 'আবনায়ে নদওয়া ফাউন্ডেশন' দুবাইয়ে "হযরত মাওলানা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী জীবন ও কর্ম" শীর্ষক আলোচনা সভা সাইয়েদ খলীলুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে দুবাইয়ের উলামা, শিক্ষক, ব্যবসায়ীসহ সর্বমহলের নদভী ভক্তদের এক বিরাট দল উপস্থিত ছিলেন।

বাংলাদেশ

বাংলাদেশে মাওলানা আলী মিয়াঁর ইন্তেকালের খবর পৌঁছানোর পর কয়েক জায়গায় গায়েবানা জানাযা অনুষ্ঠিত হয় এবং পরবর্তীতে বাংলাদেশস্থ 'মাওলানা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী একাডেমীর' উদ্যোগে মাওলানা সুলতান যওক নদভী, মাওলানা সালমান ও মাওলানা আবু সাঈদ মুহাম্মাদ ওমর আলীর ব্যবস্থাপনায় এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। জাতীয় প্রেস ক্লাবের এ অনুষ্ঠানে দেশবরেণ্য ব্যক্তিগণ বক্তব্য রাখেন।

জাতীয় সীরাত কমিটি বাংলাদেশের উদ্যোগে কমিটির চেয়ারম্যান মাওলানা মুহিউদ্দীন খান ও খন্দকার রঈস উদ্দিনের প্রচেষ্টায় এক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয় এবং আল্লামা নদভী (রহ.) স্মারক নামে একটি বই প্রকাশিত হয়। এছাড়াও বাংলাদেশস্থ রাবেতা আল-আদাবিল ইসলামীর উদ্যোগে "আল্লামা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী (রহ.) জীবন ও অবদান" শীর্ষক এক মনোজ্ঞ আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন মাওলানা সুলতান যওক নদভী।

মালয়েশিয়া

মালয়েশিয়ায় হযরত আল্লামা নদভীর ইন্তেকালের খবর পৌঁছার সাথে সাথে রাজধানী কুয়ালালামপুরসহ বিভিন্ন শহরে শোকের ছায়া নেমে আসে। কুয়ালালামপুর, তরঙ্গানো, কাদাহ, ক্লিন্টন, জাযিরাসহ বেশ কয়টি শহরে

গায়েবানা জানাযা এবং বিভিন্ন শহর-বন্দরে দ্বীনী সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। মাওলানা আবুল হাসান আলী নদভীর উপর এ স্মরণসভার ধারাবাহিকতা অনেক দিন পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। বিভিন্ন শহরে একাধিক স্থানে বিভিন্ন শিরোনামে মাওলানা আলী মিয়াঁ নদভী (রহ.) স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। তারমধ্যে ২৭ শে রমযান, ১৪২১ হিজরীতে মা'হাদুত্ তারবিয়াতিল ইসলামিয়াঁ কাদাহ, কুয়ালালামপুর ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির হায়ার স্টাডিজ এবং মালয়েশিয়ান যুবকদের বিখ্যাত সংগঠন ইসলামী যুব আন্দোলনের (ABIM) উদ্যোগে ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসের আলোচনা সভা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এসব অনুষ্ঠানে আন্ত র্জাতিক ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত হয়ে বক্তব্য পেশ করেন। একটি স্মারক গ্রন্থও প্রকাশ করা হয়।

ইন্দোনেশিয়া

ইন্দোনেশিয়ার রাজধানী জাকার্তাসহ বিভিন্ন শহরে হযরত মাওলানা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভীর গায়েবানা জানাযা এবং স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়।

থাইল্যান্ড

থাইল্যান্ডেও বড় বড় মসজিদে আল্লামা নদভীর গায়েবানা জানাযা ও স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়।

পাকিস্তান

পাকিস্তানের করাচি, লাহোর, ফয়সলাবাদ, গুজরানওয়ালা, ইসলামাবাদ, আকুড়াখটক, কোয়েটা, পেশওয়ার, হায়দারাবাদসহ বিভিন্ন শহর-বন্দরে শোকসভা অনুষ্ঠিত হয়। যার বিস্তারিত রিপোর্ট বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। রাবেতা আলমে ইসলামীর পাকিস্তান দফতরের উদ্যোগে ইসলামাবাদ ও লাহোরে বিশেষ সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।

ইসলামাবাদে জাতীয় ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগেও আর একটি গুরুত্বপূর্ণ সিম্পোজিয়ামের ব্যবস্থা করা হয়। এতে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট রফীক তারারসহ সেদেশের লেখক-গবেষক, সাহিত্যিক সাংবাদিকগণ অনেক মূল্যবান বক্তব্য পেশ করেন।

মিশর ঃ

রাবেতা আদবে ইসলামীর মিশর শাখা "ইসলামী সাহিত্যে মাওলানা আবুল হাসান আলী নদভী" শীর্ষক এক সেমিনারের আয়োজন করে। এতে আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর আব্দুল হালীম আবিস উপস্থিত ছিলেন। তিনি তাঁর বক্তব্যে বলেন, "হযরত মাওলানা নদভী (রহ.) পন্ডিত, আলেমে দ্বীন, উচ্চতর গবেষক, প্রজ্ঞাবান চিন্তাবিদ-বুদ্ধিজীবী, দার্শনিক এবং উঁচুমানের একজন লেখক ছিলেন।

মিশরস্থ নদওয়ার ছাত্রদের উদ্যোগে পৃথক আরও দুইটি স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। এ ছাড়াও মিশরের বিভিন্ন শহরে স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়।

দক্ষিণ আফ্রিকা

দক্ষিণ আফ্রিকায় শায়খুল হাদীছ হযরত মাওলানা যাকারিয়া (রহ.)-এর নামে প্রতিষ্ঠিত দারুল উলূম যাকারিয়ায় হযরত মাওলানা আবুল হাসান আলী নদভীর উপর এক স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন মাওলানা মুহাম্মাদ রাবে হাসানী নদভী। আল্লামা নদভী স্মরণে আয়োজিত এই সম্মেলনে দারুল উলূমের মুফতী জনাব জিয়াউল হক সাহেবের রচিত একটি কবিতা এ মাদরাসার ছাত্ররা অত্যন্ত আবেগপূর্ণ ও সুললিত কণ্ঠে পাঠ করে হযরত নদভী (রহ.)-কে শ্রোতাদের হৃদয়ে পৌঁছে দেয়।

যুক্তরাজ্য

যুক্তরাজ্য মুসলিম কমিউনিটি ফোরাম ৩০ শে জুলাই ২০০০ ইং তারিখে হযরত মাওলানা নদভীর উপর এক স্মরণসভার আয়োজন করে। এতে আমেরিকা, ইউরোপ, আফ্রিকা ও এশিয়ার বেশ ক'টি দেশের জ্ঞানী-গুণী, বুদ্ধিজীবী, সাহিত্যিক-সাংবাদিক-কলামিস্টসহ বহু ভক্ত জমায়েত হন এবং মাওলানা নদভীর উপর বিশ্লেষণমূলক আলোচনা পেশ করেন।

উত্তর ইংল্যান্ডের বাটলে (Batley) শহরে ২৪ শে জানুয়ারী ২০০০ইং তারিখে একটি গুরুত্বপূর্ণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে মাওলানা মুহাম্মাদ ইয়াকুব কাসেমী আল্লামা নদভী (রহ.)-এর জীবন বৃত্তান্ত আলোচনা করেন। তিনি বলেন, হযরত নদভী (রহ.)-কে আল্লাহ তা'আলা অসাধারণ যোগ্যতার অধিকারী করেছিলেন। দ্বীনের প্রতি তাঁর অকৃত্রিম আন্তরিকতা, একনিষ্ঠতা এবং দ্বীনের স্বার্থে সমস্ত কিছু বিসর্জন দেয়ার মত মন-মানসিকতা তাঁর মধ্যে কানায় কানায় পূর্ণ ছিল।

এ সভায় বক্তব্য দিতে গিয়ে হযরত মাওলানা আতিকুর রহমান সম্ভলী বলেন- মরহুম মাওলানা এমন এক বক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন যে, যে ব্যক্তিই তাঁর সান্নিধ্য ও আকীদা-বিশ্বাসের পরশ পেয়েছে সে বহু মূল্যবান বস্তু পেয়েছে। এ ছাড়াও দেশে-বিদেশে তাঁর স্মরণে বহু সভা-সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

বিশেষ সংখ্যা

হযরত মাওলানা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী (রহ.) ইন্তেকাল করলে অত্যন্ত বেদনা বিধুর ভাষায় বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় খবর প্রকাশিত হয়। ইন্ডিয়ান রেডিও, টিভিতে বিশেষ গুরুত্বের সাথে এ সংবাদ প্রচার করা হয়। তাঁর বর্ণাঢ্য জীবন এবং কর্মের উপর যেসকল পত্রপত্রিকার বিশেষ সংখ্যা এবং স্মারক গ্রন্থ প্রকাশ করা হয় তারমধ্যে ভারতসহ পার্শবর্তী দেশের কয়েকটা পত্রিকার কথা নিম্নে উল্লেখ করা হচ্ছেঃ

নদওয়াতুল উলামা থেকে আরবী পত্রিকা আল-বা'ছুল ইসলামী এবং আর-রায়েদ, উর্দু পত্রিকা তা'মীরে হায়াত ও ইংরেজী পত্রিকা FRAGRENCE OF EAST বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করে।

আঞ্জুমানে শাবাবে ইসলাম লাখনৌর মাওলানা সাইয়েদ সালমান আল হাসানী নদভীর তত্ত্বাবধানে "বাঙ্গেদারা", লাখনৌ থেকে "আল ফুরকান", মাসিক "রিজওয়ান"(উর্দু) হায়দারাবাদ থেকে প্রকাশিত আরবী পত্রিকা "আস্-সাহওয়াতুল ইসলামিয়াঁ," দারুল উলূম দেওবন্দ থেকে প্রকাশিত "আদ-দায়ী" (আরবী) পাক্ষিক "আশ্শারেক" (আজমগড় থেকে প্রকাশিত), "নাওয়ায়ে আদব বোম্বে", কাশ্মীরের মাসিক "নুসরাতুল ইসলাম", দিল্লী থেকে প্রকাশিত "নয়ী দুনিয়া", "আল-জমিয়ত", "আফকারে মিল্লী", মিল্লী ইত্তেহাদ" এবং জয়পুর থেকে প্রকাশিত "হেদায়াত", গাজীপুরের "তাযকীর" ভাটকল থেকে প্রকাশিত "নকশে নাওয়ায়েত" "আল-আরমাগানে জামেয়া", "আয্-জহরাহ", আহমাদাবাদ থেকে প্রকাশিত "সওতুল কুরআন" ইত্যাদি ইন্ডিয়ান পত্রিকা হযরত মাওলানা মরহুম নদভী (রহ.) স্মরণে বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করে।

এ ছাড়াও পার্শবর্তী দেশের বিভিন্ন পত্রপত্রিকা বিশেষ পাতা প্রকাশ, প্রবন্ধ, জীবন চরিত নিয়ে ব্যাপক আলোচনা করে। পাকিস্তানের "আল-ফারুক", "আল-বালাগ", "তামীরে আফকার", "খতমে নবুওয়াত", "তাকবীর", "ইয়ানাত", "আনওয়ারে মদীনা", "হক চার ইয়ার", "আল-হক", "আন্-নসীহাহ", "আস-সিয়ানাহ", "তরজমানুল কুরআন" ইত্যাদি পত্রিকা বিশেষ প্রবন্ধ, জীবনী ও অন্যান্য বিষয়ে বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করে।

এমনিভাবে বাংলাদেশে দৈনিক "ইনকিলাব", "দৈনিক সংগ্রাম" ও "মাসিক মদীনা" এ উদ্দেশ্যে বিশেষ প্রবন্ধ প্রকাশ করে। এ ছাড়াও হিন্দুস্তান, পাকিস্তান, বাংলাদেশসহ এশিয়া ও মধ্যপ্রাচ্যের প্রায় দেশগুলোর পত্রপত্রিকা হযরত আল্লামা নদভী (রহ.) স্মরণে বিশেষ নিবন্ধ প্রকাশ করে। আল্লাহ তাদের শ্রম স্বার্থক করুন এবং আল্লামা নদভীর ব্যক্তিত্ব ও চিন্তা-চেতনায় জীবন গড়ার তাওফীক দান করুন।

==ooo==

অধ্যায়–১৪

ইরশাদাত ও মালফুযাত

হযরত মাওলানা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী (রহ.) ছিলেন একই সাথে সুবিখ্যাত আলেমে দ্বীন, গবেষক, সাহিত্যিক, আবার অত্যন্ত উঁচু মার্গের আধ্যাত্মিক বুযুর্গ। তাই তাঁর বাণী ও ভাষায় পাওয়া যেত প্রজ্ঞা, গভীর চিন্তা ও তত্ত্ব, তেমনি তাতে রূহানিয়াতের নূর নিহিত থাকত। এখানে তার মুখনিঃসৃত কতিপয় অমূল্যবাণী উল্লেখ করা হল।

পৈত্রিক নিবাসের বৈশিষ্ট্য

তাকিয়ায়ে শাহ্ আলামুল্লাহ রায়বেরেলীর বৈশিষ্ট্য এবং উক্ত স্থানের সাথে আল্লাহওয়ালা ও বুযুর্গানে দ্বীনের সম্পর্ক বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, এখানকার মৌলিক বৈশিষ্ট্য চারটি– (১) ইত্তেবায়ে সুন্নাত (সুন্নাত অনুসরণ) (২) এ'লায়ে কালিমাতুল্লাহ (দ্বীন সমুন্নত রাখা) (৩) তাওহীদে খালেস (নিখাদ তাওহীদ) (৪) এহইয়ায়ে সুনান (সুন্নাত পুনরুজ্জীবন)।

কুরআনের মাধ্যমে শিক্ষাজীবনের সূচনা ঃ

হযরত আলী মিয়াঁ নদভী (রহ.) বলেন, পবিত্র কুরআন পাঠের মধ্য দিয়েই আমার শিক্ষা জীবনের বিসমিল্লাহ হয়। আমার লেখায় কোথাও কোথাও উল্লেখ করেছি যে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাকে এমন উস্তাদের নিকট পড়ার সৌভাগ্য দান করেছিলেন, যিনি ঈমান ও কুরআনের আলোয় উদ্ভাসিত ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তিনি কুরআন পড়তেন আর অঝোরে কাঁদতেন। সর্বপ্রথম তিনি আমাকে যে তেলাওয়াত শুনিয়েছেন তা ছিল কেবলই আবেগময়। আমার বড় সৌভাগ্য যে, আমার জীবনের প্রথম শিক্ষকই ছিলেন বিনম্র ও কোমল চিত্তের। আমার প্রতি তাঁর ছিল গভীর আন্তরিকতা। তিনি হচ্ছেন শায়খ খলীল আরাবী।

হযরত মাওলানা (রহ.) **আমার কুরআন অধ্যয়ন** নামে একটি প্রবন্ধে এ বিষয়ে বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি বলেন, "আমি বাল্যকালে মুসলিম সমাজে প্রচলিত রেওয়াজ অনুযায়ী নাযেরা কুরআন শরীফ পড়ি। কুরআন শরীফ পাকা হয়ে যাবার পর তেলাওয়াত করতে থাকি। কিন্তু বড়দের শত

তাগাদা সত্ত্বেও তার উপর দৃঢ়পদ থাকতে পারিনি। আমার আরবী শিক্ষার কার্যক্রম শুরু হলে এবং অল্প-স্বল্প আরবী বুঝতে শিখলে কুরআন পাকের আয়াতসমূহ কিছু কিছু অনুধাবন করতে শিখি।

আমার শ্রদ্ধেয় উস্তাদ খলীল ইবনে মুহাম্মাদ আরব (রহ.)-এর ছিল কুরআনের প্রতি দারুণ আগ্রহ। সেকালে আমাদের মসজিদেই তিনি অধিকাংশ সময় ফজরের নামায পড়াতেন। তাঁর বংশ পরম্পরা আরবের ঐ গোত্রের সাথে সম্পৃক্ত, যাদের সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে, "তোমাদের কাছে ইয়ামানবাসী এসেছে। তাঁরা নরম দিল, কোমল অন্তরের অধিকারী"। হয়তো আল্লাহ তা'আলা তাঁকে সেই কোমলতা ও আবেগের একটি বিরাট অংশ দিয়েছিলেন। তিনি কুরআন তেলাওয়াতের সময় ব্যাকুল হয়ে পড়তেন এবং নিস্তেজ হয়ে যেতেন। অজান্তেই চোখ থেকে বয়ে যেত অশ্রুধারা। তাঁর সত্তা ছিল আবেগে ভরপুর। বড়ই করুণ আওয়াজ ও আবেগাপ্লুত সুরের ছিল তাঁর তেলাওয়াত। আমার আজও খুব ভাল করে স্মরণ আছে, শেষ দিকের পারাগুলো থেকে ফজরের নামাযে একটি বড় সূরা দিয়ে আরম্ভ করতেন। তাঁর কিরাআতের মধ্যে কান্না তাঁকে সূরা শেষ করতে দিত না। সূরা শেষ করার সুযোগ তাঁর খুব কম এসেছে। শ্রোতাদের হাজারো আফসোস থেকে যেত তাঁর তেলাওয়াতের প্রতি। কেননা তারা বঞ্চিত হতেন এক মধুর কিরাআত থেকে।

আমার কুরআন শিক্ষার যাত্রা তাঁর কাছেই। শায়খের উপর তাওহীদের বড়ই প্রাধান্য ছিল। তিনি নিজে যেমন পরিচ্ছন্ন আকীদার অধিকারী ছিলেন, তেমনি স্বীয় ছাত্রদেরও সেই আকীদা রাখার ব্যাপারে জোর দিতেন। এটি আল্লাহর মহান অনুগ্রহ আর এহসান যে, তিনি এমন শুদ্ধ আকীদার অধিকারী ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে অধ্যয়নের সুযোগ দিয়েছিলেন।

সূরা যুমার- যা আকীদা ও তাওহীদ সম্পর্কিত বিষয়ের প্রতি পরিষ্কার ও জোরালো শিক্ষা দেয়, সেই সূরা যুমার ছিল তাঁর একান্ত প্রিয় ও নির্বাচিত সূরা। আরবী সম্পর্কে আমরা যখন কিছু বুঝতে শুরু করি, তখন এই সূরা দিয়েই তিনি আমাদের পড়ানো শুরু করেন। তারপর পর্যায়ক্রমে সূরা মু'মিন ও সূরা শূরা পড়ান। হযরত আরব সাহেব (রহ.)-এর স্বনির্বাচিত কিছু প্রিয় রুকু ছিল, যা তিনি অত্যন্ত আবেগ ও আগ্রহ নিয়ে পড়াতেন। তার মধ্যে সূরা

আলে-ইমরানের শেষ রুকু ছিল অন্যতম। এই রুকু সম্পর্কে হাদীছ শরীফে বর্ণনা এসেছে যে, নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) শেষ রাতে তাহাজ্জুদের উদ্দেশ্যে জাগ্রত হলে নামায পড়ার আগেই এই রুকু পড়ে নিতেন।

এমনিভাবে সূরা ফুরকানের শেষ রুকুও ছিল তাঁর সেই নির্বাচিত রুকুগুলোর মধ্যে আরেকটি। আজো কানের পর্দায় তাঁর শ্রুতিমধুর আবেগ মিশ্রিত কণ্ঠ ধ্বনিত হয়। আরব সাহেব (রহ.)-এর মুখে এই রুকু শুনতে শুনতে আমার তা ভালরূপে মুখস্থ ও সাথে সাথে অন্তঃস্থ হয়ে গিয়েছিল। এমনিভাবে কুরআন মজীদের সাথে গড়ে উঠল আমার এক অন্যরকম সম্পর্ক।

আরবী সাহিত্যের আনুষ্ঠানিক পঠনপর্ব যখন আমার সমাপ্ত হল, তখন কুরআন পাক তেলাওয়াত করে আমি এক অন্তঃস্থ আত্মার সন্ধান পাই। আমার পরিবারে তখন এমন কিছু ঘটে গেল, যেগুলোকে কুরআন পাকের স্বয়ং তাফসীর বলেই মনে হতো। আর বাস্তবিক পক্ষে তা-ই এবং এটা পরিষ্কার বুঝা যেত যে, আল্লাহ তা'আলার বিধানাবলী বিশ্বজনীন। সামষ্টিক ও জাতীয় ব্যাপারে উত্থান-পতনে তার ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের বিরাট দখল রয়েছে।

এটা সঠিক যে, তখন কুরআন পাক তেলাওয়াত করেই খুব ভাল করে অনুভব করতাম যে, এটি সাধারণ কিছু নয়। এ যেন এক জীবন্ত কিতাব। তাতে বর্ণিত হয়েছে জীবন্ত মানুষদেরকে নিয়ে বহু কিছু। যাদের কীর্তি-কাহিনী কুরআন জানিয়েছে, তারা সকলেই যেন জীবন্ত আত্মার ধারক। কুরআন এক দর্পণ, যেখানে মানুষ দেখতে পায় আপন সত্তার স্বরূপ, যেখানে সে খুঁজে পায় নিজেকে। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

"আমি তোমাদের নিকট ঐশীগ্রন্থ অবতীর্ণ করেছি যা তোমাদের আলোচনা সম্বলিত।" তাফসীরকারক আলেমগণ এই আয়াতের বহু ব্যাখ্যা পেশ করেছেন। তার মধ্যে একটি চমৎকার ব্যাখ্যা এই যে, আমি তোমাদের উপর এমন কিতাব নাযিল করেছি যাতে তোমাদের নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে বিশিষ্ট তাবেয়ী হযরত আহনাফ ইবনে কায়েস (রহ.) একদা এই আয়াত অন্যকে পড়তে শুনলেন। শুনেই বলে উঠলেন, বল দেখি, কুরআন শরীফে কোন আয়াতে আমাকে নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে? কিছু

পাতা উল্টানোর পর একটি আয়াত পড়ে থেমে গেলেন তিনি। বলে উঠলেন, "পেয়ে গেছি আমি আমার কথা। আমার নিজের সন্ধান পেয়েছি আমি এই মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের মধ্যে।" সেই আয়াতটি ছিল–

"আর কোন কোন লোক রয়েছে যারা নিজেদের পাপ স্বীকার করেছে, তারা মিশ্রিত করেছে একটি নেককাজ ও অন্য একটি বদকাজ। শীঘ্রই আল্লাহ হয়তো তাদের ক্ষমা করে দিবেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ ক্ষমাশীল, করুণাময়।"

আমার কাছে এ কথা খুব অকাট্যরূপে প্রমাণিত হয়েছিল যে, এই অনন্য অদ্বিতীয় পুণ্যগ্রন্থে এদিকে যেমন বর্ণিত হয়েছে জাতি-গোষ্ঠী নির্বিশেষে সকলের ইতিবৃত্ত, অপরদিকে তাদের সাহসের অভাব ও জ্ঞানের সীমাবদ্ধতার দরুন বিভিন্ন গোষ্ঠীর ইতিহাস-ইতিবৃত্ত অজানা থেকে যায়। আর আমার পরিচিতিও পরিষ্কার দৃশ্যমান হতো নিজস্ব মহলেই। এই আত্মিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে আমার একদিকে যেমন কুরআন শরীফের সাথে সম্পর্ক বর্ধিত হয়, তেমনিভাবে তার মাঝেই প্রকৃত সুখের সন্ধান পেয়ে যাই। আমি তখন সূরা মায়েদা, আনআম এক ভিন্ন আগ্রহ নিয়ে পড়তাম।

আমার শিক্ষা জীবনের গতিধারা অন্যদের তুলনায় ছিল একটু ভিন্ন প্রকৃতির। আমার শিক্ষা কার্যক্রমে আমি একটি বিরাট সুযোগকে কাজে লাগিয়েছিলাম। সেই সুযোগকে শুধু সুবর্ণ সুযোগ বলেই চুপ থাকতে চাই না; বরং আমি তাকে আখ্যা দেই এক ঐশীদান হিসাবে। আর সেটি হল–

আমি আমার ছাত্র জীবনে একটি করে বিষয় আলাদাভাবে পড়েছি। একই সাথে বিভিন্ন ধরনের বিষয় পড়ার সুযোগ আমার হয়নি। সুচিন্তাশীল অভিভাবক আল্লামা আরব সাহেব (রহ.) সর্বপ্রথম আমার আরবী সাহিত্যের পর্ব সেরে দেন। সে বিষয়ে পূর্ণতা অর্জন করতে পেরে আল-মুতাআলাতুল আরাবিয়ার মত পুস্তিকা থেকে শুরু করে নাহজুল বালাগাহ, হামাসা ও দালাইলুল ইজাযের মত উচ্চাঙ্গের গ্রন্থাবলী একাধারে তিন বছর তিনি আমাকে পড়ান এবং আরবী সাহিত্য ও তার আনুষঙ্গিক বিষয়াবলী আয়ত্ত করে নেই।

সুরুচিসম্পন্ন যোগ্য উস্তাদের সার্বিক ও সার্বক্ষণিক সান্নিধ্যের বরকতে এবং দিনরাত সাহিত্যের মধ্য দিয়ে কাটানোর মাধ্যমে অল্প কিছু দিনের মধ্যে আরবী ভাষার সাথে আমার গড়ে ওঠে এক অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক। ফলে এ ভাষার সূক্ষ্ম কথার সূক্ষ্মতা বুঝতে বেগ পেতে হতো না, সকল সূক্ষ্মতা সহজে

বুঝে আসত। যার ফলে কুরআনের অলৌকিকতা আমার কাছে প্রকাশ পেল। আর সেই অলৌকিকতা পূর্ণরূপে অনুধাবন করতে লাগলাম। দ্বিতীয় কোন দলীলের প্রয়োজনতো পড়তই না, বরং কুরআনে কারীমের প্রতিটি শব্দই সাক্ষ্য দিত যে, এটি বিধাতার মুখনিঃসৃত বাণী।

সমগ্র জগতের অনিশ্চয়তাও তার মধ্যে অণু পরিমাণ সন্দেহ সৃষ্টি করতে অক্ষম। আরবী সাহিত্য চর্চার এই দান অসাধারণ বৈকি? এর ফলে কুরআন মজীদের প্রকৃত স্বরূপ বুঝে পড়তে শিখেছি। পুণ্যবাণীর সাহিত্য ভান্ডার আমার সম্মুখে উন্মোচিত হয়েছিল; উন্মোচিত হয়েছিল অতি পরিষ্কারভাবে। এই অপুর্ব ও অলৌকিক দানের কৃতজ্ঞতা হুযুরের নিকট কিভাবে প্রকাশ করি তা চিন্তা করে বুঝে আসে না। তাঁর প্রতি আমি চিরকৃতজ্ঞ।

আমার দৃষ্টিতে আমাদের মাদরাসাগুলোতে আরবী সাহিত্য চর্চার বর্তমান পদ্ধতির মাধ্যমে এ ধরনের ফলাফল ও যোগ্যতা অর্জন আশা করা যায় না। সাহিত্যের ধরন বুঝতে হলে, লালিত্যের স্বরূপ বুঝতে হলে এবং সাহিত্যের ক্ষেত্রে সুরুচি সৃষ্টি করতে হলে, আদি যুগের প্রাণহীন-চমকহীন অলঙ্কারশাস্ত্রের কিতাবাদি সম্পুর্ণরূপে পরিত্যাগ করতে হবে। ভাষা সম্বন্ধে উচ্চাঙ্গের ধারণা সৃষ্টি করতে এই পুরানো বইপত্র ব্যর্থ। এই সমস্ত মধ্যযুগীয় বইপত্রের রচনাকাল ছিল আরবী ভাষার অধঃপতনের সময়। এ জাতীয় বইপত্রের উপর ভিত্তি করে একেতো কুরআনে অলৌকিকতা অনুধাবন অসম্ভব, তার উপর কুরআনে কারীমে বর্ণিত আল্লাহর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ইঙ্গিতবাহী বাণীর মর্ম উদ্ধার দুষ্করই বটে। তবে দু'এক ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম তো থাকবেই।

হযরত আরব (রহ.)-এর কাছে নির্ধারিত সিলেবাস সমাপ্ত করার পর আল্লামা তাকীউদ্দীন হিলালী মারাকেশী (রহ.)-এর সঙ্গলাভের সৌভাগ্য হয়। তিনি ছিলেন সে যুগের আরবী সাহিত্য ও ব্যাকরণের মহাপণ্ডিতদের অন্যতম। আরবী সাহিত্যের পর আমি কিছু ফিকাহ তথা ইসলামী আইনশাস্ত্র নিয়ে অধ্যয়ন করে অবশেষে দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামাতে মাওলানা হায়দার হাসান খান সাহেব (রহ.)-এর তত্ত্বাবধানে দুই বছর হাদীছশাস্ত্র অধ্যয়ন শেষ করি। তখনই হযরতের কাছে তাফসীরে বায়যাবীর কিছু অংশ পড়ে নেই। হযরত ছিলেন দরসে নেযামীর অত্যন্ত দক্ষ ও বিজ্ঞ শিক্ষক। কিছু দিনের জন্য লাহোরে গিয়ে আমি হযরত মাওলানা উবায়দুল্লাহ সিন্ধী (রহ.)-এর সুযোগ্য ছাত্র হযরত মাওলানা আহমাদ আলী (রহ.)-এর তাফসীর ঘন্টায় শরীক

থাকতাম। তিনি কুরআনের ভিত্তিতে রাজনীতি বিষয়ক আলোচনা বেশী করতেন। যা থেকে আমি খুব একটা উপকার লাভ করতে পারিনি। কিন্তু হুযুরের শিষ্টাচার, তার জগৎবিরাগী চরিত্র আমার মধ্যে বিরাট পরিবর্তন সাধন করেছিল।

লাহোর থেকে ফিরে এসে এবং দাওরায়ে হাদীছ পাস করার পর সম্পূর্ণ সময় তাফসীর অধ্যয়নের মধ্যেই কাটাতে শুরু করি। শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াঁ ও হামীদুদ্দীন ফারাহী (রহ.)-এর তাফসীর দিয়ে অধ্যয়ন শুরু করি। তখন থেকে সর্বক্ষণ পুরাতন তাফসীর গ্রন্থগুলো পড়তে শুরু করলাম। আর এক গ্রন্থ পড়ে মনে যে প্রশ্ন জাগত তার উত্তর খুঁজে পেতাম অন্য গ্রন্থে। তখন আমি 'তাফসীরে জালালাইন', আল্লামা বগভী (রহ.)-এর বিশদ তাফসীর গ্রন্থ 'মাআলিমুত তানযীল' ও আল্লামা যামাখশারী (রহ.)-এর 'কাশশাফ' গ্রন্থ শব্দ শব্দ করে পড়ি। আল্লামা নাসাফী (রহ.)-এর 'মাদারেক' এর প্রায় অর্ধেক আমার স্মরণ মোতাবেক শব্দে শব্দে পড়েছি, আর অর্ধেক মোটামুটি দেখেছি। ধারাবাহিকতার সাথে তাফসীর গ্রন্থাবলী অধ্যয়নের মাধ্যমে যে দারুণ অভিজ্ঞতা অর্জন করি, তা হল যে কোন একটি গ্রন্থ অধ্যয়নের মাধ্যমে মন ভরে না। মানুষের বুদ্ধিতে আল্লাহ তা'আলা কত হাজারো বৈচিত্র্য দেখিয়েছেন যে, সামান্য নির্বোধের মাথায় যে প্রশ্ন জাগে তা অনেক ক্ষেত্রে বিজ্ঞ নদের মনে উদয় হয়নি। আমার মনে অনেক সময় দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়েছিল, সন্দেহ হয়েছিল যার জবাব কোন বড় তাফসীর গ্রন্থে খুঁজে পাইনি। কিন্তু কোন পুস্তিকা কিংবা কোন টীকায় তার জবাব পেয়ে গেছি।

তাফসীরের সাথে সবচেয়ে বেশী সম্পর্ক হয়, যখন আমি দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামাতে পড়ানোর সুযোগ লাভ করি। তখন গভীর মনোনিবেশের সাথে অধ্যয়ন করতাম। আল্লামা আলূসী (রহ.)-এর রূহুল মা'আনী থেকে প্রচুর উপকার লাভ করি। 'তাফসীরে কাবীর' সম্পর্কে আজকাল যত বদনাম শোনা যায়, আসলে সেটা বাড়াবাড়ি বৈ কিছুই নয়। কেউ কেউ তো বলেই ফেলেন যে, তাফসীরে কাবীরে তাফসীর ছাড়া সবই আছে। আমি পড়ে লক্ষ্য করেছি, কিছু অতিরিক্ত কথা থাকলেও প্রচুর কাজের কথা রয়েছে তাতে। এমন বিরল বিষয় সন্নিবেশিত হয়েছে তাতে, যা সচরাচর অন্য কিতাবে পাওয়া যায় না। আজকালকার তাফসীর দেখার সুযোগ হয়েছে বটে, কিন্তু মনে দাগ কাটতে পারেনি। আল্লামা আবু হাইয়ান (রহ.)-এর

তাফসীরুল মানারটি বেশ পড়ার মত। আধুনিক বিষয়াদির সমাবেশ হয়েছে তাতে। জুম'আল কিতাবটি মাদরাসার শিক্ষানীতি ও সিলেবাসের প্রতি লক্ষ্য রেখে রচিত হয়েছে বিধায় মাদরাসার ছাত্রদের জন্য বিশেষ উপযোগী। ইরাবুল কুরআন থেকেও বেশ সহায়তা আমি লাভ করেছি।

সেকাল পর্যন্ত আল্লামা আব্দুল মাজেদ দরিয়াবাদী (রহ.)-এর তাফসীর বেশী প্রসিদ্ধি লাভ করতে পারেনি। পুরাতন ইতিহাস গ্রন্থ ইত্যাদি পড়ে অনেক বিষয়ে প্রশ্ন জাগলে সেগুলো নিরসনের উদ্দেশ্যে দরিয়াবাদ যেতাম। সেখান থেকে বহু উপকারী বিষয় শিখতে পেরেছি। সে বিষয়গুলো তাফসীরে মাজেদীতে ছড়ানো-ছিটানো আছে। তাফসীরে মাজেদী পাঠকের জন্য বড় উপকারী কিতাব।

শিক্ষকতার জীবন পেরিয়ে নিজ প্রয়োজনে বহু সময় অনেক তাফসীর অধ্যয়ন করেছি। যখন তাফসীরে তাবারী পড়ে আমার চোখ খুলে গেল, তখন বুঝতে পারলাম যে, এটি শুধু একটি তাফসীর গ্রন্থই নয়; বরং ইতিহাস ও সাহিত্যের একটি পাঠাগার তুল্য। এটিকে কাছে পাওয়া বিরাট নেয়ামতই বটে। জাহেলী যুগের আরবী বর্বরতা, আকায়েদ শাস্ত্র ইত্যাকার বিষয় সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট ধারণা জন্মাবার জন্য এর চেয়ে নির্ভরযোগ্য কিতাব আর নেই।

আর একটি মহামূল্যবান গ্রন্থের নাম উল্লেখ না করলেই নয়। এটি সবিস্তারে লেখা কোন বিরাট তাফসীর গ্রন্থ নয়, কিন্তু কুরআন বুঝার জন্য একটি অতুলনীয় গ্রন্থ। তাফসীর অধ্যয়নকারীর জন্য এটি একটি বিরাট উপহার। এটি হল শাহ আব্দুল কাদের (রহ.)-এর তরজমা। এই মহামূল্যবান গ্রন্থটি তাদেরই উপকারে আসবে যারা তাফসীর শাস্ত্রের বিস্তারিত ও উচ্চাঙ্গের গ্রন্থাবলী অধ্যয়ন করেছেন এবং এগুলো পড়ে এ কথা বুঝেছেন যে, বড় তাফসীরবিদগণও অনেক ক্ষেত্রে কুরআন পাকের সঠিক মর্ম উপস্থাপন করতে গিয়ে সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন। এই সমস্ত কিতাব অধ্যয়ন শেষে যদি কেউ শাহ সাহেব (রহ.)-এর তরজমা পড়ে, তবে সে বুঝতে পারবে তিনি কত সুন্দর ও সুচারুরূপে এই সমস্ত বিষয়ের সমাধান দিয়েছেন। তিনি মর্ম বর্ণনা করতে গিয়ে উর্দূ ভাষায় যেসমস্ত শব্দ ব্যবহার করেছেন, তাতে মনে হয় এলহামের মাধ্যমেই এই ব্যাখ্যা তিনি পেশ করেছেন।

এই কিতাবে বহু মূল্যবান তথ্য ছড়ানো ছিটানো আছে। আমাদের উস্তাদ মাওলানা হায়দার হাসান খান বলেন, "মাযাহেরে উলূম সাহারানপুর মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা আল্লামা মুহাম্মাদ মাযহার নানুতবী (রহ.) সমস্ত তাফসীর গ্রন্থ পড়ানোর শেষে শাহ সাহেব (রহ.)-এর এই তরজমা ছাত্রদের পড়াতেন।

আমার এই দীর্ঘ অভিজ্ঞতার সাথে আর একটি বিষয় যোগ হয়েছে তা হল, কুরআন পাকের সঠিক মর্মের দ্বার যখন উন্মুক্ত হয়, তখন পাঠক এই কালামের পরশে কথোপকথন করতে পারবে, এই কালামের কথকেরই সাথে। কিন্তু তার উপায় হলো, বেশী করে কুরআনে পাক তেলাওয়াত করা আর নফল ইবাদত করা। এই কুরআনের মাধ্যমেই সে আনন্দ ও প্রশান্তি অনুভব করবে। সাথে সাথে সে গড়ে তুলবে কুরআনের সাথে এক হৃদ্যতাপূর্ণ গভীর সম্পর্ক, যার ফলে সে অবশেষে অনুভব করবে আমি যেন এক মহান সত্তার সাথে আলাপরত।"

আল্লামা সাইয়েদ সুলাইমান নদভী ও কুরআনী জ্ঞান

মাওলানা আলী মিয়াঁ নদভী বলেন- সাইয়েদ সুলাইমান নদভীকে মানুষ একজন ঐতিহাসিক ও জীবনীকার হিসেবে জানত, খুব বেশি হলে একজন দার্শনিক। কিন্তু আমার মতে তিনি শুধু ভারত নয়, গোটা উপমহাদেশে এমন কোন ব্যক্তিত্ব আমার দৃষ্টিগোচর হয়নি, যার কুরআন অধ্যয়ন তাঁর মত এত ব্যাপক ও গভীর ছিল। তাঁর তুলনা শুধু তিনিই। তাঁর কুরআনের সেই গভীর জ্ঞান থেকে উপকৃত হবার সৌভাগ্য আমার হয়েছে।

কুরআনের গুরুত্বপূর্ণ দিক

কুরআনে কারীমের দু'টি দিক রয়েছে। (১)-এর পঠন-পাঠন (২) তাবলীগ বা প্রচার। কুরআনে এমন আকাইদ বর্ণিত রয়েছে যার উপর ঈমান আনা প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য জরুরী; কুরআন বোঝা জরুরী এবং কুরআনকে (কুরআনের বিধি-বিধান) আঁকড়ে ধরাও জরুরী। এ মর্মে কুরআনের ভাষ্য ঃ "কুরআন সুস্পষ্ট আরবী ভাষায় অবতীর্ণ।" কুরআনের অন্যত্র আরো স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে, কুরআনকে আমি উপদেশ গ্রহণকারীদের জন্য সহজবোধ্য করে দিয়েছি।"

কুরআন সবার জন্য

তিনি বলেন, আমার লেখার ভিত্তি হলো কুরআন, সীরাতে নববী (রাসুলের জীবনী) ও ইতিহাস। ইসলামের ইতিহাসকে আমি কুরআনের তাফসীর মনে করি। ইতিহাসের পরে আমি সাহিত্য দ্বারা উপকৃত হয়েছি। কুরআনে সবার জন্য সব বিষয়ের অবতারণা করা হয়েছে। এটি প্রত্যেকের জন্য এক একটি এ্যালবামের মত। এতে সকলের জন্য দিক-নির্দেশনা রয়েছে।

প্রিয় রচনা

একবার হযরতকে জিজ্ঞেস করা হলো, আপনার রচনাবলীর মধ্যে কোনটি আপনার বেশি প্রিয়। তিনি বললেন, প্রথমতঃ السيرة النبوية 'নবীয়ে রহমত', দ্বিতীয়তঃ ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين-এর মাধ্যমে গোটা আরব বিশ্বে সর্বপ্রথম আমার পরিচিতি এবং প্রচার-প্রসার লাভ হয়। এরপর অন্যান্য মহলে এটা গৃহীত হয় এবং ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয় ও প্রসার লাভ করে। সীরাতে সাইয়েদ আহমাদ শহীদ গ্রন্থখানার মাধ্যমে ভারতবর্ষে আমার পরিচিতি লাভ হয়। তাবলীগী মহলে বইটিকে সুদৃষ্টিতে দেখা হয়। এছাড়াও হযরত আশরাফ আলী থানভী (রহ.)-এর প্রশংসা করে সুদীর্ঘ বক্তব্য দিয়েছেন, যা পরবর্তীতে সংকলিত হয়েছে। হযরত মাওলানা হোসাইন আহমাদ মাদানী (রহ.) এটির প্রশংসা করে একখানা বই লিখেছেন। মাওলানা সাইয়েদ সুলায়মান নদভী (রহ.) এ সম্পর্কে দীর্ঘ একটি ভূমিকা লিখেছেন যা সাহিত্যগুণে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের দাবিদার।

নদওয়াতুল উলামা

হযরত মাওলানা আবুল হাসান আলী নদভী বলেন, আমি সারা বিশ্ব ঘুরে দেখেছি। ইউরোপের শিক্ষাকেন্দ্রগুলো দেখেছি। আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় দেখেছি। আমি আত্মপ্রীতি কিংবা হেয়তাবোধের কারণে নয়, বরং আমার অধ্যয়ন ও অভিজ্ঞতার আলোকে বলছি– নদওয়ার চেয়ে উঁচু চিন্তাধারা কোন প্রতিষ্ঠানের নেই। নদওয়ার চিন্তাধারা কালজয়ী ও কল্যাণকর। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা নদওয়াকে কবুল করেছেন এবং বহাল রেখেছেন। হাজী ইমদাদুল্লাহ মোহাজেরে মক্কী (রহ.) নদওয়া আন্দোলনের ভবিষ্যত সম্পর্কে বড় আশাবাদী ছিলেন এবং

তিনি এর জন্য আল্লাহর কাছে দু'আও করেছিলেন। এ সাফল্য মাওলানা মুহাম্মাদ আলী মুঙ্গেরী (রহ.)-এর ইখলাছ ও লিল্লাহিয়াতেরই ফসল। তিনি একজন খোদাপ্রেমী ছিলেন। আল্লাহ তাঁকে এবিষয়ে সঠিক চিন্তাধারা ও পরিকল্পনা দান করেছিলেন।

নদওয়া ঃ মুজাদ্দেদী ও ওয়ালীউল্লাহী দরসগাহ

আল্লামা নদভী বলেন, দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামা ভারত বর্ষের দু'জন বিরল ব্যক্তিত্বের প্রাতিষ্ঠানিক চিন্তার উপর প্রতিষ্ঠিত। এক, হযরত শায়খ আহমাদ সেরহিন্দী মুজাদ্দেদে আলফে ছানী; দুই, হাকীমুল ইসলাম শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলভী (রহ.)। মূলতঃ তাদের চিন্তাধারা ছিল অনুসরণীয় ও অনুকরণীয়। জ্ঞান ও চিন্তা-চেতনার বিপ্লবের ক্ষেত্রে এ দু'জন ছিলেন অগ্রনায়ক ও মাপকাঠি। দারুল উলূম নদওয়া এই দুই ব্যক্তির অনুসৃত পথেই আছে। তাদের দাওয়াত ও চিন্তাধারার মৌলিক বৈশিষ্ট্য আঁকড়ে ধরে আছে। ইসলাম সম্পর্কে নদওয়া সাহাবায়ে কেরাম, ইমাম চতুষ্টয়, মুজাদ্দিদ এবং মুসলিহীনের আক্বীদা পোষণ করে।

দ্বিতীয় বিষয় হচ্ছে দ্বীনের প্রসার এবং তৃতীয় বিষয় যা ছিল তাদের বিশেষ বৈশিষ্ট্য; তা হল দ্বীনের ব্যাপারে সহযোগিতা ও দ্বীনের মর্যাদা রক্ষা করা। দ্বীনের বিপরীতে ও বিরুদ্ধে কোন কাজ ছিল তাদের সহ্যের বাইরে।

নদওয়ার বৈশিষ্ট্য

আলী মিয়াঁ নদভী তাঁর এক বক্তৃতায় বলেন, অধ্যয়নের মধ্যে গভীরতা, প্রশস্ততা, ব্যাপকতা ও বৈচিত্র্য থাকা আবশ্যক। এসব বৈশিষ্ট্যগুলোর দ্বারা নদওয়া বৈশিষ্ট্যমন্ডিত ও স্বাতন্ত্র্য।

আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের চিন্তা

সাহিত্যিকদের এক বিশেষ বৈঠকে হযরত মাওলানা আবুল হাসান আলী নদভী দু'টি বিষয় আলোচনা করেন– (এক) লেখালেখি, (দুই) অধ্যয়ন ও জ্ঞানার্জন। এ আলোচনায় তিনি বলেন, লেখনী ও বক্তৃতার মাধ্যমে পরিচিতি উদ্দেশ্য না হওয়া উচিত, বরং এগুলোর মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন উদ্দেশ্য হওয়া দরকার। আল্লাহর দ্বীন প্রচার-প্রসারের জন্য নিজের লেখনী

ক্ষুরধার করা প্রয়োজন, তেমনিভাবে বিদ্যার্জনের উদ্দেশ্য মহান প্রভুর সাথে সম্পর্ক জোরদার করা উচিত। এজন্যই কুরআনে বলা হয়েছে– اقرا باسم ربک الذي خلق – পড় তোমার প্রভুর নামে, যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন।

সাহিত্য চর্চার প্রয়োজনীয়তা

সাইয়েদ নদভী বলেন, দ্বীন প্রচারকদের উচিত প্রথমেই সাহিত্য চর্চা করা। এতে তার মধ্যে এমন উদ্দীপনা সৃষ্টি হবে যাতে করে সে অভিনব পদ্ধতিতে যুগোপযোগী লেখনীর মাধ্যমে আধুনিক শিক্ষিত নতুন প্রজন্মের নিকট দ্বীনের দাওয়াত পৌঁছাতে সক্ষম হবে। ধর্মীয় মহলে এ বিষয়টির বড় অভাব। এর ফলে যখন তারা দ্বীনী কোন বিষয়ের উপর টপিক লেখে তাতে না থাকে কোন প্রভাব-শক্তি, না থাকে কোন আকর্ষণ। তাই নতুন প্রজন্মকে প্রভাবিত করতে তারা ব্যর্থ হয়। দ্বীনের দায়ীরা দ্বীনের শিক্ষা অর্জনের পর সাহিত্য শিখলে তাতে জনসাধারণের উপর যথেষ্ট পরিমাণ প্রভাব পড়বে। এতে যথেষ্ট উপকারও হবে। তবে এ ক্ষেত্রে লেখকের লেখায় নিম্নোক্ত যথার্থতা থাকতে হবে-

كلموا الناس على قدر عقولهم

অর্থাৎ শ্রোতার ধারণক্ষমতা অনুযায়ী তাদের কাছে বক্তব্য পেশ করতে হবে।

সাহিত্য, দাওয়াত ও দ্বীন এই তিনটির মধ্যে সম্পর্ক কায়েম থাকা প্রয়োজন। শায়খ আবদুল কাদের জিলানী, আল্লামা ইবনে জাওযির মত আত্মসংশোধনকারী অলীআল্লাহগণও সাহিত্যের উপর গুরুত্বারোপ করেছেন। তাদের উস্তাদগণের অনেকে আদব পড়েছেন বলে উল্লেখ রয়েছে।

সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সাহিত্য ও অন্যান্য রাষ্ট্রের সাহিত্য

ডাঃ মাওলানা সাইয়েদ জিয়াউল হাসান নদভী বর্ণনা করেন, একবার হযরত মাওলানা আলী মিয়াঁ বলেন, কম্যুনিষ্ট সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোর সাহিত্য ও অন্যান্য সরকার ব্যবস্থার সাহিত্যের মধ্যে তুলনামূলক বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোর সাহিত্যের বিষয়বস্তু প্রভাব বিস্তারের দিক থেকে অবান্তর ও আকর্ষণহীন। এ দু'প্রকার সাহিত্যের পার্থক্য স্থূলবুদ্ধির ব্যক্তিরাও বুঝতে পারে।

একবার এক ছাত্র সাইয়েদ নদভীর নিকট জিজ্ঞেস করল, ইংরেজী সাহিত্যে গল্প, উপন্যাস ও নাটক সম্পর্কিত সাহিত্যের জন্য 'কাল্পনিক' পরিভাষা (Fiction) ব্যবহৃত হয়। এই Fiction শব্দ আভিধানিক অর্থেই মিথ্যা, বানোয়াট ও অলীক গল্প-কাহিনীর ক্ষেত্রে শোভা পায়। তাহলে কি আমরা বলতে পারি যে, ইংরেজী এবং ইউরোপীয় সাহিত্যের ভিত্তি মিথ্যা ও প্রতারণার উপর প্রতিষ্ঠিত?

এ প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, না, এটা নিছক সাহিত্য এবং সাহিত্য বিষয়ক পরিভাষা। Fiction সাহিত্য এক প্রকার সাহিত্যের উদাহরণ মাত্র, এর উপর মিথ্যা, প্রতারণা ইত্যাদি বিশেষণ প্রয়োগ অর্থহীন। আসমানী ওহীর মধ্যেও এরকম উদাহরণ ও বিশ্লেষণ আনা হয়েছে।

মন ও মস্তিষ্কের মধ্যে ব্যবধান

মন ও মস্তিষ্কের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করতে গিয়ে মাওলানা নদভী বলেন, মস্তিষ্কের বিশ্বাস নানাবিধ, কিন্তু মনের বিশ্বাস একটি। মস্তিষ্ক ইংরেজী জানে, ফ্রান্স, আরবী, ফার্সী, সংস্কৃত ভাষা জানে, তুখোড় বক্তৃতা দিতে পারে, সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিষয় বিশ্লেষণের মাধ্যমে বের করতে পারে, দর্শন বিষয়ক অতি দীর্ঘ বিতর্ক করতে পারে। আর মনের বিশ্বাস একটি। সে ন্যায় বিচার জানে, আন্তরিকতা জানে। কিন্তু দর্শন তার বোধগম্য নয়। সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ সে বুঝে না। সায়েন্স, লজিক দিয়ে সে বুঝতে চায় না। হ্যাঁ, তবে আল্লাহর নামে আহ্বান করলে সে জেগে উঠবে। তাঁর নামের দোহাই দিলে সে আত্মোৎসর্গ করতেও প্রস্তুত।

মনকে একবার জাগিয়ে তুলতে পারলে, একবার কল্যাণের পথে চালিত করতে পারলে, একবার মানব দরদ সৃষ্টি করতে পারলে দ্বিতীয়বার কোন প্রকার কল্যাণের অনুভূতি তার থেকে বিন্দুমাত্র তিরোহিত হবে না। চাই তা মধ্যস্থতার ক্ষেত্রে হোক, রুচির ব্যাপারে হোক, শৃংখলা কিংবা সম্পদের ক্ষেত্রে হোক।

আল্লাহ ওয়ালাদের আছর ও বরকত

তিনি বলেন, আমার বিশ্বাস এবং বিশেষ অধ্যয়ন আমাকে এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করে যে, (পৃথিবীর) যেখানে যতটুকু দ্বীনের কাজ হয়েছে তা আহলে হকগণ করেছেন, অথবা তাঁদের তত্ত্বাবধানে এবং তাঁদের দু'আ ও

আন্তরিক প্রচেষ্টার বরকতে হয়েছে। দ্বীনের প্রতিষ্ঠা ও উন্নতি আহলে কুলুবদের সাথে সংশ্লিষ্ট।

তাসাওউফ কি?

মাওলানা আবুল হাসান আলী নদভী (রহ.) কোন এক সেমিনারে বলেন, তাসাওউফের (আত্মশুদ্ধির) সার সংক্ষেপ হচ্ছে– সকাল-সন্ধ্যা আমরা অপরিকল্পিতভাবে ও হিসাব ছাড়া যেসব কাজ করি তা পরিকল্পনাধীন করতে হবে এবং হিসাবের গন্ডিতে আবদ্ধ করে কাজ চালিয়ে যেতে হবে। তাহলে তাসাওউফের একটা মৌলিক ভিত্তি আমাদের হৃদয়ে সৃষ্টি হবে এবং এর গুরুত্ববোধ আমাদের অন্তরে জাগ্রত হবে। যেমন লবণের কোন ক্ষমতা নেই নোনতা হবার, চিনির কোন ক্ষমতা নেই মিষ্টি অনুভূত হবার এবং পানির কোন সাধ্য নেই পিপাসা মিটাবার। (এসব কিছুই আল্লাহর নিয়ন্ত্রণাধীন)

তাওয়াক্কুল

আল্লাহর অদ্বিতীয় সত্তার প্রতি তাওয়াক্কুল করার জন্য দৃষ্টি আকর্ষণ করে তিনি বলেন, পবিত্র কুরআন অধ্যয়ন করে এবং বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে বলা যায় যে, امر بالصلوة (নামাযের আদেশ) বজায় রাখা ও তা কায়েমের মাধ্যমে পৃথিবীতে রিযিক বা জীবিকার অধিকার জন্মে।

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার দায়ীর (দ্বীনের পথে আহবায়ক) প্রতি বে-রহম হন না এবং তাদের অভূক্ত রাখেন না; বরং তাদের মাধ্যমে হাজার হাজার লোক রিযিক পায়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, জঙ্গলে এক বাঘে শিকার ধরে আর হাজারও বন্য প্রাণী তা আহার করে। হযরত নিযামুদ্দীন আওলিয়া, মাজাহেরে উলূমের শায়খুল হাদীছ ও হযরত হুসাইন আহমাদ মাদানী (রহ.)-এর দস্তরখান যারা দেখেছে তারা বুঝতে পারে কিভাবে এক বাঘের শিকারে গোটা জঙ্গলের অন্যান্য প্রাণীকুল আহার করে।

শিশুদের প্রতি উপদেশ

একদা তিনি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা দিতে গিয়ে বলেছিলেন– অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, শৈশবের স্বপ্নগুলো ভবিষ্যতে মানুষের জীবনে বাস্তবে রূপায়িত হয়। আল্লাহ শৈশবের নিস্পাপ অবস্থাকে

অত্যন্ত পছন্দ করেন, তাই শিশুদের কামনাগুলোকে পরবর্তী জীবনে কোননা কোনভাবে পূর্ণ করে দেন।

তাই আমি শিশুদের উদ্দেশ্যে বলছি– তোমরা বড় বড় আকাঙ্ক্ষা কর। সুন্দর সুন্দর ইচ্ছা করে খোদার কাছে প্রার্থনা কর যে, ইসলামের মশালকে উর্ধ্বে তুলে ধরবে, দ্বীনের একনিষ্ঠ দায়ী হবে। আল্লাহর ওলী ও তাঁর মাকবুল (নৈকট্য প্রাপ্ত) বান্দা হবে বলে আকাঙ্ক্ষা পোষণ কর। বর্তমান সময় বিস্ময় ও আফসোসের।

আজ আমরা হতাশা ও বিস্ময়ের সম্মুখীন

এক আলোচনা সভায় ভাষণ দিতে গিয়ে মাওলানা নদভী বলেন, শিক্ষার প্রসার যত বেশী হচ্ছে মানুষের দৃষ্টিও তত খুলে যাচ্ছে এবং সবাই শান্তির পরিবর্তে হতাশা ও বিস্ময় এবং আনন্দের পরিবর্তে দুঃখ ও নিরানন্দতা প্রত্যক্ষ করছে। আর একারণে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন–

لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا و لبكيتم كثيرا-

"আমি যা জানি তোমরা যদি তা জানতে তাহলে কাঁদতে বেশী, হাসতে কম।"

একটু চিন্তা করুন, যদি কোন এক দুর্বল বৃদ্ধের সুস্থ ও সুঠাম দেহের যুবক সন্তান থাকে, নাতি-পুতি ইত্যাদি থাকে তাহলে লোকে তাকে দেখে কেমন ঈর্ষা করবে? বলবে, কি সৌভাগ্য তার! আল্লাহ তাকে নির্ভরযোগ্য আশ্রয় দিয়েছেন। সে ব্যক্তি নিজেও আত্মতৃপ্তি লাভ করবে, কারণ সে যে বাগান লাগিয়েছিল তা আজ ফুলে-ফলে সুশোভিত।

কিন্তু ঐ ব্যক্তি তখনই প্রচন্ড আঘাত পাবে যখন দেখবে তার অন্তিমকালে তাকে এক ফোঁটা পানি এগিয়ে দেয়ার মত কাউকে কাছে দেখবে না। আজ আমাদের অবস্থা বৃদ্ধের এই সন্তানদের মত। ইসলাম আজ আমাদের দিকে তাকিয়ে আফসোস করে বলছে– এত লোকের (আলেমের) মধ্যে যদি সামান্য কয়েকজনও কাজের হত তাহলে সেই অল্প সংখ্যকই না কত ভাল ছিল!

ইসলাম বলছে, সবাই আমার নামে মানুষকে আহ্বান করছে। কিন্তু তাদের কাজ একনিষ্ঠভাবে এবং ইসলামের জন্য সামান্যই হচ্ছে। আল্লাহর শুকরিয়া যে, মানুষের ভবিষ্যতের বিষয় অজানা এবং তাদের দোষ সম্পূর্ণ

গোপন। মানুষ যদি অন্তর্দৃষ্টি পেত তাহলে তাদের চোখ দেখতে পেতো যে, পৃথিবীটা দুর্বলতা, অসম্পূর্ণতা, কলুষতা আর পাপ-পঙ্কিলতায় ভরে গেছে। সবাই জাঁকজমক ও ঝলমলে পোশাক পরে হিংস্র পশুর ন্যায় বিচরণ করছে।

বড় রোযা ছোট রোযা

তিনি বলেন, রোযা দুই প্রকার– (এক) বড় রোযা, (দুই) ছোট রোযা। বড় রোযার ইফতার হাউযে কাওসারে রাসূল (সা.)-এর হাতে হবে ইনশা আল্লাহ। আর ছোট রোযা হল বড় রোযার মহড়া। ছোট রোযা বিনষ্টকারী হলো পানাহার ইত্যাদি। আর বড় রোযা বিনষ্টকারী বস্তু হলো শিরক। এর ক্ষতিকারক বস্তু হলো পাপ, শরীয়ত বিরোধী কাজ, সুন্নাত পরিপন্থী কাজ ইত্যাদি।

মক্তব-মাদরাসা প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা

মাদরাসা ও মক্তব প্রতিষ্ঠা করা অতি জরুরী কাজ। এখানে আক্বীদা পরিশুদ্ধ হবে, দ্বীন সম্পর্কে অবগতি লাভ হবে, জরুরী মাসআলা-মাসায়েল জানা যাবে। এটা ব্যতীত দ্বীন বিলুপ্ত হবার আশংকা রয়েছে, যেমনটি স্পেনে হয়েছিল। ভারতে স্পেনের পুনরাবৃত্তির নীল নকশা প্রস্তুত হচ্ছে। ফলে দ্বীন-ইসলামের সাথে মুসলমানদের সম্পর্কচ্ছেদ হয়ে যাবে। বিজাতীয় কৃষ্টিকালচার এদেরকে এমনভাবে বিগড়ে দেবে যে, এরা নামে মাত্র মুসলমান থাকবে, কিন্তু কাজে হবে শূন্য।

বুযুর্গানের ছোহবতের কোন বিকল্প নেই

বুযুর্গদের সোহবত বা সৎলোকের সংশ্রবের কোন বিকল্প নেই। যদি এর কোন বিকল্প থাকতো তাহলে রাসূলের সাহাবীদের (সাহচর্যপ্রাপ্তদের) সাহাবী বলা হতো না– আউলিয়া, সুফী বা অন্য কোন পদবীতে তাদের ভূষিত করা হত। তাবেয়ীদের অনেকে যিকির, তাসবীহ ও নফল ইবাদতে খুব অগ্রগামী হয়েছিলেন, কিন্তু তাঁরা মর্যাদায় সাহাবীদের সমতায় পৌঁছতে পারেননি। সোহবতের দ্বারা কয়েক মুহূর্তে যে কাজ হয়, তা প্রখর মেধা, একনিষ্ঠ অধ্যয়নেও হয় না।

সোহবতে হৃদয়ে আকুলতা-ব্যকুলতা সৃষ্টি হয়, অন্তর নূরে উদ্ভাসিত হয়, সবকিছুতে একটা ভারসাম্য সৃষ্টি হয়। এর দ্বারা কোন জিনিসের গুরুত্ব, মর্যাদা ও মূল্য সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়, যা কিতাবপত্রেও পাওয়া যায় না,

বিদ্যার্জনের মাধ্যমেও আয়ত্ত করা সম্ভব হয় না। এটা যেন একটা প্রদীপ। প্রদীপ থেকে প্রদীপে যেমন আলো সঞ্চালিত হয়, তেমনি হৃদয় থেকে হৃদয়ে আলোর গতি সঞ্চালন হয়।

আল্লাহওয়ালাদের নিকট উপস্থিত থাকার লাভ ঃ

এক প্রশ্নের জবাবে আল্লামা নদভী বলেন, বুযুর্গ ব্যক্তিদের নিকট উপস্থিত হওয়ার সবচেয়ে বড় উপকার হচ্ছে মানুষ নিজেদেরকে তুচ্ছ মনে করতে শেখে এবং অনুশোচনার সুযোগ পায়, বুযুর্গদের দরবারে গিয়ে নিজেদের অবস্থা দেখে লজ্জিত হয়। তাঁদের চরিত্র মাধুর্য, ইবাদত, রূহানিয়াত দেখে নিজেদের দোষ-ত্রুটি ও ঘাটতি সম্পর্কে অবহিত হতে পারে। প্রসঙ্গক্রমে তিনি এও বলেন যে, নেকলোকের সাহচর্যে থাকার বিষয়টিতো সরাসরি ওহীর দ্বারা প্রমাণিত।

পূর্বসূরী উলামায়ে কেরাম

আগের যুগের আলেমগণ বুযুর্গ ব্যক্তিদের সোহবতে থাকা জরুরী মনে করতেন। তাঁদের থেকে ফায়দা গ্রহণ করাকে অত্যন্ত লাভজনক মনে করতেন। কিন্তু বর্তমানে এ প্রচলন উঠে গেছে। এমন কি বর্তমানে ছাত্ররা তাদের উস্তাদদের নিকট বসতেও চায় না।

আল্লাহ তাআলার বিরাট অনুগ্রহ

আল্লাহ তা'আলা আমাকে বিরাট অনুগ্রহ (জ্ঞান ও ব্যক্তিত্ব দান) করেছেন। এর পেছনে চারটি জিনিসের ভূমিকা রয়েছে যথা- (১) আমার পিতার ইখলাস, (২) মাতার দু'আ, (৩) ভাইয়ের তরবিয়ত (দীক্ষা) (৪) উস্তাদ ও শায়খদের আন্তরিকতাপূর্ণ নেক দৃষ্টি।

ইখলাস ও আখলাক

আল্লাহর নিকট ইখলাস (নিয়তের বিশুদ্ধতা) এবং মানুষের নিকট সদাচরণ প্রদর্শন করা আবশ্যক। প্রবাদ রয়েছে– "আখলাক তো আল্লাহ ওয়ালাদের ব্যাপার"। আজকাল মানুষ কাশ্‌ফ ও কারামাত দেখার জন্য বুযুর্গদের নিকট গমন করে, অথচ উচিত ছিল তাদের চরিত্রমাধুর্য, সদাচরণ দেখার জন্য তাদের কাছে গমন করা।

সামাজিক জীবনে অনিষ্টতা

তিনি প্রায়ই বলতেন– বর্তমান যুগে সামাজিক জীবনে অনিষ্টের এবং বিভ্রান্তির কারণ খারাপ নিয়ত নয়, বরং নিয়তহীনতা। হযরত নদভী কোয়েটার সেই ব্যক্তির ঘটনা বয়ান করেছিলেন, যিনি রোযা রেখে ইফতার করার সময় বলতেন, আমি তো রোযা রাখি এজন্য যে, ইফতারীর সময় খাবার এমন সুস্বাদু লাগে যা অন্য সময় লাগে না।

বিশ্বাস ও উদ্দেশ্যের একাত্মতা

বিশ্বাসে একনিষ্ঠতা, উদ্দেশ্যে বিশুদ্ধতা ও আন্তরিকতায় একাত্মতা অভাবনীয় ফলাফল দান করে। উদ্দেশ্য ও বিশ্বাস এমন হয় যে, তা অস্থি-মজ্জায়, শিরা-উপশিরায় এক হয়ে মিশে যায়। এর মধ্যে আকর্ষণ ও স্বাদ সৃষ্টি হয়। মাকসাদ বা উদ্দেশ্যের সাথে কেবল সংশ্লিষ্টতাই যথেষ্ট নয়, বরং এর প্রতিও থাকতে হবে প্রবল আকর্ষণ।

সাইয়েদ আহমাদ শহীদের আত্মশুদ্ধি আন্দোলন ও জিহাদ

হযরত সাইয়েদ আহমাদ শহীদ (রহ.)-এর আন্দোলন ও দাওয়াত ছিল খালেছ তাওহীদ ও জিহাদী প্রেরণায় উজ্জীবিত। তিনি হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহর কর্মের পরিপূরক। তিনি দাওয়াত, তাওহীদ, সুন্নাতের প্রসার এবং আল্লাহর বাণী বুলন্দ করার যে কর্ম প্রচেষ্টা চালিয়েছেন তার বিরাট প্রভাব পড়েছে জনসমাজের উপর। ইংরেজ লেখকগণ এটি বিশ্লেষণ করে বর্ণনা করেছেন যে, ইংরেজদের এদেশের কোন বিপদের আশঙ্কা থাকলে তা এটিই ছিল। তাই তারা সাইয়েদ সাহেবের আন্দোলনের প্রভাব স্তিমিত করতে খাঁটি তাওহীদকে কলুষিত করতে এবং জিহাদী প্রেরণা নষ্ট করতে তথা চিরতরে ধ্বংস করতে আহমাদ রেযাখান ও গোলাম আহমাদ কাদিয়ানীর উদ্ভব ঘটায়। গোলাম আহমাদ নিজেই বলত, "আমি ইংরেজদের বপনকৃত ফসল।"

এ আলোচনা থেকে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, সাইয়েদ আহমাদ শহীদ (রহ.)-এর আন্দোলন কী অসাধারণ প্রভাব বিস্তার করেছিল।

মুজাদ্দেদে আলফে ছানী (রহ.) ও শাহ ওয়ালী উল্লাহর অবদান

আল্লামা ইকবাল মুজাদ্দেদে আলফে ছানী সম্পর্কে যথার্থই বলেছেন-

اللہ نی بروقت کیا ان کو خبردار * وہ ہند مین سرمایۃ ملت کا نگہبان *

তাঁর প্রচেষ্টার ফলে ভারতবর্ষের সঙ্গে ইসলাম এবং আরব রাষ্ট্র গুলোর সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়নি। এ সভ্যতা উন্নত চিন্তা ও স্বাতন্ত্র্য বিশ্বাসের কারণে চাণক্যবাদের গ্রাস থেকে মুক্ত থাকতে পেরেছে এবং ইসলাম ও শরীয়তে মুহাম্মাদী (সা.)-এর গন্ডির মধ্যে অবস্থান করছে। এর পিছনে তাঁর ভূমিকা রয়েছে। যিনি সম্রাট আকবরের সিংহাসনে দ্বীনের উজ্জীবনকারী, বিচক্ষণ আওরঙ্গজেব আলমগীরের ন্যায় ফকীহ বাদশাহকে সমাসীন করেছিলেন। শায়খ আলী তনতবী আলমগীর বাদশাহকে খোলাফায়ে রাশেদীনের ষষ্ঠ ব্যক্তি বলে উল্লেখ করেছিলেন।

হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ এবং তাঁর বংশের খেদমতের কথায় আসা যাক, যার মাধ্যমে দ্বীনের নবজাগরণ ও উজ্জীবনের বিরাট ভূমিকা পালিত হয়েছে। দারুল উলূম দেওবন্দ, মাজাহারে উলূম এবং নদওয়া এমনকি সমস্ত দ্বীনী দরস্গাহও ঐ এক মশালেই উজ্জ্বল হয়েছে। এ সমস্ত প্রতিষ্ঠানের পরম্পরা শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ ও তাঁর প্রতিনিধি ছাত্রদের পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছেছে।

সর্বজনপ্রিয়তা ও গ্রহণযোগ্যতার রহস্য

নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত, কুরআন তেলাওয়াত ইত্যাদি অনেকেই করে থাকে, কিন্তু ওলীআল্লাহগণ তাঁদের উঁচু মর্তবা, কাজের নিয়তের বিশুদ্ধতা, রাত্রি জাগরণ ইত্যাদি সঠিক নিয়মমাফিক করার কারণে তাঁরা সফলকাম ও সম্মানের উচ্চ আসনে উন্নীত হন। তাঁরা দুনিয়াবী কাজকেও সঠিক নিয়ম ও হিসেবের মাধ্যমে দ্বীনের কাজ করে নেন। আর এটাই তাদের খোদার নিকট প্রিয়ভাজন হওয়া ও গ্রহণযোগ্য হওয়ার ক্ষেত্রে অতিরিক্ত মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত হয়েছে।

ইখলাস ও খাঁটি নিয়ত বৃথা যায় না

সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী প্রায়ই বলতেন, এটা বার বার পরীক্ষিত যে, মুখলেস (খাঁটি নিয়তওয়ালা) ব্যক্তির পরিশ্রম কখনও বৃথা যায় না। মুখলেস ব্যক্তির দৃষ্টান্ত সেই নৌকার মাঝির ন্যায় যার নৌকা সমুদ্রের ঢেউয়ের মধ্যে পড়ায় তীরবর্তী দর্শকগণের অন্তর ভয়ে দুরু দুরু করতে থাকে, কিন্তু সে নৌকা দেখা যায় ডুবতে ডুবতে তীরে এসে ভেড়ে। আর গায়র মুখলেস ব্যক্তিদের নৌকা তীরে পৌঁছতে পৌঁছতে ডুবে যায়। আমার দীর্ঘ জীবনে আমি লক্ষ্য করেছি– কোন ব্যক্তির খ্যাতি ষোলকলায় পূর্ণ হলো,

সবাই তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। কিন্তু দেখা যাবে তার জীবদ্দশায় অথবা তার মৃত্যুর পর এ খ্যাতি লুপ্ত হতে শুরু করেছে। আর যদি তার সম্পর্কে কোন পর্যবেক্ষক ও বিশ্লেষক সমালোচনা করতে শুরু করে, তবে তার প্রসিদ্ধি ও গ্রহণযোগ্যতার অপমৃত্যু ঘটবে।

অপরদিকে কোন অপ্রসিদ্ধ, নির্জনবাসী ব্যক্তি বসে বসে কল্যাণকর কাজ করতে থাকে, তার ইখলাসপূর্ণ কাজ তার জীবদ্দশায় প্রসিদ্ধি লাভ না করতে পারলেও হঠাৎ করে কোন কারণে তার কর্ম এমন প্রসিদ্ধি লাভ করতে পারে যে, তার প্রতিটি ক্ষুদ্র কাজ ও প্রচেষ্টা তাকে পৃথিবীতে অমরত্ব দান করবে। তার কবুলিয়াতের (গ্রহণযোগ্যতার) জন্য মহাপরাক্রমশালী আল্লাহর তরফ থেকে এমন অবস্থার সৃষ্টি হয় যা দেখে বিবেক স্তব্ধ হয়ে যায়।

নিয়তের উপর গুরুত্বারোপ

আমি মাওলানা ইলিয়াস (রহ.)-এর জীবদ্দশায় নিযামুদ্দীনে (তাবলীগের বড় মারকায়) এক বক্তৃতায় বলেছিলাম, মুসলমানদের নিয়ত খারাপ হয় না, বরং তাদের মধ্যে নিয়তহীনতা দেখা দেয়। আমাদের অনেকে এমনও রয়েছে যারা নিয়ত ছাড়াই কুরআন তেলাওয়াত করে, খতম করে, সওয়াব রেসানী করে। তিনি আরো বলেন, আমি হাদীছ শরীফে নিয়ত সম্পর্কে পড়েছি। কিন্তু হযরত ইলিয়াস (রহ.)-এর নিকট থেকে সর্বপ্রথম ঈমান ও এহতেসাবের সঠিক বুঝ লাভ করেছি। মাওলানা ইলিয়াস (রহ.) এদিকে সর্বপ্রথম আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন যে, ঈমান ও এহতেসাবের উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর ওয়াদার উপর দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন ও ছওয়াবের আশায় কোন কাজ করা।

আমাদের অনেকে কাজ করে ঠিকই, কিন্তু কাজের পূর্বে কোন সুনির্ধারিত নিয়ত করে না; যেমন-অযু করে কিন্তু যেভাবে হাদীসে বর্ণিত আছে যে, হাত ধোয়ার সময় এ নিয়তে ধুতে হবে যে, হাতের দ্বারা যে পরিমাণ পাপ হয় তা মাফ হয়ে যাক, মুখমন্ডল ধোয়া এবং কুলি করার সময় নিয়ত করতে হবে, চোখ ও মুখের দ্বারা কৃত পাপ পানির ফোঁটার সাথে বের হয়ে যাক। এভাবে অসুস্থ রুগীর সেবা-যত্ন ও সমবেদনা প্রকাশ করা, রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক জিনিস সরিয়ে ফেলা, গরীব ও অসহায়দের সাহায্য করা, মুজাহিদকে সাহায্য করা, স্বতঃস্ফুর্ত ভাবে তাদের সাথে অংশ নেওয়া– এসব কিছুতেই আল্লাহর সন্তুষ্টি ও ছওয়াবের নিশ্চয়তা রয়েছে। তাই এসব কাজ করার পূর্বে নিয়ত (উদ্দেশ্য) ঠিক করতে হবে।

মানুষের দ্বৈত আচরণ

১৯৪৭ সাল। ভারতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা তখন চরমে। সর্বত্র মারামারি, কাটাকাটি। মুসলমানদের অনেকে তখন ইসলামী পোশাক-পরিচ্ছদ ও লক্ষণীয় বেশভূষা (দাঁড়ি) পরিত্যাগ করে ভিন্ন বেশ ধারণ করল, যাতে শত্রুরা মুসলমান হিসেবে চিহ্নিত করতে না পারে। কিন্তু এতেও তাদের শেষ রক্ষা হয়নি। জনৈক কবি বলেন–

نه خدا ملا نه وصال صنم ،نه ادهر كي رهي نه اڈكي رهي

দু'দেল বান্দা কালেমা চোর, না পায় শ্বশ্মান, না পায় গোর।

এর বিপরীতে তেজোদীপ্ত ঈমানের একটা পুরোনো ঘটনা শোনা যাক। নাসির বেলুচী ও পাঞ্জাবের শিখদের মধ্যে একবার যুদ্ধ হল। যুদ্ধের এক পর্যায়ে নাসীর বেলুচী আহত হয়ে ঘোড়া থেকে ভূপাতিত হন। এ সময় দু'জন শিখসেনা তার পাশ দিয়ে অতিক্রম করে যাচ্ছিল। তাদের মধ্যে একজন বেলুচীকে হত্যা করতে উদ্যত হল। অপরজন বাঁধা দিয়ে বলল, না একে হত্যা করো না। তারা বড় বড় চুল দেখে বলল, এ জওয়ান আমাদের ভাই। কারণ তখন শিখরা বড় চুল রাখত। আর নাসীর বেলুচীর চুলও ছিল বড় বড় এবং তিনি ঘোড়া থেকে উপুড় হয়ে পড়েছিলেন বিধায় শিখ সেনা তাকে চিনতে ভুল করে। যুদ্ধ শেষে নাসির বেলূচী নিজ রাজ্যে ফিরে নিজের লম্বা চুল কর্তন করলেন এবং জাতির সবাইকে চুল খাট করার নির্দেশ দিলেন।

তিনি আফসোস করে বললেন, এই দুর্ভাগা চুলই আমার মুসলমান হবার ব্যাপারে সন্দেহ সৃষ্টি করেছিল, এই চুলই আমাকে শাহাদাতের সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত করেছে।

লক্ষ্যণীয় যে, কেউ অমুসলিমের ছদ্মবেশ ধরে বাঁচতে চেষ্টা করেছে, অপরজন অবাঞ্ছিত ছদ্মবেশ হওয়ায় দুঃখিত হয়েছেন– এই দুই প্রকার মানসিকতার মধ্যে কত ব্যবধান!

ধর্ম ও রাজনীতি

একবার বেশ কয়েকজন রাজনীতিক আল্লামা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভীর খেদমতে হাজির হলেন। তারা বিভিন্ন বিষয়ে হযরতের সঙ্গে মত বিনিময় করছিলেন। এর কয়েকদিন পূর্বে সূর্যগ্রহণ হয়েছিল। আলী মিয়াঁ নদভী সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে নেতাদের উদ্দেশ্য করে বললেন, এবার কি

সূর্য পূর্ণগ্রহণ হয়েছিল। একজন জবাব দিলেন হ্যাঁ, পূর্ণগ্রহণ হয়েছিল। এ সময় উপস্থিত অন্য নেতা তার জবাব খণ্ডন করে বললেন, না, এখানে নয়, এলাহাবাদে পূর্ণগ্রহণ হয়েছিল। হযরত নদভী তখন সূর্যগ্রহণ সম্পর্কে উপদেশমূলক একটা ঘটনা শুনালেন। রাসূল (সা.)-এর যুগে একবার সূর্যগ্রহণ হলো। ঘটনার দিন রাসূল (সা.)-এর এক ছেলে ইন্তেকাল করেন। তখন লোকে বলতে শুরু করল যে, মুহাম্মাদ (সা.)-এর সন্তান ইন্তেকাল করেছে তাই সূর্যের এ অবস্থা হয়েছে। মহানবী (সা.) সঙ্গে সঙ্গে এর প্রতিবাদ করে বললেন, সূর্যগ্রহণ আল্লাহ তা'আলার নিদর্শনাবলীর মধ্যে একটি নিদর্শন, কারো জীবন-মৃত্যুর সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। যখন সূর্যগ্রহণ হয় তখন তোমরা মসজিদে গিয়ে নামায পড়বে, দু'আ করবে, দান-খয়রাত করবে, নিজের গোনাহের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে।

যদি এ ঘটনা পয়গম্বরের ক্ষেত্রে না হয়ে আমাদের কোন নেতার ব্যাপারে ঘটত তাহলে তিনি বলতেন– হ্যাঁ, তোমরা ঠিকই বলেছ, আমার ছেলের মৃত্যুতে সূর্যও শোক প্রকাশ করছে। এটা আমি বলছি না, লোকেই বলছে। আর যদি কোন ঘটনা না ঘটত তবে নিশ্চুপই থাকতো। নেতা ও পয়গম্বরদের মধ্যে এটাই পার্থক্য।

তালীম ও তাবলীগওয়ালাদের দায়িত্ব

সমস্ত মুসলমানের এক সাথে দাওয়াত ও তাবলীগের কাজে বের হয়ে যাওয়া এবং ধারাবাহিকভাবে তা চালিয়ে যাওয়া যেমন অসম্ভব, তেমনি নিষ্প্রয়োজনও বটে। কিন্তু দ্বীনের প্রতি উৎসাহিত করা এবং দাওয়াত দিতে সমাজের প্রত্যেক শ্রেণী থেকে একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক লোকের বের হওয়া সম্ভব এবং উদ্দেশ্যও তা-ই।

দু'টি উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। প্রথমতঃ নিজে দ্বীনের জ্ঞান, বিধি-বিধান ও দ্বীনী শিক্ষা অর্জন করতে হবে। দ্বিতীয়তঃ নিজের পরিবারের লোকদের এবং আত্মীয়-স্বজনদের রাসূল (সা.)-এর আদর্শ মত গড়ে তোলা এবং ইসলামী চেতনায় জাগ্রত করতে হবে। তাদেরকে ভ্রান্ত আকিদা-বিশ্বাস ও আমলহীনতার ক্ষতি থেকে উদ্ধার করতে হবে এবং সাবধান করতে হবে। এ মর্মে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেন–

وماكان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين و لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون (التوبه - ١٢٠)

অর্থাৎ "আর সমস্ত মুমিনের অভিযানে বের হওয়া সঙ্গত নয়। তাই তাদের প্রত্যেক দলের একটি অংশ কেন বের হল না, যাতে দ্বীনী জ্ঞান লাভ করে এবং ভীতি প্রদর্শন করে স্বজাতিকে, যখন তারা তাদের কাছে প্রত্যাবর্তন করবে, যেন তারা বাঁচাতে পারে?

উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহর রাস্তায় বহির্গমনকারীর উদ্দেশ্যে (দাওয়াতের উদ্দেশ্যে বা তালীমের জন্য) দু'টি মূল লক্ষ্য ও ফায়দা বয়ান করা হয়েছে যা অর্জন করা এবং যার উপর আমল করা আবশ্যক। দ্বীনের জন্য বহির্গমনকারী এবং দ্বীনের কাজে সময় ব্যয়কারীকে আত্মসমালোচনা করতে হবে যে, সে নিজে দ্বীনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের উপর কতটুকু আমল করতে পারছে, নিজের দ্বীনী ইলম, ফরযসমূহ ও দায়িত্বশীলতার উপলব্ধি কতটুকু বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং অন্যের নিকট দ্বীনের প্রচার-প্রসারে কতটুকু প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

সম্মানযোগ্য শাসক ঃ

শারজার শাসককে অভ্যর্থনা করতে গিয়ে হযরত নদভী বলেছিলেন, আমাদের সম্পর্ক এমন একটি ধারার সাথে এবং এমন চিন্তাশীল প্রতিষ্ঠানের সাথে আমরা সংযুক্ত যেখানের ব্যাপারে প্রবাদ আছে, উত্তম শাসক সাগ্রহে যায় দরবেশের দ্বারে, অধম দরবেশ নির্বিঘ্নে যায় শাসকের দরবারে

(তা'মীরে হায়াত-১০ জুন ১৯৮২)

কুসংস্কার দূর করাও একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব

সমাজের কুসংস্কার ও কু-প্রথা দূর করাও একটি বিরাট কাজ। আমি তাবলীগওয়ালাদের বলছি, তাঁরা যেন এই কাজটিকে নম্বরের মধ্যে গণ্য না করলেও জেহেনে রাখেন। সুযোগ পেলে এ বিষয়ে উত্তম রূপে তারগীব (উৎসাহ) দিতে হবে, লোকদের দৃষ্টি আকর্ষণ অব্যাহত রাখতে হবে। যৌতুক, লটারী, জুয়া, ঘুষ ইত্যাদি এবং এ প্রকারের আরো ক্ষতিকর লেনদেন যা সামাজিক ও সামষ্টিক জীবনে ফাসাদ সৃষ্টি করে এগুলো চলতে দিবে না। এভাবে লোকদের ইসলাহ (পরিশুদ্ধ) করতে হবে। তাহলেই তাবলীগের দায়িত্ব-কর্তব্য সঠিকভাবে পালন করা সম্ভব হবে।

তাবলীগের অর্থ ও কার্যকর পদ্ধতি

মাওলানা ইলিয়াস (রহ.) এবিষয়ের উপর অত্যাধিক গুরুত্বারোপ করতেন যে, তাবলীগের পদ্ধতি এমন হওয়া চাই যে, শ্রোতার সঙ্গে কথা বলার সময় সে যেন বুঝতে না পারে, সে একজন নওমুসলিম বা মূর্খ লোক। লোকের সাথে কথা বলার সময় বক্তব্যের রীতি অনুসরণ করতে হবে।

স্পেনে দাওয়াতী কাজ করা জরুরী

আন্দালুস যা এখন স্পেন নামে প্রসিদ্ধ তার কথা উল্লেখ করে মাওলানা নদভী বলেন, আমার অন্তরে স্পেনে দাওয়াতী কাজ যে খুব জরুরী তা বার বার অনুভূত হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে। ডঃ সাঈদ রমযান বলেন, যখন তিনি সেখানে পৌঁছলেন তখন কয়েক জায়গা থেকে কুরআন তেলাওয়াতের আওয়াজ আসছিল; অথচ সেখানে তেলাওয়াতকারী কেউ ছিল না, কেননা তখন স্পেনে কোন মুসলমান জীবিত ছিল না।

এখন অবশ্য সেখানে দাওয়াতী কাজ চলছে। উক্ত মজলিসে সাইয়েদ সালমান নদভীও উপস্থিত ছিলেন। মাওলানা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী তাঁর দিকে ইঙ্গিত করে বলেন, তুমি তাঁর সাথে সম্পর্ক রাখ। আমি তো এজন্যই বলছি, লোকদের স্পেনের ভাষা শেখা দরকার যেন সেখানে দ্বীনের দাওয়াত পৌঁছানো সহজ হয়।

তিনি বলেন, কর্ডোভার মসজিদের এক প্রান্তে কথা বললে প্রতিধ্বনি হয়ে তীব্র আকারে আওয়াজ শোনা যায়। আমি তখন উচ্চস্বরে পড়লাম

جاء الحق و زهق الباطل إن الباطل كان زهوقا

সত্য সমাগত মিথ্যা অপসৃত হবারই। গাইড মনে করলেন যে, আমি না বুঝেই এ আয়াত পড়ছি। তাই আমাকে থামিয়ে দিল। আমি তখন উচ্চস্বরে বললাম, ইনশা আল্লাহ এটাই হবে (এখন সময় হয়েছে বাতিল দূর হবার)।

ভাতাবিহীন শিক্ষাদান প্রসঙ্গ

আলী মিয়াঁ নদভী বেতন না নেবার বিষয়ে বলেন, আমাদের তাবলীগী দায়ীগণের অধিকাংশই সফরে থাকেন। আমি মাওলানা ইলিয়াস (রহ.)-কে একবার বললাম, আমি বিনা বেতনে পড়াতে চাই। তিনি আমাকে বললেন, আমাদের পূর্বসূরী আলেম- উলামার মধ্যে এ রীতি নেই, তাই বেতন নেওয়া উচিত। এতে ভিন্ন ফায়দা আছে।

পরবর্তীতে একদিন মাওলানা ইলিয়াস (রহ.) আমাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, কত টাকা বেতন? আমি জবাবে বললাম পঞ্চাশ রুপি। তিনি বললেন, মৌলভী সাহেব! এরূপ হাজার পঞ্চাশ রুপি আপনার চাকর-নকরের চরণে উৎসর্গ হোক। অতঃপর আমি বেতন নেওয়া ছেড়ে দিলাম।

মাওলানা ইমরান খানের চমকপ্রদ ঘটনা

দারুল উলূম নদওয়ার সাবেক মুহতামিম মাওলানা ইমরান খান সম্পর্কে বলেন যে, তিনি নদওয়ার চাঁদা আদায়ের জন্য গিয়েছিলেন। তাঁর নিকট একজন ধর্মপরায়ণ ব্যক্তি গিয়ে জিজ্ঞেস করল, আপনি তো আলেম মানুষ, আপনি জানেন কোন কাজের জন্য বের হলে সালাতুল হাজত পড়তে হয়। এখন কাজ উদ্ধার হবার জন্য আপনি সালাতুল হাজত পড়ে নেন, তাহলে কাজ সহজ হবে। তিনি হঠাৎ করে বললেন, এ জন্যই আল্লাহ আপনাকে পাঠিয়েছেন।

তাওয়াজ্জুহ (নেকদৃষ্টি)-এর ফায়দা ও প্রভাব

ধারাবাহিক আলোচনার এক পর্যায়ে হযরত নদভী 'তাওয়াজ্জুহ'-এর ফায়দা ও প্রভাব বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত সাইয়েদ আহমাদ শহীদ (রহ.) এর তাওয়াজ্জুহ সম্পর্কে খুব বেশী প্রশংসা করলেন। অতঃপর বললেন, উত্তম তাওয়াজ্জুহ হলো যার মাধ্যমে মানুষ ফরযসমূহের প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং নামাযে বিশেষ স্বাদ অনুভব করে। আর যে তাওয়াজ্জুহ-এর প্রভাবে কারামত ও কাশফ বেশী বেশী হয় সেটা গ্রহণযোগ্য তাওয়াজ্জুহ নয়।

রিয়াযত ও মোজাহাদার সময় অবস্থা ও যোগ্যতার দিকে লক্ষ্য রাখা

তরীকতে কম ঘুমাবার উপর জোর দেয়া হয় এবং তার পুনরাবৃত্তি করা হয়। এর সীমা কতটুকু? এ প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, এর কোন সীমা নেই। সময়, অবস্থা এবং যোগ্যতা অনুযায়ী এটা করানো হয়। সারারাত জাগার কথা বলা হয়নি। কোন কিতাবেও এর উপর তাগিদ দেয়া হয়নি। হ্যাঁ, তবে কম ঘুমিয়ে শেষ রাতের তাহাজ্জুদের উপর গুরুত্বারোপের কথা পাওয়া যায়।

মা'মুলাতের পাবন্দী করা

পারতপক্ষে মা'মুলাত (শায়খের নির্দেশিত আমলসমূহ)-এর পাবন্দী (যথাযথ পালন) করা উচিত। এতে অন্তরে নূর সৃষ্টি হয় এবং কাজে বরকত হয়।

ধর্মীয় চেতনা ঃ

দ্বীনদারীর সাথে সাথে দ্বীনী চেতনা থাকা আবশ্যক। অর্থাৎ আবেদ ব্যক্তি ইসলামী জ্ঞানও অর্জন করবে।

কতিপয় দায়িত্ব

পিতা যদি সন্তানের প্রতি বিনা কারণেও নাখোশ হন তাহলে পুত্রের জন্য এটাও ক্ষতির কারণ। ওলীআল্লাহ ও খোদাভীরু আলেমদের সম্পর্কে কোন বিরূপ মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকা উচিত। আর এটাও লক্ষ্য রাখা উচিত যে, তোমার কাজের দ্বারা তাঁরা সামান্য কষ্টও যেন না পান। তিনি তাঁর এক শাগরেদকে বলেন, নিজের জন্য মুস্তাহাবকেও জরুরী মনে করবে, আর অন্যের ব্যাপারে ফরয আদায় করলে যথেষ্ট মনে করবে।

তিনি বলেন, জীবন এমন হওয়া উচিত যেন অন্যের উপর তার সুপ্রভাব পড়ে। এটা ইসলামের দাওয়াত প্রদানের মাধ্যমে হতে পারে। নিজের আমল, আক্বীদা, চরিত্র, সদাচারণেও হতে পারে। পথ নির্দেশ করে, আকৃষ্ট করে ও তাদের উপর প্রাধান্য বিস্তার করে এমন কাজ করা বাঞ্ছনীয়।

আমরা এদেশে হাজার বছর যাবত হিন্দু-মুসলিম বসবাস করছি। একে অপরের প্রতিবেশী, একজনের দেওয়াল অন্যজনের সাথে মিলিত হয়ে আছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় একে অপরের ধর্মের প্রাথমিক মৌলিক বিষয়গুলোও জানে না।

উদাহরণ স্বরূপ একটি ঘটনা উল্লেখ করা যেতে পারে। একবার আমি আমার কয়েক সাথীকে নিয়ে ট্রেন সফরে ছিলাম। নামাযের সময় হলে আমরা জামাআতে নামায পড়লাম। নামাযের মধ্যে রুকু'-সিজদায় যেতে আল্লাহু আকবার বললাম। আমাদের সাথে একজন হিন্দু ভাই ছিলেন। নামায শেষে তিনি আমাদের জিজ্ঞেস করলেন, মৌলভী সাহেব! নামায পড়ার সময় কি আপনারা আকবর বাদশাহকে স্মরণ করেন?

দেশে সর্বত্র মসজিদ আছে। প্রত্যেক ওয়াক্তে আযান ও নামাযে আল্লাহু আকবার বলা হচ্ছে। কিন্তু কখনও তার আল্লাহু আকবারের উদ্দেশ্য সম্পর্কে জিজ্ঞেস করার অনুভূতি জাগ্রত হয়নি। আর আমাদেরও কোন ভ্রুক্ষেপ নেই যে, তাদের এসব বিষয়ে বলব। চিন্তার বিষয় বটে, বিরাট আফসোসের বিষয় এটা। আমরা এত কাছাকাছি থেকেও একে অপরের ধর্মীয় মৌলিক ও প্রাথমিক বিষয়গুলো শিখতে পারিনি। হযরতকে প্রশ্ন করা হল, রমযান মাসে সফরে কিছু দিন মক্কা-মদীনায় এবং কিছুদিন ভারতে কাটালে এতে সময়ের তারতম্যের কারণে রোযা কম বেশী হলে এ ব্যাপারে আপনার মতামত কি?

তিনি বললেন, রোযার কোন সংখ্যা নির্দিষ্ট নেই। বরং হাদীসে বর্ণিত আছে চাঁদ দেখে রোযা শুরু কর এবং চাঁদ দেখে তা বন্ধ কর। এখন তা ২৮ ও হতে পারে ৩১ও হতে পারে।

খতমে নবুওয়াতে বিশ্বাস

আল্লামা ইকবাল এ সম্পর্কে অত্যন্ত জোরালো বক্তব্য দিয়েছেন, যা তার অবস্থান থেকে অতি উর্ধ্বের। আল্লাহ তা'আলার বাণী তার মধ্যে প্রতিধ্বনিত হয়েছিল। তিনি লিখেছেন –

দ্বীন ও শরীয়তের স্থায়িত্ব কিতাবুল্লাহ ও সুন্নাতের সাথে দৃঢ়ভাবে সংশ্লিষ্ট। যতদিন কিতাব ও সুন্নাহ বিদ্যমান থাকবে ততদিন দ্বীন ও শরীয়াত অক্ষত থাকবে। কিন্তু উম্মতের অস্তিত্ব খতমে নবুয়তের বিশ্বাসের উপর নির্ভরশীল। এই উম্মত এক ও অদ্বিতীয় বৈশিষ্ট্যের উপর বিদ্যমান রয়েছে।

জীবনযাপনের ধরন

জীবনযাপন এমন হতে হবে যে, তা অন্যের চলার পথে মশালের কাজ করবে এবং তা ইসলামের দাওয়াতের কাজ দেবে। জীবন হতে হবে এমন চৌম্বকশক্তিসম্পন্ন যা মানুষকে আকৃষ্ট করবে কল্যাণের পথে, সামাজিক ও সামষ্টিক জীবনকেও নাড়া দেবে। যখন এই জীবন এমন শক্তিবিশিষ্ট হবে যে, গণজীবনে বিপ্লব আসে; ইসলাম তখন দুনিয়ার বুকে চমকে উঠবে ।

খাজা মঈনুদ্দীন চিশতী (রহ.) আজমীর শরীফে এলে লক্ষ লক্ষ লোক মুসলমান হয়েছিল। সাইয়েদ আলী হামদানী কাশ্মীর গেলে সেখানকার অধিকাংশ মানুষ ইসলাম গ্রহণ করেছিল। এভাবে সাইয়েদ আহমাদ শহীদ

এবং তাঁর সাথীদের প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে তাঁরা যেখানেই উপস্থিত হয়েছেন সেখানে হিদায়াতের হাওয়া প্রবাহিত হয়েছে এবং বিরাট সংখ্যক লোক তাদের হাতে তওবা করেছে।

বেকারত্ব সকল অনিষ্টের মূল

বেকার থাকা বিশেষ করে তরুণদের বেকারত্ব সকল অনিষ্টের মূল। আমার বোধগম্য নয়, মানুষ কিভাবে বেকার বসে বসে সময় নষ্ট করে। মাওলানা আব্দুল মাজেদ দরিয়াবাদী (রহ.) সময়ের অত্যন্ত কদর করতেন। এতে কয়েক বছরের মধ্যে তাঁর অভ্যাস এমন হলো যে, কখনো কখনো কাজে মশগুল হয়ে ভুলে খানা খেতেন না।

যদি আমার কখনো তাঁর ওখানে যাবার সুযোগ হতো এবং যাবার প্রোগ্রাম যদি পূর্বেই নির্দিষ্ট থাকত তাহলে তিনি পাঁচ-ছয় দিন পূর্ব থেকে প্রতিদিন নির্দিষ্ট টাইমের অতিরিক্ত কাজ করতেন। এভাবে ১৫/২০ মিনিট করে বাঁচিয়ে তিনি নির্দিষ্ট দিনে আমার সাথে সঙ্গ দেবার সময় বের করে নিতেন। সাধারণ সাক্ষাতের সময় পূর্বে লিখিত বিষয়ের উপর কিছু আলাপ–আলোচনা হত, কিছু কিতাবের রেফারেন্স দিতেন। এতে দ্বিবিধ ফায়দা হত। এক. উস্তাদের নিজের ফায়দা হত। দুই. আমার ফায়দা হত। এভাবে উস্তাদ ও ছাত্রের কাজ সঠিক সময়ে সমাধা হত।

স্থানীয় ভাষার প্রতি গুরুত্বারোপ করা আবশ্যক

এ উপমহাদেশে ইসলামের প্রচারের জন্য বিভিন্ন ভাষায় রচিত ইসলামী সাহিত্য স্থানীয় ভাষায় অনুবাদ করা আবশ্যক। এটা আমাদের উপর একটা গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। এ জন্য ভারত ও পাকিস্তানের উচিত এর উপর গুরুত্বারোপ করা। মিরাঠি, তেলেগু, বাংলা ইত্যাদি স্থানীয় ভাষায় ইসলামী সাহিত্য অনুবাদ করার ব্যাপারে যথারীতি প্রোগ্রাম করে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন। উত্তর ভারতে ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় সবচেয়ে বেশী জরুরী কাজ হলো হিন্দী ভাষায় ইসলামী সাহিত্য তরজমা করা। তরজমা বা অনুবাদ হতে হবে সাহিত্য রসে এমন সিক্ত, যেমন সাহিত্যপ্রেমী প্রেমচাঁদের সাহিত্যের হিন্দী অনুবাদে রস পাওয়া যেত।

পবিত্র হিজাযের সঙ্গে আন্তরিক সম্পর্ক হওয়া উচিত

পবিত্র আরব ভূমির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা আমাদের জন্য আবশ্যক। সাইয়েদ আহমাদ শহীদ (রহ.) যখন হিজাযে পৌঁছলেন এবং দূর থেকে বায়তুল্লাহ নজরে পড়ল তখন তিনি দু'রাকাআত শুকরিয়া জ্ঞাপক নামায পড়লেন। হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজেরে মক্কী বলেন, শরীর ভারতে, আর অন্তর হিজাযে (মক্কায়)। এটা শরীর হিজাযে আর দিল ভারতে এ অবস্থা থেকে উত্তম।

জনৈক বুযুর্গ ব্যক্তি এক রাতে স্বপ্নে দেখেন যে, জান্নাতুল বাকী (মদীনার কবরস্তান) থেকে কতিপয় মুর্দাকে অন্যত্র সরিয়ে নেয়া হচ্ছে এবং অন্য স্থান থেকে কতিপয় মুর্দাকে জান্নাতুল বাকীতে আনা হচ্ছে। তিনি অপসারণকারীদের জিজ্ঞেস করলেন, ব্যাপার কি? স্বপ্নে তাকে জবাব দেয়া হলো, যাদেরকে অন্যত্র নেয়া হলো জীবিত থাকতে তাদের শরীর আরব ভূমিতে ছিল, কিন্তু অন্তর ছিল অন্যত্র, তাই তাদেরকে জান্নাতুল বাকী থেকে সরিয়ে নেয়া হচ্ছে। আর যাদেরকে আনা হলো, তাদের শরীর অন্যত্র ছিল বটে, কিন্তু তাদের অন্তর ছিল পবিত্র হেজাজে; তাই তাদেরকে জান্নাতুল বাকীতে আনা হচ্ছে।

নিজের দোষ ও অন্যের গুণের প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত

সকল মানুষের উচিত নিজের দোষত্রুটি দেখা (সংশোধন করা) এবং অপরের ভাল গুণগুলো বর্ণনা করা। কিন্তু বর্তমানে হচ্ছে ঠিক এর উল্টো। নিজের সাফাই গাইতে ব্যস্ত এবং অপরের দোষত্রুটি ধরতে উৎসাহী। আর এ অবস্থা সকল অনিষ্টের মূল।

বস্তুর হাকীকত দেখা উচিত

হযরত আলী (রা.)-এর উক্তি, তোমরা বক্তা নয়, বক্তব্যের প্রতি লক্ষ্য কর। কিন্তু বর্তমানে অবস্থা এমন হয়েছে যে, বলা হচ্ছে তোমরা বক্তার প্রতি লক্ষ্য কর, বক্তব্যের প্রতি নয়।

যিকিরের প্রভাব সৃষ্টিকরার তরীকা

জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, "হযরত অন্তরে আল্লাহর স্মরণ কিভাবে আনব? তিনি জবাবে বললেন, আমি এখনই আপনাকে তা বলে দিচ্ছি। নিশ্চিন্তায় বসে অনুচ্চস্বরে তাসবীহের দানা আঙ্গুলের উপর রেখে পড়বেন এবং মনে মনে আল্লাহ আল্লাহ উচ্চারণ করবেন, যেমন ঘড়ির কাঁটা চলে। এভাবে কণ্ঠধ্বনী ভারী হয় এবং কোন কিছু করা ছাড়াই উচ্চস্বরে যিকির হতে থাকে। মূলতঃ মুমিনের কলবে আল্লাহর স্মরণ প্রথম থেকে পূর্ণ আছে। এখন জরুরী অন্তরের কাঁটাটাতে (ঘড়ির মত) নাড়া দেওয়া (এ তরীকায়)।

দাওয়াতের দু'পদ্ধতি

দায়ীদের জন্য দাওয়াতে তাবলীগের দু'পদ্ধতি। এক. ঈমান সিংহাসন পর্যন্ত পৌঁছে যাবে অর্থাৎ ঈমানদার ব্যক্তি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাধর হবে। দুই. সিংহাসন ঈমানের অধিনস্ত হবে অর্থাৎ ক্ষমতাধর ব্যক্তি ঈমানদার হয়ে যাবে। শায়খ জামাল উদ্দীন ইরানী দ্বিতীয় পদ্ধতি সমর্থন করেন।

এরপর হযরত মাওলানা তুঘলক তৈমুরের সিংহাসন আরোহনের কাহিনী শুনালেন এবং কিভাবে পুরো তাতারী জাতি ইসলাম গ্রহণ করেছিল তার বিবরণ দিলেন। বর্তমান সময়ের জন্যও এই পদ্ধতি সমীচীন।

বিনয়, শোকরগোযার ও ইখলাসের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক

হযরত মাওলানা ইলিয়াস (রহ.)-এর বড় বৈশিষ্ট্য ছিল তাঁর দ্বীনী প্রেরণা ও খালেস নিয়ত। বুযুর্গদের মধ্যে বিনয়, ইহসান, কৃতজ্ঞতা এবং ওয়াদা পালনের আধিক্য থাকে। ইহসান বা অনুগ্রহ বিশেষ গুরুত্বের দাবিদার। সকলের উচিত মানুষের প্রতি বেশী বেশী ইহসান করা। উন্নত চরিত্রের জন্য এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

বুযুর্গদের প্রতি ইহসান, শায়খদের প্রতি ইহসান, উস্তাদদের প্রতি ইহসান, পিতা-মাতার সাথে সম্পর্ক রক্ষাকারীর প্রতি ইহসান এবং বন্ধুবান্ধবদের প্রতি ইহসান করা উচিত।

হযরত শাহ আলামুল্লাহর সুন্নতের পাবন্দী ও যুহ্দ

হযরত শাহ আলামুল্লাহ (রহ.)-এর নামে একটি এলাকার নামকরণ করা হয়েছে। তিনি মোজাহাদা ও সুন্নতের এক অনন্য অনুসারী বলে পরিচিত ছিলেন। বাদশাহ আলমগীর এক রাতে স্বপ্ন দেখলেন, রাসূল (সা.) ইন্তেকাল করেছেন। বাদশা তাঁর সভাষদকে এই তারিখটি নোট করতে বললেন। তাবীর (ব্যাখ্যা) করে খোঁজ-খবর নিয়ে দেখা গেল ওই রাতে হযরত শাহ আলামুল্লাহ (রহ.) ইন্তেকাল করেছেন।

তিনি বলেন, শাহ আলামুল্লাহ (রহ.) মোজাহাদায় ছিলেন এলাকার প্রবাদ পুরুষ। শৈশবে আমাদের কারো ঘরে খাবার না থাকলে শিশুদের শিখানো হত– তোমরা এটা বলো না যে, আমাদের ঘরে আজ খাবার নেই; বরং বল আমাদের ঘরে আজ শাহ আলামুল্লাহ মেহমান হয়েছেন। যুহদের ব্যাপারে মানুষ তাকেই দৃষ্টান্ত হিসেবে পেশ করতো।

কথা কম বলতে উৎসাহ প্রদান

বেশী কথা বলার দ্বারা মন-মস্তিষ্ক ও শিরা তিনটিরই শক্তি ব্যয় হয় এবং তিনটি অঙ্গই প্রভাবিত হয়। এতে রূহানিয়তের ঘাটতি হয়। এজন্য খানকাহগুলোতে কম কথা বলার জন্য উৎসাহিত করা হয়। মাওলানা আব্দুল কাদের রায়পুরী (রহ.) বলতেন, আমার এখানে আস, যত পার পানাহার কর এবং থাক অসুবিধা নেই, কিন্তু কথা কম বল।

কল্যাণ ও অকল্যাণ একত্রিত হতে পারে না

এক বক্তৃতায় তিনি বলেন, আমার ভাইয়েরা! কল্যাণ ও অকল্যাণ দু'টি বিপরীতধর্মী জিনিস। এ দু'টি কখনও একত্রিত হতে পারে না। মুসলমানদের সম্পর্ক কল্যাণের সাথে, অকল্যাণের সাথে নয়।

যদি কেউ দেখে-শুনে কুমারদের (মৃৎশিল্পী) পাত্র পদদলিত করে তবে কুমার তাকে আচ্ছামত উত্তম মাধ্যম দিয়ে ছাড়বে। ঠিক অদ্রুপ মুয়ামালা আল্লাহর সৃষ্টির ব্যাপারও। কুমারের মত সৃষ্টিকুল আল্লাহর পাত্র (বরতন) স্বরূপ। যদি আমরা দুষ্কর্ম করে তার ক্ষতি করি তবে আল্লাহর ক্ষমাশীলতা বর্তমান থাকা সত্ত্বেও তাঁর রোষানলে পড়ব।

শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.) দুনিয়ার কল্যাণের পয়গাম শুনিয়েছিলেন। যখন খোদার বার্তা শেষ নবীর মাধ্যমে আমাদের নিকট পৌঁছেছে তখন আমাদের দায়িত্ব হলো দুনিয়াকে বিবাদ ও ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করা।

চারটি গুণ হওয়া বাঞ্ছনীয়

লাহোরের সেমিনারে মাওলানা দাউদ গজনবী ও মাওলানা আতাউল্লাহ হানীফের বক্তব্যের উপর আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, আহলে হাদীছদের জন্য চারটি গুণ অপরিহার্য। যথা– (১) একত্ববাদে খাঁটি বিশ্বাস, (২) সুন্নতের একনিষ্ঠ অনুসরণ, (৩) আল্লাহর সাথে খালেস সম্পর্ক ও (৪) জিহাদের চেতনা।

দ্বীনের দাওয়াত

আন্দালুসের (স্পেনের) কথা উল্লেখ করে মাওলানা নদভী বলেন, আমি যখন আন্দালুসে (স্পেনে) পৌঁছি তখন মনে হয়েছে, সে স্থান রূহানিয়তে সুরভিত। কেননা সেখানে বড় বড় আওলিয়া ও মাশায়খ জন্মগ্রহন করেছেন এবং শুয়ে আছেন। কিন্তু বড় আফসোসের কথা আমাদের কোন প্রতিষ্ঠান এবং আলেম-উলামার এ বিষয়ে কোন চিন্তাই নেই যে, আন্দালুসে ইসলাম প্রচার হতে পারে। এমন গুটি কয়েক লোকও নেই যারা স্পেনের ভাষা শিখে সেখানে যাবে। স্পেনীয় ভাষা তো দূরে থাক, তুর্কি ভাষা জানা লোকও খুব বেশী নেই। দু'চারজন হতে পারে আমাদের এদেশে।

শেষ কথা

হযরত নদভীর দরবারে বৈঠক হতো সম্ভ্রমপূর্ণ। সেখানে কোন দলের সমালোচনা করা হতো না। এমন কি কারো নামও উল্লেখ করা হতো না। মাওলানার সমালোচক ও অপবাদ প্রচারে ব্যস্ত ব্যক্তিদের আলোচনাও হত না। সেখানে অকাট্য নীতি, দাওয়াত এবং তরবিয়তের আলোচনা হত। সেখানে মুসলিম উম্মাহর (সঠিক উন্নয়নে) চিন্তা, তাদের জাগ্রত করণ, নিজেদের আমল, আখলাক, শিষ্টাচার লেনদেন ইত্যাদি পরিশুদ্ধকরণ এবং ইবাদতের প্রতি গুরুত্বারোপের প্রেরণা দেয়া হত।

মাদরাসাগুলো টিকিয়ে রাখবার প্রতি তাগিদ আরোপ করে পূর্বসূরীগণ, সাহাবায়ে কেরাম ও মুজতাহিদদের অবদানের কথা উল্লেখপূর্বক শুকরিয়া আদায় করা হত। ঐ সমস্ত মুহসিন (উপকারী) ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে তিনি সুধারণা ও তাদের জন্য দু'আ করার ব্যাপারে উৎসাহিত করতেন এবং নিজেও ছাত্রদের সামনে বিনম্র শব্দ ব্যবহার ও দু'আ করতেন।

তাঁর বক্তব্যের মজলিস যদি ছাত্রদের নিয়ে হত তাহলে তিনি আল্লাহর প্রতি একনিষ্ঠ বিশ্বাস, দ্বীনী ইলম অর্জনে বিশেষ বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি, মোজাহাদা এবং চরম আত্মত্যাগের মানসিকতাসম্পন্ন জীবন গড়ার প্রতি গুরুত্বারোপ করতেন।

তিনি বলেন, বেশী বেশী দ্বীনী প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করা বর্তমান যুগে বড় জিহাদ। কোন অবস্থাতেই তোমরা মাদরাসার জন্য সরকারী অনুদান গ্রহণ করবে না। অমুসলিমদেরকে ইসলামের দিকে টানবে এবং তাদের প্রতি আন্তরিকতা দেখাবে।

যদি তিনি উলামা-মুদাররিসীনের মজলিসে বক্তৃতা দিতেন তাহলে তিনি শিক্ষাদান ও দাওয়াতী কাজকে ইবাদত মনে করে তা আঞ্জাম দেয়ার উপর গুরুত্বারোপ করতেন। তিনি বলতেন, এটাই হয়তো তাদের আধ্যাত্মিক উন্নতি ও প্রভুর নৈকট্য লাভের মাধ্যম হবে।

ব্যবসায়ী ও সুধীবৃন্দের উদ্দেশ্যে তিনি বলতেন, আক্বীদা সঠিক রাখুন, নামাযের গুরুত্ব দিন। সব কাজ আল্লাহর সন্তুষ্টির নিয়তে করবেন। শিরক ও বিদআত থেকে দূরত্ব বজায় রাখুন। নিজের সন্তান-সন্ততিকে সুশিক্ষা ও শিষ্টাচারের তালীম দিন, অনৈসলামী রুসুম-রেওয়াজ ও কুসংস্কার থেকে দূরে থাকুন। বিবাহ-শাদী অনাড়ম্বর ও সুন্নাত মোতাবেক করুন। ওয়ারিসানদের ন্যায্য হিস্যা দিন। তিনি এত আবেগভরা কণ্ঠে ও দরদ নিয়ে এ বক্তব্য দিতেন, যার ফলে গোটা মজলিসের লোকের উপর প্রভাব পড়ত এবং যে কোন সৎকর্মের জন্য তাদের মধ্যে জযবা সৃষ্টি হত। গোটা মানবগোষ্ঠীর জন্য চিন্তা ও নিরাপত্তার উপলব্ধি হত, আবার নিজের অবস্থানের জন্য তাদের সম্মান বোধ হত।

==ooo==

অধ্যায়–১৫

সমসাময়িক উলামা ও মাশায়েখের দৃষ্টিতে মাওলানা আলী মিয়াঁ

(উপমহাদেশীয় উলামা-মাশায়েখ)

মুফাক্কিরে ইসলাম হযরত মাওলানা আবুল হাসান আলী নদভী (রহ.) ছিলেন বিংশ শতাব্দীর একজন খ্যাতনামা ইসলামী চিন্তাবিদ, প্রখ্যাত দায়ী এবং একজন বিখ্যাত লেখক। তাঁর জীবনের সবচাইতে বড় বৈশিষ্ট্য ছিল তিনি সমগ্র বিশ্বের উলামা-মাশায়খ, দ্বীনদার বুদ্ধিজীবী এবং সুসাহিত্যিক ও দার্শনিকদের নিকট ছিলেন সুপ্রিয় ব্যক্তিত্ব। হযরত মাওলানার জ্ঞান গভীরতা, চিন্তার ব্যাপকতা, দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি, রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, দেশপ্রেম, জাতিপ্রেম ও মুসলিম মিল্লাতের প্রতি সীমাহীন দরদ ও বিশ্বমানবতার জন্য তাঁর ব্যথাতুর হৃদয়ের আকুল আকুতির কারণে তাঁর অসাধারণ মর্যাদা ও গ্রহণযোগ্যতার পরিধি শুধু এ উপমহাদেশেই নয়; বরং আন্তর্জাতিক পর্যায়েও বিস্তৃতি লাভ করেছিল। এখানে হযরত মাওলানা আলী মিয়াঁ (রহ.) সমসাময়িক খ্যাতনামা উলামা মাশায়খ ও ইসলামী চিন্তাবিদগণের নজরে কত প্রিয় এবং মর্যাদার অধিকারী ছিলেন তার কিছু নমুনা পেশ করা হচ্ছে।

হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহ.)

১৯৩৪ সালে গরমের সময় হযরত আলী মিয়াঁ লাহোরে তাঁর শায়খ হযরত মাওলানা আহমদ আলী লাহোরী (রহ.)-এর নিকট অবস্থান করছিলেন। ঐ সময় তাঁর বড় ভাই এক চিঠিতে লাহোর থেকে ফিরে আসার পথে থানাভবনে হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহ.)-এর সোহবতে কয়েকদিন কাটিয়ে আসার হুকুম দেন; সাথে সাথে থানাভবনে হাজিরা দেয়ার নিয়ম-কানুন ইত্যাদি সম্পর্কে হুঁশিয়ার করে দেন। সেমতে হযরত আলী মিয়াঁ লাহোর থেকে পত্র মারফত হযরত থানভী (রহ.)-এর নিকট তাঁর নিজের পরিচয় দিয়ে থানা ভবনে হাজির হওয়ার অনুমতি চান। তখন তাঁর বয়স ছিল ১৯ বছর।

হযরত থানভী তাঁর পত্রের জবাবে তাঁকে থানা ভবনে হাজির হওয়ার অনুমতি দেন। ইতিমধ্যে হযরত থানভী (রহ.)-এর চিকিৎসার উদ্দেশ্যে লাখনৌ তাশরীফ নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত হওয়ায় তিনি অন্য এক চিঠিতে আলী মিয়াঁকে লাখনৌর ঠিকানা দেন। কিন্তু এরপর নানান কারণে তাঁর থানা ভবনে হাজির হওয়ার সুযোগ হয়নি। অবশেষে ১৯৩৮ সালে হযরত থানভী (রহ.) চিকিৎসার উদ্দেশে লাখনৌ এলে মাওলানা আলী মিয়াঁ তাঁর বড় ভাই– ডাঃ সাইয়েদ আব্দুল আলী সাহেবের সাথে হযরত থানভীর সোহবতে যাওয়া আসার সুযোগ লাভ করেন। তারপর থেকে চিঠিপত্রের আদান-প্রদান চলতে থাকে। অবশেষে তিনি ১৯৪২ সালের মে অথবা জুন মাসে হযরত মাওলানা ইলিয়াস সাহেবের সাথে কান্দালা এলাকা সফর করার সময় হযরতজীর কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে ২৪ ঘন্টার জন্য থানা ভবনে হাজিরা দেন। হযরত থানভী তাঁকে পেয়ে অত্যন্ত খুশি হন। স্নেহ-ভালবাসা ও আদরের সাথে মেহমানদারী করেন। তিনি দুপুরের সময় পৌঁছেছিলেন। এ সময় তাঁর লিখিত গ্রন্থ 'সিরাতে সাইয়েদ আহমাদ শহীদ' হযরত থানভীর ডেস্কের উপর শোভা পাচ্ছিল।

যোহরের পর মজলিস শুরু হলে হযরত থানভী তাঁর বিশিষ্ট খলীফা হযরত খাজা আজিজুল হাসানকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, ডাঃ আব্দুল আলী সাহেবের ভাই এসেছে কিনা। তখন আলী মিয়াঁ বললেন, হ্যাঁ আমি এসেছি। হযরত থানভী বললেন, আপনি আমাকে অবগত করেননি। আমিতো আপনার সাথে নিরিবিলি কথা বলার জন্য চিঠিপত্র লেখার কাজ অনেকটা আগেই সেরে নিয়েছি।

একজন নতুন কম বয়সী মেহমানের জন্য এ ছিল হযরত থানভীর ভীষণ রকমের রেয়ায়েত, যার ধারণাও তিনি করেননি। হযরত থানভী (রহ.) জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আর কোন সাথীতো নেই? খানার কোন নির্ধারিত নিয়ম আছে কিনা, কোন বিধি-নিষেধ বা বাছবিচার আছে কিনা? এরপর তিনি বলে দিলেন যে, আমার অসুস্থতার কারণে খানা আপনার সাথে খেতে পারবো না। অবশ্য আপনি আমার মেহমান। এর পর মজলিস শুরু হয়ে যায়। পরের দিন সকালে খাজা সাহেব হযরত থানভীর পয়গাম নিয়ে আসেন যে, অমুক সময়

আমার বিশেষ মজলিস হবে, আপনি সে মজলিসে শরীক হতে পারেন অথবা পৃথক সময় চাইলে তা দেয়া যাবে। হযরত আলী মিয়াঁ পৃথক সময় নেননি। ঐ খাছ মজলিসেই হযরতের সোহবত থেকে ফায়েদা নেন। এরপর দুপুরের দিকে তিনি থানা ভবন থেকে বিদায় নেন।

হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহ.)-এর কাছে আলী মিয়াঁ যখন লাহোর থেকে প্রথম চিঠি লিখেছিলেন, সেই চিঠির জবাবে হযরত থানভী শুরুতে যে সম্বোধন লিখে দেন তা ছিল "মুজাম্মাউল কামালাত" অর্থাৎ বিভিন্ন গুণের আধার। হাকীমুল উম্মতের মত যুগশ্রেষ্ঠ মুজাদ্দিদের কলম থেকে একজন নওজোয়ান আলেমের উদ্দেশ্যে এ ধরনের শব্দাবলী ব্যবহার করা হযরত আলী মিয়াঁর উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বাক্ষর বহন করে। সাথে সাথে হযরত থানভীর অন্তরে হযরত আলী মিয়াঁর ইজ্জত এবং মাকাম কোন ধরনের ছিল তা প্রতিভাত হয়।

হযরত মাওলানা আব্দুল কাদের রায়পুরী (রহ.)

হযরত মাওলানা আব্দুল কাদের রায়পুরী (রহ.) তখন উপমহাদেশের খ্যাতনামা মাশায়েখের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। আলী মিয়াঁ হযরত রায়পুরীর হাতে বায়াত হয়েছিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই তিনি হযরত রায়পুরীর নূরে নযর (নয়নমণি) হয়ে যান। মাওলানা মনযুর নো'মানী (রহ.) লেখেন যে, হযরত রায়পুরীর নিকট আলী মিয়াঁর যে মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তা আমাদের ঈর্ষার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। লাহোরের এক আন্তর্জাতিক কনফারেন্সে কাদীয়ানীদের উপর একখানা আরবী গ্রন্থ লেখার আলোচনা হলে হযরত রায়পুরী বড় নির্ভরতার সাথে বলে ওঠেন যে, আলী মিয়াঁ এলে আমি এ কাজ তাঁর দ্বারাই করিয়ে নেব। আলী মিয়াঁর উপর তাঁর অগাধ বিশ্বাস ছিল। আলী মিয়াঁকে নিয়ে তিনি গৌরব করতেন।

হযরত রায়পুরীর এক খাদেম বলেন যে, একবার ১৩৮০ হিজরীর রমযান মাসে রায়পুরে উলামা-মাশায়েখের ভীড় জমে যায়। ঐ সময় হযরতের জন্য, শায়খুল হাদীছ সাহেবের জন্য এবং হযরত আলী মিয়াঁর জন্য পৃথক পৃথক তিনটি সুন্দর খাট পাতা হয়। এটি সম্ভবত ১৪ই রমযানের ঘটনা। উক্ত খাদেম যার সাথে হযরতের বংশগত সম্পর্ক ছিল তিনি হযরত রায়পুরীর শরীর ম্যাসেজ করছিলেন। এক ফাঁকে তিনি রায়পুরী সাহেবের নিকট জিজ্ঞেস

করলেন, হযরত! আপনার এবং শায়খের জন্য বিছানা পাতা আমাদের বুঝে আসে, কিন্তু আলী মিয়াঁকে এত সম্মান দেখানোর কারণ আমাদের বুঝে আসে না। হযরত তৎক্ষণাৎ জবাব দিয়েছিলেন, "তোমরা জান না, আলী মিয়াঁ মুজাদ্দিদে আলফে ছানীর হক কথা, শাহ ওয়ালী উল্লাহর চিন্তা-চেতনা এবং সাইয়েদ আহমাদ শহীদের জযবায়ে জিহাদের ফটোকপি। হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী, মাওলানা রহমাতুল্লাহ কিরানভী, মাওলানা রশীদ আহমাদ গংগুহী এবং মাওলানা কাসেম নানুতবী (রহ.) এর জিহাদে হেকমতে আমলীর উজ্জ্বল নমুনা এবং সাইয়েদ সুলায়মান নদভী, মাওলানা শিবলী নো'মানীর চিন্তাধারার বাস্তব চিত্র। মাওলানা ইলিয়াস, শায়খুল ইসলাম মাওলানা মাদানী এবং শায়খুল হাদীছ হযরত মাওলানা যাকারিয়া (রহ.) এর দু'আর ফসল। মনে রেখ, তিনি হযরত খাজা মঈনুদ্দীন চিশতী (রহ.) হতে সকল আকাবিরীনের আওয়াজের মুখপাত্র এবং আমার চোখের মণি।

হযরত রায়পুরী (রহ.) নিজ মজলিসে প্রায় সময় আলী মিয়াঁর কিতাব-পত্র পড়ে শুনানোর নিয়ম চালু করে ছিলেন। তিনি আলী মিয়াঁ ও তাঁর নতুন গ্রন্থাবলীর অপেক্ষায় প্রহর গুণতেন। হযরত রায়পুরী আলী মিয়াঁর চিঠির জবাবে নিজের এই সাগরেদকে "সাইয়েদী ওয়া মাওলায়ী" বলে সম্বোধন করতেন। উপরের ঘটনাগুলোর দ্বারা হযরত রায়পুরীর অন্তরে মাওলানা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভীর কি ধরনের মর্যাদা ছিল তা সহজেই উপলব্ধি করা যায়।

আল্লামা ইকবাল (রহ.)

১৯২৯ সালের জুন মাসে হযরত মাওলানা আবুল হাসান আলী নদভী (রহ.) তাঁর ফুফা মাওলানা মুহাম্মাদ তালহা এবং পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটির শিক্ষক আবদুল্লাহ চাগতাই এর সাথে কবি ইকবালের বাসায় গিয়ে তাঁর সাথে দেখা করেন। তখন হযরতের পরিচয়ের জন্য একথাগুলি বলা হয়েছিল।

(১) এ ছেলেটি 'গুলে রায়ানা'র লেখকের ছেলে।

(২) এ ছেলেটি আপনার কয়েকটি কবিতার আরবী অনুবাদ করেছে।

হযরত আলী মিয়াঁ কবি সাহেবের 'চান্দ' কবিতার আরবী অনুবাদ সাথে নিয়ে গিয়েছিলেন। আল্লামাকে এ অনুবাদ দেখালে তিনি আশ্চর্য হয়ে ভাবতে থাকেন যে, এই বয়সে এ কি করে সম্ভব! বিষয়টি পরীক্ষা করার জন্য তিনি

আলী মিয়াঁকে প্রাচীন আরব কবিদের সম্পর্কে বিভিন্ন প্রশ্ন করেন। হযরত আলী মিয়াঁ সে সকল প্রশ্নের এমন সুন্দর জবাব দেন যে, কবি ইকবাল খুশী হয়ে যান এবং বলে ওঠেন, "আপনি আরবী ভাষা ও সাহিত্যকে আপনার কর্মক্ষেত্র বানাবেন।"

১৯৩৭ সালের ২২শে নভেম্বর তিনি তাঁর ফুফা– লাহোর অরিয়েন্টাল কলেজের সাবেক প্রফেসরের সাথে গিয়ে ডক্টর ইকবালের সাথে দেখা করেন এবং ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মত বিনিময় করেন।

মাওলানা আলী মিয়াঁ
আল্লামা ইকবালকে আরব দেশে পরিচিত করেন

হযরত আলী মিয়াঁ যখন মিশর ও সিরিয়ার আরবী পত্র-পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও উপমহাদেশীয় অন্য কবিদের প্রশংসা এবং আলোচনা দেখতেন তখন তিনি জ্বলে উঠতেন। তিনি তখন আল্লামা ইকবালের কবিতা ও চিন্তাধারা আরবী ভাষার মাধ্যমে আরবদের কাছে তুলে ধরে কবি ইকবালকে সরাসরি পরিচয় করিয়ে দেবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। সুতরাং তিনি দ্বিতীয় বার সাক্ষাতের সময় তাঁর কবিতা অনুবাদ করার অনুমতি লাভ করেন এবং ডক্টর ইকবাল হযরত আলী মিয়াঁর উপর ভীষণ খুশী হন এবং দু'আ করেন।

হযরত মাওলানা আবুল হাসান আলী নদভী অত্যন্ত সুন্দরভাবে প্রাচ্যের এই দার্শনিক কবির মর্মবাণীকে 'রাওয়ায়ে ইকবাল' নামক গ্রন্থের মাধ্যমে আরবদের কাছে পৌঁছে দেন। এভাবে তিনি ইকবালের চিন্তা-চেতনাকে রাসুল (সা.)-এর দেশে পৌঁছে দিয়ে এক ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেন। এই গ্রন্থের উর্দূ অনুবাদ 'নুকুশে ইকবাল' প্রকাশিত হলে আল্লামা ইকবালের সাহেবযাদা– জাস্টিস জাভেদ ইকবাল এবং বিখ্যাত লেখক মাওলানা মাহেরুল কাদেরী হযরত আলী মিয়াঁর শুকরিয়া আদায় করেন এবং ভূয়সী প্রশংসা করেন।

শায়খুল হাদীছ হযরত
মাওলানা মুহাম্মাদ যাকারিয়া (রহ.)

উপমহাদেশের স্বনামধন্য শায়খুল হাদীছ হযরত মাওলানা যাকারিয়ার (রহ.)-এর সাথে হযরত আলী মিয়াঁর গভীর সম্পর্ক ছিল। তিনি তাঁর বিখ্যাত আরবী গ্রন্থাবলীর ভূমিকাগুলো আলী মিয়াঁকে দিয়ে লেখাতেন। অথচ ঐ সময়

ভারতে বড় বড় উলামা-মাশায়েখ ছিলেন। এক চিঠিতে হযরত শায়খ আলী মিয়াঁকে লেখেন যে, "বিনা দ্বিধা-সংকোচে বলছি– আপনার সাথে এই সম্পর্ককে নিজের জন্য নাজাতের ওসীলা মনে করি।" হযরত শায়খ, আলী মিয়াঁর চিঠিপত্র ও তাঁর আগমনের অপেক্ষায় থাকতেন। আলী মিয়াঁর হযরত রায়পুরীর হাতে বায়আত হওয়ার মূলে হযরত শায়খুল হাদীছ সাহেবের প্রত্যক্ষ সহযোগিতা ছিল। শায়খ রায়পুরীর সাথে আলী মিয়াঁর হজ্জে যাওয়ার সময় তিনিই নিজের মেয়ের পক্ষ থেকে আলী মিয়াঁকে বদলী হজ্জের ব্যবস্থা করে দেন।

পবিত্র মদিনায় অবস্থানের সময় জিকিরের মজলিসে হাজির হলে হযরত শায়খ হযরত আলী মিয়াঁকে প্রতিদিন ডিম এবং খমিরা (শক্তিবর্ধক হালুয়া) খাওয়াতেন। আলী মিয়াঁ কোন সময় মদীনা হতে অন্য শহরে গেলে খাদেমদের ইশারা করতেন যে, যতদিন তিনি বাইরে থাকবেন ততো দিনের খোরাক সাথে দিয়ে দাও। মদিনায় উপস্থিতির দিনগুলোয় তাঁর কাছে গাড়ী না থাকলে তাঁকে নিজের গাড়ীতে করে বাসায় না পাঠানো পর্যন্ত তিনি স্বস্তি পেতেন না। হযরত আলী মিয়াঁর চোখের অপারেশনের ব্যাপারে তাঁর চেয়ে শায়খই বেশী চিন্তান্বিত থাকতেন। অবশেষে শায়খের হুকুমেই আমেরিকায় আলী মিয়াঁর চোখের সফল অপারেশন হয়। হযরত শায়খ ঐ সময় দু'আর খুব এহতেমাম করেন এবং খাদেমদেরকে দু'আর জন্য হারাম শরীফ পাঠিয়ে দেন। উপরের ঘটনাবলীতে আমরা বুঝতে পারি হযরত আলী মিয়াঁ হযরত শায়খের কত প্রিয়পাত্র ছিলেন।

শায়খুল ইসলাম হযরত মাওলানা হোসাইন আহমাদ মাদানী (রহ.)

নদওয়া থেকে ফারেগ হওয়ার পর হযরত আলী মিয়াঁর বড় ভাই যিনি হযরত মাদানীর মুরীদ ছিলেন, তাকে দেওবন্দে হযরত মাদানীর খেদমতে পাঠিয়ে দেন। সেখানে তিনি কয়েক মাস হযরত মাদানীর হাদীসের দরসে এবং সোহবতে থেকে ফায়েদা হাসিল করেন। হযরত মাদানী তাঁকে খুবই শফ্কত ও মহব্বতের চোখে দেখতেন। কুরআন পাকের বিভিন্ন আয়াতের তাফসীর জানার জন্য হযরত মাদানী তাঁর এই প্রিয় শাগরেদকে কিছু পৃথক সময়ও দিতেন।

১৯৫০-৫১ সালে দীর্ঘ তাবলীগী সফরে মাওলানা আলী মিয়াঁ সৌদি আরব, মিশর, সুদান ও সিরিয়া যান। উক্ত সফরের কিছু বর্ণনা তাঁর ভাই মাওলানা আবদুল আলী সাহেব হযরত মাদানীকে জানালে হযরত মাদানী তাঁর জবাবে লিখেন, "মৌলভী আলী মিয়াঁর খবর আমি তাবলীগ জামাতের আমীর মাওলানা মুহাম্মাদ ইউসুফ ও অন্যান্যদের থেকে পাই। আপনার লেখায় আরো বিস্তারিত জেনে খুশী হলাম। দু'আ করি আল্লাহ পাক আলী মিয়াঁকে খায়ের বরকতের চাবী ও সকল অনিষ্টের প্রতিরোধক বানিয়ে দেন এবং হযরত সাইয়েদ আহমাদ শহীদের 'মিল্লাতে ইসলামিয়াঁ'র সংস্কারিক কার্যক্রমের নিশানবাহী বানিয়ে, স্বীয় নেয়ামত দিয়ে ভরপুর করে দিন।

আল্লামা সাইয়েদ সুলায়মান নদভী (রহ.)

তাযকিরায়ে সুলায়মান গ্রন্থের লেখক জনাব গোলাম মোহাম্মাদ সাহেব বলেন যে, ১৯৫০ সালের ১৯শে নভেম্বর মাগরিব বাদ হযরত সুলায়মান নদভী নিজের মা'মুলাত পুরো করার পর আমাদের দিকে ফিরে কথাবার্তা বলছিলেন। হঠাৎ করে সিরিয়ার রাষ্ট্রদূত হযরতের সাথে দেখা করতে আসেন। সালাম-কালামের পর তিনি জামায়াতে ইসলামী এবং তাবলীগ জামাত সম্পর্কে মাওলানার ব্যক্তিগত অভিমত জিজ্ঞাসা করেন। জবাবে হযরত আল্লামা বলেছিলেন, জামায়াতে ইসলামী দ্বীনের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট পেশ করে, আর তাবলীগ জামাত দ্বীনে খালেসের দায়ী। রাষ্ট্রদূত দ্বিতীয় প্রশ্ন করেন যে, মাওলানা মওদূদী এবং মাওলানা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভীর মধ্যে কে বড় আলেম? জবাবে তিনি বলেন, "মাওলানা আবুল হাসান আলী নদভী তো একজন বড় আলেম"। অন্যত্র আল্লামা সুলায়মান নদভী লেখেন যে, আজ আলী মিয়াঁ সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী নামে পৃথিবী বিখ্যাত। তাবলীগে দ্বীনের কাজে মশগুল। হেজাজ এবং মিশরের আকাশ বাতাস তাঁর দাওয়াতী মিশনে গুঞ্জরিত হচ্ছে। আল্লাহ পাক তাঁকে আরবী ভাষা ও সাহিত্যের নেয়ামত দান করেছেন যা তিনি আজ দাওয়াতী কাজে লাগাচ্ছেন।

হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ শফী (রহ.)

মুফতী মুহাম্মাদ শফী (রহ.) এর সাহেবযাদা, বিশিষ্ট আলেমে দ্বীন করাচীর মাওলানা তাকী উসমানী সাহেব বিভিন্ন মজলিসে বার বার উল্লেখ করেছেন যে, তাঁর পিতা হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ শফী সাহেব

বলতেন যে, হযরত মাওলানা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী (রহ.) موفق من الله- আল্লাহ্ পাকের পক্ষ থেকে তাওফীক প্রাপ্ত। হযরত মাওলানা আলী মিয়াঁর ফয়েজ ও বরকতে দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামা যে আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেছে তা ইসলামী দুনিয়ার এক উজ্জ্বল অধ্যায়। কিন্তু এর সাথে সাথে নদওয়াকে তিনি আরো একটি তোহফা দিয়েছেন যার ফলে তাঁর আযমত, মকবুলিয়াত, বিশ্বাস এবং সম্মানের ক্ষেত্রে অসাধারণ অগ্রগতি হয়েছে।

মাওলানা মানাযের আহসান গিলানী (রহ.)

বিখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ ও দার্শনিক আলেম হযরত মাওলানা মানাযের আহসান গিলানী (রহ.) এর অন্তরে হযরত আলী মিয়াঁর স্থান ছিল অনেক উচ্চে। দামেশ্ক ইউনিভার্সিটিতে মাওলানা আলী মিয়াঁ ভিজিটিং প্রফেসরের দাওয়াত পেলে হযরত গিলানী আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়েন এবং হযরত মাওলানা আলী মিয়াঁর এই মর্যাদা লাভে তিনি গৌরব অনুভব করতে থাকেন। মাওলানা গিলানী এক চিঠিতে মাওলানা আলী মিয়াঁকে মোবারকবাদ পেশ করেন। চিঠির এক স্থানে তিনি লেখেন যে, সত্যই আপনার উজ্জ্বল অস্তিত্ব আমার জন্য ঈর্ষার বিষয়।

অন্য এক চিঠিতে হযরত গিলানী লিখেছেন, "আল জমিয়ত ও মদীনার পত্রিকায় এই ঐতিহাসিক সম্মানের কথা পড়েছি, যা শতাব্দীর পর এ উপমহাদেশ অর্জন করেছে। আল্লামা সফিউদ্দীন বাদায়ুনীর পর সম্ভবত আপনিই দ্বিতীয় ব্যক্তিত্ব, যিনি সিরিয়াবাসীদের শিক্ষাদানে এবং নিজের এলম ও প্রজ্ঞা দিয়ে সিরীয়দের কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করার সুযোগ পেলেন। মাওলানা সফিউদ্দীন হিন্দী তো নিজ ইচ্ছায় গিয়েছিলেন আর আপনাকে সেখানকার ইউনিভার্সিটি এবং সরকার আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।

এ সম্মান শুধু আপনার ব্যক্তিত্ব পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকেনি; বরং এ সম্মান সকল ভারতীয় উলামাদের জন্য বয়ে এনেছে এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। ডাক্তার সাহেব (বড় ভাই) এবং আপনার সকল খানদানের খেদমতে মোবারকবাদ পেশ করতে গিয়ে যে খুশী আমি অনুভব করছি তা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়।"

হযরত গিলানীর মহব্বত

হযরত মাওলানা আলী মিয়াঁর বিখ্যাত গ্রন্থ "তারিখে দাওয়াত ওয়া আযিমাত" এর প্রথম খণ্ড হযরত গিলানীর খেদমতে পৌঁছালে তিনি নিম্নলিখিত বাক্যের মাধ্যমে মাওলানা আলী মিয়াঁকে নিজের হৃদয়ের আবেগের অভিব্যক্তি করেছিলেন– "দাওয়াত ওয়া আযিমাতের ইতিহাস মিলেছে, নিজের হারানো সম্পদ হাতে এসেছে। আল্লাহ পাকই জানেন কতবার এই গ্রন্থ পড়ে ফায়েদা লাভ করতে থাকবো। পড়েছি, অন্তর ভরে না, তৃপ্তি মিটেনা। আল্লাহ পাকই জানেন, আমার অন্তরের কত আশা-আকাঙ্খা আপনার দ্বারা পুর্ণ হবে।

হযরত মাওলানা মনযূর নো'মানী (রহ.)

আল ফুরকান পত্রিকার সম্পাদক হযরত মাওলানা মনযুর নো'মানী (রহ.) মাওলানা আলী মিয়াঁর চিরজীবনের সাথী ছিলেন। তাঁরই চেষ্টায় হযরত মাওলানা আলী মিয়াঁ কিছু ভালো দ্বীনী চিন্তা-চেতনার ক্ষেত্রে অগ্রসর হওয়ার সুযোগ পেয়েছিলেন। বিশেষ করে দাওয়াত ও তাবলীগ এবং হযরত রায়পুরীর সাথে সম্পর্ক কায়েমের ব্যাপারে তাঁর যথেষ্ট অবদান ছিল। তিনি সব সময় আলী মিয়াঁকে রফিকে মোহতারাম (সম্মানিত বন্ধু) বলে সম্বোধন করতেন। বহু বছর ধরে মাওলানা নো'মানী ও আলী মিয়াঁ একই সাথে উঠাবসা করতেন।

হযরত মাওলানা নো'মানী সাহেব হযরত আলী মিয়াঁকে কত ভালবাসতেন এবং মর্যাদার চোখে দেখতেন নিম্নের ঘটনাবলীর দ্বারা তা স্পষ্ট হয়ে যায়। হযরত নো'মানী বর্ণনা করেন যে, ১৯৫৪ ইং সালে রফিকে মোহতারাম আলী মিয়াঁ দারুল উলূম দেওবন্দের বিহারী ছাত্রদের সংগঠন 'সাজ্জাদ লাইব্রেরী' এর এক জলসায় প্রধান অতিথির ভাষণ দেওয়ার জন্য আমন্ত্রিত হন।

হযরত শায়খুল ইসলাম মাদানী (রহ.) উক্ত দাওয়াত নামার সাথে সাথে সুপারিশ সম্বলিত একখানা পত্রও দেন। ঐ সময় হযরত আলী মিয়াঁ খুবই অসুস্থ ছিলেন। তারপরও তিনি দাওয়াত কবুল করেন। তিনি দেওবন্দে তাশরীফ নিয়ে যান ও ছাত্র সমাবেশে ভাষণ দেন। তাঁর আলোচনার বিষয় ছিল 'তালেবানে উলূমে নবুয়ত কা মাকাম আওর উনকি যিম্মাদারীয়া' (নববী জ্ঞানের শিক্ষার্থীদের মর্যাদা এবং দায়িত্ব) প্রবন্ধটি তাঁর ফিরে আসার ২ সপ্তাহ

পরে আমার দৃষ্টি গোচর হয়। ঐ সময় আমি অনুভব করি যে, প্রবন্ধটি তিনি লেখেননি, বরং তাঁর দ্বারা লেখানো হয়েছে। আমি প্রবন্ধটি পড়ার পূর্বে প্রবন্ধকারের কিছু পরিচয় আপনাদের কাছে (আল ফুরকান পাঠকের কাছে) এ জন্য তুলে ধরছি যে, তাতে প্রবন্ধের কদর এবং মূল্যায়ন করা আপনাদের জন্য খুবই সহজ হবে বলে আমি মনে করি।

প্রথমকথা এই যে, এটা শুধু প্রবন্ধকারের কথাই নয় বরং এটা তাঁর অন্তরের দরদ, এটাই তাঁর অবস্থা এবং যে সব বিষয়ের দিকে দ্বীনী মাদাসার ছাত্রদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে, আল্লাহ পাকের খাস ইনায়েত এবং তাওফীকে প্রবন্ধকার নিজেই তার জীবন্ত নমুনা।

দ্বিতীয় কথা এই যে, আমার ৫০ বছরের অভিজ্ঞতার আলোকে বলছি, এ পৃথিবীতে এ ধরনের লোক খুবই কম পয়দা হয়েছেন, যাদেরকে আল্লাহ পাক তীক্ষ্ণ জেহেন (স্মৃতিশক্তি) দিয়েছেন এবং সাথে সাথে আলোকময় অন্তরও দিয়েছেন। যারা পরিবর্তিত দুনিয়ার অবস্থা ও চাহিদা সম্পর্কে জ্ঞাত এবং নবীগণের উত্তরাধিকার হিসেবে মজবুত ঈমানের অধিকারীও বটে। অবশ্যই দুনিয়াতে এ ধরনের ব্যক্তিত্ব একেবারেই কম। একেবারে হাতে গোনা ক'জন। আল্লাহ পাকের ঐ রকম বান্দা যারা এ দুই গুণে গুণান্বিত, এ অধমের এক হাতে যে কয়টি আঙ্গুল আছে তাঁর সমসংখ্যকও দেখেনি। দু'চারজন যাদের দেখেছি তাঁর মধ্যে মাওলানা আলী মিয়াঁ অন্যতম। আল্লাহপাক তাঁকে একদিকে চিন্তা ও চেতনার সঠিক মুখপাত্র বানিয়েছেন, সাথে সাথে সাহেবে কলবও। তিনি নিজের ইলম ও প্রজ্ঞার দিক দিয়ে আধুনিক, কিন্তু দ্বীন, ইয়াকীন, দ্বীনের গভীরতা এবং জীবনযাত্রার দিক দিয়ে পুরাতনও। তিনি জীবন্ত মাদরাসাও – খানকাহও।

হযরত মাওলানা
আবদুল মাজেদ দরিয়াবাদী (রহ.)

হযরত মাওলানা. আব্দুল মাজেদ দরিয়াবাদী (রহ.) তার সমসাময়িক উলামা মাশায়েখ ও মণীষীদের সম্পর্কে নিজের অভিব্যক্তির গ্রন্থ "মু'আসিরীন" এ মাওলানা আলী মিয়াঁ প্রসঙ্গে লিখেছেন–

আলী মিয়াঁ মরহুম নন, জীবিত। আল্লাহর রহমতে দ্বীন ও মিল্লাতের জন্য যুগ যুগ ধরে তাঁর কীর্তি এই ধরা পৃষ্ঠকে সজীব রাখবে। তিনি বয়সে আমার চেয়ে কিছুটা ছোট হলেও জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যে পরিপূর্ণত, সাধাসিধে চালচলন,

চিন্তা-চেতনা, স্বভাব-চরিত্র, ইখলাসের দিক থেকে, শিষ্টাচার আর খোদাভীতির ব্যাপারে, এবাদত-বন্দেগীতে এবং চেষ্টা-সাধনায় আমাদের চেয়ে অনেক বড়দের সমমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত। রায়েবেরেলীর সাইয়েদ বংশের অন্যদের সম্পর্কেও জানি। এরপরও তাঁর বাবা, মা, ভাই-বোনদের কথা বলার দরকার নেই। সব মিলে 'নূরুন আ'লা নূর' আলোর উপর আলো।

পাক-পবিত্র মাটির (যা তায়াম্মুম করার যোগ্য) দ্বারা তৈরী অনান্য আত্মীয়-স্বজনও নিজ স্থানে প্রশংসা এবং গৌরবের অধিকারী। তাঁরা প্রত্যেকেই তারকাতুল্য। এই তারকারাজির মধ্যে মাওলানা আলী মিয়াঁ জ্বলন্ত এক সূর্য্য।

নদওয়া এবং দেওবন্দ উভয় বিদ্যাপীঠের আকাবির থেকে মাশাআল্লাহ তিনি জ্ঞান আহরণ করেছেন। এছাড়াও নিজ বংশীয় বুযুর্গদের নিকট থেকেও ইখলাস আর আধ্যাত্মিকতার শিক্ষা গ্রহণ করেছেন। তীক্ষ্ম মেধা আর বুদ্ধি শুরু থেকেই তাঁর ছিল। চাঁদ, সূর্য তিনি আজন্মই। ইংরেজীও প্রয়োজন পরিমাণ শিখেছেন। আরবী সাহিত্যে তো হিন্দুস্তানসহ সারাবিশ্বে খ্যাতি অর্জন করে ফেলেছেন। উর্দূ পদ্য ও গদ্য সাহিত্যে পাণ্ডিত্য অর্জন করেছেন। সিরীয় ও মিশরীদের নিকটও গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করেছেন। বক্তৃতা আর গল্পেও অসাধারণ দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। আমার মত তিনি রোগা ও দুর্বল নন। দারুল উলূম নদওয়ার মত বিশাল প্রতিষ্ঠান তিনি পরিচালনা করছেন। বিভিন্ন আমন্ত্রণে গোটা হিন্দুস্তান চষে ফিরছেন। এখন এখানে, তখন সেখানে। প্রবন্ধ-নিবন্ধ লেখালেখির ব্যাপারে এই ভাবলেন আর সাথে সাথেই লিখে ফেললেন।

উর্দূ-আরবী ছাড়াও ইংরেজীতে এমনকি তুর্কীতেও বেশ কিছু লিখেছেন। তাঁর জীবন গর্বেরও, ঈর্ষারও। স্বয়ং আমার ব্যাপারে তাঁর কৃপণতা আর আত্মাভিমানের অভিযোগ অবশ্যই আছে। একবার নয়, হয়তো দুইবার। আর এটা কোন ইশারা-ইঙ্গিতে নয়, বরং মুখে মুখে সরাসরি জিজ্ঞেস করে ফেলেছিলাম, "হযরত! উঁচুমানের আধ্যাত্মিকতার রহস্য আমাদের কিছু শেখান, চেহারা থেকে নিজকে গোপন করার পর্দা একটু সরান। আপনার পূর্ণ মনোযোগ নিবদ্ধ করে আমাদেরকে একটু উষ্ণতা দিন। তিনি শুধু চুপ থাকলেন, এসব আব্দারের কোন জবাব পেলাম না। এমন অজ্ঞতার ভাব দেখালেন যেন জ্ঞানী হয়েও অজ্ঞতার পরিচয় দিচ্ছেন।

আলী মিয়াঁ প্রতিটি দিকে এত বিপুল পরিমাণের কাজ আঞ্জাম দিয়েছেন যে, কেউ যদি তাঁর কাজগুলোর বিস্তারিত অনুসরণ নয়, শুধু তার একটি সূচী তৈরী করে, তাহলেই সে এক বিরাট পণ্ডিত হিসেবে খ্যাতি অর্জন করবে। মোট কথা জাতীয়, রাজনৈতিক, দার্শনিক, ইতিহাস, জীবন চরিত আকাবির এবং শরীয়তের দার্শনিক তত্ত্বের উপর ব্যাপক কাজ করেছেন।

আমি আমার ওসীয়তনামায় (অন্তিম ইচ্ছার তালিকায়) লিখে যাচ্ছি যে, আমার শেষ নিঃশ্বাস চলে যাওয়ার পর সর্বপ্রথম যেন তাকেই (আবুল হাসান আলী নদভী) খোঁজা হয়। যদি তাঁকে পাওয়া যায়, তাহলে জানাযার নামায পড়ানোর প্রথম নম্বরের অধিকার তাঁরই।

সমগ্র দুনিয়ায় তাঁকে মাওলানা আবুল হাসান আলী নদভী বলে সম্বোধন করে, আর আমাদের মুখে শুধু আলী মিয়াঁটাই প্রিয় থেকে প্রিয়তর।

মাওলানা শাহ ওছিউল্লাহ ইলাহাবাদী (রহ.)

হযরত মাওলানা আলী মিয়াঁ হযরত হাকীমুল উম্মতের বিশিষ্ট খলীফা হযরত মাওলানা শাহ ওছিউল্লাহ সাহেবের সোহবতে কয়েকবার উপস্থিত হয়েছিলেন। তিনি তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন, একবার আমি ফতেহপুরে দুপুরের সময় হযরতের খেদমতে পৌঁছি। তখন খাওয়া-দাওয়া হয়ে গিয়েছিল। সংবাদ পেয়েই হযরত উপর থেকে নিচে নেমে আসেন এবং অত্যন্ত মহব্বত ও শফকতের সাথে উপরে নিয়ে যান। দীর্ঘক্ষণ আমার হাত ধরে রাখেন। খানা গরম করা হয়। তিনি আমাকে মাঝে মাঝে খানা লোকমা বানিয়ে মুখে তুলে দিচ্ছিলেন। আমি বুঝতে পারছিলাম না। আমি আশ্চর্য হচ্ছিলাম যে, আমার মধ্যে কোন যোগ্যতা না থাকা সত্ত্বেও, আর হযরত এত উঁচু মাকামে থাকার পরও এ অধমের সাথে প্রথম সাক্ষাতেই এ ধরনের ব্যবহার করছেন কেন?

একবার ১৯৬৪ সালের জুন মাসে হযরত শাহ সাহেব ইলাহাবাদে ছিলেন। মাওলানা আলী মিয়াঁ এলাহাবাদে হযরতের খেদমতে হাজির হওয়ার সংবাদ পাঠিয়েছিলেন, কিন্তু গাড়ী দেরীতে পৌঁছে। হযরত মাওলানা শাহ ওছিউল্লাহ সাহেব সেখানে উপস্থিত ছিলেন। দেখা হতেই বলে উঠেছিলেন, মাওলানা! নাস্তার সময় মনে করে আমি আপনার জন্য নাস্তা নিয়ে হাজির

হয়েছিলাম, কিন্তু এখনতো দুপুর হয়ে গেছে। তাই ঘরেই নাস্তা হবে। হযরত আলী মিয়াঁ হযরত শাহ সাহেবের এই ব্যবহারে লজ্জায়, আবেগে আড়ষ্ট হয়ে যান এই ভেবে যে, উপস্থিত হওয়ার সংবাদ কেন দিলাম।

হযরত শাহ সাহেব্ মাঝে মাঝে অস্থিরচিত্তে দাঁড়িয়ে যেতেন এবং কারো চুলে হাত দিয়ে কিছু কথা বলতেন। এ ধরনের এক ঘটনায় নিজের এক খাস শাগরেদ সুফী আব্দুর রব সাহেবকে উদ্দেশ্য করে তিনি বলেছিলেন, "সকলের অন্তর দেখেছি কিন্তু আলী মিয়াঁর মত অন্তর কারো পাইনি।" অন্য এক চিঠিতে মাওলানা আলী মিয়াঁকে তিনি লিখেছিলেন, যে সকল আলেম-উলামা আমার নিকট আসেন তাদের মধ্যে অন্তরের গতি আপনার দিকেই সবচেয়ে বেশী ধাবিত হয়।

হযরত শাহ মুহাম্মাদ ইয়াকুব সাহেব মুজাদ্দেদী (ভূপালী) (রহ.)

হযরত মাওলানা আলী মিয়াঁ হযরত শাহ সাহেবের সোহবতে যাতায়াত করতেন। তিনি 'সোহবতে বাআহলেদেল' নামে হযরত শাহ সাহেবের মজলিসের মালফুজাত জমা করে একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেছিলেন। এত বড় বুযুর্গ হওয়া সত্ত্বেও শাহ সাহেব আলী মিয়াঁকে খুবই সম্মান করতেন। ভূপালের সফরের সময় আলী মিয়াঁকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য তিনি নিজেই সেখানে হাজির হতেন। একবার তিনি স্টেশনে হাজির হতে পারেননি। হযরত আলী মিয়াঁ তাঁর খানকায় পৌঁছে গেলে তিনি বার বার তাঁর অপারগতার কথা আলী মিয়াঁকে জানিয়ে আফসোস করতে থাকেন এবং বলতে থাকেন, হযরত! বেআদবী হয়ে গিয়েছে, মাফ করে দিবেন।

একবার হযরত আলী মিয়াঁ হায়দ্রাবাদ থেকে ফিরছিলেন। ভূপালের মাওলানা ইমরান খানকে অল্প সময়ের জন্য ভূপালে অবস্থানের টেলিগ্রাম করেছিলেন। কিন্তু ঘটনাক্রমে গাড়ী ৪/৫ ঘন্টা বিলম্বিত হওয়ায় সব প্রোগ্রাম উলটপালট হয়ে যায়। ডিসেম্বর মাসে প্রচণ্ড শীত ছিল। গাড়ী ভূপাল পৌঁছালে মাওলানা ইমরান খান সাহেবের পাঠানো লোক ছুটে এসে সংবাদ দেয় যে হযরত! শাহ সাহেব আপনার জন্য স্টেশনে এসেছেন এবং সারারাত শীতে কষ্ট করেছেন। ইতিমধ্যে শাহ সাহেব আলী মিয়াঁর সাথে দেখা করেছিলেন। হযরত আলী মিয়াঁ মাথা নত করে টেলিগ্রাম দেয়ার জন্য আফসোস করছিলেন। অপরদিকে হযরত শাহ সাহেব বলে চলছিলেন, এমন সুন্দর রাত জীবনে আর কোন দিন পাইনি।

হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ আহমাদ ফুলপুরী (রহ.)

হযরত মাওলানা আলী মিয়াঁ, যামানার কুতুব এবং বিশিষ্ট বুযুর্গ হযরত মাওলানা আহমাদ ফুলপুরী (রহ.) এর খেদমতে মাঝে মাঝে হাজির হতেন। হযরত ফুলপুরীও তাকে খুবই মর্যাদা দিতেন। তিনি বলতেন, "যেহেতু আলী মিয়াঁ আল্লাহপাকের মাহবুব তাই আল্লাহ পাক তাঁকে ইলমের পর্দার মধ্যে লুকিয়ে রেখেছেন। তিনি যদি নিজকে জাহের করে দেন তবে অন্য পীরদের মুরীদ মিলবে না।"

অন্য এক চিঠিতে তিনি আলী মিয়াঁকে লিখেছিলেন যে, হযরতের ফিরে যাওয়ার পর একটি হাত চিঠি দিয়েছিলাম, এরপর একটি টেলিগ্রাম পাঠিয়েছি। এরপর একখানা জবাবী খাম পাঠিয়েছি, জবাবের অপেক্ষায় আছি। এখনও হযরতের খায়রিয়াত শুনতে পাইনি বলে বড় পেরেশান আছি। আমার দ্বারা কোন ভুল-ত্রুটি হলে মাফ করে দিবেন। সম্ভবতঃ আমার পত্র পাননি। অন্তর পেরেশান, তাই আপনার খোঁজখবর নেয়ার জন্য সুলতানুল হুদাকে আপনার খেদমতে পাঠালাম। এই পবিত্র মাসে (রমযান) আপনার জন্য দু'আ করে চলেছি এবং আমি নিজেও আপনার দু'আর মুখাপেক্ষী। আপনি সফরে থাকা অবস্থাতেও দু'আ জারী ছিল। আপনার সাথে আমার যে কি সম্পর্ক তা আপনি ভালো করেই জানেন। মনে-প্রাণে আপনার জন্য দু'আ করি।

বিশিষ্ট দাঈ হযরত মাওলানা কারী সিদ্দীক আহমাদ বান্দবী (রহ.)

হযরত মাওলানা কারী সিদ্দীক সাহেব বান্দবী (রহ.) হযরত মাওলানা আলী মিয়াঁকে খুবই সম্মান ও মহব্বত করতেন। নিম্নের একটি ঘটনায় কারী সাহেবের নম্রতা ও ইখলাস এবং হযরত আলী মিয়াঁর বড়ত্ব ও মহত্বের পরিচয় পাওয়া যায়।

একবার হযরত বান্দবী (রহ.) লাখনৌ আসেন এবং হযরত আলী মিয়াঁকে বলতে থাকেন, হযরত! আমার কিছু সাথী আমার মালফুজাত জমা করছে এবং তাঁরা ছাপাতে চাচ্ছে। আমি তাঁদের বলেছি যে, আমি প্রথমে গিয়ে হযরতের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে নেই, তারপর ছাপা হবে। আজ শুধু এ নিয়তেই খেদমতে হাজির হয়েছি, অন্যকোন উদ্দেশ্য নেই। এ আলোচনা সাধারণ মজলিসে চলছিল।

হযরত আলী মিয়াঁ বলে উঠেছিলেন যে, আমার পক্ষ থেকে শুধু অনুমতিই নয়; বরং দরখাস্ত এই যে, আপনি এই মালফুযাত অবশ্যই ছাপুন। ইনশাআল্লাহ বহুত ফায়েদা হবে।

অন্য এক চিঠিতে হযরত বান্দবী (রহ.) আলী মিয়াঁকে লিখেছিলেন, আহকার নিজের আকাবিরের সাথে মহব্বত এবং আকীদাত কায়েম রেখেছে আলহামদুলিল্লাহ। এ সময়ে হযরত ওয়ালার যে মহব্বত ও সম্মান আমার অন্তরে আছে তাঁর স্থান সকলের উপরে। এটাই আমার জীবনের পুঁজি, আল্লাহ পাক শেষ সময় পর্যন্ত এটাকে অক্ষুণ্ন রাখুন।

আরেফ বিল্লাহ ডাক্তার আব্দুল হাই (রহ.)

হযরত ডাক্তার আবদুল হাই সাহেব হাকীমুল উম্মতের বিশিষ্ট খলীফা ছিলেন। তিনি তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম (সা.)'-এর আরবী এডিশনের ভূমিকা লেখার জন্য হযরতের কাছে যে চিঠি দিয়েছিলেন, তাতে তাঁর অন্তরে মাওলানা আলী মিয়াঁর কি মাকাম ছিল তা পরিস্কার হয়ে যায়।

তিনি লিখেন, "আল্লাহ পাক নিজের ফযল ও করমে বর্তমান যুগে আপনার হৃদয়, যবান এবং কলমে এমন এক বৈশিষ্ট্য দান করেছেন যা নিজের শানে পরিস্ফুটিত। (এটা আল্লাহর অপার দান) ذالک فضل الله- মা-শা আল্লাহ। আপনি সারাক্ষণ দাওয়াত ও ইশাআতের কাজেই লিপ্ত আছেন। আল্লাহ পাক কবুল করুন। اللهمّ زد فزد- আরব দেশে বিশেষ করে সৌদী আরবে আপনার তাবলীগী খেদমতের যথেষ্ট প্রতিক্রিয়া আছে। এ আশায় যদি এই গ্রন্থের ভূমিকা আপনি লেখেন তাহলে এই কিতাবের প্রচার ঐসব দেশে সম্ভব হবে।"

আল্লামা ইউসুফ বিন্নুরী (রহ.)

হযরত মাওলানা ইউসুফ বিন্নুরী (রহ.) পাকিস্তানের বহুত বড় আলেম ছিলেন। তিনি তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ মাআরিফুস সুনান গ্রন্থ প্রকাশিত হলে হযরত আলী মিয়াঁর নিকট পাঠিয়ে দেন। হযরত বিন্নুরী আলী মিয়াঁর নামের সাথে آية من آية الله- "আল্লাহ পাকের নিশানসমূহের মধ্যে একটি নিশান" এই বাক্য ব্যবহার করেছিলেন। উক্ত ঘটনার দ্বারা হযরত বিন্নুরীর অন্তরে আলী মিয়াঁ কত বড় স্থান দখল করেছিলেন তা সহজেই অনুমেয়।

হযরত মাওলানা তাকী উসমানী (দাঃ বাঃ)

পাকিস্তানের প্রখ্যাত আলেম হযরত মাওলানা তাকী উসমানী (দাঃ বাঃ) বলেন- আল্লাহ্ পাক এ যামানায় হযরত আলী মিয়াঁর দ্বারা যে আযিমুশ্বান খেদমত নিয়েছেন, তা সত্যই আশ্চর্যের ব্যাপার এবং তাঁর প্রতিক্রিয়া উপমহাদেশ পেরিয়ে আরব দুনিয়া এমনকি পাশ্চাত্য সমাজ পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছে। এ ধরনের সৌভাগ্য খুব কম লোকেরই হয়ে থাকে। আল্লাহ্পাক তাকে যে ধরনের চিন্তাধারার শুভ্রতা ও উম্মতে ইসলামিয়াঁর জন্য যে ধরনের ব্যথা ও দরদ দান করেছেন এবং তাঁর দ্বারা তিনি যে কাজ নিয়েছেন তা শুধুমাত্র ভাষা ও সাহিত্যের পণ্ডিতদের দ্বারা সম্ভব নয়।

হযরত মাওলানা আলী মিয়াঁ

(আরব উলামাগণের নজরে)

১৯৫০ সালের নভেম্বর মাসে সৌদী আরবে দাওয়াতী সফরের সময় হযরত মাওলানার জীবন এবং কর্মের উপর সৌদী বেতার থেকে একটি প্রবন্ধ প্রচার করা হয়। উক্ত প্রবন্ধে হযরত মাওলানা আলী মিয়াঁকে তৎকালীন বিশ্বের খ্যাতনামা ইসলামী চিন্তাবিদ এবং আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্ব হিসেবে উল্লেখ করা হয়। তাঁকে একজন আদর্শ পুরুষ হিসেবে পেশ করে রেডিওতে উল্লেখ করা হয় যে, মাওলানার মধ্যে আমরা দ্বীনদারী, তাকওয়া, পবিত্রতা, সাধারণ জীবন যাত্রা, নির্লোভ প্রভৃতি এমন কিছু গুণের সমারোহ দেখেছি যাতে করে তাঁকে আমাদের আসলাফগণের সঠিক নমুনা হিসেবে পেশ করা যায়।

হযরত মাওলানা আলী মিয়াঁর সকল চিন্তা-চেতনা বর্তমান মুসলিম জাহানের দ্বীনী এবং আখলাকী হালাতকে জাগরুক রাখার জন্য কেন্দ্রীভূত হয়ে আছে। তাঁর দাওয়াত, তাঁর সাহিত্য সাধনা, তাঁর ব্যথিত হৃদয় মুসলিম উম্মাহর কল্যাণে নিয়োজিত রয়েছে। রেডিওতে প্রচারিত এই প্রবন্ধের মাধ্যমে গোটা মুসলিম জাহানে আলী মিয়াঁর ব্যাপক পরিচিতি গড়ে ওঠে। নিম্নের কয়েকজন খ্যাতনামা আরবী শায়খ এবং সাহিত্যিকের বক্তব্য থেকে হযরত মাওলানা আলী মিয়াঁর আরব জাহানে ব্যাপক পরিচিতি ও সমাদৃতির বিষয়টি আন্দায করা যায়।

আল্লামা ইউসুফ আল কারযাভী (কাতার)

ফযিলাতুশ শায়খ ইউসুফ আল কারযাভী বর্তমান আরব বিশ্বের একজন খ্যাতনামা মুসলিম চিন্তাবিদ, লেখক ও দায়ী হিসেবে ভূয়সী প্রশংসা কুড়িয়েছেন। তিনি বর্তমানে কাতার ইউনিভার্সিটির ইসলামী শরীয়া বিভাগের ডীন হিসেবে কর্মরত। তিনি মিসরে জন্মগ্রহণ করেন। আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করেন এবং সেখান থেকেই ডক্টরেট ডিগ্রী অর্জন করেন। তিনি একজন বিখ্যাত খতীব। মাওলানা আলী মিয়াঁর মিশর সফরের সময় প্রথম পরিচয় হয়। তিনি তাঁর কাছে সেখানে কিছু দিন পড়াশুনাও করেছিলেন এবং তাঁর সোহবতে অবস্থান করেছিলেন।

সৌদী ফয়সাল পুরস্কার পাওয়ার পর শায়খ কারযাভী এক চিঠিতে হযরত মাওলানাকে মোবারক বাদ দিতে গিয়ে বলেন, "সালাম বাদ ফয়সাল পুরস্কার পাওয়ার জন্য আপনাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামী শরীয়া বিভাগের পক্ষ থেকে আমরা আমাদের হৃদয় নিংড়ানো মোবারক বাদ পেশ করছি। আমার কাছে মনে হয় আপনার মত ব্যক্তিত্ব এ পুরস্কার লাভ করায় স্বয়ং পুরস্কারের দামই বেড়ে গেছে। আমি আপনাকে একজন খালেস দ্বীনী দায়ী হিসেবে তিরিশ বছর ধরে জানি। আপনার সাথে সাক্ষাতের পূর্বে আপনার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ "মা-যা খাসিরাল আলাম বিইনহিতাতিল মুসলিমীন" পড়েছিলাম। পড়ার পর ১৯৫১ সালে মিশরে আপনার সাথে পরিচয় হয়।

তখন আমি জামিয়াঁ আযহারের ছাত্র ছিলাম। ঐ সময় আমার অন্তরে আপনার মত একজন মুখলেস দাঈ মুয়াল্লিমের আদর্শ নমুনা বসে যায়। আপনি ঐ সময় আমাদের নওজোয়ানদের তরবিয়ত করতেন। নিজের ঈমানী শক্তি দিয়ে আমাদের অন্তর গরম করতেন। নিজের চিন্তা ও চেতনা দিয়ে আপনি আমাদের মন জয় করেছিলেন। এরপর হযরত মাওলানা আওকাফ বিভাগের আমন্ত্রণে কাতার সফর করেন ১৯৯৫ সালে। শেখ কারযাভী হযরত আলী মিয়াঁর এক বয়ানের পর আবেগাপ্লুত হয়ে দাঁড়িয়ে যান এবং হযরতের উপর পারিচিতিমূলক কিছু কথাবার্তা বলেন– "শায়খ আবুল হাসান আলী আমার প্রিয়। নিঃসন্দেহে তাঁর সাথে আমার মহব্বত আছে। আল্লাহপাকের কাছে দু'আ করি এ মহব্বত যেন শুধু আল্লাহর জন্য হয়। শায়খ নিজের তাকওয়া, পরহেজগারী, ইখলাস ও বুযুর্গীর কারণে আমার প্রিয়।"

শায়খ আব্দুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দা (রহ.)

মুহাদ্দিসে জলীল, শায়খ আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দা রিয়াদের মুহাম্মাদ বিন সৌদ ইউনিভার্সিটির হাদীছের উস্তাদ ছিলেন। তিনি মূলতঃ সিরিয়ার অধিবাসী ও জামেয়ার ছাত্র ছিলেন। তাঁর নিকট হযরত আলী মিয়াঁ খুবই প্রিয় ছিলেন। শায়খ আবুল ফাত্তাহ যে চারজন বিশেষ ব্যক্তিদের জন্য দু'আ করতেন তাঁর মধ্যে মাওলানা আলী মিয়াঁ অন্যতম। তিনি দেওবন্দ ও নদওয়া কয়েকবার এসেছিলেন।

এক চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন, 'আল্লাহ পাক আপনার ব্যক্তিত্বের মধ্যে আমাদের অতীত ইতিহাসের গৌরবান্বিত উজ্জল অধ্যায়গুলি দেখিয়েছেন। উলামায়ে সালাফের স্মরণ পুনরুজ্জীবিত হয়েছে। আপনি নিঃসন্দেহে ঐ আসলাফের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়ার উত্তম দৃষ্টান্ত বটে; যাদের অন্তরে আল্লাহ পাক নিজের এবং তাঁর রাসুলের মহব্বত সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহপাক আপনাকে দীর্ঘজীবি করুন।

অন্য এক চিঠিতে লিখেছিলেন যে, আল্লাহপাক আপনাকে কলমের শক্তি এবং ইখলাসের দৌলত দান করেছেন। আপনার চিন্তা চেতনা মিল্লাতে ইসলামিয়াঁর নওজোয়ানদের অন্তরের চাবি এবং তাঁদের হিম্মতকে বৃদ্ধি করার ঐ মাধ্যম হিসেবে পরিগণিত হয়েছে, যার দ্বারা উম্মতে মুসলিমার প্রথম যুগের কাফেলাসমূহ পরিচালিত হতো।

শায়খ আলী তানতাবী (মক্কা মোকাররমা)

বর্তমান বিশ্বের খ্যাতনামা আরবী সাহিত্যিক শায়খ আলী তানতাবী দামেস্কে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সিরিয়া ইউনিভার্সিটি থেকে ল' পাস করেন এবং হাইকোর্টে আইন ব্যবসা শুরু করেন। পরে সৌদী আগমন করেন। তিনি অনেক গ্রন্থের লেখক। বর্তমানে মক্কাশরীফে অবস্থান করছেন।

তিনি হযরত আলী মিয়াঁর রচনা এবং ফিকরী কার্যক্রমের খুবই প্রশংসা করতেন এবং তাকে ভালবাসতেন। এক চিঠিতে তিনি আলী মিয়াঁকে লিখেছিলেন– "আমার বক্তব্য ব্রডকাস্ট করছিলাম। হঠাৎ এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলো পৃথিবীতে আপনার কোন শহরটি সবচেয়ে প্রিয় এবং কোন শহরের সাথে আপনার স্মৃতি বিজড়িত? ঐ ব্যক্তির বিশ্বাস ছিল যে, আমি জবাবে দামেস্কের নাম নেব। কিন্তু আমি যখন লাখনৌ শহরের নদওয়াতুল উলামার নাম নিলাম তখন তাঁর আশ্চর্যের সীমা থাকলো না। ঐ ব্যক্তি অবাক হয়ে

জিজ্ঞাসা করল, লাখনৌ কোথায়? আমি বললাম, এটা আবুল হাসান আলী নদভীর শহর।" এতে কোন সন্দেহ নেই যে, আরব বিশ্বে আপনি লাখনৌর চেয়ে অনেক বেশী প্রসিদ্ধ। লাখনৌর পরিচয় তো আপনার সত্তার মাধ্যমে হয়ে থাকে।

সাইয়েদ কুতুব শহীদ রহ. (মিশর)

আরব বিশ্বের বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ এবং প্রখ্যাত লেখক সাইয়েদ কুতুব শহীদ (রহ.) হযরত মাওলানাকে উচ্চ মর্যাদার চোখে দেখতেন। হযরতের কিতাব "মাযা খাছিরাল আলাম" প্রকাশিত হলে তিনি এ গ্রন্থ সম্পর্কে তাঁর মতামত ব্যক্ত করতে যেয়ে উল্লেখ করেন, বর্তমান যুগের সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন হল মুসলমানদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনা। তাঁদের মধ্যে অতীতের উপর নির্ভরতা এবং ভবিষ্যতের উপর আশা-ভরসা করার মনোবৃত্তি সৃষ্টি করা। এই দ্বীন মুসলমানদের খুবই কম বুঝে এসেছে।

এ বিষয়ে নতুন ও পুরাতন যে কয়েকখানি গ্রন্থ আমার নজরে এসেছে তাঁর মধ্যে হযরত মাওলানা আবুল হাসান আলী নদভীর নতুন লেখা ।ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين - আমার কাছে বিশেষ মর্যাদার অধিকারী।

খানায়ে কা'বায় প্রবেশের বিরল সম্মানঃ

১৯৯৬ সালে মুসলিম বিশ্বের গৌরব হযরত মাওলানা আলী মিয়াঁকে কাবা শরীফে প্রবেশ করার জন্য বায়তুল্লাহর দরজার চাবি পেশ করা হয়। রাবেতায়ে আলমে ইসলামীর সদস্যবৃন্দ সমভিব্যহারে হযরত মাওলানা খানায়ে কাবায় প্রবেশ করেন। এ বিরল সম্মানের কথা পত্র-পত্রিকা এবং মিডিয়ার মাধ্যমে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে। এঘটনার দ্বারা আরব জাহানে হযরত মাওলানার কি ধরনের মকবুলিয়াত ও গ্রহণযোগ্যতা ছিল তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

বায়তুল্লাহর ইমাম ফযিলাতুশ শায়খ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ সুবাইল

শায়খ মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ কাবা শরীফের সব চাইতে প্রবীণ ইমাম। বহু বছর ধরে তিনি মসজিদে হারামে ফজর এবং এশার নামাযে ইমামতি করে আসছেন। তিনি মক্কা-মদীনা উভয় হেরেমের সকল প্রশাসনিক কাজের জিম্মাদার। ১৯৯৭ সালের ১২/১৩ই নভেম্বর কাদীয়ানীদের উপর এক

আন্তর্জাতিক সেমিনারে অংশগ্রহণ করার উদ্দেশ্যে শায়খ সুবাইল, মসজিদে আকসার ইমাম সহ উলামায়ে কেরামের এক বড় জামাত নিয়ে নিজের বিশেষ প্লেনে করে লাখনৌ উপস্থিত হন। কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে সভাপতি হিসেবে শায়েখের নাম ঘোষণা করার ইশারা করা হলে শায়খ সুবাইল বিস্মিত হয়ে বলে ওঠেন, সেমাহাতুশ শায়খ আবুল হাসান আলী নদভী উপস্থিত থাকতে আমি সভাপতিত্ব করব! আল্লাহু আকবার! আল্লাহ পাক হযরত আলী মিয়াঁকে আরব উলামা এবং মাশায়েখের নজরে কত বড় করেছিলেন, এ ঘটনা তাঁর জ্বলন্ত প্রমাণ।

==ooo==

অধ্যায়-১৬

চিঠিপত্র

বুযুর্গ ও মনীষীদের চিঠিপত্র জমা করা এবং তা থেকে ফায়েদা লাভের শওক মুসলমানদের মধ্যে সব সময় বিদ্যমান ছিল। মাকতুবাতে ইমামে রব্বানী, মাকতুবাতে হযরত মাখদুমুল মুলক শরফুদ্দীন ইয়াহইয়া মানেরী, মাকাতিবে ইলিয়াস, মাকতুবাতে শায়খুল ইসলাম মাদানী, আল্লামা সাইয়েদ সুলায়মান নদভী, মাওলানা শিবলী নোমানী ও মাওলানা আবুল কালাম আযাদসহ বহু উলামায়ে কেরামের মাকতুবাত (চিঠিপত্র) নিজ নিজ পরিসরে ইলমী, দ্বীনী এবং সাহিত্যিক সম্পদ হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। হাদীছ শরীফে কায়সার ও কিসরার নিকট প্রেরিত রাসূলে পাক (সা.)-এর চিঠিপত্র সংরক্ষিত রয়েছে। এ ছাড়া স্বয়ং কুরআনে পাকেও হযরত সুলায়মান (আ.)-এর পক্ষ থেকে সাবার রাণী বিলকিসের নিকট চিঠি প্রদান করার আলোচনা এসেছে। এজন্য চিঠি পত্র একত্র করা এবং মানুষের উপকারের জন্য তা প্রকাশ করা এক বড় দ্বীনী খেদমত।

হযরত মাওলানার চিঠিপত্রের বিশাল সম্ভার একত্র করার প্রচেষ্টা দ্রুত গতিতে অগ্রসর হচ্ছে এবং অচিরেই তা প্রকাশিত হবে। হযরতের জীবদ্দশাতেই তাঁর প্রিয় শাগরেদ মাওলানা আব্দুল করীম পারেখ হযরত মাওলানা আলী মিয়াঁর দুইশত বিশটির মত চিঠির একটি সংকলন বের করেছেন। এছাড়া হযরত মাওলানা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী (রহ.) সৌদী আরবসহ মধ্যপ্রাচ্যের বাদশাহ ও আমীর ও সুলতানদের কাছে তাদের দায়িত্ব এবং কর্তব্য স্মরণ করিয়ে কয়েকটি মূল্যবান চিঠি লিখেছিলেন। সে সকল চিঠিতে তিনি তাঁদেরকে বর্তমান মুসলিম জাহানের করুন অবস্থার কথা উল্লেখ করে অবস্থার পরিবর্তনে, কার্যকর ভূমিকা পালন করার জন্য উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছিলেন। হেজাযে মুকাদ্দাস ও জাজিরাতুল আরব নামক গ্রন্থে ঐ চিঠিগুলি প্রকাশিত হয়েছে।

এছাড়া ভারতের বিভিন্ন সময়ের রাষ্ট্রপ্রধান, প্রধান মন্ত্রী এবং নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের কাছেও তিনি বহু চিঠি লিখেছিলেন। এ চিন্তা থেকেই উপমহাদেশের স্বনামধন্য আলেমে দ্বীন হযরত মাওলানা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী (রহ.)-এর হাজার হাজার চিঠিপত্রের মধ্য হতে মাত্র কয়েকটি চিঠির অনুবাদ এখানে পেশ করা হল।

বাদশাহ্ ফয়সালের নিকট পত্র

[১৯৬১ সাল। আমীর ফয়সাল ইবনে আব্দুল আযীয তখন সৌদী সরকারের প্রধানমন্ত্রী ও বাদশাহ্ সউদ ইবনে আব্দুল আযীয-এর যুবরাজ। হযরত মাওলানা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী হজ্ব-উমরা এবং বিভিন্ন সভায় যোগদানের জন্য বার বার সৌদী আরব গিয়েছেন। তেমনি এক সফরকালে তিনি জানতে পারলেন যে, সৌদী সরকার সে দেশের উন্নতি ও জনগণের সুখের নামে আধুনিক সংস্কৃতির উপকরণাদি, বিনোদন যন্ত্রাদি এবং সৌদী আরবকে প্রতিবেশী উন্নত দেশসমূহের পদাংক অনুসরণ করে চালানো ও পশ্চিমা সভ্যতা থেকে কিছু কিছু বিষয় গ্রহণ করার ব্যাপারে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করছে। এতে আরব যুব সমাজের অস্থিরতা দূর হবে এবং মিসরের পত্র-পত্রিকা, রেডিও ও তার বিনোদন কর্মসূচী দ্বারা সৌদী সমাজে যে অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে তার অবসান হবে। হযরত মাওলানা আবুল হাসান আলী নদভী এ বিষয়ে নিশ্চিতরূপে কিছু জানতে না পারলেও আশংকাবোধ করতে লাগলেন। তাই এ প্রসঙ্গে সৌদী সরকারের দায়িত্বশীলদের সাথে আলাপ করতে মনস্থ করলেন। ঘটনাক্রমে তখন সৌদী যুবরাজ আমীর ফয়সাল মদীনা মুনাওয়ারায় আগমন করলেন। হযরত মাওলানাও মদীনাতেই অবস্থান করছিলেন। তিনি সুযোগ বুঝে যুবরাজের সাথে দেখা করলেন এবং তার সাথে একান্তে মিলিত হয়ে হারামাইন শরীফের হেফাজতের জিম্মাদার হিসেবে সৌদী সরকারের কর্তব্য সম্পর্কে তাকে সচেতন করলেন। যুবরাজও অত্যন্ত ধৈর্যের সাথে তাঁর বক্তব্য শুনলেন এবং ইসলামী শিক্ষা ও আকায়েদের পরিপন্থি কোন কিছুর অনুমতি দেওয়া হবে না বলে সৌদী সরকারের মনোভাব ব্যক্ত করলেন। এরপর হযরত মাওলানা অনেকবার মক্কা মদীনায় গিয়েছেন। এসময়ে সেখানকার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক কারণে সৌদী সরকারে আকস্মিক পরিবর্তন ঘটে। হযরত মাওলানা তখন যুবরাজ ফয়সলকে নিম্নোক্ত পত্র লেখেন।]

সম্মানিত যুবরাজ ও প্রধানমন্ত্রী,

আস্‌সালামু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু

আল্লাহ তা'আলা আপনাকে যেসব নেয়ামতে ভূষিত করেছেন তা স্থায়ী ও অক্ষুণ্ন রাখুন এবং এমন কাজের তাওফীক দান করুন যাতে আল্লাহর সন্তুষ্টি রয়েছে, যা মুসলমানদের নিকট প্রশংসনীয় হয় এবং ভবিষ্যত প্রজন্মের মুখে যার আলোচনা থাকবে।

আপনি নিশ্চয়ই ভালভাবে অবগত আছেন যে, এ দেশ অন্যান্য দেশের মত নয় যে, এখানকার সভ্যতা ও উন্নতি, জনকল্যাণ, শিক্ষা-দীক্ষা ও জনসমর্থন লাভের জন্য প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের কোন দেশের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। এটি এমন দেশ, যার সম্পর্কে আল্লাহর অভিপ্রায় ও সিদ্ধান্ত হলো এটি

ইসলামের রাজধানী, দ্বীনের দুর্গ ও মুসলমানদের অন্তরের স্থিরতার স্থান হবে। এ দেশ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আমানত, তাঁরই আগমনের ফলে অন্ধকার থেকে আলোতে এবং অনেক জাতির মত অপরিচিতির গহ্বর ও ইতিহাসের আস্তাকুড় থেকে বেরিয়ে প্রসিদ্ধি ও নেতৃত্ব এবং বিশ্বের কেন্দ্রিয়তার উচ্চ স্থানে পৌঁছেছে। এখানকার ভাষা ও সংস্কৃতি বিশ্বের বিস্তীর্ণ এলাকা, ইতিহাসের দীর্ঘ যুগ এবং জাতি-সম্প্রদায়সমূহের বিচিত্র বৃত্তে প্রসার লাভ করেছে।

এজন্য দ্বীন ও আমানত, ব্যক্তিত্ব ও ভদ্রতা, ঐতিহাসিক বাস্তবতার স্বীকার এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে ছড়িয়ে থাকা মুসলমানদের মনোভাবের প্রতি লক্ষ্য রাখা ও প্রজ্ঞাপূর্ণ রাজনীতির দাবী হল- এখানে যেসব নিয়ম কানুন প্রণীত হবে, যে লক্ষ্যবস্তু নির্ধারিত হবে অথবা রাষ্ট্রের যে নীতি নির্ধারিত হবে এবং জীবনের যে ধারা আত্মস্থ করা হবে, তাতে দেশের বিশেষ বৈশিষ্ট্য তার বিশ্বকেন্দ্রিকতা, তার শাশ্বত আহবানের পূর্ণ লক্ষ্য রাখতে হবে এবং এমন প্রতিটি বিষয় থেকে বিরত থাকতে হবে যা তার মূলনীতি ও বিশ্বাসের পরিপন্থী, তার বৈশিষ্ট্য ও মর্যাদাহানিকর, তাতে দেশের যতই বস্তুগত লাভ হোক এবং দেশের বাসিন্দাদের সচ্ছলতা ও স্বাচ্ছন্দ্য লাভ হোক। এ দেশ ও তার পরিচালকবৃন্দকে নিজ বিশ্বাসের পথে তার চেয়ে বেশী ত্যাগ স্বীকার করতে হবে যা কমিউনিষ্ট রাশিয়া ও পুঁজিবাদী আমেরিকার নেতৃবৃন্দ দেশের জন্য দিচ্ছেন। তারা নিজের মূলনীতি ও চিন্তাধারা এবং দেশের জীবনধারার বিপরীতে কোন ক্ষুদ্র বিষয়েরও অনুমতি দেয় না তাতে যতবড়ই ভৌতিক ও আর্থিক লাভ হোক।

অনেক মানুষের ধারণা- জীবনকে স্বাচ্ছন্দময় ও আরামদায়ক করার বিষয়সমূহ গ্রহণ করা ও পাশ্চাত্যের অনুগমন ও অবাধ প্রচার কর্মসূচী এবং পশ্চিমা জীবনধারা অবলম্বন করায় (দেশের প্রকৃত উন্নতি ও সংহতির সাথে যার সম্পর্ক নেই) কোন ক্ষতি নেই। এতে জনসাধারণের অস্থিরতার প্রতিকার হয় এবং তারা অসৎ চিন্তা থেকে রক্ষা পায়। (কিন্তু আমাকে ক্ষমা করবেন) আমি ইতিহাস ও অভিজ্ঞতার এ অভিমতের সাথে একমত হতে পারছি না। আমার নগণ্য ধারণায় এটি কোন প্রতিকার নয়। সাগরের লবণাক্ত ও ক্ষার পানি তো পিপাসার্তকে তৃপ্ত করার পরিবর্তে তা পিপাসা আরো বাড়িয়ে দেয়। সঠিক প্রতিকার, ইসলামের সামাজিক সুবিচার প্রতিষ্ঠা, দেশের শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতি, হালাল রুজির সংস্থান, স্বনির্ভর করার উপায়সমূহ, কারখানা

নির্মাণ, জীবনোপকরণসমূহ সুলভ হওয়া ও বৈধ সুবিধাসমূহের ব্যবস্থা করা, এগুলোর ক্ষেত্র সংকীর্ণ ও সীমিত নয়। শরীয়ত ও মানব প্রকৃতি সম্পর্কে অজ্ঞ ব্যক্তিরাই এরূপ মনে করে। যে অনুসরণ-অনুকরণ ও স্থূল চিন্তাধারা যে কোন গড্ডালিকা প্রবাহে ভেসে যায়, তার মোটেই প্রতিরোধ করতে পারে না যা যে কোন প্রচারণার সামনে মাথা নুইয়ে দেয় ও সকল প্রকারের দাবী মেনে নেয়। তা যে কোন দেশ ও সরকারের জন্য ক্ষতিকর এবং তা অনতিবিলম্বে নৈতিক বিপর্যয়, অস্থিরতা ও দুষ্কর্মের বিস্তার ঘটাতে পারে। অনেক দেশই এ পরিস্থিতির শিকার হয়েছে এবং এতে সেসব দেশের নেতৃবৃন্দ ও সংস্কারকদের হাত থেকে ইচ্ছাশক্তি কেড়ে নিয়েছে। এখন তাদেরকে অসহায় দেখা যায়।

এ ধরনের প্রবণতা এসব পবিত্র শহরের সম্মান-মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্য দুর্বল করে দেবে। অতীতের সাথে তার সম্পর্ক ছিন্ন করে দেবে। এসব পবিত্র শহরসমূহের নেতৃবৃন্দের জন্য আল্লাহর রহমত ও সাহায্যের পথে অন্তরায় সৃষ্টি হবে, যা ব্যতীত (এই নাজুক সময়ে যখন দুশমন অত্যন্ত শক্তিশালী ও ধূর্ত এবং প্রতিপদে আল্লাহর সাহায্যের প্রয়োজন) কোন জয় ও সাফল্য, সম্মান ও মর্যাদা এবং নিরাপত্তা ও শান্তির আশা করা যায় না।

যদি এদেশও সেদিকে ধাবিত হয়, যার পরামর্শ অনেকে দিচ্ছে এবং মিসর, সিরিয়া ও লেবানন যে লাগামহীন স্বাধীনতা ও নৈতিক ও শরয়ী সীমা লংঘনকারী বিলাসিতার পথে ধাবিত হচ্ছে, সে পথই অবলম্বন করে, তেমনি অন্যান্য আরব রাষ্ট্রের সাথে প্রতিযোগিতা করে জাতীয়তাবাদের দর্শন গ্রহণ করে এবং নিজেকেও অন্যান্য দেশ, জাতীয় সরকার ও মানব সমাজসমূহের মত মনে করে, যাদের কোন নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য ও মর্যাদা, আহ্বান ও অবস্থান নেই, তাহলে সেসব দেশের মতই একটি দেশ হয়ে যাবে পৃথিবীর মানচিত্রে ও জাতিসমূহের সারিতে যাদের কোন সম্মানজনক স্থান নেই। (আল্লাহ না করুন) এভাবে প্রথম যুগের মুসলমান দ্বীন প্রচারক ও মুজাহিদদের সে সমুদয় চেষ্টা ও ত্যাগের চিহ্ন মুছে যাবে, যা তারা ইসলামের প্রচারের জন্য করেছিলেন। এমন দেশের কী মূল্য ও মর্যাদা হতে পারে যার অধিবাসিরা বিলাসিতায় লিপ্ত হয়ে যায়, পশুর মত নিজেদের উদরপূর্তি করতে থাকে এবং কীটপতঙ্গের মত একদিন বিলুপ্ত হয়ে যাবে। তাদের কাছে কোন আহবান ও বার্তা, মূলনীতি ও বিশ্বাস, ব্যক্তিত্ব ও নৈতিক মূল্যবোধ থাকবে না এবং তারা ইসলামী জাহান থেকে লব্ধ সম্মানও পদমর্যাদার সাথে পাশ্চাত্য ও তার

নেতৃবৃন্দ ও চিন্তাবিদদের দৃষ্টিতে নিজেদের বিশ্বস্ততাও খোয়াবে এবং নিজেদের ঐতিহাসিক কীর্তিও হারাবে যা সামান্য সাহসিকতা ও দৃঢ়তা এবং সাধারণ ত্যাগ স্বীকার ও স্বার্থহীনতার দ্বারা বজায় রাখা সম্ভব। এ হবে হীনমন্যতা সংকীর্ণ দৃষ্টি ও দৃঢ়তাহীনতার এমন দৃষ্টান্ত, যা থেকে এ মহান রাষ্ট্রের নেতৃবৃন্দকে আমি অনেক উঁচু বলে মনে করি।

আমি এমন ব্যক্তি হিসাবে (যে নিজের দ্বীন ও জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি বরং সভ্যতা ও মানবতায় সম্পূর্ণরূপে এরাষ্ট্রের অনুগ্রহধারী) আপনাকে আপনার উচ্চ মনোভাব, যোগ্যতা ও বিশ্বস্ততার দোহাই দিচ্ছি এবং আল্লাহ প্রদত্ত সেই সম্মান ও পদমর্যাদা, প্রভাব প্রতিপত্তিকে কাজে লাগানোর আবেদন করছি, যা দ্বারা তিনি আপনাকে ভূষিত করেছেন। আপনি বিশেষ ও সাধারণ জীবনের কোন শাখায় সৃষ্টি হওয়া সে হুমকির মোকাবেলা করবেন এবং আরব ও মুসলিম দেশসমূহের সেসব বৈশিষ্ট্যের হেফাজত, চিন্তাগত নেতৃত্ব, জনমত, সাংবাদিকতা ও প্রকাশনা, জ্ঞান-বিজ্ঞানসমূহ সঠিক পথে চালানোর জন্য নিজের পূর্ণ শক্তি সামর্থ ব্যয় করবেন যার ফলে জাতি ও নতুন বংশধরদের মন-মস্তিষ্কে ঈমান, দ্বীনি চেতনা, ইসলামী মর্যাদাবোধ এবং নৈতিকতা ও মাহাত্মের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হবে এবং দুষ্কর্ম ও অপকর্ম ও নীতিহীনতার প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি হবে। এভাবে তাদের মস্তিষ্কে ইসলামী মূল্যবোধ বদ্ধমূল হয়ে তাদেরকে সেই সম্মানিত ও মহান দায়িত্ব পালনে উদ্বুদ্ধ করবে যার আশা বিশ্বের সকল মুসলমান তাদের প্রতি রাখে। দাওয়াত ও জেহাদের যে সুযোগ ও ক্ষেত্র আল্লাহ তা'আলা আপনাকে দান করেছেন, তা সকলের সর্বত্র ও সর্বদা অর্জিত হয় না। কবির ভাষায়-'নিত্য আসেনা ফুলের মৌসুম।'

তাই আমি নিষ্ঠা ও পীড়াপীড়ির সাথে এ আশা রাখব যে, আপনি এ সুযোগকে মূল্যবান মনে করবেন এবং নিজ বার্তাকে কার্যকর আকারে বাস্তবায়ন করবেন। কেননা এ মহান ও পবিত্র দেশ তার আশপাশের ঘটনাবলী, পরিবর্তন এবং স্বয়ং নিজের অভ্যন্তরীন, চিন্তাগত বিশৃংখলা ও মানসিক অস্থিরতার কারণে, নিজ ইতিহাসের সবচেয়ে নাজুক ও জটিল পর্যায় অতিক্রম করছে এবং তার প্রতিটি মূহূর্ত মাসের পর মাস ও বছরের পর বছরের গুরুত্ব বহন করে। ভুলপথের একটি ছোট পদক্ষেপও তাকে এত দূরে নিয়ে যেতে পারে, যেখান থেকে ফিরে আসা কঠিন হয়ে যাবে।

এ স্পষ্টবাদিতা ও স্বচ্ছতার জন্য আমি ক্ষমা চাইছি। যেজন্য আমাকে এদেশ তার সরকারের হিতকামনা ও মহব্বত এবং আরব ও মুসলমানদের সম্মান ও নিরাপত্তা এবং নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের চাহিদাই উদ্দীপিত করেছে।

আপনার দীর্ঘ জীবন
ও সাফল্যকামী
আবুল হাসান আলী নদভী

কুয়েতের আমীর শায়খ আব্দুল্লাহ আস-সালেম আস-সাবাহ এর নিকট পত্র

[হযরত মাওলানা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী (রহ.) শাবান ১৩৮১ হিঃ মোতাবেক জানুয়ারী ১৯৬৩ সনে, কুয়েতে প্রথম সফর করেন। এ সময়ে তিনি শিক্ষা ও সাহিত্য এবং দীন ও সংস্কৃতির ধারক ব্যক্তিবর্গ ব্যতীত রাষ্ট্রপ্রধান শায়খ আবদুল্লাহ আস-সালেম আস-সাবাহ এর সাথে সাক্ষাত করার এবং দেশের অবস্থাদি ও উন্নয়ন কর্মসূচী সম্পর্কে অবহিত হওয়ার সুযোগ লাভ করেন। তখন তিনি সে দেশ ও জাতির একজন হিতাকাংক্ষী মুসলমান এবং আরব ভূমির ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা ও পটভূমির প্রতি লক্ষ্যকারী একজন মানুষ হিসেবে কুয়েতের আমীরকে নিম্নোক্ত পত্র লেখেন।]

মহাত্মন শায়খ আবদুল্লাহ আল-সালেম আস-সাবাহ, আমীরে কুয়েত

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়ারাহ্‌মাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু

অতঃপর আমি আপনার দেশে একজন নবাগত মুসলমান হিসেবে আমার জন্য দায়িত্ব বলে মনে করছি, দেশের উন্নতি ও জনগণের স্বাচ্ছন্দের প্রতি আপনার বিশেষ মনোযোগের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা এবং নিজের সন্তোষ প্রকাশ করা, যার ফলে কুয়েত অত্যন্ত স্বল্প সময়ের মধ্যে নির্মাণ ও নগরায়নে অসাধারণ উন্নতি লাভ করেছে এবং আপনার নেতৃত্ব ও নির্দেশনায় তা এক বিশেষ মর্যাদা লাভ করেছে। আল্লাহ তা'আলা দেশ ও জাতির উপর আপনার ছায়া দীর্ঘকাল বহাল রাখুন ও সুফল দান করুন।

আপনার মূল্যবান সময়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে আমি অত্যন্ত সম্মান ও শ্রদ্ধার সাথে জনাবের খেদমতে কতিপয় নিবেদন পেশ করতে চাই। কেননা আপনার জরুরী ব্যস্ততা ও রাষ্ট্রীয় দায়িত্বসমূহের কথা আমি স্মরণ করছি।

১. আল্লাহ তা'আলা ইতিহাসে আপনাকে এমন বিরল সুযোগ দান করেছেন যে, আপনি এমন বিপ্লবী ভূমিকা পালন করতে পারেন, যা চিরকাল কৃতজ্ঞতা ও স্বীকারোক্তির সাথে স্মরণ করা হবে। আর সে ভূমিকা হল

আমাদের বর্তমান সভ্যতার শূন্যতা পূরণ করা। সেই শূন্যতা হল এমন কোন সরকারের অনুপস্থিতি, যে সরকার দ্বীন ও আকীদা এবং বস্তুগত উপকরণ ও মাধ্যমের মধ্যে সম্পর্ক সৃষ্টি করবে। সে শূন্যতা হল এমন সমাজের অনুপস্থিতি যাতে ঈমান ও নৈতিকতা এবং সমকালীন দুনিয়ার আধুনিক অভিজ্ঞতাসমূহের মধ্যে সমন্বয় থাকবে। এ এমন শূন্যতা যা বিশ্বের কোন পরাশক্তিও পূরণ করতে সক্ষম নয়। যে সরকারই এ রীতি গ্রহণ করবে, তা সরকারসমূহের পাশে তাৎপর্যের দিক দিয়ে নিজের অগ্রসাহিত্য প্রতিষ্ঠা করবে এবং এমন সম্মান ও মর্যাদা অর্জন করবে যা বিশ্বের পরাশক্তিগুলোও কখনও অর্জন করতে পারেনি।

এর বাইরে রয়েছে খোদায়ী সাহায্য, গায়েবী সহায়তা, কল্যাণ ও জনপ্রিয়তা, আল্লাহ তা'আলা তার নেক বান্দাদেরকে যার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, যারা এ দ্বীনের উত্তরাধিকারী এবং এ বার্তার ধারক ও এ পথের মুজাহিদ হবে। এ উদ্দেশ্য সাধনের উপকরণসমূহ আল্লাহর মেহেরবানীতে প্রচুর রয়েছে এবং তার সুযোগও রয়েছে। তবে শর্ত হল সদুদ্দেশ্য ও দৃঢ় সিদ্ধান্ত।

২. আপনার জানা আছে যে, আল্লাহ তা'আলা নিজ রাসূল (মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে প্রেরণের সাথে সাথে এ সিদ্ধান্তই দিয়েছিলেন যে, আরবদের উন্নতি, ঐক্য ও নেতৃত্ব এবং তাদের সমস্যাবলীর সমাধান একমাত্র এ দ্বীন ও মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শের মাধ্যমেই সম্ভব। ইতিহাস তার সাক্ষী এবং সদ্য সংঘটিত ঘটনাবলীই তার প্রমাণ। তাই যে-ই আরবদেরকে মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে সম্পর্ক দুর্বল করতে চাইবে বা তাদেরকে তা থেকে পৃথক করে একটি জাতি হিসেবে দেখতে চেষ্টা করবে সে আরব জাতির প্রতি সবচেয়ে বড় অবিচার করবে। সে তার অন্তর থেকে ঈমানের মূলোৎপাটন করতে, তার বিশ্বাস দুর্বল করতে এবং নিষ্ঠাবান সংস্কারক ও আরব জাতির শতশত বছরের নির্মাণকে ধ্বংস করতে চায়। তাই সে কোন আরব রাষ্ট্রেরই সমর্থন পাওয়ার যোগ্য নয়। সে তাদের সবচেয়ে বড় শত্রু, যে তাদের অতীতের সাথে ও বর্তমানের ব্যাপক ইসলামী জাহানের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করতে চায় এবং এ উৎসধারাকে শুকিয়ে ফেলতে চায়। আমার মনে হয় আপনার জন্য এর চেয়ে বেশী ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই।

৩. আরব ও মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের শিক্ষা ব্যবস্থার বিন্যাস গভীর চিন্তা-ভাবনা বিশেষ পরিকল্পনার ভিত্তিতে হওয়া প্রয়োজন, যা হবে ইসলামের বিশ্বাস ও বার্তা অনুযায়ী। কেননা শিক্ষার উপরেই ভবিষ্যত বংশধর এবং জাতির দ্বীনি ও নৈতিক ভবিষ্যত ও সভ্যতার প্রবণতা নির্ভরশীল। একই সাথে যুবকদের বিপথগামিতা ও নৈতিক অবক্ষয় প্রতিরোধের উপায় অবলম্বন করাও প্রয়োজন। কেননা যখন কোন জাতির মধ্যে এ অবস্থা এসে যায়, তখন তাকে হেয়ও করে, ধ্বংসও করে এবং সে তারুণ্যও শেষ হয়ে যায়, যা আরব জাতির প্রতীক ও তাদের গর্বের পুঁজি।

৪. আপনি আমাদের সকলের কৃতজ্ঞতার পাত্র। আপনি পূর্ণ উদারতার সাথে মুসলিম দেশসমূহের শিক্ষা ও নির্মাণ কর্মসূচীতে সহযোগিতা করে যাচ্ছেন। এভাবে আপনি আপনার দেশেরও উপকার সাধন করছেন। মানুষের মনে আপনার মর্যাদা ও ভালবাসা সৃষ্টি হবে। আর এ হচ্ছে আল্লাহর শোকর আদায় করার উত্তম পদ্ধতিও ।

৫. সর্বশেষ যে বিষয়ের প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই তা হলো এদেশের অমুসলিম উপাসনালয় নির্মাণের বিষয়। আপনি জানেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরব উপদ্বীপকে ইসলাম, মুসলমানগণ এবং আল্লাহ তা'আলার নির্ভেজাল তাওহীদ ও ইবাদতের জন্য নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। আমীরুল মু'মিনীন হযরত উমর (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন- "আমি আরব উপদ্বীপ থেকে ইহুদী ও নাসারাদের বের করে দেব এবং মুসলমানদের ব্যতীত অন্য কাউকে সেখানে বসবাসের অনুমতি দেব না।" আখেরাতের পথে যাত্রার পূর্বে তিনি বলেছিলেন-"আরব ভূমিতে যেন কিছুতেই দুই ধর্ম না থাকে।"

হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সর্বশেষ অসিয়ত ছিল-"আরব ভূমিতে যেন দুই ধর্ম না থাকে।" এসব অমুসলিম উপাসনালয় দ্বারা দেশের নিরাপত্তা এভাবে বিঘ্নিত হবে যে, এসবের দায়িত্বশীলরা এদের সমর্থন দাবী করবে এবং এসবের উপস্থিতি দ্বারা অবৈধ সুবিধা লাভ করবে। এর ফলে এমন সমস্যা সৃষ্টি হবে, যার সমাধান অসম্ভব হয়ে পড়বে। এভাবে ভিনদেশী সংখ্যালঘু, তাদের তৎপরতা বৃদ্ধি ও জমির মালিকানার ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। কেননা এতে রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে রাষ্ট্র সৃষ্টি হওয়ারও জটিল সমস্যা উত্থিত হওয়ার আশংকা রয়েছে।

সম্মানিত আমীরের বোধ, দূরদর্শিতা এবং জাতি ও রাষ্ট্রসমূহের অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে আমি এর চেয়ে বেশী ব্যাখ্যার প্রয়োজন অনুভব করছি না।

অবশেষে এ দুঃসাহস ও ধৃষ্টতার জন্য ক্ষমা চাইছি যার কারণ ছিল নিষ্ঠা ও দ্বীনের চিন্তা।

কুয়েত
১২ শাবান ১৩৮১ হিঃ

আপনার দীর্ঘজীবন
ও সাফল্যকামী
আবুল হাসান আলী নদভী

তুরস্কের প্রধান মন্ত্রী
নাজমুদ্দীন আরবাকানের নিকট পত্র

[হযরত মাওলানা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী ১৯৯৬ সালের আগষ্ট মাসে যখন তুরস্ক সফর করেন, তখন ঘটনাক্রমে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী নাজমুদ্দীন আরবাকান ইরান ও আরো কয়েকটি দেশ সফরে গিয়েছিলেন। তাই হযরত মাওলানা তার সাথে সাক্ষাত করতে না পেরে দুঃখবোধ করেন। এই ঘাটতিপূরণের জন্য তিনি আরবীতে নামজুদ্দীন আরবাকানের নামে একখানা পত্র লিখে আসেন এবং তা অনুবাদ ও তার নিকট পেশ করার জন্য প্রিয়ভাজন আমীন সিরাজ ও আলীনার-এর নিকট দিয়ে আসেন, যাতে নাজমুদ্দীন আরবাকান ফিরে এলে তার নিকট পেশ করা হয়।]

শ্রদ্ধেয় সম্মানিত জনাব নাজমুদ্দীন আরবাকান সাহেব

প্রধানমন্ত্রী, ইসলামী প্রজাতন্ত্র তুরস্ক,
আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

আমার খুবই কামনা ছিল যে, এ সফরে জনাবের সাথে সাক্ষাতের সুযোগ হোক! এতে এ বরকতময় ও সফল সফরের মূল্য ও মর্যাদায় সংযোজন ঘটত এবং যেসব প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিবেদন করার ছিল, তার সুযোগ পাওয়া যেত। যে তুর্কি জাতি ইসলামের দুশমনদের দমন করার, পবিত্র ভূমিসমূহের হেফাজতের, গোটা দুনিয়ায় মুসলমানদের সম্মানিত করতে ও ইসলামী নেতৃত্বের পতাকা সমুন্নত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। তার সামনে অন্তরের কথা প্রকাশ করার ও আহবান জানানোর সুযোগ পাওয়া যেত। আর এভাবে আমার উপর যে দায়িত্ব বর্তায় তার কিছুটা আদায় হত।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, যে আকাঙ্ক্ষা পূরণ হল না এবং আপনি এক বিশেষ সফরে গিয়েছেন। আল্লাহপাক আপনার এ সফর সফল করুন। এখন এ

পত্রের মাধ্যমে আপনার সাথে সরাসরি আলাপের সুযোগ হচ্ছে। সবচেয়ে বুনিয়াদী যে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে এবং যা সুশৃংখল ও সংহত হতে হবে এবং এমন বিপ্লবাত্মক হতে হবে যা এই প্রিয় জাতি ও দেশের জন্য প্রয়োজন এবং যা তাকে তার পূর্বের নেতৃত্বের কেন্দ্রে পৌঁছে দেবে। তা হল, এ জাতিকে বিশেষ করে জাতির সেই শ্রেণীকে যারা শিক্ষিত সংস্কৃতিবান ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীপ্রাপ্ত এবং যাদের হাতে নেতৃত্বের ভার আসবে, তাদেরকে ইউরোপ, আমেরিকার গোলামী থেকে মুক্ত করতে হবে।

সঠিক ভাষায় বলতে হলে- তাদেরকে ধর্মহীনতা ও পশ্চিমা খৃষ্টানবাদের জাল থেকে মুক্ত করতে হবে এবং তাদের উপর যে বুদ্ধিবৃত্তিক, সাংস্কৃতিক, সভ্যতার ও শৃংখলামূলক পশ্চিমা ছাপ রয়েছে, তা দূর করতে হবে। যে সভ্যতার ফলে আধুনিক শিক্ষিত বংশধর তাদের মনোবল, প্রেরণা, চেতনা ও স্বার্থ ত্যাগের প্রাণশক্তি থেকে শূন্য হয়ে গেছে। তাদের মধ্যে বস্তুগত সজ্জা ও আপাতঃসুন্দরের মোকাবেলা করার ও রাজনীতির বুদ্ধিবৃত্তিক ও সাংস্কৃতিক চক্রান্তের সাথে যুদ্ধ করার যোগ্যতা শেষ হয়ে গেছে। এভাবে তরুণদের মধ্যে ইসলামের উপর আস্থা বহাল করতে হবে। বিশেষ করে সংস্কৃতিবান ও শিক্ষিত তরুণ শ্রেণী যাদের মধ্যে এ যোগ্যতা রয়েছে যে, তারা ইসলামের চিরন্তনতা ও স্থায়িত্ব এবং সর্বত্র ও সর্বদা ইসলামের নেতৃত্বের ও এর প্রতি আস্থা ফিরিয়ে আনবার জন্য কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে এবং বুদ্ধিবৃত্তিক ও চেতনার প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া রাখে।

এ শিক্ষিত বংশধরকে যাদের মধ্যে সমাজকে নতুন রঙে রঙিন করার যোগ্যতা আছে। আস্থা ও নির্ভরতা ফিরিয়ে আনবার মত সাহিত্যের মাধ্যমে সাংবাদিকতা ও প্রচার মাধ্যমের সাহায্যে তাদেরকে হীনমন্যতা থেকে বাঁচাতে হবে, যা ইসলামী বিশ্বাস ও ইসলামী মানবতা ও সমাজ নীতি সম্পর্কে তাদের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে।

এটি সেই মরণব্যাধি, যা এ উম্মতকে ব্যাধির মত পেয়ে বসেছে। যে উম্মতের নিজ দ্বীনের প্রতি গর্ব রয়েছে এবং নিজ বিশ্বাস ও প্রতীকের প্রতি অহংকার রয়েছে তারা এক অভ্যন্তরীন ধর্মান্তরের শিকার হয়ে যাচ্ছে এবং ইউরোপের হাতে ক্রীড়নক হয়ে গেছে। হালাল-হারাম ও ভালমন্দের পার্থক্য ব্যতীত সে নিজ বুনিয়াদী বিশ্ব নেতৃত্বের কীর্তি হারিয়ে ফেলেছে। বরং তারা বিশ্বাসগত, চিন্তাগত ও নেতৃত্বগত ধর্মান্তরের (ইরতিদাদ) শিকার হয়ে গেছে। ঘটনাবলীর আলোকে ও ঈমানী দাবীর আলোকে এটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ

প্রয়োজন এবং নেতৃত্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব যে, ইসলামের ব্যাপারে এ বিশ্বাস সৃষ্টি করাতে হবে যে, তার সকল খুঁটিনাটি বিষয়সহ সত্য দ্বীন এবং সকল ক্ষেত্রে তার মধ্যে পূর্ণরূপে নেতৃত্বের যোগ্যতা রয়েছে।

যে মানবতা পাশ্চাত্যের বস্তুগত ও ধর্মহীনতার চক্রান্তের শিকার হয়েছে, তাকে বাঁচানোরও একমাত্র এটিই পথ। এজন্য শিক্ষা-দীক্ষা, সভ্যতা, প্রচার মাধ্যম ও সাংবাদিকতার নিয়মকানুন পরিবর্তন করতে হবে। এমন শিক্ষাক্রম ও সেইসব কিতাবের প্রচলন করতে হবে যা নতুন বংশধর ও শিক্ষিত শ্রেণীর মস্তিষ্ককে ইসলামী ছাঁচে গড়তে পারে। যত দিন পর্যন্ত এ বিপ্লবী ও গঠনমূলক কাজ সম্পন্ন না করা হবে, ততদিন পর্যন্ত এ জাতির দ্বীনের সাথে সম্পৃক্ততা, দ্বীনী মর্যাদাবোধ এবং এ পথে স্বার্থত্যাগের উপর কোন নির্ভর করা যায় না। এসকল কাজে তাড়াহুড়া ও উত্তেজনার পরিবর্তে কৌশল, কল্যাণ ও ক্রমধারা অবলম্বন করা প্রয়োজন এবং শিক্ষিত শ্রেণীর সাহায্য গ্রহণ করা প্রয়োজন যাদের হাতে সাংবাদিকতা ও প্রচার মাধ্যমসমূহ রয়েছে এবং যারা শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থার মালিক। এর ভিত্তি হওয়া উচিত আল্লাহর প্রতি মনোযোগ ও নিষ্ঠা।

আল্লাহর মেহেরবানীতে আপনার মধ্যে এ যোগ্যতা রয়েছে এবং আল্লাহ তা'আলা আপনাকে নেতৃত্বের এমন সুযোগ দান করেছেন যা সাধারণভাবে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও ক্ষমতাধরগণ পান না। আল্লাহ তা'আলা আপনাকে পথ প্রদর্শন করুন। এ উম্মত ইসলামের শত্রুদের চক্রান্তের শিকার হয়ে পড়েছে। আপনার দ্বারা তারা যেন এ জাল থেকে বেরিয়ে আসতে পারে। আল্লাহ তৌফিক দিন। আমীন!

আপনার একান্ত
আবুল হাসান আলী নদভী

হযরতের বড় ভাই ডাঃ মাওলানা সাইয়েদ আব্দুল আলী (রহ.) সাহেবের নিকট লিখিত চিঠি

মুহতারাম ভাইজান, (১)

গত পরশুদিন রাতের অর্ধভাগে আমরা আমাদের সফরের প্রথম পর্ব শেষ করে ফিরে এসেছি। আলহামদুলিল্লাহ! কামিয়াঁবির সাথেই তা সমাপ্ত হয়েছে। আকুড়া থেকে একটি পোষ্টকার্ড পাঠিয়েছিলাম, হয়ত তা পেয়ে গেছেন।

আকুড়ার পর আমরা হিন্দ গিয়েছিলাম। খাদি খান মাকতুলের আত্মীয়স্বজনের সাথে সাক্ষাৎ হয়েছে। রাত্রে তাদেরই মেহমান ছিলাম। তাদের সাথে এক ব্যক্তিকে পেয়েছিলাম, যিনি তার পূর্বপুরুষদের অবস্থা সবচে' বেশি জানতেন। ছুটিতে তিনি বাড়ি এসেছিলেন। অনেক মেহনত করে তিনি তাঁর পূর্বসূরীদের জীবনবৃত্তান্ত এবং স্থানীয় ইতিহাস জমা করেছিলেন। আমাদের 'জীবনীমূলক গ্রন্থে' বহু তথ্য-উপাত্ত সম্বলিত যথেষ্ট সংখ্যক পৃষ্ঠা তিনিই লিপিবদ্ধ করেছেন। তাঁর রাহনুমায়ীতে আমরা সেখানকার সমস্ত প্রাচীন স্থাপত্য অবলোকন করলাম। আমরা তখনও তাকে নিজেদের পরিচয় দেইনি।

সাইয়েদ আহমাদ শহীদ (রহ.)-এর তিনি অনেক প্রশংসাই করলেন। তাঁর তাকওয়া, ইখলাছ ও লিল্লাহিয়াতের বর্ণনা চমৎকার ভাষায় তুলে ধরলেন এবং সেই দুঃখজনক ইখতিলাফকে তিনি 'ভুল বোঝাবুঝি' বলে অভিহিত করলেন।

খাদী খানের প্রপৌত্র তাঁর পিতামহের বাসস্থান আমাদেরকে দেখালেন এবং সেস্থানের সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন ঘটনাবলী আমাদেরকে শুনালেন। 'হিন্দ' থেকে আমরা 'মানেরী' এলাম। 'সীরাত' গ্রন্থে সে অঞ্চলের আলোচনা বারবার এসেছে। এক রাত আমরা সেখানে কাটিয়েছি।

পরদিন আমরা অনেক কৌতূহল নিয়ে 'পানজতার' এলাকার দিকে রওয়ানা হই। যেখানে সাইয়েদ শহীদ (রহ.) ও তাঁর সহযোগীদের মূল আবাসস্থল ছিল। 'মানেরী' থেকে পানজতার ৮/৯ মাইল দূরত্বে পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত। দ্বিপ্রহরে আমরা সেখানে উপস্থিত হই। ঘটনাক্রমে আমরা সেখানকার অধিবাসী ফাতাহ মরহুম খান (যিনি সাইয়েদ শহীদ (রহ.)-এর মেজবান ছিলেন)-এর প্রপৌত্র দোস্ত মুহাম্মাদ খানের মেহমান হই। ফাতাহ খানের আপন পৌত্র আতা মুহাম্মাদ খান, ভাতিজা শাহ পসন্দ খান এবং তাঁর অন্যান্য আপনজনের সাথে সাক্ষাৎ হয়। ফাতাহ খানের বংশধরদের ১০/১৫টি ঘর সেখানে রয়েছে। এলাকাটি একটি উঁচু টিলায় পাহাড়ী ঝর্ণার কিনারায় অবস্থিত। তার চতুর্দিক পাহাড়ে ঘেরা। সব মিলিয়ে এটি একটি প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি। আত্মরক্ষা এবং নিরাপত্তার জন্যও উৎকৃষ্ট স্থান। সেনানিবাস স্থাপনের একটি উপযুক্ত জায়গা। সাইয়েদ শহীদ (রহ.)-এর তিরোধানের পর সে এলাকাটি কয়েকবার ধ্বংসযজ্ঞের শিকার হয়েছে। এখন সেখানে কেল্লার বাউণ্ডারীর কিছু নিদর্শন এবং পাথরের স্তূপ

ছাড়া সেই গৌরবময় স্থানের আর কোন চিহ্ন বাকী নেই। সাইয়েদ শহীদ (রহ.) যে স্থানে থাকতেন, সেটি এখন সমান্তরাল ভূমিতে পরিণত হয়েছে।

এতদসত্ত্বেও সেই বিরানভূমি দর্শনে আমাদের হৃদয়ের গহীনে পরম ভালবাসা অনুভূত হয়েছে, কল্পনার রাজ্যে সেই প্রাচীন দৃশ্যাবলীর ছবি ভেসে উঠেছে, আবেগের তীব্রতায় আমাদের হৃদয় বিগলিত হয়েছে, কপোল বেয়ে অশ্রুধারা নেমে এসেছে। কল্পনার ভুবনে এই জমিনের প্রাচীন নমুনা চোখের সামনে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। এতো সেই জমিন যেখানে তিনশত মুজাহিদ ও নেককার লোক বাস করতেন। আল্লাহর যিকির এবং জিহাদী চেতনায় এই জমিন সদা মুখরিত থাকতো।

আমরা সেখানে ঐতিহাসিক কোন স্মৃতি বা নিদর্শন পাওয়ার জন্য বহু অনুসন্ধান করেছি এবং আমরা যাদের মেহমান ছিলাম তারাও অনুসন্ধান করেছে, কিন্তু কিছুই পাওয়া যায়নি। দু'বেলা আমরা সেই খান্দানের দু'টি শাখার মেহমান ছিলাম। ফিরে আসার সময় 'গুরগামি' নামক পার্শ্ববর্তী বসতিতে গেলাম। সেখানকার নেতৃস্থানীয় লোকেরা যারা নিজেদেরকে 'হাসানী' বলে অভিহিত করে। তারা আমাদেরকে অনেক আদর-মহব্বত করে বিদায় দেয়ার মুহূর্তে সেখানে কিছুদিন অবস্থানের জন্য পীড়াপীড়ি করে। পশতু ভাষায় তাদের নিকট পূর্বপুরুষদের একটি সুবিস্তর ইতিহাস মওজুদ ছিল। আমি যাওয়ার আগে ফেরত দেয়ার ওয়াদা করে সেটি কেউ নিয়ে গিয়েছিল।

এখন আমাদের শুধু বালাকোটের সফর বাকী। ইনশাআল্লাহ আগামী ২৬শে মার্চ শনিবারের ভিতরে আমরা সেখানের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হবো। আমাদের এখানে ঠাণ্ডা এখনো বাকী আছে। সেখান থেকে ফেরার পথে লাহোর, দিল্লী হয়ে আমরা লাখনৌ পৌছবো।

নাচিজ

আবুল হাসান আলী

মুহতারাম ভাইজান, (২) সৌদি হতে

সেপ্টেম্বর, ১৯৫০

খৃষ্টীয় ৪৭ সালে আমরা প্রথমবার এখানে এসেছিলাম। এখন ৫০ সাল চলছে। তিন বছরে অনেক অনেক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। ব্যবসা-

বাণিজ্য থেকে নিয়ে মানুষের মন-মস্তিষ্ক পর্যন্ত পশ্চিমা সংস্কৃতির দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। তাদের ধ্যান-ধারণায় বিলেতী ছাপ সুস্পষ্টভাবেই নজরে পড়ছে। জিদ্দা অবতরণ করা মাত্রই হৃদয়ে সে অনুভূতির উদয় হলো। পরিবেশ-পরিস্থিতি সম্পর্কে যে পরিমাণ জ্ঞান থাকে, বাস্তবতাও সে পরিমাণ উপলব্ধি করা যায়। একমাত্র আল্লাহই জানেন আরবী লেবাস পরিহিত কত মানুষের মন ও মস্তিষ্ক পশ্চিমা সংস্কৃতিকে ভালবাসে, কত অসংখ্য হৃদয় থেকে বিলেতী ধ্যান-ধারণা এবং বস্তুগত চিন্তা-চেতনার বহিঃপ্রকাশ ঘটতে পারে।

বাহ্যদৃষ্টে মনে হচ্ছে, তাদের অর্থ সঞ্চয় করা, সম্পদ উপার্জন করা এবং ভোগ-বিলাসিতায় মত্ত থাকার সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছে। তাদের মতে পার্থিব উন্নতি-অগ্রগতি ছাড়া জীবনের কোন কল্পনাও করা যায় না। সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা সকল মুসলমানের কেবলা হলো মক্কা মোয়াজ্জমা এবং খানায়ে কাবা। এটিই ইসলামের মারকায। পৃথিবীর দিগ-দিগন্তে সেখান থেকেই তাওহীদের আলো বিস্তৃতি লাভ করেছে। কিন্তু আজ সে মারকাযের লাগাম হচ্ছে আমেরিকার হাতে। ব্যাপক মহামারীর মত সেখানকার বায়ু ও শূন্যমণ্ডলেও তার প্রভাব পড়ছে। এর মোকাবেলায় আমাদের প্রস্তুতি নগণ্য। কিছু কিতাব , কিছু দেখা-সাক্ষাৎ এবং দাওয়াতী কাফেলার কিছু গাশত এসব কিছুর প্রভাব ঠিক এতটুকু, যেমন কেউ বিশাল সমুদ্রের মাঝে ক্ষুদ্র একটি পাথর নিক্ষেপ করল এবং তার দ্বারা হালকা একটু তরঙ্গমালার সৃষ্টি হলো। এ ছাড়া এই ক্ষুদ্র মেহনত, দেখা-সাক্ষাৎ, সভাসমাবেশ এবং কিছু সংখ্যক ব্যক্তিত্বের সমর্থন ও সাধুবাদ থেকেও ভুল বোঝাবুঝির যথেষ্ট আশংকা রয়েছে। বস্তুতঃ এসবের স্বরূপ অনুসন্ধান ছাড়া আর কিছুই নয়।

নাচীজ

আবুল হাসান আলী

বিশিষ্ট আরবী সাহিত্যিক নদওয়ার উস্তাদ মাওলানা মাসউদ আলম নদভীর নিকট লিখিত একটি চিঠি

ভাই মাসউদ আলম নদভী! ৩রা আগষ্ট, ১৯৪৯

যে জমিনে আপনি পদার্পণ করেছেন, সেখানকার বিরান ভূমিতে দ্বীন-ইসলামের বীজ বপনে কোন একটি মুহূর্তও হাত ছাড়া হতে দিবেন না। জান-প্রাণ দিয়ে মেহনত করে যান। রাত-দিন একাকার করে ফেলুন। দেহ-মনে

আগুন জ্বালিয়ে দিন। নয়নযুগল ও কলিজার তপ্ত খুন ঢালতে থাকুন। দজলা এবং ফুরাতের প্রশস্ত বুকও যেন সংকীর্ণতায় কাতর হয়ে মাতম করতে থাকে। এক-একজন লোককে জড়িয়ে ধরে বলুন, 'হে আরব মরু সাহারার বিভ্রান্ত পথিক! সারা আলমে ইসলামের ইজ্জত-আব্রুর কেন্দ্রভূমি! ইবরাহীম (আ.) ও সাইয়েদুল মুরসালীন (সা.)-এর নয়নমণি! তুমি আজ কোথায় নিজেকে হারিয়ে ফেলেছো?

তুমি কি মনে কর, হযরত উমর ফারুক (রা.)-এর শেষ রাত্রির দু'আ ও ক্রন্দন, মুসান্না ইবনে হারেসা (রা.)-এর শাহাদতের তপ্ত খুন, আবু উবায়দা সাকাফী (রা.)-এর হাড়ভাঙ্গা কষ্ট, সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রা.)-এর উড্ডীন বিজয় কেতন, আলী (রা.)-এর রক্তাশ্রু বর্ষণ, শুহাদায়ে ইসলামের জান-প্রাণ বিসর্জন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নয়নমণি হুসাইন (রা.)-এর তৃষ্ণার্তকণ্ঠ, খান্দানে রেসালতের আত্মত্যাগ, আবু হানীফা (রহ.)-এর নিরলস পরিশ্রম, আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহ.)-এর কারাভোগ, ইবনুল জওযী (রহ.)-এর সুন্নত প্রীতি, আব্দুল কাদের জিলানী (রহ.)-এর দরদ ও ফিকির, মোটকথা, সাহাবা, তাবেঈন, আইম্মায়ে মুজতাহেদীন ও বুযুর্গানে দ্বীনের এত আত্মত্যাগ ও কোরবানীর পরও তুমি কিভাবে পথভ্রষ্টদের পদরেণু হয়ে থাকতে ভালোবাসবে?'

আবুল হাসান আলী

হযরতের ভাতিজা বিশিষ্ট আরবী সাহিত্যিক মরহুম মাওলানা মুহাম্মাদুল হাসানীর নামে কয়েকটি পত্র

[এ পত্রটি হযরত মাওলানা (রহ.) তাঁর আরবী শিশু সাহিত্যের কিতাব "কাসাসুন নাবিয়্যীন" রচনার সময় লিখেছিলেন।]

স্নেহাস্পদ! (১)

তোমাকে কেচ্ছা-কাহিনীর প্রতি আগ্রহী দেখি। এটাই তোমাদের মত বয়সের শিশুদের অভ্যাস। তারা এসব কিচ্ছা-কাহিনী অতি আগ্রহের সাথে শোনে এবং অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে পড়ে। কিন্তু দুঃখ লাগে তখন, যখন তোমাদের হাতে শুধুমাত্র কুকুর, বিড়াল, বাঘ, সিংহ, বানর, ভাল্লুক বা এমন হিংস্র প্রাণীর কেচ্ছা-কাহিনী দেখি। ফলে তাদের ব্যাপারে আমার উপর দায়িত্ব এসেছিল। আর সে দায়িত্বের ফল যা তুমি ছাপা দেখতে পাচ্ছ।

তুমি আরবী ভাষা শেখা শুরু করেছ। কারণ এটা পবিত্র কুরআনের ভাষা, প্রিয় নবী (সা.)-এর ভাষা এবং ইসলামের ভাষাও বটে। তাই এ ভাষা শেখার ব্যাপারে তোমার অতুলনীয় আগ্রহ আছে। কিন্তু আমি তখন লজ্জা পাই, যখন দেখি তোমরা তোমাদের উপযুক্ত কোন আরবী গল্পের বই না পাও। যা পাও তাহল জীবজন্তুর গল্প বা কল্প কাহিনী।

তাই আমি সংকল্প করে ছিলাম, তোমার মত মুসলিম শিশুদের জন্য নবী-রাসূলগণের ঘটনাগুলো তোমাদের বয়স ও রুচির উপযোগী করে সহজ-সাবলীল করে লিখব। আল-হামদুলিল্লাহ! আমি তা করতে সক্ষম হয়েছি। আর এটা হল, 'শিশুদের নবী কাহিনী সিরিজের প্রথম খণ্ড'। এখন তোমার জন্য তা উৎসর্গ করছি।

ঘটনাগুলো শিশুদের রুচি ও বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী লিখেছি। আর তাই শব্দ ও বাক্যগুলোকে বারবার উল্লেখ করতে এবং শব্দকে সহজ ও গল্পগুলোকে লম্বা করতে বাধ্য হয়েছি।

আশা রাখি, এই ছোট বইটি আরবী ভাষা শেখার জন্য শিশুরা প্রথম পড়বে। সেই সাথে তাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে পাঠ্যপুস্তক হিসেবে পড়ান হবে। ইনশাআল্লাহ, নবীদের ঘটনাগুলোকে হৃদয়গ্রাহী, মনোমুগ্ধকর, সহজ-সাবলীল, সুন্দর ও আকর্ষণীয়ভাবে তোমাকে উপহার দেব, কিন্তু এর মাঝে সামান্যতম মিথ্যার আশ্রয় নেব না।

মুহাম্মাদ! তোমার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা তোমার আব্বা-আম্মা, তোমার চাচা ও ইসলামের চোখকে শীতল করুন। তোমার মাধ্যমে ফিরিয়ে দিন তোমার পিতৃ-পুরুষদের বরকতসমূহ এ ঘরে এবং মুসলিম জগতে।

দু'আ প্রার্থী
আবুল হাসান আলী আল হাসানী

[হযরত মাওলানা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী (রহ.) ইউরোপে অবস্থানকালে সেখানকার সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক অবস্থা জানিয়ে নিজের ভাতিজাকে অনেকগুলি চিঠি দিয়েছিলেন। নিম্নে তা হতে কয়েকটি চিঠি পেশ করা হল]

স্নেহের মুহাম্মাদ! (২) প্যারিস থেকে

১৯৬৩ ইং

ইউরোপে নারীদের যে অধিকার ও মর্যাদা দেওয়া হয়েছে, বর্তমানে তার গোমর ফাঁস হচ্ছে। বেচারী মহিলারা এখন কুলি, মজুর হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। তাদেরকে এখন দোকানে ঢোকানো হচ্ছে, সেলসম্যানের কাজ তার দ্বারা নেয়া হচ্ছে এবং অনেক নিম্নমানের কাজ করতে তাকে নির্দেশ দেয়া হচ্ছে। রেল, মটর, বাস তথা সব জায়গায় বেচারী নারীরা ধাক্কা খাচ্ছে। পুরুষ আরামে বসে থাকে, আর বেচারী মহিলারা দাঁড়িয়ে থাকে। তাদের থেকে নারীত্ব, লজ্জা-শরম সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। তাদের প্রতি পুরুষের যে স্বাভাবিক আকর্ষণ ছিল তা থেকেও তারা মাহরূম হয়ে যাচ্ছে। এ কারণেই হয়ত নোংরা সাহিত্যের মাধ্যমে, সিনেমা, ভিডিওর পর্দায় ছায়াছবি দেখানোর মাধ্যমে এবং ক্লাব, নাট্যমঞ্চ ইত্যাদিতে ক্রমবর্ধমান নগ্নতা প্রদর্শনের মাধ্যমে পুরুষের অনুভূতি জাগানোর চেষ্টা করা হচ্ছে।

আবুল হাসান আলী

স্নেহের মুহাম্মাদ! (৩) লণ্ডন থেকে

১৫ই আক্টোবর ৬৩ ইং

দেখার সাথে শোনার কি কোন তুলনা হতে পারে? পশ্চিমা সংস্কৃতি স্বচক্ষে দেখার পর তা থেকে নৈরাশ্য ও দূরত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। অতি মসৃণ পাথরে জোঁক জড়ানো যেমন কঠিন, অবস্থা দেখে ঠিক তেমনই মনে হচ্ছে। ফলে আল্লাহ পাকের কুদরতই শুধু এদেরকে কোন প্রকৃত মহাসত্যের সন্ধানে আকৃষ্ট করতে পারে।

দূর থেকে শুনে শুনে হৃদয়ে বড় আকর্ষণ জাগতো। এখানকার যিন্দেগী তো সম্পূর্ণ কৃত্রিম ও মেশিন নির্ভর।

আবুল হাসান আলী

[নিম্নে আরো একটি চিঠির কিয়দংশ তুলে ধরা হলো, যাতে ইউরোপীয় জীবনধারা ও সেখানকার জনসাধারণ সম্বন্ধে কিছুটা আলোকপাত করা হয়েছে]

স্নেহের মুহাম্মাদ! (৪) প্যারিস থেকে
১৯৬৩ ইং

ইউরোপের আলোচনা করতে হলে সেখানকার অধিবাসী ইংরেজ ও ফিরিঙ্গীদের আলোচনা করাও জরুরী হয়ে পড়ে। তাত্ত্বিক ধ্যান-ধারণা, ভোগ-বিলাসিতা এবং বেঁচে থাকার আশা-আকাঙ্ক্ষায় তারা এমনভাবে মগ্ন হয়েছে যার ফলে রূহানিয়াত বলতে তারা কিছু বুঝে না। বস্তু জগতের উর্ধ্বে আরো একটি মহাশক্তি রয়েছে সেই চেতনাই তাদের মাঝ থেকে প্রায় বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। খোদার পরিচয় লাভের মানসিকতা থেকে তারা অনেক দূরে চলে গিয়েছে।

একারণেই তাদের মাঝে পর্যাপ্ত মেধা, যোগ্যতা, দায়িত্ববোধ, জ্ঞান, শৃংখলা মানসিকতা এবং আরো প্রশংসনীয় গুণাবলী থাকার পরও রূহানিয়াত থেকে তারা মাহরুম রয়েছে। দ্বীনী জযবা তাদের থেকে বিলুপ্ত হওয়ার দ্বার প্রান্তে এসে পৌঁছেছে। যে ভূখণ্ডে এমন বিজ্ঞ, দক্ষ ও পণ্ডিত মনীষীদের জন্ম হয়, যারা নিজেদের পাণ্ডিত্যের মাধ্যমে দুনিয়ার নকশা এবং জীবনের ধারা বদলে দেওয়ার শক্তি রাখে, সেই উর্বর ভূমি আজ আল্লাহ্ ওয়ালা বুযুর্গানে দ্বীন থেকে খালি।

আবুল হাসান আলী

মাওলানা আব্দুল করীম পারেখের উদ্দেশ্যে লেখা চিঠি

বিশিষ্ট দায়ী মুফাস্সিরে কুরআন মাওলানা আব্দুল করীম পারেখ ঐসব সৌভাগ্যবান ব্যক্তিদের মধ্যে অন্যতম যাকে আল্লাহ পাক বিভিন্ন গুণের আধার হিসেবে নিজেকে পেশ করার তাওফীক দিয়েছেন। কুরআনে হাকীমের সাথে তাঁর সম্পর্ক খুবই গভীর। তিনি হযরত মাওলানা আলী মিয়াঁর হাজার হাজার সাগরেদের মধ্যে একজন খাছ শাগরেদ ও হযরতের বিশিষ্ট খলীফা এবং গুণগ্রাহী মুরীদ। হযরত মাওলানা পারেখ সাহেব সম্পর্কে এক চিঠিতে লিখেছেন যে, "আমার অন্তর আপনার সাথে আছে। আপনাকে নিজের জন্য আখেরাতের বহু মূল্যবান সম্পদ মনে করি। আপনার সাথে আমার সম্পর্ককে

নিজের মাগফিরাত এবং নাজাতের ওসীলা মনে করি। আল্লাহ্ পাক আপনার স্বাস্থ্যের ও শক্তির উন্নতি দান করুন এবং আপনার থেকে মাখলুকের বেশী বেশী ফায়েদা হোক এই দু'আ করি।"

আপনার মহব্বত ও দু'আ প্রার্থী
আবুল হাসান আলী নদভী

স্নেহাস্পদ! (১) তাং- ২৮- ৫-১৯৭৫ইং

আস্সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ,

আমি ১৪ই এপ্রিলের একটি চিঠি প্রিয় মৌলভী ইসহাক জলিস সাহেবের মারফত ২২ অথবা ২৩শে মে পেয়েছি। আপনার এত পরিচয় দেয়ার প্রয়োজন ছিল না। আপনার কথা শুধু স্মরণ নয়, আপনার চেহারা পর্যন্ত আমার চোখে ভাসছে। আবার এ জ্ঞান-অনুভূতিও আছে যে, আপনার সাথে আমার গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে। এটাই আপনি আপনার লেখায় উল্লেখ করেছেন।

আপনার দ্বীনী তৎপরতার খবর রাখারও চেষ্টা করি। আপনি যখনই আসবেন খুশি হব। মৌলভী ইসহাক সাহেবের মাধ্যমে যদি প্রথমে আমার অবস্থান সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করে নেন তাহলে ভাল হবে। যাতে এ বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত হতে পারেন যে, আমি লাখনৌ আছি না রায়েবেরেলীতে। আল্লাহ্ তা'আলা আপনার মেধা এবং দ্বীনী যোগ্যতা দ্বারা বেশি বেশি লাভবান হওয়ার তাওফীক দান করুন এবং তার রাজিখুশি ও ভালবাসা দান করুন, যেন সমস্ত কিছুতে সফলতা আসে।

আপনার মহব্বত ও দু'আ প্রার্থী
আবুল হাসান আলী নদভী

(২) তারিখঃ ৫-৭-১৯৭৫ ইং

আস্সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ,

গত ২১শে জুনের একটা চিঠি কয়েক দিন আগে আমি পেয়েছি। অত্যন্ত আগ্রহ আর মনোযোগ সহকারে পড়েছি। আপনার দু'টি দরসের রেকর্ডও ইতিপূর্বে শুনেছিলাম। মা'শাআল্লাহ, সেগুলো অত্যন্ত সহজ ও গুরুত্বপূর্ণ

বিষয়বস্তু সম্পর্কিত উঁচুমানের বক্তব্য ছিল। আল্লাহ তা'আলা আপনার সুন্দর বক্তব্য আর দাওয়াতী জযবার মধ্যে আরও উন্নতি দান করুন।

"মানবতার শ্লোগান" পিঞ্জিরায় আবদ্ধ তোতা পাখির চিৎকারের সাথেও তুলনা করা যায় না (মানবতার আজ এমন অবনতি ঘটেছে)। তবে একটু আশার আলো হচ্ছে এই যে, আল্লাহ তা'আলা তার সৃষ্টজীবকে একেবারে সমূলে ধ্বংস হতে দেবেন না।

"দ্বীনী শিক্ষা সম্মেলনের" এই সুযোগে আপনি যদি তাশরীফ আনতেন তাহলে অনেক লোকের সাথে দেখা হয়ে যেত। হয়ত এ সংক্রান্ত খবরটি আপনি দেরীতে পেয়েছিলেন। এখনতো আপনি অনুষ্ঠান উপলক্ষে আসতে পারবেন। আল্লাহ এ অনুষ্ঠান সুন্দরভাবে সম্পন্ন করুন।

দু'আ প্রার্থী

২৪-৬-১৩৯৫ হিঃ — **আবুল হাসান আলী নদভী**

(৩) — তাং ঃ ১০- ৯-১৯৭৫ ইং

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ,

সেপ্টেম্বরের তিন তারিখে আপনার পত্রখানা আমার হস্তগত হয়েছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে আমার চিঠি আপনার নিকট পৌঁছেনি। এ পত্রটা দিয়েছিলাম বই প্রকাশের জন্য শুকরিয়া জ্ঞাপন করে। এ চিঠিটা আমি সম্ভবত ঐ প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান কিংবা প্রেসের ঠিকানায় দিয়েছিলাম। প্রকাশকের মারফত এ চিঠি আপনার নিকট বিলম্বেও পৌঁছতে পারে। আপনার স্থায়ী ঠিকানা আমার সংরক্ষণে ছিল না বিধায় সরাসরি চিঠিটা দিতে পারিনি। যাহোক, বিষয়বস্তুর সঠিক বিন্যাসের সাথে বইটি লেখার জন্য আপনাকে আবারও মোবারকবাদ জানাচ্ছি। আপনার লেখা অত্যন্ত উপকারী এবং রচনাভঙ্গি খুব উন্নত। আল্লাহ তা'আলা বইটি যথার্থভাবে কবুল করুন।

আমাদের এখানে যাঁরা আছে তাঁরা অত্যন্ত ব্যস্ত। দুই দুইটি আরবী পত্রিকা প্রকাশ করছে। শিক্ষকতার ঝামেলাসহ নানারকম ব্যস্ততায় সময় করে উঠতে পারছি না। আমার সামনে এমন কোন আশার আলো দেখছি না যে, বর্তমানে এই বই দুইটির কাজের জন্যে সময় বের করতে পারব। ছাত্রদের মধ্যেও এ যোগ্যতা নেই। আল্লাহ যেন বই দুইটির অফসেট এডিশন আরো ব্যাপক সমাদৃত হবার সুযোগ দেন। আপনি যদি কোন এক ফাঁকে এদিকে আসেন এবং কিছু দিন আমার সাথে থাকেন তাহলে খুব খুশি হব।

ওয়াসসালাম

আবুল হাসান আলী নদভী

স্নেহাস্পদ প্রিয় পারেখ সাহেব! (৪) তাং ঃ ৬-১১-৭৫ইং

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ,

আলহামদুলিল্লাহ! দিল্লী, সাহারানপুর, মুরাদাবাদ লাখনৌতে বেশ কয়দিন আপনি সাথে ছিলেন। কিন্তু যখন আপনি লাখনৌ থেকে বিদায় হতে চাইলেন তখন এমন মনে হতে লাগল যে, খুব অল্প সময়ই কাছে ছিলেন এবং হঠাৎ বিদায় হয়ে যাচ্ছেন। আপনি যাওয়ার কারণে আমার মানসিক অবস্থায় খারাপ প্রভাব পড়েছে।

আপনি যাবার পর থেকে এখন পর্যন্ত আপনার কোন চিঠি আসেনি। আল্লাহর নিকট আশা করি আপনি ভাল ভাবেই গিয়ে পৌঁছেছেন। আপনার ভাল থাকার খবর জানিয়ে দ্রুত চিন্তামুক্ত করবেন। গত সফর এবং অবস্থানের দিনগুলোতে যা কিছু ত্রুটি হয়েছে তা মাফ করে দেবেন। মন-মস্তিষ্কে অবস্থার বড় একটা প্রভাব পড়েছিল। ঐ অবস্থায় আপনার সান্নিধ্য থেকে পুরোপুরি উপকৃত হতে পারিনি। এখন তো আপনার সাথে খুব শীগগিরই দেখা করার এবং অনেক দিন পর্যন্ত সাথে থাকার প্রয়োজন অনুভব করছি। কনভেনশনের ভারী দায়িত্ব মাথায় নিয়েছি। তবিয়তের মধ্যে এর প্রভাব পড়েছে। এখন খুব একলা একলা মনে হয়।

মৌলভী ইসহাক সাহেব ও মুহাম্মাদ মিয়াঁর সাহায্য পেতাম, কিন্তু তাঁরাও আল্লাহ তা'আলার নিকট চলে গেছেন। এখন আপনার পূর্ণ মনোযোগ প্রয়োজন।

আপনি যে কর্মসূচী তৈরী করেছিলেন সেটা তালাশ করেও পাচ্ছি না। জানি না, আপনার সাথে ভুলে চলেই গেল কিনা অথবা ডক্টর ইশতিয়াক সাহেব ভুলে গেছেন হয়ত। যাহোক, একটা বিস্তারিত কর্মসূচী জলদি তৈরী করে পাঠান। আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ কথা হচ্ছে নাগপুর, পুনা এবং আহমাদ নগর আপনার দায়িত্বে। এসব এলাকায় আপনাকে সফরও করতে হবে। মুসলিম ও অমুসলিম সবাইকে ২৭-২৮ তারিখে লাখনৌতে আনার জন্য প্রস্তুতি নেবেন। জেনে রাখবেন, এই কনভেনশনের বড় দায়িত্ব ভার আপনার আর ডক্টর ইশতিয়াক সাহেবের উপর। আপনি সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করবেন বলে আশা করছি।

মৌলভী মঈনুল্লাহ সাহেব বোম্বাই আসছেন। তাঁর সাথেও পরামর্শ হয়ে যাবে। অন্যান্য অবস্থা মৌলভী মঈনুল্লাহ সাহেবের কাছ থেকে জানতে পারবেন।

ওয়াস্‌সালাম
আবুল হাসান আলী নদভী
১৬ই যিলকদ ১৩৯৫ হিজরী

মুহতারাম, (৫) তাং ঃ ১০-১-৭৬ ইং

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ

আশা করি আপনি সবদিক থেকে ভাল আছেন। আপনার মহব্বতের চিঠিখানা মৌলভী ইসহাক সাহেব পৌছিয়েছেন।

আমার জন্য এই গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য নিয়ে নাগপুর আসা এবং আপনার মত প্রিয় বন্ধুর সাথে সাক্ষাৎ করা বিভিন্ন দিক থেকে আনন্দের ছিল। স্নেহাস্পদ মৌলভী ইসহাক জলিস ১৫ই জানুয়ারী গাড়িতে সিটও নিয়ে রেখেছিল। কিন্তু এদিকে প্রায় এক সপ্তাহ যাবত আমার বাঁ হাতটায় প্রচণ্ড ব্যথা অনুভব করছি। যার কারণে প্রায়ই তীব্র ব্যথায় অধৈর্য হয়ে উঠি। বাসায় থেকে কয়েকবার ওষুধ ব্যবহার করতে হয়। এ ছাড়া রাতে ঘুমোতে পারি না। আমি পায়ের জোড়ার ব্যথার পুরোনো রোগী। জানি না এটা ঐ রোগেরই প্রতিক্রিয়া না অন্য কোন কারণ।

সফর মুলতবী করতে মন কিছুতেই চাচ্ছে না। কিন্তু বর্তমান অবস্থায় সফর করাটা খুবই কঠিন হবে বলে মনে হচ্ছে। আমি লাখনৌ থেকে ডক্টর ইশতিয়াক সাহেব কোরাইশীকে ডেকে পাঠিয়েছি এবং মৌলভী ইসহাক সাহেবের সাথেও পরামর্শ করেছি। যাহোক, বর্তমানে কিছুটা বিলম্ব করা ভাল মনে হচ্ছে। শরীর কিছুটা ভাল হয়ে উঠলেই পুনরায় সফরের প্রোগ্রাম বানিয়ে নেব ইনশাআল্লাহ। আপনি নিরাশ হবেন না।

আমার শারীরিক সুস্থতার জন্য দু'আ করবেন। আশা করি মৌলভী ইসহাক সাহেবও আপনাকে চিঠিপত্র দেবে। বাড়তি সতর্কতার জন্য আমি এই চিঠি লিখলাম।

ওয়াস্‌সালাম
আবুল হাসান আলী নদভী

হযরতের প্রিয়ভাজন শাগরেদ বিশিষ্ট আরবী সাহিত্যিক মাওলানা সুলতান যওকের নামে কয়েকটি চিঠি

প্রিয় মৌলবী (১). ২০/১১/৮২ইং
মুহাম্মাদ সুলতান যওক সাহেব

আসসালামু আলাইকুম

আপনার ২২শে মুহররম তারিখের হৃদ্যতাপূর্ণ পত্র আমি প্রায় একমাস পরে পেলাম। জবাব দিতে এজন্যই দেরী হয়েছে। আজ তা পাঠ করেই জবাব দিচ্ছি। পত্রে উল্লিখিত বিষয়সমূহের জবাব যথাক্রমে পেশ করছি।

(১) আমার রচনাবলীর বাংলা অনুবাদের সংবাদে আনন্দিত হয়েছি। অনেক দিনের আকাঙ্ক্ষা পূরণ হতে চলেছে। আমি মজলিসের পক্ষ থেকে ইসলামিক ফাউণ্ডেশনের প্রকাশনা পরিচালক জনাব আব্দুল গফুর সাহেবের নামে নিয়মতান্ত্রিক অনুমতিপত্র টাইপ করে পাঠাবো। আপনি তাঁকে আমার এ পত্রের ভিত্তিতে আশ্বাস দেবেন যে, আমার পক্ষ থেকে অনুমতি রয়েছে এবং এটিকে আপনার তত্ত্বাবধানে অব্যাহত রাখবেন। যেসব গ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশিত হয়ে যাবে তার কিছু কপিও পাঠিয়ে দেবেন।

(২) আনন্দিত হলাম যে, আপনি আপনার ওখানে নদওয়াতুল উলামার প্রশংসিত পাঠ্যপুস্তক এবং আমার নগণ্য রচনাবলী পাঠ্য তালিকাভুক্ত করেছেন। আল্লাহ তা'আলা তা দ্বারা প্রকৃত কল্যাণ সাধন করুন। গ্রন্থসমূহ পাওয়ার জন্য আপনি সরাসরি দারুল উলুমে যোগাযোগ করবেন। আমার রেফারেন্সও দিবেন।

(২) আমার নিজেরও ইসলামের মহান সাধকগণ বিশেষ করে হযরত সাইয়েদ শহীদ (রহ.)-এর প্রচার সাধনা ও প্রশিক্ষণ ভূমি সফরের আগ্রহ রয়েছে। আপনি জানুয়ারীর শেষ কিংবা ফেব্রুয়ারীর শুরুতে সম্মেলন কিংবা জামেয়া ইসলামিয়াঁ পটিয়ার পক্ষ থেকে নিয়মতান্ত্রিক দাওয়াতনামা পাঠাবেন এবং স্মরণ করিয়ে দেবেন। যদি যথাসময়ে কোন আকস্মিক প্রতিবন্ধকতা না আসে এবং সফরের শক্তি থাকে তাহলে ইনশাআল্লাহ্ আসবার চেষ্টা করব। সফরের খরচাদির ব্যাপারে চিন্তিত হবেন না। সফরের সাথী এক বা দুইজন অবশ্যই হবে। নিজের অবস্থাদি অবশ্যই জানাতে থাকবেন। কেননা এটাই তো সম্পর্কের দাবী।

ওয়াসসালাম
আবুল হাসান আলী

প্রিয় মাওলানা (২) ৩০শে জুন, ৮৩ইং
সুলতান যওক সাহেব

আসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহ,

আপনার ২৭শে শাবানের পত্র আজ ১৮ই রমযান পেলাম। আপনার বার বার ওযরখাহির কারণে আমার শরম লাগে। ডাক ব্যবস্থার অসুবিধা এবং আমার পত্র ও টেলিগ্রাম যথাসময়ে না পৌঁছার কারণে আপনাদের অস্থিরতা থেকেই দ্বিধাদ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়েছে। আপনার কোন ত্রুটি কিংবা অবহেলার কোনই অভিযোগ নেই। আসলে ভারত, বাংলাদেশের মধ্যে ডাক ব্যবস্থা খুব খারাপ এবং উভয় পক্ষের এজন্যই কষ্ট হয়। এর কোন প্রতিকারও বুঝি না। আপনার সাথে যথারীতি সম্পর্ক রয়েছে।

আপনি সে দেশে আমার চিন্তাধারা ও রচনাবলীর প্রকাশক ও ব্যাখ্যাতা। আপনার একজন পরিচিত ব্যক্তি রায়বেরেলী এসেছিলেন। তিনি বাংলাদেশে যাচ্ছেন। আমি তার হাতে মুযাক্কিরাত সায়েহ ফিল শারকিল আরাবীর নতুন এডিশন, যাতে বিলুপ্ত অংশও যুক্ত হয়েছে, হাদিয়া স্বরূপ আপনাকে দিয়েছি। আশা করি এতদিনে পৌঁছে গেছেন। ঈদের পরেই দেশের বাইরে দীর্ঘ সফর হবে। তবে শরীরের কোন ঠিক ঠিকানা নেই। এখনো গিরার ব্যথায় আক্রান্ত। ইনশাআল্লাহ আপনার প্রস্তাবিত ও মনোনীত সময়ে যদি হায়াতে ও সুস্থ থাকি, একটি সফর হবে। আপনার ইচ্ছা ইনশাআল্লাহ পূরণ হবে।

ছাত্রদের ভর্তির ব্যাপারে আপনার পত্র মুহতামিমের দফতরে পাঠিয়ে দিচ্ছি যাতে যথাযথ ব্যবস্থা নেয়া যায়।

আপনি এমন ছাত্রদের নাম-ঠিকানা লিখে পাঠাবেন, যারা আপনার বিবেচনায় পূর্ণরূপে উপকৃত হতে পারে এবং তারা মেধাবী, সুবোধ ও লক্ষ্যমুখী। প্রত্যয়ন পত্র, সনদ ইত্যাদিও পাঠাবেন।

আনন্দিত হলাম যে, আপনি 'আস-সুবহুল জাদীদ'-কে মাসিক পত্রিকা করতে চাইছেন। আল্লাহ তা'আলা প্রতিবন্ধকতাসমূহ দূর করুন। শুভানুধ্যায়ীদের খেদমতে সালাম। যদি এ পত্র মুবারক মাসের মধ্যে পৌঁছে যায়, তাহলে দু'আসমূহে আমাকেও স্মরণ রাখবেন। আমিও দু'আ করছি।

ওয়াসসালাম
আবুল হাসান আলী

হযরত মাওলানার খলীফা ইসলামিক ফাউণ্ডেশনের ইসলামী বিশ্বকোষ বিভাগের পরিচালক বিশিষ্ট লেখক ও অনুবাদক মাওলানা আবু সাঈদ মুহাম্মাদ ওমর আলীর নামে কয়েকটি চিঠি।

(১) ১১ সফর, ১৪০৫হিজর

আস্‌সালামু আলাইকুম,

আপনার চিঠি পেয়েছি। জবাব দিতে একটু দেরী হয়ে গেল। এদিকে হযরত মাওঃ সুলতান যওক সাহেবও আমার সাথে দেখা করে ফিরে গিয়েছেন। তাঁর মাধ্যমেও আমাদের অবস্থা জানতে পারবেন।

কিতাবগুলোর ব্যাপারে বিস্তারিত লিখে দিয়ে ভাল করেছেন। আশা করি তোহফায়ে মাশরেক পেয়েছেন। এটা শীঘ্রই তরজমা হওয়া প্রয়োজন।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের গুরুত্ব সম্পর্কে আমি যা কিছু লিখেছি ওটাই আমার মনোভাব। বর্তমানে স্বাস্থ্য খারাপ যাচ্ছে। ডিসেম্বরে হেজাযে সফরের কর্মসূচী রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা আপনাদের সাথে ভালভাবে সাক্ষাৎ করার তাওফীক দান করুন। মা'মুলাত পুরোপুরী আদায় করার চেষ্টা করবেন। ইলমে দ্বীন এবং দ্বীনী মেযাজের প্রসারে অংশ গ্রহণ করতে থাকবেন। আল্লাহ তা'আলা আপনার দ্বারা দ্বীন ও মিল্লাতের বেশি বেশি খেদমত নিন। সকল সাথীকে আমার সালাম দেবেন।

আবুল হাসান আলী নদভী

লাখনৌ

(২) ১৩-৪-১৪১৮হিজরী

আস্‌সালামু আলাইকুম,

বাংলাদেশী বন্ধুদের হাতে পাঠানো আপনার ৬ই আগষ্টের লেখা চিঠি পেয়েছি। নবীয়ে রহমতের বাংলা তরজমার মূল্যবান উপহার পেলাম। কারওয়ানে মদীনা খুব শীঘ্রই প্রকাশিত হচ্ছে এ সুসংবাদও পেলাম। আল্লাহ তা'আলা আপনাকে দ্বীনের এইসব প্রকাশনার খেদমতের উত্তম প্রতিদান দিন।

বাংলাদেশে আপনিই এতবড় কাজ করছেন। আপনি রমযানে অবশ্যই আসবেন, খুব খুশি হব। হাফেয সাহেবকে সালাম জানাবেন। আমাদের এখানকার সমস্ত বন্ধুদের পক্ষ থেকে সালাম গ্রহণ করবেন।

আবুল হাসান আলী নদভী

মুহতারাম ওমর আলী সাহেব (৩)
আস্‌সালামু আলাইকুম,

তারিখবিহীন আপনার বিস্তারিত একটি চিঠি পেয়েছি। আপনি না আসার ব্যাপারে যে প্রতিক্রিয়া এবং আমার সাথে সাক্ষাৎ ও অবস্থান করার যে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন, তাতে আপনার সাথে আমার সম্পর্কের অনুমান করা যায়। রমযানের শেষ ১০ দিন থেকে কিছুটা অসুস্থতা যাচ্ছে, এখনো অবস্থা স্বাভাবিক নয়।

বর্তমানে আমার শরীর সুস্থ নয়, চলাফেরায় অসুবিধা হচ্ছে। কিডনী ঠিক মত কাজ করছে না। আমার সাথে সাক্ষাৎ না হওয়ার সময়টুকুতে যোগাযোগের পথ হচ্ছে যিকির, দু'আ এবং আমার কিতাবগুলো অধ্যয়ন করা। ইসলামিক ফাউণ্ডেশন থেকে আমার তিনটি কিতাব তরজমা হয়েছে জেনে খুশি হলাম। কারওয়ানে জিন্দেগীর ৩য় খণ্ড প্রস্তুত হয়েছে। এখন প্রকাশের প্রক্রিয়ায় আছে। চার তোহফার অনুবাদ প্রকাশ হচ্ছে জেনে খুশি হলাম। আল্লাহ তা'আলা সার্থক করুন। আপনার প্রেরিত পার্সেল থেকে বুঝতে পারলাম যে, আপনার অনুদিত তারিখে দাওয়াত ও আযীমাতের খণ্ড এবং অন্যান্য ভাইদের তরজমাকৃত তাযকিয়া, এহসান ও মুতালায়ে কুরআন কে উসূল ওয়া মাবাদী রয়েছে। এ কিতাবগুলি পাঠানোর জন্য শুকরিয়া আদায় করছি। আরকানে আরবাআ প্রকাশ হচ্ছে শুনে খুশি হয়েছি। সীরাতে সাইয়েদ আহমাদ শহীদের তরজমাও খুব জরুরী।

আপনার চিঠিতে আমার কয়েকখানি কিতাবের তরজমার সংবাদে খুশি হয়েছি। আল্লাহ তা'আলা মুসলিম দেশগুলোর অবস্থা ভাল করে দিন। মুসলিম দেশগুলোর বিচ্ছিন্নতা দেখে বড় কষ্ট পাই। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সঠিক বুঝ দান করুন।

আবুল হাসান আলী নদভী
লাখনৌ

হযরত মাওলানার প্রিয় শাগরেদ মাওলানা মুহাম্মাদ সালমানের নামে কয়েকটি চিঠি।

সাল্লামাল্লাহু তা'আলা (১) ৫ই জুলাই ১৯৭৫ইং

প্রিয় সালমান!

ওয়াআলাইকুমুস সালাম,

আপনার বিস্তারিত চিঠি পেয়েছি। আপনি যে আন্তরিক সম্পর্ক, অগাধ বিশ্বাস এবং অকৃত্রিম ভালবাসার বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন আপনার এ চিঠিতে তা আমাকে দারুণভাবে অভিভূত করেছে। আল্লাহ তা'আলা এ সম্পর্ককে খায়ের ও বরকতের উৎস বানান। আপনি যে অনুপ্রেরণা আর চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে দ্বীনী শিক্ষার এ দুর্গম পথে পা বাড়িয়েছেন তা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ এবং শোকরের ব্যাপার। আল্লাহ আপনার সৎ উদ্দেশ্যে সফলতা দান করুন। আপনার স্বপ্ন মোবারক। আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের সবাইকে আত্মিক এবং চারিত্রিক রোগসমূহ থেকে রক্ষা করুন।

যদি আপনি শিক্ষার গতি অব্যাহত রাখতে নদওয়ায় আসতে চান তাহলে ২য় বর্ষ কিংবা তারচে' উপরের স্তরে ভর্তি পরীক্ষা দিতে হবে। ইনশাআল্লাহ যতদূর সম্ভব আপনার জন্য সহজ হয়ে যাবে। আপনার নিকট শিক্ষা সিলেবাস এবং মাদরাসার পরিচিতি পাঠানো হচ্ছে। আপনি দেখে নিন যে, আপনি তৃতীয় বর্ষের উপযুক্ত না প্রথম বর্ষের। যদি ঈপ্সিত যোগ্যতা আপনার মধ্যে থাকে তাহলে রমজান মাসেই দরখাস্ত পাঠিয়ে দিন এবং শাওয়াল মাসে নতুন শিক্ষা বর্ষেই ভর্তি হয়ে নিন। এ ব্যাপারে আপনি নিম্ন ঠিকানায় চিঠি লিখুন। মাওলানা ইসহাক জলিস নদভী সম্পাদক, তা'মীরে হায়াত, পোষ্ট বক্স- ৯৩, দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামা, লাখনৌ-৭। তিনি আপনাকে সব ধরনের সহযোগিতা করবেন এবং সঠিক পরামর্শ দেবেন।

যেহেতু এ সপ্তাহের ভেতরেই আমি দুই-তিন মাসের জন্যে হিন্দুস্তানের বাইরে আমেরিকা এবং আরব দেশগুলো সফরে বেরোচ্ছি। তাই আপনি এ চিঠির জবাব এবং অন্যান্য চিঠিপত্রের যোগাযোগ মৌলভী ইসহাক জলিস–তা'মীরে হায়াত সম্পাদকের সাথে করবেন। আমি আপনার ব্যাপারে তাঁর সাথে বিস্তারিত কথা বলে রেখেছি। যদি আপনি রজব মাসের মধ্যে আসতে পারেন তাহলে অবশ্যই আসবেন এবং মৌলভী ইসহাক জলিস সাহেবের সাথে সাক্ষাৎ করবেন। তিনি আপনাকে সব ধরনের সাহায্য

করবেন। আমিও আপনার ব্যাপারে আরও সতর্ক করে যাব। আমি যেহেতু খুবই দুর্বল, তথাপি আমার নির্ভরতাও দুর্বল। আমি নিজে চিঠি পড়তেও পারি না, লিখতেও পারি না। অন্যদের দিয়ে লেখাই, পড়াই।

আপনার সমস্ত চিঠির জবাবও মৌলভী ইসহাক জলিস সাহেব লিখে দেন। আপনার নিকট আমার জরুরী কথাগুলো আমি বলে দেই মাত্র। এ জন্যই তার সাথে যোগাযোগ রক্ষাকে মনে করবেন আমার সাথেই করছেন। এতে আপনার কোন ঘাটতি হবে না, বরং ইনশাআল্লাহ উন্নতিই হবে। আর সময়মত আপনি চিঠির উত্তর পেয়ে যাবেন এবং এটা সহজও হবে।

মৌলভী ইসহাক জলিস সাহেব আপনার কাছে আমার কিছু কিতাব ইতিমধ্যেই পাঠিয়ে দিয়েছেন। আপনার নামে পাক্ষিক তা'মীরে হায়াতও পাঠানো হবে। এসবের বেশির ভাগেই আমার বিষয়ভিত্তিক বক্তব্য সন্নিবেশিত থাকে। আমি আপনার জন্য দু'আ করি। এ চিঠির জবাব এবং সামনের চিঠিগুলো নিম্ন ঠিকানায় পাঠাবেন।

ওয়াস্‌সালাম

(মাওলানা) আবুল হাসান আলী নদভী

Ishaq Jalees Nadwi
Editor-Tameer-e-Hayat
P.O-Box 93, Nadua-Luckhnow-7

মুহতারাম সালমান, (২) তারিখঃ ১-১-১৯৭৯ইং

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

গত ২২শে মহররম আপনার চিঠি আমার হস্তগত হয়েছে। সফর থেকে ফিরেই সেটা পেয়েছি। আপনার উদ্যম-উৎসাহ, আর সামর্থ্যের অভাব থাকা সত্ত্বেও বই পড়ার দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা আমাকে দারুণভাবে অভিভূত করেছে। আমার এই বইয়ের প্রতি আপনার আগ্রহ আর তা কেনার ব্যাপারে অসমর্থতার কথা যদি আগেই জানতাম, তাহলে এ বই আপনার জন্য হাদিয়া পাঠাতাম।

আপনি জেনে খুশি হবেন যে,'পুরানে চেরাগের' ২য় খণ্ডও ছাপা হয়ে এসেছে। এ কিতাবের স্বাদ আশা করি প্রথম খণ্ডের তুলনায় কম হবে না। এর কপি আপনার নিকট হাদিয়া পাঠানো আমার দায়িত্বে। আপনি সময়-সুযোগ করে আমার নিকট এসে কিছু দিন থাকুন। সফরের খরচ আমার।

আমার এক সফরে আরবের কিছু ছাত্র আমার জীবনচরিত লেখার অনুরোধ করেছিল। আমি অন্য কোন পন্থায় ঐ অনুরোধ পুরো করব ইন্‌শাআল্লাহ। আশা করি আপনি ভাল আছেন।

দু'আপ্রার্থী
আবুল হাসান আলী নদভী
লাখনৌ

(৩)

প্রিয় সালমান, লাখনৌ

সাল্লামাল্লাহু আলাইহি। ১২-২-১৯৮০ইং

আপনার চিঠি পেয়েছি। এতে কোন তারিখ লেখা ছিল না। ডঃ ইসহাক সাহেবকে আমি ঐ সময় থেকে জানি যখন থেকে তিনি দারুল মুসান্নিফীন ও নদওয়াতে অবস্থান করতেন। মাওলানা ইলিয়াস (রহ.)-এর জীবনী বাংলায় অনুবাদ করার জন্য কিছুদিন পূর্বে আমার বন্ধু গোলাম মোহাম্মদ অনুমতি চেয়েছিলেন, আমি তাকে অনুমতি দিয়ে দিয়েছি। তিনি একাজ করতে না পারলে আপনি অবশ্যই করবেন। কিন্তু একটু অপেক্ষা করুন। বাকি আমার আরও বহু কিতাব আছে যার বাংলা অনুবাদ করা যেতে পারে। আমি বর্তমানে খুবই ব্যস্ত। আপনার অনুরোধ রক্ষার্থে আমার স্বহস্তে দু'এক লাইন লিখে দিচ্ছি।

প্রিয় মৌলভী সালমান, আপনার চিঠি পেয়ে খুশি হয়েছি। বইগুলো জায়গামত পৌঁছেছে। আপনার সাথে বহুদিন হল সাক্ষাৎ হয় না। আপনার জন্য দু'আ করি।

দু'আ প্রার্থী
আবুল হাসান আলী নদভী

(৪)

দায়েরায়ে শাহ আলামুল্লাহ

প্রিয় সালমান! তাং- ২৩-৩-১৯৮০ইং

আপনার শ্রদ্ধাপূর্ণ পত্র পেয়েছি। আপনার স্বপ্ন অমূলক নয়। ইনশাআল্লাহ শীঘ্রই এ স্বপ্নের বাস্তবতা দেখা দেবে। সম্ভবত আমি মে মাসের দিকে বাংলাদেশে আসছি। জামিয়াঁ ইসলামিয়াঁ পটিয়ার মাওলানা মুহাম্মাদ সুলতান যওক সাহেবের কাছ থেকে জানতে পারবেন।

ইসলামিক ফাউণ্ডেশনের পক্ষ থেকে আমার দুইটি বই অনুবাদ হয়েছে জেনে খুশি হলাম। আপনি "নয়া তুফান" এর অনুবাদ করেছেন বলে আন্তরিক অভিনন্দন। আমি আসলে কিংবা কেউ আপনাদের ওদিকে গেলে হযরত শায়খের জীবনী পাঠিয়ে দেব। মৌলভী আবু তাহের মিসবাহ সাহেবকে আমার অনেক অনেক সালাম দিবেন, অন্যদেরকেও সালাম দিবেন। আমি মজলিসের বই-পত্রের তালিকা এবং আমার নিজস্ব বইয়ের তালিকা সত্ত্বর পাঠাচ্ছি।

দু'আ প্রার্থী
আবুল হাসান আলী

(৫) ২৮-১০-১৪০০ হিজরী

আস্‌সালামু আলাইকুম।

২০শে শাওয়াল আপনার চিঠি পেয়েছি। আপনার কুশলাদি এবং অবস্থা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত অবগতি লাভ করেছি। এ সময় আমি এমন অবস্থায় নেই যে, আপনাকে চূড়ান্ত কোন সিদ্ধান্ত বলে দেব কিংবা বিশেষভাবে পরামর্শ দেব। ছাত্রজীবন অব্যাহত রাখা এবং বন্ধ করার ব্যাপারে আপনি নিজের অবস্থা সম্পর্কে বেশি সচেতন। আধ্যাত্মিক এবং সুলূকের ব্যাপারে হযরত মাওলানা আব্দুল কাদের রায়পুরী (রহ.)-এর জীবনী বার বার পড়বেন। আমি আপনার উভয় জগতের সফলতা এবং ইলমী উন্নতির জন্য দু'আ করি।

(মাওলানা) আবুল হাসান আলী নদভী

অধ্যায়–১৭

রচনাবলী

হযরত মাওলানা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী (রহ.) একজন খ্যাতিমান লেখক হিসেবেও সারা বিশ্বের দৃষ্টি কেড়ে নিতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁর ক্ষুরধার লেখনী আরব-অনারবসহ সারা বিশ্বে ব্যাপক সাড়া জাগাতে সমর্থ হয়। আল্লাহ্ পাক তাঁর কলমকে মকবুলিয়াত এবং তাঁর লেখনীর মধ্যে নূরানিয়াত ও বরকত দান করে ছিলেন। দীর্ঘ চৌদ্দ বছর দৃষ্টি শক্তির ক্ষীণতা এবং একের পর এক দীর্ঘ সফরের পরও লেখনীর ময়দানে তাঁর এই অব্যাহত পদচারণা শুধু আল্লাহ্ পাকের গায়েবী মদদই সম্ভব করে তুলেছিল।

মাত্র ১৬ বছর বয়সে মিসরের বিখ্যাত সাহিত্যিক সাইয়েদ রশীদ রেযা সম্পাদিত আল-মানার পত্রিকায় তাঁর প্রথম আরবী লেখা প্রকাশিত হয়। এরপর তাঁর কলম আরবী এবং উর্দুতে অবিশ্রান্তভাবে চলতে থাকে বছরের পর বছর। অবশ্য প্রথমে বেশ কয়েক বছর তাঁর মূল টার্গেট ছিল আরবী ভাষা। উর্দুর পরিবর্তে তখন তিনি শুধু আরবী ভাষাতেই লিখতেন। তিনি আরবী রচনাবলীর জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করেন। সাথে সাথে তাঁর আরবী রচনাবলীর উর্দু তরজমা হতে থাকে। এ পর্যন্ত পাওয়া তথ্য অনুযায়ী হযরতের উর্দু রচনার সংখ্যা ২৬৫ এবং আরবী রচনার সংখ্যা ১৭৬। এ ছাড়া তাঁর অধিকাংশ রচনা ইংরেজী, আরবী, ফার্সী, হিন্দি, তুর্কি, বাংলা, তামিল, মালয়ী, গুজরাটীসহ বিভিন্ন ভাষায় তরজমা হয়ে সুধী সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

আরবী ভাষায় রচিত তাঁর কয়েকখানা গ্রন্থ আরব দেশসমূহের বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্যপুস্তকরূপে স্বীকৃতি পেয়েছে। তাঁর রচনাবলীর মধ্যে সীরাত, জীবনী, দাওয়াত, সমাজ সংস্কার, চরিত্র গঠন, অমুসলিম সম্প্রদায়ের প্রতি আহ্বান, আরব জাহানকে জাগ্রত করা এবং পাশ্চাত্যে বসবাসকারী মুসলিম সমাজ ও শুধুমাত্র পাশ্চাত্যবাসীকে ইসলামের দিকে আহ্বানের বিষয় প্রাধান্য পেয়েছে।

নিম্নে হযরত মাওলানার কয়েকখানা বিখ্যাত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত আলোচনাসহ তালিকা পেশ করা হল ঃ–

উর্দূ গ্রন্থাবলী

সীরাতে সাইয়েদ আহমাদ শহীদ

এ গ্রন্থখানি হযরত সাইয়েদ আহমাদ শহীদের বিস্তারিত জীবনী, এতে তাঁর ইসলাহী ও সাংস্কারিক কার্যক্রমের বর্ণনা রয়েছে। এগারশত পৃষ্ঠার এ বিখ্যাত গ্রন্থখানি তিনি ২৪ বছর বয়সে প্রণয়ন করে ছিলেন। তখন তাঁর পরিচয়ের সময় বলা হতো যে, ইনি সীরাতে সাইয়েদ আহমাদ শহীদের লেখক। এ গ্রন্থের মাধ্যমেই তিনি ভারত উপমহাদেশের উলামা- মাশায়খ ও শিক্ষিত শ্রেণীর কাছে ব্যাপকভাবে পরিচিত হয়েছিলেন।

ইনসানি দুনইয়া পর মুসলমানুঁ কা উরুজ ওয়া যাওয়াল কা আছর

হযরত মাওলানা আলী মিয়াঁর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হল, "মা যা খাসিরাল আলামু বি ইনহিতাতিল মুসলিমীন"। তিনি তিরিশ বছর বয়সে এ গ্রন্থখানি আরবীতে রচনা করেন। পরে "ইনসানি দুনইয়া পর মুসলমানুঁ কা উরুয ওয়া যাওয়াল কা আছর" নামে উর্দূতে অনূদিত হয়। এ গ্রন্থ শুধু একখানি বিপ্লব সৃষ্টিকারী গ্রন্থই নয়, বরং এ গ্রন্থে মুসলিম উম্মাহর ইসলামী পুনর্জাগরণের জন্য যেসকল নির্দেশনার প্রয়োজন তার সকল বিষয়ের উপর আলোকপাত করা হয়েছে। যুগ-পরিক্রমায় মুসলিম মিল্লাতের উত্থান-পতনের ঐতিহাসিক বর্ণনা- বিশ্লেষণ এ গ্রন্থে পাওয়া যায়। গ্রন্থখানি প্রকাশিত হলে ইসলামী দুনিয়ায় যেন এক ভূমিকম্পের সৃষ্টি হয়। হুযুরে পাক (সঃ)-এর পৃথিবীতে আগমনের সময় দুনিয়ার অবস্থা কি ছিল এবং ইসলামী নেতৃত্বের ভার তিনি কিভাবে নিজের হাতে নিয়েছিলেন এবং তা সভ্যতার উপর কি প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল, এরপর এই নেতৃত্ব কিভাবে দুর্বল হয়ে শেষ হয়ে যায় ইত্যাদির বিস্তারিত বর্ণনা এ গ্রন্থে পাওয়া যায়।

হযরতের সবচেয়ে প্রিয় গ্রন্থ

একবার এক মজলিসে হযরত মাওলানা আলী মিয়াঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, আপনার গ্রন্থাবলীর মধ্যে সবচেয়ে প্রিয় গ্রন্থ কোনখানি। তিনি জবাবে বলেছিলেন, ফযিলতের দিক দিয়ে প্রিয় গ্রন্থ নবীয়ে রহমত। কিন্তু যে গ্রন্থের মাধ্যমে আলমে ইসলামে আমার পরিচয় হয়েছিল এবং দাওয়াতী কাজ করার ক্ষেত্র তৈরী হয়েছিল তা ছিল "মা যা খাসিরাল আলামু বি ইনহিতাতিল মুসলিমীন।"

এ গ্রন্থখানি সারা দুনিয়ায় অভূতপূর্ব সাড়া জাগাতে সমর্থ হয়। আরব দুনিয়া, ইসলামী দুনিয়া আলোচ্য বিষয়ের ভূয়সী প্রশংসা করেন। এমনকি পাশ্চাত্যের বিখ্যাত লেখক লণ্ডন ইউনিভার্সিটির মিডলইস্ট সেকশনের চেয়ারম্যান ডক্টর বেকনাঘস এ কথা বলতে বাধ্য হন যে, "এ শতাব্দীতে মুসলমানদের পুনর্জাগরণের লক্ষ্যে যেসকল ভালো ভালো প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে এ গ্রন্থখানি তাঁর নমুনা এবং ঐতিহাসিক দলিল হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়ার যোগ্য।

প্রকাশনার গায়েবী ব্যবস্থা

পাণ্ডুলিপি তৈরী হওয়ার পরও হযরত মাওলানার নিকট ব্যক্তিগতভাবে আরবী এ গ্রন্থখানি প্রকাশ করার কোন ব্যবস্থা ছিল না এবং তখন পর্যন্ত কোন ব্যবসায়িক প্রকাশনা সংস্থাও এ গ্রন্থখানি প্রকাশ করার আগ্রহ দেখায়নি। ফলে তিনি খুবই চিন্তিত হয়ে পড়েন। সে সময়ে হযরত আলী মিয়াঁ দাওয়াতী মিশনে মক্কা শরীফে অবস্থান করছিলেন। সেখানকার বিভিন্ন গ্রন্থ প্রকাশক প্রতিষ্ঠানের সাথে এ ব্যাপারে কথাবার্তা বলেও তিনি বিফল মনোরথ হয়ে চিন্তিত হয়ে পড়েন। অবশেষে তিনি নিরাশ হয়ে মনের আগুন আর চোখের পানির হাদিয়া নিয়ে আল্লাহ পাকের ঘরের দরজায় হাজিরা দেন। হযরত তার আত্মজীবনীতে লিখেছেন, "এ অবস্থায় সোজা হেরেম শরীফে চলে যাই এবং মুলতাযিমে অন্তরের সকল আকুতি-মিনতি নিয়ে এ গ্রন্থখানির প্রকাশনার সকল ব্যবস্থাপনার তাওফীক রাব্বুল আলামীনের কাছে ভিক্ষা চাই। দু'আর প্রতিক্রিয়া এই হয়েছিল যে, আল্লাহ পাক এ গ্রন্থখানি প্রকাশের সকল ব্যবস্থা উত্তম পদ্ধতি ও অদৃশ্য ব্যবস্থাপনায় করেছিলেন এবং আমার এ গ্রন্থখানির যে ব্যাপক গ্রহণ যোগ্যতা হয়েছিল অন্য কোন গ্রন্থের বেলায় তা হয়নি।

এ গ্রন্থখানির মকবুলিয়াতের মাত্রা এভাবে অনুমান করা যায় যে, গ্রন্থখানির ১৫ টি এডিশন মিসর, বৈরুত, সিরিয়া থেকে বের হয়েছে। ১৯৮২ সালে কুয়েতের দারুল কলম এ গ্রন্থখানির এক লাখ কপি ছাপার সাথে সাথে তার আশি হাজার কপি সৌদি শিক্ষা মন্ত্রণালয় ক্রয় করে এবং রিয়াদের মাকতাবাতুল হারাম বারো হাজার কপি খরিদ করে নেয়। গ্রন্থখানির এ পর্যন্ত ১২টি উর্দু এডিশন ভারতে এবং সমসংখ্যক এডিশন পাকিস্তানে বের হয়েছে। ইংরেজীতে ছয় এডিশন এবং তুরস্কের আংকারা থেকে তুর্কিতে, ইরানের কোম থেকে ফার্সীতে, প্যারিস থেকে ফরাসীতে ছাপা হয়েছে। এ ছাড়া

অন্যান্য ভাষাতে এর তরজমা হচ্ছে। বাংলাতেও গ্রন্থখানির তরজমা শুরু হয়েছে।

মোটকথা হেড কোয়ার্টারে পাশ করিয়ে নেয়ার পর হযরত মাওলানা মিশরের এক বিখ্যাত গ্রন্থ প্রকাশক "লাজনাতুত তা'লীফ ওয়াত তারজমা ওয়ান্নাশর" এর সভাপতি বিখ্যাত সাহিত্যিক ডক্টর আহমাদ আমীনের কাছে পাণ্ডুলিপি পাঠিয়ে দেন। উক্ত প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান কমিটি গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি ও তার সূচীপত্র দেখে খুশী হন এবং হযরতের সাথে এ গ্রন্থ প্রকাশ করার চুক্তি করে নেন।

হযরত মাওলানা তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন যে, আমার জীবনের কয়েকটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ খুশীর দিনগুলির একটি ঐ দিন ছিল, যেদিন প্রিয়ভাজন মুহাম্মাদ রাবে চলতি মোটরে আমাকে উক্ত প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানের চিঠি দেন। প্রকৃতপক্ষে এ গ্রন্থের প্রকাশনা আমার দাওয়াতী কাজের মধ্যে সেই সহজসাধ্যতা এবং মধ্যপ্রাচ্যের দ্বীনী ও ইলমী বৃত্তে আমার পরিচয়ের ক্ষেত্রে ঐ ভূমিকা রেখেছিল যা সীরাতে সাইয়েদ আহমাদ শহীদ গ্রন্থখানি ভারত উপমহাদেশে আমার পরিচয়ের ক্ষেত্রে অবদান রেখেছিল। ঐ সময় আরব দুনিয়ার যেসমস্ত লোক এ গ্রন্থ পড়েনি, তাদেরকে শিক্ষিত লোক মনে করা হত না। মোটকথা এ গ্রন্থখানি আরব দেশে হযরত মাওলানা আলী মিয়াঁর জন্য ভিজিটিং কার্ড হিসেবে চিত্রিত হয়েছিল।

গ্রন্থখানির উপর প্রথম নজর

গ্রন্থখানি ১৯৫০ সালে প্রকাশিত হয়। কিন্তু ১৯৫১ সালের জানুয়ারী পর্যন্ত গ্রন্থখানি দেখার সৌভাগ্য তিনি লাভ করেননি। ১৯৫১ সালের জানুয়ারী মাসের শুরুতে তাঁর দীর্ঘ হেজায সফরের শেষের দিকে তিনি মিশর সফরের সাথে সাথে সিরিয়া ও সেখানকার লেখকদের সাথে সাক্ষাতের জন্য সফরের পরিকল্পনা করেন এবং ভিসা নেয়ার জন্য জেদ্দার সিরিয়া দূতাবাসে যান। ভিসা পাওয়ার পর তিনি সিরিয়ার রাষ্ট্রদূতের সাথেও দেখা করেন। উক্ত রাষ্ট্রদূত একজন সাহিত্যামোদী ব্যক্তি ছিলেন। মিশরী সাহিত্য আলোচনার এক পর্যায়ে তিনি বলতে থাকেন যে, ভারতীয় আলেমদের গ্রন্থসমূহে যে রুহানিয়াত পাওয়া যায় তা মিশরীয় আলেমদের গ্রন্থে পাওয়া যায় না। আমি কিছুদিন পূর্বে মিশরে গিয়েছিলাম। সেখানে এক লাইব্রেরীতে "মা যা খাসিরাল আলামু বি ইনহিতাতিল মুসলিমীন" নামক একখানা গ্রন্থ দেখলাম

এবং তা পড়ে অভিভূত হলাম। হযরত মাওলানা এ কথা শোনার সাথে সাথে তার হৃদয়ে বিদ্যুৎ খেলে যায়। তিনি আবেগভরে রাষ্ট্রদূতকে জিজ্ঞাসা করেন, আপনার কাছে বইখানা আছে কি? আমাকে দেখাতে পারেন? তিনি আলমারী থেকে বই খানা বের করে হযরতের হাতে দেন। তিনি কয়েক দিনের জন্য বই খানা তার কাছ থেকে ধার নেন এবং নিজের বই নিজে দেখে পড়ে লেখক হিসেবে আল্লাহ পাকের মহান দরবারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

তারিখে দাওয়াত ওয়া আযীমাত

হযরত আলী মিয়াঁ তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন যে, একবার আমি আমার মোর্শেদ হযরত রায়পুরীর সাথে ফজরের নামাযের পর হাঁটছিলাম। ঐ সময় একজন অমুসলিম পণ্ডিত ব্যক্তিও আমাদের সাথে চলছিলেন। হযরত তাকে বলছিলেন, ইসলামের সত্যতার একটি প্রমাণ এই যে, ইসলামের যে যামানায় যে ধরনের ব্যক্তিত্বের প্রয়োজন হয়েছে, আল্লাহ পাক তা পাঠিয়েছেন এবং যে যামানায় যে ধরনের ফেতনা উঠেছে তার মোকাবেলা করার জন্য আল্লাহ পাক সে ধরনেরই ব্যক্তিত্ব সৃষ্টি করেছেন।" হযরত রায়পুরীর এই সংক্ষিপ্ত বাক্যগুলি হযরত আলী মিয়াঁর মনে খুবই প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে এবং এ ধরনের আলোচ্য বিষয়ের প্রয়োজনীয় মাল-মসলার এক বিরাট ভাণ্ডার তাঁর চোখের সামনে ভাসতে থাকে। ফলে তিনি এ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর কলম ধরার পরিকল্পনা করে ফেলেন। সৌভাগ্যক্রমে ১৯৫২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে লাখনৌতে জামায়াতে ইসলামী এবং তাবলীগের পক্ষ থেকে সাথীদের সামনে কয়েকটি বিষয়ের উপর এমন ধরনের বক্তৃতা দেয়ার সিদ্ধান্ত হয় যাতে তাদের চিন্তা-চেতনার তরবিয়ত হবে এবং তাদের জ্ঞান ও ধারণা কিছুটা বিস্তৃত হবে। হযরত মাওলানাকে আলোচ্য বিষয় ঠিক করে দেয়া হয় "ইসলাহ ওয়া তাজদীদ কি তারীখ আওর উসকি আহাম শাখছিয়াতেঁ" অর্থাৎ ইসলাহ ও সংস্কারের ইতিহাস এবং তার বিশেষ ব্যক্তিত্বসমূহ।

হযরত আলী মিয়াঁ এক সপ্তাহ যাবত এ বিষয়ে বক্তৃতা করেন। বক্তৃতা সাথে সাথে সংরক্ষণ করা হত। পরে যখন তিনি দ্বিতীয় বার এগুলি দেখেন তখন তার মনে এই ধারণার সৃষ্টি হয় যে, এ বিষয়ে আরো কিছু প্রচেষ্টা চালালে এবং এই বক্তৃতাগুলিকে গ্রন্থ আকারে প্রকাশ করলে তা এক মূল্যবান সম্পদে পরিণত হবে। এ কাজটিতে পুরো ইসলাহ ও দাওয়াতের ইতিহাসই সংকলিত হবে না; বরং এতে মুসলমানদের চিন্তা ও ইলমী পরাজয়ের এবং

উত্থান-পতনের ইতিহাস সামনে এসে যাবে। ফলে তিনি এ মহৎ কাজ শুরু করে দেন।

প্রথম খণ্ড

তারিখে দাওয়াত ওয়া আযীমাতের প্রথম খণ্ড ১৯৫৪ সালের অক্টোবর মাসে শেষ হয়। এ খণ্ডে প্রথম শতাব্দীর বিশেষ ব্যক্তিত্ব হযরত উমর ইবনে আব্দুল আজিজ এর সাংস্কারিক কার্যক্রম থেকে শুরু করে সপ্তম শতাব্দীর হযরত জালালুদ্দীন রুমী (রহ.)-এর সাংস্কারিক ও বিপ্লবী চিন্তাধারার কার্যক্রম সন্নিবেশিত হয়েছে। এর সাথে তিনি ইসলাহ ও সংস্কারের উপর একটি অতিব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা লেখেন। এ গ্রন্থখানি আযমগড়ের দারুল মুসান্নিফীন থেকে ১৯৫৫ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়।

এ গ্রন্থ হাতে পাওয়ার পর এক চিঠিতে হযরত রায়পুরী লেখেন, "অধম আজকাল আপনার কিতাব তারিখে দাওয়াত ওয়া আযীমাত শুনছে। এটি শাহ সাহেবের কাছ থেকে পেয়েছিলাম। মা-শা আল্লাহ, খুবই সুন্দর কিতাব। আল্লাহ পাক আপনাকে জাযায়ে খায়ের দান করুন। আপনি বড় কষ্ট করে এ গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। প্রকৃতপক্ষে এটা আপনার বড় কাজ। ১৯৫৬ সালে অন্য এক চিঠিতে লেখেন যে, আপনার কিতাব দ্বিতীয় ও তৃতীয়খণ্ড শুনছি। আজ কিতাবখানি কাজী সাহেব পড়তে নিয়েছেন। আপনার কিতাব পড়ে মন ভরে না, আরো চাহিদা থেকে যায়। অন্য এক চিঠিতে ইরশাদ করেন, "দ্বিতীয় খণ্ড ছাপা হলে খুবই ভালো হবে।

বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ হযরত মাওলানা মানাযির আহসান গিলানী লিখেছেন, দাওয়াত ও আযীমাতের ইতিহাস পেয়েছি। নিজের হারানো সম্পদ ফিরে পেয়েছি। আল্লাহ পাকই জানেন কতবার এই গ্রন্থ থেকে ফায়দা লাভ করতে থাকবো। পড়ছি, মন ভরছে না। আল্লাহ পাকই জানেন আমার কত স্বপ্নের ব্যাখ্যা আপনার দ্বারা পূর্ণ হবে।

দ্বিতীয় খণ্ড

তারিখে দাওয়াত ওয়া আযীমাতের দ্বিতীয় খণ্ডের পাণ্ডুলিপি ১৯৫৬ সালে তৈরী হয় এবং ১৯৫৭ সালে দারুল মুসান্নফীন থেকে ছাপা হয়। এ গ্রন্থে শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াঁর সাংস্কারিক কার্যাবলীর বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে।

তৃতীয় খণ্ড

হযরত মাওলানার বিদেশ সফর এবং অন্যান্য কারণে তৃতীয় খণ্ড বের হতে ছয় বছর সময় লেগে যায়। ঐ সময় বন্যার কারণে হযরত তাঁর গ্রামের বাড়ী রায়বেরেলীর তাকিয়া কেলায় আটকা পড়ে যান। ঐ সময় তিনি তৃতীয় খণ্ডের কাজ শুরু করেন এবং তিন সপ্তাহের মধ্যে সুলতানুল মাশায়েখ হযরত খাজা নিযামুদ্দীন মাহবুবে ইলাহীর সাংস্কারিক কার্যক্রম লিপিবদ্ধ করেন। এই খণ্ডের দ্বিতীয় অংশে তিনি মাখদুমুল মুলক শায়খ শরফুদ্দীন ইয়াহইয়া মানেরীর ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেন। ১৯৬২ সালে লাহোরে অবস্থান কালে এই গ্রন্থ পরিপূর্ণ হয়। গ্রন্থখানি ১৯৬৩ সালে মজলিসে নশরিয়াতে ইসলাম হতে প্রকাশিত হয়।

চতুর্থ খণ্ড

এ খণ্ডটি দ্বিতীয় হাজার বছরের মুজাদ্দিদ হযরত শায়খ আহমাদ সিরহিন্দ (রহ.)-এর কর্মবহুল জীবনের উপর লিখিত। তৃতীয় খণ্ডের দীর্ঘ ১৮ বছর পর ১৯৮০ সালের এপ্রিল মাসে এটি প্রকাশিত হয়।

পঞ্চম খণ্ড

পঞ্চম খণ্ড হাকীমুল ইসলাম শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (রহ.)-এর সাংস্কারিক কার্যক্রমের উপর রচিত।

নবীয়ে রহমত

এ গ্রন্থখানি আল্লামা নদভী (রহ.)-এর সীরাতুন্নবী বিষয়ক গ্রন্থ। এ গ্রন্থখানি প্রথমে "আস-সীরাতুন নববিয়া নামে প্রকাশিত হয়, পরে নবীয়ে রহমত নামে এর উর্দু সংস্করণ বের হয়। অত্যধিক জনপ্রিয়তার কারণে আরবীতে এর দশটি সংস্করণ বের হয়েছে। গ্রন্থটির প্রতিটি অধ্যায়ে নবী জীবনের বিস্তারিত তথ্য সন্নিবেশিত হয়েছে। মোটকথা, এ গ্রন্থখানিকে নবী চরিতের একটি সঠিক ও সার্থক প্রকাশনা বলা যেতে পারে।

সাওয়ানেহে হযরত মাওলানা আব্দুল কাদের রায়পুরী (রহ.)

বইখানি হযরত মাওলানা আলী মিয়াঁর পীর ও মোরশেদ হযরত মাওলানা আব্দুল কাদের রায়পুরী (রহ.)-এর বিস্তারিত জীবনী। মাওলানা আব্দুল কাদের রায়পুরী ছিলেন হযরত মাওলানা আব্দুর রহীম রায়পুরী (রহ.)-এর

বিশিষ্ট খলীফা। উত্তর প্রদেশের সাহারানপুর জেলা থেকে ২০/২৫ মাইল দূরে রায়পুর এক নীরব পল্লী। যেখানে এসব আল্লাহ ওয়ালা খানকাহী পরিবেশে উম্মতের ইসলাহ এবং দাওয়াতের কাজে নিজেদেরকে সঁপে দিয়েছিলেন।

আরকানে আরবাআ'

আরকানে আরবাআ' বইখানি ইসলামের চারটি প্রধান রুকন–সালাত, সিয়াম, যাকাত ও হজ্জের উপর লেখা সিরিজ গ্রন্থ। বইখানি বর্তমান যুগ ও ধর্মের পেক্ষাপটে যুক্তি-তর্ক এবং বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে আলোচনা সমৃদ্ধ এক অনবদ্য গ্রন্থ। কুরআন-সুন্নাহর আলোকে এই বুনিয়াদী ইবাদাতগুলির মূল লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, কল্যাণ ও উপকারিতা এবং ব্যক্তি জীবন ও সামাজিক জীবনের উপর এগুলির সুগভীর প্রভাব সম্পর্কেও এতে পর্যাপ্ত আলোকপাত করা হয়েছে।

হযরত মাওলানা ইলিয়াস আওর উনকি দ্বীনী দাওয়াত

গ্রন্থখানি উনবিংশ শতাব্দীর বিশিষ্ট দায়ী এবং প্রথম কল্যাণযুগের এক হীরক খণ্ড, দাওয়াত ও তাবলীগের কর্মবীর হযরতজী মাওলানা ইলিয়াস সাহেব (রহ.)-এর জীবনী গ্রন্থ। আল্লাহ তা'আলা ভাগ্যবান লেখককে হযরতজীর সাথে বহু বছর গভীর সম্পর্ক রাখার তাওফীক দিয়েছিলেন। তাঁর এই সাংস্কারিক কাজকে যেরূপ তিনি কাছ থেকে উপলব্ধি করেছিলেন তা তিনি এ জীবনী গ্রন্থে আলোকপাত করেছেন।

পুরানে চেরাগ

'পুরানে চেরাগ" (প্রাচীন প্রদীপ) হযরত মাওলানা (রহ.)-এর স্মৃতিচারণমূলক এক অনবদ্য রচনা। বইখানি ৩ খণ্ডে সম্পাদিত। তাঁর দীর্ঘ কর্মজীবনে তিনি যেসব উলামা, মাশায়খ, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবী এবং বড় বড় মনীষীর সাথে মিশেছিলেন কিংবা তাঁরই সোহবতে যেসকল মনীষী বড় হয়েছিলেন তিনি তাঁর এ গ্রন্থে তাদের সম্পর্কে বিস্তারিত স্মৃতিচারণ করেছেন। বইখানি এমন সুখপাঠ্য যে, পড়া শুরু করলে শেষ না করে থামা যায় না।

প্রথম খণ্ডে মাওলানা সাইয়েদ সুলায়মান নদভী, মাওলানা সাইয়েদ মানাযের আহসান গিলানী, মাওলানা সাইয়েদ হোসাইন আহমাদ মাদানী,

হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী, মাওলানা আহমাদ আলী লাহোরী, মাওলানা ওছীউল্লাহ ফতেহপুরী, মাওলানা হায়দার হাসান খান, মাওলানা খলীল আরব, মাওলানা হালীম আতা, মাওলানা মাসউদ আলম নদভী, জিগর মুরাদাবাদী প্রমুখ মনীষীগণের আলোচনা এসেছে।

২য় খণ্ডে মাওলানা মুহাম্মাদ আলী জওহার, নওয়াব সদর ইয়ারজং, মাওলানা হাবীবুর রহমান খান শেরওয়ানী, মাওলানা আবুল কালাম আযাদ, ডাঃ জাকির হোসাইন, মাওলানা আব্দুল মাজেদ দরিয়াবাদী, সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদী, মাওলানা মুহাম্মাদুল হাসানী প্রমুখ মনীষীদের স্মৃতিচারণমূলক জীবনী স্থান পেয়েছে।

তৃতীয় খণ্ডে শায়খ হাসানুল বান্না, সাইয়েদ কুতুব শহীদ, মাওলানা ইউসুফ কান্ধলভী, মাওলানা সাইয়েদ মিন্নাতুল্লাহ রহমানী, মাওলানা কারী তয়্যিব, মাওলানা উবায়দুল্লাহ বলিয়াভী প্রমুখ মনীষীদের জীবনী স্থান পেয়েছে।

হায়াতে শায়খুল হাদীছ

এটি ভারতের উত্তর প্রদেশের সাহারানপুর জেলার স্বনামধন্য মাদরাসা মাজাহিরে উলূমের শায়খুল হাদীছ হযরত মাওলানা যাকারিয়া (রহ.)-এর বিস্তারিত জীবনী। হযরত আলী মিয়াঁ হযরত শায়খুল হাদীছকে একজন মুরুব্বী হিসাবে মেনে চলতেন। সকল কাজে তাঁর পরামর্শ নিতেন। শায়খের ইন্তেকালের পর তিনি তাঁর উপর বিস্তারিত এই জীবনীগ্রন্থ রচনা করেন। ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ থেকে বইখানির বাংলা অনুবাদ হয়েছে।

ফযলে রহমান গঞ্জমুরাদাবাদী

দারুল উলূম দেওবন্দের সাথে জড়িত উলামায়ে কেরামের পথ প্রদর্শক যেমন হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজেরে মক্কী (রহ.), ঠিক তেমনিভাবে দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামার সাথে জড়িত প্রায় অধিকাংশ উলামায়ে কেরামের পীর ও মোর্শেদ ছিলেন বিখ্যাত বুযুর্গ হযরত ফযলে রহমান গঞ্জে মুরাদাবাদী। গ্রন্থখানি হযরত মুরাদাবাদীর সংক্ষিপ্ত জীবনী।

দো মাহিনা আমেরিকা মে

গ্রন্থখানি যুক্তরাষ্ট্র এবং কানাডায় হযরত মাওলানার ভ্রমণ কাহিনী সম্পর্কিত। যার মধ্যে তিনি এই আধুনিক রাষ্ট্রের ভালো ও মন্দ উভয় দিক আলোচনা করেছেন।

কাদিয়ানিয়াত

নবুয়তের মিথ্যা দাবীদার গোলাম আহমাদ কাদিয়ানীর উপর লেখা একখানি প্রামাণ্য আরবী দলীল। আরব জাহানে ভণ্ডনবীর দাবীদার গোলাম আহমাদের সঠিক পরিচয় তুলে ধরার জন্য হযরত মাওলানা আব্দুল কাদের রায়পুরী (রহ.)-এর অনুরোধে তিনি আরবীতে এ গ্রন্থখানি রচনা করেন।

কারওয়ানে মাদীনা

এ গ্রন্থখানি সীরাত বিষয়ক বিভিন্ন প্রবন্ধমালার সমষ্টি। যার মধ্যে রাসুলে পাক (সঃ)-এর শিক্ষা, পয়গাম, উপহার, ইহসান এবং তার বিশ্বজনীন ফলাফলের উপর আলোকপাত করা হয়েছে।

কারওয়ানে জিন্দেগী

গ্রন্থখানি হযরত মাওলানার লিখিত আত্মজীবনী। ৭ খণ্ডে সমাপ্ত এ বিশাল গ্রন্থে তিনি নিজের অবস্থার চেয়ে নিজের চিন্তা-চেতনা এবং ভাবধারাকে বেশী উজ্জীবিত করেছেন।

মাগরেব ছে কুছ ছাফ ছাফ বাতেঁ

এটি মাওলানা নদভীর সেই বক্তৃতামালা যা তিনি ইউরোপ ও ভারতে করেছিলেন। ঐসকল বক্তৃতায় অত্যন্ত সাহসের সাথে পশ্চিমা সভ্যতার পোস্টমর্টেম করেছেন। এ ছাড়া এতে তিনি প্রাচ্যের পশ্চিমা পন্থীদেরও কঠোরভাবে আক্রমণ করে বলেছেন, পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণকারীদের দ্বারা বিশ্বমানবতার কল্যাণ সাধনের কোন সুযোগ নেই।

তাযকিয়া, ইহসান,
তাসাউফ ওয়া সুলুক

তাযকিয়া ও এহসান যাকে এই শেষ যুগে তাসাউফ নামে অভিহিত করা হয়, ইসলামী ও ঈমানী জিন্দেগীর পরিপূর্ণতার জন্য এর প্রয়োজন ও গুরুত্ব রয়েছে। ইসলামী হুকুমাত এবং দেশ ও কওমের উপর এর অবিশ্বাস্য প্রতিক্রিয়া ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনায় এ গ্রন্থ লেখা হয়।

দরিয়ায়ে ইয়ারমুক ছে দরিয়ায়ে কাবুল তাক

কাবুল থেকে আম্মান বইটি একটি ভ্রমণ কাহিনী। লেখক ১৯৭৩ সালে রাবেতার প্রতিনিধি দলের সদস্য হয়ে আফগানিস্তানের কাবুল থেকে ইরান, লেবানন, সিরিয়া, ইরাক ও জর্দান বিশেষ করে এসব দেশের রাজধানী শহরসহ বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক স্থান ভ্রমণ করেন। তাঁর সফর লব্ধ অভিজ্ঞতা তিনি এ ভ্রমণ কাহিনীতে সবিস্তারে উল্লেখ করেছেন।

আসরে হাযের মে দ্বীন কি তাফহীম ওয়া তাশরীহ

এটি মওদুদী সাহেবের চার বুনিয়াদী পরিভাষার উপর লেখা একখানি সমালোচনামূলক গ্রন্থ।

আল-মুরতাযা

গ্রন্থখানি চতুর্থ খলীফা আমীরুল মোমেনীন হযরত আলী (রা.)এর বিস্তারিত জীবনী।

মোতালায়ে কুরআন কে উসুল ওয়া মাবাদী

এ বইখানি হযরত আলী মিয়াঁর শিক্ষকতা জীবনের শুরুতে কুরআনে হাকীম বুঝার জন্য এবং তা থেকে ফায়েদা হাছিলের জন্য ছাত্রদের সামনে তিনি যেসব গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি ও প্রাথমিক বিষয়াদির উপর দরস দিয়েছিলেন সেগুলিরই সমষ্টি।

নুকূশে ইকবাল

আল্লামা ইকবালের চিন্তাধারা বহি-র্বিশ্বে ছড়িয়ে দেয়ার লক্ষ্যে এ গ্রন্থখানি রচিত হয়। প্রথমে আরবীতে পরে নকুশে ইকবাল নামে উর্দুতে অনুদিত হয়।

মা'রেকায়ে ঈমান ও মাদ্দিয়াত

গ্রন্থখানি লেখকের আরবী গ্রন্থ "আচ্ছুরাউ বাইনাল ঈমানী ওয়াল মাদ্দিয়াত" এর উর্দু তরজমা। এ গ্রন্থে সূরায়ে কাহাফের তাফসীর এবং কুরআন-হাদীছ, প্রাচীন ইতিহাস ও নতুন জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোকে এ সূরার পর্যালোচনা করা হয়েছে।

যিকরে খায়ের

গ্রন্থখানি মাওলানার মোহতারামা আম্মাজান সাইয়েদা খায়রুন নিসার সংক্ষিপ্ত জীবনী।

হায়াতে আব্দুল হাই

এ গ্রন্থখানি মাওলানা আলী মিয়াঁর মোহতারাম আব্বা হযরত মাওলানা সাইয়েদ আব্দুল হাই, নাযেমে নদওয়াতুল উলামার বিস্তারিত জীবনী। শেষের দিকে হযরত আলী মিয়াঁর বড় ভাই মাওলানা আব্দুল আলী সাহেবের জীবনীও সন্নিবেশিত হয়েছে।

পা জা ছুরাগে জিন্দেগী

বইখানি দ্বীনী মাদরাসার ছাত্রদের সামনে দেয়া হযরত মাওলানার আবেগ বহুল বক্তৃতামালা। এসব বক্তৃতায় তিনি তালেবানে উলূমের ধারক-বাহকদের সঠিক মর্যাদা, দায়িত্ব-কর্তব্যবোধ, মনজিলে মকসুদ ইত্যাদি বিষয়গুলি সুন্দর করে ফুটিয়ে তুলেছেন। ইসলামী ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশের পক্ষ থেকে এটির বাংলা অনুবাদ হয়েছে।

হাদীসে পাকিস্তান

পাকিস্তানের কয়েকটি দ্বীনী মাদরাসা এবং সুধী সমাবেশের বক্তৃতার সমষ্টি এ বইতে স্থান পেয়েছে। বাংলা অনুবাদ হয়েছে।

সহ্‌বতে বা আহলে দিল

ভূপালের বিখ্যাত বুযুর্গ হযরত শাহ মুহাম্মাদ ইয়াকুব মুজাদ্দেদীর মালফুযাত ও ইরশাদাত এ বইতে স্থান পেয়েছে।

তা'মীরে ইনসানিয়াত

বইখানি আল্লামা নদভীর কয়েকটি বক্তৃতা সংকলন। লেখক পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে একটি দাওয়াতী মিশনে গিয়েছিলেন। সে সময়ে তাঁর দেয়া কালজয়ী আহ্বানগুলি এ পুস্তিকায় ধরে রাখা হয়েছে। বইখানি আল্লাহর পথের ঠিকানা নামে বাংলায় অনুদিত হয়েছে।

মানসাবে নবুয়ত আওর উসকে
আলী মাকাম হামেলীন

এ গ্রন্থখানি ১৯৬৩ সালের ৩০ শে মার্চ থেকে মদীনা ইউনিভার্সিটিতে দেয়া "আন-নবুওয়াহ্ ওয়াল আম্বিয়া ফি যওকিল কুরআন" নামক আরবী বক্তৃতার উর্দু তরজমা।

মুসলিম মামালেক মে ইসলামিয়াঁত আওর
মাগরিবিয়াত কি কাশমাকাশ

এটি মুসলিম দেশসমূহে ইসলামী ভাবধারা ও পাশ্চাত্য কৃষ্টি-কালচারের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব চলছে তার উপর লেখা গ্রন্থ।

যব ঈমান কি বাহার আয়ি

এটি ইযা হাব্বাত রিহুল ঈমান নামক আরবী গ্রন্থের উর্দু অনুবাদ। হযরত সাইয়েদ আহমাদ শহীদ রায়েবেরেলী (রহ.)-এর উপর রচিত সংক্ষিপ্ত পুর্ণাঙ্গ গ্রন্থ। এ গ্রন্থখানি বাংলায় তরজমা হয়েছে।

হেজাযে মোকাদ্দাস আওর
জাযিরাতুল আরব

এ গ্রন্থখানি হযরত মাওলানার ঐসমস্ত চিঠিপত্রের সমষ্টি যা তিনি বিভিন্ন আরব রাষ্ট্র প্রধানদের নিকট পাঠিয়েছিলেন। এ ছাড়া ঐ প্রবন্ধাবলীও রয়েছে যা তিনি সৌদী আরবের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে পাঠ করেছিলেন।

আরবী গ্রন্থাবলী

১. المرتضى

২. العقيدةوالعبادة

৩. المسلمون فى الهند

৪. ألمدخل إلى الدراسات القرأنية

৫. المدخل إلى دراسات الحديث النبوى الشريف

৬. إلى الإسلام من جديد

৭. الطريق إلى المدينة

৮. الإسلام– أثره في الحضارة وفضله على الإنسانية

৯. التفسير السياسى(على قيد الطبع)

১০. العرب والإسلام

১১. ارتباط في مسير الإنسانية

১২. الإسلام والمستشرقون

১৩. المد والجزرفي تاريخ الإسلام

১৪. النبى الخاتم

১৫. إسمعي يا مصر

১৬. أحاديث صريحة مع إخواننا العرب والمسلمين

১৭. لقرن الخامس عشر الهجري الجديد في ضوء التاريخ الواقع

১৮. الدعوة الإسلامية في الهند وتطوراتها

১৯. الدعوة الإسلامية في العصر الحاضر

২০. جبهاتها الحاسمةو مجالاتها الرئيسة

২১. الدعوة إلى الله

২২. إسمعي يا إيران

২৩. النبي الخاتم والدين الكامل

২৪. النبوة هي الوسيلة الوحيدة للمعرفة الصحيحة والهداية الكاملة

২৫. الإسلام والغرب

২৬. العرب يكتشفون أنفسهم

২৭. الحاجة إلى التركيز

২৮. الفتح للعرب المسلمين

২৯. اللإمام الذي لم يوف حقه من الإنصاف والإعتراف

৩০. الإجتهاد و نشأة المذاهب الفقهية

৩১. إلي نظام عالمي جديد

৩২. أضواء

৩৩. بين نظرين

৩৪. بين الصورة والحقيقة

৩৫. ترشيد الصحوة الإسلامية

৩৬. حاجة العالم إلي مجتمع إسلامي مثالي

৩৭. حكمة الدعوة وصفة الدعاة

৩৮. خليج بين الإسلام و المسلمين

৩৯. دور الحديث في تكوين المناخ الإسلامي

৪০. درس من الحوادث (على قيد الطبع)

৪১. دور الجامعات ألإسلامياة المطلوب في تربية العلماء

৪২. دور الأمة الإسلامية في إبقاذ البشرية و إسعادها

৪৩. روائع إقبال

৪৪. ردة و لاأبابكر لها

ربّانية لا رهبانية .৪৫

السيرة النبوية .৪৬

سيرة النبي الإمين .৪৭

صورتان متضاداتان عيد أهل السنة والشيعة .৪৮

عاصفة يواجهها العالم الإسلامي والعربي.৪৯

فضل البعثة المحمدية على الإنسانية .৫০

في ظلال البعثة المحمدية .৫১

كيف ينظر المسلمون إلى الحجاز.৫২

كيف دخل العرب التاريخ .৫৩

كارثة العالم العربي.৫৪

ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين .৫৫

محمدرسول الله – الرسول الإعظم .৫৬

منهج إفضل للدعاة والعلماء.৫৭

مواساة أم مساواة .৫৮

مطالبة القرآن للا نقياد التام والاستسلام الكامل .৫৯

ملة إبراهيم و حضارة الإسلام .৬০

مستقبل العربية الإسلامية بعد الحرب الخليج .৬১

منهج علماء الهند في التربية الإسلامية .৬২

من صاعة الموت إلى صناعة القرارات .৬৩

نفحات الإيمان بين صنعاء وعمان.৬৪

نظرة مؤمن واع إلى المدنيات المعاصرة الزائفة .৬৫

نحو تكوين إسلامي جديد.৬৬

ইংরেজী গ্রন্থাবলী

1. A Guide book for Muslims.
2. Appreciation and Interpretation of Religion in the Modern Age.
3. A Misunderstood Reformer
4. Basis of a New Social Order
5. Calamity of Linguistic
6. Faith versus Materialism
7. From the Depth of the Heart in America
8. Glory of Iqbal
9. Islamic Concept of Prophethood
10. Islam and the World
11. Islam and Civilization
12. İslam and the Earliest Muslims
13. Islamic Studies Orientalists and Muslim Scholars
14. Islam the Perfect Religion
15. Islam and the West
16. Islam in a Changing World
17. Life and Mission of Moulana Mohd. Ilyas
18. Live to Lead: A Call to Indian Muslims
19. Mohammad The Last Prophet
20. Mohammad Rasulullah
21. Muslims in India
22. Mercy for the World
23. Mankind's Debt to the Prophet Muhammad

24. Prophet Muhammad in the Mirror of the Supplications.
25. Quadianism A Critical Study
26. Quadianism A Critique
27. Religion and Civilization
28. Role of Hadith
29. Reconstruction of Indian Society
30. What Muslims can do?
31. Saviours of Islamic Spirit (Vol.: 1-4)
32. Stories of the Prophets.
33. Speaking Plainly to the west
34. Status of Woman in Islam.
35. The Life of Caliph 'Ali
36. The Four Pillars of Islam.
37. The Pathway to Medina
38. The Musalman
39. The Excellent name of God.
40. Tales of the prophet and the Perfect Religion
41. The Arabs Must Win
42. The New Menace and it Answer
43. The Place of Knowledge
44. The World of Islam To-day
45. Western Civilization-Islam and Muslims

==000==

অধ্যায়–১৮

হযরত মাওলানার রচনাবলী থেকে

(৩৫২-৫১২)

- নতুন তুফান এবং তার প্রতিরোধ /৩৫২
- ইসলামী জীবন বিধান /৩৭৪
- ইসলামী রেনেসাঁর অগ্রপথিক /৩৯১
- আরকানে আরবাআ' /৪০৭
- প্রাচ্যের উপহার /৪২৫
- মাদরাসার ছাত্রদের মর্যাদা ও দায়িত্ব-কর্তব্য /৪৬৫
- বিবিধ /৪৯৮

নতুন তুফান এবং তার প্রতিরোধ

নতুন ইরতিদাদ

ইরতিদাদ অর্থ ধর্মত্যাগ করা। ইসলাম ধর্ম যে ত্যাগ করে তাকে মুরতাদ বলে। ইসলামের ইতিহাসে ইরতিদাদের ঘটনা একাধিকবার সংঘটিত হয়েছে। সবচেয়ে বড় এবং মারাত্মক ইরতিদাদের ঘটনা ছিল যা হযরত রাসূলে আকরাম (সা.) এর ইন্তিকালের অব্যবহিত পরই আরবের সীমান্তবর্তী গোত্রগুলোতে দেখা দিয়েছিল। তখন হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা.) তাঁর ইস্পাতদৃঢ় প্রতিজ্ঞা ও নজীরবিহীন ঈমানের বদৌলতে তা অংকুরেই বিনাশ করেছিলেন। দ্বিতীয় বৃহত্তম ইরতিদাদের ঘটনা ছিল খৃস্ট ধর্ম গ্রহণের ঘটনা। "স্পেন" থেকে বহিষ্কৃত মুসলমানদের মাঝে তা মহামারীর আকারে ছড়িয়ে পড়েছিল। আশেপাশের পশ্চিমা খৃস্টান শাসনাধীন রাষ্ট্রগুলোও এর প্রভাবমুক্ত ছিল না। খৃস্টান পাদ্রী ও মিশনারীগুলো তখন সেখানে এ উদ্দেশ্যে ব্যাপক মিশনারী তৎপরতা চালিয়ে ছিল। উল্লেখযোগ্য এ ঘটনাদ্বয় ছাড়া ইরতিদাদের বিচ্ছিন্ন দু'একটা ঘটনাও আছে। যেমন, হিন্দুস্তানের বিচার-বুদ্ধিহীন কোন সংকীর্ণচেতা ব্যক্তি ইসলাম ত্যাগ করে অন্য কোন ধর্ম গ্রহণ করল কিন্তু তা এত বিরল যে, ধর্তব্যে আসে না। প্রকৃতপক্ষে যদি বদনসীব স্পেনীয়দের খৃস্ট ধর্ম গ্রহণকে ইরতিদাদ বলা হয় তবে তা বাদে মুসলমানদের ইতিহাস ব্যাপক কোন ইরতিদাদের ঘটনার সাথে পরিচিত নয়। ঐতিহাসিকগণ এ সত্য অক্লেশে স্বীকার করেছেন।

যখনই ইরতিদাদের কোন ঘটনা ঘটেছে তার দুটি প্রতিক্রিয়া অবশ্যই দেখা দিয়েছে। এক, মুসলমানদের পক্ষ থেকে মারাত্মক বিদ্বেষ ও অনীহা। দুই, ইসলামী সমাজের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ। অর্থাৎ অতীতে যে কোন ব্যক্তিই ইসলাম ত্যাগ করেছে সে মুসলমানদের মারাত্মক রোষ ও বিদ্বেষের লক্ষ্যে পরিণত হয়েছে এবং আপনা-আপনিই ইসলামী সমাজ থেকে সে বিচ্যুত হয়ে গেছে। শুধু ইসলাম ত্যাগ করার কারণে তার ও তার আত্মীয়-স্বজনদের মাঝের সমস্ত বন্ধন, সমস্ত সম্পর্ক ঘুচে গেছে। মুরতাদ হওয়ার মতলবই হল, সে এক নতুন সমাজে, এক নতুন দুনিয়াতে প্রবেশ করল। মুরতাদের খান্দান তাকে সম্পূর্ণ বয়কট করে দিত। উত্তরাধিকার, লেনদেন, বিয়ে-শাদী কিছুই তার সাথে চলত না। ইরতিদাদের কোন ঢেউ যদি কখনো উঠত,

ধর্মীয় অঙ্গন উত্তপ্ত হয়ে উঠত। মুসলমানদের মাঝে তার প্রতিবিধানের চেতনা এবং ইসলামী মূল্যবোধ জাগ্রত হত। যেই ইসলামী রাষ্ট্রে এই ধরনের ঘটনা ঘটত সেখানকার উলামায়ে কেরাম, মুবাল্লিগীন এবং সাহিত্যিক ও সাংবাদিকগণ অত্যন্ত বলিষ্ঠভাবে তার বিরোধিতায় একাত্ম হয়ে যেতেন। তার কারণ ও গুঢ় রহস্য খুঁজে বের করতেন এবং ইসলামের সৌন্দর্য ও শ্রেষ্ঠত্ব তুলে ধরতেন। মুসলিম সমাজের চেহারাই পাল্টে যেত যেন এক মহাবিপর্যয় তাদেরকে বিধ্বস্ত করে দিয়েছে। নতুন শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করতে সাজ-সাজ রব পড়ে যেত। যুবক-বৃদ্ধ, নারী-শিশু নির্বিশেষে সকলের এক কাজ, এক ফিকির, কিভাবে একে মোকাবিলা করা যায়।

ইরতিদাদের ঘটনা প্রতিবিধানে ইসলামী সমাজের এই অবস্থা ছিল আবশ্যক। অথচ এই ধরনের ঘটনা না কোথাও বেশি ঘটত, না জনজীবনে এর গভীর কোন প্রভাব ছিল। কিন্তু কিছু দিন হল, ইসলামী দুনিয়ার সামনে এমন এক ইরতিদাদের অভ্যুদয় ঘটেছে, যার বিষক্রিয়া ইসলামী বিশ্বের এক প্রান্ত থেকে অপরপ্রান্ত পর্যন্ত মুহূর্তেই ছড়িয়ে পড়েছে যা শক্তি ও দাপট, ব্যাপকতা ও গভীরতার দিক থেকে এ যাবৎকালের সমস্ত ইরতিদাদী আন্দোলনকে ছাড়িয়ে গেছে। এমন কোন রাষ্ট্র নেই যা এর হামলা থেকে আত্মরক্ষা করতে পেরেছে; বরং খুব কম খান্দানই আছে যা তার হামলা থেকে নিরাপদ আছে। ইউরোপের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের আবরণে ইসলামী এশিয়ায় স্মরণকালের সবচেয়ে মারাত্মক এই ইরতিদাদী ফেৎনার অনুপ্রবেশ ঘটেছে।

ইসলামের পরিভাষায় ইরতিদাদের অর্থ কি? এক ধর্মের স্থানে অন্য ধর্ম, এক বিশ্বাসের স্থানে অন্য বিশ্বাস গ্রহণ করা। রাসূল (সা.) যে শিক্ষা নিয়ে আগমন করেছিলেন, যা কিছু তাঁর থেকে অকাট্য সত্যরূপে বর্ণনা-পরম্পরায় আমাদের পর্যন্ত পৌঁছেছে এবং যা কিছু ইসলামে নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত তাকে অস্বীকার করা। আর একজন মুরতাদ কি অবস্থান গ্রহণ করে? রিসালাতে মুহাম্মদী (সা.) কে অস্বীকার করে ইহুদী, খৃস্টান বা হিন্দু ধর্ম গ্রহণের কিংবা নাস্তিকতার পথ অবলম্বন করে এবং ঐশী প্রত্যাদেশ, রিসালাত ও নবুওয়াত এবং পুনরুত্থান ও আখেরাতের বিশ্বাসকে প্রত্যাখ্যান করে। ইরতিদাদের এই অর্থই পুরাতন যুগে এবং পুরাতন সমাজে প্রচলিত ছিল। যে ব্যক্তি নিজ ধর্ম পরিত্যাগ করে খৃস্ট ধর্ম গ্রহণ করত, সে গীর্জায় যাওয়া-আসা করত, যে অগ্নিপূজারী হত সে অগ্নিমণ্ডপে যেত, যে হিন্দু মাযহাব গ্রহণ করত সে দেব

মন্দিরে যেত। স্পষ্টভাবেই তার ধর্মত্যাগের বিষয়টা বুঝা যেত। দূর থেকেই মানুষ তাকে মুরতাদ বলে চিনত। তার প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করা হত। মুসলমান তার থেকে সকল আশা-ভরসা পরিত্যাগ করত। তার ধর্মত্যাগের বিষয়টা কারো কাছেই গোপন থাকত না।

ইউরোপের পাচারকৃত দর্শন

কিন্তু ইউরোপ থেকে ইসলামী এশিয়ায় যে ইরতিদাদের অনুপ্রবেশ ঘটেছে, তা এক দর্শনের আকারে আমাদের কাছে পৌঁছেছে। ইসলামের মৌলিক বিষয়াবলী অস্বীকারই এ দর্শনের মূল বক্তব্য। যে মহাশক্তি এই-বিশ্ব জগতকে অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে এনেছেন, বিশ্বজগতের প্রতিটি নড়াচড়া, উত্থান-পতন, ঘটনা-দুর্ঘটনা যাঁর নিয়ন্ত্রণে, যে মহাশক্তি এই বিশ্বজগতের স্রষ্টা, একমাত্র যাঁর হুকুম এই বিশ্বজগতে চলে সেই মহাশক্তিকে (আল্লাহ) অস্বীকারই এ দর্শনের মূল ভাষ্য। এই দর্শন ইলমে গায়েব, ওহী, নবুওয়াত, আসমানী বিধান এবং চারিত্রিক ও আধ্যাত্মিক শক্তিকে অস্বীকার করে।

এ পর্যন্ত ইউরোপ থেকে আমাদের কাছে যত দর্শন পৌঁছেছে তা কিছুর সম্পর্ক জীব বিজ্ঞানের সাথে, কিছুর সম্পর্ক জ্যোতির্বিজ্ঞানের সাথে, কিছুর সম্পর্ক আধ্যাত্মিক ও চারিত্রিক উৎকর্ষতার সাথে আর কিছুর সম্পর্ক রাজনীতি ও অর্থনীতির সাথে। কিন্তু এটা এমন এক দর্শন যার সম্পর্ক সবকিছুর সাথে, সবার সাথে। বিষয়ের দিক থেকে মানুষের পরস্পর যত পার্থক্যই থাকুক না কেন এই দর্শন সবাইকে এক পয়েন্টে সমবেত হওয়ার আহবান জানায় যে, এই বিশ্বজগত ও বিশ্বজগতে বসবাসকারী মানবজাতিকে বস্তুবাদী ও প্রকৃতিবাদী দৃষ্টি নিয়ে দেখ এবং এ দু'য়ের বাহ্যিক সমস্ত কাজ ও অবস্থাকে বস্তুবাদী দৃষ্টিকোণ নিয়ে পর্যালোচনা কর।

এই দর্শন মানুষের চিন্তা জগতে বিরাট প্রভাব ফেলে। আল্লাহর শক্তির উপর বিশ্বাসকে ক্রমান্বয়ে শিথিল করে দেয় এবং মানুষকে বস্তুর শক্তিতে বিশ্বাসী করে তোলে। এটা মানুষের মনোজগতে ও চিন্তা-জগতে প্রভাব বিস্তারকারী একটি স্বতন্ত্র বিশ্বাস, একটি স্বতন্ত্র ধর্ম। এটা তার মৌলিকত্ব, ব্যাপকতা, সার্বজনীনতা এবং মানুষের হৃদয় ও মস্তিস্ক, তথা দিল ও দেমাগকে আচ্ছন্ন, বিকৃত ও বশীভূতকরণের ক্ষেত্রে ইসলামের পর জন্ম নেয়া সবচেয়ে বড় ধর্ম। ইসলামী রাষ্ট্রের যেই শ্রেণী শিক্ষা-দীক্ষায় ও বুদ্ধিবৃত্তিতে বিশেষ স্বীকৃতিপ্রাপ্ত তারা এর চিত্তাকর্ষক রূপে মুগ্ধ হয়ে পড়ে এবং চোখ মুখ বন্ধ করে অকুণ্ঠচিত্তে তা কণ্ঠনালী দিয়ে ভিতরে পাঠিয়ে দেয় এবং পরম

নিশ্চিন্তে হজম করে নেয়। তারা এই ধর্মের এমন ভক্ত অনুসারী ও একনিষ্ঠ কর্মী বনে যায় যেমন একজন মুসলমান ইসলামের এবং একজন খৃস্টান খৃস্টধর্মের ভক্ত অনুসারী– প্রয়োজনে সে এর জন্য জীবন বিলীন করে, এর নিদর্শনাবলীকে সম্মান করে, এর রাহনুমা ও দাঈদের ইজ্জত করে, নিজস্ব শিল্প ও সাহিত্যকর্মের মাধ্যমে এর দাওয়াত দেয়। যেই ধর্ম, যেই সমাজ ব্যবস্থা এবং যেই চিন্তা-চেতনা এর সাথে সংঘাতপূর্ণ হয় তাকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে এবং এর অনুসারী সবাইকে ভাই ও বন্ধু বলে জানে। অনুরূপভাবে এই দর্শন গ্রহণকারী সবাই মিলে একটি উম্মাহ, একটি জাতি ও একটি দলে পরিণত হয়।

ধর্মহীনতা

এই নতুন ধর্মের –অবশ্য এর অনুসারী একে ধর্ম বলতে তৈরী নয়– সারবস্তু কি? বিশ্বজগতকে অস্তিত্বে আনয়ণকারী ঐ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময় সত্তার অস্বীকৃতি, যিনি তাকদীরের অধিপতি এবং জীবন-ব্যবস্থার প্রকৃত নির্দেশক (الذى قدر فهدى), মৃত্যুর পর পুনঃ জীবন, হাশর, জান্নাত, দোযখ, সওয়াব ও আযাবের অস্বীকৃতি, নবুওয়াত ও রিসালাতের অস্বীকৃতি, আসমানী বিধি-বিধান ও ইসলামের দন্ডবিধির অস্বীকৃতি এবং এই বাস্তবতার অস্বীকৃতি যে, আল্লাহ তাআলা তাঁর সমস্ত বান্দাদের উপর স্বীয় নির্বাচিত রাসূল (সা.) এর আনুগত্য ফরয করেছেন এবং হেদায়াত ও সফলতা তাঁর অনুসরণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ করে দিয়েছেন। আর ইসলাম আল্লাহর পক্ষ থেকে আখেরী ও স্থায়ী পয়গাম যা দ্বীন ও দুনিয়ার তামাম সফলতা ও কল্যাণের একমাত্র প্রতিভূ। ইসলামই এমন এক জীবন-ব্যবস্থা যার কোন বিকল্প নেই এবং এ দ্বীনই আল্লাহর কাছে একমাত্র দ্বীন। এই দ্বীন ছাড়া দুনিয়াবী কামিয়াবী ও সফলতা সম্ভব নয়। সর্বোপরি এই কথাকে অস্বীকার করা যে, এই দুনিয়াকে মানুষের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে আর মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে আল্লাহর জন্য।

বর্তমানে যেই শ্রেণীর হাতে অধিকাংশ ইসলামী রাষ্ট্রের নেতৃত্ব ও ক্ষমতা তাদের এক বৃহৎ অংশ এই নতুন ধর্মের অনুসারী। অবশ্য তাদের সবার বিশ্বাস সমান নয়। কারো বিশ্বাস হালকা; আবার অনেকে এই বিশ্বাসে অত্যন্ত মযবুত। মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও দুঃখজনকভাবে তাদের উপর বস্তুবাদী ধ্যান-ধারণা ও পাশ্চাত্য জীবন দর্শন প্রভাব বিস্তার করেছে, যা সম্পূর্ণ নাস্তিকতা নির্ভর। এই দর্শন ও বিশ্বাস বহন করে আজো ইসলামী বিশ্বের হাজারো

লাখো মুসলমান নাস্তিক হয়ে যাচ্ছে। মহাবিশ্বের সমস্ত উত্থান-পতন, ঘটনা-দুর্ঘটনা, বিপর্যয় ও স্বাচ্ছন্দ্য, মঙ্গলামঙ্গলকে প্রাকৃতিক সাধারণ নিয়ম বলে বিশ্বাস করছে।

আলহামদুলিল্লাহ! নেতৃস্থানীয়দের মধ্যে তাদের সংখ্যা নেহাত কম নয় যারা আল্লাহর উপর বিশ্বাস রাখে এবং ইসলামের অনুসরণ করে। আমি আবার বলছি, এটাই ঐ ইরতিদাদ যা ইসলামী বিশ্বের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত অবাধে লুণ্ঠন চালিয়ে যাচ্ছে। প্রতিটি ঘর, প্রতিটি খান্দান এর হামলায় আক্রান্ত হয়েছে। ইউনিভার্সিটি কলেজ থেকে শুরু করে সাহিত্য ও শিল্প কেন্দ্র, ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান সব কিছুর উপর এর আগ্রাসী থাবা বিস্তৃত হয়েছে। এমন খান্দান খুঁজে পাওয়া সৌভাগ্য যার মাঝে এই ধর্মের কোন ভক্ত ও অনুরাগী নেই। আপনি যখনই তাদের কারো সাথে একান্তে আলাপ করবেন, তাদের মনের কথা বের করে আনবেন, আশ্চর্যের সাথে দেখবেন হয়ত তার আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস নেই। কিংবা পরকালের প্রতি বিশ্বাস নেই। সে রাসূল (সা.) এর প্রতি বিশ্বাস রাখে না অথবা কুরআনকে একমাত্র জীবন-ব্যবস্থা মানে না। তাদের মধ্যে এমন লোকের সংখ্যা কম নয় যারা অবহেলা ভরে বলবে, আমি এ ধরনের বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করি না। আমার কাছে এর তেমন কোন গুরুত্ব নেই।

এক বেওয়ারিশ মাসয়ালা

নিঃসন্দেহে এই ইরতিদাদ ইসলাম প্রত্যাখ্যান করেছে। কিন্তু প্রশ্ন হল, মুসলমানরা এর প্রতি কেন সজাগ নয়? কারণ এ ইরতিদাদের কোন প্রতীক নেই। এর অভিযুক্ত ব্যক্তি কোন গীর্জায় যায় না, দেব মন্দিরে বা অগ্নিমণ্ডপে যায় না। সে নিজের ইরতিদাদ ও ধর্ম প্রত্যাখ্যানেরও ঘোষণা দেয় না এবং সমাজও তার এ ধর্ম প্রত্যাখ্যানে সচেতন নয়। তাই সামাজিকভাবে সে কোন রোষের মুখোমুখি হয় না। সে বরাবরের মত সমাজে বসবাস করে , সামাজিক অধিকার ভোগ করে, এমন কি সে সমাজ অধিপতি হওয়ারও সুযোগ লাভ করে। এটা ইসলামী বিশ্বের জন্য অত্যন্ত দুর্ভাবনার বিষয়। ইরতিদাদের বিস্তৃতি ঘটছে, ইসলামী সমাজ হুমকির সম্মুখীন হচ্ছে অথচ মুসলমানদের এখনো নিদ্রাভঙ্গ হচ্ছে না। উলামায়ে উম্মত এবং ইসলামের কেতনধারী কাফেলা এর জন্য অস্থিরতা ও ব্যাকুলতা অনুভব করছে না। আগে যখন কোন জটিল মাসয়ালা আসত লোকেরা হযরত আলী (রা.) এর কথা স্মরণ করত।

এরূপ ক্ষেত্রে প্রবাদ ছিল لا ابا حسن لها قضية ولا যে কেউ এক জটিল মাসয়ালার সম্মুখীন অথচ এমন কেউ নেই যে হযরত আলী (রা.) তাঁর ধীশক্তি দিয়ে তার সমাধান দেয়। বর্তমান ইরতিদাদের নাযুকতম মুহূর্তে অলক্ষ্যেই হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা.)-এর দৃঢ়চেতা ব্যক্তিত্বের কথা স্মরণ হয় এবং বলতে হয় لا ابا بكر لها ردة ولا ইরতিদাদের আগুন ছড়িয়ে পড়ছে কিন্তু এমন কেউ নেই, যে হযরত আবু বকর (রা.)-এর ঈমানী কুওয়াত ও দৃঢ়তা নিয়ে তার টুটি চেপে ধরবে। কিন্তু মনে রাখবেন, লড়াই ও আন্দোলন এ মাসয়ালার সমাধান নয়। এর জন্য গণমত তৈরীর চিন্তাও সঠিক নয়, জবরদস্তি ও চাপের মাধ্যমে এর সমাধান কোনদিন হবে না; বরং চাপ প্রয়োগে হিতে বিপরীত হবে। এ ফেৎনা আরো চাঙ্গা হবে। ইসলাম ধর্মত্যাগী বিরুদ্ধবাদীদের অনুসন্ধান করে তাকে দমন করবে এমন কোন আদালতের স্বীকৃতি দেয় না। আর সে আদালত জুলুম ও জবরদস্তির পৃষ্ঠপোষক। এর সমাধানের জন্য প্রয়োজন কৌশল, দৃঢ়তা ও চরম সহিষ্ণুতা। কিভাবে এই ইরতিদাদের পথ রুদ্ধ করা যায় এবং ধর্ম বর্জনকারী শ্রেণীকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনা যায় তার জন্য প্রয়োজন গভীর চিন্তা-ভাবনা ও প্রচুর অধ্যয়ন।

ধর্মহীনতার বিশ্বপ্লাবী সয়লাবের আসল রহস্য

এ নতুন ধর্ম ইসলামী বিশ্বে কিভাবে বিস্তার লাভ করল? কিভাবে এত বিপুল ক্ষমতার অধিকারী হল যে, আজ মুসলমানদের ঘরে তা হানা দিচ্ছে? মানুষের দিল-দেমাগকে এত দ্রুততার সাথে, এত দাপটের সাথে আচ্ছন্ন করা কিভাবে এর জন্য সম্ভব হল? এ সব প্রশ্নের উত্তরের জন্য প্রয়োজন সুক্ষ্ম চিন্তা-ভাবনা, প্রচুর অধ্যয়ন ও গবেষণা।

আসল ঘটনা হল, উনবিংশ শতাব্দীর শেষ প্রান্তে এসে ইসলামী দুনিয়ার উপর ক্লান্তি, অবসাদ ও বার্ধক্যের লক্ষণ ফুটে ওঠে। দাওয়াত ও আকায়েদ, জ্ঞান ও বুদ্ধির দিক থেকে ইসলামী দুনিয়া ক্রমশ অবক্ষয় ও অধঃপতনের দিকে ধাবিত হয়। ইসলাম তো চির তরুণ। তা বার্ধক্য ও প্রাচীনতার সাথে আদৌ পরিচিত নয়। সূর্যের মত সর্বদাই দীপ্যমান। শত সহস্র বছরের পুরনো হওয়া সত্ত্বেও সূর্য প্রতি মুহূর্তেই নতুন। আজো তার ভরা যৌবন। কিন্তু মুসলমানরা দুর্বলতা ও বার্ধক্যের শিকার হয়ে পড়ে। জ্ঞানের ব্যাপকতা, চিন্তা-গবেষণার শ্রেষ্ঠত্ব, বুদ্ধির গভীরতা, দাওয়াতের অনির্বাণ জযবা, সর্বোপরি ইসলামকে আবেদনময় ভঙ্গিতে উপস্থাপনের যোগ্যতায় ক্রমেই

তারা পিছিয়ে পড়ে। এছাড়াও অধুনা শিক্ষিত শ্রেণীর সাথে উলামায়ে কেরাম ও ইসলামের কির্তনধারী জামাআত সুসম্পর্ক রাখেনি, তাদের চিন্তা-চেতনাকে প্রভাবিত করার চেষ্টা হয়নি। অথচ তারাই ছিল আগত বংশধর। ভবিষ্যৎ তাদেরই। এ নতুন বংশধরকে কেউ বলেনি যে, ইসলাম ফিতরতের ধর্ম, ইসলাম মানবতার শুষ্ক বাগিচায় জীবনসঞ্চারকারী বসন্তের পয়গাম। কুরআনই একমাত্র অবিকৃত, অলৌকিক ও চিরস্থায়ী গ্রন্থ, যার অলৌকিকত্ব অসীম, যার মাঝে চিন্তা-গবেষণার খোরাক অফুরন্ত, যার মাধুর্য ও নতুনত্বের কোন বিকল্প নেই। হযরত রাসূলে করীম (সা.) ছিলেন মানব ইতিহাসের সর্ব শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। তিনি নিজেই ছিলেন এক জীবন্ত মুজেযা। তিনি সমস্ত যুগের, সমস্ত বংশধরের, সমস্ত ভাষাভাষির রাসূল ছিলেন। ইসলামী শরীয়ত মানব জীবনের জন্য গাইড বুক, একটি পূর্ণাঙ্গ সংবিধান। তার মাঝে যে কোন সমস্যার সঠিক সমাধানের এবং যুগের আবেদন বজায় রেখে চলার পূর্ণ যোগ্যতা বিদ্যমান।

ঈমান-আকায়েদ, চারিত্রিক উৎকর্ষতা এবং আধ্যাত্মিকতার বিশুদ্ধ সুষমাই হতে পারে একটি সভ্য সমাজ ও একটি নির্মল সংস্কৃতির বুনিয়াদ। আজকের নব্য সংস্কৃতিমনা প্রগতিবাদী গোষ্ঠির কাছে টেকনোলজী ও যন্ত্রপাতি মওজুদ আছে, কিন্তু আখলাক ও আকায়েদ, মননশীল জীবনবোধ এবং মানবতার কল্যাণের চিরন্তন উৎসধারা শুধুমাত্র আম্বিয়ায়ে কিরামের শিক্ষার মাঝেই নিহিত। একটি ভারসাম্যপূর্ণ সুসভ্য সমাজ ও সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠা তখনই সম্ভব যখন জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাথে জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতির সঠিক সংযোগ ঘটবে। ইউরোপ যখন তার দর্শনের বাহিনী নিয়ে ইসলামী দুনিয়ার উপর হামলা করে তখন ইসলামী দুনিয়ার এই ছিল অবস্থা। এই দর্শনের আবিষ্কার, সংকলন এবং এর তাত্ত্বিক বিচার-বিশ্লেষণ হয়েছিল এমন যুগশ্রেষ্ঠ দার্শনিক ও পণ্ডিতবর্গের থেকে যাদের গবেষণাকে মানুষ মানব গবেষণার মে'রাজ মনে করত। তারা মনে করত-অধ্যয়ন, অনুসন্ধান এবং মানুষের জ্ঞানের পরিধি এ পর্যন্তই শেষ।

চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণার এটাই সংক্ষিপ্ত-সার। এরপর আর কিছু চিন্তা করা যায় না। অথচ এ দর্শনের মাঝে কিছু বিষয় এমন আছে যা অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণের উপর ভিত্তিশীল এবং এসব বিষয় সঠিক। আবার অনেক বিষয় এমনও আছে যেগুলো শুধু অনুমান ও ধারণা নির্ভর। এর মাঝে সত্যও আছে, মিথ্যাও আছে। জ্ঞানও আছে, অজ্ঞানতাও আছে; সঠিক স্বত্ত্ব আছে, আবার

কবিদের কল্পনাও আছে। এটা মনে করার কোন কারণ নেই যে, কল্পনা শুধু ছন্দ ও কবিতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এটা জ্ঞান ও দর্শনের ময়দানেও হয়ে থাকে। আজ থেকে দেড়শ বছর আগে ইউরোপীয়রা ছিল বিজয়ী জাতি। আমরা ছিলাম পরাধীন ও শোষিত শ্রেণী। এ দর্শন বিজয়ী জাতির উদ্ভাবিত ফসল। আর বিজয়ী জাতির জীবনধারা, সভ্যতা ও সংস্কৃতি দ্বারা বিজিত জাতি প্রভাবিত হয় এটা এক ঐতিহাসিক সত্য। তাই তৎকালীন উপমহাদেশসহ এশিয়ার শিক্ষিত ও বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর এক বিরাট অংশ ইউরোপীয়দের এ দর্শন দ্বারা প্রভাবিত হয় এবং তা বরণ করার প্রতিযোগিতা শুরু করে। তাদের মধ্যে এমনও ছিল যারা বুঝে বরণ করেছিল। তবে তারা সংখ্যায় স্বল্প। বেশী সংখ্যক তারাই ছিল যারা সম্পূর্ণ না বুঝে 'ঈমান বিল গায়েব' রেখেছিল। কিন্তু সবাই সমানভাবে আচ্ছন্ন ছিল। সময়ের অগ্রসরমানতায় ক্রমান্বয়ে এ দর্শনের উপর বিশ্বাস রাখাই জ্ঞান ও সভ্যতার মাপকাঠি হয়ে ওঠে এবং একে প্রগতিবাদী ও আধুনিকতার আলামত মনে করা হতে লাগল। এভাবেই এ ইরতিদাদ ও ধর্মহীনতা ইসলামী পরিবেশ ও ইসলামী সীমানায় নির্বিঘ্নে ছড়িয়ে পড়ে। না পিতা-মাতা এই পরিবর্তনের ব্যাপারে সচেতন ছিল, না উস্তাদ ও মুরব্বীদের এর কোন খবর হয়েছে। কারো ঈমানী সম্ভ্রমবোধও এতে আহত হয়নি। কারণ এটা ছিল নিরব বিপ্লব। এ ইরতিদাদ ও নাস্তিকতা বরণকারী কোন লোক গীর্জায়ও যায়নি, "কোন উপাসনা গৃহেও প্রবেশ করেনি, কোন মূর্তির সামনে নতজানুও হয়নি" অথচ আগে এগুলোই ছিল কুফর, ইরতিদাদ ও নাস্তিকতার মাঝে পার্থক্য নির্ণয়কারী আলামত।

নেফাক ও নাস্তিকতা

আগেকার যুগে মুরতাদরা ইসলামী সোসাইটিকে বিদায় জানিয়ে যে দ্বীন গ্রহণ করত তাদের সোসাইটিতে তারা অন্তর্ভূক্ত হত এবং নিজ বিশ্বাসের পরিবর্তনকে গর্বের সাথে স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করত। এরপর নতুন দ্বীনের পথে যত বিপদ-মুসিবত আসত অম্লান বদনে বরদাশত করত। তারা পুরাতন সমাজে যেই সুযোগ-সুবিধা ও অধিকার ভোগ করত, এ সোসাইটিতে এসেও তা সংরক্ষিত থাকুক তার জন্য প্রচেষ্টা চালাত না। কিন্তু আজ যে সকল লোক ইসলাম ধর্মের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে তারা এর জন্য তৈরী নয় যে, ইসলামী সোসাইটি থেকে তাদের সম্পর্ক ঘুচে যাবে। অথচ দুনিয়াতে ইসলামী সমাজই একমাত্র সমাজ যার প্রতিষ্ঠা ও স্থায়িত্ব আকীদা-বিশ্বাসের উপর নির্ভরশীল। সুনির্ধারিত আকায়েদ ছাড়া ইসলামী সমাজের অস্তিত্বই কল্পনা করা যায় না।

কিন্তু বর্তমানের নতুন মুরতাদরা চায় মুসলিম সমাজের নাম ভাঙ্গিয়ে ইসলাম প্রদত্ত সকল অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা ভোগ করবে, কিন্তু নিজ বিশ্বাসে অটল থাকবে। ইসলামের ইতিহাসে এ অবস্থা সম্পূর্ণ নতুন।

জাহেলী সাম্প্রদায়িকতা ও জাতীয়তাপ্রীতি

এ দর্শন একদিকে যেমন আকায়েদ ও আখলাকের গুরুত্বকে ক্ষত-বিক্ষত করেছে, তেমনি ইসলামী দুনিয়ায় ঐ সব জাহেলী আবেগ ও মানসিকতার জন্ম দিয়েছে, যেগুলোর সাথে ইসলাম খোলাখুলি লড়াই করেছিল এবং যেগুলোর উৎখাতের জন্য পয়গাম্বর (আ.) সর্বশক্তি দিয়ে আঘাত করেছিলেন। উদাহরণতঃ জাহেলী জাতীয়তাপ্রীতি যা বংশ, রাষ্ট্র, ভাষা অথবা ভৌগলিক সীমারেখার ভিত্তিতে গড়ে ওঠে। জাহেলী যুগে গোত্রপ্রীতি ছিল আরবদের মজ্জাগত। গোত্রের ইজ্জত-সম্মান রক্ষা করা তারা তাদের পবিত্র দায়িত্ব মনে করত, এর জন্য প্রাণ বিসর্জন দিত, মানবিক ভ্রাতৃত্ববোধকে এর উপর ভিত্তি করে নির্মমভাবে পদদলিত করত। গোত্রপ্রীতি তাদের জাতীয় জীবনে একটি স্বতন্ত্র বিশ্বাস ও একটি স্বতন্ত্র ধর্মের মর্যাদা লাভ করেছিল। তাদের চিন্তা-চেতনাকে এটা এতটা প্রভাবিত করত যে, যিন্দেগীর সমস্ত কর্মকাণ্ড এ চেতনালোকেই নিয়ন্ত্রিত হত। আর বাস্তব সত্য এই যে, সাম্প্রদায়িক চিন্তা-চেতনা ও জাতীয়তাপ্রীতি তার ক্ষমতা, শক্তি ও সুদূরপ্রসারী প্রভাবের কারণে একটি ধর্ম ও একটি মাযহাবের শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বী। যখন কোন সমাজে এটা বিস্তার লাভ করে আম্বিয়ায়ে কিরামের সমস্ত প্রচেষ্টা ও মেহনত প্রায় অকার্যকর হয়ে পড়ে এবং যে দ্বীন প্রেরিত হয়েছিল মানুষের যিন্দেগীর প্রতিটি নিঃশ্বাসের যৌক্তিক রাহনুমা হিসাবে তা ইবাদত ও কিছু আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। আর সেই উম্মতে ওয়াহেদা যার ব্যাপারে আল্লাহ্ তাআলা পবিত্র কুরআনে এরশাদ করেছেন-

وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون

তা খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে অগণিত উম্মতে বিভক্ত হয়ে পড়ে। (সূরা মু'মিনূন-৫২)

ইসলাম সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে এত কঠোর কেন?

হযরত রাসুল করীম (সা.) জাহেলী গোত্রপ্রীতি ও সাম্প্রদায়িক ধ্যান-ধারণার বিরুদ্ধে কঠিনভাবে লড়াই করেছেন। এ ব্যাপারে আগত উম্মতকে পরিষ্কার শব্দে সতর্ক করে দিয়েছেন এবং এর সমস্ত সম্ভাবনার দ্বারদেশে

নির্দয়ের মত কুঠার চালিয়েছেন। আর এ ধরনের পদক্ষেপের প্রয়োজনও ছিল। কারণ সাম্প্রদায়িক চিন্তা-চেতনার বর্তমানে বিশ্বজনীন কোন ধর্মের প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয় এবং উম্মতে ওয়াহেদার ঐক্য ও সংহতি চিরদিন নিরাপদে থাকতে পারে না। সাম্প্রদায়িকতার মন্দ দিকগুলো তুলে ধরা এবং তার প্রতিরোধ করা ইসলামী শরীয়তের এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ। অসংখ্য আয়াত ও হাদীসে এ বিষয়ের ক্ষতিকর দিক বয়ান করা হয়েছে বরং ইসলামের সাথে সাম্প্রদায়িকতার দূরত্ব একটি স্বীকৃত বিষয়। যে ব্যক্তি ইসলামের মেজায বরং সাধারণ দ্বীনী মেজাযের সাথে পরিচিত হবে, সে অতি সহজেই বুঝতে পারবে এই মেজায সাম্প্রদায়িকতার সাথে কোনভাবেই সংগতিপূর্ণ নয়। রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত হয়ে কেউ যদি উম্মুক্ত মনে ইতিহাস অধ্যয়ন করে তবে সে এই সত্যকে কখনোই পাশ কাটাতে পারবে না যে, জাতিগত বিভেদ ও মানবীয় গুণাবলীর ধ্বংস ও বিকৃতির পিছনে যে সকল বিষয় মৌলিকভাবে কাজ করে তন্মধ্যে সাম্প্রদায়িক মানসিকতার স্থান সবার শীর্ষে।

সমস্ত দুনিয়াকে এক সূত্রে গাঁথার মহানব্রত নিয়ে যে মানব জাতির অগ্রযাত্রা শুরু হয়েছে, ভাষা, বর্ণ, গোত্র ও দেশের ভিন্নতা সত্ত্বেও সকলকে এক বিশ্বাস ও এক পতাকাতলে সমবেত করার মহান লক্ষ্যে যাদের আবির্ভাব ঘটেছে, ঈমান বিরাব্বিল আলামীন ও এক দ্বীনকে কেন্দ্র করে এক নতুন সমাজ ব্যবস্থা সৃষ্টির জন্য যাদের পদক্ষেপ, কষ্ট ও কাটাভরা এ বিশ্বে শান্তি ও নিরাপত্তার ফুল যারা বিছিয়ে দেবে, যারা মানবতার সমস্ত বাগিচাকে মুহাব্বত ও ভালবাসায় সিঞ্চিত করবে, সবাইকে এমন এককে পরিণত করবে যেমন চিনি ও পানি মিশে গিয়ে এককে পরিণত হয়- যেন এক মন এক দেহ, একজনের দুঃখে অন্যজন কাঁদবে, একজনের ব্যথায় অন্যজন ব্যথিত হবে- তাদের তো উচিৎ জাতিগত ও গোত্রীয় সকল সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে তারা খোলাখুলি যুদ্ধ ঘোষণা করবে এবং শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত এমনভাবে লড়াই অব্যাহত রাখবে, যাতে এ ধরনের মানসিকতা এক অতীত দুঃস্বপ্ন হয়ে ইতিহাসের আস্তাকুড়ে নিক্ষিপ্ত হয়।

ইসলামী রাষ্ট্রে জাতীয়তাপ্রীতি

কিন্তু ইউরোপের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিজয়ের পর হযরত রাসূলে করীম (সা.) এর প্রতিষ্ঠিত ইসলামী দুনিয়ায় চিন্তা-চেতনা সাম্প্রদায়িকতার বিষক্রিয়ায় এমনভাবে ছেয়ে গেছে যেন কোন জ্ঞানের কথা বা কোন সত্য তার সামনে উদঘাটিত হয়েছে। এর থেকে ফিরে আসার কোন সুরত নেই।

আজ ইসলামী দুনিয়ার অবস্থা এমন ভয়াবহ যে, এতে বসবাসকারী প্রতিটি জাতি সাম্প্রদায়িকতাকে যিন্দা করার ব্যাপারে এবং এর গুণকীর্তনে অসম্ভব রকম উৎসাহী, অথচ ইসলাম একে মৃত্যুর দুয়ারে পৌঁছিয়ে দিয়েছিল। এমনকি গোত্রীয় ও জাহেলী ঐসব আচার-আচরণকে জীবন্ত করার প্রেরণা আজ উজ্জীবিত হচ্ছে যা স্পষ্টত মূর্তিপূজার বহিঃপ্রকাশ।আজ অনেক রাষ্ট্রে ইসলাম আগমনের পূর্ব সময়কে তাদের জন্য ঐতিহ্য ও গৌরবের কাল মনে করা হচ্ছে অথচ ইসলাম তাকে জাহেলিয়াত, একমাত্র জাহেলিয়াত নামে স্মরণ করে। এটা এমন এক শব্দ যার চেয়ে ঘৃণা ও উদ্বেগ প্রকাশক কোন শব্দ ইসলামের অভিধানে নেই-যার থেকে নিস্তার পাওয়াকে কুরআন মুসলমানদের উপর শুধু মহা অনুগ্রহই মনে করে না বরং এর জন্য আল্লাহর শুকরিয়া আদায়ের জোর তাগিদ করেনঃ-

واذكروا نعمة الله عليكم إذكنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها .

অর্থঃ তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহকে স্মরণ কর; তোমরা ছিলে পরস্পর শত্রু, তিনি তোমাদের হৃদয়ে প্রীতি সঞ্চার করেন। ফলে তাঁর অনুগ্রহে তোমরা ভাই ভাই হয়ে গেলে। (সূরা আল-ইমরান ১০৩)

بل الله يمن عليكم ان هداكم للأيمان ان كنتم صدقين.

অর্থঃ আল্লাহ্ তাআলা তোমাদের উপর অনুগ্রহ করেছেন ঈমানের পথে পরিচালিত করে-যদি তোমরা সত্যবাদী হও। (সূরা হুজুরাত-১৭)

هوالذى ينزل على عبده أيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤف رحيم.

অর্থ ঃ তিনি তাঁর বান্দার প্রতি সুস্পষ্ট আয়াত অবতীর্ণ করেন তোমাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোর পথে আনার জন্য। আল্লাহ তো তোমাদের প্রতি করুণাময় ও পরম দয়ালু। (সূরা হাদীদ-৯)

জাহেলী যুগের ব্যাপারে একজন মুসলমানের অবস্থান

এরপর তো একজন মু'মিনের এই অবস্থা হওয়া চাই যে, জাহেলিয়াতের আলোচনা যখনই ওঠে.....চাই তা অতীতের হোক কিংবা বর্তমানের হোক-যেন ঘৃণা ও অবজ্ঞার সাথে ওঠে এবং প্রতি মুহূর্তে মুখ থেকে ঘৃণা ও নিন্দা

মিশ্রিত আবেগ ঝরে পড়ে। আপনি কি কোন বন্দীকে দেখেছেন যে, সে মুক্তি পাওয়ার পর তার বন্দী জীবনের দুঃখ-ক্লেশকে স্মরণ করে তখন অথচ তার প্রতিটি কথায় বন্দী জীবনের প্রতি ভীতি ও অশ্রদ্ধা প্রকাশ করে না? জটিল ও ধ্বংসকর অসুস্থতা থেকে সুস্থতা লাভকারী যখন তার অসুস্থতার দিনগুলোর কথা স্মরণ করে, তার অন্তর কি ব্যথিত না হয়ে থাকে? তার চেহারার রং কি পরিবর্তন হয় না? গভীর রাতে ভীতিকর কোন দুঃস্বপ্ন দেখা ব্যক্তি প্রভাতে তা স্মরণ করার সময় তা অসত্য ও অবান্তর হওয়াতে সে কি আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করে না? অতএব, যদি বন্দী তার বন্দী জীবনের দুঃখ-ক্লেশকে আনন্দের সাথে স্মরণ না করে, জটিল রোগমুক্ত ব্যক্তির জন্য তার অসুস্থতার অসহায় মুহূর্তগুলোর স্মরণ যদি সুখকর না হয় এবং ভীতিকর দুঃস্বপ্ন দেখা ব্যক্তি তা শুধু স্বপ্ন-এ জন্য যদি দিল থেকে স্বতঃস্ফূর্ত শুকরিয়া আদায় করে থাকে, তবে জাহেলিয়াত তো তার তুলনায় অনেক বেশী ঘৃণিত ও ভীতিকর-তা সমস্ত অজ্ঞতা-মূর্খতা ও ভ্রষ্টতার উৎসধারা, তাতে দুনিয়া ও আখেরাতের জন্য আশংকাজনক ও ক্ষতিকর অসংখ্য জিনিস নিহিত আছে- তার আলোচনা মানুষের জন্য মারাত্মক অপছন্দের বিষয় হওয়া চাই। এবং বেএখতিয়ার আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করা চাই, এক অশুদ্ধ ও বর্বর যিন্দেগীর অবসান হয়েছে, আল্লাহ তা'আলা গোমরাহীর অন্ধকার থেকে নাজাত দিয়েছেন। তাইতো সহীহ হাদীসে এসেছেঃ

ثلث من كن فيه وجد حلاوة الأيمان ان يكون الله ورسوله أحب اليه مما سواها وان يحب المرء لايحبه إلا لله وان يكره ان يعود إلى الكفر كما يكره ان يقذف فى النار.

অর্থ ঃ যার মধ্যে তিনটি জিনিস থাকবে সে ঈমানের মজা অনুভব করবে। এক, আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূল (সা.) তার কাছে দুনিয়া ও দুনিয়ার মধ্যস্থিত সমস্ত বস্তু অপেক্ষা প্রিয়। দুই, যে মানুষের সাথে মুহাব্বত রাখে শুধু আল্লাহর জন্য। তিন, তার জন্য কুফরী ও ভ্রষ্টতায় ফিরে যাওয়া এত কষ্টকর যেমন কষ্টকর আগুনে নিপতিত হওয়া। (বুখারী শরীফ)

আল্লাহ তাআলা জাহেলী যুগের আচার-আচরণ ও জাহেলী নেতৃবর্গের নিন্দা করে বলিষ্ঠ ভাষায় ঘোষণা করেন ঃ

وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. واتبعنهم فى هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين.

অর্থ ঃ আমি তাদেরকে (দোযখবাসীদের) নেতা বানিয়েছিলাম। তারা লোকদেরকে জাহান্নামের দিকে আহবান করত। কেয়ামতের দিন তাদেরকে সাহায্য করা হবে না। এ পৃথিবীতে আমি তাদের পশ্চাতে লাগিয়ে দিয়েছি অভিশম্পাত এবং কেয়ামতের দিন তারা হবে ঘৃণিত। (সূরা কাসাস ৪১-৪২)

وما امر فرعون برشيد. يقدم قومهم يوم القيامة فأوردهم النار و بئس الورد المورود. واتبعوا فى هذه لعنة و يوم القيامة بئس الرفد المرفود.

অর্থ ঃ ফেরআউনের কার্যকলাপ ভাল ছিল না। সে কিয়ামতের দিনে তার সম্প্রদায়ের অগ্রভাগে থাকবে এবং সে তাদের নিয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। যেখানে তারা প্রবেশ করবে তা কত নিকৃষ্ট স্থান! এ দুনিয়ায় তাদের অভিশম্পাতগ্রস্থ করা হয়েছিল এবং অভিশম্পাত হবে কিয়ামতের দিনেও। কত নিকৃষ্ট সে পুরস্কার যা তারা লাভ করবে! (সূরা হূদ-৯৯)

ইসলামী রাষ্ট্রে জাহেলী যুগপ্রীতি

কিন্তু বর্তমানে অনেক ইসলামী রাষ্ট্রের মুসলমানদের অবস্থা হল তারা পাশ্চাত্য জীবন-ধারা ও ইউরোপীয়দের চিন্তা-চেতনায় প্রভাবিত হয়ে ইসলাম পূর্ব যুগকে এবং সে যুগের সভ্যতা-সংস্কৃতি ও আচার-অনুষ্ঠানকে ইজ্জতের দৃষ্টিতে দেখে। এতে তার হৃদয়ে সে সভ্যতা-সংস্কৃতি ও আচার-অনুষ্ঠানের প্রতি অনুরাগ জন্ম নেয়। সে আশা করে, সে সব আচার-অনুষ্ঠান আবার নবজীবন লাভ করুক। সে এর জন্য তখনকার কৃষ্টি ও সভ্যতার পৃষ্ঠপোষকদেরকে ইতিহাসের কিংবদন্তির ভূমিকায় পেশ করার চেষ্টা করে যেন সেই যুগ এবং সেই কৃষ্টি ও সভ্যতা তাদের জন্য মহামূল্যবান নেয়ামত ছিল। ইসলাম তাদের থেকে তা ছিনিয়ে নিয়েছে। (আল্লাহ এরকম মন্দ অনুভূতি থেকে আমাদেরকে হেফাজত করুন)। এটা কত নির্লজ্জ কৃতঘ্নতা! ইসলাম ও ইসলামের নবীর (সা.) কতটুকু অবমূল্যায়ন! এর অর্থ এছাড়া আর কি যে, হৃদয় থেকে কুফর ও মূর্তি পুজার মন্দ অনুভূতি মুছে গেছে, জাহেলী আচার-অনুষ্ঠানের প্রতি তার হৃদয়ে কোন ঘৃণা অবশিষ্ট নেই- আর একজন অনুভূতিশীল মুসলমানের জন্য এটা অকল্পনীয়। যদি তার ঈমান চলে গিয়ে থাকে, সে ইসলামের দৌলত থেকে বঞ্চিত হয়ে থাকে এবং আল্লাহর

রহমতের পরিবর্তে আল্লাহর গজব এসে থাকে তবেই তা সম্ভব হতে পারে। কুরআন এ মর্মে আমাদেরকে হুঁশিয়ার করেছে ঃ

ولاتركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون.

অর্থ ঃ যারা নিজেদের প্রতি জুলুম (শির্ক) করেছে তাদের প্রতি তোমরা ঝুঁকে পড়ো না। ঝুঁকলে তোমাদেরকে অগ্নি স্পর্শ করবে এবং সে অবস্থায় তোমাদের জন্য আল্লাহ ব্যতীত কোন সাহায্যকারী থাকবে না এবং তোমাদেরকে কোন সাহায্য করা হবে না। (সূরা-হূদ-১১৩)

দ্বীনী, নৈতিক ও চারিত্রিক অধঃপতন

ইসলামী বিশ্বের বর্তমান অধঃপতনের পিছনে জাতীয়তাপ্রীতি ধ্যান-ধারণা ছাড়াও দ্বিতীয় আরেকটি ফেৎনার ভূমিকা অনস্বীকার্য। তাহল- সমাজের শিক্ষিত ও নেতৃস্থানীয় মহলের ভোগবাদী মানসিকতা এবং পার্থিব আরাম-আয়েশের পিছনে হন্যে হয়ে ছোটা। অন্য কথায়, দুনিয়াকে আখেরাতের উপর প্রাধান্য দেয়ার মানসিকতা, পার্থিব জীবনের প্রতি মোহ এবং ভোগবাদী চিন্তা-চেতনা। এর স্বাভাবিক পরিণতি হল, মানবীয় বৈশিষ্ট্যাবলী ও নৈতিকতার অবক্ষয়। ইসলাম কর্তৃক হারাম বিষয়কে হালকাভাবে গ্রহণ, অশ্লীলতার প্রসার, মদ্যপ সমাজের সৃষ্টি এবং ইসলামের ফরয ও আবশ্যকীয় বিষয় থেকে এমন বাধা-বন্ধনহীন স্বাধীনতা যেন এই শ্রেণীর কাজের সাথে ইসলামের কোন সম্পর্কই নেই কিংবা ইসলামী শরীয়ত অতীত কোন দাস্তান ও বিয়োগান্ত উপাখ্যান ছিল, আজ তা মানছুখ্ ও রহিত হয়ে গেছে। ইসলামী দুনিয়ার প্রান্তে প্রান্তে আজ এ ভোগবাদী মানসিকতা লালনকারী এক বিশাল জনগোষ্ঠির উপস্থিতি আমাদের জন্য সত্যই দূর্ভাগ্যজনক।

মুসলিম বিশ্বের জন্য সবচেয়ে বড় আশংকা

এটা হল আজকের মুসলিম বিশ্বের সংক্ষিপ্ত চিত্র। এই চিত্রে যা কিছু ধরা পড়ে আমার কাছে তা জাহেলিয়াতের এমন এক আগ্রাসী প্লাবন মনে হয় যা ইসলামের সমস্ত দৌলতকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। মুসলিম বিশ্ব তার সমগ্র ইতিহাসে এমন সর্বগ্রাসী কোন প্লাবনের মুখোমুখি আর হয়নি। এর মত প্রচন্ড প্লাবনেরও মুখোমুখি হয়নি, আবার এর মত বিশাল বিশ্বগ্রাসী প্লাবনেরও মুখোমুখি হয়নি। তাছাড়া এ প্লাবনের অন্য রকম একটি বিশেষত্ব আছে ঃ সব

ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু এ ব্যাপারে কেউ সচেতন নয়। দু'একজন যাওবা আছে কিন্তু তাদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যে তার সব কিছু ছেড়ে-ছুড়ে সর্বশক্তি নিয়ে, সর্বস্ব দিয়ে এর প্রতিরোধে ঝাঁপিয়ে পড়বে। আমরা অতীতের দিকে তাকালে দেখি, তৎকালীন সময়ে যখন গ্রীক দর্শন ইসলামী সমাজে ধর্মহীনতা ও নাস্তিকতা বিস্তার করছিল তখনি তার প্রতিবিধানে এমন সব ব্যক্তিত্ব সর্বশক্তি নিয়ে তেজোদ্দীপ্ত হুংকার দিয়ে দাঁড়িয়ে গিয়েছিলেন যাঁরা ইলমী গভীরতা, বিদগ্ধ পাণ্ডিত্য, বিরল প্রতিভা ও ব্যক্তিত্বের তেজস্বীতায় ইসলামী ইতিহাসের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক ছিলেন। এমনি ভাবে যখন বহুজাতিক ভারতে ভাববাদী ও বহুঈশ্বরবাদী চক্রের আবির্ভাব ঘটেছিল তখনও উলামায়ে উম্মত ইলম ও প্রজ্ঞা, দলিল ও যুক্তির উন্মুক্ত কৃপাণ হস্তে রণসাজে ময়দানে সিনা টান করে দাঁড়িয়ে গিয়েছিলেন। তাদের কোরবানীর বদৌলতেই ইসলাম ভেঙে পড়া অবস্থা থেকে প্রকৃত রূপ-সুষমা ফিরে পেয়েছিল এবং পূর্বের তুলনায় আরো সুদৃঢ় হয়ে সমাজে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল। তাই তো পরে বিরোধিতার প্রচণ্ড ঢেউ ধেয়ে এসেছিল বটে, কিন্তু মাথা নিচু করে ফিরে গেছে; সয়লাবের বেগবান স্রোত এসেছিল, কিন্তু অকার্যকর হয়ে প্রত্যাবর্তন করেছে।

প্রধান সমস্যা

যে সমস্যা মুসলিম বিশ্বের দিকে তুফান বেগে ছুটে আসছে, যার লক্ষ্য আমাদের দ্বীনী ও আখলাকী বরবাদী, তা আজ আমাদের জন্য কুফর ও ঈমানের সমস্যা আমাদের সামনে দুটি পথ খোলা আছে ঃ (এক) যুদ্ধের প্রস্তুতি, (দুই) আত্মসমর্পন। এখন প্রশ্ন হল, আমরা কোন পথ এখতিয়ার করব? ইসলামী দুনিয়ায় যুদ্ধক্ষেত্র তৈরী হচ্ছে যার একদিকে ইউরোপীয় দর্শন, ধর্মহীনতা, অন্যদিকে ইসলাম-আল্লাহর আখেরী পয়গাম। একদিকে বস্তুবাদ, অন্যদিকে আসমানী শরীয়ত। আমি মনে করি, এটা ধর্ম ও ধর্মহীনতার চূড়ান্ত লড়াই। এরপর দুনিয়া এ দু'টোর কোন একটাকেই গ্রহণ করে নেবে।

পবিত্রতম জিহাদ

ধর্মহীনতার সয়লাব আজ মুসলিম বিশ্বের সীমান্তের বহু ভেতরে ঢুকে পড়েছে। আমাদের কিল্লায় নয় বরং আমাদের কলিজায় তা আঘাত করছে। আমি মনে করি, ধর্মহীনতা ও বস্তুবাদের এ সয়লাবকে প্রতিরোধ করাই

এখনকার জেহাদ, সময়ের সবচেয়ে বড় দাবী, বর্তমান যুগের সবচেয়ে বড় দ্বীনী জরুরত। এ সময়ের সংস্কার ও বৈপ্লবিক কাজ হল উম্মতের যুবক ও শিক্ষিত শ্রেণীর মাঝে ইসলামের বুনিয়াদি বিষয় মৌলিক আকায়েদ ও ইসলামের শাশ্বত আদর্শের এবং রেসালতে মুহাম্মদীর প্রতি সেই বিশ্বাস ও বিশ্বস্ততা ফিরিয়ে আনা, যার বন্ধন তারা স্বেচ্ছায় আলগা করে ফেলেছে। আজকের সবচেয়ে বড় ইবাদত হল, ইসলাম সম্পর্কে যেসব সংশয়-সন্দেহ ও ধুম্রজাল তাদের মন-মস্তিষ্কে ছেয়ে আছে; মননশীল, সুন্দর ও প্রজ্ঞাপূর্ণ যুক্তি-তর্কের মাধ্যমে তা দূর করা এবং জাহেলী কৃষ্টি ও সভ্যতার ত্রুটিসমূহ চিহ্নিত করে অত্যন্ত হেকমতপূর্ণ পদ্ধতিতে তাদের কাছে ইসলামের সৌন্দর্য তুলে ধরা, যাতে তাদের চিন্তা-চেতনা এর দ্বারা প্রভাবিত হয় এবং দিল ও দেমাগে ইসলামপ্রীতি স্থান করে নেয় বরং আরেকজন পর্যন্ত ইসলাম পৌঁছানোর জযবা পয়দা হয়।

পূর্ণ এক শতাব্দী হতে চলেছে ইউরোপ আমাদের যুবক ও শিক্ষিত শ্রেণীর মস্তিষ্ক বিকৃত করে আসছে। সংশয়-সন্দেহ, ধর্মহীনতা, নাস্তিকতা, ভণ্ডামী ও প্রতারণার বীজ ঢুকিয়ে দিয়েছে তাদের হৃদয়ে, চিন্তা-চেতনায়। এতে ধর্মীয় সকল বিষয়ে তাদের ঈমান নড়বড়ে হয়ে পড়েছে বরং তদস্থলে স্থান করে নিয়েছে বস্তুতান্ত্রিক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ধ্যান-ধারণা। পূর্ণ এক শতাব্দী ধরে আমরা এই গ্লানি ও পরাজয়ের শিকার, কিন্তু আমাদের তা প্রতিরোধ করার কোন ফিকির হয়নি, আমরা তার কোন পরওয়া করিনি। আমাদের যে সময়ের দাবী অনুযায়ী পুরাতন জ্ঞান-ভাণ্ডারের সাথে নতুন অনেক জ্ঞানের, বিভিন্ন ধরনের জ্ঞানের সংযোজন করা একান্ত কর্তব্য ছিল; আমরা তা বুঝিনি। আমরা ইউরোপের ঐ সমস্ত দর্শনকে বুঝার এবং বুঝে তার যথাযথ তাত্ত্বিক পর্যালোচনা করে দক্ষ সার্জনের মত তার পোষ্টমর্টেম করার কোন প্রয়োজন অনুভব করিনি। আমাদের সমস্ত সময় ব্যয় হয়েছে মৌলিকত্ব নেই এমন অনেক বিষয়ে। ফলে শতাব্দীর এ দ্বার-প্রান্তে এসে আমরা এক ভয়ানক পরিস্থিতির সম্মুখীন হলাম। আমাদের এক বিশাল জনগোষ্ঠির ঈমান ও বিশ্বাস আজ নড়বড়ে, ঘুণে ধরা।

এমন এক প্রজন্ম আমাদের শাসন-ক্ষমতায় আসছে যাদের না ইসলামের মৌলিক বিশ্বাসের উপর ঈমান আছে, না তাদের মধ্যে ইসলাম প্রীতি, ইসলামী চেতনাবোধ এবং সর্বক্ষেত্রে ইসলামের অনুশাসনকে প্রাধান্য দেয়ার

উৎসাহ-উদ্দীপনা আছে, না তার মুসলমান সম্প্রদায়ের সাথে জাতিগতভাবে-সেও গণনায় মুসলমান–এ সম্পর্ক ছাড়া অন্য কোন সম্পর্ক আছে। আর যদি কিছু সম্পর্ক থাকেও তা রাজনৈতিক ফায়দা হাসিলের জন্য। ব্যস! এছাড়া আর কোন সম্পর্ক নেই। এখনকার অবস্থা তো এর চেয়েও নাযুক। ধর্মবিবর্জিত মানসিকতা, অধর্মীয় চিন্তাধারা, বিজাতীয় সাহিত্য-সংস্কৃতি ও রাজনীতিপ্রীতি আমাদের আওয়াম ও গ্রাম্য জনগণ পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। আজ মুসলমানদের মাথার উপর ব্যাপক ধর্মহীনতার নাঙা কৃপাণ ঝুলছে। আল্লাহ না করুন, সময়ের অগ্রসরমানতায় সেই অবস্থা না উপস্থিত হয় যখন ইসলাম জীবনের কর্মমুখর ময়দান থেকে বেদখল হয়ে শুধু শোভা ও বিলাসিতার জিনিসে পরিণত হবে।

ঈমানের দাওয়াত

এ মুহূর্তে ইসলামী দুনিয়ায় প্রয়োজন এক নতুন ইসলামী দাওয়াতের ও মেহনতের। এ দাওয়াত ও মেহনতের শ্লোগান হবে- এস, আবার নতুন করে ইসলামের উপর ঈমান আনি, তবে শুধু শ্লোগান যথেষ্ট নয়। এর জন্য প্রথমেই ভাবতে হবে, বুঝতে হবে কোন রাস্তায় ইসলামী দুনিয়ার বর্তমান শাসকগোষ্ঠি ও ক্ষমতাবান শ্রেণীর মন-মগজে পৌঁছা যাবে এবং তাদেরকে ইসলামে ফিরিয়ে আনা যাবে।

নিঃস্বার্থ ও নিবেদিতপ্রাণ দাঈ'র জরুরত

আজ ইসলামী দুনিয়ার জন্য এমন কর্মোদ্যম জামাতের প্রয়োজন যারা এর জন্য হবে নিবেদিতপ্রাণ। জ্ঞান-বুদ্ধি, ধন-সম্পদ, যোগ্যতা, উপায়-উপকরণ সব কিছু এর জন্য উৎসর্গ করবে। ইজ্জত-সম্মান, পদ ও নেতৃত্বের প্রতি তাদের কোন মোহ থাকবে না। তারা হবে হিংসা- বিদ্বেষ ও সংকীর্ণতা থেকে বহু উর্ধ্বে। অন্যের উপকারের চিন্তা করবে, নিজে উপকার গ্রহণ করবে না। শুধু দিবে, কিছু নেবে না। তাদের কর্মপন্থা হবে রাজনৈতিক কর্মপদ্ধতি থেকে ভিন্ন। তাদের দাওয়াত ও মেহনত হবে রাজনৈতিক আন্দোলনের (যার লক্ষ্য কেবল ক্ষমতা অর্জন) চেয়ে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। এখলাস হবে তাদের পুঁজি। প্রবৃত্তি পূজা, আত্মপছন্দ এবং সব ধরনের জাতীয়তাপ্রীতি থেকে তারা হবে সম্পূর্ণ পবিত্র।

দাওয়াতের জন্য নতুন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন

সাথে সাথে আজ ইসলামী দুনিয়ার জন্য এমন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন যা নতুন ইসলামী সভ্যতার জন্ম দেবে, যে সভ্যতা আমাদের শিক্ষিত শ্রেণীকে ইউরোপীয় জীবনধারার নাগপাশ থেকে ছিনিয়ে পুনরায় ইসলামের দিকে, সার্বজনীন ইসলামী আদর্শের দিকে ফিরিয়ে আনবে। তাদের কেউ তো বুঝে শুনে আসবে, কিন্তু অনেকেই সময়ের আবহাওয়ায় প্রভাবিত হয়ে আসবে। যে সভ্যতা যুবকদের চেতনায় নতুনভাবে ইসলামের বুনিয়াদকে প্রতিষ্ঠিত করবে, তাদের হৃদয় ও আত্মার খোরাক হবে। এ কাজের জন্য ইসলামী দুনিয়ার প্রান্তে প্রান্তে এমন দৃঢ়চেতা ব্যক্তিত্বের প্রয়োজন যারা শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত এ লড়াইয়ের ময়দান থেকে পিছু হটবে না।

আমি আমার ব্যাপারে স্পষ্ট করে বলতে চাই যে, আমি কস্মিনকালেও ঐ সকল লোকদের দলভুক্ত নই যারা দ্বীন ও রাজনীতির মাঝে বিভাজন সৃষ্টি করে। আমি না তাদের দলভুক্ত যারা পূর্বেকার সমস্ত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ থেকে হটে গিয়ে ইসলামের এমন ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে, যার দ্বারা ইসলাম যে কোন সমাজ ব্যবস্থা এবং যে কোন অবস্থার সাথে (চাই তা ইসলাম থেকে যতদুরে সরে গিয়ে হোক না কেন) ফিট হয়ে যায় এবং সব ধরনের সোসাইটিতে খাপ খায়। আমার তাদের সাথেও কোন সম্পর্ক নেই যারা রাজনীতিকে কুরআনে উল্লিখিত অভিশপ্ত বৃক্ষ والشجرة الملعونة فى القرآن. এর মতলব মনে করে। আমি ঐ সমস্ত লোকদের প্রথম সারিতে যারা মুসলিম জাতির মাঝে বিশুদ্ধ রাজনৈতিক চেতনা উজ্জীবিত করার প্রত্যাশী এবং প্রতিটি রাষ্ট্রের শাসন ক্ষমতায় যোগ্য নেতৃত্ব দেখার অভিলাষী। আমি তাদের দলভুক্ত যাদের বিশ্বাস, ইসলামী সমাজ ততক্ষণ পর্যন্ত কায়েম হতে পারে না, যে পর্যন্ত না ইসলামী নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা হয় এবং ইসলামী আইনই রাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থার বুনিয়াদ হয়। আমি এর একজন একনিষ্ঠ দা'ঈ এবং যিন্দেগীর আখেরী নিঃশ্বাস পর্যন্ত এর উপর অবিচল থাকব।

অতীত অভিজ্ঞতা

এখন পর্যন্ত আমাদের সমস্ত চেষ্টা, আমাদের সমস্ত যোগ্যতা, সমস্ত উপায়-উপকরণ এবং সময় রাজনৈতিক আন্দোলনের লক্ষ্যেই পরিচালিত

হয়। আন্দোলন ও নির্বাচন প্রাক্কালে আমরা মনে করি, আমাদের মাঝে পূর্ণ ঈমান আছে এবং জাতীয় নেতৃবর্গ (যারা নিঃসন্দেহে শিক্ষিত শ্রেণী থেকেই হয়ে থাকে) তারাও পূর্ণ মুসলমান, ইসলামের মাহাত্ম ও মর্যাদা বৃদ্ধির চেতনায় তারা উদ্দীপ্ত, ইসলামের অনুশাসন ও দণ্ডবিধি বাস্তবায়নে উৎসাহী, অথচ বাস্তবতা সম্পূর্ণ বিপরীত। সামগ্রিকভাবে আজ তাদের মাঝে ঈমানী দুর্বলতা ও আখলাকী ত্রুটিতে ছেয়ে আছে। কিন্তু এ ব্যাপারে আমরা কোন খোঁজ-খবর করি না, জনসাধারণের মাঝেও কোন সচেতনতা নেই। পাশ্চাত্যমুখী জীবনধারার প্রভাবে তাদের বেশীর ভাগই এমন যাদের থেকে সত্যিকার ইসলামের আকীদা-বিশ্বাস হারিয়ে গেছে বরং তাদের অনেকে তো খোলাখুলি ইসলামী বিশ্বাসের বিরুদ্ধেই বিদ্রোহ করে এবং পাশ্চাত্য জীবনাধারাকে হৃদয় দিয়ে ভালবাসে। তার প্রচার-প্রসারের চিন্তায় সর্বদাই উম্মাদ হয়ে থাকে।

এই হল সেই শ্রেণীর অধিকাংশের ধ্যান-ধারণা। এরপর কাজের ময়দানে কেউ দ্রুততার পক্ষপাতী, কেউ আবার ' ধীরে চল' নীতির প্রবক্তা। কেউ চায় শক্তি দিয়ে, ক্ষমতা দিয়ে এই ধর্মহীনতাকে সমাজে চাপিয়ে দিতে। আবার কেউ চিত্তাকর্ষক, দৃষ্টিনন্দন লেবেল লাগিয়ে জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করতে চায়। কিন্তু তাদের সবার উদ্দেশ্য এক, গন্তব্যস্থল অভিন্ন।

ধর্মপ্রিয় শ্রেণীর মাঝে দুই গ্রুপ

আমাদের ধর্মীয় শ্রেণী-অবশ্য তাদেরকে "ধর্মীয় শ্রেণী" যদি বলা বৈধ হয়- বৈধতার কথা আসে, কারণ খৃষ্ট সমাজের মত ইসলামে কোন পোপ শ্রেণী নেই, চিন্তাগত অবস্থানের হিসাবে দু'গ্রুপে বিভক্ত। এক গ্রুপ ইউরোপীয় দর্শনের মুখরোচক শ্লোগানের ফাঁদে আবদ্ধ আমাদের আধুনিক শিক্ষিত ও নেতৃস্থানীয় শ্রেণীর প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে, তাদেরকে তাকফির করে। তাদের ছায়া মাড়াতেও পছন্দ করে না। কিন্তু কি কারণে এদের মধ্যে ধর্মহীনতা ও নাস্তিক্যবাদের প্রতি অনুরাগ জন্ম নিয়েছে তা খতিয়ে দেখার প্রয়োজন মনে করে না। এ শ্রেণীর কাছাকাছি যাওয়া, মেলামেশা করা, ইসলাম ও উলামায়ে কেরাম সম্পর্কে তাদের ভীতি ও অশ্রদ্ধা দূর করা, তাদের মধ্যে আল্লাহ তা'আলা ঈমান ও কল্যাণের সামান্যতম বুঝ যদি রেখে থাকেন তাকে আরেকটু চাঙ্গা করা, ইসলামের প্রতি আবেদন সৃষ্টি হয় এমন পুস্তক প্রণয়ন করে তাদের মধ্যে দ্বীনী চেতনা জাগরিত করা, তার ধন-সম্পদ,

পদমর্যাদা ও ক্ষমতার প্রতি অমুখাপেক্ষিতা প্রদর্শন করে তাকে ইসলামের মূল্যবোধ ও ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল করে তোলা, দরদ ও ব্যথা নিয়ে তাকে প্রজ্ঞাপূর্ণ নসীহত করা, ইত্যাদি পদক্ষেপ তাদের কাছে যৌক্তিক পদক্ষেপ মনে হয় না। আর দ্বিতীয় গ্রুপ সম্পূর্ণ বিপরীত। তারা এ শ্রেণীকে সহযোগিতা দেয়, তাদের দ্বীনকে বিশুদ্ধ করার কোন ফিকির করে না। এ গ্রুপের মধ্যে না কোন দাওয়াতী রুহ আছে, না দ্বীনী কোন সম্ভ্রমবোধ আছে।

সংস্কার ও বিপ্লবের জন্য যেই জামাতের প্রয়োজন

আজ এমন কোন জামাত নেই যারা এ অবস্থা দর্শনে ব্যথিত হবে। যারা উপলব্ধি করবে আজকের শিক্ষিত ও নেতৃস্থানীয় শ্রেণী অসুস্থ, কিন্তু এরা আমাদের ভাই। এদের চিকিৎসার দরকার। তারা চিকিৎসার ব্যবস্থা করবে। হেকমত ও কোমল ব্যবহার দিয়ে তাদের হৃদয়ে স্থান করে নেবে এবং অত্যন্ত মমতা নিয়ে তাদের কল্যাণে নিজেদের উৎসর্গ করবে। এই তৃতীয় শ্রেণীর অনুপস্থিতির কারণেই আজ পশ্চিমা জীবনধারামুখী প্রজন্মের দ্বীন ও দ্বীনী পরিবেশের কাছাকাছি আসার সুযোগ হয় না। তাদের সারা জীবন দ্বীনী পরিবেশের প্রতি এক ধরনের ভীতি ও দূরত্ব থাকে। দ্বীনদার এক শ্রেণী তাদের এই ভীতিকে আরো বাড়িয়ে তোলে। চতুর্থ আরেক শ্রেণী আছে যারা দ্বীনের নামে তাদের থেকে নেতৃত্ব ও শাসন ক্ষমতা দখলের শ্লোগান তুলে, তাদের ফাঁসী ও গ্রেফতারীর ধোঁয়া তুলে তাদের এই ভীতি ও দূরত্বকে বহুগুণে বাড়িয়ে দেয়।

এ দু'গ্রুপ হিংসা-বিদ্বেষের এক নতুন দুয়ার উন্মোচন ছাড়া আর কিছু করে না। মানুষের স্বভাব হল মানুষ যদি দুনিয়ার লোভী হয় তবে এ ব্যাপারে সে কোন তত্ত্বাবধায়ককে বরদাশত করে না। যদি ক্ষমতা ও নেতৃত্ব তার মাকসাদ হয়, তবে এ ময়দানে তার প্রতিদ্বন্দীকে সে দু'চোখে দেখতে পারে না। আর যদি সে প্রবৃত্তিপূজারী ও দুনিয়ার আরাম-আয়েশের প্রত্যাশী হয় তবে এটা অসম্ভব যে, সে দুনিয়ার ভোগ-বিলাসে অন্য কাউকে তার অংশীদার বানাবে এবং ভোগ অধিকার দেবে। আজ ইসলামী দুনিয়ার বেদনার একমাত্র অবসানকারী হল ঐ জামাত যারা হবে প্রবৃত্তিপূজার উর্ধ্বে নিঃস্বার্থ ধর্মপ্রচারক। তাদের উদ্দেশ্য হল সম্পদ হাসিল করা কিংবা নিজের বা পার্টির জন্য নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা- সন্দেহ উদ্রেককারী এমন সমস্ত পদক্ষেপ থেকে যারা হবে সম্পূর্ণ মুক্ত। যারা দ্বীন বঞ্চিত শ্রেণীর মাঝে মেলামেশার মাধ্যমে, পত্রাদি ও আলোচনার মাধ্যমে, দাওয়াতী সফরের মাধ্যমে, আবেদনশীল ইসলামী রীতিনীতির প্রচলন ঘটিয়ে, ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব স্থাপন করে, মননশীল ও

সুন্দর আখলাকের মাধ্যমে, অমুখাপেক্ষিতা, দুনিয়ার প্রতি নির্লোভ মানসিকতা ও পয়গাম্বরসুলভ ব্যবহার দ্বারা তাদের সমস্ত সংশয়-সন্দেহ ও জটিলতা দূর করে দেবে, যা পশ্চিমা জীবনধারা ও দর্শনের প্রভাবে কিংবা দ্বীনদার শ্রেণীর গাফলতির ফলে জন্ম নিয়েছিল কিংবা বুদ্ধিহীনতা, সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি এবং ইসলাম ও ইসলামের নির্মল পরিবেশের সাথে দূরত্বই যার একমাত্র কারণ।

এ পদ্ধতিতে মেহনতকারীর সফলতা

এটাই ঐ জামাত যাদের দ্বারা প্রত্যেক যুগে ইসলামের খেদমত হয়ে এসেছে। উমাইয়া শাসনের গতিধারা পাল্টে দেয়ার এবং হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয (রহ.)-কে খেলাফতের মসনদে বসানোর পিছনে কার্যকরী ভূমিকা এ জামাআতেরই ছিল, যাঁদের প্রতিনিধিত্ব করেছেন যুগশ্রেষ্ঠ বুযুর্গ হযরত রাজা ইবনে হায়াত (রহ.)। হিন্দুস্তানের মোগল আমলেও এ ধরনের সংস্কার কাজ এ জামাআতেরই পরিশ্রমের ফসল।

আকবরের মত দোর্দন্ড প্রতাপশালী শাসক ইসলাম প্রত্যাখ্যান করে খোলাখুলি ইসলামের দুশমনীতে অবতীর্ণ হয়েছিল যেন সে এই প্রতিজ্ঞা নিয়েছিল, যে ইসলামী সমাজ দীর্ঘ চারশত বছর হুকুমতের ছায়াতলে লালিত হয়েছে তাকে পুনরায় জাহেলিয়াতের নমুনায় সাজানো হবে।

ঠিক এমনি যুগ সন্ধিক্ষণে হক ও হক্যানিয়্যাতের প্রদীপ্ত মশাল নিয়ে সত্যের সূর্যরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন মুজাদ্দিদে আলফেসানী (রহ.)। তাঁর এখলাস, বুদ্ধিমত্তা এবং তাঁর ও তাঁর সাথীদের কোরবানীর বদৌলতে দ্বীনে এলাহী প্রত্যাখ্যাত হয়, ইসলাম তার প্রকৃত রূপ সুষমা ফিরে পায় এবং পূর্বের তুলনায় মজবুত হয়ে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়। এ কারণেই আকবরের পর মোগল সিংহাসনে ক্রমাগত শাসকবৃন্দের প্রত্যেকেই পূর্বের শাসকের তুলনায় ভাল ছিলেন। এমনকি আওরঙ্গযেব আলমগীরের মত শাসকের জন্ম হয়। আওরঙ্গযেব আলমগীরের আলোচনা ইসলাম ও সংস্কার ইতিহাসের একটি স্বতন্ত্র অধ্যায়। আর একথা তো স্বতঃসিদ্ধ যে, ইতিহাসের সৃষ্টি সেই ঐতিহাসিক বিপ্লবের পুনরাবৃত্তির জন্য, বারবার পুনরাবৃত্তির জন্য। মোটকথা, আজকের অন্ধকারাচ্ছন্ন দুনিয়ায় ইসলামের পুনর্জীবনদানকারী শক্তি শুধু এই দাওয়াত, এই হেকমত এবং এই এখলাস।

নাযুক অবস্থা

এ অবস্থাকে আমাদের হিম্মত ও দৃঢ়তা, হেকমত ও বুদ্ধিমত্তার দ্বারা মোকাবেলা করতে হবে। ইসলামী দুনিয়ার উপর আজ এক মারাত্মক

সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় ইরতিদাদের মুসিবত এসেছে। ইসলামের জন্য যাদের হৃদয়ে সামান্যতম টানও আছে এই মুসিবত তাদের চিন্তা-গবেষণার ও আলোচনার একমাত্র বিষয় হওয়া চাই। আজ প্রতিটি মুসলিম রাষ্ট্রের আধুনিক শিক্ষিত শ্রেণীর এক বিরাট অংশের অবস্থা অত্যন্ত হৃদয়বিদারক। ঈমান ও আকীদার লাগাম থেকে তাদের হাত আলগা হয়ে গেছে। মানবীয় গুণাবলীর সমস্ত বন্ধন তারা ছুঁড়ে ফেলেছে। তাদের চিন্তা-চেতনা সম্পূর্ণ বস্তুতান্ত্রিক হয়ে গেছে। রাজনীতিতে তারা ধর্মহীনতাকে প্রশ্রয় দিচ্ছে। যদি 'অধিকাংশ' শব্দ আমি নাও বলি কিন্তু একথা অবশ্যই বলব, তাদের মধ্যে 'এমন' লোক অনেক আছে যাদের নিকট ইসলাম একটি আকীদা, একটি জীবন ব্যবস্থা- এই ঈমানও নেই।

মুসলমান জনসাধারণ- যাদের মধ্যে কল্যাণ ও মঙ্গলের সমস্ত উপকরণ মওজুদ আছে এবং তারা স্বীয় বিশ্বাস ও স্বভাব হিসেবে মানবতার শ্রেষ্ঠ জামাত- এতদসত্ত্বেও এই শ্রেণীর জ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব ও চিন্তাধারার উৎকর্ষতার কারণে তাদের অধীন ও অনুগত। যদি এই অবস্থা বরাবর চলতে থাকে তাহলে ধর্মহীনতা ও ফাসাদ তাদের মধ্যেও বিস্তার লাভ করবে। গ্রাম্য সরলপ্রাণ মুসলমানরাও এর লুণ্ঠন থেকে নাজাত পাবে না এবং ক্ষেত-খামার ও কারখানার শ্রমিকদের ঈমানও এই ধ্বংসকর ভাইরাসে আক্রান্ত হবে। আজ ইউরোপে এগুলোই হচ্ছে। এভাবেই, এ গতিতেই হচ্ছে। যদি এ অবস্থার গতি ও রোখ অপরিবর্তিত থাকে এবং মহাপরাক্রান্ত আল্লাহর রহমতের মাঝে প্রতিবন্ধক না হয় তবে উপমহাদেশের মাটিতেও এসব কিছুই হতে চলেছে।

এক্ষণি কাজের প্রয়োজন

এ দায়িত্ব আদায়ে একদিনও বিলম্ব করার সময় নেই। মুসলিম বিশ্ব ইরতিদাদের মারাত্মক বিভীষিকার মুখোমুখি। এমন বিভীষিকা সমাজের উপর স্তরে যার বিস্তার ঘটছে। এ বিভীষিকা ঐসব আকায়েদ, নেযামে আখলাক এবং মহানেয়ামতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ যা হযরত রাসূলে কারীম (সা.)-এর মীরাছ, ইসলামী দুনিয়ার একমাত্র পুঁজি যা প্রজন্ম পরম্পরায় আমাদের কাছে পৌঁছেছে। এর জন্য ইসলামের জানবাজরা পাহাড়সম দুঃখ-মুসিবত বরদাশত করেছেন, নির্যাতিত হয়েছেন, নিপীড়িত হয়েছেন, রক্তাক্ত হয়েছেন। যদি এই পুঁজি নষ্ট হয়ে যায়, তবে মুসলিম বিশ্বও হারিয়ে যাবে।

আমরা কি এই সত্য উপলব্ধি করার চেষ্টা করব? সময়ের এই নাযুকতা কি আমাদের হৃদয়ে কোন আবেদন সৃষ্টি করবে?

অনুবাদ-মাওলানা অছিউর রহমান

ইসলামী জীবন বিধান

ইসলামী তাহযীব ও তামাদ্দুনের গুরুত্ব ও এর প্রয়োজনীয়তা এবং পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সঙ্গে এর বৈপরিত্য

য দ্বীন ও জীবন-ব্যবস্থা মানুষের জীবনের সবগুলো ক্ষেত্রের উপর ব্যাপ্ত, যে দ্বীনবিশেষ এক আকীদা, বিশ্বাস ও জীবনবোধের আলোকে মানুষের জীবনকে বিশেষ এক কাঠামোতে গড়তে চায় সেই দ্বীন ও জীবন-ব্যবস্থা তার নিজস্ব সংস্কৃতি ও এর সহায়ক এবং এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ পরিবেশ ব্যতিরেকে কখনও জিন্দা থাকতে পারে না। জীবন ও জীবনের মুহূর্তগুলোর এক বিরাট অংশের উপর ব্যাপ্ত ইবাদত ও আরাধনা, ফারাইয ও কর্তব্যকর্মের এক বিশেষ ব্যবস্থা যে দ্বীন ও জীবন-ব্যবস্থায় রয়েছে সে ধর্ম ব্যবস্থার ইবাদতসমূহ আঞ্জাম দেয়ার জন্য রয়েছে বিশেষ কিছু শর্ত ও নিয়ম-পদ্ধতি, পবিত্রতা ও চারিত্রিক বিশুদ্ধতা সম্পর্কে নিজস্ব দর্শন ও দৃষ্টিভঙ্গী যে দ্বীনের মাঝে বিদ্যমান, বড় বড় নৈতিক ও চারিত্রিক অপরাধ থেকে মুক্ত থাকার অর্থই কেবল যেখানে নৈতিক নির্মলতা বা পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতার অর্থ ব্যক্ত নয় বরং পরিচ্ছন্নতা ও নির্মলতা শব্দটি যেখানে আরো ব্যঞ্জনাময়, আরো ব্যাপক ও গভীরতর সেই দ্বীন ও তার অনুসারীদের পক্ষে বিশেষ করে এমন এক পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সাথে সহাবস্থান কেমন করে সম্ভব, কতিপয় ঐতিহাসিক কার্যকারণের প্রেক্ষিতে যে সংস্কৃতি ও তামাদ্দুন লালিত ও বর্ধিত হয়েছে, কখনও বা নিরেট বস্তুতান্ত্রিক পরিবেশ, এমন কি কখনও বা ধর্ম ও নৈতিকতার প্রতি শত্রুভাবাপন্ন আবহাওয়ায় হয়েছে যার পরিস্ফুটন পাশ্চাত্য সংস্কৃতি ও জীবন-ব্যবস্থার মূল রহস্য ও আসল রূপ সম্পর্কে অভিজ্ঞ ও দার্শনিক কবি ইকবাল মাত্র একটি পংক্তিতে গোটা ব্যবস্থাটি চিত্রিত করে তুলে ধরেছেন –

کہ روح اس مدنیت کی رہ سکے نہ عفیف

এই তামাদ্দুন ও সমাজ ব্যবস্থার নেই কোন প্রাণ আর নেই কোন নির্মলতাও।

ইসলামী তামাদ্দুনের গোটা ইবাদাত ব্যবস্থাই তাহারাত বা পবিত্রতার সাথে বিজড়িত। পক্ষান্তরে পাশ্চাত্য সমাজ ব্যবস্থায় বড়জোর পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে কিছুটা ধারণা রয়েছে মাত্র। ইসলামী তামাদ্দুন দৃষ্টি, হৃদয়, এমন কি

কল্পনার নির্মলতা অর্জনেরও প্রবক্তা এবং সকল কিছুর ক্ষেত্রেই সে কলুষহীনতা ও ইফ্ফাতের আবেদন জানায়। পক্ষান্তরে পাশ্চাত্য সংস্কৃতি ও তামাদ্দুনের মাঝে কেবল আইনগত কাঠামোর বড়জোর প্রচলিত ধারণা ও রীতিরই মর্যাদা দেয়া হয়ে থাকে। প্রচলিত রীতি; পরিস্থিতি এবং সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহের যদি কোন আপত্তি না থাকে তবে তার চোখে কোন আচরণই আর মন্দ এবং নৈতিক নির্মলতার পরিপন্থী বলে বাকী থাকে না।

পর্দা ও শালীনতার প্রতি ইসলাম সব সময়ই সোচ্চার এবং তার গোড়া সমর্থক। শরীয়ত প্রদত্ত অনুমোদন ব্যতিরেকে সকল ক্ষেত্রে অত্যন্ত কঠোরভাবে সে তা মেনে চলে। পক্ষান্তরে পাশ্চাত্য সমাজ বর্তমানে হিজাব ও পর্দার বিষয়ে প্রাথমিক ধারণা সম্পর্কেও অনবহিত ও অজ্ঞ। এই সংস্কৃতির সূচনা লগ্নেই এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল তারা। নর-নারীর অবাধ মেলামেশা ইসলাম সমর্থন করে না, সমাজের জন্য একে খুবই ক্ষতিকর এবং বহু নৈতিক অসুস্থতার কারণ বলে এটিকে চিহ্নিত করে সে। পক্ষান্তরে পাশ্চাত্য ব্যবস্থায় জীবনের অগ্রগতির অন্যতম বুনিয়াদ এটি এবং একটি স্বতঃসিদ্ধ সত্য বলে বিশ্বাস করা হয় একে।

উভয় সংস্কৃতিতে এই সমস্ত মৌলিক ও নীতিগত পার্থক্য ছাড়াও ছবি, কুকুর, পুরুষদের জন্য স্বর্ণ-রৌপ্য এবং রেশমের ব্যবহার, যবেহ করা না করার প্রভেদ এবং এই ধরনের আরো বহু খুঁটি-নাটিতে উভয় সংস্কৃতির দৃষ্টিভঙ্গী ও চিন্তাধারার ক্ষেত্রে পার্থক্যই কেবল নয় অধিকন্তু বৈপরীত্যও বিদ্যমান।

জানদারের ছবি ও চিত্রকর্মের স্বপক্ষে কলা-সমৃদ্ধ যত যুক্তিই প্রদর্শন করা হোক না কেন, ইসলাম কখনও এটিকে পছন্দের দৃষ্টিতে দেখে না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটিকে ঘৃণা করতেন, না-পছন্দ করতেন। সহীহ হাদীসে আছে, যে ঘরে ছবি, কুকুর এবং মূর্তি থাকে ফিরিশতা সে ঘরে প্রবশ করেন না।[১] অথচ ছবি ও চিত্রকর্ম ছাড়া পাশ্চাত্য সংস্কৃতির কথা তো

---

১. বুখারী শরীফে বর্ণিত হয়েছে ঃ ان الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة অর্থাৎ যে ঘরে ছবি রয়েছে সে ঘরে ফিরিশতা প্রবেশ করেন না। অপর একটি রিওয়ায়েত আছে ঃ لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة تماثيل অর্থাৎ যে ঘরে কুকুর ও মূর্তি রয়েছে সে ঘরে ফিরিশতা আসেন না। অন্য একটি বর্ণনায় আছে হযরত জিবরাঈল (আ.) বলেন, انا لا ندخل بيتا فيه صورة ولا كلب অর্থাৎ আমরা সে ঘরে যাই না যে ঘরে ছবি ও কুকুর বিদ্যমান।

চিন্তাও করা যায় না।[১] আর তাই পাশ্চাত্য সংস্কৃতিকে গ্রহণ করার পর ইসলামের পবিত্রতা ও নির্মলতা, হিজাব ও পর্দা, লজ্জাশীলতা ও শালীনতা, অনাড়ম্বরতা ও সামঞ্জস্যশীলতা, সুন্নাত ও নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উসওয়া প্রদর্শিত পথে কায়েম থাকা কখনও সম্ভবপর হয়ে উঠতে পারে না।

পাশ্চাত্য সংস্কৃতিকে সার্বিকভাবে গ্রহণ করার পরই কেবল এই সমস্ত অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয় সে কথা নয়, এমন কি আংশিকভাবে বা সাময়িভাবেও যদি কেউ পাশ্চাত্য সংস্কৃতির ছাঁচে গঠিত সমাজে বা পরিবেশে সামান্য সময়ও কাটায় তবে তাকেও এই সমস্ত অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। পাশ্চাত্য দৃষ্টিভঙ্গীর আঙ্গিকে নির্মিত (এশিয়া ও প্রাচ্য দেশসমূহে এমনকি আরব এবং অন্যান্য পবিত্র স্থানসমূহে নির্মিত) বড় বড় হোটেলগুলোতে কিছু সময় অবস্থান করার দ্বারাও এই কথার আন্দাজ একজনের হয়ে যেতে পারে। এইগুলোতে অবস্থানকালে তাহারাত বা পবিত্রতা অর্জন এবং ফরযসমূহের পাবন্দী করা খুবই মুশকিল হয় উঠে, এমন কি অনেক সময় শরীয়ত নির্ধারিত সীমা অতিক্রমেও বাধ্য হয়ে যেতে হয়[২]। সুতরাং বিশুদ্ধ আকীদা বা বিশ্বাস, ইবাদত এবং সুন্নাত ও মুস্তাহাব কাজসমূহ, আযকার বা সূরা অর্থ বা হাদীসে বর্ণিত যিকর-আযকার এবং ইসলামী চরিত্র ও অভ্যাস (এই পুস্তকটিতে যেগুলোর প্রয়োজনীয় বিবরণ উল্লেখ করা হয়েছে) গড়ে তোলার সাথে সাথে স্বীয় পরিবার ও পরিবেশে ইসলামী তামাদ্দুন এবং ইসলামী সমাজ চিত্রের প্রতিফলনেও সচেষ্ট হওয়া উচিত। পাশ্চাত্য সংস্কৃতি এবং এর বৈশিষ্ট্যাবলী ও এর সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি যথা নরনারীর অবাধ মেলামেশা, বে-পর্দা, ছবির অবাধ ব্যবহার বিশেষ করে সিনেমা, টেলিভিশন, গান-বাদ্য, কুকুর-প্রীতি ও এর স্পর্শ লাভ, সন্দেহজনক খাদ্যাহার ইত্যাদি থেকে যথেষ্ট দূরে থাকা কর্তব্য। পর্দা-পুশিদা, পবিত্রতা ও তাহারাতের ব্যবস্থা, পানি ব্যবহারের সহজ পদ্ধতি, কিবলার দিক সম্পর্কে জ্ঞান, পোশাক-পরিচ্ছদ এবং ব্যবহার্য জিনিসপত্রের পরিচ্ছন্নতা, সন্তানদের ধর্মীয় শিক্ষাদান এবং দ্বীনি শিক্ষা ও

---

[১] আরবদেশও আজ এই ফিতনার শিকার এবং এর পরিণামও আজ সেখানে প্রত্যক্ষ হচ্ছে।

[২] লেখকের বারবার এই বিষয়টির পরীক্ষা হয়েছে। সফরনামা ও বিভিন্ন ভাষণে এ কথার উল্লেখও আমি করেছি।

সংস্কৃতি সম্পর্কে মেয়েদের ওয়াকিফহাল করে তুলতে সতর্কতার সাথে তৎপর থাকতে হবে। এছাড়া শরীয়ত এবং সুন্নাত অনুসরণে জীবন যাপন তো দূরের কথা, দ্বীনি ফরয ও কর্তব্যসমূহ পালন করাও বেশ মুশকিল হয়ে দাঁড়ায়।

স্বকীয় দ্বীন ও শরীয়তের ছায়ায় গঠিত ও লালিত, বিশেষ দ্বীনি ও ধর্মীয় পরিবেশে বর্ধিত ও সমৃদ্ধ তাহযীব-তামাদ্দুন থেকে কোন জাতিকে দূরে সরিয়ে দেওয়ার অর্থই হল জীবনের কর্মকাণ্ড থেকে একে পৃথক করে কেবল আকীদা ও বিশ্বাস, ইবাদত ও দ্বীনি রসম-রেওয়াজের সীমায় একে সীমাবদ্ধ করে দেওয়া। আর তা হল সে জাতিকে তার অতীত থেকে সম্পূর্ণ ছিন্ন করে দেয়ারই নামান্তর। ফলে সে জাতি ক্রমান্বয়ে নিজেদের বুনিয়াদী আকীদা ও জীবন দর্শন থেকে পর্যন্ত বিচ্যুত হয়ে পড়ে এবং তখন সময় হয়ে যায় মানসিক ও সাংস্কৃতিকভাবে ইরতিদাদ ও ধর্মচ্যুতি ঘটার। এদের মধ্যে তখন সামাজিক নৈরাজ্য, পারিবারিক বন্ধনের শিথিলতা এবং নৈতিক কুষ্ঠ রোগাক্রান্ততার লক্ষণ পরিলক্ষিত হতে শুরু হয়, মদ্যপান ও নেশার বিস্তার ঘটে। পাশ্চাত্য সমাজে আজ এরই চরমরূপ পরিলক্ষিত হচ্ছে, আর পাশ্চাত্যের অনুকরণে লিপ্ত মুসলিম দেশসমূহও বর্তমানে তাই নিজেদের মধ্যে প্রত্যক্ষ করছে।

কিছু অভিজ্ঞতা, কিছু পরামর্শ

পূর্বোল্লিখিত অধ্যায়সমূহে ইসলামের বিশেষ প্রকৃতি ও এর বৈশিষ্ট্যসমূহ, বিশুদ্ধ ইসলামী ও সুন্নী আকীদাসমূহের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, ইসলামের বৈধ আদাত ও রীতিসমূহ, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতসমূহ, ইবাদতসমূহে তাঁর অনুসৃত রীতিনীতি, আল্লাহর পথে জিহাদে ও আল্লাহর নামকে বুলন্দ করার বিষয়ে তাঁর আদর্শ ও কর্মপদ্ধতি, চরিত্র গঠন ও তাযকিয়া-এ-নাফস বা আত্ম-সংশোধনের কুরআনসম্মত ও নবী অনুসৃত মর্ম, আল্লাহর কিতাব ও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতের গুরুত্ব, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চরিত্র, তাঁর আকৃতি-প্রকৃতি ও পবিত্র সীরাত সম্পর্কে যে সংক্ষিপ্ত চিত্র তুলে ধরা হয়েছে, চরিত্র গঠন ও চরিত্র সংশোধন, একজন আদর্শ সমাজ সদস্য নির্মাণ এবং নাফ্সের ফিত্না, শয়তানের বিভিন্ন চাল ও ষড়যন্ত্র, স্বভাব-চরিত্র ও ক্রিয়াকর্মে বিভিন্ন বিপদজনক দুর্বলতা থেকে হিফাজতের বিষয়ে যে সমস্ত আয়াত ও হাদীস পেশ করা হয়েছে তা একজনের জন্য যথেষ্ট, যে নিজেকে সংশোধন করার সফলতা ও সৌভাগ্য লাভ দ্বারা নিজেকে অভিসিক্ত করার আন্তরিকভাবে

একনিষ্ঠ, যে ব্যক্তি নাফ্সের ধোঁকায় প্রবঞ্চিত না হয়ে ঈমান ও ইহসানের সুউচ্চ মর্যাদায় অভিষিক্ত হওয়ার অভিলাষ ও আশা পোষণ করে, বিলায়াতে আম্মা ও খাস্সা বা সাধারণ ওলীর দরজা বা বিশেষ ওলীর দরজা এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লামের কামিল ইকতিদা ও অনুসরণের সুউচ্চ মর্যাদায় পৌঁছার অপার প্রেরণা ও সাহস যার অন্তরে উর্মিমুখর, তার জন্য এর চেয়ে আর বেশী কিছুর প্রয়োজন নেই। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেনঃ

والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين

যারা আমার জন্যে মুজাহাদা করছে আমি অবশ্যই তাদের আমার পথ দেখিয়ে দেব; আর আল্লাহ্ তো সৎকর্মশীলদের সাথেই রয়েছেন। সূরা আল-আনকাবুত ঃ ৬৯

পাঠকের হয়ত ধারণা হতে পারে সংক্ষিপ্ত এই পুস্তকটিতে যে সমস্ত বিষয়ের অবতারণা করা হয়েছে তা তো নতুন কিছু নয়। এগুলো হল সাধারণ কিছু জ্ঞাতব্য বিষয়, আল্লাহর কালাম ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসসমূহে এগুলোর বিবরণ ছড়িয়ে আছে। প্রাচীন ও বর্তমান যুগের নির্ভরযোগ্য আলিমদের রচিত গ্রন্থসমূহে একই স্থানে না হোক কিন্তু বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্ত আকারে হলেও এইগুলো বিদ্যমান, লেখক নিজেই (ভূমিকায়) ইমাম গায্যালীর যুগ থেকে শুরু করে বিভিন্ন যুগের রচিত এই জাতীয় গ্রন্থের কথা উল্লেখ করেছেন। সুতরাং সংক্ষিপ্ত করা, সহজীকরণ ও বর্তমান যুগ-মানসের প্রতি কিছুটা দৃষ্টি দেয়া ছাড়া গ্রন্থটিতে নতুনত্ব বলতে তো কিছুই নেই।

এতে নতুন কোন আবিস্কার বা লুকায়িত কোন ভাণ্ডারের কোনরূপ সন্ধান নেই। সুতরাং এই গ্রন্থটির বিষয়বস্তু থেকে উপকার লাভের এবং এটির মূল লক্ষ্যে ও উদ্দেশ্যে আমাদের পৌঁছুতে, আমাদের যে জীবন বর্তমানে এক বিশেষ রীতি ও ধারায় প্রবাহমান-একে ঈমান, ইহতিসাব ও জবাবদিহির ধারণা এবং আল্লাহর ফরমাঁবরদারী ও আনুগত্য সঞ্জাত জীবনে পরিবর্তিত ও রূপায়িত করার, ঈমানের রঙে রঞ্জিত ও ইসলামী আখলাকে ও চরিত্রে সুসজ্জিত জীবনে বদলে দেয়ার কি পথ? বর্তমান যুগের একজন মুসলিম কোন্ পয়েন্ট থেকে শুরু করবে এই কাজ? কোন্ জিনিসটিকে দিতে হবে অগ্রাধিকার যাতে সন্তোষজনক ফল লাভ সম্ভব হয়ে উঠতে পারবে? পরিস্থিতি ও পরিবেশের মধ্যে সম্ভাবনাময় অনুভূতিগ্রাহ্য পরিবর্তন সূচিত হতে পারবে? আর যা প্রত্যক্ষ করে তার নিজের হৃদয় ও বিবেক আশ্বস্ত হতে পারবে এবং সাথে সাথে সমস্যাবলীর ও তা বাস্তবভাবে উপলব্ধি করতে পারবে সেটি কি?

এই প্রশ্ন এবং এই জিজ্ঞাসার উত্তরেই এখানে কিছু অভিজ্ঞতার কথা, পরামর্শস্বরূপ কয়েকটি বিষয় পেশ করছি। আশা করি বিদগ্ধ ও সত্যানুসন্ধিৎসু পাঠক যাদের আল্লাহ্ তা'আলা দান করেছেন সাহস ও সংকল্প এবং সুশোভিত করেছেন হাকীকত ও তাৎপর্য বিলাসী মন ও ইখলাসপূর্ণ হৃদয় সম্পদ, তারা এ থেকে সন্তোষজনক ফায়দা উঠাতে সক্ষম হবেন।

সর্বপ্রথম এই গ্রন্থটিকে স্বীয় জীবনের জীবন-বিধান, স্বীয় আকীদা ও আমলের ক্ষেত্রে একটি গাইড-বুক ও নির্দেশিকা পুস্তকরূপে গ্রহণ করে নেওয়ার প্রয়াস নিতে হবে। তা এইজন্য নয় যে, এটি এমন একজন মুজতাহিদ ও নির্ভরযোগ্য মুহাক্কিক আলিমের রচনা যাকে আল্লাহ্ তাঁর বিশেষ জ্ঞানে সমৃদ্ধ করেছেন। আসলে তা নয়, নিজের শক্তি ও হাকীকত সম্পর্কে লেখক খুবই অবহিত। বরং গ্রন্থটিকে এইজন্যই গ্রহণ করা দরকার যে, এটিতে ইসলামের প্রাথমিক জরুরী ও বুনিয়াদী বিষয়সমূহ মুসলিম বিশ্ব বিশেষ করে আহলে সুন্নাত ওয়াল-জামাত যে সমস্ত দ্বীনি বিষয়ে একমত সেই সমস্ত বিষয়ের বর্ণনাসহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত, তাঁর আখলাক ও আকৃতি-প্রকৃতির বিবরণ সন্নিবেশিত করা হয়েছে। প্রতিটি মুসলিমের জন্য এগুলো সম্পর্কে অবহিত হওয়া জরুরী। সুতরাং অনুরোধ হল বিনোদন বা জ্ঞানের ক্ষেত্রে বৃদ্ধি ঘটান বা লেখকের দক্ষতা, সফলতা কিংবা তার অসফলতা ও ব্যর্থতা নিরূপণের উদ্দেশ্যে যেন কেউ গ্রন্থটি অধ্যয়ন না করেন। এই বিষয়ে লেখক নিজেকেও পাঠকদের কাতারে শামিল বলে মনে করেন; কারণ, এর বিষয়বস্তু থেকে উপকৃত হওয়ার বিষয়ে সে অন্য কারো চেয়ে কম মুখাপেক্ষী নয়।[১]

১. মহান আল্লাহ তা'আলা তাঁর নাযিলকৃত কিতাব এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর তাবলীগ ও রিসালাত প্রচারের কাজ যে বিষয়টি দিয়ে শুরু করেছিলেন সেই বিষয়টির মাধ্যমেই আমাদেরও শুরু করা উচিত। আমাদের আকীদা ও বিশ্বাসের ইসলাহ এবং তা বিশুদ্ধ করতে হবে সবার আগে। কুরআনুল কারীমের আলোকে (কেননা কুরআন এই বিষয়ে কোনরূপ কলুষতা ও দুর্বলতার অবকাশ বা প্রশ্রয় দেয় না) নিজেদের আকীদা ও বিশ্বাসকে যাঁচাই করে নিতে হবে। কুরআনই এমন এক পরিস্কার ঝকঝকে আয়না, যাতে প্রত্যেকেই নিজের চেহারা ও আকৃতি-প্রকৃতি সুস্পষ্ট ও

---

[১] দ্বীনহীন অনুবাদকের অবস্থাও তথৈবচ।

পরিস্কারভাবে অবলোকন করতে পারে। আল্লাহর অসীম অনুগ্রহ এই গ্রন্থটিতে কুরআনী শিক্ষা, নববী হিদায়াত ও নির্দেশনার সার উল্লেখ করে দেয়া হয়েছে এবং সকল প্রকার বাড়াবাড়ি ও প্রান্তিকতা হতে মুক্ত আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের অনুসারী আলিমদের অধ্যবসায় ও গবেষণালব্ধ জ্ঞানের সংক্ষিপ্তসারের বিবরণও এতে এসে গেছে।

২. জাহিরী ও বাতিনী অথাৎ বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ, জিসমানী ও রূহানী শারীরিক ও আধ্যাত্মিক সকল ভাবেই ইসলামী বিধানানুসারে অনুমোদিত ইবাদাতসমূহ এবং চারটি আসলী রুক্‌ন যথা-সালাত, যাকাত, সওম ও হজ্জের পুরোপুরি ইহতিমাম করা, এগুলোর গুরুত্ব দেয়া অবশ্য কর্তব্য। এই বিষয়ে যথাসম্ভব রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হুবহু পদাংক অনুসরণ করে চলা দরকার। দায়িত্বশীলতার এবং ঐকান্তিকতার সাথে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লমের আমল পদ্ধতি, তাঁর উসওয়া এবং সুন্নাতসমূহ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে হবে। কারণ তিনিই এই সব কিছুর সর্বোত্তম নমুনা এবং পরিপূর্ণ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ আদর্শ। ইবাদত সমূহের কথাতো আছেই, অধিকন্তু আল্লাহ তা'আলা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবন সম্পর্কে সুস্পষ্ট ঘোষণা ইরশাদ করেছেন ঃ

لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجوالله

واليوم الأخر وذكر الله كثيرا .

"নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের মাঝে রয়েছে সুন্দরতম আদর্শ, সে ব্যক্তির জন্য যে ব্যক্তি আশা করে আল্লাহর শেষ দিনের এবং অধিক হারে আল্লাহর যিকর করে।" –সূরা আল-আহযাব ঃ ২১

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যতটুকু অনুসরণ আমরা করব, তাঁর অনুকরণ ও অনুসরণে যতটুকু আমরা সফল হব সেই পরিমাণেই আমাদের ইবাদাত পূর্ণাঙ্গতা লাভ করতে পারবে। আল্লাহর দরবারে তা কবূলিয়াত ও সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারবে। হাদীস গ্রন্থসমূহ এবং সহীহ্ হাদীসসমূহের সংকলনগুলোতে তাঁর ইবাদত, দ্বীনি ফারাইয ও কর্তব্যাদি সম্পাদন এবং আল্লাহর পথে দাওয়াত ও জিহাদের ছোট-বড় সকল কথা তাঁর সুন্নাত ও অনুসৃত রীতিনীতিসমূহের আজো এমন পরিপূর্ণ ও পুঙ্খানুপুঙ্খ রেকর্ড বিদ্যমান যার নজীর আর কোথাও নেই।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাযহি ওয়া সাল্লামের অবদান ও তাঁর অনুসৃত পদ্ধতি অনুসারে আমল সম্পাদনের সাথে প্রত্যেকের এই খেয়ালও রাখতে হবে যে, সকল ইবাদত বিশেষ করে সালাত তার হাকীকত ও মূল তাৎপর্যে যেন উদ্ভাসিত ও সুষমামণ্ডিত হয়ে ওঠে, তার রূহ ও অন্তস্থিত শক্তির সাথে যেন শক্তিময় ও ভরপুর হয়ে ওঠে। যাতে আখলাক ও সকল প্রকার ক্রিয়াকাণ্ডে, ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের সকল ক্ষেত্রে তার শুভ প্রভাব ও কল্যাণকর পরিণাম পরিস্ফুট হয়ে উঠতে সক্ষম হয় এবং তা আল্লাহর নৈকট্য লাভ ও মা'রিফাত বা প্রত্যয় অভিজ্ঞানে এবং আল্লাহর মহাব্বত ও প্রেম বৃদ্ধিতে শক্তিশালী ও ক্রিয়াশীল মাধ্যমরূপে পরিগণিত হয়ে উঠতে পারে।

৩. আকীদা, ফরয ইবাদত এবং হুকূকুল্লাহ বা আল্লাহর হকসমূহের পরে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও অগ্রাধিকারসম্পন্ন বিষয় হল হুকূকুল ইবাদ বা বান্দার হকসমূহ। আল্লাহ্ তাঁর হকসমূহ মাফ করে দেন, কথাটি সত্য-কিন্তু বান্দার হক ও দাবীসমূহ মাফ করার ইখতিয়ার আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বান্দাকেই দিয়ে রেখেছেন। বুখারী শরীফে বর্ণিত একটি হাদীসে আছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, কারো যিম্মায় যদি কোন ভাইয়ের কোনরূপ দাবী, ইয্যত-আব্রু সম্পর্কিত কোন বিষয় বা অন্য আরো কোন বিষয় থেকে থাকে তবে আজ দুনিয়াতেই সে যেন এর সাফাঈ করে নেয়, সেই সময় আসার আগেই, যে সময় দিনার বা দিরহাম কিছুই থাকবে না। যদি তার (অভিযুক্ত ব্যক্তির) কোন নেক আমল থাকে তবে হকদারকে তার হক ও দাবী অনুসারে সেই নেক আমল থেকে দিয়ে দেয়া হবে। যদি নেক আমল না হয় তবে হকদারের গুনাহ থেকে তাকে (অভিযুক্ত ব্যক্তিকে) দিয়ে দেয়া হবে। মুসলিম শরীফে বর্ণিত একটি হাদীসে আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে, জিবরাঈল (আ.) আমাকে বলেছেন, ঋণ ব্যতীত শহীদের সকল গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে।

মুসলিম শরীফের আর একটি বর্ণনায় আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার সাহাবা-কিরামকে বললেন ঃ তোমরা বলতো কাঙ্গাল কে? সাহাবীগণ বললেন ঃ যার টাকা-পয়সা বা মাল-সামান নেই তাকেই তো কাঙ্গাল বলে মনে করা হয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ আমার উম্মতের মধ্যে প্রকৃত কাঙ্গাল ও দরিদ্র হল সে ব্যক্তি-যে ব্যক্তি কিয়ামতের দিন সালাত, সিয়াম যাকাত ইত্যাদি আমল নিয়ে উঠবে, কিন্তু দুনিয়াতে সে হয়ত কাউকে গালি দিয়েছিল, কাউকে অপবাদ দিয়েছিল, কারো

সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করেছিল, কাউকে খুন করে এসেছিল, কাউকে মেরে এসেছিল। ফলে তার নেক কাজের ছওয়াব ওদের দিয়ে দেয়া হবে। এইভাবে তার নেক খতম হয়ে যাওয়ার পরও তার উপর বিভিন্ন হকের দাবী থেকে যাবে। শেষে হকদারদের গুনাহ এনে তার উপর চাপিয়ে দেয়া হবে এবং জাহান্নামে ছুড়ে ফেলা হবে তাকে।

এই ধরনের অবস্থা ও আশংকা থেকে হিফাজত থাকার জন্য এবং নিজের হিসাব পরিস্কার রাখার জন্য মানুষের লেনদেনের ব্যাপারে, এবং আচার-আচরণের ব্যাপারে খুবই পরিস্কার থাকা উচিত। এতদ্বিষয়ে হুকুম-আহকাম ও মাস্আলা-মাসায়েল সর্ম্পকে জ্ঞান লাভের জন্য খুবই তৎপর থাকা দরকার এবং বিষয়টির খুবই গুরুত্ব দেয়া উচিত, আর এই বিষয়ে খুবই সতর্ক থাকা কর্তব্য। এই সমস্ত সহীহ্ হাদীস (কুরআনে কারীমের আয়াত দ্বারাও যেগুলো সমর্থিত) এর আলোকে নিরপেক্ষ ও জবাবদিহির মনোভাব নিয়ে আমাদের নিজেদের অতীত ও বর্তমান অবস্থা এবং সকল আচার-আচরণ ও লেন-দেনের ব্যাপারে যাচাই করা দেখা উচিত। যদি কারো কোনরূপ হকের দাবী আমার যিম্মায় থেকে থাকে, ঋণ হোক বা বিকিকিনির ব্যাপার হোক, এজমালী সম্পত্তির বিষয় হোক বা মীরাছের বিষয় হোক, কোন মুসলমানের মনে কষ্ট দেয়ার বিষয় হোক বা হক নষ্ট করার বিষয় হোক, তুহ্মত বা অপবাদ সম্পর্কিত বিষয় হোক বা গীবত সম্পর্কিত বিষয়–এই দুনিয়াই হকদারের হক দিয়ে হোক বা তার স্বতঃস্ফুর্ত ক্ষমা প্রদর্শনের মাধ্যমে হোক সব শুধরে নেয়া দরকার, সব পরিস্কার করে নেয়া উচিত আমাদের। অপরের হক সম্পর্কিত বিষয়ে আমাদের অত্যন্ত অবহেলা হয়ে থাকে। অনেক ক্ষেত্রে এর যিম্মাদারী থেকে যায়। উল্লিখিত হাদীসসমূহের আলোকে বিষয়টি খুবই গুরুত্বের অধিকারী। প্রথম অবকাশেই এদিকে সকলের মনোযোগ দেয়া দরকার।

৪. এরপর আমাদের কর্তব্য হল চরিত্র গঠন, তাযকিয়ায়ে নাফ্স বা আত্মসংশোধন এবং অন্তরকে সকল প্রকার কলুষতা ও মন্দ থেকে পবিত্র করে সুন্দর ও সদগুণাবলী দ্বারা সুসজ্জিত করার সাধনায় নিমগ্ন হওয়া। মন্দ ভাব ও অসৎ গুণাবলী হচ্ছে ভারী ও মোটা একটি পর্দা। নববী শিক্ষা থেকে ফায়দা অর্জন এবং আল্লাহর রঙে নিজেকে রঞ্জিত করার পথে এই পর্দাটি হল বিরাট এক বাধা। এই জিনিসই মানুষকে প্রবৃত্তির শিকারে পরিণত করে এবং তাকে শয়তানের লীলাক্ষেত্র হিসাবে বানিয়ে তোলে। আর দ্বীনও ধর্মক্ষেত্রে বিপদ ও ধ্বংসের কারণ হিসাবে দেখা দেয় এটাই। কুরআনুল কারীমে ইরশাদ হয়েছে– افرأيت من اتخذ الهه هواه

"আপনি কি সে লোকটিকে লক্ষ্য করেছেন, যে নিজের কামনা-বাসনা ও প্রবৃত্তিকেই বানিয়ে নিয়েছে স্বীয় মা'বুদরূপে। –সূরা আল-জাছিয়া ঃ ২৩

এই ক্ষেত্রেও কুরআন, সুন্নাহ এবং নববী শিক্ষার মাপকাঠিরই আমাদের অনুসরণ করা কর্তব্য। স্বীয় নফ্স ও চরিত্র সংশোধনের বিষয়ে কুরআন ও সুন্নাহর ফায়সালাকেই চূড়ান্ত বলে মেনে নেয়া উচিত। একজন মানুষ যতই দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ও সূক্ষ্মদর্শীই হোক না কেন, কেবলমাত্র কোন না কোন আয়নার সামনেই সে নিজের প্রতিবিম্ব প্রত্যক্ষ করতে পারে। সৌভাগ্যের অধিকারী হল সেই ব্যক্তি, যে ব্যক্তি স্বীয় দুর্বলতা ও চারিত্রিক রোগ-বালাই যথা–অহংকার, হিংসা, লোভ-লালসা, কৃপণতা, দ্বেষ, দুশমনী, দুনিয়ার মুহাব্বত, সম্পদ-লিপ্সা, কোন মুসলিমকে হীন দৃষ্টিতে দেখা, নীচতা ইত্যাদি মন্দ ও অসৎ গুণাবলী সম্পর্কে ওয়াকিফহাল এবং এইগুলিকে বিদূরিত করার এবং এগুলো থেকে মুক্তি লাভের চিন্তায় অস্থির। জ্ঞানী দুশমনের সাথে একজন যেমন আহবে লিপ্ত হয় ঠিক তদ্রুপ সেও এইগুলির বিরুদ্ধে প্রচণ্ড সংগ্রামে নিজেকে রাখে ব্যপৃত।

সেই ব্যক্তি অত্যন্ত খোশনসীব ও সৌভাগ্যশীল, আল্লাহ তা'আলা আলিম, সুবিজ্ঞ ও সুক্ষ্মদর্শী কোন রূহানী চিকিৎসকের সাক্ষাৎ যার ভাগ্যে ঘটিয়েছেন, যিনি তাকে সতর্ক ও সজাগ করেন, তার চারিত্রিক দুর্বলতা ও গোপন চারিত্রিক ও রূহানী রোগ সম্পর্কে তাকে অবহিত করতে থাকেন, এ থেকে মুক্তিলাভের উপায় বাত্লে দেন, তার জন্য সহজতর ও কার্যকরী করা সম্ভবপর বানিয়ে তোলেন তাও তাঁর অভ্যন্তরীণ ও হৃদয় জ্যোতি রোগী ও প্রত্যাশীর ভিতর পরিব্যাপ্ত হয়ে তাঁর গুণাবলীর ও বৈশিষ্ট্যসমূহের প্রতিবিম্বিত হয় এর মাঝে। তাঁর খোদাভীতি, নিজেকে মুহাসাবা ও যাচাই করার অবস্থা থেকে সে শিক্ষা গ্রহণ করে।

অতীত যুগে এই ধরনের আল্লাহওয়ালা সত্তার সংসর্গই ছিল সবচে সহজ রূহানী চিকিৎসা-পদ্ধতি। বড় বড় আলিম ও বিদগ্ধ ব্যক্তিরা এই ধরনের মুখলিস ও আল্লাহওয়ালা সত্তার তালাশে থাকতেন। নিজের থেকে জ্ঞানে কম মর্যাদার হলেও তারা এতে ভ্রুক্ষেপ করতেন না। কেননা তাঁদের দরবারে ও সংসর্গে এমন সব জিনিস তাদের লাভ হত যা বাতিনী তারবিয়ত ও সংশোধনের ক্ষেত্রে খুবই সহায়ক হত, নফল ও শয়তান থেকে হিফাজতের উপায় বলে বিবেচিত হত।

হযরত ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল (রা.)-এর পুত্র একবার তাঁকে অভিযোগ করে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, যারা জ্ঞানে তাঁর চেয়ে নিম্নমানের এবং তাঁর ছাত্র হওয়ার যোগ্য এমন সব লোকদের ওয়াজ ও নসীহতের মজলিসে যেয়ে কেন তিনি বসেন। এতে তার নিজের লজ্জা হয়। অনেক সময় এতে অন্য মানুষের ভুল বুঝাবুঝিরও সুযোগ হয়ে পড়ে। পুত্রের এই কথা শুনে হযরত ইমাম আহমাদ বলেছিলেন ঃ

يا بنيّ انما يجلس المرء حيث يجد صلاح قلبه .

প্রিয় বৎস, মানুষ সেখানেই গিয়ে বসে
যেখানে সে নিজের কলব ও অন্তরের ফায়দা দেখে।

ফিত্না-ফাসাদের ক্রমোন্নতি ও ব্যাপকতা সত্ত্বেও কোন যুগই এই ধরনের আল্লাহওয়ালা ও আহলে দিল বুযুর্গ সত্তা থেকে পৃথিবী খালি থাকেনি; হয়ত কোন সময় তাদের সংখ্যা রয়েছে বেশী আর কোন সময় বা কম। তবে কোন কারণে যদি কারো সে ধরনের আল্লাহওয়ালা সত্তার সংসর্গ নসীব না হয় তবে সে যেন তার বাতিনী অবস্থা ও নাফসের দিকে বিশেষ দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখে এবং নিরপেক্ষ বা আতালিক হিসাবে কিংবা সুবিজ্ঞ ও অন্তরসৃষ্টিসম্পন্ন একজন সমালোচক হিসাবে যেন নিজের নফসের অবস্থার পর্যালোচনা ও জায়েযা নিতে থাকে এবং স্বীয় রূহানী দুর্বলতা ও রোগসমূহ সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হওয়ার নিয়্যতে চেষ্টা করতে থাকে। আল-কুরআনে ইরশাদ হয়েছে ঃ

بل الإنسان على نفسه بصيرة . ولو ألقى معاذيره .

বরং মানুষ সে নিজের উপর নিজেই সাক্ষ্যদাতা, যদিও সে করতে থাকে ওযর-আপত্তি। –সূরা আল-কিয়ামা ঃ ১৪-১৫

সন্দেহ নেই, ক্রমে সে ইনশাল্লাহ স্বীয় অভ্যন্তরীন দুর্বলতা এবং ভিতরের সেই খানা-খন্দ সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হয়ে উঠবে, যে সমস্ত খানা-খন্দে দীর্ঘ দিন থেকে পঁচা পানি জমে জমে সমাজজীবন পর্যন্ত যার দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়েছে। এরপর তার কর্তব্য হবে কিতাব ও সুন্নাহ এবং এই উম্মতের আল্লাহওয়ালা 'উলামা ও বিজ্ঞ এবং অভিজ্ঞ রূহানী মুরব্বীদের অভিজ্ঞতা ও নির্দেশ-এর আলোকে স্বীয় রূহানী চিকিৎসার চিন্তা করা।

এই বিষয়ে উলামায়ে কেরাম অনেক কিছু লিখেছেন, হাজারো লাখো মুসলিম এ থেকে উপকার পেয়েছেন। উদাহরণস্বরূপ হযরত ইমাম গাযযালীর

ইহয়াউল উলূম[১] আল্লামা ইবন জাওযীর [২] তালবীস ইবলীস, আল্লামা ইবন কায়্যিমের ইগাছাতুল-লাহফান ফী মাকাইদিশ্-শায়তান[৩] এবং মাদারিজুস্-সালিকীন বায়না সালাসিলি ইয়্যা কানা'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্তাঈন। আল্লামা ইবন রাজাবের জামিউল 'উলূমি ওয়াল-হিকাম, শারহু খামসীনা হাদীসান মিন জাওয়ামিইল কিলাম, হযরত সাইয়্যিদ আহমাদ শহীদের সীরাত মুস্তাকীম, হযরত মওলানা আশরাফ আলী থানবীর তার্-বিয়াতুস্-সালিক নিয়মিত অধ্যয়ন করার বিশেষ পরামর্শ দেয়া যেতে পারে।

এই ক্ষেত্রে অধিক হারে যিকর ও দু'আর, ভয়ংকর রূহানী রোগসমূহের ধ্বংসকর পরিণাম সম্পর্কে ভীতি ও আশংকা, নিজের নাফ্স সম্পর্কে আশ্বস্ত না হওয়া ও এর প্রতি অনাস্থা, উদাসীনতা থেকে এবং উদাসীন ও রূহানী ও আত্মিক রোগের আক্রান্ত লোকজন, নাফ্সানী ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও শয়তানী মকর ও ধোঁকায় লিপ্ত লোকদের সংসর্গে থেকে দূরে থাকা খুবই উপকারী ও সহায়ক পদ্ধতি বলে স্বীকৃত। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ ফরমান ঃ

ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين .

যে ব্যক্তি আল্লাহ্র স্মরণ থেকে উদাসীন ও গাফিল থেকে জীবন কাটায় আমি তার উপর শয়তানকে চাপিয়ে দিই, আর সে-ই হয় তার সাথী।সূরা আয-যুখরুফঃ৩৬

আকীদা ও বিশ্বাস বিশুদ্ধ করা, ইবাদাত এবং যথাসম্ভব নাফসের সংশোধন ও মন্দ স্বভাব থেকে এর পুরাপুরি হিফাজত ব্যবস্থা অবলম্বনের পর পুরা যিন্দেগী, সকাল-সন্ধ্যা, আচার-আচরণ, লেনদেন এমনকি সামর্থ্য অনুযায়ী স্বীয় আদব-অভ্যাস এবং আকৃতি-প্রকৃতির ক্ষেত্রেও সীরাতে নববীর অধ্যয়নের দিকে বিশেষ মনোযোগ নিবদ্ধ রাখা দরকার। এটিকে জীবনের দিকদর্শন এবং সকল ক্রিয়াকাণ্ড ও নকল-হরকতে একে নমুনা ও আদর্শরূপে গ্রহণ করা কর্তব্য। শক্তি ও সামর্থ্য অনুসারে এর উপর আমল করার এবং এর অনুসরণে সদা সচেষ্ট থাকা প্রয়োজন। এতে কুরআনে বর্ণিত আল্লাহ্

---

১ দেখুন, ইহয়াউল উলূম-এর আল-মুহলিকাত পরিচ্ছেদ বা ইবন কুদামা মাকদিসীর মুখতাসারু মিনহাজিল কাসিদ্বীন-এর রিয়াযাতুন্-নাফ্স ওয়া তাহযীবুল-খুলক ওয়া মু'আলাজাতু আমরাযিল-কলব" শীর্ষক অধ্যায়।

২ দেখুন তালবীস ইবলীস-এর ষষ্ঠ, অষ্টম এবং দ্বাদশ অধ্যায়।

৩ মাকাইদুশ-শায়তান অধ্যায়ের ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

তা'আলার নিম্নোক্ত ফরমান ও ওয়াদার কিছু হিস্যা আমাদের নসীব হতে পারে ঃ

قل إن كنتم تحبون الله فا تبعونى يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم .

"হে নবী! আপনি বলে দিন, যদি আল্লাহকে তোমরা ভালবাস তবে তোমরা আমার অনুসরণ কর; ফলে আল্লাহ্ও তোমাদের ভালবাসবেন এবং তিনি মাফ করে দেবেন তোমাদের গুনাহ্সমূহ। –সূরা আল-ই-ইমরান ঃ ৩১

৫. আরকানে ছালাছা অর্থাৎ সালাত, সিয়াম, যাকাত[১]-এর জরুরী মাস্আলা-মাসাইল, হালাল-হারাম, জায়েয-নাজায়েয, ফরয-ওয়াজিব-সুন্নাতসমূহ, শুদ্ধ ও বিশুদ্ধ লেন-দেন এবং শরীয়ত নির্ধারিত হুদূদ ও সীমাসমূহ সম্পর্কে জ্ঞানলাভ একান্ত দরকার। বিশেষ জীবিকা নির্বাহের জন্য যে পেশা বা কাজে লিপ্ত সে সম্পর্কে শরীয়তের বিধি-বিধানসমূহের জ্ঞান লাভ করা এবং তদানুযায়ী আমল করা একজন খোদাভীরু, দায়িত্ববোধসম্পন্ন ও আখিরাত সম্পর্কে চিন্তাশীল মুসলিমের জন্য অপরিহার্য। এর জন্য কোন নির্ভরযোগ্য, সুবিজ্ঞ হাক্কানী আলিম এবং যাকে সমকালীন আলিমগণ আস্থাভাজন মনে করেন সেই ধরনের কোন আল্লাহ্ওয়ালা আলিমের লেখা ফিক্হ ও মাসআলা-মাসাইলের কোন কিতাব স্বীয় অধ্যয়নে রাখা দরকার।

৬. আমাদের মধ্যে অনেকেই সহীহ্ হাদীসসমূহে বর্ণিত ওযু, মসজিদে প্রবেশ করা বা বাহির হওয়ার দু'আ, বায়তুল-খালায় যাওয়া বা সেখান থেকে বের হওয়ার দু'আ, শোয়ার বা জাগরণের দু'আ, সকাল-সন্ধ্যার যিকর-আযকার, সফরে যাওয়ার বা বাড়ীতে ফিরে আসার দু'আ ইত্যাদির খুবই পাবন্দী ও গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। কিন্তু আশংকা হয় এই সমস্ত দু'আ ও যিকরের যে ফযীলত এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালআম এগুলোর বিষয়ে যে ছওয়াবের উল্লেখ করেছেন, আল্লাহ তা'আলার কাছে এগুলোর যে মরতবা ও মর্যাদা রয়েছে, আখিরাতে এগুলোর যে ফায়দা ও উপকারিতা রয়েছে সে সবের প্রতি লক্ষ্য না করে অমনোযোগিতা, গাফলত, অভ্যাসবশত আধুনিক যুগের কথামত টেপ রেকর্ডারের ন্যায় হয়ত এগুলো একজন কেবল আউড়ে যাচ্ছে। এমন অনেক ইবাদত আছে, যেগুলোর অত্যাবশ্যকতা

১. হজ্জের মাস্আলাসমূহ কার্যত হজ্ব করা ব্যতিরেকে আয়ত্তাধীন করা সাধারণের পক্ষে কঠিন।

সকলেরই জানা আছে, বিশেষ করে সেগুলোর ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলা যে পুরস্কার ও ছওয়াবের কথা উল্লেখ করেছেন, তাতে এই শর্তের কথাও বলা হয়েছে যে, সেই কেবল তা পাবে যে ব্যক্তি পুরস্কারের আশা নিয়ে এবং এর ইয়াকীনসহ তা আদায় করবে। সহীহ্ হাদীসে আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ

من صام رمضان إيمانا و إحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه .

"আল্লাহ্র ওয়াদার উপর ইয়াকীন ও প্রত্যয় রেখে এবং ছওয়াব লাভের আশা পোষণ করে যে ব্যক্তি রমযানের সিয়াম পালন করবে আল্লাহ্ তা'আলা তার পেছনের গুনাহ্-খাতা মাফ করে দেবেন। আরো আছে ঃ-

ومن قام ليلة القدر إيمانا و إحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه

"আল্লাহ্ প্রদত্ত ওয়াদার উপর ইয়াকীন ও প্রত্যয়সহ এবং ছওয়াবের আশা নিয়ে যে ব্যক্তি শব-ই-কদরের ইবাদত করবে, আল্লাহ্ তার পেছনের গুনাহ্ মাফ করে দেবেন। কিন্তু আমাদের মধ্যে অনেকেই ইবাদত হিসাবে করা এবং অভ্যাসবশত করার মাঝে পার্থক্য নির্ণয়কারী এই শর্ত ও বিষয়টির প্রতি বেশী খেয়াল দেই না। যার ফলে সালাত, যাকাত, সিয়াম, হজ্জ ইত্যাদি আরকানসমূহসহ আমাদের বহু ইবাদতই একটা প্রথা, একটা রুটিন ওয়ার্কে পর্যবসিত হয়ে যাচ্ছে, ঈমান ও ইহতিসাব[১] শূন্য নিষ্প্রান আনুষ্ঠানিকতায় পরিণত হয়ে যাচ্ছে।

সাহাবা কিরাম, এই উম্মতের আওলিয়া ও আল্লাহ্ওয়ালা উলামা এবং সাধারণ মুসলিমদের মধ্যে এই বিষয়টির নিরিখেই বিরাট ব্যবধান হয়ে যায়। এই সমস্ত আমলের ফযীলত তাঁদের সামনে সব সময়ই জাগরূক থাকত। এই সব আমল ও যিকর-আযকারে তাঁদের মধ্যে এমন ঈমান ও প্রত্যয়ী দশার সৃষ্টি করত যা মন-মগজ ছেয়ে যেত। এমন সাগ্রহ প্রেরণা ছিল তাদের, যা হৃদয়ের গভীরে অনুভূতি ও অতলান্ত উপলব্ধি নিয়ে তাঁরা এগুলো আদায়

---

১. বুখারী শরীফে উল্লিখিত হযরত 'আব্দুল্লাহ্-ইবন আমর ইবনুল-আস বর্ণিত একটি হাদীসে ঈমান ও ইহতিসাব শব্দ দুটোর ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, চল্লিশটি আমল, তার মধ্যে শ্রেষ্ঠতম হল কাউকে সাহায্য করার নিয়্যাতে ছাগী দান করা; এর যে কোন একটি আমল যদি কেউ ছওয়াবের আশায় মনে রেখে এবং এগুলো সম্পর্কে আল্লাহ্ প্রদত্ত ওয়াদার উপর বিশ্বাস রেখে করবে আল্লাহ্ তাকে জান্নাতে দাখিল করবেন।

করতেন। যেমন ওযূর কথাই ধরা যাক। দিন ও রাত্রিতে বারবার বিষয়টি ঘটে থাকে। আমাদের অনেকেই জীবনে একটি রুটিন ওয়ার্ক এবং মেশিনী আনুষ্ঠানিকতায় আজ এই মহান ইবাদতটি পর্যবসিত। কিন্তু ঐ আল্লাহওয়ালা বান্দারা যখন তা আদায় করতেন তখন তাদের সামনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিম্নোক্ত বাণীটি সজীব ও জাগরূক থাকত ঃ

إذا توضأ العبد المسلم او المؤمن فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء او مع إخر قطر الماء او هذا و إذا غسل يديه خرجت من يديه كل خطيئته بطشتها يداه مع الماء او مع إخر قطر الماء حتى يخرج تقيا من الذنوب .

"মুসলিম বা কোন মু'মিন বান্দা যখন ওযূ করে আর সে যখন তার চেহারা ধোয় তখন পানির সাথে বা পানির শেষ ফোটাটির সাথে তার হাত থেকে সকল গুনাহ ঝরে যায়, যা সে হাত দিয়ে ধরে করেছিল। এমনিভাবে সে গুনাহ থেকে একদম পাক সাফ হয়ে বেরিয়ে আসে।[১]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বর্ণিত কথায় ও খবরে তাঁদের এমন দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যেমন তাঁরা তাদের চোখে তা প্রত্যক্ষ করছেন। প্রতিশ্রুত ছওয়াবের আশা ও প্রেরণা নিয়েই তাঁরা সকল কাজ আঞ্জাম দিতেন। কোন মুসলিমের সাথে সাক্ষাতকালে তাঁরা যখন আনন্দ প্রকাশ করতেন, হাসতেন, তখনও তাঁদের মনে ঐ অবস্থা ও প্রেরণাই বিরাজ করত। ঐ প্রেরণা নিয়েই তাঁরা ব্যবসা-বাণিজ্য, স্বীয় পেশা বা জীবনের অপরাপর কাজে-কর্মে লিপ্ত হতেন। যে কাজই তাঁরা করতেন, পুরস্কার ও ছওয়াব এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায়ই হয়ে গিয়েছিল। ফলে তাঁদের ইবাদত ছিল আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি আনুগত্য ও ইতা'আতের প্রতীক।

ছওয়াব ও পুরস্কারে ইস্তিজহার বা সামনে জাগরূক রাখার অবস্থা যদি আমাদের হত, আমাদের ইবাদত-বন্দেগী, যিকর-আযকার যদি ঈমান ও ইহতিসাব, প্রত্যয় ও পুণ্যের প্রেরণায় থাকত পরিপুর্ণ, প্রাণময়তা, হাকীকত ও তাৎপর্যময়তায় হত ভরপুর, তাহলে যে সমস্ত কাজ আমরা করি, শৈশব থেকে যে সমস্ত কাজের অভ্যাস আমাদের হয়ে গেছে সব যদি আমরা ইস্তিজহার ও

---

১. তিরমিযী শরীফ,--- মা-জাআ ফী ফাযলিত্-তুহুর।

ইহতিসাব, ছওয়াবের আশা ও ফযীলতের কথা জাগরুক রেখে আদায় করতে থাকি তবে তা আমাদের মাঝে অন্য ধরনের এক নূর পয়দা করত নিশ্চয়, এর স্পষ্ট আছর ও প্রভাব আমাদের জীবনে উপলব্ধি করতে সক্ষম হতে পারব ইনশাআল্লাহ। এই জাগরূকতার স্বাগ্রহ প্রেরণা কেবল ইবাদত-বন্দেগীর ক্ষেত্রেই নয়, হালাল জীবিকা অর্জনে চাকুরী, ব্যবসা-বাণিজ্য, কৃষিকর্ম এবং অন্যান্য পেশার ক্ষেত্রে ও আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনই আমাদের আসল নিয়্যত হওয়া উচিত। কোন কোন হাদীসের কিতাব-এর মতানুসারে মুতাওয়াতির হিসাবে পরিচিত এবং ইমাম বুখারী তাঁর সুপ্রসিদ্ধ সংকলনটি নিয়্যাত সম্পর্কিত যে হাদীসটির মাধ্যমে সূচনা করেছেন সেই হাদীসটির প্রকৃত মর্ম এ-ই হাদীসটি হল ঃ إنما الأعمال بالنيات و إنما لكل امرء ما نوى

নিয়্যতের উপরই আমল নির্ভর করে। যে যার নিয়্যত করে তা-ই সে পায়। যে সমস্ত হাদীস দ্বীনও ইসলামের বুনিয়াদ হিসাবে স্বীকৃত, এই হাদীসটি হচ্ছে সেগুলোর অন্যতম। হযরত ইমাম শাফিঈ বলেন ঃ "এই হাদীসটি হচ্ছে জ্ঞানের তিন ভাগের এক ভাগ এবং ফিকহের সত্তরটি অধ্যায়ের সাথে এটি সম্পর্কিত।"

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আবির্ভাবের সবচে বড় ও অবিস্মরণীয় অনুগ্রহ ও ইহসান এবং সবচেয়ে মূল্যবান উপহার হচ্ছে এটিই; মানুষের নিয়্যত এরই সন্ধানে ব্যাপৃত। একটা সহজ সরল অথচ খুবই তাৎপর্যমণ্ডিত ও গভীর অর্থবহ শব্দ 'নিয়্যত' বলে এটির চিত্র এঁকেছেন হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। ইরশাদ করেছেন –

انما الأعمال بالنيات و إنما لكل امرء ما نوى .

আমল নিয়্যতের উপরেই করে নির্ভর। যে যা নিয়্যত করে তাই পায় সে।

সুতরাং কেবলমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে, ইখলাস, আনুগত্য ও ফরমাঁবরদারীর চেতনা নিয়ে যে কাজ করা হবে তাই আল্লাহর নৈকট্য অর্জন এবং ঈমান ও ইয়াকিনের সুউচ্চ মর্যাদায় পৌছার মাধ্যম হিসেবে পরিগণিত হবে । খালিস ও নির্ভেজাল দ্বীন এটাই, সকল প্রকার আবিলতার ছোয়াঁচ থেকে তা মুক্ত ও পবিত্র।আল্লাহর পথে জিহাদ ও যুদ্ধের আমল হোক বা রাজ্য পরিচালনা ও প্রশাসনের আমল হোক, আল্লাহ প্রদত্ত দুনিয়ার নিয়ামতসমূহ ভোগ করার বিষয় হোক বা নফসের, শরীয়ত অনুমোদিত চাহিদা পুরণের বিষয়, হালাল জীবিকা অর্জন ও চাকরী, পদবী হোক বা বৈধ

বিনোদনের বিষয়, দাম্পত্য জীবনের সুখভোগ হোক বা অন্য কিছু- এই সব উক্ত নিয়্যতের আঙ্গিকে যখন হবে তখনই হবে তা দ্বীন।

পক্ষান্তরে যে কাজ আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের প্রেরণা থেকে খালি, আল্লাহ পাকের আদেশ-নিষেধ-এর ঈমান এবং তারই ফরমাঁবরদারীর ধারনা থেকে হবে শূন্য, অমনোযোগিতা, গাফলতি ও আখেরাত বিস্মরণের পর্দায় যে কাজ হবে আবৃত–তা ফরয সালাত বা হিজরত ও জিহাদ বা যিকর ও তাসবীহ– এমনকি আল্লাহর পথে শহীদ হওয়ার মত মহান আমল বা ইবাদত ও দ্বীনিখিদমত হলেও দুনিয়াদারী বলেই আল্লাহর নিকট বিবেচ্য হবে। এ ধরনের অবস্থা নিয়ে যে কাজ করবে সে আলিম হোক বা মুজাহিদ, দ্বীনের পথে অবস্থানকারী হোক বা দ্বীনপ্রচারক মুবাল্লিগ, এই ধরনের সকলকেই ছওয়াব থেকে বঞ্চিত হতে হবে। কোন মূল্য হবে না তার আমলের। বরং আশংকা আছে যে, এই ধরনের আমল তার জন্য বিপদ ও আযাবের এবং আল্লাহ্ ও তার মাঝে হিজাব ও আবরণের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে।[১]

তরজমা ঃ মাওলানা ফরিদ উদ্দীন মাসউদ

---

১. হাদীসগ্রন্থসমূহে এই বক্তব্যের স্বপক্ষে বহু প্রমাণ বিদ্যমান। ইখলাস, নিয়্যত, ঈমান ও ইহতিসাব বিষয়ক অধ্যায়গুলো দ্রষ্টব্য।

ইসলামী রেনেসাঁর অগ্রপথিক

রেনেসাঁ ও সংস্কার আন্দোলনের আবশ্যকতা এবং ইসলামের ইতিহাসে এর ধারাবাহিকতা

জীবন গতিময় ও পরিবর্তনশীল

ইসলাম আল্লাহ্ তা'আলার শেষ পয়গাম এবং তা সামগ্রিকভাবে ও পরিপূর্ণরূপে দুনিয়ায় এসেছে। ইসলাম সম্পর্কে ঘোষণা করা হয়েছে ঃ

أليوم أكملت لكم دينكم و أتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الأسلام دينا

"আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন পূর্ণাঙ্গ করলাম, তোমাদের উপর আমার নিয়ামত পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দ্বীন হিসাবে মনোনীত করলাম।"

আল্লাহ্র দ্বীন একদিকে যেমন পূর্ণাঙ্গ, অন্যদিকে এটাও বাস্তব সত্য যে, জীবন গতিময় ও পরিবর্তনশীল এবং এর যৌবন চিরসত্য।

جاوداں پیہم دواں ہر دم جواں ہے زندگی

"চিরন্তন, সদা ধাবমান, জীবন সর্বদাই যৌবন তরঙ্গে প্রবাহমান।"

এই নিত্য প্রবহমান ও চির-যৌবনা জীবনে সঙ্গ দেবার এবং তাকে পথ প্রদর্শনের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা সর্বশেষ দ্বীন পাঠিয়েছেন-তার বুনিয়াদ যদিও "চিরন্তন 'আকীদা ও বাস্তব সত্যের" উপর, কিন্তু তথাপি তা জীবন রসে ভরপুর এবং গতিময়তা তার অস্থিমজ্জায় অনুপ্রবিষ্ট। তার ভেতর আল্লাহ্ তা'আলা এই যোগ্যতাও প্রদান করেছেন, যেন সে সকল অবস্থায় দুনিয়াকে পথ প্রদর্শন করতে পারে এবং প্রতিটি মনযিলে পরিবর্তনশীল মানবতার সাথে তাল মিলিয়ে চলতে পারে। সে বিশেষ কোন যুগের এমন কোন নির্মাণ-শাস্ত্র নয় যা সেই যুগের স্মৃতিচিহ্নের ভেতর সংরক্ষিত-বরং তা এমন একটি জীবন্ত দ্বীন যা সর্বজ্ঞ, সর্বোত্তম ও ন্যায়-বিচারক শিল্পীর শিল্প-নৈপুণ্যের সর্বোত্তম নমুনা।

ذلك تقدير العزيز العليم—الأنعام :١٢

"প্রবল পরাক্রমশালী জ্ঞানীর এটাই নির্ধারিত পরিমাপ।"

صنع الله الذى أتقن كل شيئ – النمل :٨٨

"সেই আল্লাহরই কারিগরি যিনি প্রতিটি বস্তুকে সুদৃঢ় করেছেন।"

মুসলিম উম্মার যুগটি ছিল সর্বাধিক পরিবর্তনশীল

এই দ্বীন যেহেতু শেষ ও বিশ্বজয়ী দ্বীন এবং এই উম্মত যেহেতু শেষ ও বিশ্বজয়ী উম্মাহ্-সেজন্য এটা অত্যন্ত স্বাভাবিক যে, দুনিয়ার বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা মানুষ এবং বিভিন্ন যুগের সঙ্গে এই উম্মার সম্পর্ক থাকবে এবং তাকে এমন সব দ্বন্দ্ব ও সমস্যা-সংকটের মুকাবিলা করতে হবে যা বিশ্বের ইতিহাসে অপর কোন জাতিকে করতে হয়নি। এই উম্মাহকে যে যুগে দেওয়া হয়েছে-সে যুগ সর্বাধিক পরিবর্তনশীল ও বিপ্লবপূর্ণ এবং তার অবস্থার মাঝে যতখানি নিত্য-নতুন সৃষ্টিশীলতা রয়েছে- (আরবী) তা অতীতের কোন যুগেই দৃষ্টিগোচর হয় না।

ইসলামের স্থায়িত্ব ও ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন্য গায়েবী ব্যবস্থাপনা

পরিবেশের প্রভাবের মুকাবিলা এবং স্থান-কালের পরিবর্তন থেকে নিজেদের মুক্ত রাখার সুবিধার্থে আল্লাহ্ তা'আলা এই উম্মাহকে দু'টি বিশেষ দানে ভূষিত করেছেন। প্রথমত, হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) এমন একটি পরিপূর্ণ ও জীবন্ত শিক্ষা দান করেছেন যা প্রতিটি দ্বন্দ্ব ও সংকট এবং প্রতিটি পরিবর্তনকে অত্যন্ত সহজভাবে মুকাবিলা করতে পারে। তার ভেতর প্রতিটি যুগের সমস্যা সমাধানের পুরোপুরি যোগ্যতা বিদ্যমান। দ্বিতীয়ত, তিনি এও নিজ দায়িত্বে গ্রহণ করেছেন যে, (এ যুগের ইতিহাস এর সাক্ষ্য দেয়) তিনি এই জীবন্ত ধর্মকে প্রতিটি যুগে এমন সব জীবন্ত ব্যক্তিত্ব দান করবেন যাঁরা ঐসব রেখে যাওয়া শিক্ষামালাকে জীবনের মাঝে স্থানান্তর করতে থাকবেন এবং ব্যক্তিগত অথবা সমষ্টিগতভাবে এই ধর্মকে জীবন্ত এবং এই উম্মাহকে কর্মতৎপর রাখবেন। এই ধর্মে ব্যক্তি সৃষ্টি করার এই যে যোগ্যতা ও শক্তি-তা এর আগে অপর কোন ধর্মে পরিলক্ষিত হয়নি। এই উম্মাহ বিশ্ব ইতিহাসে যেভাবে 'সন্তান-প্রসবিনী' প্রমাণিত হয়েছে, দুনিয়ার অন্য কোন উম্মাহ ও জাতি-গোষ্ঠীর ভেতর তার নজীর মেলা ভার। এটা আকস্মিক কোন ব্যাপার

নয়, বরং আল্লাহর একটি বিশেষ অবদান যে, যে যুগে যেরূপ যোগ্যতা ও শক্তিসম্পন্ন লোকের দরকার ছিল এবং যে বিষের জন্য যে বিষহরির প্রয়োজন ছিল তা এই উম্মাহকে দান করা হয়েছে।

ইসলামের জীবন সত্তার উপর হামলা

শুরু থেকেই ইসলামের জীবন-সত্ত্বা ও তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উপর এমন সব হামলা এসেছে যার ধকল সহ্য করা অন্য কোন মাযহাবের পক্ষেই সম্ভব ছিল না।

পৃথিবীর অপরাপর ধর্ম, যে সব ধর্ম নিজ নিজ যুগে বিশ্ব জয় করেছিল, এর তুলনায় স্বল্পতর আঘাতও সহ্য করতে পারেনি এবং সেসব ধর্ম নিজের অস্তিত্বই খুয়ে বসেছে। কিন্তু ইসলাম তার সকল প্রতিপক্ষকেই পর্যুদস্ত করেছে এবং নিজ স্বরূপেই টিকে আছে। একদিকে বাতেনী ফেরকা ও তার শাখা-প্রশাখা ইসলামের মূল প্রাণসত্তা ও তার নেজামে 'আকীদার জন্য যেমন ছিল ভয়াবহ তেমনি ভয়াবহ ছিল মুসলমানদেরকে জড়ে-মূলে উৎখাত করবার জন্য ক্রুসেডারদের অভিযান ও তাতারীদের হামলা । দুনিয়ার অন্য কোন ধর্ম হলে এ পরিস্থিতিতে সে তার নিজস্ব সকল বৈশিষ্ট্যই খুইয়ে বসত এবং একটি কাহিনী হিসাবে ইতিহাসের পাতায় স্থান পেত। কিন্তু ইসলাম এসব আভ্যন্তরীণ ও বহিরাক্রমণ বরদাশত করেছে । সে কেবল তার নিজ অস্তিত্বই বজায় রাখেনি, বরং জীবনের ময়দানে নিত্য-নতুন বিজয়লাভও করেছে। বিকৃতি ও মনগড়া ব্যাখা, নতুন প্রথা-পদ্ধতির উদ্ভাবন,অনারবীয় প্রভাব-প্রতিপত্তি, শিরকমূলক কর্মকাণ্ড ও প্রথা-পদ্ধতি, বস্তু-পূজা, আত্ম-পূজা,বিলাসপরায়ণতা, ইলহাদ ও ধর্মহীনতা, বুদ্ধিবৃত্তি পূজা প্রভৃতি ইসলামের উপর বারবার হামলা করেছে।

এমনকি, কখনো কখনো মনে হয়েছে, আর বুঝি ইসলাম এইসব আক্রমণের মুখে নিজের অস্তিত্ব রক্ষা করতে পারল না, এই বুঝি সে আত্মসমর্পণ করে বসল। কিন্তু মুসলিম উম্মার সচেতন বিবেক ও আত্মমর্যাদাবোধ আত্মসমর্পণের ধারে কাছে না গিয়েও নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রেখেছে; ইসলামের প্রাণসত্তা কখনো বিলীন হয়ে যায়নি। প্রতিটি যুগেই এমন সব ব্যক্তির জন্ম হয়েছে যাঁরা সব রকমের বিকৃতি ও মনগড়া ব্যাখ্যার পর্দা উন্মোচন করেছেন এবং ইসলামের হাকীকত ও খালেছ দ্বীনকে উজ্জ্বলতর রূপে ফুটিয়ে তুলেছেন। তাঁরা বিদ'আত ও অনারবীয় প্রভাব-

প্রতিপত্তির বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলেছেন, রাসূলে করীম (সা.)-এর সুন্নাহ তথা বাস্তব জীবনাদর্শের প্রতি সর্বাত্মক সমর্থন ঘোষণা করেছেন, বাতিল ও ভ্রান্ত 'আকীদা-বিশ্বাস সাহসিকতার সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করেছেন, শিরকমূলক কর্ম-কাণ্ড ও আচার-প্রথার বিরুদ্ধে প্রকাশ্য জিহাদ ঘোষণা করেছেন, বস্তুবাদ ও আত্মপূজার উপর চরম আঘাত হেনেছেন, বিলাসপরায়ণতা এবং স্বীয় যুগের 'মুতরাফীন'(مترفين)-[১] এর ভীষণ নিন্দাবাদ করেছেন, অত্যাচারী শাসকদের সামনে সত্যের কলেমাকে বুলন্দ করেছেন, বুদ্ধি-বৃত্তির মায়াবী জাল ছিন্নভিন্ন করেছেন এবং ইসলামের ভেতর নতুন প্রাণশক্তি ও কর্মপ্রেরণা এবং নতুন ঈমান ও নতুন প্রাণস্পন্দন সৃষ্টি করেছেন। এ সমস্ত ব্যক্তি মেধা, জ্ঞান, চরিত্র ও আধ্যাত্মিকতার দিক দিয়ে স্বীয় যুগের বিশিষ্টতম ব্যক্তি ছিলেন এবং শক্তিশালী ও আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন।

জাহিলিয়াত ও গুমরাহীর নিত্য-নতুন অন্ধকারের জন্য তাঁদের নিকট কোন না কোন " শুভ্র সমুজ্জ্বল হাত" ছিল যদ্ধারা অন্ধকার অমানিশার ঘোর কালো পর্দা তাঁরা উন্মোচন করেছেন। ফলে সত্য প্রকাশ্য দিবালোকে উদ্ভাসিত হয়েছে। এ থেকে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, আল্লাহ্ তা'আলারই ইচ্ছা হ'ল, এই দ্বীনের হেফাজত করা এবং বিশ্ববাসীর পথ-প্রদর্শনের সেই কাজ এই উম্মার মাধ্যমেই সম্পন্ন করা, যে কাজ তিনি অতীতে জীবন্ত নবুওয়াতের মাধ্যমে সম্পন্ন করতেন। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা অতীতে যে কাজ আম্বিয়ায়ে কিরামের দ্বারা নিতেন- এখন তা রসূল (সা.)-এর প্রতিনিধিবর্গ এবং উম্মতের মুজাদ্দিদ ও সংস্কারকদের দ্বারাই নেবেন।

অন্যান্য ধর্মে মুজাদ্দিদের স্বল্পতা

বিশ্বের অন্যান্য ধর্মে এমন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্বের স্বল্পতা পরিলক্ষিত হয় যাঁরা ঐসব ধর্মে নতুন প্রাণস্পন্দন এবং তার অনুসারীদের মধ্যে নতুন জীবন সৃষ্টি করতে পারেন। তাদের ইতিহাসে শত সহস্র বছরের এমনও শূন্যতা দৃষ্টিগোচর হয় যেখানে উক্ত ধর্মের এমন কোন সংস্কারকের আবির্ভাব হয়নি যিনি উক্ত ধর্মকে বিকৃতি ও বিদ'আতের (নবাবিস্কৃত প্রথা-পদ্ধতির) বেড়াজাল থেকে মুক্ত করবেন, তার হাকীকত তথা বাস্তবতাকে প্রকাশ্যে তুলে ধরবেন, প্রকৃত দ্বীনও ঈমানী হাকীকতের দিকে পূর্ণ শক্তিতে দা'ওয়াত দেবেন, রসম

---

১. গর্বিত ও উদ্ধত ধনী এবং প্রাচুর্যের অধিকারী বিত্ত-সম্পদের মালিকদের কুরআনের ভাষায় 'মুতরাফিন' বলা হয়। –অনুবাদক

ও রেওয়াজের বিরুদ্ধে প্রকাশে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করবেন, বস্তু-বাদ ও আত্মপূজার বিরুদ্ধে জিহাদ করবার জন্য কোমর বেঁধে ময়দানে অবতরণ করবেন এবং স্বীয় ইয়াকীন ও সত্য-সুন্দর আধ্যাত্মিকতা এবং সীমাহীন কুরবানী দ্বারা উক্ত ধর্মের অনুসারীদের মধ্যে নতুন প্রাণ-স্পন্দন সৃষ্টি করবেন।

এর সর্বাপেক্ষা বড় উদাহরণ হ'ল খৃস্ট ধর্ম। খৃস্ট ধর্ম স্বীয় যুগের সূচনায় অর্থাৎ খৃস্টীয় প্রথম শতাব্দীর প্রথমার্ধেই এমন বিকৃতির শিকার হ'ল যার নজীর সে যুগের কোন ধর্মের ইতিহাসে মেলে না। খৃস্ট ধর্ম পরিস্কার ও নির্ভেজাল একটি তওহীদী ধর্ম থেকে এমন একটি মুশরিক ও পৌত্তলিকতাবাদী ধর্মে রূপান্তরিত হয় যাকে বর্তমানে গ্রীক-দর্শন ও বৌদ্ধ চিন্তাধারার সংমিশ্রণ বলাই ভাল। এখানে লক্ষ্যণীয় বিষয় হ'ল এসব কিছুই হয়েছে খৃস্ট ধর্মের সর্বাপেক্ষা বড় অনুসারী ও প্রচারক সেন্ট পল (১০-৬৫'ঈসায়ী)-এর হাতে। আর প্রকৃতপক্ষে এ পরিবর্তন ছিল এক আত্মা থেকে অপর আত্মায়, এক কাঠামো থেকে অপর কাঠামোয়, এক বিধিব্যবস্থা থেকে অপর বিধি-ব্যবস্থার দিকে এমন একটি উল্লম্ফনের সমার্থক যার ভেতর প্রথম কাঠামো থেকে স্রেফ নাম এবং কতক প্রথা-পদ্ধতির সমন্বিত রূপই অবশিষ্ট থেকে গিয়েছিল। একজন খৃস্টান মনীষী (Eruset De Bunsen) এই বিপ্লব ও পরিবর্তনের কথা বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেছেন ঃ

"যে ধর্ম-বিশ্বাস ও বিধি-ব্যবস্থার বর্ণনা আমরা বাইবেলে পাই তার দা'ওয়াত হযরত মসীহ (আ.) কখনোই তাঁর বাণী ও কর্মের দ্বারা দেননি। এই মুহূর্তে খৃস্টান, ইহুদী ও মুসলমানদের মধ্যে যে মনোমালিন্য বিদ্যমান, এর যিম্মাদার হযরত ঈসা (আ.) নন; বরং এজন্য খৃস্টান বেদ্বীন পলই দায়ী। এসব কিছুই পবিত্র গ্রন্থের বিকৃতি ও কাঠামোগত পরিবর্তন-পরিবর্ধনের পন্থায় ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ এবং পবিত্র গ্রন্থের ভবিষ্যদ্বাণী ও উপমা-উৎপ্রেক্ষা দ্বারা পূর্ণ করারই ফল। পল ঈসানীয় (Essenio) ধর্মের প্রচারক স্টিফেন (Stephen)-এর অন্ধ আনুগত্য করতে গিয়ে হযরত মসীহ (আ.) এর ধর্মের সঙ্গে বৌদ্ধ ধর্মের অনেক রসম-রেওয়াজ জুড়ে দেন। আজ ইঞ্জীলে যে পরস্পরবিরোধী গল্প-কাহিনী ও বিবিধ ঘটনাবলী পরিদৃষ্ট হয় এবং যা হযরত ঈসা (আ.)-কে তাঁর প্রকৃত মর্যাদা থেকে অনেক খাটো করে দেখিয়ে থাকে –তা সবই উক্ত পল-এরই সৃষ্টি, হযরত মসীহ (আ.) নন; বরং পল এবং তার পরবর্তীতে আগত পাদরী ও ধর্মযাজকগণ সেই সব ধর্ম-বিশ্বাস ও বিধি-ব্যবস্থা প্রণয়ন করেন

যাকে গোড়া খৃস্টান জগৎ অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে নিজেদের ধর্ম-বিশ্বাসের বুনিয়াদ হিসাবে অভিহিত করে আসছেন।"

খৃস্ট ধর্ম দীর্ঘ কয়েক শতাব্দী যাবত এবং অদ্যাবধিও পলের এই উত্তরাধিকারত্বকে বুকে উঠিয়ে রেখেছে এবং এই সময়কালে খৃস্টান জগতে এমন কোন ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব ঘটেনি–যিনি খৃস্ট ধর্মকে বাইরের এই সব ধার করা ও অবাস্তব বিধি-বিধান থেকে মুক্ত করবেন এবং সেই বিন্দুর দিকে প্রত্যাবর্তনের প্রয়াস চালাবেন যেই বিন্দুর উপর হযরত মসীহ (আ.) এবং তাঁর একনিষ্ঠ খলীফা ও ভক্ত অনুসারীরা অবস্থান নিয়েছিলেন। শতাব্দীর পর শতাব্দী চলে গেল, অথচ এমন কোন ব্যক্তির আগমন ঘটল না–যিনি খৃস্ট ধর্মের সেই সব নতুন ও বর্ধিত অংশকে মূল অংশ থেকে পৃথক করতে পারেন। শেষাবধি খৃস্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে জার্মানীতে মার্টিন্ লুথার (Martin Luther) -এর জন্ম হল। তিনি কতক খুটিনাটি সমস্যার ক্ষেত্রে কিছুটা সীমিত ধরনের সংস্কার সাধন করেন। এটা এমন কিছু মূল্যবান ও ব্যাপক সংস্কার ছিল না, কিংবা খৃস্ট ধর্মের ভুল গতি ও তার বিপথগামীতার বিরুদ্ধে কোন বিদ্রোহও ছিল না। অর্থাৎ খৃস্ট ধর্মের প্রায় পনেরটি শতাব্দী বিপ্লবাত্মক বুনিয়াদী ও সকল ধর্ম-সংস্কারের আন্দোলন থেকে মুক্ত থাকল এবং এই সময়ে কোন সৎ প্রচেষ্টাই পুরোপুরি কার্যকর ও ফলপ্রসূ প্রমাণিত হল না। খৃস্টান মনীষীগণও একথা স্বীকার করেছেন যে, এই দীর্ঘ সময়ে খৃস্টান জগতে যেমন কোন ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব হয়নি– তেমনি এমন কোন আন্দোলনের ও বিকাশ ঘটেনি যা খৃস্ট-ধর্মের সংস্কার কিংবা পুনর্জাগরণের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে পারে।

ইনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকার নিবন্ধকার Mr. J. Bass Mullinger লিখেছেনঃ "আমরা যদি এর কারণ অনুসন্ধান করি যে, ষোড়শ শতাব্দীর পূর্বে ধর্ম-সংস্কার (Reformation)-এর প্রয়াসে কেন আংশিক সাফল্যও অর্জিত হয়নি –তাহলে কোনরূপে কষ্ট-কল্পনা ছাড়াই বলে দেওয়া যায় যে, এর সর্বাপেক্ষা বড় কারণ হল মধ্যযুগের মেধা অতীতের দৃষ্টান্তের গোলামী থেকে মুক্ত হতে পারেনি।"[১]

---

১. Enc.Britannica, Ed. ix.vol. xx. p.320, ২.ঐ, ৩২১ পৃ., ৩. ঐ, ৩২১পৃ.

অন্যত্র বলেন, "চার্চ-সংস্কারের কোন সামগ্রিক প্রস্তাব কার্যকর করার ক্ষেত্রে তাদের ধারাবাহিক প্রয়াসের ব্যর্থতা ইউরোপীয় ইতিহাসের একটি বাস্তব ঘটনা।"

তিনি আরো একটু এগিয়ে বলেন, "ষোড়শ শতাব্দীর পূর্বে ধর্ম-সংস্কারের ক্ষেত্রে বেশ কয়েকটি উল্লে-যোগ্য রকমের প্রয়াস নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এর সবগুলিই কোনরূপ বাছ-বিচার ব্যতিরেকে গির্জার নিন্দা ও অভিশাপের শিকারে পরিণত হয়।"

এর পর এমন কোন দ্বিতীয় ব্যক্তির জন্ম হয়নি যিনি গির্জার কাল্পনিক ও মনগড়া মতবাদ ও ধ্যান-ধারণা এবং তাদের জোর-জবরদস্তির বিরুদ্ধে স্বীয় আওয়াজ উঠাতে পারেন এবং কমপক্ষে এতটুকু করতে পারেন, যতটুকু লুথার (তাঁর সীমিত কর্মক্ষেত্রে ও দুর্বলতা সত্ত্বেও) করেছিলেন।

মোটকথা, এভাবে খৃস্ট ধর্ম তার মনোনীত পথ ধরেই ক্রমান্বয়ে চলতে থাকে; বরং সঠিকভাবে বলতে গেলে সেই পথ ধরেই চলতে থাকে যা তার মাথায় চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ফলে গির্জার প্রভাব হ্রাস পায় এবং পরবর্তীকালে তার ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি একেবারে নিঃশেষ হয়ে যায়; ইউরোপে বস্তুবাদের রাজত্ব কায়েম হয় এবং তা ধর্মের স্থান দখল করে। পাশ্চাত্যের সকল ধর্মকেই বস্তুবাদ তার পশ্চাতে ঠেলে দেয়। খৃস্ট ধর্মে এমন কোন ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব ঘটেনি, যিনি এই বস্তুবাদের সয়লাব রুখতে পারেন, তাকে তার প্রকৃত স্থানে ফিরিয়ে আনতে পারেন অথবা খৃস্টানদের ভেতর স্বধর্মের আস্থা পুনর্বহাল করে তাদের মধ্যে সেই রূহানী ও আখলাকী তথা আধ্যাত্মিক, নৈতিক ও চারিত্রিক শক্তি সৃষ্টি করতে সক্ষম হন, যা তাদেরকে বস্তুবাদের এই ভীষণ চপেটাঘাত এবং ঈমানী উৎসাহ-উদ্দীপনার সামনে দৃঢ়পদ রাখতে পারে, তাদেরকে এমন একটি জীবন অতিবাহিত করতে বাধ্য করতে পারে যা জ্ঞান, নৈতিক চরিত্র এবং বিশুদ্ধ খৃস্টীয় 'আকীদার উপর স্থিতিশীল এবং যেখানে নতুন যুগের প্রশ্নাদি ও আধুনিক কালের সমস্যা-সংকটের সমাধান তারই আলোকে সম্ভব। কিন্তু তা না হয়ে হল এই যে, খৃস্টান চিন্তাবিদ ও মনীষীবৃন্দ খৃস্ট ধর্মের ভবিষ্যত সম্পর্কে নিজেরাই হতাশ হয়ে পড়লেন এবং ধর্মহীন বস্তুবাদের মুকাবিলায় তাদের ভেতর হীনমন্যতা এসে ভর করল।

এই একই কাহিনীর পুনরাবৃত্তি ঘটে প্রাচ্যের বিভিন্ন ধর্মের বেলায়ও। হিন্দু ধর্মও তার আসল রাস্তা থেকে সরে যায়। সে তার অনাড়ম্বরতা ও সহজ-সারল্য এবং বিশ্ব-স্রষ্টার সঙ্গে সরাসরি রূহানী সম্পর্ক একেবারে খুইয়ে বসে। নৈতিক শক্তিও হারিয়ে ফেলে এবং অত্যধিক জটিলতা ও ঘোর-প্যাঁচের কারণে কেবলমাত্র একটি সূক্ষ্ম ও অবাস্তব দর্শনে পরিণত হয়। ক্রমান্বয়ে তা নির্ভেজাল তওহীদ এবং পারস্পরিক সম্পর্ক ও লেন-দেনের ক্ষেত্রে সাম্য–এই দু'টি গুরুত্বপূর্ণ জিনিস হাতছাড়া করে ফেলে। এ দু'টিই হচ্ছে সেই গুরুত্বপূর্ণ বুনিয়াদ যার উপর যে ধর্ম কায়েম হবে তার শেকড় হবে মাটির গভীরে সুদৃঢ়ভাবে প্রোথিত এবং ডালপালা ও শাখা-প্রশাখা হবে উন্মুক্ত আকাশে বিস্তৃত।

উপনিষদের লেখকগণ বহু আয়াস স্বীকার করেছেন এই গণ্ডগোলের প্রতিবিধানে। অনন্তর তারা সেসব রসম-রেওয়াজ প্রত্যাখ্যান করেন যা হিন্দু ধর্ম ও হিন্দু সমাজকে পুরোপুরি ঢেকে ফেলেছিল এবং সে স্থলে এমন একটি দার্শনিকতামণ্ডিত ও চিন্তাপ্রসূত ব্যবস্থা পেশ করেন যা বহুত্বের মধ্যেও একত্বের দৃষ্টিভঙ্গির উপর প্রতিষ্ঠিত। এই নতুন চিত্র হিন্দু ধর্মের পণ্ডিত মহলে গৃহীত হয়। কেননা তাঁদের প্রবণতা তো প্রথম থেকেই ওয়াহ্‌দাতুল-ওজুদ 'হামাউস্ত'-এর দিকে ছিল। কিন্তু জনসাধারণ, যাদের চিন্তাশক্তি অত উচ্চমার্গের ছিল না এবং যারা কার্যকর পন্থা ও বাস্তব শিক্ষার অভিলাষী ছিল, তা কবুল করেনি। এভাবে হিন্দু ধর্ম ক্রমান্বয়ে তার শক্তি ও প্রভাব-প্রতিপত্তি হারাতে থাকে এবং তাতে আস্থাহীনতা ও অনিশ্চয়তা দিন দিন বাড়তে থাকে। হিন্দু সমাজের এই অনিশ্চয়তা ও অস্থিরতা সম্মুখে অগ্রসর হয়ে বুদ্ধের ব্যক্তিত্বে প্রতিবিধানের পথ খোঁজে। এটা খৃস্ট-পূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর ঘটনা।

বুদ্ধ একটি নবতর চিন্তা, একটি নতুনতর মাযহাব (ধর্ম) [যদি এক্ষেত্রে 'ধর্ম' শব্দটির প্রয়োগ যথার্থ হয়] পেশ করেন যা ঘর-সংসার ত্যাগ, আত্মার শুচি-শুভ্রতা, প্রবৃত্তির মুকাবিলা তথা ষড়রিপু দমন, দয়া-দাক্ষিণ্য ও মহানুভবতা, সেবা-কর্ম ও প্রথা-পদ্ধতি, আচার-অভ্যাস এবং শ্রেণী-সংঘাত ও শ্রেণী-বৈষম্য প্রত্যাখ্যান ও বিরোধিতার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। ফলে এই ধর্ম[১]

---

[১]. বৌদ্ধ মতের উল্লেখ করতে গিয়ে 'ধর্ম' শব্দের ব্যবহারে আমার আপত্তির কারণ হল এই যে, এতে স্রষ্টার অস্তিত্ব এবং প্রারম্ভ ও প্রত্যাবর্তনস্থল সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট কোন আকীদা ও দৃষ্টিভঙ্গি পাওয়া যায় না। অধিকাংশ ও ঐতিহাসিকেরও একই মত। ইনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকার 'বুদ্ধ' নিবন্ধ দেখুন।

খুবই দ্রুততার সঙ্গে বিস্তার লাভ করে এবং এশিয়ার দক্ষিণ ও পূর্বাংশে এর একচ্ছত্র প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হয়।

কিন্তু কিছুকাল পরেই এই বিরাট ধর্মীয় আন্দোলনও স্বকীয়তা হারিয়ে বিকৃতির শিকারে পরিণত হয়। মূর্তিপূজা ও অন্যান্য রীতি-নীতি ও প্রথা-প্রদ্ধতি–যেগুলোর বিরুদ্ধে এই ধর্ম বিদ্রোহের ধ্বজা উড্ডিন করেছিল, পুনরায় এর উপর আক্রমণোদ্যত হয়। এমন কি, শেষ পর্যন্ত বৌদ্ধ ধর্মও শিরক ও মূর্তিপূজার সেই ধর্মে পরিণত হয় যা তার পূর্ববর্তী হিন্দু ধর্ম থেকে বিভিন্ন প্রকার মূর্তি ও তার সংখ্যা ব্যতীত অপর কোন ক্ষেত্রে ভিন্নতর ও উত্তম ছিল না। এর নৈতিকতারও অবনতি ঘটে এবং চিন্তা ও ধ্যান-ধারণার ক্ষেত্রে জটিলতা আরো বৃদ্ধি পায়। নতুন নতুন ফেরকা ও ধর্মীয় গ্রুপের সৃষ্টি হয়। অধ্যাপক ঈশ্বর টোপা তাঁর "হিন্দুস্তানী তামাদ্দুন"(ভারতীয় সংস্কৃতি) নামক গ্রন্থে বলেনঃ

"বৌদ্ধ ধর্মের ছত্রছায়ায় এমন রাজত্ব কায়েম হয় যার ভেতর অবতারের ছড়াছড়ি এবং মূর্তিপূজার অবাধ কর্তৃত্ব বিদ্যমান। সংঘসমূহের পরিবেশ পরিবর্তিত হয়ে তার ভেতর ধর্মের নামে নিত্য-নতুন প্রথা-পদ্ধতি ও নবাবিস্কৃত বস্তু একের পর এক দৃষ্টি গোচর হতে থাকে।"[১]

পণ্ডিত জওয়াহের লাল নেহরু তাঁর "Discovery of India" নামক গ্রন্থে বৌদ্ধ ধর্মের বিকৃতি ও ক্রমাবনতির বর্ণনা দিতে গিয়ে লিখেছেন ঃ

ব্রাহ্মণ্যবাদ বুদ্ধকে অবতার বানিয়েছিল। বৌদ্ধ ধর্মও তাই করে। সংঘ খুবই সম্পদশালী হয়ে ওঠে এবং একটি বিশেষ দলের স্বার্থ সিদ্ধির আখড়ায় পরিণত হয়। সংঘের ভেতর নিয়ম-শৃঙ্খলার কোন বালাই ছিল না। উপাসনা পদ্ধতির ভেতর যাদু ও নানারূপ কল্পনার অনুপ্রবেশ ঘটে এবং সহস্র বছর এসব নিয়ম মাফিক চালু থাকার পর বৌদ্ধ ধর্মের অবনতি শুরু হয়। এই যুগে তার যে রোগজীর্ণ অবস্থা ছিল Mrs. Rhys Dayis তার উল্লেখ করেছেন এভাবেঃ

"এই সব রোগক্লিষ্ট ধ্যান-ধারণার গভীর ছায়াতলে এসে গৌতমের (বুদ্ধের) নৈতিক শিক্ষা দৃষ্টিসীমার বাইরে চলে যায়। একটি স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গি জন্ম নেয় এবং তা ফলে-ফুলে সুশোভিত হয়ে ওঠে। একের স্থান দখল করে

---

[১] হিন্দুস্তানী তামাদ্দুন (উর্দূ), ঈশ্বর টোপাকৃত।

অন্য এবং প্রতিটি পদক্ষেপে নব-সৃষ্টির খেলা চলতে থাকে। আর এই প্রতারণাপূর্ণ নিত্য নব-সৃষ্টির দ্বারা অন্ধকার ঘনীভূত হয় এবং বৌদ্ধ ধর্মের প্রবর্তকের সাদা-সিধা ও উন্নত নৈতিক শিক্ষা মনগড়া চাকচিক্যপূর্ণ বাক্যজালের নীচে চাপা পড়ে যায়।[১]

"সামগ্রিক দিক দিয়ে বৌদ্ধ ধর্ম ও ব্রাহ্মণ্যবাদ-এ উভয়ের মধ্যেই ভেজালের সৃষ্টি হয় এবং উভয়ের ভেতর অধিকাংশ ইতর ও তুচ্ছ (مبتذل) প্রথা-পদ্ধতির অনুপ্রবেশ ঘটে। শেষ পর্যন্ত উভয়ের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণই কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়। বিস্তৃত বৌদ্ধ জগতে এবং তাদের সুদীর্ঘ শাসনামলে এমন কোন সংস্কারকের আবির্ভাব ঘটেনি যিনি প্রকৃত বৌদ্ধ-মতের দিকে মানবজাতিকে আহবান জানাবেন এবং পূর্ণ শক্তিতে এই নবসৃষ্ট বিকৃত ধর্মের মুকাবিলা করে মূল ধর্মের অতীত যৌবন, হৃত সারল্য, অনাড়ম্বরতা ও শুচি-শুভ্রতা পুনরায় ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হবেন।"[২]

মোটকথা, বৌদ্ধ-মত শেষ পর্যন্ত প্রাচীন হিন্দু ধর্মের সাথেও প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে পারেনি। এমন কি, খৃস্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে শংকরাচার্য[৩] বৌদ্ধ মতের বিরোধিতা এবং প্রাচীন হিন্দু ধর্মের প্রচার ও প্রসার ব্যাপদেশে পতাকা উত্তোলন করেন এবং শেষাবধি বৌদ্ধ-মতকে ভারতের মাটি থেকে উৎখাত করে ছাড়েন। বড় জোর বলা যেতে পারে যে, বৌদ্ধ-মত ভারতবর্ষের অনেক ধর্মের ভেতর একটি প্রাচীন ক্রমাবনতিশীল ও সীমিত ধর্মের মর্যাদা নিয়ে বেঁচে থাকে। শংকরাচার্য তাঁর নিজস্ব মেধা, ধর্মীয় প্রেরণা ও কর্ম প্রচেষ্টা দ্বারা বৌদ্ধ-মতকে ভারতের চৌহদ্দী থেকে মোটামুটি বহিস্কৃত করতে সক্ষম হন; অবশ্য তিনি প্রাচীন হিন্দু ধর্মকে তার আদি ও অকৃত্রিম রূপে ফিরিয়ে আনতে আদৌ সফলকাম হননি (সম্ভবত তিনি এ ধরনের কোন ইচ্ছাও পোষণ করেননি), সফলকাম হন নি এতে তওহীদের আকীদা, মহান বিশ্ব-স্রষ্টার সঙ্গে সরাসরি সম্পর্ক, আল্লাহ ও তাঁর বান্দাহর মধ্যবর্তী সকল মাধ্যমকে অস্বীকৃতি এবং সামাজিক ন্যায়-বিচার ও শ্রেণী সাম্যের প্রাণ-স্পন্দন সৃষ্টি করতে। অনন্তর অদ্যাবধি এ দু'টি ভারতীয় ধর্ম নিজেদের পরিবর্তিত কাঠামোর উপরেই টিকে আছে এবং পতন যুগের উত্তরাধিকার,

---

[১] তালাশ-ই-হিন্দ–২০১, ২০৩ পৃ.

[২] ঐ, ২০১, ২০৩ পৃ,

[৩] শংকরাচার্য অষ্টম শতাব্দীর শেষার্ধের একজন ধর্ম-সংস্কারক। ৩২ বছর বয়সে তিনি মারা যান

প্রথা-পদ্ধতি ও আচার-আচারণ এবং মূর্তিগুলোকে নিজেদের বুকের সঙ্গে লাগিয়ে রেখেছে। Encyclopaedia of Riligion and Ethics-এর নিবন্ধকার এলফিস্টন কলেজ, বোম্বাই-এর সংস্কৃত ভাষার অধ্যাপক V.S.Ghate- যিনি ভারতের প্রাচীন ধর্ম ও দর্শনের উপর গভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী- শংকরাচার্যের উল্লেখ করে লিখেছেন ঃ

তাঁর জীবনের সর্বাপেক্ষা বড় ও মহৎ উদ্দেশ্য ছিল সেই ধর্ম ও দর্শনকে জীবিত করা, উপনিষদে যার শিক্ষা প্রদান করা হয়েছিল। তিনি কেবল ওয়াহ্দাতুল-ওয়াজূদের আকীদাকে চালু করেন। তাঁর আসল উদ্দেশ্য ছিল এই প্রমাণ করা যে, উপনিষদ ও শ্রীমদ্ভগবত-গীতার মধ্যে কোন বিধিবদ্ধ আইন-কানুন পেশ করা হয়নি, বরং পরিপূর্ণ ওয়াহ্দাতুল-ওয়াজূদ -এর শিক্ষাই পেশ করা হয়েছে। শংকারাচার্য মূর্তিপূজার যেমন বিরোধিতা করেননি, তেমনি একে আক্রমণও করেন নি। তাঁর নিকট মূর্ত একটি রূপক বা ইঙ্গিতে স্রষ্টার প্রকাশ। শংকারাচার্য আনুষ্ঠানিক (Ritualism) আচার-আচরণের নিন্দা করেন, কিন্তু সাধারণ্যে প্রিয় দেব-দেবীর পূজা-অর্চনার পক্ষে ওকালতিও করেন। তাঁর মতে, লালন-পালন ও বিকাশে একটি বিশেষ পর্যায়ে মূর্তিপূজা আমাদের প্রকৃতির একটি অপরিহার্য অঙ্গ। যখন ধর্মীয় আত্মা (রূহ) পাকাপোক্ত ও সাবালকত্ব প্রাপ্ত হয় তখন মূর্তিপূজার প্রয়োজন আর থাকে না। আর শুধুমাত্র তখনই প্রতীক ও রূপক বা রহস্যপূর্ণ ইশারা-ইঙ্গিত (مـــوز) পরিত্যাগ করা উচিত যখন ধর্মীয় আত্মা পাকাপোক্ত ও সাবালকত্ব প্রাপ্ত হয়। শংকরাচার্য প্রতীক হিসাবে সে সব লোকের জন্য মূর্তিপূজার অনুমতি দেন যারা এমন ব্রাহ্মণের মর্যাদায় উপনীত হতে পারেনি যিনি যাবতীয় দোষ-গুণের উর্ধ্বে।"[১]

যা-হোক সে সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায় যা শংকরাচার্য থেকে দয়ানন্দ সরস্বতী ও গান্ধীজি পর্যন্ত চলেছে এবং যেগুলোর উদ্দেশ্য ছিল এই ধর্মকে সেই সঠিক ও বিশুদ্ধ বুনিয়াদের উপর পুনরুজ্জীবিত করা, যা নবীদের দা'ওয়াত, মানুষের সুস্থ প্রকৃতি এবং পরিবর্তনশীল যুগ-সব কিছুর সঙ্গেই সামঞ্জস্যশীল হবে। উল্লিখিত দু'টি ধর্মই শেষ পর্যন্ত বস্তুবাদ ও ধর্মহীনতার সম্মুখে একেবারে হাত-পা ছেড়ে দিয়ে আত্মসমর্পণ করে বসে এবং জীবন থেকে নিজকে সরিয়ে নিয়ে উপাসনা গৃহ ও তীর্থকেন্দ্রে আশ্রয় নেয় এবং

[১] তালাশ-ই-হিন্দ (Didcovery of India)–২০১,২০৩।

আচার-অনুষ্ঠান ও প্রথা-পদ্ধতি এবং বাহ্যিক রূপ-কাঠামোর মধ্যে বন্দী হয়ে পড়ে। ভারতবর্ষে এমন কোন শক্তিশালী দা'ওয়াত নেই যার ধ্বনি এবং ঘোষণা হবে এই যে, "পুনরায় ধর্মের পথে ফিরে এস" এর বিপরীতে বরং ঐ সব আন্দোলন খুবই সক্রিয় ও শক্তিশালী হয়ে ওঠে, যার ধ্বনি ও মূলনীতি হল, "নিজেদের পুরনো সভ্যতাকে বাঁচিয়ে তোল এবং ভারতবর্ষের প্রাচীন ও ঐতিহাসিক ভাষা সংস্কৃতকে পুনরায় চালু কর।"

ধর্মের জন্য জীবিত ব্যক্তির প্রয়োজন

প্রকৃতপক্ষে কোন ধর্মই সে পর্যন্ত বেঁচে থাকতে পারে না, নিজের বৈশিষ্ট্য বেশীদিন ধরে রাখতে পারে না, পরিবর্তনশীল জীবনের উপর প্রভাব ফেলতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না মাঝে মাঝে তার মধ্যে এমন সব ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটে যাঁরা নিজেদের অসাধারণ বিশ্বাস, আধ্যাত্মিকতা, নিঃস্বার্থপরতা, ত্যাগ এবং উন্নত মানের মেধা ও আত্মিক যোগ্যতা দ্বারা তার অসাড় দেহে নবতর জীবনের সৃষ্টি করবেন, তার অনুসারীদের মাঝে নতুন আস্থা ও অনপ্রেরণার সৃষ্টি করবেন। জীবনের চাহিদা নিত্য-নতুন এবং বস্তুবাদের বৃক্ষ বসন্তের সবুজ সমারোহে পল্লবিত। প্রবৃত্তি পূজার আন্দোলন ও প্রবৃত্তি পূজা ভিত্তিক ধর্মের জন্য বস্তুতপক্ষে কোন রেনেসাঁর প্রয়োজন নেই। কেননা এর প্রেরণা ও উৎসাহদাতা বস্তুসমূহ পদে পদে বিদ্যমান। কবির ভাষায় –

اگرچہ پیر ہے مؤمن جواں ہے لات و منات

"যদিও ঈমানদার বৃদ্ধ, লাত ও মানাত কিন্তু যুবক।"

অতএব যতক্ষণ পর্যন্ত ধর্ম একটি নতুন জীবন ও নতুন শক্তির সঙ্গে ময়দানে অবতরণ না করবে এবং মাঝে মাঝে এর সংস্কার না হতে থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত জীবন্ত বস্তুবাদের মুকাবিলায় তার বেঁচে থাকাটা প্রায় অসম্ভব।

প্রতিটি নতুন ফিত্না ও বিপদের জন্য নতুন ব্যক্তিত্ব ও শক্তি

এই বাস্তবতাকে কেউ অস্বীকার করতে পারবে না যে, ইসলামের এই দীর্ঘ ও ঘটনাবহুল ইতিহাসে স্বল্প থেকে স্বল্পতম সময় কালও এমন পাওয়া যায় না–যেখানে ইসলামের প্রকৃত দা'ওয়াতের কাজ একেবারে বন্ধ হয়ে গেছে, ইসলামের প্রকৃত সত্য (হাকীকত) একেবারে অন্তরালে হারিয়ে গেছে, মুসলিম জাতির বিবেক একেবারে অনুভূতিশূণ্য হয়ে পড়েছে কিংবা সমগ্র

মুসলিম জাহান অন্ধকারে ছেয়ে গেছে। এটি একটি ঐতিহাসিক ঘটনা যে, যখনই ইসলামের সামনে কোন নতুন ফিতনা এসেছে, ইসলামকে বিকৃত ও কদাকার করার চেষ্টা করা হয়েছে কিংবা বস্তুবাদের কোন শক্ত হামলা এসেছে–তখনই এমন কোন শক্তিশালী ব্যক্তিত্ব অবশ্যই ময়দানে এসে গেছেন, যিনি পূর্ণ শক্তিতে সেই ফিতনার মুকাবিলা করেছেন এবং তাকে ময়দান থেকে ঝেটিয়ে বিদায় করেছেন। বহু দা'ওয়াত ও বিপ্লবী আন্দোলন এমনও আছে যেগুলো স্বীয় যুগে খুবই শক্তিশালী ছিল, কিন্তু আজ তার অস্তিত্ব কেবল কিতাবের পাতায় রয়েছে, এমনকি তার হাকীকত অনুধাবন করাও আজ মুশকিল। কাদরিয়া, জাহমিয়াঁ, মু'তাযিলা মতবাদ, খালক-ই-কুরআন, ওয়াহ-দাতুল-ওয়াজূদ এবং আকবরের দ্বীন-ই-ইলাহীর হাকীকত ও বিস্তারিত তথ্যাদি সম্পর্কে ওয়াকিফহাল লোকের সংখ্যা আজ কতই বা হবে, অথচ স্ব-স্ব যুগে এসব মতবাদ বিরাট গুরুত্বপূর্ণ আকীদা ও ধর্ম হিসাবে খ্যাত ছিল। এগুলোর ভেতর কতকগুলোর পৃষ্ঠপোষক তো বিরাট বিশাল সাম্রাজ্য এবং বিরাট মেধাসম্পন্ন, প্রতিভাধর ও সুযোগ্য ব্যক্তিত্ব ছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ইসলামের হাকীকত সে সব আকীদা ও ধর্মের উপর বিজয়ী হয় এবং কিছুদিন পর সে সব জীবন্ত আন্দোলন ও সরকারী ধর্ম শুধুমাত্র জ্ঞানগর্ভ আলোচনার বিষয়-বস্তুতে পরিণত হয়, এবং কেবলমাত্র 'ইল্ম-ই-কালাম ও আকাইদ' শাস্ত্রের ইতিহাস গ্রন্থের পাতায় আশ্রয় নেয়। দ্বীনের হেফাজতে এই চেষ্টা-সাধনা, রেনেসাঁ ও বিপ্লবী প্রয়াস এবং দা'ওয়াত ও সংস্কার-সংশোধনের এই ধারাবাহিকতা ততটাই প্রাচীন যতটা প্রাচীন ইসলামের ইতিহাস এবং ততটাই সূত্র-পরম্পরা যতটা সূত্র-পরম্পরা মুসলিম জীবন।

ইতিহাসের লুপ্ত-প্রায় উৎস

এই গুরুদায়িত্ব কেবল ঐতিহাসিকের উপর অর্পিত নয়, বরং-এর যিম্মাদার সেই সব লোকও যারা ইতিহাসের পারিভাষিক এবং সরকারী মর্যাদা ভিন্ন আর কোন মর্যাদা মেনে নিতে প্রস্তুত নন এবং তারা এমন কোন পুস্তককেও নির্ভরযোগ্য মনে করেন না, যা কোন 'কুতুবখানায় ইতিহাসের আলমারীতে স্থান পায়নি কিংবা ইতিহাস শাস্ত্রের আওতায় লিপিবদ্ধ হয়নি। অথচ এধরনেরই বহু গ্রন্থ নিজের মধ্যে ইতিহাসের বহু মূল্যবান সম্পদ ও গুরুত্বপূর্ণ উৎস ধরে রেখেছে। এগুলো সেই সব সাহিত্য ও ধর্মীয় গ্রন্থ যার ভেতর মুসলিম উম্মার স্বনামখ্যাত দা'ঈ ও সংস্কারকগণ নিজেদের অন্তরের অনুভূতি ও মন-মানসের পর্দা উন্মোচন করেছেন এবং নিজেদের জীবনের

গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী ও অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করেছেন। এগুলো সেই সব গ্রন্থ যার মধ্যে সংস্কারকদের শাগরিদ ও মুরীদবর্গ আপন আপন উস্তাদ ও শায়খগণের নসীহত ও বাণীসমষ্টি এবং হাকীকত ও মা'রিফত লিপিবদ্ধ করেছেন এবং তাঁদের প্রভাবমণ্ডিত ও বরকতপূর্ণ মজলিসের রোয়েদাদ পেশ করেছেন। এসব চিঠি-পত্র ও ওয়াজ-নসীহতের সংকলন দ্বারা ঐসমস্ত ব্যক্তিবর্গের ধ্যান-ধারণা, চিন্তা-ভাবনা এবং আবেগ-অনুভূতির সঠিক পরিমাপ করা যায়। ঐ সব গ্রন্থে সামাজিক খতিয়ানের উপর সমালোচনা এবং বিদ'আত ও গর্হিত কাজ-কর্ম রদ ও বাতিলের বিবরণী রয়েছে। আমাদের অধ্যয়ন যদি নির্ধারিত সীমা থেকে সম্মুখে অগ্রসর হয়ে ঐসব গুরুত্বপূর্ণ ও লুপ্ত ঐতিহাসিক উৎস পর্যন্ত প্রসারিত হয় এবং কোন দূর-দৃষ্টিসম্পন্ন সমালোচক এবং সাহসী বিজ্ঞ দার্শনিক ও পণ্ডিত এই বিষয়ের উপর কায়মনে কাজ করেন তাহলে একটি সুসমন্বিত, সুসংবদ্ধ ও পূর্ণাঙ্গ রেনেসাঁ আন্দোলনের ইতিহাস অনায়াসে উদ্ধার করা যাবে। তখন আমাদের পরিষ্কার দৃষ্টিগোচর হবে যে, ইসলামী রেনেসাঁ ও পূনর্জাগরণের অস্তিত্ব এই মুসলিম উম্মার প্রতিটি যুগে এবং প্রতিটি পর্যায়ে বিদ্যমান ছিল। আল্লাহর এই অবদান থেকে তারা কখনো মাহরূম বা বঞ্চিত থাকেনি।

ইসলামের উত্তরাধিকার

এই উত্তরাধিকার (মীরাছ) যা আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে (এবং আমরা যার উত্তরাধিকারী) সেই অর্থে উত্তরাধিকার নয় যে অর্থে পাশ্চাত্যের লোকেরা বুঝেছে। এটা এজন্য যে, ইসলাম একটি জীবন্ত ও চিরন্তন জীবন-বিধান (দ্বীন)। আমরা উত্তরাধিকার বলতে সেই দৌলত ও মূল্যবান সম্পদ বুঝে থাকি যা আমাদের পূর্বপুরুষ থেকে বংশ ও সূত্র-পরম্পরায় আমাদের দিকে হস্তান্তরিত হয়ে চলে এসেছে। আর তা হল-বদ্ধমূল জ্ঞান, সংরক্ষিত ও সুদৃঢ় আকীদা, শক্তিশালী ঈমান, সুন্নাত (আদর্শ), উন্নত ও মহান চরিত্র, ফিক্হ ও শরীয়ত এবং শানদার ইসলামী সাহিত্যের মূল্যবান সম্পদ। এই উত্তরাধিকারে 'এমন প্রতিটি ব্যক্তিরই পরিপূর্ণ অংশ রয়েছে, যিনি ইসলামের কোন একটি যুগে মিনহাজুন-নবুওয়াতের উপর খিলাফত কায়েম করেছেন, জাহিলিয়াত ও বস্তুবাদের মুকাবিলা করেছেন, আল্লাহর দিকে আহবান জানিয়েছেন, ইসলামের যে বৈশিষ্ট্যসমূহ মিটে গিয়েছিল সেগুলোকে উজ্জ্বল ও প্রোজ্জ্বল করেছেন, উম্মার মধ্যে ঈমানী রূহ সৃষ্টি করেছেন।

এই অবিনশ্বর সম্পদে এমন প্রতিটি লোকেরই অংশ রয়েছে যিনি এই দ্বীনের উপর তার উৎস ও টীকা-ব্যাখ্যার উপর নির্ভরযোগ্যতার দিকটি নতুনভাবে ঢেলে সাজিয়েছেন, নবোদ্ভূত ও নতুন অবতারিত দর্শনকে বাতিল করে ইসলামের প্রকৃত চিন্তাধারার উন্মেষ ঘটিয়েছেন এবং এই উম্মাহকে কোন না কোন নবতর ফিতনার মধ্যে নিক্ষিপ্ত হবার হাত থেকে বিরত রেখেছেন। যিনি এই উম্মতের জন্য তার ধর্ম (দ্বীন) এবং ধর্মের মূল উৎসসমূহের হেফাজত করেছেন, হাদীছ ও ফিকহ শাস্ত্র নতুন করে সম্পাদনের দায়িত্ব আনজাম দিয়েছেনম ইজতিহাদের দ্বারোদঘাটন করেছেন, উম্মাহকে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের অফুরন্ত ভাণ্ডার এবং জীবন ও সামাজিকতার সু-শৃঙ্খল বিধান দান করেছেন, সমাজে হিসাব-নিকাশ ও খতিয়ানের ফরয আদায় করেছেন, এর থেকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন ও অবহেলাকে পরিষ্কারভাবে সমালোচনা করেছেন,–সঠিক, বিশুদ্ধ ও প্রকৃত ইসলামের দিকে খোলাখুলি ও প্রকাশ্য দাওয়াত দিয়েছেন, যিনি সন্দেহ ও সংশয়ের যুগে এবং অস্বস্তিকর ও বিব্রত আকীদার যামানায় জ্ঞানগত যুক্তি ও প্রমাণ-পদ্ধতি অবলম্বন করত মস্তিষ্ককে তৃপ্ত করতে কোশেশ করেছেন এবং একটি নতুন ইল্ম-ই-কালাম (কালাম শাস্ত্র)-এর ভিত্তি স্থাপন করেছেন।

যিনি দাওয়াত ও যিকর-আযকার ভীতি প্রদর্শন ও সুসংবাদ প্রদানের ক্ষেত্রে আম্বিয়া-ই-কিরাম (আ.)-এর প্রতিনিধিত্ব করেছেন এবং ঈমানের চাপাপড়া অগ্নিস্ফুলিঙ্গকে উত্তাপ ও গতিশীলতা দান করেছেন, যিনি বস্তু-পূজার চঞ্চল ও বেগবান গতিধারার সামনে খাড়া হয়ে তার গতিবেগকে কমিয়ে দিয়েছেন এবং আল্লাহর মাখলূককে সেই ধারায় ভেসে যাবার কিংবা চাপা পড়ার হাত থেকে মাহ্ফূজ রেখেছেন, যিনি এই উম্মতের রাজনৈতিক শক্তির হিফাজত করেছেন এবং তাকে উপর্যুপরি বহিরাক্রমণ সইবার শক্তি দান করেছেন, যিনি বিজ্ঞ ও পাণ্ডিত্যসুলভ দাওয়াত এবং স্বীয় মুহব্বতের জালে আবদ্ধ হয়ে সেই শত্রুকেও শিকার করেছেন যার তলোয়ারের শক্তি ও খঞ্জরের অগ্রভাগ অবনমিত ও পর্যুদস্ত হয়নি, যিনি স্বীয় শক্তিশালী ঈমান ও রূহানী কুওয়তের দ্বারা এমন দুশমনকেও ইসলামের আওতায় টেনে এনেছেন এবং মুহাম্মদ (সা.)-এর গোলামীতে নিয়োজিত করে তার জীবনকে ধন্য করেছেন যে তার শক্তিশালী সাহিত্য এবং হৃদয়স্পর্শী ও অলংকারপূর্ণ কাব্য-প্রতিভা দ্বারা অন্যের মস্তিষ্ককে আবিষ্ট ও বন্দী করতে সক্ষম হয়েছিল এবং যে

ইসলামের জ্ঞানপূর্ণ ও বিজ্ঞ আলাপচারিতা এবং ধর্মীয় দর্শন দ্বারা তৃপ্ত হবার ছিল না। এটি একটি ধারাবাহিক কার্যক্রম এবং এতে প্রতিটি ব্যক্তিত্বের একটি বিশেষ হিস্যা ও মরতবা রয়েছে।

ইতিহাস আসলে আমানতের দায়িত্ব পালন এবং প্রকৃত সত্যকে স্বীকার করারই নাম। এর মধ্যে প্রতিটি ব্যক্তিই ইসলামের কোন না কোন সীমান্তের মুহাফিজ (রক্ষক) ছিলেন। যদি তাঁরা ঐকান্তিক নিষ্ঠার সঙ্গে তাঁদের সাধনা ও কোশেশ অব্যাহত না রাখতেন, যাকে আমরা ইতিহাসের দূরবীন দ্বারা দেখার প্রয়াস পাচ্ছি, তাহলে আমাদের কাছে ঐসব বিরাট সংকলন-ভাণ্ডার পৌঁছুতে পারত না, যার ভেতর আমাদের জন্য ইয্যত, শিক্ষা ও উপদেশের প্রচুর উপকরণ ও সরঞ্জাম মওজুদ রয়েছে এবং যার কারণে আমরা বিশ্বের তাবৎ জাতিগোষ্ঠীর সামনে গর্বে মাথা উচুঁ করে দাঁড়াতে পারি। এই পথ এবং এই চিহ্নিত রেখা অবলম্বনে (যা গ্রন্থকারের নিকট ন্যায় ও সুবিচারসম্মত পথ) সামনের পৃষ্ঠাগুলোতে সেসব গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্বের চিত্র পেশ করার কোশেশ করা হবে যাঁরা ইসলামের রেনেসাঁ এবং সংস্কার ও সংশোধনের ক্ষেত্রে কোন না কোন উল্লেখযোগ্য খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন।

অনুবাদ- আবু সাইদ মুহাম্মাদ ওমর আলী

আরকানে আরবা'আ

সিয়ামের হাকীকত ও মর্ম সংরক্ষণের ব্যবস্থা

রমযান হচ্ছে একটি সার্বজনীন ইবাদত। মুসলিম উম্মাহর প্রতিটি সক্ষম ও প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির উপরই সিয়াম ফরয। রমযানুল মুবারকের এই সার্বজনীনতা ও ব্যাপকতার কারণে এ আশংকা পুরোমাত্রায় বিদ্যমান ছিলো যে, অন্যান্য ধর্মের মতো একদিন হয়তো এই ইসলামী সিয়ামও সীমাবদ্ধ হয়ে পড়বে প্রাণহীন আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে। হয়তো অনেক লোক সমাজ ও পরিবেশের চাপে পড়েই শুধু সিয়াম পালন করবে। আল্লাহর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ ও তাঁর সন্তুষ্টি লাভের পরিবর্তে মানুষের সমালোচনা থেকে রেহাই পাওয়া কিংবা ধার্মিকরূপে প্রশংসা কুড়ানোই হবে সে সিয়ামের উদ্দেশ্য। আল্লাহর প্রতিশ্রুতি মুতাবিক উত্তম বিনিময় লাভের সুসংবাদের উপর বিশ্বাস তার অন্তরে থাকবে অনুপস্থিত। আবার অনেকে হয়তো নিছক স্বাস্থ্যগত উপকারের কথা ভেবেই সিয়াম পালন করবে। এভাবে সিয়ামের আসল উদ্দেশ্যই পণ্ড হয়ে যাবে। মানুষের এ দুর্বলতার কথা আল্লাহর পেয়ারা রসূলের অগোচরে ছিলো না। তাই এর প্রতিকারের ব্যবস্থাও তিনি করে গেছেন। অত্যন্ত সুস্পষ্ট ভাষায় উম্মাহকে সতর্ক করে দিয়ে তিনি ইরশাদ করেছেন যে, সিয়ামের উদ্দেশ্য হতে হবে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন এবং শুধুই আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন। কেননা এমন সিয়ামই শুধু আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য যার মূল উপাদান হচ্ছে ঈমান ও ইহ্তিসাব (সাওয়াব প্রাপ্তি)। ইরশাদ হয়েছে – "যে ব্যক্তি ঈমান ও ইহ্তিসাব তথা আল্লাহকে নিবেদন করে সিয়াম পালন করবে তার পূর্ব জীবনের সকল পাপরাশি ক্ষমা করে দেয়া হবে।"

(বুখারী, মুসলিম)

মানুষের স্বভাব ও ফিতরাতের দুর্বলতম স্থানটি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল নয় এমন যে কোন ব্যক্তির কাছে উপরোক্ত হাদীস শরীফে ঈমান ও ইহতিসাবের শর্তারোপের বিষয়টি আপাতঃ দৃষ্টিতে অপ্রাসঙ্গিক ও অযৌক্তিক মনে হতে পারে। কেননা রমযানের সিয়াম তো কেবল মুসলমানগণই পালন করে থাকে এবং তা আল্লাহর সন্তুষ্টি ও উত্তম বিনিময় লাভের প্রত্যাশা নিয়েই। অতএব নতুন করে ঈমান ও ইহ্তিসাবের শর্ত উত্থাপন একান্তই অপ্রয়োজনীয়। কিন্তু

মানব চরিত্রের গভীরে যারা প্রবেশ করেছেন এবং মানুষের সূক্ষ্মাতি-সূক্ষ্ম অনুভূতি ও দুর্জ্ঞেয় মনস্তত্ব সম্পর্কে যাদের স্বচ্ছ ধারণা আছে রসূলুল্লাহর এই সুদূরপ্রসারী ও মহাপ্রজ্ঞাপূর্ণ ব্যবস্থাপত্র দেখে অবশ্যই তারা বিস্ময়ে, মুগ্ধতায়, ভক্তি ও শ্রদ্ধায় মস্তক অবনত করে দিবে এবং মুক্ত কণ্ঠে এ কথা স্বীকার করে নিতে বাধ্য হবে যে, আল্লাহর রসূল নিজে থেকে কখনো কিছু বলেন নি। যা কিছু বলেছেন আহ্কামুল হাকিমিনের নির্দেশেই বলেছেন, ঈমান ও ইহ্তিসাবের ব্যাখ্যা প্রসংগে অপর এক হাদীসে ইরশাদ হয়েছে– "(ঈমান ও ইহ্তিসাবের অর্থ হলো) মানুষ তার যাবতীয় কাজকর্ম ও ইবাদত একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন ও উত্তম বিনিময় লাভের প্রত্যাশায় করবে।"

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আ'স (রা.) রেওয়ায়েত করেছেন, "রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহিওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ যে ব্যক্তি সওয়াবের প্রত্যাশা ও বিশ্বাস নিয়ে তার সকল কাজ আঞ্জাম দিবে আল্লাহ্ তাকে এই বিশ্বাস ও প্রত্যাশার বিন্নিয়ে জান্নাত দিবেন।" (বুখারী)

সিয়ামের বাহ্যরূপ তথা বিধি-বিধানের উপর গুরুত্বারোপের সাথে সাথে ইসলামী শরীয়ত সিয়ামের উদ্দেশ্য, হাকীকত ও মর্ম অনুধাবন এবং সংরক্ষণেরও আহবান জানিয়েছে সমান গুরুত্বের সাথে। একদিকে সে যেমন নির্দেশ দিয়েছে পানাহার বর্জন ও জৈবিক চাহিদা পরিহার করে চলার, অন্যদিকে সে অত্যন্ত জোড়ালো ভাষায় আহবান জানিয়েছে এমন সব অন্যায় ও অপরাধ সযত্নে পরিহার করে চলার, যা সিয়ামের ঐতিহ্য বিনষ্টকারী, সিয়ামের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের পরিপন্থী এবং সিয়ামের নৈতিক ও চারিত্রিক সুফল লাভের পক্ষে অন্তরায়। সিয়াম হচ্ছে তাকওয়া ও হৃদয়ের পবিত্রতা, শালীনতা, উন্নত নৈতিকতা এবং আত্মার সজীবতা ও চিন্তার বিশুদ্ধতা অর্জনের এক বলিষ্ঠ মাধ্যম। তাই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহিওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ "সিয়ামরত অবস্থায় তোমাদের কেউ যেন অশালীন ও অর্থহীন কথাবার্তায় লিপ্ত না হয়। কেউ যদি তাকে অশালীন কথা বলে কিংবা তার সাথে অকারণে বাদানুবাদে লিপ্ত হতে চায় তবে সে যেন একথা বলে দেয় যে, আমি রোযাদার। (বুখারী)

আল্লাহর পেয়ারা হাবীব আরো ইরশাদ করেছেন ঃ "যে রোযা রেখেছে অথচ মিথ্যাচার পরিহার করেনি তার এই কৃত্রিম পানাহর বর্জনের কোন প্রয়োজন আল্লাহর নেই।" (বুখারী, মুসলিম)

বস্তুতঃ যে সিয়াম তাকওয়া ও হৃদয়ের পবিত্রতা শূন্য এবং চারিত্রিক মাহাত্ম্য ও চিন্তার বিশুদ্ধতা বঞ্চিত সে সিয়াম হচ্ছে প্রাণহীন এক দেহ যা শুধু স্বাস্থ্যহীনতা ও দুর্গন্ধই ছড়ায়। হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে –

অনেক সিয়াম পালনকারী এমন যাদের ক্ষুধার্ত ও পিপাসার্ত থাকাই সার হয়েছে। তদ্রুপ অনেক ইবাদতগুযার এমন যাদের বিনিদ্র রাত কাটানোই সার হয়েছে। (বুখারী, আবু দাউদ ও তিরমিযী)

হযরত আবু উবায়দা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, 'সিয়াম হচ্ছে ঢাল স্বরূপ। যদি না সে নিজেই তা ফুটো করে দেয়। (নাসাঈ শরীফ)

'আওসাত' গ্রন্থে উপরোক্ত হাদীসের সাথে একথাও আছে যে, "সাহাবাগণ আরয করলেন, কোন জিনিস দ্বারা তা ফুটো হয়ে যায় ? ইরশাদ হলো, "মিথ্যা কথা ও গীবত দ্বারা।"

ইসলামী সিয়াম শুধুমাত্র গুটিকতেক নেতিবাচক বিষয় ও নির্দেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। বরং অনেক ইতিবাচক বিষয় ও নির্দেশও এর অন্তর্ভুক্ত। সিয়ামকে যেমন নির্দেশ দেয়া হয়েছে পানাহার ও জৈবিক চাহিদা বর্জনের, গীবত ও পরচর্চা পরিহারের ঝগড়া-বিবাদ ও যাবতীয় অশ্লীলতা ত্যাগ করার, তদ্রুপ অত্যন্ত কঠোর তাগিদের সাথে তাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে ইবাদাত, তিলাওয়াত, যিক্‌র ও তাসবীহে মগ্ন থেকে এবং সমবেদনা, সহানুভূতি, সদয় আচরণ ও দানশীলতার মাধ্যমে পরকালীন কল্যাণ ও মুক্তির পথ প্রশস্ত করে নেয়ার। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ

"রমযানুল মুবারকে যে কেউ কোন একটি নেক আমল দ্বারা আল্লাহর নৈকট্য ও সন্তুষ্টি অর্জন করতে চাইবে তার সে আমল অন্য সময়ের ফরযের তুল্য গণ্য করা হবে এবং যে ব্যক্তি রমযানুল মুবারকে একটি ফরয আদায় করবে সে অন্য সময়ের সত্তরটি ফরযের তুল্য পূণ্য অর্জন করবে। এটা ধৈর্যের মাস এবং ধৈর্যের বিনিময় হচ্ছে জান্নাত। আর এই মাস মানুষের প্রতি সমবেদনা ও সহানুভূতি প্রকাশের মাস।"

(বায়হাকী, হযরত সালমান ফারসী (রা.) থেকে)

হযরত যায়েদ ইবনে খালিদ জুহানী (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

"কোন রোযাদারকে যে ব্যক্তি ইফতার করাবে সে উক্ত রোযাদারের বরাবর সাওয়াব লাভ করবে। অথচ এর কারণে রোযাদারের পূণ্য হ্রাস করা হবে না।" (তিরমিযী শরীফ)

এই উম্মাহর উপর আল্লাহর আরেকটি বিশেষ নিয়ামত ও দান এই যে, মুসলমানদের হৃদয়ে সারা দিনের সিয়াম সাধনার পর তারাবীহ্‌র সালাতকেও নিষ্ঠার সাথে পালন করার জন্য অফুরন্ত উৎসাহ, উদ্দীপনা ও জযবা দান করেছেন। তারাবীহ্‌র সালাতের প্রতি যুগে যুগে এ উম্মাহ যে গভীর দরদ ও অন্তরঙ্গ প্রেমের পরিচয় দিয়ে এসেছে তার তুলনা ধর্মের ইতিহাসে মেলা ভার।

বস্তুতঃ বহু প্রামাণ্য হাদীস গ্রন্থেই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইমামতিতে সালাতে তারাবীহ্‌ অনুষ্ঠিত হওয়ায় কথা উল্লেখ আছে। তবে একাধারে তিনদিন জামা'আতের সাথে তারাবীহ্‌ আদায়ের পর জামা'আত অনুষ্ঠান থেকে তিনি বিরত হন। কেননা তাঁর আশংকা হচ্ছিল যে, হয়তো এটা ফরয করে দেয়া হবে আর উম্মতের জন্য তা কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আন্‌হা থেকে বর্ণিত আছে যে, এক রমযানের রাতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেশ বিলম্ব করে ঘর থেকে বের হলেন এবং মসজিদে সালাত আদায় করলেন। তাঁর সাথে আরো কিছু লোক সালাত আদায় করলো। সকালে ব্যাপারটা জানাজানি হলো। ফলে দ্বিতীয় রাতে আরো বেশী সংখ্যক লোক সে জামাআতে শরীক হলো। সকালে ব্যাপারটা আরো জানাজানি হলো। ফলে তৃতীয় রাতে মুসল্লীদের সংখ্যা অত্যধিক বৃদ্ধি পেলো। তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাইরে তাশরীফ নিয়ে গেলেন এবং সালাত আদায় করলেন। সকলেই তার পিছনে জামা'আত আদায় করলো।

চতুর্থ রাতে মুসল্লীদের প্রচণ্ড ভিড়ে মসজিদে স্থান সংকুলান হলো না। সকলেই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহিওয়াসাল্লামের অপেক্ষায় বসে রইলো। ফজরের নামাযের সময় তিনি মসজিদে তশরীফ আনলেন এবং সালাত আদায়ের পর সমবেত সাহাবাদের লক্ষ্য করে বললেন, তোমাদের উপস্থিতি আমার অজ্ঞাত ছিলো না। কিন্তু আমার ভয় হচ্ছিলো যে, শেষে হয়তো এই সালাত তোমাদের উপর ফরয করে দেয়া হবে। আর তোমরা তা পালন

করতে অপারগ হয়ে যাবে। রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের পরও এ অবস্থা বিদ্যমান ছিলো। (বুখারী)

তারপর সাহাবাগণ সর্বসম্মতভাবে তারাবীহ্‌র জামা'আত শুরু করলেন। বলাবাহুল্য সালাতে তারাবীহের ব্যাপারেও তারা তাদের স্বভাবসুলভ নিষ্ঠা ও একাগ্রতার পরিচয় দিয়েছেন।

সাহাবাকেরামের পর পরবর্তীকালের উম্মত উত্তরাধিকার সূত্রে এ মহামূল্যবান সম্পদ লাভ করলো এবং এর হিফাজত ও সংরক্ষণের ব্যাপারেও তারা অত্যধিক যত্নবান ছিলো। এমনকি এটা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত তথা হকপন্থীদের বৈশিষ্ট্য ও প্রতীক রূপে স্বীকৃতি লাভ করলো। হিফ্‌জে কুরআনের এই ব্যাপক প্রসারের ক্ষেত্রেও সালাতে তারাবীহ্‌র অবদান অনস্বীকার্য। হাফিজ সাহেবগণ সারা বছর ধরে কুরআন তিলাওয়াতে মগ্ন থাকেন এবং রমযানুল মুবারকে তারাবীহ্‌র জামা'আতে খতমে কুরআন অনুষ্ঠানের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। কত লক্ষ পবিত্র সিনায় এরই বদৌলতে আল্-কুরআন আজ সংরক্ষিত হয়ে আছে। পৃথিবীর সকল তাগুতি শক্তি মিলে প্রচার ও প্রকাশনার যাবতীয় উপায়-উপকরণ ব্যবহার করেও কি আল্-কুরআনের একটি হরফের সামান্য পরিবর্তন সাধন করতে পারবে? সালাতে তারাবীহ্‌র আরেকটি বড় ফায়দা এই যে, এর বদৌলতে সাধারণ মুসলমানগণ আংশিকভাবে হলেও রাত্রি জাগরণ ও ইবাদতের সৌভাগ্য লাভ করার সুযোগ পাচ্ছেন।

বস্তুতঃ জীবন্ত হৃদয়ের অধিকারী ব্যক্তি মাত্রই জানেন যে, রমযানুল মুবারক হচ্ছে ইবাদত, তিলাওয়াত ও সৎকাজের মাধ্যম আল্লাহর বিশেষ করুণা ও সন্তুষ্টি লাভের মৌসুম। কোকিল যেমন বসন্তের আগমন অপেক্ষায় কাটিয়ে দেয় শরৎ ও হেমন্তকাল। আল্লাহর নেক বান্দারাও তদ্রুপ রমযানের নতুন চাঁদের অপেক্ষায় কাটিয়ে দেয় সারা বছর। বসন্তের আগমন আনন্দে কোকিল যেমন বাগান মুখরিত করে তোলে তার সুমিষ্ট স্বরের কলকাকলিতে, তেমনি আল্লাহর ঘর মসজিদেও রমযানের সারা মাস মুখরিত থাকে তিলাওয়াত ও যিকিরের গুঞ্জরনে এবং আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের রাত্রি জাগরণে। বসন্তের আগমনে বাগান যেমন লাভ করে সবুজের স্নিগ্ধ পরশ, আমোদিত হয় ফুলের মন মাতানো সৌরভে, আল্লাহর নেক বান্দাদের হৃদয় উদ্যানও রমযানের শুভাগমনে লাভ করে এক অপূর্ব সবুজ সজীবতা। ইবাদতের আগ্রহ, আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তনের ইচ্ছা, সৎকাজের আকাঙ্খা

হৃদয়ের আর্দ্রতা এবং লজ্জা ও অনুশোচনার দাহন এতো প্রচণ্ডতা ও তীব্রতা লাভ করে যা অন্য মাসে কল্পনাও করা যায় না। আর এটা শুধু এই উম্মাহরই একক বৈশিষ্ট্য। দুনিয়ার অন্য কোন জাতির ইতিহাসে এর তুলনা পাওয়া যায় না। "সেটা আল্লাহর দান, যাকে ইচ্ছা দান করেন। আর আল্লাহর দান অপরিসীম।"

মুসলমানদের ক্ষমাহীন উদাসীনতা

তিক্ত হলেও এ সত্য অস্বীকার করার কোন উপায় নেই যে পরবর্তীকালের মুসলমানগণ রমযানুল মুবারকের প্রতি অমার্জনীয় উদাসীনতা প্রদর্শন করেছে এবং নিদারুণ ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে এই পবিত্র মাসের মর্যাদা ও পবিত্রতা রক্ষায়। ফলে মুসলিম উম্মাহ্ রমযানুল মুবারকেও সিয়ামের কাঙ্খিত ফল লাভ থেকে হয়েছে বঞ্চিত। ইফতারের সুন্নাতকে তারা পরিণত করেছে ব্যয়বহুল এক বিলাসী ভোজ অনুষ্ঠানে। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় যেন সারা দিনের ক্ষুধা ও পিপাসার মূল্য সুদে-আসলে আদায় করে নিতে তারা বদ্ধ-পরিকর। ফলে সিয়ামের ঐতিহ্যই কেবল ক্ষুন্ন হয়নি; বরং নৈতিক ও আধ্যাত্মিক সংশোধনের ক্ষেত্রেও সিয়াম একেবারেই শক্তিহীন হয়ে পড়েছে।

ইমাম গাযালী রহমাতুল্লাহি আলাইহি অত্যন্ত প্রজ্ঞাপূর্ণভাবে এ বিষয়টির উপর আলোকপাত করেছেন। তিনি লিখেছেন ঃ

"সিয়ামের কাঙ্খিত ফল লাভের জন্য একটি অন্যতম শর্ত এই যে, হালাল খাদ্য গ্রহণের বেলায়ও যথেষ্ট সংযমের পরিচয় দিতে হবে। এতো অধিক পরিমাণ কিছুতেই খাওয়া উচিত নয়, যার পর আর একটি গ্রাসেরও অবকাশ না থাকে। কেননা পূর্ণ উদর আল্লাহর কাছে খুবই নিন্দনীয়। ইফতারের উদ্দেশ্য যদি হয় সারা দিনের উপবাসের মূল্য সুদে-আসলে আদায় করে নেয়া, তবে সে সিয়াম নফসের খাহেশাত তথা পাশবিকতা দমনে কি সাহায্য করতে পারে? এ অপচয়মূলক অভ্যাস মুসলমানদের মধ্যে এতটাই শিকড় গেড়ে বসেছে যে, অনেকেই সারা বছর ধরে রমযানের জন্য খাদ্য-সম্ভার সংগ্রহের আয়োজনে মগ্ন থাকে। আর রমযানে এতো রকমারি ও উপাদেয় খাদ্য প্রস্তুত করা হয় যার সিকি ভাগও অন্যান্য মাসে করা হয় না। রোযার উদ্দেশ্য তো হচ্ছে ক্ষুধা ও পিপাসার যন্ত্রণার মাধ্যমে নফসের খাহেশাত তথা পাশবিকতা দমন করা এবং মানুষের মধ্যে তাকওয়া ও আল্লাহ্

ভীতির প্রশংসিত গুণ সৃষ্টি করা। কিন্তু কেউ যদি সারা দিন নিজেকে অভুক্ত রেখে সূর্যাস্তের পর ইফতারের নামে রকমারি ও উপাদেয় খাদ্য-দ্রব্যাদি দ্বারা উদর পূর্ণ করে নেয়, তবে তো নফসের পাশবিকতা অবদমিত হওয়ার পরিবর্তে আরো উত্তেজিত হয়ে উঠবে। শুধু তাই নয়; হতে পারে যে, অনেক সুপ্ত পাশবিক শক্তিও তখন জেগে উঠবে।

'রমযানের মূল উদ্দেশ্যই হচ্ছে নফসের সেই অশুভ শক্তিকে দুর্বল করা যা শয়তান মানুষের বিরুদ্ধে অস্ত্ররূপে ব্যবহার করে থাকে। এটা সম্ভব হতে পারে কেবল খাদ্য বর্জন ও সংকোচনের মাধ্যমেই। অর্থাৎ সেহ্‌রী ও ইফতারের সময় ততটুকুই খাদ্য গ্রহণ করা উচিত, যতটুকু অন্য সময় করা হয়। কিন্তু কেউ যদি সারা দিনের হিসেবে সুদে-আসলে আদায় করে নিতে বদ্ধপরিকর হয় তবে সিয়ামের ফললাভ থেকে সে অবশ্যই বঞ্চিত হবে।'

'এমনকি অধিক দিবা নিদ্রাও ত্যাগ করতে হবে যেন ক্ষুধা-পিপাসার অনাস্বাদিতপূর্ব স্বাদ পূর্ণরূপে অনুভব করার সুযোগ হয়। পাশবিক শক্তি নিস্তেজ হতে পারে এবং হৃদযের স্বচ্ছতা ও আত্মার পবিত্রতা অর্জিত হতে পারে। হৃদয় ও আত্মার এই স্বচ্ছতা ও পবিত্রতাই মানুষকে উর্ধ্ব জগতের সমুদয় রহস্য অবলোকনের যোগ্য করে তুলবে।

'তদ্রুপ রাতেও এতো অধিক পরিমাণ খাদ্য গ্রহণ করা উচিত নয় যা তাহাজ্জুদ ও অন্যান্য ইবাদতে মশগুল হতে বাধা সৃষ্টি করতে পারে।'

(এহ্‌য়াউল উলুম,পৃঃ ২১১)

তাহ্‌রীফ (বিকৃতি) ও সীমা'লংঘনের কবল থেকে হিফা'জত

সিয়ামের আহ্‌কামে কঠোরতা ও মাত্রাতিরিক্ত বাড়াবাড়ির মাধ্যমে নতুন ফিতনা সৃষ্টিরও সমূহ সম্ভাবনা ছিলো। কেননা অত্যুৎসাহী অনেকেই এরূপ ধারণা করে বসতো যে, সিয়ামের উদ্দেশ্য হচ্ছে কঠোর নির্যাতনের মাধ্যমে আত্মা দমন এবং কঠোর থেকে কঠোরতম মুজাহাদার মাধ্যমে সকল পাশবিকতার শিকড় উৎপাটন। অতএব যে ব্যক্তি নিজেকে যত কঠিন মুজাহাদা ও অমানুষিক কষ্টে লিপ্ত করবে, পানাহারসহ যাবতীয় আরাম-আয়েশ যত বেশী বর্জন করবে, ক্ষুধা ও পিপাসার যাতনা যতবেশী বরদাশ্‌ত করবে; আল্লাহর নৈকট্য ও সান্নিধ্যও সে ততবেশী লাভ করতে সক্ষম হবে। এই ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়েই ইসলাম-পূর্ব বিভিন্ন ধর্মের অনুসারিগণ সাধারণভাবে সকল ইবাদতের ব্যাপারে এবং বিশেষভাবে সিয়ামের ব্যাপারে

চরম কড়াকড়ি শুরু করেছিলো। নিজেদের মনগড়া বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করে সিয়ামের বিধানকে তারা একটি আত্মনির্যাতনমূলক কঠোর অনুষ্ঠানে পরিণত করেছিলো। কেউ কেউ উপবাসের সময়সীমা বাড়ানোর জন্য ইফতারের সময়কে বিলম্বিত এবং সেহরীর সময়কে ত্বরান্বিত করতো। কেউ বা সেহরীর সময় খাদ্য স্পর্শই করতো না। অনেকের বাড়াবাড়ি এতদূর অতিক্রম করে গিয়েছিলো যে, রাত-দিন একাকার করে দিনের পর দিন তারা একটানা উপবাসব্রত পালন করতো। কেননা তাদের ধারণা ছিলো এই যে, পানাহারের প্রয়োজন আসলে একটি লজ্জাজনক মানবীয় দুর্বলতা এবং এই দুর্বলতা থেকে যে নিজেকে যত বেশী মুক্ত করতে সক্ষম হবে আধ্যাত্মিক জগতে সে ততবেশী উৎকর্ষ লাভ করতে সক্ষম হবে।

এই ভ্রান্ত ধারণা ও বিকৃত মানসিকতা ক্রমে মুসলমানদের মধ্যেও অনুপ্রবেশ লাভ করে এবং তাদের মধ্যেও শুরু হয় সিয়ামের ব্যাপারে মাত্রাতিরিক্ত বাড়াবাড়ি। এমন কি একটানা চল্লিশ দিন সিয়াম পালন প্রথাও চালু হয়ে যায়। বস্তুত এধরণের মানসিকতা ধর্মের বিকৃতি, আত্মনির্যাতন ও বৈরাগ্য অবলম্বনেরই নামান্তর। এর মাধ্যমে আসলে ফিতনার এক সুপ্রশস্ত দরজাই উম্মুক্ত করে দেয়া। সর্বোপরি এর অর্থ হচ্ছে পরোক্ষভাবে আল্লাহর বিধান অস্বীকার করা। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন ঃ

يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر–

"আল্লাহ তোমাদের সাথে নম্রতাই পছন্দ করেন এবং আল্লাহ তোমাদের সাথে কঠোরতা পছন্দ করেন না।" (আল বাকারা ঃ ১৮৫)

وما جعل عليكم فى الدين من حرج–

"ধর্মের ব্যাপারে তিনি তোমাদের উপর কোনরূপে সংকীর্ণতা করেননি।"

(সুরা হজ্জ ঃ ১৮)

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

"ধর্ম সহজ ব্যাপার। ধর্মের ব্যাপারে যে বাড়াবাড়ি করবে (এবং নিজের শক্তি দেখাতে গিয়ে কঠোরতা অবলম্বন করবে) সে অবশ্যই বিপর্যস্ত হবে। অতএব সঠিক ও মধ্যম পন্থা অবলম্বন করো।" (বুখারী শরীফ)

উপরোক্ত দিকসমূহ বিবেচনা করেই ইসলাম সাম্ভাব্য এ ফিতনার দরজা বন্ধ করে দিয়েছে চিরতরে। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর

উম্মতকে সর্বাবস্থায় নিয়মিত সেহ্‌রী খাওয়ার প্রতি উৎসাহিত করেছেন। হযরত আনাস বিন মালিক রাযিয়াল্লাহু আনহু রিওয়ায়েত করেছেন, 'সেহ্‌রী খাওয়ার ব্যাপারে তোমরা যত্নবান হও। কেননা সেহ্‌রীতে বরকত নিহিত রয়েছে।' (বুখারী, মুসলিম ও তিরমিযী)

হযরত আমর বিন আস রাযিয়াল্লাহু আনহু রিওয়ায়েত করেছেন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "আমাদের ও আহ্‌লে কিতাবদের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টিকারী বিষয় হচ্ছে সেহ্‌রী।" (মুসলিম শরীফ)

ইফতারের সময় অযথা বিলম্ব করার ব্যাপারেও তিনি সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন। ইরশাদ হয়েছে, "এই উম্মাহ যতদিন প্রথম সময়ে ইফতার করার ব্যাপারে যত্নবান হবে ততদিন তারা কল্যাণের পথে থাকবে।"(বুখারী ও মুসলিম)

হযরত আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু রিওয়ায়েত করেছেন ঃ "লোকেরা যতদিন প্রথম সময়ে ইফতার করবে ততদিন ইসলাম বিজয়ী থাকবে। কেননা ইয়াহুদী ও নাসারাগণ ইফতারে বিলম্ব করে থাকে।" (আবু দাউদ)

তদ্রুপ সেহ্‌রীতে বিলম্ব করা এবং শেষ সময়ে সেহ্‌রী খাওয়া রসূলুল্লাহর সুন্নাত। সাহাবাগণ এ ব্যাপারেও ছিলেন পুরোপুরি যত্নবান। হযরত যায়েদ বিন সাবিত (রা.) রিওয়ায়েত করেচেন ঃ "আমরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সেহ্‌রী খেলাম এবং সাথে সাথেই সালাতে দাঁড়িয়ে গেলাম। প্রশ্ন করা হলো, মাঝখানে কতটুকু বিরতি ছিলো। উত্তরে তিনি বললেন, এই ধরো, পঞ্চাশ আয়াত পড়তে যতটুকু সময় লাগে।"

(বুখারী ও মুসলিম)

হযরত ইবনে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু রিওয়ায়েত করেছেন ঃ "রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দু'জন মুয়াযযিন ছিলো একজন হলেন বিলাল (রা.) অপরজন ইবনে উম্মে মাকতূম (রা.)। বিলালের আযান রাত বাকি থাকার আলামত। ইবনে উম্মে মাকতূমের আযান ধ্বনিত না হওয়া পর্যন্ত তোমরা পানাহার চালিয়ে যাও।" ইবনে উমর (রা.) বলেছেনঃ 'অথচ উভয় আযানের মাঝে শুধু এতটুকু সময় ছিলো যে, একজন নামতেন, অপর জন উঠতেন।' এ সম্পর্কে হযরত শাহ ওয়ালিউল্লাহ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

তিনি লিখেছেন ঃ

"সিয়ামের একটি অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হলো, প্রয়োজনাতিরিক্ত কঠোরতা ও বাড়াবাড়ির পথ রোধ করে দেয়া। কেননা ইয়াহুদী নাসারা ও স্বয়ং আরবদের মধ্যেও এই ইবাদতের প্রথা ছিলো। এ ব্যাপারে তারা মাত্রাতিরিক্ত কঠোরতা ও বাড়াবাড়ি শুরু করেছিলো। কেননা তাদের ধারণা ছিলো যে, সিয়ামের লক্ষ্যই হচ্ছে আত্মদমন। তাই আত্মাকে কঠোর নির্যাতনের মধ্যে নিক্ষেপ করার জন্য তারা নিজেদের মনগড়া বিভিন্ন পন্থা উদ্ভাবন করতো। বস্তুত এটাই হচ্ছে বিকৃতির উৎস।"

এ বিকৃতি হতে পারে সংখ্যাগত, আবার হতে পারে চরিত্রগত। প্রথমটির দৃষ্টান্ত হলো রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিম্মোক্ত ইরশাদ ঃ

"রমযানের সংলগ্ন পূর্বে কেউ একটি বা দু'টি রোযা যেন না রাখে।"

তদ্রুপ ঈদের দিনে কিংবা সন্দেহমূলকভাবে শা'বান মাসের ২৯ তারিখে রোযা রাখার ব্যাপারেও তিনি নিষেধ করেছেন। কেননা কঠোরতাপ্রিয় লোকদের মধ্যে এই রোযার প্রথা চালু হয়ে গেলে অন্যরাও তাদের অনুকরণ শুরু করবে এবং ক্রমেই সেটা তাহ্‌রীফ বা বিকৃতির পর্যায়ে গিয়ে দাঁড়াবে।

দ্বিতীয়টির দৃষ্টান্ত হচ্ছে বিরতিহীন রোযা সম্পর্কে নিষেধ বাণী, সেহ্‌রীর প্রতি উৎসাহদান এবং প্রথম সময়ে ইফতার করার নির্দেশ দান।

(হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা, খণ্ড ১ , পৃঃ ৩৯)

প্রকৃতপক্ষে সিয়ামের অর্থই হলো, আল্লাহর নির্দেশের কাছে স্বতঃস্ফূর্ত ও নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ। আল্লাহর নির্দেশে গ্রহণ ও বর্জন। আর আল্লাহর নির্দেশ হলো ফজর থেকে নিয়ে সূর্যাস্তের পূর্ব পর্যন্ত পানাহার ও জৈবিক চাহিদা বর্জনের; যত তীব্রই হোক ক্ষুধা ও পিপাসা এবং যত উম্মত্তই হোক তার যৌন চাহিদা। তদ্রুপ সূর্যাস্তের পরপরই খাদ্য গ্রহণ ও ইফতারের নির্দেশ রয়েছে। যতই প্রবল হোক তার ত্যাগ ও আত্মদমনের ইচ্ছা। কেননা নফসের ইচ্ছা অনিচ্ছার উপর সিয়ামের ভিত্তি নয়। সিয়ামের ভিত্তি হচ্ছে আল্লাহর নির্দেশ পালনের উপর। সে নির্দেশ লংঘনের অর্থই হবে ধর্মের প্রতি বিদ্রোহ এবং আল্লাহর মুকাবিলায় শক্তি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হওয়া। গ্রহণ ও বর্জনের বেলায় রোযাদার নিজের নফসের ইচ্ছা-অনিচ্ছার যতটা উর্ধ্বে উঠতে সক্ষম হবে এবং আল্লাহর নির্দেশের যতটা অনুগত হবে তার আবদিয়াতের প্রকাশ ততটাই নির্ভেজাল ও পবিত্র বলে আল্লাহর দরবারে বিবেচিত হবে।

হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানী রহমাতুল্লাহি আলাইহি লিখেছেন ঃ

"সেহ্‌রীতে বিলম্ব এবং ইফতারে তাড়াহুড়ো করার মাধ্যমে মানুষের অক্ষমতা ও দুর্বলতাই প্রকাশ পায় এবং এটা তার আবদিয়াতের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। আল্লাহর ইচ্ছাও হচ্ছে এই যে, মানুষ তার সামনে নিজের অক্ষমতা ও দুর্বলতা তথা আবদিয়াত প্রকাশ করুক।"

(মাকতুবাতে ইমামে রব্বানী, মাকতুব ২৫)

ই'তিকাফ

ই'তিকাফ হচ্ছে রমযানুল মুবারকের সামগ্রিক কল্যাণ ও বরকত লাভের জন্য একটি বলিষ্ঠ সহায়ক শক্তি। রমযানের প্রথম অংশে কোন কারণে যদি পূর্ণ আত্মিক প্রশান্তি, স্থির চিত্ততা, চিন্তা ও হৃদয়ের একাগ্রতা এবং আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন ও তাঁর রহমতের দুয়ারে পড়ে থাকার সৌভাগ্য অর্জিত না হয়, তার জন্য পরম করুণাময় আরহামুর রাহিমীন একটি শেষ সুযোগের ব্যবস্থা করেছেন। যেন সে অতি সহজেই তার সে অপূরণীয় ক্ষতি পুষিয়ে নিতে পারে ই'তিকাফের মাধ্যমে ।

আল্লামা ইবনুল কায়্যিম লিখেছেন ঃ

"ই'তিকাফের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে গায়রুল্লাহর মোহনীয় বেড়াজাল থেকে মুক্তি লাভ করে আল্লাহর সাথে পরিপূর্ণ ও গভীর প্রেমময় সম্পর্ক স্থাপন। রমযানের পবিত্র মাসে আল্লাহর ঘরে নির্জন বাস ও ই'তিকাফের মাধ্যমে হৃদয় ও আত্মার এমন অভাবনীয় উৎকর্ষ সাধিত হয় যে,মানুষের হৃদয়ে তখন আল্লাহর যিকির ও তাঁর প্রতি গভীর প্রেম ছাড়া অন্যকিছু স্থান পায় না। মহান প্রতিপালকের ধ্যান-চিন্তা ছাড়া অন্য কোন চিন্তা-ভাবনাতেই সে উৎসাহবোধ করে না। তার হৃদয়ের সকল অনুভূতি তখন আল্লহর নৈকট্য ও সান্নিধ্য লাভের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ ও সহায়ক হয়ে থাকে। মখলুকের সাথে ঘনিষ্ঠতা গভীরতার পরিবর্তে আল্লাহর সাথে ঘনিষ্ঠতা ও গভীরতা সৃষ্টি হয়। কবরের নিঃসঙ্গ অন্ধকারে, যেখানে কোন বন্ধু ও সাহায্যকারী থাকবে না তখন এই সম্পর্কটি এক মহা মূল্যবান পাথেয়রূপে কাজে আসবে। এই হলো ই'তিকাফের উদ্দেশ্য এবং রমযানুল মুবারকের সর্বোত্তম শেষ দশ দিনের সাথে একে সম্পৃক্ত করার গভীর তাৎপর্য।" (যাদুল মায়াদ ঃ পৃঃ ১৮৭)

হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ রহমাতুল্লাহি আলাইহি লিখেছেন ঃ "মসজিদের ই'তিকাফ হচ্ছে আত্মিক প্রশান্তি, হৃদয়ের পবিত্রতা, চিন্তার বিশুদ্ধতা,

ফিরিশতাকুলের গুণাবলী অর্জন এবং শবে ক্বদরের সৌভাগ্য ও কল্যাণ লাভসহ সকল প্রকার ইবাদতের অখণ্ড সুযোগ লাভের এক সর্বোত্তম উপায়। তাই আল্লাহর রসূল রমযানুল মুবারকের শেষ দশ দিনে ই'তিকাফ করেছেন, এবং উম্মতের সৎ ও ভাগ্যবান লোকদের জন্য তা সুন্নাতরূপে ঘোষণা করেছেন। (হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা ঃ খণ্ড ২, পৃঃ ৪২)

এজন্যই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতি রমযানে অত্যন্ত আগ্রহ ও গভীর আত্মনিমগ্নতার সাথে ই'তিকাফ পালন করেছেন এবং যুগে যুগে মুসলিম উম্মাহ যথার্থ নিষ্ঠা ও ঐকান্তিকতার সাথে এই নববী সুন্নাতের উপর আমল করে এসেছেন। ফলে ই'তিকাফ রমযানুল মুবারকেরই এক অবিচ্ছেদ্য অংশরূপে স্বীকৃতি লাভ করেছে।

হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা রিওয়ায়েত করেছেন ঃ "ওফাতের পূর্ব পর্যন্ত নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযানের শেষ দশদিন বরাবর ই'তিকাফ পালন করেছেন এবং তাঁর ইন্তিকালের পর তাঁর স্ত্রীগণ ই'তিকাফের এ পুণ্য ধারা অব্যাহত রেখেছেন।" (বুখারী ও মুসলিম)

হযরত আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু রিওয়ায়েত করেছেন ঃ "প্রতি রমযানেই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শেষ দশদিন ই'তিকাফ করতেন। কিন্তু ওফাত-পূর্ব রমযানে ই'তিকাফ করেছেন বিশ দিন।"
(বুখারী শরীফ)

কুরআন ও হাদীসের বিভিন্ন স্থানে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে শবে ক্বদরের অসীম ফযীলত ও মর্যাদার কথা বর্ণিত হয়েছে। আল-কুরআনে ইরশাদ হয়েছেঃ

انا انزلناه فى ليلة القدر. وما ادراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها باذن ربهم من كل أمر. سلام هى حتى مطلع الفجر.

"নিঃসন্দেহে আমি তা লাইলাতুল ক্বদরে অবতীর্ণ করেছি। আর আপনি কি জানেন লাইলাতুর ক্বদর কি? লাইলাতুল ক্বদর হাজার মাসের চেয়ে উত্তম। এই রাতে ফিরিশতাগণ এবং রূহুল কুদুস স্বীয় প্রতি পালকের অনুমতিক্রমে প্রত্যেক মঙ্গলময় বস্তু নিয়ে অবতরণ করেন। (আর এই রাত) আগাগোড়া শান্তি। তা (বিরাজ করে) সূর্যোদয় পর্যন্ত। (সুরাতুল কদর)

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ "লাইলাতুল ক্বদরে ঈমান ও ইহ্‌তিসাব সহকারে যে ব্যক্তি ইবাদত করবে তার পূর্ব জীবনের সকল পাপ ক্ষমা করে দেয়া হবে।" (বুখারী ও মুসলিম)

মহা প্রজ্ঞা ও করুণার অধিকারী আল্লাহ পাক লাইলাতুল ক্বদরকে রমযানের শেষ দশ দিনের মধ্যে গোপন রেখেছেন, যেন মুসলমানগণই তার সন্ধানে ব্যাপৃত হয় এবং লাইলাতুল ক্বদরের সৌভাগ্য লাভের প্রত্যাশায় উদ্যম ও চঞ্চলতা নিয়ে সব ক'টি রাতই কাটিয়ে দেয় ইবাদত নিমগ্নতায়। কেননা এতে মানুষেরই কল্যাণ। রমযানের শেষ দশদিন মুসলামানদের কিভাবে কাটাতে হবে, নিজেকে দিয়েই আল্লাহর রসূল তা দেখিয়ে গেছেন। হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা রিওয়ায়েত করেছেনঃ

"রমযানের শেষ দশদিন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সারারাত জেগে ইবাদত করতেন এবং ঘরের অন্যদেরও জাগিয়ে দিতেন। তখন তাঁর ইবাদত নিমগ্নতা ছিলো দেখার মতো।" (বুখারী ও মুসলিম)

অধিকাংশ হাদীস দ্বারা এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, লাইলাতুল ক্বদর রমযানের শেষ দশদিনে এবং আরো সুনির্দিষ্টভাবে শেষ সাতদিনের যে কোন বেজোড় রাতে নিহিত রয়েছে। আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে রিওয়ায়েত আছে যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কতিপয় সাহাবা স্বপ্নযোগে দেখলেন যে, লাইলাতুল ক্বদর রমযানের শেষ সাত দিনে রয়েছে। তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, দেখা যাচ্ছে তোমাদের স্বপ্ন অধিকাংশই শেষ সাতদিন সম্পর্কে । অতএব যে ব্যক্তি লাইলাতুল ক্বদরের সন্ধান পেতে চায় সে রমযানের শেষ সাতদিনের মধ্যেই সন্ধান করুক। (বুখারী ও মুসলিম)

হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লহু আনহা রিওয়ায়েত করেছেন যে, "রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযানের শেষ দশদিন নির্জন ই'তিকাফে বসে যেতেন এবং বলতেন যে, শেষ দশদিনে লাইলাতুল ক্বদরের সন্ধান করো।"

(বুখারী ও মুসলিম)

হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে. রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ "শেষ দশদিনের বেজোড় রাতে লাইলাতুল ক্বদরের অনুসন্ধান করো।" (বুখারী শরীফ)

সিয়ামে ইসলামের বিপ্লবী সংস্কার

অন্যান্য ইবাদতের মতো সিয়ামের মধ্যেও ইসলাম বেশ কিছু মৌলিক ও বৈপ্লবিক সংস্কার সাধন করেছে। এই ইসলামী সংস্কারের ফলে সিয়াম বেশ আনন্দদায়ক এবং মানুষের স্বভাব ও ফিতরতের অনেক নিকটবর্তী হয়েছে। হয়েছে আত্মিক, নৈতিক ও চারিত্রিক কল্যাণের ধারক। সমাজের সর্বস্তরে এ সংস্কারের সুদূর প্রসারী প্রভাব সুস্পষ্ট।

ইসলামের সর্বপ্রধান সংস্কার হচ্ছে সিয়ামের ধারণাগত পরিবর্তন। একথা উপরে বর্ণিত হয়েছে যে, ইয়াহুদীদের দৃষ্টিতে রোযা ছিলো বেদনা ও শোকের প্রতীক এবং বিভিন্ন জাতীয় বিপর্যয় ও শোকাবহ ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর স্মারক। এই হতাশাব্যঞ্জক অন্ধকার ধারণা ইসলাম স্বীকার করেনি। ইসলামের দৃষ্টিতে সিয়াম হচ্ছে এমন এক সার্বজনীন ইবাদত যা রোযাদারকে দান করে আত্মার সজীবতা, হৃদয়ের পবিত্রতা ও চিন্তার বিশুদ্ধতা, এ সিয়ামের মাধ্যমেই সে লাভ করে বন্দেগী ও ইবাদতের অপার্থিব স্বাদ। লাভ করে নতুন উদ্যম ও প্রেরণা। সিয়ামের জন্য আল্লাহ পাক যে মহাপুরস্কারের কথা ঘোষণা করেছেন তা এক মুহূর্তে মানুষকে করে তোলে ভোগে বিতৃষ্ণ ও ত্যাগে উদ্বুদ্ধ এবং আত্মবিশ্বাস ও ভবিষ্যত আশাবাদে বলীয়ান।

হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন ঃ " সিয়ামই একমাত্র ইবাদত যার বিনিময় বান্দাকে আমি নিজ হাতে দান করবো।" একই হাদীসে আরো ইরশাদ হয়েছে ঃ সিয়াম পালনকারী দুটি আনন্দ লাভ করে। একটি আনন্দ হলো ইফতারের মুহূর্তে আরেকটি হবে রব ও প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাতের (অকল্পনীয়) মুহূর্তে।

একজন রোযাদার নির্মল পবিত্রতা, উন্নত নৈতিকতা, আল্লাহর নৈকট্য ও সান্নিধ্য লাভের সাধনা এবং পারস্পরিক কল্যাণ কামনার এমন স্নিগ্ধ স্বর্গীয় পরিবেশে তার মুহূর্তগুলো অতিবাহিত করে যে, পৃথিবীর কোন আবিলতা ও পংকিলতাই তখন তাকে স্পর্শ করতে পারে না। এমনকি রোযাদারের সব কিছুই তখন আল্লাহর কাছে একান্ত প্রিয় হয়ে ওঠে।

হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে ঃ "রোযাদারের মুখের দুর্গন্ধ আল্লাহর কাছে মিশকের সুগন্ধির চেয়ে বেশী প্রিয়।"

বলাবাহুল্য যে, শোক, হতাশা, অনিশ্চয়তা ও হীনমন্যতা বোধের শ্বাসরুদ্ধকর পরিবেশের তুলনায় আশা-উদ্দীপনা, আত্মবিশ্বাস এবং পুরস্কার প্রাপ্তির প্রত্যাশাপূর্ণ পরিবেশই মানবীয় ফিতরতের সাথে অধিক সংগতিপূর্ণ।

সিয়াম সম্পর্কে ইয়াহুদী ধর্মের আরেকটি ধারণা এই যে, এটা আত্মাকে দমন ও শাস্তিদানের তুলনায় একটি প্রকৃষ্ট উপায়। ইয়াহুদী ধর্ম-গ্রন্থসমূহে যত্রতত্র সিয়াম সম্পর্কে উপরোক্ত ধারণা দৃষ্টিগোচর হয়। যেমন –"তোমাদের জন্য এটা একটা স্থায়ী বিধান যে, সপ্তম মাসের দশম দিনে তোমরা নিজেদের আত্মাকে কষ্ট দিবে। সেদিন কেউ তোমরা কোন কাজ করবে না। কেননা সেদিন তোমাদেরকে পবিত্র করার জন্য প্রায়শ্চিত্ত দেয়া হবে এবং প্রভুর দৃষ্টিতে তোমরা সকল পাপ থেকে মুক্ত হয়ে যাবে।"

"প্রভু মূসাকে বললেন, সপ্তম মাসের দশম দিন হচ্ছে কাফ্ফারার দিন। এদিন তোমরা ধর্মীয় সমাবেশে মিলিত হবে এবং আত্মাকে নিগ্রহ করবে এবং সেদিন তোমরা কোন কাজ করবে না। কেননা সেটা কাফ্ফারার দিন।"

পক্ষান্তরে ইসলামের দৃষ্টিতে সিয়াম আত্মাকে কষ্ট দেয়া কিংবা নিগ্রহ করার বিষয় নয়। নয় আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিলকৃত শাস্তি-বিধান। আল-কুরআন ও আল-হাদীছের কোথাও আপনি এমন একটি শব্দ খুঁজে পাবেন না যা সে ধরনের কোন ইঙ্গিত বহন করে। মানুষের কাছে সিয়ামকে পেশ করা হয়েছে এক মহিমান্বিত ইবাদত রূপে যার একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও নৈকট্য অর্জন। সিয়ামের বিধি-বিধান ও আহকামও নিরস কিংবা অত্যাচারমূলক নয়। ফিকাহ্ ভাণ্ডারে এমন একটি হুকুম আপনি খুঁজে পাবেন না, যাতে মনে হতে পারে যে, সিয়ামের উদ্দেশ্যই বুঝি মানুষকে কষ্টে নিক্ষেপ করা কিংবা শক্তি ও সাধ্যের অতিরিক্ত কোন কাজে তাকে বাধ্য করা। বরং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোযাদারের জন্য সেহ্রীকে সুন্নাত এবং বিলম্বে সেহ্রী করাকে মুস্তাহাব ঘোষণা করেছেন। তদ্রুপ ইফ্তারের সময় অযথা বিলম্ব না করে প্রথম ওয়াক্তেই খাদ্য গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন। সেই সাথে দিনে ও রাতে প্রয়োজনে বিশ্রাম গ্রহণের অনুমতি দিয়েছেন। ব্যবসা-বাণিজ্য কিংবা যে কোন কল্যাণমূলক বৈধ কাজে নিয়োজিত হতেও কোন বাধা নেই। অথচ ইয়াহুদী ধর্ম মতে রোযার দিনে সমস্ত কাজ থেকে হাত গুটিয়ে বসে থাকতে হবে। এ নির্দেশ যে মানব স্বভাব ও ইনসানী ফিতরতের সাথে কি পরিমাণ সাংঘর্ষিকতা বোধ করি উল্লেখের প্রয়োজন নেই।

তদ্রুপ কোন কোন প্রাচীন ধর্ম মতে (এর নমূনা এখনও বাকী আছে) রোযা বা উপবাসব্রত এক বিশেষ শ্রেণীতেই সীমাবদ্ধ। উপবাসের দায়-দায়িত্ব সাধারণত ব্রাহ্মণ ও সন্ন্যাসীদের উপর । পারসিকদের মতে রোযা ধর্ম-প্রধান ও পুরোহিতদের জন্যই কেবল অবশ্য পালনীয়। গ্রীকদের মতে রোযা হচ্ছে নারীদের বিষয়; কর্মব্যস্ত পুরুষদের নয়।

কিন্তু ইসলাম সিয়ামকে সকল শ্রেণী বিভক্তি ও সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্ত করে এক সার্বজনীন রূপ দান করেছে। ইসলাম বলে, প্রতিটি সক্ষম মুসলমানকেই রমযানে সিয়াম পালন করতে হবে।

فمن شهد منكم الشهر فليصمه –

"তোমাদের যে কেউ রমযান মাস পাবে তাকে আবশ্যিকভাবেই সিয়াম পালন করতে হবে।"

সকল শ্রেণী বিভক্তি ও সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও প্রাচীন ধর্মসমূহে বিশেষ কারণবশতঃ কাউকে রোযা থেকে অব্যাহতি দানের কথা নেই। কিন্তু ইসলাম এক্ষেত্রেও যথেষ্ট মানবিকতার পরিচয় দিয়েছে। মাযূর (অক্ষম) ব্যক্তিদেরকে সিয়াম থেকে পূর্ণ অব্যাহতি কিংবা আংশিক সুবিধা প্রদান করেছে। আল্-কুরআন ইরশাদ করেছে ঃ

فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام اخر–

"তোমাদের মধ্যে কেউ যদি অসুস্থ কিংবা মুসাফির হয় তাহলে অন্য সময় দিন গণনা করে সিয়াম পালন করতে হবে।"(সূরা আল্-বাকারা ঃ ১৮৫)

و على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين–

"যারা সিয়াম পালনে সক্ষম নয় তারা (প্রতিটি সিয়ামের পরিবর্তে) একজন মিসকীনকে আহার দান করবে।" (সূরা আল্-বাকারা ঃ১৮৪)

সিয়ামের ক্ষেত্রে কোন কোন ধর্মে এতদূর বাড়াবাড়ি দেখা যায় যে, একটানা দীর্ঘ চল্লিশ দিন পর্যন্ত খাদ্য স্পর্শ করা নিষিদ্ধ করে দেয়া হয়েছিলো। আবার কোন কোন ধর্মের শিথিলতার অবস্থা যে, গোশত জাতীয় খাদ্য বর্জনকেই রোযার জন্য যথেষ্ট বলে ধরে নেয়া হয়েছিলো। এছাড়া অন্য যেকোন প্রকার খাদ্য কিংবা পানীয় গ্রহণের ব্যাপারে কোন বাধা-নিষেধ ছিলো না। কিন্তু ইসলাম মাত্রাতিরিক্ত বাড়াবাড়ি এবং প্রয়োজনাতিরিক্ত উদারতা উভয়েরই বিরোধী। ইসলামী সিয়াম হলো ভারসাম্যপূর্ণ এক খোদায়ী বিধান। এখানে যেমন অধিকার নেই আত্মাকে অমানবিক কষ্ট দেয়ার কিংবা নিজের

জন্য জীবন্ত সমাধি রচনা করার–তেমনি অবকাশ নেই স্বেচ্ছাচারিতার, বোকার মত কল্পনার স্বর্গে বাস করার।

ইয়াহুদীরা ইফতারের সময় শুধু খাদ্য গ্রহণ করতো। এরপর খাদ্য পানীয় স্পর্শ করার কোন অনুমতি ছিলো না।' ফলে সারা রাত পানাহারসহ যাবতীয় বৈধ কাজ থেকে তাদেরকে বিরত থাকতে হতো। কিন্তু আল্-কুরআন মানুষের মনগড়া সকল নিয়ম-কানুন ও বিধি-নিষেধ খতম করে দিয়ে সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছে ঃ

كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر –

"পানাহার চালিয়ে যাও যতক্ষণ না ভোরে শ্বেত রশ্মিরেখা আঁধারের কৃষ্ণরেখা ভেদ করে।" (আল বাকারা ঃ ১৮৭)

তদ্রুপ ইসলামের দৃষ্টিতে কেউ যদি সিয়ামের কথা ভুলে গিয়ে পেট ভরেও কিছু খেয়ে নেয় তাহলে তার সিয়াম পালন হয়ে যাবে।

হযরত আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু রিওয়ায়েত করেছেন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ কেউ যদি ভুলে কিছু পানাহার করে নেয় তাহলে সে যেন তার সিয়াম ভঙ্গ না করে। কেননা এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে দাওয়াত। (তিরমিযী)

সকল প্রাচীন ধর্মেই সৌর মাস হিসেবে রোযা রাখার বিধান ছিলো। তাই দিন-তারিখ ও মাসের হিসেব রাখার জন্য সৌর বিষয়ে গভীর জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের প্রয়োজন ছিলো। এ ছাড়াও সৌরবর্ষের কারণে প্রতি বছর একই সময়ে নির্দিষ্ট মাসে রোযা রাখতে হতো। এতে কখনও কোনরূপ পরিবর্তন হতো না। ফলে পরিবর্তন পিয়াসী মানুষ এক ধরনের একঘেঁয়েমি অনুভব করতো। কিন্তু ইসলামী সিয়াম হচ্ছে চন্দ্র মাসের চাঁদ হিসেবে এবং সিয়ামের সম্পর্ক চাঁদ উদয়ের সাথে নয় বরং চাঁদ দেখার সাথে। আল্ কুরআনে ইরশাদ হয়েছে ঃ

يسئلونك عن الأهلة . قل هى مواقيت للناس والحج–

"তারা আপনাকে চাঁদ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে আপনি বলে দিন যে, চাঁদ মানুষের জন্য হজ্জের সময় নির্দেশক।" (আল্-বাকারা ঃ ১৮৯)

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته–

"চাঁদ দেখে সিয়াম শুরু করো এবং চাঁদ দেখে তা শেষ করো। যদি মেঘ থাকে এবং চাঁদ দৃষ্টিগোচর না হয় তবে ত্রিশ দিন পূর্ণ করে নাও।" (তিরমিযী)

অন্য হাদীসে ইরশাদ হয়েছে ঃ "যতক্ষণ পর্যন্ত চাঁদ না দেখবে ততক্ষণ সিয়াম রাখা শুরু করবে না এবং যতক্ষণ চাঁদ না দেখবে ততক্ষণ সিয়ামের মাস শেষ হয়েছে বলে মনে করবে না। আর যদি উদয়স্থল স্বচ্ছ না হয় তাহলে অনুমান করে নাও।"[১] (মুসলিম, তিরমিযী ও আবু দাউদ)

এই ব্যবস্থার সবচেয়ে বড় সুফল এই যে, এর ফলে পৃথিবীর যে কোন স্থানের যে কোন মুসলমান অতি সহজেই সিয়াম পালন করতে সক্ষম হবে। এমনকি গভীর অরণ্যে, পর্বত চূড়ায় কিংবা জনহীন কোন দ্বীপেও যদি সে আটকা পড়ে যায় তবু চাঁদ দেখে অনায়াসেই সিয়ামের বিধান পালন করে যেতে পারে। এ জন্য তাকে সৌর বিজ্ঞানের ছাত্র হতে হবে না।

আরেকটি সুফল এই যে, চন্দ্রমাসের কারণে ধীরে-ধীরে রমযানের মৌসুম পরিবর্তন হতে থাকে। কখনও রমযান আসে গরমে, কখনও বা শীতে। মৌসুম ও আবহাওয়ার এই পরিবর্তনের ফলে একটা নতুনত্বের স্বাদ অনুভব করা যায়। শীত-গরমের সংক্ষিপ্ত ও দীর্ঘ উভয় প্রকার সিয়ামেই অভ্যস্ত হয়ে সর্বাবস্থায় ধৈর্যধারণ ও শোকর আদায়ের তাওফীক তারা লাভ করে।

একজন মুসলমান যখন হিকমত, প্রজ্ঞা ও কল্যাণে ভরপুর ইসলামী সিয়ামের সাথে প্রাচীন ধর্মসমূহের উপবাস ব্রতের তুলনা করে এবং সিয়ামের প্রতি মুসলিম উম্মাহর একনিষ্ঠ প্রেম ও গভীর সম্পর্কের ইতিহাস পাঠ করে। সেই সাথে রোযার প্রতি অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের আচরণ সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করে। তখন তার অন্তরের অন্তঃস্থল থেকেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে বেরিয়ে আসে এ অকপট স্বীকৃতি ঃ

الحمد لله الذى هدانا لهذا و ما كنا لنهتدى لو لا أن هدانا الله لقد جائت رسل ربنا بالحق–

"সকল প্রশংসা সেই মহান আল্লাহর। যিনি আমাদেরকে পথ দেখিয়েছেন। আল্লাহ আমাদের পথ না দেখালে কিছুতেই আমরা পথ পেতাম না। অবশ্যই আমাদের প্রতিপালকের বার্তাবাহকগণ সত্য নিয়ে এসেছিলেন। (সূরা আল আরাফ ঃ ৪৩)

অনুবাদ- মাওলানা আবু তাহের মিসবাহ

---

১. ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিতে চাঁদের উদয় আসল নয়, চাঁদ দেখতে পাওয়াই আসল। অতএব চন্দ্রোদয় প্রমাণ করার কোন উপায় অবলম্বনের কোন আদৌ প্রয়োজন নেই। কিন্তু কিছু কিছু দেশে এই অনভিপ্রেত প্রবণতা দেখা দিয়েছে। 'চাঁদ দেখে রোযা রেখো' এই হাদীস দ্বারাই আসলে সব জটিলতা পরিস্কার হয়ে যায়।

প্রাচ্যের উপহার

বাংলা ভাষার নেতৃত্ব গ্রহণ করা উলামায়ে কেরামের কর্তব্য

[১৪ মার্চ ১৯৮৪ জামিয়া-ইমদাদিয়া কিশোরগঞ্জ প্রাঙ্গণে বিশিষ্ট আলেম, বুদ্ধিজীবী ও ছাত্র-শিক্ষক সমাবেশে প্রদত্ত ভাষণ।]

উপস্থিত উলামায়ে কেরাম, বুদ্ধিজীবী, শিক্ষক ও আমার প্রিয় বন্ধুগণ!

আপনাদের প্রথম দায়িত্ব হচ্ছে দেশ জাতির প্রতিটি মুহূর্তের প্রতি সদা সতর্ক দৃষ্টি রাখা। আপনারা এ জাতির ঈমান ও বিশ্বাসের অতন্দ্র প্রহরী ইসলামের সাথে এ দেশের সম্পর্ক কোন অবস্থাতেই যেন বিন্দুমাত্র শিথিল না হয় সে ব্যাপারে আপনাদেরকে পূর্ণ সচেতন থাকতে হবে। যে দেশ এবং যে জাতির জন্য আল্লাহপাক আপনাদের নির্বাচিত করেছেন তাদের ব্যাপারে অবশ্যই আপনাদেরকে আল্লাহর দরবারে জবাবদিহী করতে হবে। ইসলামের সাথে এ দেশের সম্পর্ক যদি বিন্দুমাত্র শিথিল হয় কিংবা অনৈসলামী কার্যকলাপ ও ইসলাম বিরোধী তৎপরতা শুরু হয় তবে মনে রাখবেন; রাসুলের ওয়ারিছ ও উত্তরাধিকারী হিসাবে আপনাদেরকেই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে কৈফিয়ত দিতে হবে। রাজনৈতিক কর্ণধাররা জিজ্ঞাসিত হবে কিনা এ প্রশ্ন এখানে নয়। কিন্তু এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই যে, সর্বপ্রথম আলেমদের কাছে কৈফিয়ত চাওয়া হবে। তোমাদের চোখের সামনে আমার রেখে আসা দ্বীনের এমন অসহায় অবস্থা কিভাবে হতে পারলো? কোন মুখ নিয়ে আজ আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছো? প্রথম খলীফা হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযিআল্লাহ বলেছিলেন- আমি বেঁচে থাকতে দ্বীনের কোন অঙ্গহানী ঘটবে এটা কি করে হতে পারে?

এই মুহূর্তে আপনাদেরকে খুঁটিনাটি মত পার্থক্য সিকায় তুলে রেখে এক বৃহত্তর ও মৌলিক লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। বুদ্ধিবৃত্তিক সংকটে নিপতিত জাতির এই মুহূর্তে আপনাদের ঐক্যবদ্ধ পথ নির্দেশনার বড় প্রয়োজন।

ইখলাছ ও আত্মত্যাগ এবং প্রেম ও নিঃস্বার্থতা দিয়ে জাতির সেই অংশটিকে প্রভাবিত করুণ যাদের হাতে দেশ শাসনের ভার অর্পিত হয়েছে কিংবা অদূর ভবিষ্যতে যাদের হাতে দেশ পরিচালনর দায়িত্ব অর্পিত হতে যাচ্ছে। এ যুগে শাসন ক্ষমতা লাভের জন্য অপরিহার্য জ্ঞান, দক্ষতা ও উপকরণ যাদের হাতে রয়েছে, জাতির সে অংশটির সাথে ঘনিষ্ট সম্পর্ক ও সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করা আপনাদের অপরিহার্য কর্তব্য। তাদেরকে তাদের ভাষায় বোঝাতে হবে। আপনাদের সম্পর্কে তাদের মনে এ বিশ্বাস যেন থাকে যে, আপনারা নিঃস্বার্থ এবং প্রকৃতই কল্যাণকামী। তাদের কাছে যেন আপনাদের কোন প্রত্যাশা না থাকে, বিভিন্ন প্রলোভন ও সুযোগ-সুবিধার কথা হয়ত বলা হবে। এ এক কঠিন অগ্নি-পরীক্ষা। নিজেদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের উপর তখন অটল-অবিচল থাকতে হবে। কেননা আপনাদের বিনিময় আল্লাহর হাতে।

দ্বিতীয় যে বিষয়টির দিকে আমি আপনাদের সযত্ন দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই তা হলো, এদেশের ভাষা (বাংলা ভাষা) কে আপনারা অস্পৃশ্য মনে করবেন না। বাংলা ভাষা ও তার সাহিত্য চর্চায় কোন পূণ্য নেই, যত পূণ্য সব আরবী আর উর্দুতে-এ ধারণা বর্জন করুন। এটা নিছক মূর্খতা নিজেদেরকে বাংলা ভাষার বিরল প্রতিভারূপে গড়ে তুলুন। আপনাদের প্রত্যেককে হতে হবে আলোড়ন সৃষ্টিকারী লেখক, সাহিত্যিক সুবক্তা। সাহিত্যের প্রতিটি শাখায় আপনাদের থাকতে হবে দৃপ্ত পদচারণা, লেখনী হতে হবে রস-সিক্ত ও সম্মোহনী শক্তির অধিকারী। যেন আজকের ধর্ম বিমুখ শিক্ষিত তরুন সমাজও অমুসলিম লেখক সাহিত্যিকদের লেখনী ছেড়ে আপনাদের সাহিত্য কর্ম নিয়েই মেতে উঠে, বিভোর হয়ে থাকে।

দেখুন! একথা আপনারা লাখনৌর অধিবাসী, উর্দু ভাষার প্রতিষ্ঠিত লেখক এবং আরবী ভাষার জন্য জীবন উৎসর্গকারী এক ব্যক্তির মুখ থেকে শুনছেন। আল-হামদুল্লিাহ! আমার বিগত জীবন আরবী ভাষার সেবায় কেটেছে এবং আল্লাহ্ চাহেন বাকী জীবনও আরবী-ভাষার সেবায় নিজেকে নিয়োজিত রাখবো। আরবী ভাষা আমাদের নিজেদের ভাষা। বরং আমি মনে করি যে, আরবী আমাদের মাতৃভাষা। আমাদের কথা থাকুক, আল্লাহর শোকর আমার বংশের অনেক সদস্যদের এবং আমাদের অনেক ছাত্রের সাহিত্য প্রতিভাও খোদ আরবী সাহিত্যিকদের চেয়ে কোন অংশেই কম নয়।

বন্ধুগণ!

উর্দু ভাষার পরিবেশে যে চোখ মেলেছে, আরবী সাহিত্যের খিদমতে যে তার যৌবন নিঃশেষ করেছে সে আজ আপনাদের সামনে দাঁড়িয়ে পূর্ণ দায়িত্ব সচেতনতার সাথে বলছে- বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে ইসলাম বিরোধী শক্তির রহম করমের উপর ছেড়ে দেবেন না। "ওরা লিখবে আর আপনারা পড়বেন" এ অবস্থা কিছুতেই বরদাস্ত করা উচিত নয়। মনে রাখবেন, লেখনীর এক অদ্ভুত প্রভাব সৃষ্টিকারী শক্তি আছে। লেখনীর মাধ্যমে লেখকের ভাব-অনুভূতি, এমনকি তার হৃদয়ের স্পন্দনও পাঠকের মধ্যে সংক্রমিত হয়। অনেক সময় পাঠক হয়ত তা-অনুধাবনও করতে পারেনা। ঈমানের শক্তিতে বলীয়ান লেখকের লেখনী পাঠকের অন্তরেও সৃষ্টি করে ঈমানের বিদ্যুৎ প্রবাহ। হযরত থানভী (রহ.) বলতেন, পত্র যোগেও মুরীদের প্রতি তাওয়াজ্জুহ বা মনোযোগ নিবদ্ধ করা যায়। শায়খ বা পীর তাওয়াজ্জুহ সহকারে মুরীদকে লক্ষ্য করে যখন পত্র লিখেন তখন সে পত্রের অক্ষরে অক্ষরে থাকে এক অত্যাশ্চর্য প্রভাব শক্তি।

এ ব্যাপারে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাও রয়েছে। পূর্ববর্তী পুণ্যাত্মাদের রচনা-সম্ভার আজো মওজুদ রয়েছে। পড়ে দেখুন, আপনার সালাতের প্রকৃতি বদলে যাবে। হয়ত পঠিত বইটির বিষয়বস্তুর সাথে সালাতের কোন সম্পর্ক নেই কিন্তু তিনি যখন লিখছিলেন তখন তাঁর তাওয়াজ্জুহ ও মনোযোগ সেদিকে নিবদ্ধ ছিলো। এখন আপনি তাদের লেখনী পড়ে তারপর গিয়ে সালাত আদায় করুণ। হৃদয় জাগ্রত এবং অনুভূতি সচেতন হলে অবশ্যই আপনি উপলব্ধি করবেন যে, আপনার সালাতের অবস্থা ও প্রকৃতি বদলে গেছে। অনেক বারই আমার এ অভিজ্ঞতা হয়েছে। আপনি অমুসলমানদের লেখনী পড়বেন; তাদের রচিত গল্প, উপন্যাস ও কাব্যের রস-উপভোগ করবেন এবং তাদের লিখিত ইতিহাস নির্দ্বিধায় গলাধঃকরণ করবেন অথচ আপনার হৃদয়ে তার কোন দাগ কাটবেনা, এটা কি করে হতে পারে? আপনার অবচেতন মনে হলেও 'লেখনী' তার নিজস্ব প্রভাব বিস্তার করবেই। আমি মনে করি, আপনাদের জন্য এটা বড় লজ্জার কথা। বর্ণনাকারী বিশ্বস্ত না হলে আমি কিছুতেই বিশ্বাস করতাম না যে, এ সে দেশ যে দেশে এ পর্যন্ত লক্ষাধিক আলেমের জন্ম হয়েছে, সেখানে বাংলায় কোরআনের প্রথম তরজমাকারী হচ্ছেন একজন হিন্দু সাহিত্যিক।

এদেশের মুসলিম সাহিত্যিকদেরকে বিশ্বের দরবারে আপনারা তুলে ধরুন, নজরুল ও ফররুখকে তুলে ধরুন তাদের অনবদ্য সাহিত্যকর্মের কথা বিশ্বকে অবহিত করুন। নিবিষ্ট মন ও গবেষকের দৃষ্টি নিয়ে তাদের সাহিত্য পড়ুন, অন্যান্য ভাষায় অনুবাদ করুন এবং আল্লাহ তাওফীক দিলে আরবী ভাষায়ও তাদের সাহিত্য পেশ করুন। কত শত আলোড়ন সৃষ্টিকারী সাহিত্য প্রতিভার জন্ম এদেশে হয়েছে। তাদের কথা লিখুন, বিশ্বের কাছে তাদেরকে তুলে ধরুন। আল্লাহর রহমতে এমন কোন যোগ্যতা বাকী নেই যা আপনাদেরও দেয়া হয়নি। আমাদের মাদ্‌রাসাগুলোতে এমন অনেক বাঙ্গালী ছাত্র আমি দেখেছি যাদের মেধা ও প্রতিভার কথা মনে হলে এখনো ঈর্ষা জাগে। প্রতিযোগিতা ও পরীক্ষার সময় ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের ছাত্ররা তাদের মুকাবিলায় একেবারেই চুপসে যেতো। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আমাকে মানপত্র দেওয়া হয়েছে। আমার এ ধারণাই ছিলনা যে, এতো সুন্দর আরবী লেখার লোকও এখানে রয়েছে। কখনো হীনমন্যতার শিকার হবেন না। সব রকম যোগ্যতাই আল্লাহ আপনাদের দান করেছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এগুলোর সঠিক ব্যবহার হচ্ছে না।

আমার কথা মনে রাখবেন; বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের নেতৃত্ব নিজেদের হাতে নিতে হবে। দু'টি শক্তির হাত থেকে নেতৃত্ব ছিনিয়ে আনতে হবে। অমুসলিম শক্তির হাত থেকে এবং অনৈসলামী শক্তির হাত থেকে। অনৈসলামী শক্তি বলতে সেইসব নামধারী মুসলিম লেখক সাহিত্যিকদের কথাই আমি বোঝাতে চাচ্ছি যাদের মন-মগজ এবং চিন্তা ও কর্ম ইসলামী নয়। মোটকথা, এ উভয় শক্তির হাত থেকেই বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের নেতৃত্ব ছিনিয়ে আনতে হবে। এমন অনবদ্য সাহিত্য গড়ে তুলুন যেন অন্যদিকে কেউ আর ফিরেও না তাকায়। আল-হামদুলিল্লাহ্! আমাদের হিন্দুস্তানী আলিমগণ প্রথম থেকেই এদিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখেছিলেন। ফলে সাহিত্য, কাব্য, সমালোচনা ও ইতিহাসসহ সর্বত্র আজ আলেম সমাজের দৃপ্ত পদচারণা পরিলক্ষিত হচ্ছে। তাদের উজ্জ্বল প্রতিভার সামনে সাহিত্যের বড় বড় দাবীদাররা একেবারেই নিস্প্রভ।

একবার একটি প্রতিষ্ঠিত ও জনপ্রিয় উর্দু সাহিত্য সাময়িকীর তরফ থেকে একটি সাহিত্য প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। প্রতিযোগীদের দায়িত্ব ছিলো উর্দু ভাষার শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক নির্বাচন। বিচারকদের দৃষ্টিতে পুরস্কার তিনিই লাভ করলেন-যারা মাওলানা শিবলী নো'মানীকে উর্দু সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ

পুরুষ বলে প্রমাণ করেছিলেন। উর্দু সাহিত্যের উপর কোন গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলন কিংবা সেমিনার হলে সভাপতিত্বের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হতো মাওলানা সাইয়েদ সুলায়মান নদভী, মাওলানা আব্দুস সালাম নদভী, মাওলানা হাবীবুর রহমান খান কিংবা মাওলানা আব্দুল মাজেদ দরিয়াবাদীকে! উর্দু কাব্য সাহিত্যের ইতিহাসের উপর দু'টি পুস্তক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের পাঠ্য-সূচীর অন্তর্ভুক্ত। সে দুটি হচ্ছে মওলভী মুহাম্মদ হুসাইন আযাদ কর্তৃক লিখিত "আবে হায়াত" এবং আমার শ্রদ্ধেয় পিতা মরহুম মাওলানা সাইয়্যেদ আব্দুল হাই এর লেখা "গুলে রা'না" (কোমল গোলাপ)।

মোটকথা, হিন্দুস্তানে উর্দু সাহিত্যকে আমরা অন্যের নিয়ন্ত্রণে যেতে দেইনি। ফলে আল্লাহর রহমতে সেখানে একথা কেউ বলতে পারে না যে, মাওলানারা উর্দু জানেনা কিংবা টাকশালী উর্দুতে তাদের হাত নেই। এখনও হিন্দুস্তানী আলেমদের মধ্যে এমন লেখক; সাহিত্যিক ও অনলবর্ষী বক্তা রয়েছেন, যাদের সামনে দাঁড়াতেও অন্যদের সংকোচ বোধ হবে। বাংলাদেশে আপনাদের তাই করা উচিত। আমার কথা আপনারা লিখে রাখুন। দীর্ঘ জীবনের লব্ধ অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি উদাসীনতা প্রদর্শন কিংবা বিমাতাসুলভ আচরণ এ দেশের আলেম সমাজের জন্য জাতি হত্যারই নামান্তর।

প্রিয় বন্ধুগণ!

আমার এ দুটি কথা মনে রাখবেন। এর বেশী কিছু আমি বলতে চাই না। প্রথম কথা হলো- এই দেশ ও জাতির হিফাযতের দায়িত্ব আপনাদের। ইসলামের সাথে এদেশের সম্পর্ক কোন অবস্থাতেই যেন শিথিল হতে না পারে। অন্যথায় আপনাদের এই শত শত মকতব মাদরাসা মূল্যহীন হয়ে পড়বে। আমি সুস্পষ্ট ভাষায় বলতে চাই, আমার কথায় দোষ ধরবেন না। আমি মাদরাসারই মানুষ, মাদরাসার চৌহদ্দীতেই কেটেছে আমার জীবন। আমি বলছি, আল্লাহ্ না করুন ইসলামই যদি এদেশে বিপন্ন হলো, তবে মকতব মাদরাসার কোনই যৌক্তিকতা নেই। আপনাদের পয়লা নম্বরের কাজ হচ্ছে এদেশে ইসলামের অস্তিত্ব রক্ষা করা। ইসলামের সাথে জাতির সম্পর্ক অটুট রাখা।

দ্বিতীয় কথা হলো; যে কোন মূল্যে দেশ ও জাতির নেতৃত্ব এবং সঠিক পথ নির্দেশনা নিজেদের হাতে নিতে হবে। আর তা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ গ্রহণের মাধ্যমে সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধি-বৃত্তিক প্রাধান্য অর্জন ছাড়া কখনো সম্ভব নয়। গতকালও আমি ইসলামিক ফাউন্ডেশন আয়োজিত সম্বর্ধনা সভায় বলেছি যে, আমার খুবই আফসোস হচ্ছে- আমি আপনাদের সাথে

বাংলা ভাষায় কথা বলতে সক্ষম নই। আপনাদের ভাষায় আপনাদের সম্বোধন করতে পারলে আজ আমার আনন্দের সীমা থাকতো না। ইসলামের দৃষ্টিতে কোন ভাষাই বিদেশী কিংবা পর নয়। পৃথিবীর সকল ভাষাই আল্লাহর সৃষ্টি এবং প্রত্যেক ভাষারই রয়েছে নিজস্ব কতগুলো বৈশিষ্ট্য। ভাষা বিদ্বেষ হলো জাহেলিয়াতেরই উত্তরাধিকার। কোন ভাষা যেমন পূজনীয় নয়, ঘৃণ্যও নয়। একমাত্র আরবী-ভাষাই পেতে পারে পবিত্র ভাষার মর্যাদা। এ ছাড়া পৃথিবীর আর সব ভাষাই সম মর্যাদার অধিকারী। মানুষকে আল্লাহ পাক বাকশক্তি দিয়েছেন এবং যুগে যুগে মানুষের মুখের ভাষা উন্নতি ও সমৃদ্ধির বিভিন্ন সোপান অতিক্রম করে বর্তমান রূপ ও আকৃতি নিয়ে আমাদের কাছে এসে পৌঁছেছে। মুসলমান প্রতিটি ভাষাকেই মর্যাদা ও শ্রদ্ধার চোখে দেখে। কেননা মনের ভাব ফুটিয়ে তুলতে পৃথিবীর সকল ভাষাই আমাদেরকে সাহায্য করে। প্রয়োজনে যে কোন ভাষা শিক্ষা ইসলামেরই নির্দেশ। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত যায়েদ বিন সাবিত (রা.) কে হিব্রু ভাষা শেখার নির্দেশ দিয়েছিলেন। অথচ হিব্রু হচ্ছে নির্ভেজাল ইহুদী ভাষা। দেশের ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি আমরা যদি উদাসীন ও নির্লিপ্ত থাকি তবে তা স্বাভাবিক ভাবেই অনৈসলামিক শক্তির নিয়ন্ত্রণে চলে যাবে। ফলে যে ভাষা ও সাহিত্য হতে পারতো ইসলাম প্রচারের কার্যকর মাধ্যম তাই হয়ে দাঁড়াবে শয়তানের শক্তিশালী বাহন। আপনাদের এখানে কলকাতা থেকে অশ্লীল সাহিত্য আসছে। সাহিত্যের ছদ্মাবরণে কমিউনিজমের প্রচার চলছে। ইসলামী মূল্যবোধ ধ্বংসের মাল-মশলা তাতে মিশানো হচ্ছে। আর সরলমনা তরুণ সমাজ গোগ্রাসে তা গিলছে। এর পরিণতি কখনো শুভ হতে পারেনা।

ভাইসব!

আপনারা তিরমিযী, মিশকাত কিংবা মিযানের শরাহ্ লিখতে চাইলে তা আরবী উর্দুতে লিখুন, আমার তাতে কোন আপত্তি নেই। কিন্তু জনগণকে বোঝাতে হলে জনগণের ভাষাতেই কথা বলতে হবে। আমি আপনাদের খিদমতে পরিষ্কার ভাষায় বলতে চাই-পাক ভারতে হাদীছ, তাফসীর ও ফিকাহ শাস্ত্রের উপর এ পর্যন্ত অনেক কাজ হয়েছে, পর্যাপ্ত পরিমাণে ব্যাখ্যা গ্রন্থও লেখা হয়ে গেছে। সেখানে নতুন সংযোজনের বিশেষ কিছুই নেই। আপনাদের সামনে এখন পড়ে আছে কর্মের এক নতুন বিস্তৃত ময়দান। দেশ ও জাতির উপর আপনাদের নিয়ন্ত্রণ যেন শিথিল হতে না পারে, আপনাদের দেশের মানুষ যেন মনে না করে যে, দেশে থেকেও আপনারা বিদেশী। স্বদেশের মাটিতে এই প্রবাস জীবন অবশ্যই ত্যাগ করতে হবে।

মনে রাখবেন, এদেশের মাটিতেই আপনাদের থাকতে হবে এবং এদেশের জনগণের মাঝেই দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ আঞ্জাম দিতে হবে। এদেশের সাথেই আপনাদের ভাগ্য, আপনাদের ভবিষ্যত জড়িত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

انّ دمائكم واموالكم واعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا فى بلدكم هذا فى شَهركم هذا الا فليبلغ الشاهد الغائب –

হে মুসলমানগণ! তোমাদের রক্ত, তোমাদের সম্পদ এবং তোমাদের আবরু ইজ্জত পরস্পরের জন্য হারাম। ভাষাগত পার্থক্যের কারণে কোন মুসলমান ভাইকে অপমান করা, তার ইজ্জত আবরু লুণ্ঠন করা কিংবা তাকে হত্যা করা সম্পূর্ণ অবৈধ হারাম ও জুলুম।

قد جعل الله لكل شئ قدرًا –'প্রতিটি বস্তুর জন্য আল্লাহ পাক একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ ও স্তর নির্ধারণ করে দিয়েছেন।' কোন মুসলমানের জন্য সে সীমা লংঘন করা বৈধ নয়। সাহিত্য প্রতিভার বিকাশ ঘটান ও কাব্যের রস উপভোগ করুন। কিন্তু অতিরঞ্জন করবেন না। কোরআন শরীফকেও যদি কেউ পূজা করা শুরু করে, উপাস্য জ্ঞানে তাকে সিজদা করে তবে সে মুশরিক হয়ে যাবে, কেননা ইবাদত শুধু আল্লাহরই প্রাপ্য। তবে সব ভাষাকে স্ব-স্ব মর্যাদায় রেখে মাতৃভাষাকে ভালোবাসা, স্বীয় অবদানে তাকে সমৃদ্ধ করে তোলা শুধু প্রশংসনীয়ই নয় অপরিহার্যও বটে।

বন্ধুগণ!

পরদেশী মুসাফির ভাইয়ের এ কথাগুলো যদি স্মরণ থাকে তবে একদিন না একদিন তার গুরুত্ব আপনারা অবশ্যই উপলব্ধি করবেন-

فستذكرون ماأقول لكم وأُفَوِّضُ امرى إلى الله * ان الله بصير بالعباد*

"আপনাদেরকে যে কথাগুলো বলছি তা অদূর ভবিষ্যতে আপনারা স্মরণ করবেন; আমি আমার যাবতীয় বিষয় আল্লাহর হাতে সোপর্দ করছি। নিশ্চয় আল্লাহ তার বান্দাদের সব কিছু দেখেন।"

আকাশের ফিরিশতারা শুনে রাখুক এবং "কিরামান কাতিবীন" লিখে রাখুক যে, প্রতিবেশী ভাইদের প্রতি আমি আমার দায়িত্ব পূর্ণ করেছি। আমি আবার বলছি- শেষ বারের মত বলছি, যদি আপনারা এদেশের মাটিতে বাঁচতে চান; ইসলামের অস্তিত্ব রক্ষা করতে চান; তবে এটাই হচ্ছে তার বিকল্প উপায়। আল্লাহ আপনাদের সহায় হোন।

তরজমা- মাওলানা আবু তাহের মেসবাহ

এ দ্বীন চির জীবন্ত
জীবন্তরাই এর ধারক ও বাহক

[১৯৭৮ সালের ১৩ই জুলাই করাচীর জামেয়াতুল উলূম আল্-ইসলামিয়া, আল্লামা বিননূরী টাউনের ছাত্রদের উদ্দেশ্যে দেয়া হযরত মাওলানার একটি ভাষণ। সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন জামেয়াতুল উলূমের শিক্ষকবৃন্দ, ইনতেজামিয়ার সদস্যবৃন্দ এবং দেশের বিভিন্ন এলাকার আলিমগণ ও শিক্ষিত সমাজ, আরো ছিলেন এশীয় ইসলামী কন্‌ফারেন্সে আগত প্রতিনিধি দলের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সদস্য।]

প্রিয় ছাত্রগণ ও সুধীবৃন্দ!

হাম্‌দ ও সালাতের পর! দ্বীনের জন্য প্রয়োজন জীবন্ত ব্যক্তিত্ব ঃ আমাদের এ দ্বীনের জন্য আল্লাহ্ পাকের নির্ণীত, নির্ধারিত বিধি হল এই যে, এর জন্য অব্যাহতভাবে জীবন্ত ব্যক্তিত্ব জন্মলাভ করতে থাকবে। কোন গাছ সুফলা না হলে, তাতে নতুন নতুন পাতা-পল্লব অংকুরিত না হলে আর ফুল-কলি না ফুটলে তাকে জীবন্ত ও সজীব শ্যামল মনে করা হয় না।

আমাদের এ দ্বীনও জীবন্ত, জীবন্তদের জন্যই তা মনোনীত এবং জীবন্ত দের অস্তিত্ব তার জন্য অপরিহার্য। আধ্যাত্মিকতার ময়দানে, 'ইল্‌ম ও চিন্তার জগতে এবং পরিচালনা ও নেতৃত্বের প্লাটফর্মে যারা জীবন্ত ব্যক্তিত্ব সৃষ্টি করতে পারেনি, তাদের ধর্ম বিলীন হয়ে গেছে, নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।

মানুষের স্বভাব জীবিতদের দ্বারা প্রভাবিত হওয়া। বাতি প্রজ্বলিত হয় বাতি থেকেই। অতীতে তাই হয়েছে, আজও তাই হচ্ছে, ভবিষ্যতেও তাই হবে। সুতরাং এ উম্মতকে বাঁচতে হলে তার কর্তব্য জীবন্ত ব্যক্তিত্ব সৃজন করা, যেন তার 'ইল্‌মের গাছ, চিন্তাবৃক্ষ, সংস্কারবৃক্ষ এবং আধ্যাত্মিকতার মহীরূহ সবুজ কিশলয়ে পল্লবিত হয়, নূতন ফুল প্রস্ফুটিত করে। হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে– আমার উম্মত বৃষ্টিধারা তুল্য; কেউ বলতে পারে না তার প্রথম ফোঁটাগুলি মৃত ভূমির জন্য অধিকতর জীবনদায়ক কিংবা শেষের বিন্দুগুলি।

আমি একজন ইতিহাস লেখক। আমার অনুভূতি এবং রচনা ও সংকলন জীবনের অধিকতর অংশ অতিক্রান্ত হয়েছে ইতিহাসের অঙ্গনেই। তাই আমি বলতে পারি, "এ মরু পরিক্রমায় কেটেছে আমার জীবন"। আমি বিশ্বাস করি

যে, পূর্ববর্তীগণের অবদান, তাঁদের নিষ্ঠা ও সততা, পূর্বসূরীগণের 'আল্লাহর সাথে সম্পর্ক, তাঁদের অবিচলতা, তাঁদের কুরবানী ও আত্মত্যাগ উত্তরসূরীদের জন্য অমূল্য পুঁজি এবং জীবন ও জীবনস্রোতের পয়গাম বাহক। 'আমাদের পূর্বসূরীগণ এমন বড় বড় বুযুর্গ ছিলেন, এত প্রখর ছিল তাঁদের মেধা ও স্মৃতিশক্তি, এত অধিক বিস্তৃত ছিল তাঁদের জ্ঞান-পরিধি, তাঁরা এহেন সুবিশাল, সুগভীর 'ইলমের অধিকারী', এসব কথা আমরা দাবী করে আসছি, স্বীকৃতিও দিয়ে আসছি। এসব সর্বান্তকরণে স্বীকার্য, কিন্তু তা যথেষ্ট নয় কখনো। মৃতদের বদৌলতে 'ফয়েয' হাসিল হতে পারে, কিন্তু পথের দিশা পাওয়া যায় জীবিতদের কাছেই।

আপনারা এমন ধারণা করবেন না যে, আমি বিগতদের সাথে অবিচার করছি। কেননা আমার সম্পর্ক সেই প্রতিষ্ঠান ও চিন্তাধারার সাথে, যাঁরা এ (ভারত) উপমহাদেশে ইসলামের ইতিহাসকে বিন্যাস করেছে এবং উর্দু ভাষায় ইসলামের ইতিহাস সংকলনের সৌভাগ্য লাভ করেছে অর্থাৎ দারুল-উলূম নদওয়াতুল-উলামা এবং দারুল-মুসান্নিফীন (লেখক সংঘ)। কথাটি অন্য কেউ বললে আপনাদের এ মন্তব্য যথার্থ হত যে, বক্তা ইতিহাসে অনভিজ্ঞ, তাই ইতিহাসের প্রতি সে অবিচার করছে। শুনুন আমি বলছি, আমাদের পূর্বসূরীদের যাবতীয় কর্ম ও অবদান সংরক্ষিত থাকা এবং সমুজ্জ্বলভাবে থাকা অপরিহার্য। আমাদের কর্তব্য বিগতদের অবদানের সাথে নতুন বংশধরদের পরিচিত করা এবং খুঁজে খুঁজে পূর্বসূরীদের কীর্তি ও অবদান সংগ্রহ করা।

কিন্তু (আমার বক্তব্যের উদ্দেশ্য হল) কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী হওয়াই এ দ্বীনের ব্যাপারে আল্লাহর ফয়সালা ও সিদ্ধান্ত। সুতরাং তার জন্য অপরিহার্য জীবন্ত ব্যক্তিত্ব। আধ্যাত্মিক কার্যক্রমও সমাধা হয় জীবন্ত বুযুর্গদের দ্বারাই। তাযকিয়া, আত্মশুদ্ধি এবং আধ্যাত্ম জ্ঞান আহরিত হয় জীবন্ত ব্যক্তিত্বের শিক্ষা-দীক্ষায়। তা পরিপূর্ণতায় উপনীত হয় তাঁদের সান্নিধ্যেই। এটাই মুহাক্কিক ও বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের সূফী-মাশায়েখদের গবেষণালব্ধ সিদ্ধান্ত। অন্যথায় বিগতদের মাঝে তো এমন শীর্ষস্থানীয় বুযুর্গও ছিলেন, যাদের একজনই গোটা সমাজ ও উম্মতের জন্য যথেষ্ট হতেন। (কিন্তু তা হয় না। কেননা) মুহাক্কিকগণ বলেছেন– জীবনে রয়েছে নিত্য রূপান্তর ও পরিবৃদ্ধি, জীবন সদা দোলায়মান ও পরিবর্তনশীল।

এখানে আনা-গোনা চলে বিভিন্ন রঙ ও রূপের, পরিবেশ ও পরিস্থিতির। এখন রয়েছে এক বর্ণ, মুহূর্তে তা পরিবর্তিত হয়ে ধারণ করল নতুন বর্ণ। একটি ব্যাধির উপশমের সাথে সাথেই হয়ত দেখা দিল নতুন ব্যাধি। জীবন-সমৃদ্ধ বিশ্বের স্বভাব জগতের সাথে যাঁদের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেছে তারা পথ দেখাতে পারেন না। এ দোলায়মান জীবন্ত মানব সমাজের ওঁদের কাছ থেকে ফয়েয (আধ্যাত্মিক সুষমা) লাভ করা যেতে পারে মাত্র। (অবশ্য ফয়েয হাসিলের নির্ধারিত পন্থায়; কাজেই ভুল বোঝাবুঝির অবসান কাম্য)। কিন্তু পথের সন্ধান লাভ জীবন্তদের হাতেই সীমিত। কোন বংশধরদের কাছে যদি থাকে সব ধরনের সম্পদ, বড় বড় পাঠাগার, ইতিহাসের বিশাল সংগ্রহ, কিন্তু তাদের না থাকে এমন জীবন্ত ব্যক্তিত্ব যাঁদের অন্তর-চিন্তা, যাদের অনুসন্ধান ও উদঘাটন, যাঁদের বুদ্ধিমত্তা ও জ্ঞানবত্তা দ্বারা আলো লাভ করতে পারে শুধু জীবিতরাই, তাহলে সে গোষ্ঠীর বিলীন হয়ে যাওয়ার সমূহ আশঙ্কা বিদ্যমান।

দ্বীন সজীব হয়ে থাকবেঃ

সহীহ্ হাদীছে বর্ণিত হয়েছে–

ان الله يبعث علي رأس كل مائة سنة من يجدد لهذه الامة امر دينها

"আল্লাহ পাক প্রতি শতাব্দীর সূচনায় উত্থিত করতে থাকবেন একজন 'মুজাদ্দিদ' যিনি এ দ্বীনকে রাখবেন তরতাজা ও সজীব, সংস্কার সাধনে সঞ্চার করবেন নতুন জীবনী শক্তি।" এ হাদীছের অর্থ এমন নয় যে, মুজাদ্দিদের আগমন মুহূর্তে তো দ্বীনের দেহে নতুন প্রাণ এল কিন্তু বিশেষ সময় পর্যন্ত স্থায়ী হবে তার অস্তিত্ব।

من يجدد لهذه الأمة امر دينها

অর্থঃ যিনি উম্মতের দ্বীনি ব্যাপারে সংস্কার সাধন করবেন। বাক্যাংশের অর্থ এমন নয় যে, তাঁর আগমনে দু'এক সপ্তাহ, দু'দশ দিন দ্বীনের চর্চা হল, তারপর তিনি বিদায় গ্রহণ করলেন।

এ পর্যন্ত আগতদের জীবনী পড়ে দেখুন। কারো সংস্কার প্রভাব বিদ্যমান ছিল শতাব্দীব্যাপী আর কারো কারো তো কয়েক শতাব্দীব্যাপী। আপনারা দেখে থাকবেন, রেল লাইনে মাঝে মাঝে একটি ছোট আকারের গাড়ী চলাচল করে। ওটার নাম 'ট্রলী' (লাইন চেকিং গাড়ী)। তার চলার নিয়ম হল, মানুষ তাকে ধাক্কা লাগিয়ে তাতে চড়ে বসে, তখন সে পিচ্ছিল লাইনের উপর আপন গতিতে চলতে থাকে। থেমে যাওয়ার উপক্রম করলে লোকেরা নেমে আবার ধাক্কা দিয়ে উঠে বসে। গাড়ী আবার চলতে শুরু করে। এ গাড়ী লাইন

পর্যবেক্ষণের জন্য। উম্মতের গাড়ীও অনুরূপ মনে করুন। এ গাড়ীতে ধাক্কাদাতারা হলেন এ উম্মতের 'উলামা, মাশায়েখ এবং মুজাদ্দিদগণ। তাঁরা ঠেলে দিলে গাড়ী নিজের চাকায় গড়িয়ে চলে, অনবরত চালাতে থাকে না কেউ, গাড়ী চলবে তার চাকার যোগ্যতায়।

কিন্তু ঠেলে দেওয়া এবং চালু করে দেওয়ার জন্য প্রয়োজন জীবনধারী মানুষ। কেননা, ওটা কোন টেকনিক্যাল মেশিনারী বস্তু নয়; বরং জীবন্তরা ধাক্কা দিয়ে তা চালু করে দিলে সে নিজের চাকার ঘূর্ণনে চলতে থাকে। 'ট্রলী'তে জরুরী বিষয় দুইটি–

(১) বিছানো লাইনের মসৃণতা, চাকার ঘূর্ণনে ও গতি এবং এগিয়ে চলার যোগ্যতা। (২) মানুষের কব্জীতে ঠেলতে পারার মত দৈহিক শক্তি। গড়ীর যাত্রীরা থাকবে স্থির, অনড়। আমাদের এ উম্মতের ঐতিহ্যও অনুরূপ। যখন উম্মত শিকার হতে শুরু করে কর্মহীনতা ও বেকারত্বের, তখন আল্লাহর কোন বান্দা এসে তাকে ধাক্কা দেয়। সে তখন চলতে শুরু করে স্বকীয় গতিতে, আর এভাবে চলে যায় বেশ কিছু দূর।

হযরত মুজাদ্দিদে আলফেছানী (রহ.) এবং হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ (রহ.), উভয়কে আমি মনে করি এ যুগের মুজাদ্দিদ। আমি এ-ও মনে করি যে, আজ উপমহাদেশের যত স্থানে দ্বীনী 'ইল্ম-এর চর্চা হচ্ছে, যত জায়গায় সুন্নাতের দা'ওয়াত চলছে, শিরক ও বিদ'আতের প্রতি ঘৃণা এবং তা বর্জন ও উৎখাতের অভিযান চলছে, সেসবই ঐ দুই মনীষীর সাধনার ফল। দেখুন তো, এমন একজন মনীষী এলেন, যার সজোর ধাক্কায় উম্মতের গাড়ীতে গতি সঞ্চারিত হয়ে তা অবিরত চলছে বিগত সাড়ে তিনটি শতাব্দী ধরে। আল্লাহই ভাল জানেন, আর চলবে কত দিন!

অতঃপর আল্লাহর আর কোন বান্দা এসে ফের ধাক্কা লাগাবেন, তাতে চলবে আবার কতদিন। হযরত মুজাদ্দিদে আলফেছানী (রহ.) এর তিরোধানের দেড় শতাব্দী পরে আগমন ঘটেছিল হযরত শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ (রহ.) এবং শাহানে দেহলী (দিল্লীর শাহ্ খান্দানের)। তাদের কীর্তি ও অবদানের প্রভাব-প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পেতে শুরু করেছে হিজরী ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভ থেকে। আমার বক্তব্যের উদ্দেশ্য হল একথা বলা যে, জীবন্ত ব্যক্তিত্ব সৃষ্টিই হচ্ছে মাদরাসাসমূহের এবং আলিমগণের পবিত্র কর্তব্য।

পাকিস্তানের জন্য যা সর্বাধিক প্রয়োজনীয়ঃ

দারুল-উলূম কোরংগীতে গতকাল আমি বলেছিলাম, পাকিস্তানের এখন সর্বাধিক প্রয়োজন এমন একটি আলিম সমাজ, যাঁরা সক্ষম হবেন আধুনিক সমস্যাগুলি অনুধাবন করে তার সমাধান পেশ করতে এবং কুরআন-সুন্নাহ ও শরীয়তের সহায়তায়, ফিক্হ ও উসূলে ফিক্হ-এর আলোকে পথ প্রদর্শন করতে।

অতএব অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়ের সাথে সাথে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজন হচ্ছে হযরত মুফতী মুহাম্মদ শফী, মাওলানা জাফর আহমাদ উছমানী, মাওলানা ইউসুফ বিননূরী (রহ.) প্রমূখের ন্যায় গভীর প্রজ্ঞাসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব সৃষ্টির। তার পরে আমি বলেছিলাম, যুগ এত অগ্রগতি সাধন করেছে, বিপদ এত ভয়ংকর রূপ ধারণ করেছে এবং চ্যালেঞ্জ এত সুকঠিন হয়েছে যে, তার মুকাবিলার জন্য প্রয়োজন ছিল ইমাম গায্যালী (রহ.) ইমাম ইবনে তায়মিয়াঁ (রহ.) এবং হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ (রহ.) এর ন্যায় যুগশ্রেষ্ঠ মণীষীবর্গের।

আর যদি হুজ্জাতুল ইসলাম গায্যালী, শায়খুল ইসলাম ইবনে তায়মিয়াঁ এবং হাকীমুল ইসলাম শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ (রহ.) এর সমপর্যায়ের লোক এ যুগে জন্মলাভ নাও করে, তাহলে অন্তত গড়ে উঠুক উপরে নামোল্লেখিত (নিকট অতীতের) মনীষীবর্গের সমতুল্য ব্যক্তিত্ব। সুতরাং মাদরাসাসমূহের দায়িত্ব হল এই যে, তারা সর্ব শক্তি নিয়োগ করবে। বিশালতা, উদার ও গভীর দৃষ্টিভঙ্গী, চিন্তাধারার প্রসারতা ও ব্যাপকতা সৃষ্টির সাধনায়, অক্লান্ত পরিশ্রম করবে কুরআন-সুন্নাহর রূহ ও আত্মার উপলব্ধি ও তার সাথে নিবিড় পরিচয় লাভের মানসে এবং শরীয়তের যথার্থ লক্ষ্যসমূহের অবগতি লাভের উদ্দেশ্যে। যাতে জাতির নবাগত কর্ণধারগণ জাতিকে সঠিক পথের সন্ধান দিতে পারেন, যুগের বিবর্তন সত্ত্বেও। সমস্যার সমাধানে "কিতাবে দেখে নিন" বলা যথেষ্ট নয়।

কেননা কিতাবগুলি তো লিখিত ও সংকলিত হয় যুগ-চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে। লা তাব্লা জিদাতুহু ওয়ালা তানতাহী আজাইবুহু। অর্থঃ তার নতুনত্ব ফুরিয়ে যাবে না, তার অভিনবত্ব নিঃশেষ হয়ে যাবে না। এ বৈশিষ্ট্য একমাত্র আল্লাহর পবিত্র কালাম আল্-কুরআনের। তার বাইরে মানব রচিত

গ্রন্থমালায় মুদ্রিত থাকে রচনা-যুগের সুস্পষ্ট রূপ ও বৈশিষ্ট্য, সে যুগের ঘণীভূত প্রতিবিম্ব। যে কোন মহান গ্রন্থকারের গ্রন্থ খুলে দেখুন, আল্লাহ যদি আপনাকে দান করে থাকেন 'ইল্‌ম-এর রুচি, প্রজ্ঞা ও প্রতিভা, তাহলে রচনাশৈলী দেখেই আপনি সিদ্ধান্ত দিতে পারবেন তা কোন যুগের রচনা। আপনি অনায়াসে বলে দেবেন, 'এ কিতাব তাতারী ফিতনার পূর্ব যুগের, এ খানি তার পরবর্তী যুগের, আর এখানি মনে হচ্ছে অষ্টম শতাব্দীর রচনা।' কেননা প্রতিটি যুগ, প্রতিটি শতাব্দীর বর্ণনাভঙ্গি, চিন্তাধারা ও স্তর বিভক্তি হয়ে থাকে স্বতন্ত্র।

আমি বলছি না যে, এসব মাদরাসা অহেতুক, অপ্রয়োজনীয়, বরং আমি বলছি, মাদরাসাগুলি একান্ত জরুরী এবং যথেষ্ট বরকতময়। আমরা সবাই নি'মাত ভাণ্ডারের মুক্তা-কণা সন্ধানী। আমিও এই যে আপনাদের সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলছি, তা মাদরাসারই ফয়েয, অবদান।

আমার শিক্ষার আগা-গোড়া পরিসমাপ্ত হয়েছে এ পদ্ধতিতেই। কিন্তু তবুও আমি বলতে চাই (এবং আশা করি গুরুত্ব ও পরিমাণে বাড়াবাড়ি না করে যতটুকু বলতে চাই- আমার কথার ততটুকুই অর্থ করা হবে) যে, এই দ্বীন জীবন্ত ধর্ম, তার জন্য চাই জীবন্ত মানুষ, জীবন্ত মানুষের স্পন্দনেই তার জীবনী শক্তি উজ্জীবিত হবে। পূর্বসূরী (বুযুর্গ)-গণের মাহাত্ম্য, শ্রেষ্ঠত্ব বিন্দু পরিমাণ কমিয়ে দেয়া আমার উদ্দেশ্য নয়, উদ্দেশ্য হচ্ছে একথাটা বলে দেওয়া যে, "বিগত মনীষীগণ একথা বলে গেছেন" এতটুকুতেই পরিতুষ্ট না হওয়া চাই।

ধরুন কেউ যদি আপনার কাছে মাসআলাহ জিজ্ঞাসা করতে এসে আপনার এ ওয়া'জ শোনে যে, "আমাদের মাঝে জন্মেছিলেন এতবড় মহান এক আলিম, যিনি ছিলেন 'ইলমের আকাশ, ইলমের পাহাড়"-তাহলে বিরক্ত হয়ে প্রশ্নকর্তা বলে বসবে ঃ জনাব! কূপে ইদুঁর পড়ে মরে রয়েছে, মহল্লার লোকেরা পেরেশান, শুধু বলুন কি করতে হবে? কত বালতি পানি তুলে ফেলতে হবে?

আপনি যদি শুরু করেন, আমাদের মাঝে জন্মেছেন জগৎ-বরেণ্য ইমাম আবু হানীফা (রহ.), ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) ইমাম যুফার (রহ.) প্রমূখ, আর বলতে বলতে দম নেন আল বাহরুর-রাইক, বাদাই'উ'সানাই, ফাতাওয়া-ই-

'আলমগিরীর মুসান্নিফদের জন্য লাভের কাহিনী, তাহলে অধিকতর বিরক্ত হয়ে ভদ্রলোক বলে উঠবে, জনাব! সব সহীহ্, সব ঠিক হ্যায়। কিন্তু দয়া করে মাসআলাটি বলে দিন। নামাজের সময় হয়ে গেল, কূপ পবিত্র করার উপায়টা কি তাই বলুন। কোন উস্তাদ আপনাকে জিজ্ঞাসা করতে এল, এবারতটি (লাইনটি) একটু বুঝিয়ে দিন, পংক্তিটির অর্থ করে দিন, আমি তা বুঝে উঠতে পারছি না। তখন যদি আপনি বক্তৃতা আরম্ভ করেন-"আমাদের পূর্বসূরীদের মাঝে জন্মেছিলেন অমুক অমুক সেরা সাহিত্যিক, যারা সর্বযুগে অতুলনীয় ছিলেন। আব্দুল কাহির জুরজানী, আবু আলী আল-ফারেসী, ইমাম আল্লামা যামাখশারী, 'আল্লামা হারীরী এবং অমুক অমুক কারী ও অগণিত জ্ঞানবীর মনীষী, (তখনো আপনার বক্তৃতা শেষ হয় নি, তাই বলতে থাকলেন)·আর নিকট অতীতে এই ভারতের বুকে জন্মেছেন এমন এমন মনীষী যাঁদের কেউ পিছিয়ে নয় অন্যের তুলনায়।"

উস্তাদজী সবিনয়ে আরজ করবেন, জনাব! সবই ঠিক বলছেন, কিন্তু এ মুহূর্তে সমস্যা হল এই যে,ঘন্টা হয়ে গেছে, ছেলেরা অপেক্ষা করছে, আমি যাচ্ছি সবক পড়াতে। তাই মেহেরবানী করে তাড়াতাড়ি কবিতা পংক্তির মতলবটা (ভাবার্থ) যদি বুঝিয়ে দেন। "অনুরূপ অবস্থা যদি হয় প্রতিটি বিষয়ের যে বিষয়ের প্রশ্নকর্তা অমুক, আপনি তখন অনর্গল বক্তৃতা ঝেড়ে চলেছেন– "আমাদের শীর্ষ তালিকায় রয়েছে অমুক" তাতে সমস্যার সমাধান আশা করা যায় কি?

গভীর প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিত্ব চাই প্রতিটি শহরেঃ

সব দেশে বরং সব শহরে এমন সব গভীর প্রজ্ঞাসম্পন্ন আলেম থাকা প্রয়োজন, যাঁরা যথাসময় সহায়তা দিতে পারেন, পথ দেখাতে পারেন কিংবা অন্তত অন্য কোন অধিকতর যোগ্য আলেমের সন্ধান দিতে পারেন। আমিও অনুরূপ করে থাকি। কেউ কোন জটিল, গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা জিজ্ঞাসা করতে এলে তাঁকে বলে দিই, আমাদের মাদরাসার মুফ্তী সাহেব রয়েছেন, তাঁর কাছে জিজ্ঞাস করুন। লিকুল্লি ফন্নিন রিজালুন- প্রতিটি বিষয়ে প্রতিটি শাস্ত্রে স্বতন্ত্র প্রজ্ঞাবান রয়েছেন। মুফ্তী সাহেব ফিকাহ বিষয়ের লোক, মাসআলার জওয়াব তিনিই দেবেন নির্ভুল, পরিতৃপ্তিকর। (অবশ্য শাস্ত্রীয় ব্যক্তিরও কখনো কখনো বিচ্যুতি হতে পারে)। ইমাম ইবনে তায়মিয়াঁ 'আল্লামা আবনে হায্ম

সম্পর্কে এক স্থানে লিখেছেন যে, তিনি তাঁর কিতাবে (হজ্জের) "সা'ঈ" (সাফা-মারওয়ার মাঝে দৌড়ানো) আদায়কালেও 'রাম্‌ল' এবং 'ইসতিবা'[১] বিধানের কথা লিখে দিয়েছেন (অথচ তা তাওয়াফের বিধান)। ইবনে তায়মিয়াঁ (রহ.) পরিপূর্ণ আদব ও বিনয়ের সাথে মন্তব্য করেছেন ঃ হযরত ইবনে হায্‌ম (রহ.) যেহেতু হজ্জ পালনের সুযোগ পান নি, তাই তাওয়াফ ও সা'ঈ তাঁর কাছে গুলিয়ে গিয়েছে। এ ধরনের বিচ্যুতি স্বতন্ত্র ব্যাপার (তা দু'একবার ঘটে যেতে পারে)।

মোট কথা, যে-কোন বিষয়ে প্রজ্ঞাবান হতে হবে কিংবা তা প্রজ্ঞাবান পর্যন্ত পৌঁছে দিতে হবে। তা না করে যদি আপনি বিগত মনীষীদের তালিকা পেশ করতে শুরু করেন, তাহলে তার দৃষ্টান্ত হবে এমন যে, পিপাসায় কাতর কোন ব্যক্তি আপনার কাছে এসে পানি পান করতে চাইল। আপনি বলতে শুরু করলেন, "মিয়াঁ! পৃথিবীর বুকে ছড়িয়ে আছে কত পানগৃহ, সরাইখানা, আবিস্কৃত হয়েছে কত কলজে জুড়ানো সুস্বাদু ঈগ্‌লু আইসক্রীম, আর মনমাতানো মজাদার স্কোয়াশ, শরবত ও পানীয়।" আমার কথা হল, পানীয় ও মিষ্টি শরবতের তালিকা পেশ করলে এবং তাকে পূর্বসূরীদের অগ্রগতির খবর পরিবেশন করলে তৃষ্ণায় বুক শুকিয়ে যাওয়া লোকটির কি উপকার হবে? তার দরকার একটু সাদা পানি, তা আপনি লোটায় করে দিন কিংবা মাটির পেয়ালায় ভরে দিন (তাতে কিছু যায় আসে না)। এতেই কেবল নিভবে তার তৃষ্ণার আগুন।

শূন্যস্থান পূরণে প্রয়োজন জীবনপণ সাধনাঃ

জ্ঞান-বিজ্ঞানের অবনতি এবং জাতির অধঃপতন সংঘটিত হয় এভাবেই যে, বিদায়ী ব্যক্তির শূন্যস্থান পূরণ হয় না পরবর্তীদের দ্বারা। যিনি চলে যাচ্ছেন তিনি আসন শূন্য করে যাচ্ছেন, এটাই আজিকার মহাবিপদ। ভারতে আমরা আজ যে শূন্যতার শিকার, তার কথা আপনাদের কি আর বলব। (কারণ তা বলা আত্ম-অবমাননার শামিল) কোন মাদরাসার শায়খুল-হাদীছের পদ খালি হল, কিন্তু আর তো শায়খুল-হাদীছ পাওয়া যাচ্ছে না। কোথাও-বা

---

১. হজ্জের জন্য তাওয়াফ করাকালে বিশেষ ভঙ্গীতে (সামরিক বাহিনীর গতিভঙ্গী) হাঁটা এবং বিশেষ ধরনের চাদর পরার বিধান রয়েছে, এ ভঙ্গী ও ধরনকে 'রমল' ও 'ইসতিবা' বলা হয়। ইহা তাওয়াফকালে বিধিবদ্ধ, সাফা-মারওয়ার সা'ঈ করার সময় নয়।

উসূলে 'ফিকাহ' কিংবা অন্য কোন বিষয় পড়াবার লোক পাওয়া যাচ্ছে না। একটা কারণ অবশ্য বলতে পারি। আল্লাহর কতক বান্দা তো চলে এসেছেন এখানে (পাকিস্তানে) আর কতক গিয়েছেন আল্লাহর দরবারে। একদল ইনতেকাল করেছেন, অপর দল 'মুন্তাকিল' (স্থানান্তরিত) হয়েছেন। আমাদের ক্ষেত্রে অবশ্য ফলাফল অভিন্নই হয়েছে। তাহলে আমার কথার উদ্দেশ্য ছিল, শূন্যস্থান পূরণ করতে হবে, আর সেজন্য প্রয়োজন অবিরাম ও অক্লান্ত সাধনা।

হাদীছের শ্রেষ্ঠ আলেম তৈরী করা কিংবা শ্রেষ্ঠ ফিকাহবিদ গড়ে তোলা যদি আপনার লক্ষ্য হয় তাহলে আপনাকে বুকের রক্ত পানি করতে হবে। কিন্তু আক্ষেপ! আজ বিলুপ্ত হয়ে গেছে আমাদের মাদরাসাগুলির ঐতিহ্য। এখানে আছে সব কিছুই, নেই শুধু মেহ্নত ও অখণ্ড শ্রমের বিগত ধারা। আমার মতে বাড়াবাড়ি হোক, সীমালংঘন হোক, তবুও বেখবর হয়ে, আত্মহারা হয়ে, ঘন্টা-মিনিটের হিসাব ভুলে গিয়ে অধ্যয়নে ডুবে থাকার ঐতিহ্য হোক পুনরুজ্জীবিত। ইউরোপের উন্নতির পিছনেও লুকিয়ে রয়েছে নিরবচ্ছিন্ন শ্রম ও অখণ্ড মনোযোগে লিপ্ত থাকার রহস্য। এ ধরনের অনেক ঘটনা আমি শুনেছি যে, গবেষণায় লিপ্ত ব্যক্তির সকাল-সন্ধ্যা, উদয়-অস্তের খবর পর্যন্ত থাকে না।

আমার পরিচিত একজন ভদ্রলোক জার্মানী গিয়েছিলেন। তিনি বর্ণনা করেছেন, সেখানকার কর্মজীবী একজনকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি দিনের কাজ কখন আরম্ভ করেন এবং আপনাদের প্রতিষ্ঠান ক'টায় খোলে? "এই এক্ষুণি বলছি" বলে ভদ্রলোক ভেতরে গিয়ে একজনকে জিজ্ঞেস করল, 'ভাই আমার সেকশন কখন খোলে?' ঐ লোক বলল ---টায়, তখন লোকটি ফিরে এসে বলল ---টায় আমাদের সেকশন খুলে থাকে। আমি বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি নিজেই বলে দিলেন না কেন? সে জওয়াব দিল, "আমার তা জানা ছিল না। আমি তো খুব ভোরে আসি, তাই আমার সময় জ্ঞান থাকে না। তা ছাড়া ঘড়ি দেখার ফুরসত পাই না।"

কর্ম-পাগলের কর্ম-প্রেরণা এমনই প্রবল হয়ে থাকে। এখন যুগ চলছে বিশৃঙ্খলার, চারদিকে মনোযোগ বিনষ্টকারী হৈ-চৈ। বর্তমানে এটা হচ্ছে মহাবিপদ। যেদিকে তাকাবেন, যে দিকেই থাকেন, দশ-বিশ-পঞ্চাশটি ব্যাপার এমন দেখতে পাবেন, যা অহরহ সৃষ্টি করে চলছে বিশৃঙ্খলা; দেখতে

পাবেন এমন অবস্থা যা বিষায়িত করছে পরিবেশকে। দেখতে পাবেন এমন এমন ছবি ও দৃশ্য, যা ছিনিয়ে নেয় মনের সব একাগ্রতা। আর টেলিভিশনের প্রোগ্রাম চলতে থাকলে তো কি আর বলব– "সুবহানাল্লাহ"! না, বরং বলুন "ইন্নালিল্লাহ"!

অতীতে সুবিধা ছিল এটাই যে, তখন মনোযোগ বিনষ্টকারী বিষয়ের আধিক্য ছিল না, আর মানুষের মাঝে ছিল আত্মনিমগ্ন হওয়ার অভ্যাস। আমার একজন মরক্কোবাসী উস্তাদ একবার একটা ঘটনা শুনিয়েছিলেন। মরক্কোর জনৈক আলেম মালেকী মাযহাবের কোন গ্রন্থ সংকলন করছিলেন। দৈনিক দুপুরে বাড়ীতে গিয়ে তিনি দুপুরের খাবার খেয়ে আসতেন। একদিন তিনি বাড়ীতে না যাওয়ায় বাড়ীর লোকেরা তার কারণ জিজ্ঞেস করল। অবাক হয়ে তিনি বললেন– কেন, আমি তো এসেছিলাম, খানাও খেয়েছিলাম। পরে তার চিন্তা হল, ব্যাপারটা কি হয়েছিল? পরে জানা গেল যে, তিনি কোন মাসআলার বিষয় চিন্তা করতে করতে বেরিয়ে গিয়েছিলেন, পথে কোন বাড়ীর খোলা দরজা দিয়ে সে বাড়ীতে ঢুকে পড়েছিলেন। বাড়ীর লোকেরা ছিল অত্যন্ত সভ্য ও ভদ্র। তারা তাঁকে খাইয়ে দিয়েছে অথচ একথা টের পাওয়ার অবকাশ দেয়নি যে, সেটা তাঁর নিজের বাড়ী নয়। বস্তুত সে যুগে আলেম দের মর্যাদা ছিল। ঐ বাড়ীর লোকদের সম্ভবত জানা ছিল যে, ইনি রোজ এ সময়ে বাড়ীতে গিয়ে খাবার খেয়ে আসেন। তারা চুপচাপ দস্তরখান বিছিয়ে হাত ধোয়ার ব্যবস্থা করে দিলেন, ইনিও খানা খেয়ে রুমালে হাত-মুখ মুছে নিজের জায়গায় ফিরে এলেন। তিনি এত নিমগ্ন ছিলেন যে, সেটা যে তাঁর বাড়ী ছিল না, তেমন ভাববার কোন কারণ তার নজরে পড়েনি।

ইমাম গাযযালী (রহ.) এ ধরনের আর একটি ঘটনা লিখেছেন সম্ভবত তাঁর 'ইয়াহইয়াউল-উলূম গ্রন্থে। ইমাম শাফিয়ী (রহ.) একবার ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহ.) এর বাড়ীতে বেড়াতে গেলেন। বাড়ীর ছেলেরা ভাবল, আমাদের আব্বাকে তো প্রতি নামাযের পরে এ দু'আ করতে শুনেছি, "ইয়া আল্লাহ! মুহাম্মদ ইব্ন ইদরীস (ইমাম শাফিয়ীর নাম)-কে বাঁচিয়ে রাখ, তাঁকে সুস্থ রাখ এবং তার হায়াত দারায করে দাও।"

ছেলেরা ভাবত, আমাদের পিতা হলেন এ যুগের ইমাম, তাহলে তাঁর উস্ত াদ- যার জন্য এত দু'আ, তিনি যেন কত বড় বুযুর্গ হবেন। কৌতুহলী ছেলেরা একবার জিজ্ঞেস করে বসল ঃ আব্বাজান ! আপনি কার জন্য দু'আ করেন। পিতা জওয়াব দিলেন, তিনি পৃথিবীর জন্য সূর্যতুল্য (আলো দানকারী) এবং (পৃথিবীর মানুষদের) দেহের জন্য সুস্থতা স্বরূপ।

আজ সেই ইমাম শাফি'ঈ (রহ.) বেড়াতে এসেছেন তাদের বাড়ীতে। এরপর এক মজার ঘটনা ঘটল। বাড়ীর লোকেরা ভাবল, ঘরে বসেই অমূল্য রত্ন পাওয়া গেল। খুব আদর-আপ্যায়ন হল। রাতের খাবারের পর কিছুক্ষণ আলাপ-আলোচনা করে তিনি শয্যা গ্রহণ করলেন। ছেলেরা ভাবল, আব্বা দীর্ঘ সময় ইবাদতে অতিবাহিত করেন, ইনি তো আব্বার উস্তাদ ! তাঁর তো চোখই বন্ধ হবে না সারারাত। সারারাত কাটিয়ে দেবেন 'ইবাদাত-বন্দেগীতে। ছেলেরা ঐ সব ভেবে বদনা ভরে পানি রেখে দিল যাতে তিনি উঠে ওযু করে 'ইবাদতে মশ্‌গুল হতে পারেন। কিন্তু হলো কি! ভোর পর্যন্ত তিনি শুয়েই থাকলেন। ইমাম আহমাদ ইব্‌ন হাম্বল (রহ.) এসে তাঁকে নামাযের জন্য ডেকে তুললেন।

তিনি উঠে ওযু না করেই নামায পড়তে চলে গেলেন। এসব দেখে তো ছেলেরা হতবাক! তাদের পায়ের তলার মাটি সরে যেতে লাগল, ইয়া আল্লাহ! এসব কি হল? বদনী পরখ করে দেখা গেল, যেমন ছিল তিমনি পানি ভর্তি রয়েছে। বেশি হতভম্ব হল এ কারণে যে, ওযূ না করেই তিনি নামায পড়ে ফেললেন। কিন্তু সে যুগে যেহেতু প্রতিবাদ-প্রশ্ন উত্থাপনের প্রথা ছিল না, তাই কেউ কোন প্রশ্ন করল না।

মজলিসে বসে ইমাম সাহেব ইমাম আহমাদ ইব্‌ন হাম্বল (রহ.)-কে বললেন– আবু আব্দুল্লাহ! (ইমাম আহমাদের কুনিয়াত) আজ রাতে এক অভাবনীয় ব্যাপার ঘটেছে। তুমি আমাকে শুইয়ে দিয়ে চলে যাবার পর আমার মন চলে গেল অমুক হাদীছের দিকে। আমি হাদীছ থেকে মাসআলা উদঘাটন করতে শুরু করলাম। সারারাত মাসআলা বের করতে থাকলাম (মাসআলার একটি বিরাট সংখ্যাও তিনি উল্লেখ করলেন)। এসব মাসআলা উদঘাটন করতে করতে ভোর হয়ে গেল, ঘুমানো আর হল না।

"পূত-পবিত্রদের কাজের তুলনা করো না নিজের সাথে, অভিন্নরূপেই লেখা হয়ে থাকে শের (সিংহ) ও শীর (দুধ)।" অর্থাৎ আকৃতি ও ধরন-ধারণ এক হলেই দু'টি বিষয় সমতুল্য হয়ে যায় না। ফারসী ভাষায় সিংহ ও দুধ এ দুই শব্দ অভিন্ন আকৃতিতেই। শের লেখা হয়ে থাকে অথচ শের অর্থ সিংহ আর ফারসী শীর এর অর্থ দুধ।

(সকাল বেলা অপরের নিদ্রালু চোখ দেখে চোর ভাবে লোকটা তারই মত আর একটা চোর। আর রাত জেগে 'ইবাদতকারী ভাবেন, ইনি একজন 'আবেদ। -অনুবাদক)"

বর্তমানের কুধারণা পোষণের যুগ হলে তো পত্রিকায় হেডিং হত, "ওযু বাদে নামায পড়ল যে আলেম " আর মজা করে প্রচার করা হত, এমন আলেম ও রয়েছে যাঁরা ওযু ছাড়াই নামায পড়ে। শুধু তাই নয়-- ইমামতিও করে (কারণ সে দিন ইমাম সাহেবের ইমামতি করারই অধিকতর সম্ভাবনা; তাঁর উপস্থিতিতে অন্য কে আর নামায পড়াতে যাবে?)। আল্লাহ আমাদেরকে কুধারণা পোষণ থেকে রক্ষা করুন। আল্লাহ পূরণ করে দিন আমাদের শূন্যস্থানগুলি।- আমীন !

তরজমা- মাওলানা আবু তাহের মেসবাহ

বুদ্ধিবৃত্তিক স্বনির্ভরতা অর্জন বুদ্ধিজীবীদের দায়িত্ব

১৯শে মার্চ ১৯৮৪ইং তে ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ আয়োজিত
সমাবেশে দেশের বুদ্ধিজীবী ও গবেষণা কাজে নিয়োজিত
বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে প্রদত্ত ভাষণ

উপস্থিত সুধীবৃন্দ!

এই মুহূর্তে আমি অত্যন্ত পুলকিত ও আবেগাপ্লুত। আল্লাহর দরবারে লাখো শোকর যে, আজকের এই মুবারক মজলিসের মাধ্যমে আমার দশ দিনব্যাপী বাংলাদেশের সফরের শুভ পরিসমাপ্তি ঘটছে। সেই সাথে আজকের এই মজলিসে 'খিদমতে খালক' প্রকল্পের শুভ উদ্বোধন হতে যাচ্ছে।

প্রথমে আমি উপস্থিত লেখক বুদ্ধিজীবীদের খিদমতে অনুমতি হলে বলতে চাই যে, আমার সহকর্মী ও স্বগোত্রীয় বন্ধুদের খিদমতে একটি কথা আরয করতে চাই। সমগোত্রীয় এ জন্য যে, আমিও আপনাদের মতো লেখা-পড়ার সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি।

আপনাদের সামনে একটি ঐতিহাসিক প্রশ্ন, কিংবা একটি ধাঁধাঁ তুলে ধরতে চাই। আপনারা অবশ্যই জানেন; হিজরী সাত শতকের মাঝামাঝি সময়ে একটি নতুন শক্তিরূপে তাতারীদের অভ্যুদয় ঘটেছিল। বর্বর তাতারীরা মধ্য এশিয়ার এক বিস্তীর্ণ এলাকায় বসবাস করতো। তাদের চিন্তা, বুদ্ধিবৃত্তি, রাজনীতি, ধর্ম ও সংস্কৃতির পরিমণ্ডল ছিলো খুবই সংকীর্ণ। হাজার বছর ধরে বদ্ধ জলাশয়ের মাছের মতো বিচ্ছিন্ন জীবনে তারা অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিলো। তারপর এক সময় আল্লাহর কুদরতের প্রকাশ ঘটলো। বর্বর তাতার জাতি তাদের সংকীর্ণ পরিবেষ্টন ভেঙ্গে-চুরে এক দুর্বার গতিতে বেরিয়ে এলো। তখনকার ইসলামী সালতানাত বা মুসলিম সাম্রাজ্য ছিলো সুদূর বিস্তৃত। বিশেষতঃ তুর্কিস্তানের খাওয়ারিজম শাহের সালতানাত ছিল তৎকালীন আলমে ইসলামীর বিশালতম সালতানাত কিন্তু মুসলিম উম্মাহর সামাজিক ও নৈতিক ভিত্তি মূলে পচন ধরে গিয়েছিলো। সমাজের অধিকাংশ লোক হয়ে পড়েছিলো অপরাধাসক্ত। সম্পদ ও ক্ষমতা এবং বস্তুসভ্যতা ও সংস্কৃতির চোরা পথে অনেক দুরারোগ্য ব্যাধির অনুপ্রবেশ ঘটেছিল তাদের মধ্যে। পক্ষান্তরে সভ্যতার আলো বঞ্চিত তাতারীরা ছিলো একটি প্রাণবন্ত জাতি। নবুয়তী পথ নির্দেশনা ও আসমানী শিক্ষার সাথে তাদের কোন পরিচয়

ছিলনা সত্য। তবে তাদের জাতীয় চরিত্রে এমন কোন ব্যাধিও ছিলোনা যা তাদের জাতীয় শক্তি ও উদ্যমে অবক্ষয় সৃষ্টি করতে পারে কিংবা অলস ও বিলাসী জীবনের প্রতি আসক্ত করে তুলতে পারে।

এমন একটি প্রাণবন্ত জাতি যখন খাওয়ারিজম সালতানাতের উপর আপতিত হলো তখন খাওয়ারিজম শাহের সুশিক্ষিত বিশাল সেনাবাহিনী সে আক্রমণের তীব্রতা সহ্য করতে পারলোনা। মোট কথা, তাতারীদের মুকাবিলা ছিলো এক জরাগ্রস্ত সালতানাত ও অপরাধাসক্ত জাতির সাথে। ফল এই দাঁড়ালো যে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের সমন্বয়ে যে সালতানাত আলমে ইসলামের বৃহত্তম শক্তিতে পরিণত হয়েছিলো তা দেখতে দেখতেই ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেলো। খাওয়ারিজম সালতানাতের পতনের পর আলমে ইসলামীতে এমন কোন শক্তি আর অবশিষ্ট ছিলোনা যারা তাতারীদের কিছুক্ষণের জন্য হলেও রুখে দাঁড়াতে পারে। মুসলিম উম্মাহ তখন এমন হীনবল ও সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিলো যে, তাতারীদের মনে করা হতো আসমানী মুসীবত এবং প্রায় প্রবাদ বাক্যের মতো একথা ছড়িয়ে পড়েছিলো যে,

اذا قيل لك ان التتر قد انهزموا فلا تصدقه

সব কিছুই বিশ্বাস করতে পারো। তবে কেউ যদি বলে যে তাতারীরা মার খেয়েছে তবে সে কথা কিছুতেই বিশ্বাস করোনা। কেননা আকাশ ভেঙ্গে পড়া সম্ভব কিন্তু তাতারীদের পরাজিত হওয়া একেবারেই অসম্ভব। এই ছিল সমসাময়িক আলমে ইসলামীর বাস্তব চিত্র।

বন্ধুগণ! হয়ত কিছুটা বিরক্তি বোধ করছেন যে, আলেম ও বিজ্ঞজনদের এই ভাব গম্ভীর মজলিসে অসভ্য তাতারীদের প্রসঙ্গ টেনে আনার কি প্রয়োজন ছিলো? বন্ধুগণ! একটি বিশেষ প্রয়োজনেই তাতারীদের আমি এখানে টেনে এনেছি এবং মুসলমান বানিয়েই এনেছি। অনুগ্রহ করে আমাকে একটুখানি সময় দিন।

ইতিহাসের এক বড় জিজ্ঞাসা এই যে, যে তাতারী জাতি এক সময় গোটা আলমে ইসলামীকে পিষে মেরেছিলো, সুদীর্ঘ ছয়শ বছরের ঐতিহ্যবাহী, হারুনুর রশীদের বাগদাদ যে তাতারীদের বর্বরতায় কবরে পরিণত হয়েছিলো, দজলা নদীর পানি একবার মুসলমানদের রক্তে লাল আর একবার লক্ষ-লক্ষ গ্রন্থের কালিতে নীল হয়ে গিয়েছিলো, সেই নিষ্ঠুর জাতি কোন আশ্চর্য উপায়ে অকস্মাৎ জাতীয়ভাবে ইসলাম গ্রহণ করে বসলো। এক সময় আলমে

ইসলামীর জন্য যারা ছিলো মূর্তিমান অভিশাপ, পরবর্তীকালে তারাই হলো ইসলামের (মুহাফিজ) রক্ষক। কিভাবে এটা সম্ভব হলো? কি কি কার্যকারণ এর পিছনে সক্রিয় ছিলো? কোন উর্ধ্ব শক্তি ইসলামের সামনে এমন একটি নিষ্ঠুর ও শক্তি মদ-মত্ত জাতির মাথা নত করে দিয়েছিলো? ইতিহাসের এটা একটা প্রশ্ন; যার বস্তুনিষ্ঠ উত্তর আমাদের খুঁজে পেতে হবে। এ অভাবনীয় ঐতিহাসিক ঘটনার পিছনে মূল কারণ ছিলো দু'টি–

প্রথমতঃ ইসলামী উম্মাহর অলী ও আধ্যাত্মিক বুযুর্গগণ তাতার জাতির প্রতি তাদের তাওয়াজ্জুহ ও মনযোগ নিবদ্ধ করলেন। আল্লাহর দরবারে তারা প্রার্থনার হাত তুললেন। শেষ রাতে ব্যথিত হৃদয়ের আহাজারিতে আল্লাহর আরশ কাঁপিয়ে দিলেন। হিকমত ও মহব্বত এবং প্রেম ও প্রজ্ঞার সাথে ইসলামের দাওয়াতী কাজ চালিয়ে যেতে লাগলেন। আহ্লুল্লাহ ও আল্লাহর ওলীদের উপরোক্ত কর্ম তৎপরতার একটি দৃষ্টান্ত জনৈক ইউরোপিয়ান ঐতিহাসিক তাঁর "The preaching of islam" নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। আমি আমার "তারীখে দাওয়াত ওয়া আযীমত" নামক গ্রন্থে বিস্তারিতভাবে তা বিবৃত করেছি। অন্য একটি কার্যকারণও এর পিছনে সক্রিয় ছিলো। সেই কার্যকারণটির সাথেই আজকের মজলিসের সম্পর্ক আর এজন্যই শুধু এ মজলিসে এ প্রসঙ্গের অবতারণা করেছি।

শক্তির সব কয়টি উপায়-উপকরণই তাতারীদের কাছে মজুদ ছিলো। সামরিক শক্তি তথা মার্শাল স্পিরিটের কোন কমতি ছিলনা। শৌর্য-বীর্য ও রণকৌশলেরও অভাব ছিলনা। কষ্ট সহিষ্ণুতা ও সহজ সরল বিলাসহীন জীবনেও তারা অভ্যস্ত ছিল পুরোমাত্রায়। কিন্তু একটি ক্ষেত্রে তাদের দৈন্য ছিল চরম। কোন লিটারেচার বা সাহিত্য সম্ভার ছিলনা তাদের কাছে। সভ্যতা ও সংস্কৃতিরও কোন ধারণা ছিলো না তাদের। ছিলোনা কোন উন্নত আইন ব্যবস্থা। যাযাবর জাতির মত গুটিকতেক উদ্ভট আইন-কানুন ছিলো তাদের সমাজ ব্যবস্থার বুনিয়াদ। এমন কি যে ভাষায় তারা কথা বলতো সে ভাষায় কোন হস্তাক্ষর পর্যন্ত ছিলোনা তাদের কাছে। এক কথায়, সভ্যতা ও সংস্কৃতি এবং জ্ঞান ও বিজ্ঞানের উদার উপহারে সমৃদ্ধ মুসলিম ভুখণ্ডের উপর যখন তাতারীদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হলো তখন তারা একেবারেই শুন্যহস্ত ছিলো। তাদের কাছে না ছিলো ভাষা ও সাহিত্য, না ছিলো সভ্যতা ও সংস্কৃতি আর না ছিলো জ্ঞান-বিজ্ঞানের ন্যূনতম অনুশীলন।

মুসলিম লেখক, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী ও চিন্তানায়কগণ এ অবস্থার পূর্ণ সুযোগ গ্রহন করলেন। তারা তাদেরকে সাহিত্য দিলেন, কাব্য দিলেন, সভ্যতা ও সংস্কৃতির সাথে পরিচিত করালেন, আর শিখালেন জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনুশীলন। এভাবে গোটা তাতার জাতির ভেতর মুসলমানদের বুদ্ধিবৃত্তিক প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হলো। ফলে ধীরে ধীরে গোটা জাতি ইসলামের ছায়াতলে এসে আশ্রয় নিলো। অর্থাৎ একদিকে আল্লাহর ওলী ও প্রিয় বান্দাগণ প্রেম ও ভালোবাসা এবং ইখলাস ও নিঃস্বার্থতা দিয়ে তাতার জাতির হৃদয় জয় করলেন। অন্যদিকে মুসলিম বুদ্ধিজীবী ও চিন্তা নায়কগণ তাদের মস্তিষ্ক জয় করে নিলেন। এর অর্থ এই দাঁড়ালো যে, তলোয়ার কিংবা অস্ত্রের ধারই কোন জাতির উপর, কোন জাতির জন্য বিজয় লাভের একমাত্র পথ নয়। সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক প্রাধান্য লাভের মাধ্যমেও একটি জাতিকে অতি সহজেই গোলাম বানানো যেতে পারে। আর রাজনৈতিক গোলামীর চেয়ে বুদ্ধিবৃত্তিক গোলাম, কোন অংশেই কম নয়।

আমি আপনাদেরকে একথাই বলতে চাই যে, সংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষেত্রে যে জাতি অন্য কারো দ্বারা প্রভাবিত সে জাতির অস্তিত্ব সর্বদাই বিপদ ও হুমকির সম্মুখীন। বিজাতীয় সাহিত্য-সংস্কৃতি থেকে যারা নিজেদের চিন্তার খোরাক কিংবা সাহিত্যের মাল-মশল্লা সংগ্রহ করে। বুদ্ধিবৃত্তির ক্ষেত্রে দেওলিয়া জাতি কোনদিন সত্যিকার স্বাধীনতার স্বাদ ভোগ করতে পারে না। নিজেদের আদর্শ ও মূল্যবোধ বিসর্জন দিয়ে উপরোক্ত জাতির আদর্শ ও মূল্যবোধই তারা জীবনের সকল ক্ষেত্রে গ্রহণ করবে। এমনকি শেষ পর্যন্ত তাদের ধর্মমতও গ্রহণ করে বসবে। মানব জাতির ইতিহাসে এমন উত্থান-পতনের ভূরি ভূরি নযীর রয়েছে।

আপনাদের খিদমতে আমি আরো আরয করতে চাই যে, আল্লাহ পাক আপনাদেরকে দেওয়ার ব্যাপারে কার্পণ্য করেননি। নয় দশদিনের এ সংক্ষিপ্ত সফরে পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত পৃথিবীর অধিকাংশ দেশ ভ্রমণকারী একজন সচেতন পর্যটকের দৃষ্টি নিয়ে এ জাতিকে আমি যতটুকু বুঝেছি তাতে আমার এ প্রতীতি জন্মেছে যে, মেধা ও বুদ্ধিমত্তা, সরলতা ও কষ্ট সহিষ্ণুতা এবং প্রেম ও হৃদয়ের উষ্ণতার দিক থেকে এ জাতি পৃথিবীর অন্য কোন জাতির চেয়ে পিছিয়ে নেই। এ জাতির মেধা ও বুদ্ধিমত্তা যেমন স্বচ্ছ প্রেম ও ভালোবাসাও তেমনি গভীর, নিখাদ। কিন্তু সেই সাথে আমি এদিকে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই যে, যদি সাহিত্য-সংস্কৃতি ও বুদ্ধিবৃত্তির

ক্ষেত্রে আপনারা কোন জাতি কিংবা শ্রেণীর প্রভাবাধীন হয়ে পড়েন তবে অত্যন্ত দুঃখের সাথেই আমাকে এ কথা বলতে হবে যে, জাতি হিসাবে যে কোন মুহূর্তে আপনাদের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে যেতে পারে। রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভের সাথে সাথে সংস্কৃতির ও বুদ্ধিবৃত্তিক স্বাধীনতা অর্জনও অপরিহার্য। এ ছাড়া রাজনৈতিক স্বাধীনতাও অর্থহীন হয়ে পড়ে। নিজেদের নেতৃত্ব নিজেদের হাতেই থাকা উচিত। আমি অত্যন্ত পরিস্কার ভাষায় বলছি। অন্য কোন দেশের; এমন কি আপনাদেরই স্বভাষী, যারা কোন প্রতিবেশী দেশে বাস করে তাদেরও বুদ্ধিবৃত্তিক ও মানসিক গোলামী করা উচিত নয়। সর্বক্ষেত্রে নিজেদের স্বতন্ত্র ও স্বাধীন সত্তা সমুন্নত রাখুন। আর্থিক মাশুলের মত বুদ্ধিবৃত্তিক মাশুলও মানুষকে আদায় করতে হয়। আর তা আর্থিক মাশুলের চেয়ে অনেক বেশী ক্ষতিকর ও বেদনাময়।

অতএব নিজেদের বুদ্ধিবৃত্তিক মাশুল নিজেদের দেশেই আদায় করুন। নিকটতম দেশ কিংবা শহরেও তা পাচার হতে দেয়া উচিত নয়। এ দেশের অর্থ-সম্পদ বাইরে পাচার হয়ে যাওয়া যেমন ক্ষতিকর; বাইরের কোন সমাজ থেকে চিন্তা ও ধ্যান-ধারণা পাচার হয়ে আসাও তেমনি ক্ষতিকর। হাঁ একমাত্র ইসলামের প্রাণকেন্দ্র ওয়াহীর অবতরণ ক্ষেত্রে হারামাইন শরীফাইন থেকে ভাব, চিন্তা ও পথ নির্দেশনা গ্রহণ করা যেতে পারে। প্রয়োজন হলে উপমহাদেশীয় আধ্যাত্মিক ও শিক্ষা কেন্দ্রগুলো থেকেও চিন্তা ও বদ্ধিবৃত্তিক পাথেয় সংগ্রহ করা যেতে পারে। কিন্তু চিন্তা, বিশ্বাস এবং ঈমান ও আকীদার ক্ষেত্রে যাদের সাথে মৌলিক বিরোধ রয়েছে তাদের প্রভাব গ্রহণ, সাহিত্য, কাব্য ও শিল্পের ক্ষেত্রে তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ খুবই মারাত্মক পরিণতি বয়ে আনবে।

দু'টি পথে তাতারী জাতি ইসলাম দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। প্রথমতঃ আধ্যাত্মিক পথে, দ্বিতীয়তঃ বুদ্ধিবৃত্তিক পথে। জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং সভ্যতা ওসংস্কৃতির ক্ষেত্রে মুসলমানগণই ছিলো তখন শীর্ষ জাতি। মৌলিক গবেষণা ও আবিস্কারের ক্ষেত্রে তারা ছিলো অপ্রতিদ্বন্দ্বী। আজকের ইউরোপ তখন ছিলো অন্ধকারাচ্ছন্ন। একাডেমিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক নেতৃত্ব তখন এককভাবে মুসলমানদের হাতেই ছিলো। সামরিক ও রাজনৈতিক বিচারে যদিও তারা ছিলো বিজিত, কিন্তু বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষেত্রে তারাই ছিলো বিজেতা আর তাতারীরা ছিলো বিজিত।

ফলে ইতিহাসের অমোঘ নিয়মে বিজয়ী জাতিকে মাথা নত করতে হয়েছিলো বিজিত জাতির কাছে। মুসলিম উম্মাহর বর্তমান অবস্থা দৃষ্টে আজ আমার সে আশঙ্কাই হচ্ছে। এক হিতাকাংখী ও কল্যাণকামী বন্ধু হিসাবে আপনাদের জন্য আমার পরামর্শ এই যে, নিজেদের সাহিত্য ও কাব্য নিজেরাই গড়ে তুলুন। সংস্কৃতি ও শিল্পের ক্ষেত্রে নিজস্ব স্টাইল ও রীতি গ্রহণ করুন এবং তার উৎকর্ষ সাধনে একনিষ্ঠ ও নিবেদিত হোন। আমি স্পষ্ট ভাষায় বলছি। জাতীয় কবি হিসাবে কবি নজরুল ইসলামকেই আপনাদের তুলে ধরা উচিত। নজরুলের কাব্য ও সাহিত্যকর্ম বিশ্ব-সাহিত্য সভায় তুলে ধরুন এবং নজরুলকে নিয়ে গর্ব করুন। আপনাদের নিজেদের ভিতরেও অনেক প্রতিভা লুকিয়ে আছে সেসব প্রতিভা বিকাশের অনুকুল পরিবেশ তৈরী করুন। নিজেদের ভিতর থেকেই স্টাইলের জন্ম দিন। নিজেদের সাহিত্য ও সংস্কৃতি নিজেরাই নিয়ন্ত্রণ করুন। মনে রাখবেন; এটা খুবই সংবেদনশীল ক্ষেত্র। এখানে অন্য কারো হস্তক্ষেপ বাঞ্ছনীয় নয়। সংস্কৃতির জগতে আপনাদেরকে পূর্ণ স্বাধীন ও আত্মনির্ভরশীল হতে হবে। ইতিহাসের একজন সাধারণ ছাত্র হিসাবে বলছি, এ ক্ষেত্রে বিন্দুমাত্র বিচ্যুতি ঘটলে ইতিহাস ক্ষমা করবে না। আর ইতিহাসের প্রতিশোধ বড় নির্মম।

যে কারণে আপনাদের দেশ থেকে আমি আনন্দ ও আশাবাদ নিয়ে ফিরে যাচ্ছি তা হচ্ছে ইসলামিক ফাউণ্ডেশনের উপস্থিতি। বস্তুতঃপক্ষে এটা হচ্ছে সঠিক সময়ে, সঠিক দিকে একটি সঠিক পদক্ষেপ। একটি স্বাধীন দেশের স্বাধীন জাতির জন্য নিজস্ব একাডেমী থাকা একান্তই অপরিহার্য। চিন্তা ও বুদ্ধিবৃত্তির উৎস স্বদেশের মাটিতে এবং নিজেদের নিয়ন্ত্রণে থাকা অতীব গুরুত্বপূর্ণ, দেশের বাইরে থাকাটা স্বাধীন জাতির জন্য আদৌ মর্যাদাজনক ও কল্যাণকর নয়। হিন্দুস্থান ও মিশরের মুসলমানগণ পাশ্চাত্য সভ্যতা দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার এবং ইসলাম থেকে দূরে সরে যাওয়ার কারণ শুধু এই যে, তাদের চিন্তা ও ধ্যান-ধারণার উৎস ছিলো ইউরোপে, কেম্ব্রিজে, অক্সফোর্ডে কিংবা আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয় সমুহে। বাইরে থেকে আপনারা যা খুশি আমদানী করুন। খাদ্য আমদানী করুন, বৈজ্ঞানিক উপকরণ, কলকব্জা ও কারিগরিবিদ্যা আমদানি করুন। কিন্তু সাহিত্য, সংস্কৃতি, দর্শন ও আদর্শ আমদানি করা বন্ধ করুন। বাংলাদেশের মত স্বাধীনচেতা জাতির জন্য নিজস্ব স্টাইল থাকা উচিত।

সর্বক্ষেত্রে নিজস্ব স্টাইল ও রীতির প্রচলন হওয়া উচিত। কলকাতা ও পশ্চিমবঙ্গ আপনাদের অনুসরণ করুক। আপনারা তাদের অনুকরণ করতে যাবেন না। সাহিত্য ও সংস্কৃতি জগতে আপনারা ইমাম হোন। সুদীর্ঘ ঐতিহ্যের অধিকারী কোন স্বাধীন জাতির জন্য মুকতাদী হওয়া গর্বের কথা নয়। আপনাদের রয়েছে নিজস্ব ঐতিহ্য, নিজস্ব ইতিহাস। আপনাদের পক্ষে অন্য কোন জাতির দুয়ারে-আয়তন ও সংখ্যায় তারা যত বড়ই হোক-ধর্ণা দেয়া শোভনীয় নয়। প্রথম কাতারে নিজেদের অবস্থান মজবুত করার সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ুন। দ্বিতীয় কিংবা তৃতীয় স্থান আপনাদের জন্য নয়। শিক্ষা-দীক্ষা, সাহিত্য-সংস্কৃতি, শিল্প-কাব্য, এক কথায় বুদ্ধিবৃত্তির ক্ষেত্রে যতদিন আপনারা আত্মনির্ভরশীলতা অর্জন না করবেন, নিজেদের স্বতন্ত্র অবস্থান মজবুত করতে সক্ষম না হবেন ততদিন আশ্বস্ত হওয়ার কোন উপায় নেই। একটি স্বাধীন দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা জাতীয় আশা-আকাংখা ও মূল্যবোধের সাথে অবশ্যই সংগঠিতপূর্ণ হতে হবে।

আরেকটি কারণেও আমার মনে আজ আনন্দ ও আশাবাদের সঞ্চার হয়েছে। তা এই যে, বিলম্বে হলেও খিদমতে খালক বা আর্তমানবতার সেবার গুরুত্ব আপনারা অনুধাবন করতে পেরেছেন এবং সেজন্য বাস্তবমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। গতকাল সোঁনারগাঁয়ে গিয়েছিলাম। সেখানকার সেবা, কার্যক্রম ও যাবতীয় ব্যবস্থা অবলোকন করে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি। স্টাফ ও স্থানীয় লোকজনদের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আমি আলাপ করেছি। গড়ে প্রতিদিন কতজন রুগী আসে, কতজন রুগীকে ব্যবস্থাপত্র দেয়া হয়, কি পরিমাণ ঔষধ বিনামূল্যে বিতরণ করা হয় ইত্যাদি বিষয়ে অবগত হওয়ার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। সত্যি এটা আল্লাহর বিরাট মেহেরবানী। এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ ও সংবেদনশীল ক্ষেত্রের দিকে বিলম্বে হলেও আপনারা মনযোগ দিয়েছেন; যা এতোদিন খৃষ্টান মিশনারীদের একচেটিয়া ময়দান মনে করা হতো।

বস্তুতঃ আর্তমানবতা সেবার ছদ্মাবরণেই তারা এদেশের সাধারণ মানুষের সহানুভূতি অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। সর্বত্র আজ এ ধারণা প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে যে, মিশনারী হাসপাতাল ও চিকিৎসা কেন্দ্রগুলো অন্যান্য হাসপাতাল ও চিকিৎসা কেন্দ্রের তুলনায় অধিক উন্নত ও সেবাধর্মী। যেহেতু তাদের মধ্যে মিশনারী মনোভাব থাকে সেহেতু চিকিৎসা প্রার্থীদের সাথে তারা অত্যন্ত কোমল ও সহানুভূতিপূর্ণ আচরণ করে থাকে। ফল এই দাঁড়ায় যে, মানুষ

সেখানে শারীরিক সুস্থতা লাভ করলেও তার আত্মা হয়ে পড়ে অসুস্থ ও রোগগ্রস্ত। অন্ততঃ এ ধারণা নিয়ে তাকে ফিরে আসতে হয় যে, আমাদের চেয়ে এরা অনেক ভালো লোক। এদের মধ্যে মানবতাবোধ আছে। আছে সহানুভূতিপূর্ণ কোমল হৃদয়। এটাই এক ধরণের রোগ। একটি রোগ থেকে আরোগ্য লাভ করে আরো মারাত্মক ও ক্ষতিকর আরেকটি রোগ নিয়ে সে বাড়িতে ফিরে আসে। তাই আমি মনে করি যে, এই মুহূর্তের সবচেয়ে বড় প্রয়োজন হলো আর্তমানবতার সেবায় গোটা জাতির আত্মনিয়োগ করা। যাতে মানুষ নিজের ঈমান ও বিশ্বাসের হিফাজত করে সহজ উপায়ে সঠিক চিকিৎসা কিংবা অন্ততঃ পক্ষে সহৃদয় পরামর্শ লাভ করতে পারে। এই মহান প্রকল্পের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পারে আমি ও আমার সফর সঙ্গীরা নিজেদেরকে সৌভাগ্যবান মনে করছি।

শুধু এ কথাই আমি আপনাদের বলবো। প্রথমতঃ শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টি ও রেজামন্দি লাভই যেন হয় আপনাদের যাবতীয় উদ্যোগ আয়োজন ও কর্মকাণ্ডের মূল উদ্দেশ্য। এ বিশ্বাস রাখবেন যে, আপনারা ইবাদতে নিয়োজিত আছেন। আমি আপনাদেরকে নিশ্চয়তা দিচ্ছি বরং আমার ফতোয়া এই যে, আপনারা ইবাদতে এবং সর্বোত্তম ইবাদতে নিয়োজিত আছেন।

কেননা হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছেঃ " দুনিয়াতে যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের কষ্ট লাঘব করবে; কেয়ামতের দিন আল্লাহ পাক তার কষ্ট লাঘব করে দিবেন।" আরো ইরশাদ হয়েছেঃ " আল্লাহ পাক বান্দার সাহায্যরত থাকেন যতক্ষণ বান্দা তার মুসলমান ভাইয়ের সাহায্যরত থাকে।" হাদীসে কুদসীতে ইরশাদ হয়েছেঃ " কিয়ামতে আল্লাহ পাক একদল লোককে লক্ষ্য করে বলবেন; আমি অসুস্থ হয়েছিলাম, কিন্তু তুমি আমাকে দেখতে আসোনি।" তারা বলবেঃ হে মহামহিম আল্লাহ! আপনি কিভাবে অসুস্থ হতে পারেন? ইরশাদ হবেঃ "আমার অমুক বান্দা অসুস্থ হয়ে পড়েছিলো। যদি তাকে দেখতে যেতে তবে আমাকেও সেখানে দেখতে পেতে।" বলুন এর চেয়ে বড় মর্যাদার বিষয় আর কি হতে পারে!

দ্বিতীয়তঃ সেবা ও চিকিৎসার সাথে প্রেম ও সহানুভূতিও যোগ করতে হবে। তবেই এ বিরাট পরিশ্রম ও প্রচেষ্টা সার্থকতা লাভ করবে। এই দুর্বল মুহূর্তে মানুষের হৃদয়ের কোমল মাটিতে ঈমান ও কল্যাণের বীজ বপন করে দিন। ইনশাআল্লাহ্ কোন একদিন তা ফুলে ফলে সুশোভিত হয়ে উঠবে। অন্ত তঃ পক্ষে এ বিশ্বাস তাদের অন্তরে বদ্ধমূল করে দিতে হবে যে, আল্লাহই

হচ্ছেন শেফাদানকারী। ঔষধ ও চিকিৎসক উপলক্ষ মাত্র। আল্লাহর নির্দেশেই ঔষধ তার ক্রিয়া করে। ঔষধের নিজস্ব কোন ক্ষমতা নেই। এর পর যখন রুগী শেফা লাভ করবে তখন তার অন্তরে নূর সৃষ্টি হবে। তার বিশ্বাসের ভিত মজবুত হবে।

আপনাদের সকলকে বিশেষ করে সভাপতি সাহেব ও ফাউণ্ডেশন কর্মকর্তাদেরকে আমার আন্তরিক মুবারকবাদ। একটি সঠিক ও নির্ভূল ক্ষেত্র আপনারা নির্বাচন করতে সক্ষম হয়েছেন। আপনাদের এ দূরদর্শীতা দেশ ও জাতির জন্য প্রভূত কল্যাণ বয়ে আনবে। এটা শুধু দেশের খিদমত নয় দ্বীনেরও এক বিরাট খিদমত। আল্লাহ পাক এ প্রকল্পটিকে স্থায়িত্ব ও পূর্ণতা দান করুন।

সাথে সাথে আপনাদেরকে একথাও বলবো যে, অমুসলিম ভাইদের সাথেও সমান আচরণ করুন। এ ক্ষেত্রে ধর্ম বিশ্বাসের প্রশ্ন তোলা উচিত নয়। মনে রাখতে হবে যে, এরাও আল্লাহর বান্দাহ্, আল্লাহই এদের সৃষ্টি করেছেন। এদের কোনরূপ কষ্ট লাঘব করতে পারলে আল্লাহ্ সন্তুষ্ট হবেন এবং আমরা উত্তম বিনিময় লাভ করবো। সেবার ক্ষেত্রে মুসলমান অমুসলমানের পার্থক্য করা উচিত হবে না। এমনকি ক্ষেত্র বিশেষে অমুসলিম ভাইকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। মোট কথা, আপনার চিকিৎসা সহায়তা নিতে এসে সে যেন কোন রকম দ্বৈত আচরণ অনুভব করতে না পারে। আমাদের বোনেরাও সেবার ময়দানে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারেন। তাদের হৃদয়ের স্বভাব কোমলতা এক মূল্যবান সম্পদ। এমন কিছু তারা করতে পারেন যা পুরুষের পক্ষে অসম্ভব। কিন্তু এ ব্যাপারে আমাদের হিন্দুস্থানে এবং এখানেও সচেতনতার যথেষ্ট অভাব রয়েছে। আমার বোনেরাও পর্দার পিছনে থেকে আমার কথাগুলো শুনছেন জানতে পেরে আমি আনন্দিত হয়েছি। আল্লাহপাক তাদেরকে সমাজ সেবায় যথাযোগ্য ভূমিকা পালন করার তাওফীক দান করুন।

শ্রদ্ধেয় বন্ধুগণ! আরেকটি বিষয় আরয করেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। আমি আপনাদেরকে মিশর বিজয়ী সাহাবী হযরত আমর ইবন আসের একটি ঐতিহাসিক বাণী স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। তখনকার দুনিয়ায় মিশরের অবস্থান ছিলো তাহযীব তামাদ্দুন ও সভ্যতার স্বর্ণ-শিখরে। নীল নদী বিধৌত মিশর ছিলো দুনিয়ার সবচেয়ে সুজলা সুফলা শস্য শ্যামল ভূখণ্ড। এমন একটি সমৃদ্ধ ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য মণ্ডিত দেশ জয় করার পরও কেন

জানি হযরত আমর ইবন আস কোন স্বস্তি পাচ্ছিলেন না। একজন বিজয়ী সেনাপতির মনে যে স্বাভাবিক পুলক অনুভূত হয় তার লেশ মাত্রও ছিল না তাঁর অন্তরে।

কেননা তিনি ছিলেন নবীর সান্নিধ্য প্রাপ্ত এক সাহাবী। কুরআনের শিক্ষা এবং নবুয়তের দীক্ষায় তাঁর অন্তর ছিলো আলোক উদ্ভাসিত। তিনি ছিলেন যুগপৎ ঈমানী প্রজ্ঞা এবং সাহাবী সুলভ অন্তর্দৃষ্টির অধিকারী। তাই তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিলো সুদূর ভবিষ্যত পানে। বিজয়ী আরব মুসলমানদের ডেকে তিনি ঘোষণা করলেন তাঁর সেই ঐতিহাসিক বাণী; যা স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখার যোগ্য। আরব বিজয়ীদের লক্ষ্য করে তিনি বললেন- انتم فى رباط دائم

দেখো! মনে রেখো! মিশরের সবুজ শ্যামল উর্বর মাটি, মিশরের সম্পদ, ভাণ্ডার ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এবং এদেশের তাহযীব-তামাদ্দুন তোমাদের মনে যেনো কোন মোহ সৃষ্টি করতে না পারে। এদেশের প্রাকৃতিক রূপ ও জৌলুসে তোমরা যেন আত্ম-বিমোহিত হয়ে পড়না। এখানে তোমাদের সঠিক অবস্থান ও দায়িত্ব সম্পর্কে সর্বক্ষণ সজাগ থেকো। মনে রেখো "তোমরা এখানে সার্বক্ষণিক প্রহরায় নিয়োজিত আছো।" এক গুরুত্বপূর্ণ চৌকিতে তোমরা অবস্থান করছো। একথা ভেবে আত্মপ্রসাদ লাভ করোনা যে, তোমরা কিবতীদের উপর বিজয় লাভ করেছো।

কিংবা রোম সাম্রাজ্যের শস্যভাণ্ডার দখল করে নিয়েছো। একথাও মনে করোনা যে, আরব উপদ্বীপ খুব নিকটে। কোন অবস্থাতেই আত্মপ্রতারণার শিকার হয়োনা। انتم فى رباط دائم।। এমন এক নাযুক জায়গায় তোমরা আছো যে, মুহূর্তের অসাবধানতায় তোমাদের সর্বনাশ হয়ে যেতে পারে। প্রতিটি মুহূর্ত তোমাদেরকে সজাগ সতর্ক থাকতে হবে। এক ঐশী বাণীর ধারক, বাহক ও প্রচারক হয়ে তোমরা এদেশে এসেছো। মুহূর্তের গাফিলতি ও দায়িত্ব বিচ্যুতি তোমাদের এ বিজয়কে ধুলি লুণ্ঠিত করে দিতে পারে। সেই জীবন, দর্শন থেকে চুলপরিমাণও যদি বিচ্যুত হও, যা তোমরা মদ্বীনার পূণ্য মাটিতে নবুয়তের পবিত্র সাহচর্যে লাভ করেছো তবে তোমাদের প্রাধান্য বিলুপ্ত হবে এবং মিশরে যারা আজ তোমাদের এ বিজয়কে স্বতঃস্ফূর্ত স্বাগত জানিয়েছে তারাই সেদিন তোমাদের বুক লক্ষ্য করে তরবারি উঁচিয়ে ধরবে। যদি মনে করে থাকো যে, সম্পদ উপার্জন, বিলাসী জীবন যাপন ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অবলোকন করতেই তোমরা স্বদেশভূমি ছেড়ে মিশরে এসেছ।

তবে এদেশবাসী তোমাদের প্রতি বিন্দুমাত্র করুণা করবে না। একটি প্রাণীও সহী সালামতে ফিরে যেতে পারবেনা। প্রায় সাড়ে চৌদ্দশ বছর পূর্বে এক আরব সৈনিক-যিনি কোন ইউনিভার্সিটির স্কলার ছিলেন না-বিজয়ী আরবদের লক্ষ্য করে যা বলেছিলেন তা আজ এই মুহূর্তে ইসলামী বিশ্বের বিশেষতঃ আপনাদের এদেশের ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য।

বন্ধুগণ! আপনাদেরও মনে রাখতে হবে انتم فى رباط دائم তোমরা সার্বক্ষণিক প্রহরায় নিয়োজিত আছো। মুহূর্তের অসাবধানতা তোমাদের ঈমান, বিশ্বাস ও স্বাধীনতা বিপন্ন করে দিতে পারে।

তরজমা ঃ মাওলানা আবু তাহের মেসবাহ

দ্বীনী 'ইলম-এর তালিবে 'ইলম ও আলিমগণের জন্য তিনটি চিরন্তন শর্ত

[দারু'ল উলূমের ছাত্র-শিক্ষকবৃন্দের উদ্দেশ্যে ১২ জুলাই, ১৯৭৮ ইং তারিখে প্রদত্ত বক্তব্য। স্থানঃ- দারু'ল উলূম, করাচী, পাকিস্তান।]

পরিচিতি পেশ ঃ দারু'ল উলূমের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী সাহেব (রহ.)-এর সুযোগ্য সন্তান পাকিস্তান ইসলামী গবেষণা পরিষদের সদস্য মাওলানা মুহাম্মদ তকী উছমানী।

মুফ্তী মুহাম্মদ শফী সাহেব (রহ.) ও শীষস্থানীয় আলিমগণের স্মরণে হাম্দ ও সালাতের পর–

দারু'ল উলূমের ছাত্র-শিক্ষকবৃন্দ!

এ যুগের আলিম সমাজের মাঝে আমার মন যাঁদের গভীর পাণ্ডিত্য ও 'ইল্ম-এর দৃঢ়তায় বিশ্বাসী ও শ্রদ্ধাবনত, তাঁদের মাঝে বিশিষ্ট মর্যাদায় আসীন রয়েছেন এ দারু'ল উলূমের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মাওলানা মুফ্তী শফী (রহ.)। জ্ঞানের গভীরতা, ফিকহ ও ফতওয়ায় প্রসারিত সুগভীর দৃষ্টি, শিক্ষকসুলভ দক্ষতা-এসব গুণই মর্যাদা ও ইহতিরামের দাবীদার। কিন্তু এ সব ভিন্ন আরও একটি বিষয় রয়েছে যার কারণে কোন ফকীহ ও মুফ্তীকে ফাকীন্-নাফ্স (জাত ফিকহবিদ) নামে আখ্যায়িত করা হয়। সমকালীন আলিম সমাজের মাঝে এ অনন্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন হযরত মুফ্তী মুহাম্মদ শফী (রহ.)। তিনি ছিলেন আমার উস্তাদগণের বয়স ও সারির বুযুর্গ। আমার দুর্ভাগ্য যে, সরাসরি তাঁর পাঠকক্ষে বসে তাঁর শিষ্যত্ব অর্জনের সুযোগ আমার হয়নি। আমি দেওবন্দের ছাত্র থাকাকালীন যখন তিনি সেখানকার মুদাররিস ছিলেন, তখনও যেহেতু আমি শুধু দাওরায়ে হাদীসের সবকে শরীক হতাম, তাই তাঁর শাগরিদ হওয়ার সৌভাগ্য আমার হয়নি। বাইশ বছর পরে আজ এ মাটিতে পা রাখার সুযোগ হল। অথচ আজ তিনি আমাদের মাঝে নেই। ১৯৫৬-তে একবার বিদেশ থেকে ফেরার পথে দু'তিন দিনের জন্য করাচীতে অবস্থানের সুযোগ হয়েছিল। আল্লাহ্ পাকের শোকর যে, তিনি আজ আমাকে মরহুম মনীষীর শ্রেষ্ঠ স্মারক দারুল উলূম পৌঁছে দিয়েছেন।

আজ পাকিস্তান অভাববোধ করছে হযরত মাওলানা মুফ্তী মুহাম্মদ শফী (রহ.), মাওলানা জাফর আহমাদ উছমানী (রহ.) ও ইউসুফ বিন্নূরী (রহ.)-এর ন্যায় সুগভীর ইলমের অধিকারী ব্যক্তিবর্গের। পরিস্থিতি ও সমস্যা-

সংকুলতার বিচারে প্রকট বাস্তব আজ এটাই যে, এ যুগের প্রয়োজন ছিল হুজ্জাতুল-ইসলাম ইমাম গাযালী, শায়খুল ইসলাম ইবনে তায়মিয়াঁ এবং হাকীমুল ইসলাম শাহ ওয়ালী উল্লাহ্ (রহ.)-র ন্যায় মহান মনীষীবর্গের। আর ঐ ত্রয় জ্ঞানবীর ও দ্বীনী রাহবারদের অনুপস্থিতিতে অন্তত নিকট অতীতের মনীষীত্রয়ের সমপর্যায়ের ব্যক্তিদের প্রয়োজনীয়তা তো অবধারিত। কিন্তু আফসোস। আজ বিদায় নিয়েছেন তাঁরাও।

সময়ের বিবর্তনের অভিযোগ

প্রিয় ছাত্রসমাজ! আমি এখন কথা বলছি দারুল-উলূম বসে। কাজেই আমার বক্তব্য হবে ইলম সম্পর্কিত। ছাত্র-শিক্ষকগণের ভবিষ্যত, তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য এবং সময়ের সংকট ও যুগের সমস্যা সম্পর্কিত। এ কথা আপনারা বারবার শুনে থাকবেন যে, যুগের পরিবর্তন হয়েছে, পৃথিবী বদলে গেছে, বদলে গেছে আসমান-যমীন, পরিবর্তিত হয়েছে চিন্তা করার প্রকৃতি ও ধরন। এমন একটি যুগে দ্বীনী ইলম হাসিল করার উদ্দেশ্য সময় ক্ষেপণ, তাতে অভিজ্ঞতা অর্জন, তার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয় অনুধাবনে মস্তিষ্ক উত্তপ্তকরণ হচ্ছে শীতকালে বাসন্তী সুরে বাঁশী বাজানো কিংবা পাহাড় খুঁড়ে কুটা সংগ্রহের তুল্য। কিন্তু মজার ব্যাপার হল এই যে, শুধু বর্তমান যুগেই নয়, বিগত সব যুগেও সময়ের বিবর্তনের অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে। যে কোন যুগের সাহিত্য ও কাব্য চর্চার ইতিহাস পড়ে দেখুন, সর্বত্রই শ্রুতিগোচর হবে একই কান্নার সুর। যুগ নষ্ট হয়ে গেছে, ইলমের কদর নেই, জ্ঞানী-দ্বীনী জনের মর্যাদা নেই, সর্বত্রই চলছে অজ্ঞতা ও অনভিজ্ঞতার জয়জয়কার। আরবী কাব্য ও সাহিত্য অধ্যয়ন করুন। শুনতে পাবেন কবি আবুল 'আলা' মু'আররীর ফরিয়াদ ঃ

تطاولت الأرض السماء سفاهة وفأخرت الشهب والحصا والجنادل

وقال السها للشمس الست ضئيلة وقال الدجى للصبح لونك حائل

واذا نسب الطائسى بالبخل سادر و عير قسا بالفهاهة باقل

শেষে বলেন ঃ

ياموت زر ا ن الحياة ذميمة ويا نفس جدى ان دهرك هازل

নির্বোধ ধরণী অহংকার ভরা চোখে তাকায় আকাশ পানে,
কাঁকর বালুকণা কটাক্ষ হানে তারকার পানে।

ক্ষুদ্র নিস্প্রভ তারকা কয়, সূর্যি! তুমি অনুজ্জ্বল।
আঁধার রাত ডাকে অরুণ প্রভাতে, তোমার রং নিকষ কালো
ইতর বংশীয় বেটা অপবাদ ঝাড়ে হাতিম তাঈ! তুমি কনজুস
ক্ষেতুয়া (ক্ষেত চাষী) হাঁকে জ্ঞানবীরে, লজ্জা পাও হে অকাট নির্বোধ।

অবশেষে তাঁকে বলতে শুনি–

"মরণ! এসো হে তুমি, জীবন বড় বিষাদ পংকিল,
"আত্মা! সমঝে চল, কালের চোখে তুমি 'এক পাত্র' উপহাসের
অর্থাৎ এ জীবন বিস্বাদ, এখানে মৃত্যুই শ্রেয়; আমার আত্মা!

আত্মমর্যাদা রক্ষা করে বাকী জীবন কাটাও, কারণ জ্ঞানীজনের অবমাননার এ যুগে তুমি একটা উপহাসের পাত্র মাত্র। শুধু আরব কবিরই দোষ দিই কেন? ফার্সীর হাফিজ সিরাজীও তো ক্ষোভে ফেটে পড়েছেন ঃ

কালের বিবর্তনে দেখছি এ কোন উৎকট ফ্যাসাদ!
দিগদিগন্তে জয়জয়কার হাঙ্গামা আর অপকীর্তির।

আহম্মকদের মর্যাদা প্রাপ্তি ও জ্ঞানী সমাজের অমর্যাদার ছবি এঁকেছেন কবি সিরাজী তার পরের পংক্তিতে ঃ

শক্ত গদীর আঘাত ক্ষতবিক্ষত আরবী হাযী
গাধার গলায় ঝুলছে মণি-মুক্তা স্বর্ণহার।

এ তো গেল আরবী ও ফার্সীর কথা। আমাদের উর্দু জগতে আসুন। 'আবে হায়াত' ও অপরাপর কাব্যগ্রন্থে পাবেন অভিন্ন সোচ্চার প্রতিবাদ। কবি অশ্রু ঝরাচ্ছেন দেশ, কাল ও বিবর্তনের অভিযোগ। উস্তাদ 'যওক' এর একটি পংক্তিই এ বিষয়ে যথেষ্ট মনে করি ঃ

অভিজ্ঞরা ঘুরে মরে দিশেহারা, দিগভ্রান্ত,
নির্বোধেরা বাসা বাঁধে সুখের স্বর্গে।
আফসোস! হায় আক্ষেপ রাখি কোথা? আফসোস!

এ কয়েক লাইনে উদ্ধৃতি সংক্ষিপ্ত করলাম। অন্যথায় যুগের নামে অভিযোগ ও ফরিয়াদ করে রচিত কবিতায় ভরে রয়েছে কাব্যগ্রন্থের পাতার পর পাতা। যে কোন কিতাব উল্টিয়ে দেখুন। তাতে রয়েছে সময়ের অবিচারের আহাজারী, অভিযোগের স্তূপ। আর সে সবের মূল সূর একটাই। কার সামনে উপস্থিত করব জ্ঞান-ভাণ্ডার? উজাড় করব অমূল্য বাণী? কে

বুঝবে রত্নের কদর? কে দেবে অমূল্য সম্পদের যথার্থ মূল্য? অপগণ্ড আর অযোগ্যদের প্রবল প্রতিপত্তির যুগে মানুষ কার জন্য করবে শ্রম সাধনা? কেন পানি করে দেবে পিত্ত? কলিজার খুন ঝরাবে কার স্বার্থে? কিন্তু মনে রাখবেন, এসব অভিযোগ যদি আপনার মনে দাগ কেটে রাখে তাহলে আপনার রুচি হবে না মাদরাসায় অবস্থানের, ইচ্ছা হবে না মেহনত করে কিছু শিখতে।

আল্লাহর বিধান অপরিবর্তনীয়

আমি যা নিবেদন করতে চাই তা হল এই যে, কালের বিবর্তন একটি বাস্তব ও অনস্বীকার্য সত্য। এক শতাব্দী পেছনে তাকিয়ে দেখুন, কত খায়র, বরকতে (মঙ্গল ও কল্যাণ) পরিপূর্ণ ছিল সে যুগ, সে যুগের (বুযুর্গদের) বিশিষ্টদের কথা তো স্বতন্ত্র-সাধারণ লোকেরাও ছিল এ যুগের বিশিষ্টদের তুলনায় শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী। তাঁদের ঈমানী তেজ, ধর্মীয় মর্যাদাবোধ ছিল কত অধিক! দ্বীনের ইলম হাসিল করা, নর-নারী নির্বিশেষে প্রত্যেকের হাফিজ-ই কুরআন হওয়ার প্রচলন কত ব্যাপক ছিল। আজ প্রভাব বিস্তার করেছে উদাসীনতাও বস্তুবাদ। ক্ষীণ ও দুর্বল হয়ে গেছে দ্বীনী ইল্ম-এর অনুপ্রেরণা ও উদ্দীপনা। কিন্তু অতীতে সংঘটিত, বর্তমানে ঘটমান ও ভবিষ্যতে সংঘটিতব্য এ বিবর্তন, যার গতি-প্রকৃতি আল্লাহ পাকই সমধিক অবগত, এর আবহমান ধারা সত্ত্বেও আমি বলতে চাই আল্লাহর বিধান অপরিবর্তনীয় । আল-কুরআন যে আয়াতে এ বিধানের ঘোষণা দিয়েছে তাতে পবিত্র কুরআনের অনুসৃত সাধারণ বর্ণনাশৈলীর ব্যতিক্রম করে বিষয়টির পুনরুল্লেখ ও পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে ঃ

ولن تجد لسنة الله تبديلا و لن تجد لسنة الله تحويلا.

আল্লাহর বিধানে তুমি কখনো রদবদল দেখতে পাবে না এবং আল্লাহর বিধানে তুমি কস্মিনকালেও বিবর্তন প্রত্যক্ষ করবে না।

আল্লাহ তা'আলা তাঁর কামিল কুদরত ও পরিপূর্ণ বিজ্ঞতার ভিত্তিতে বিশ্বজগত ও মানব 'ফিতরাত' (স্বভাববিধি)-এর জন্য যে বিধিমালা নির্ণীত করেছেন, যে নীতি স্থির করে রেখেছেন, কিয়ামত পর্যন্ত তাতে কোন রদ-বদল হবে না। আল্-কুরআনের পূর্বাপর অনুসন্ধানী ও হাদীসসমূহের সুগভীর অধ্যয়নের মাধ্যমে অবগতি লাভ করা যেতে পারে সেসব মৌলিক বিধানের সে বিধিমালার তালিকা সুদীর্ঘ। আমার মত নগণ্য তালিবে-ই ইলমের পরক্ষে সে তালিকা প্রদান সাধ্যাতীত। আর সময়ও সে উদ্দেশ্য সাধনে সংকীর্ণতর,

তবুও আমার অসম্পূর্ণ বিদ্যার পরিসর হতে এমন তিনটি বিধানের উল্লেখ করছি যা আমাদের জীবন এবং আমাদের মাদরাসাগুলির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাথে বিশেষভাবে সম্পৃক্ত।

উপকারীর মর্যাদার স্বীকৃতি

আল্লাহর বিধানসমূহের একটি হল কল্যাণকর ও লাভজনক বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া, তার মর্যাদার স্বীকৃতি দেওয়া। উপকারী বিষয় এবং তার ক্ষেত্রে ও কেন্দ্রের প্রতি আসক্তি, উপকারীর খোঁজে লেগে থাকা, তার দিকে ধাবিত হওয়া এবং তা পেয়ে গেলে তাঁর কদর করা মানুষের স্বভাব। আল্লাহ পাক লাভজনক বিষয়ের স্থায়িত্ব, তার জীবন্ত থাকা ও সজীব থাকার গ্যারান্টি দিয়েছেন। লাভশূন্য বিষয়ের জন্য নেই এমন কোন গ্যারান্টি। সূরা আর রা'দ-এ এসেছে এ বিষয়ের সুস্পষ্ট ভাষ্য ঃ

فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الارض كذلك يضرب الله الأمثال.

(বান বন্যায় ভেসে আসা) আবর্জনাগুলি বিলীন হয়ে যায় শুকিয়ে আর যা উপকারী (পানি) তা সঞ্চিত হয় ভূ-গর্ভে। আল্লাহ্ এভাবে দৃষ্টান্ত পেশ করেন লাভ-অলাভ এবং কল্যাণ-অকল্যাণের যাতে তোমরা তা অনুধাবন করতে পার।

একটি বিষয় লক্ষ্য করুন। 'অধিক উপযোগী' বলা হয় নি, বরং আল-কুরআনের পরিভাষা হল "উপকারী"। এ উপকারীর স্থায়িত্বের বিধান চলে আসছে লাখ লাখ বছর ধরে এবং হাজারো রকমের বিবর্তন সত্ত্বেও তা থাকবে অপরিবর্তনীয়। উন্নতি ও অগ্রগতি এবং গুরুত্ব ও মূল্যমানের স্বীকৃতি লিখে দেওয়া হয়েছে উপকারীর ললাটে। সুতরাং উপকারী সত্তারূপে গড়ে ওঠা নিশ্চয়তা দান করে অগণিত বিরুদ্ধাচরণ ও অসংখ্য বিবাদ মুকাবিলায় হেফাজতের। তার প্রয়োজন পড়ে না প্রচার-পাবলিসিটির। কেননা খোদ উপকারী সত্তায় বিদ্যমান থাকে প্রেমাস্পদ হওয়ার গুণ এবং তাতে থাকে না স্থান-কাল-পাত্র ও দেশ-জাতির ব্যবধান। উপকারী যদি আত্মগোপন করে থাকে পাহাড় চূড়ায়, তবুও পৃথিবী তার সন্ধান তুলে নেবে মাথার উপর; বরং সাগ্রহে সাদরে অধিষ্ঠিত করবে চোখের মণিতে। এ হচ্ছে আল্লাহর বিধান এবং হাজারো লাখো বছরের অলংঘনীয় অপরিবর্তনীয় বিধান।

উপকারীর চাহিদা ও সন্ধান

প্রিয় ছাত্রগণ! নিজেদের উপকার ও কল্যাণকররূপে গড়ে তোলার সাধনা করুন। জীবনচলার পথে আঁধার রাতের পথিকবৃন্দ! আপনাদের অস্তিত্বে লাভ করুক পথের দিশা ও আলোকবর্তিকা, আপনাদের সহায়তায় খুলে যাক ইল্‌ম জগতের জটিল গিঁট, সমাধান মিলুক দুর্লংঘ সমস্যার, আপনাদের সান্নিধ্যে সজীব ও প্রাণবন্ত হোক ঈমানী শক্তি।' আপনাদের সান্নিধ্যে এসে মানুষ আহরণ করে নিয়ে যাক একটা কিছু। এ ভাবে আত্মগঠনের পর আপনি যদি আপনার ও লোকদের মাঝে দেয়ালও তুলে দেন, কিংবা দরওয়াজা বন্ধ করে বসে থাকেন, তবুও এখানে একজন 'উপকারী' ব্যক্তি থাকেন, তাঁর দ্বারা অমুক বিষয়ে লাভবান হওয়া যায় (ঈমান ও আত্মার লাভ যা সমধিক গুরুত্বপূর্ণ) এ তথ্য লোকজনের অবগত হওয়ার পর তারা দেয়াল টপকে কিংবা দরওয়াজা ভেঙ্গে উপস্থিত হবে আপনার সমীপে।

এ বিষয়ে হযরত শাহ্ মুহাম্মদ ইয়া'কুব মুজাদ্দিদী ভুপালী (রহ.)-এর একটি ঘটনা মনে পড়ে গেল। আল্লাহ্ পাক তাঁকে দান করেছিলেন জটিল ও সূক্ষ্ম বিষয়গুলি সহজ ও সর্বজনবোধ্য উপমা দিয়ে বুঝিয়ে দেওয়ার বিস্ময়কর কুশলতা। একবার ফোরওয়াহ'-র নওয়াব সাহেব তাঁর কাছে অভিযোগ নিয়ে এলেন-"হযরত! অনেক আগ্রহে অনেক সখ করে অনেক টাকা খরচ করে মসজিদ বানালাম, কিন্তু সেখানে নামায পড়তে আসেনা কেউ।" হযরতের সমাধান পদ্ধতি ছিল অভিনব। অনেক সময় তা রীতিমত পরীক্ষার বিষয় হয়ে যেত। তিনি জওয়াব দিলেন, "নওয়াব সাহেব! দেয়াল তুলে মসজিদের দরওয়াজা বন্ধ করে দিন। একেবারে বন্ধ ঘর বানিয়ে ফেলুন।" এতটুকু শুনতেই সাহেবের বুদ্ধি-বিভ্রম ঘটতে লাগল। তিনি ভাবলেন, এ যে উল্টো চিকিৎসা! বলতে লাগলেন-হযরত ! আমি মসজিদ বানিয়েছি লোকেরা তা আবাদ করবে ভেবে, অথচ আপনি বলছেন দরওয়াজা বন্ধ করে দিতে।" হযরত বললেন, "আমার পুরো কথা শুনে নিন, দরওয়াজা বন্ধ করে ভিতরে একজনকে বসিয়ে দিন পঞ্চাশ টাকার কিছু নোট হাতে দিয়ে; পঞ্চাশ না হয়ে দশ-পাঁচ টাকার নোট হলেও চলবে। বাইরে ঘোষণা করে দিন ঃ মসজিদে নোট বন্টন করা হচ্ছে। আপনি মসজিদ নির্মাণ করেছেন, কিন্তু লোকেরা জানে না নামাযের ছওয়াব ও উপকারিতা। কাজেই তাদের মসজিদে আসার আশা করা যায় কি করে? নোটের অর্থ ও উপকারিতা তাদের জানা। তারা জানে পাঁচ টাকার নোট দিয়ে কত জিনিস সংগ্রহ করা যায়, কত কত

কার্যোদ্ধার হয়। নামায দিয়ে কি কি কেনা যায়, কোন্ কোন্ বিষয়ে উপকৃত হওয়া যায়, তা তাদের অবগতির বাইরে। আর আপনি বসে আছেন শীত-গ্রীষ্মের কষ্ট উপেক্ষা করে, নিজেদের কাজের ক্ষতি করে দূর-দূরান্ত থেকে লোক মসজিদে উপস্থিত হবে সেই আশায়। এভাবে লোক বসিয়ে দেওয়ার পরে আর ঢোল পিটিয়ে প্রচার করার দরকার হবে না। অবিলম্বেই এ কথা (বাতাসে) ছড়িয়ে পড়বে যে, নওয়াব সাহেব কেন জানি মসজিদের দরওয়াজা বন্ধ করে দিয়েছেন, আর ভেতরে লোক বসিয়ে রেখেছেন টাকার নোটসহ। মনে হয় তা বাঁটা হচ্ছে। ফল দাঁড়াবে এই যে, লোকেরা দৌড়ে এসে দরওয়াজা ভেঙ্গে মসজিদে ঢুকে পড়বে, শত বাধা দিয়েও কেউ তাদের রুখতে পারবে না।"

মোটকথা, উপকারী হওয়াই মুখ্য বিষয়। যার ফলে লোকেরা ভিড় করতে থাকে পতংগের ন্যায়। পতংগদের এই কথা বলে দিতে হয় না যে, মোমবাতি জ্বালানো হয়েছে। কেউ কি কোন দিন এমন ঘোষণা দিয়েছে যে, পতংগকুল! বাতির উপরে হুমড়ি খেয়ে পড়। পতংগ ও বাতির মাঝে সংযোগ কিসের? যেখানে পানির আভাস পাওয়া যায়, সেখানেই সমবেত হয় পাখী ও পতংগ, ভিড় জমায় প্রাণী ও মানুষ। সুতরাং বিবর্তনের অভিযোগ প্রমাণ বহন করে অজ্ঞতা, অনভিজ্ঞতা ও সাহসহীনতার।

উপকারীর যাদুকরী ক্ষমতা

আপনাদের একটি মজাদার ঘটনা শোনচ্ছি। আমাদের লাখনৌ শহরে ডাক্তার আবদুল হামীদ (মরহুম) নামে একজন উচ্চশ্রেণীর ডাক্তার ছিলেন। চিকিৎসা শাস্ত্রে তাঁর দক্ষতা, অভিজ্ঞতা ও বিশেষজ্ঞ হওয়ার স্বীকৃতি দিত হিন্দু-মুসলমান সব ডাক্তারই। তিনি আমাকে শুনিয়েছিলেন এ রসপূর্ণ ঘটনাটি। বারা-বাংকীর এক অমুসলিম ধনাঢ্য ব্যবসায়ী দেশ বিভাগের পর কটাক্ষ করে তাঁকে বলেছিল-ডাক্তার সাব! পাকিস্তানে পাড়ি জমাচ্ছেন না কেন? ডাক্তার সাহেব স্বাভাবিক স্বরে জওয়াব দিলেন-জী হাঁ, আমি তো ভারতে থেকে যাওয়ার মনস্থ করেছি। আল্লাহর কি মর্জী! ব্যবসায়ী ভদ্রলোক কোন কঠিন রোগে আক্রান্ত হলেন। বড় বড় ডাক্তার থেকে বিভিন্ন প্রক্রিয়ার চিকিৎসা চালানো হল। কিন্তু উপকার হল না কিছুই। ভদ্রলোক হার স্বীকার করে ডাক্তার হামীদ সাহেবকে অনুরোধ করে পাঠালেন। ডাক্তার সাহেব গিয়ে যখন চিকিৎসা শুরু করলেন তখন বললেন-আমি পাকিস্তানে পাড়ি জমালে কি

করে আজ আমাকে ডেকে পাঠাতেন। আমিই বা কিভাবে আপনাকে সেবা করার সুযোগ পেতাম? আল্লাহর মর্জী, এ চিকিৎসায় তার রোগ মুক্তি ঘটল এবং তাকে লজ্জিত হতে হল।

আপনি যুগের কাছ থেকে আপনার কল্যাণকর ও উপকারী হওয়ার স্বীকৃতি আদায় করুন, সমকালীনদের একথা মেনে নিতে বাধ্য করুন যে, আপনার সঞ্চয়ে বিদ্যমান 'ইল্‌ম দুনিয়ার হাতে নেই। আমি মনে করি, এ পন্থা আপনার হাজারো সমস্যার সমাধান। যে দোকানে যে সওদা পাওয়া যায় তা কেনার জন্য সেখানে যাওয়াই পৃথিবীর নিয়ম। কোন যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিও এমন অধিকতর যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তির কাছে যাতায়াত করে যার কাছে মনের খোরাক এবং রোগের ওষুধ পাওয়া যায়। ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহ.) ছিলেন হাদীস ও ফিক্‌হ শাস্ত্রে তাঁর যুগের ইমাম এবং বাগদাদে জনতার লক্ষ্যবিন্দু। কিন্তু মনের খোরাকও আত্মার প্রশান্তি লাভের জন্য তিনি যাতায়াত করতেন শহরের এমন এক বুযুর্গের সোহবতে, যিনি 'ইলমের মানদণ্ডে ইমাম সাহেবের ধারে-কাছেও ছিলেন না। একবার ইমাম সাহেবের এক ছেলে পিতাকে বলল–আব্বাজান! আপনি ওখানে যাতায়াত করলে সমাজে আমাদের মাথা নত হয়ে যায়। ইমাম সাহেব জওয়াব দিলেন, বৎস! সেখানে আমি প্রত্যক্ষ করি আমার অন্তর-জগতের কল্যাণ।

এই দরসে নিজামী–যার প্রভাব আজ বিশ্বব্যাপী, এর বিন্যাস করেছিলেন মুল্লা নিজাম উদ্দীন ফিরিংগী মহল্লী (লাখনবী)। তিনি ছিলেন গোটা ভারতের আলিম সমাজের উস্তাদ। এত জ্ঞান ও পাণ্ডিত্য সত্ত্বেও তিনি ছিলেন অযোধ্যার বাঁসা এলাকার বুযুর্গ হযরত সায়্যিদ আবদুর রাজ্জাক বাঁসাবী কাদিরী (রহ.) -এর মুরীদ। উক্ত বুযুর্গের শিক্ষার পরিধি ছিল প্রাথমিক স্তর পর্যন্ত, কথা বলতেন আঞ্চলিক 'পুরাবিয়া' ভাষায়। মুল্লা সাহেব ঐ বুযুর্গের মালফূজাতও (বাণীমালা) সংকলন করেছেন। তাতে তিনি নাম উল্লেখ করেছেন ভক্তি ও শ্রদ্ধাপ্লুত ভংগীতে। এর কারণ হল এই যে, তিনি নিজের মাঝে অনুভব করতেন এক শূন্যতা, যা পূর্ণ হবে ঐ দরবারে গেলে। সবার উস্তাদ হয়ে তিনি খুঁজে ফিরছিলেন এমন এক ব্যক্তিকে, যাঁর সান্নিধ্যে নিজের অযোগ্যতা ও "কিছু না হওয়ার" উপলব্ধি জাগে এবং আরো পড়বার, আরো শিখবার উদগ্র বাসনা সৃষ্টি হয়। দিল্লীর শাহ্ আবদুল আযীয (রহ.)-এর পক্ষ থেকে 'শায়খুল-ইসলাম' খেতাবে ভূষিত হযরত মাওলানা আবদুল হাই বাড়ানভী এবং হুজ্জাতুল ইসলাম খেতাবে ভূষিত হযরত মাওলানা শাহ্ ইসমাঈল শহীদ

(রহ.) সম্পর্ক জুড়েছিলেন হযরত সায়্যিদ আহমাদ শহীদ (রহ.)-এর সাথে। অথচ সায়্যিদ সাহেবের শ্রেণীকক্ষের পাঠ সমাপ্ত হয়েছিল না। দেওবন্দ-এর মুরুব্বীদের বর্ণনা- সায়্যিদ সাহেব যখন এ এলাকায় শুভাগমন করলেন, তখন ঐ মহান দুই ব্যক্তির অবস্থা ছিল এই যে, সায়্যিদ সাহেব খাটে শুয়ে আরাম করতেন, আর তাঁরা দু'জন খাটের দু'ধারে বসে থাকতেন। সায়্যিদ সাহেব চোখ খুলে কিছু বললে তাঁরা দীর্ঘক্ষণ সে বাণী-চর্চা করে তার স্বাদ আস্বাদন করতেন।

স্বনির্ভরতা ও নিস্বার্থপরতার শক্তি অপরিসীম

দ্বিতীয় বিষয়টি হল আত্মনির্ভরতা ও স্বার্থত্যাগ। এটাও আল্লাহর অপরিবর্তনীয় বিধান যে, যারা হাত পাতে, মানুষ তাদের থেকে দূরে সরে যায়। যারা আঁচল পেতে ধরে, তাদের দেখলে মানুষ পালিয়ে যায়, আর যারা নিজের মুষ্টি বন্ধ করে রাখে, আঁচল গুটিয়ে রাখে, লোকেরা তাদের পদচুম্বন করে এবং খোশামোদ করে কিছু গ্রহণ করাতে পারলে ধন্য হয়ে যায়। অনাদিকাল থেকে আত্মনির্ভরতা ও স্বাবলম্বিতায় নিহিত রয়েছে আকর্ষণ ও জনপ্রিয়তা আর হাত পাতায় রয়েছে অপমান ও বেইয্যতী। যে স্বনির্ভর, সকলে তার মুখাপেক্ষী আর যে পরনির্ভর, সকলে তার প্রতি তোয়াক্কাবিহীন। আল্লাহর এ বিধানও চিরন্তন। সময়ের বিবর্তন তাতে আনেনি কোন পরিবর্তন। চতুর্থ শতকের ইতিহাস পড়ুন, সেখানে একই অবস্থা, ইতিহাস পড়ুন অষ্টম শতকের, সেখানেও বিরাজমান একই অবস্থা, আর আজকে এ চতুর্দশ শতকেও সে বিধি অপরিবর্তিত। সব যুগেই আপনি পাবেন অভিন্ন ধারার ঘটনাপঞ্জী। অধিক ঘটনা বা বিশদ বর্ণনার অবতারণা করতে চাই না। বুযুর্গানে দ্বীনের জীবন-চরিত এবং তাসাওউফের ইতিহাস ভরা রয়েছে এসব ঘটনায়। এ বিষয়ে আপনাদের সম্ভবত রয়েছে নিজস্ব অভিজ্ঞতা কিংবা আপনার আপনাদের উস্তাদ ও মুরুব্বীদের কাছে শুনে থাকবেন তাঁদের উস্তাদ বুযুর্গানে দ্বীনের ঘটনাবলী।

পরিপূর্ণতা অর্জন মর্যাদার চাবিকাঠি

তৃতীয় এবং শেষ বিষয় হল, সম্পূর্ণতা, অনন্যতা, পারদর্শিতা এবং কোন বিষয়ে পরিপূর্ণ দক্ষতা লাভ। ঊর্ধ্ব জাগতিক মহাজ্ঞান তো বটেই- জাগতিক শাস্ত্রীয় বিদ্যায়ও যদি কেউ পরিপূর্ণতা অর্জন করতে পারে; বরং আরো নিম্নমানের ব্যবহারিক কোন বিষয়ে, যথা-হস্তাক্ষর শিল্প, বাইন্ডিং শিল্পে দক্ষতা

অর্জন করে তাহলে কত কত নামকরা বিদ্বানকে তাদের পিছনে ঘুরতে দেখা যায়। অনেক জ্ঞানী-গুণী-গ্রন্থকার, নামী-দামী পাবলিশার, কাতিব (হস্তাক্ষর শিল্পী) ও কম্পোজিটরদের অন্যায় আবদার ও মান-অভিমান সয়ে যায়। তদুপরি তাদের অনুনয় ও খোশামোদ করতে থাকে। উদ্দেশ্য যথাসময়ে লেখাটি কম্প্লিট করে দেওয়া কিংবা অন্তত ব্লক তৈরীর উদ্দেশ্য গ্রন্থের নামটা আর্ট করে দেওয়া।

কোন বিষয়ে অনন্য বৈশিষ্ট্য সমৃদ্ধ কিংবা দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার অধিকারী কোন ব্যক্তিকে যদি আপনি দেখেন কিংবা তার বিষয়ে শুনতে পান যে, বেকারত্ব ও অসচ্ছলতার অভিশাপে ভুগছে, তাহলে অবশ্যই আপনাকে মনে করতে হবে যে, সে গুণবান ব্যক্তির মাঝে রয়েছে এমন কোন দুর্বলতা কিংবা স্বভাব দোষ, যা তার যাবতীয় গুণ ও যোগ্যতাকে পর্দাবৃত করে রেখেছে, তাতে পানি ঢেলে দিয়েছে। যেমন– অতিশয় ক্রোধ, মেজাজের অস্থিরতা, অলসতা, পাঠদানে অমনোযোগিতা, কর্মবিমুখতা, নিয়ম ভঙ্গের অভ্যাস, পরমতে অসহিষ্ণুতা ইত্যাদি কিংবা আরও অধিক মারাত্মকরূপে সে কিছুটা উন্মাদ বা আধা-পাগল অথবা উত্তপ্ত স্বভাবের। তাই সে স্থির হতে পারে না কোথাও, ঝগড়া বাঁধিয়ে দেয় মুহূর্তে। নিশ্চিতই তার মাঝে বিদ্যমান থাকবে এ ধরনের কোন উপকরণ, যার পরিণতিস্বরূপ জগত তার কল্যাণ থেকে মাহরূম আর সে নিজে পরিত্যক্ত হয়েছে অবহেলা ও বিস্মৃতির অজ্ঞাত কোণে।

এই হল সেই তিনটি চিরন্তন শর্ত ও গুণ, যার ব্যাপারে বিধান হল--যুগ ও যুগের বাসিন্দারা যতই বিগড়ে যাক, এ তিন গুণের যাদুকরিতা ও লোকপ্রিয়তা অক্ষুন্ন রয়েছে ও থাকবে। আমাদের মাদরাসাসমূহের ফারেগীন ও নববী ইলমের তালিব (ছাত্র)-গণকে পূরণ করতে হবে এ তিনটি শর্ত, তাদের হতে হবে এ গুণাবলীতে গুণান্বিত।

তরজমা ঃ মাওলানা আবু তাহের মেসবাহ

মাদরাসার ছাত্রদের মর্যাদা ও দায়িত্ব-কর্তব্য

[প্রবন্ধটি ১৯৫৪ সালের মার্চ মাসে দারুল উলূম দেওবন্দে ছাত্রদের এক সভায় পাঠ করা হয়। পরে তা পুস্তিকা আকারে প্রকাশ করা হয়।]

প্রিয় বন্ধুগণ! আপনারা দ্বীনী মাদরাসার শিক্ষার্থী; আর আমি তার নগণ্য খাদেম ও আপনাদের সহযাত্রী। এ হিসেবে কিছু কথা আজ আরজ করতে চাই। বিষয়বস্তুর গুরুত্ব ও বর্তমান যুগের দাবী হচ্ছে, আমি আপনাদের সামনে জীবনের অভিজ্ঞতার এবং সীমিত অধ্যয়নের ফলাফল নিঃসংকোচে ব্যক্ত করি। যাত্রাপথে প্রাপ্ত সবচে' মুল্যবান ও প্রিয় সওগাত আপনাদের সামনে পেশ করি। আপনারা আমাকে কিছু কথা আরজ করার সুযোগ দিয়ে অনেক অনেক সম্মান দান করেছেন, পূর্ণ আস্থা ও মুহাব্বতের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন। তাই আমি সেই মুহাব্বত ও আস্থার যথাযথ মূল্যায়ন করতে চেষ্টা করব এবং আপনাদের ব্যস্ততম জীবনের এ সংক্ষিপ্ত সময় থেকে উপকৃত হওয়ার প্রয়াস পাব।

বন্ধুগণ! আপনাদের এ সময় তো অত্যন্ত মূল্যবান। প্রতিটি মুহূর্ত সাধারণ মানুষের একমাস, এমনকি এক বছরের সাথে তুলনা করা যায়।

মাদরাসার পরিচয়

বন্ধুগণ! আমাদেরকে সর্বপ্রথম জানতে হবে, একটি দ্বীনী মাদরাসার মর্যাদা ও তার পরিচয় কি? মাদরাসা তো এ দুনিয়ার সবচে' বড় কর্মক্ষেত্র, যেখানে মানুষ গঠন করা হয়, দ্বীনের দা'য়ী ও ইসলামের সিপাহী তৈরী হয়। মাদরাসা হল মুসলিম বিশ্বের পাওয়ার হাউজ, সেখান থেকে মুসলিম জনবসতি তথা সারা দুনিয়ায় আলোক-রশ্মি বিতরণ করা হয়। মাদরাসা হল এমন এক কারখানা যেখানে মানুষের মন-মগজ, ধ্যান-ধারণা ও চিন্তা-চেতনা বিকশিত করা হয়। সৃষ্টিকুলের প্রতিটি অণু-পরমাণুর বিচার- বিশ্লেষণ করা হয়।

মাদরাসা মানবজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্র পর্যবেক্ষণ করে। তার শাসনে সারা দুনিয়ায় চলে। কিন্তু দুনিয়ার কোন শাসন তার উপর চলে না।

মাদরাসার সম্পর্ক কোন বিশেষ কালের সাথে নয়। সুনির্দিষ্ট কোন তাহযীব-তামাদ্দুন, কৃষ্টি-কালচার বা ভাষা ও সাহিত্যের সাথে নয়। অতএব, তার প্রাচীনত্ব সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করা বা তার স্থায়িত্ব নিয়ে দ্বিধাবোধ করার কোন অবকাশ নেই।

মাদরাসার সম্পর্ক হল সরাসরি নবুয়তে মুহাম্মাদীর সাথে, যা চিরন্তন ও সার্বজনীন। যে মানবতা সদা গতিশীল ও যে জীবন সদা চলমান তার সাথে রয়েছে মাদরাসার সম্পর্ক। মাদরাসা মুলতঃ প্রাচীনত্ব ও নতুনত্বের বিতর্ক থেকে সম্পূর্ণ উর্ধ্বে। কারণ এতে নবুয়তে মুহাম্মাদীর অবিনশ্বরতা এবং মানব জীবনের উন্নতি, অগ্রগতি উভয়টিই পাওয়া যায়।

মাদরাসার সুকঠিন যিম্মাদারী

প্রিয় তালিবানে ইলম! কোন মাদরাসাকে যদি শুধু একটি মিউজিয়াম বা অতীত স্মৃতি সংরক্ষণের কেন্দ্র মনে করা হয়, তাহলে এটি হবে বড় আপত্তিকর বিষয়। আমি মনে করি মাদরাসা হল এক শক্তিশালী ও মজবুত ঘাঁটি। উন্নতি-অগ্রগতি ও জীবন পরিচালনার এক জীবন্ত মারকায। তার এক প্রান্ত নবুয়তে মুহাম্মাদীর সাথে এবং অপর প্রান্ত মানবজীবনের সাথে সংযুক্ত। মাদরাসা নবুয়তে মুহাম্মাদীর জীবন্ত ঝর্ণা থেকে পানি সংগ্রহ করে জীবনরূপ ক্ষেত-খামারে তা সিঞ্চন করে।

মাদরাসা যদি তার দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে অবহেলা করে তাহলে সেই জীবনরূপ ক্ষেত-খামার শুষ্ক হয়ে যাবে, মানবতার অপমৃত্যু ঘটবে। আর তখন নবুয়তে মুহাম্মদীর ঝর্ণার প্রবাহ বাকী থাকবে না। মানবতার পিপাসাও নিবৃত হবে না।

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নবুয়তের ঝর্ণাধারা সদা-সর্বদা অবারিত, সকলের জন্য উন্মুক্ত। এতে কোন কার্পণ্য নেই, মানবতার ভিক্ষার ঝুলির প্রতি তার কোন বিমূখতা নেই। জবানে নবুয়ত থেকে যেমন একদিকে ইরশাদ হচ্ছে ঃ إنما أنا قاسم والله يعطي "আমি তো শুধু বন্টনকারী আর আল্লাহ্ হলেন দাতা।" অপরদিকে মানবতা চিৎকার করে বলছে هل من مزيد "আরো পেতে চাই, আরো পেতে চাই।"

প্রিয় ছাত্র বন্ধুরা! মাদরাসার চেয়ে ব্যস্ত, গতিশীল ও প্রাণবন্ত কোন প্রতিষ্ঠান এ দুনিয়াতে থাকতে পারে না। মানবজীবনের সমস্যার কোন অন্ত নেই। পরিবর্তন-পরিবর্ধনেরও কোন সীমা নেই। তার চাহিদা, কামনা-বাসনা অসংখ্য। ভুল-ভ্রান্তি, পদস্খলন ও গুনাহ বেশুমার। অতএব, মাদরাসা যেহেতু এ বৈচিত্র্যময় জীবন পরিচালনার দায়িত্বভার নিজ কাঁধে বহন করেছে, তাই তার অবসর নেয়ার সুযোগ কোথায়? দুনিয়ার অন্যান্য প্রতিষ্ঠান কর্মব্যস্ত

থাকলেও অবসর নেয়ার সুযোগ আছে; কর্মবিরতির পথ আছে। কিন্তু মাদরাসার অবস্থা সেরূপ নয়। দুনিয়ার সকল মুসাফির বিশ্রাম নিতে পারে। কিন্তু মাদরাসার জন্য মুহূর্ত পরিমাণ বিশ্রাম নেয়ার কোন কল্পনাও করা যায় না।

জীবন প্রবাহে যদি স্থিরতার অবকাশ থাকতো, তাহলে মাদরাসার জন্যও সামান্য বিশ্রাম নেয়ার সুযোগ ছিল। কিন্তু জীবনের গতিধারা যেহেতু থামবার নয়, তাই মাদরাসার কর্মবিরতির কোন প্রশ্নই আসে না।

জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত নিরীক্ষণ করা, নবউদ্ভূত প্রশ্নের সমাধান দেয়া এবং বিভ্রান্ত মানুষকে দিক-নির্দেশনা দান করা মাদরাসার দায়িত্ব। মাদরাসা যদি তার যাত্রাপথে পিছনে থেকে যায় বা ক্লান্ত হয়ে কোথাও যাত্রা বিরতি করে অথবা মনোরম কোন দৃশ্য দেখে তার মন এর প্রতি আসক্ত হয়ে যায়, তাহলে এ গতিশীল জীবনের নেতৃত্ব দেবে কে? নবুয়তের চিরন্তন শাশ্বত পয়গাম কে তাকে শুনাবে?

মাদরাসার জন্য কোন রকম নিষ্ক্রিয়তা, কর্মবিমুখতা ও নেতৃত্ব থেকে দূরে থাকা আত্মহত্যারই শামিল; যা মানবতার সাথে চরম বিশ্বাসঘাতকতা বৈ আর কিছুই নয়। কোন আত্মসচেতন ও দায়িত্বশীল মাদরাসার ক্ষেত্রে তা কল্পনাও করা যায় না।

মাদরাসার ছাত্র ও ফারেগীন আলেমগণের যিম্মাদারী

বন্ধুগণ! মাদরাসার ছাত্র হিসাবে আপনাদের দায়িত্ব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও সুমহান। দুনিয়াতে এরচে' বেশি গুরুত্বপূর্ণ ও ব্যস্ততম দায়িত্ব বর্তমান যুগ-সন্ধিক্ষণে আর কারো আছে বলে আমি জানি না। পুনর্বার সে কথাটি ভেবে দেখুন যে, আপনাদের সম্পর্ক এমন এক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে; যার এক প্রান্ত দৈনন্দিন জীবন প্রবাহ ও অপর প্রান্ত নবুয়তে মুহাম্মাদীর সাথে সম্পৃক্ত। এ সুমহান গৌরব ও গুরুত্বপূর্ণ যিম্মাদারীর অধিকারী হওয়া আপনাদের মহত্ত্বের সবচেয়ে বড় দলিল।

আমার প্রিয় তালিবানে ইলম! আপনারা নবুয়তে মুহাম্মাদীর সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যেমন বড় সৌভাগ্য ও সুউচ্চ মর্যাদার অধিকারী হয়েছেন, তেমনি এক বিরাট যিম্মাদারী আপনারা নিজ কাঁধে বহন করছেন। আপনাদের নিকট বাস্তবসম্মত আক্বীদা-বিশ্বাসের সবচেয়ে বড় দৌলত রয়েছে, যা অন্য কারো কাছে নেই।

নবুয়তে মুহাম্মাদীর সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার কারণে আপনাদের উপর যে সমস্ত দায়িত্ব আরোপিত হয় তা নিম্নরূপ ঃ

১. পাহাড়সম দৃঢ়-মজবুত ঈমান থাকতে হবে এবং এমন সাহসের অধিকারী হতে হবে, যাতে সারা দুনিয়ার বিনিময়ে হলেও কেউ আপনাদের ঈমানী চেতনা ও ধর্মীয় আদর্শ ক্রয় করার কল্পনাও করতে না পারে।

২. আপনাদের হৃদয়ে ঈমান সংরক্ষণ করার জযবা থাকতে হবে, এর উপর গর্ববোধ করতে হবে এবং সর্বান্তঃকরণে তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে হবে।

৩. আপনাদের অন্তরে ধর্মীয় সততা, যৌক্তিকতা ও চিরন্তনতার সুদৃঢ় বিশ্বাস থাকতে হবে। তার অসীম শ্রেষ্ঠত্ব, মহত্ত্ব ও নির্ভুলতার ইয়াকীন রাখতে হবে।

৪. আপনাদের নিজস্ব মতাদর্শের পরিপন্থী সব কিছুকে জাহেলিয়াতের মীরাস মনে করতে হবে।

৫. আপনারা আল্লাহর নির্দেশাবলী, রাসূলের হেদায়াত শোনার সাথে সাথে যেমন স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলে উঠবেন سمعنا وأطعنا "আমরা শুনলাম ও মানলাম।" তেমনিভাবে জাহেলিয়াতের শিক্ষা-সংস্কৃতি ও তার নীতিমালার কথা শুনে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলে উঠবেন,

كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده

"আমরা তোমাদের প্রতি বিদ্রোহ ঘোষণা করলাম। তোমরা যতদিন এক আল্লাহকে বিশ্বাস না করবে ততদিন তোমাদের ও আমাদের মাঝে শত্রুতা ও সংঘাত বিদ্যমান থাকবে।" (সূরা মুমতাহিনা-৪)

৬. দুনিয়াতে ইসলামই একমাত্র মুক্তির পথ। রাসূলের আদর্শই একমাত্র শান্তির প্রতীক। তাঁর অনুকরণেই নিহিত রয়েছে সফলতা ও কামিয়াবীর চাবিকাঠি। ব্যক্তি, সমাজ ও জাতির শ্রেষ্ঠত্ব এরই মাঝে লুকায়িত রয়েছে -এ বিশ্বাস হৃদয়-মনে বদ্ধমূল করতে হবে। একথা তো বাস্তব সত্য–

محمد عربی کہ آبروے ہر دو سرا است
کسیکہ خاک درش نیست خاک بر سر او

"মুহাম্মাদ আরাবীই হচ্ছেন সম্মান ও মর্যাদার একমাত্র উৎসস্থল, কেউ যদি তাঁর পদতলে নিজেকে বিলীন করতে না পারে, তাহলে তার ধ্বংস অনিবার্য।"

৭. ইলমে নবুয়তকে যাবতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের সার-নির্যাস মনে করতে হবে, দুনিয়ার মানব রচিত বস্তুকেন্দ্রিক তত্ত্ব-দর্শন, যুক্তি ও তর্ক-জ্ঞান এসব কিছুকে কল্প-কাহিনীর উর্ধ্বে স্থান দেয়া যাবে না।

৮. আপনাদের কাছে তাওহীদের পরিপূর্ণ জ্ঞান থাকতে হবে এবং এর উপর অবিচল আস্থা রাখতে হবে। শিরক, কুফর ও প্রতিমা পূজার দর্শন যতই আকর্ষণীয় পন্থায়, জ্ঞান-বিজ্ঞানের পরিভাষায় উপস্থাপন করা হোক, সেগুলোকে তুচ্ছ মনে করতে হবে। زخرف القول غرورا "অন্তঃসার শূন্য, চাকচিক্যময় ভাষা" বলেই সেগুলোকে আখ্যা দিতে হবে।

৯. সুন্নাতে রাসূলের প্রতি আপনাদের লালায়িত হতে হবে এবং রাসূলের আদর্শকে সর্বোত্তম আদর্শ হিসেবে বিশ্বাস করতে হবে। বিদ'আত-কুসংস্কারের ক্ষতি এবং আল্লাহর দরবারে তা গ্রহণযোগ্য না হওয়ার ইয়াকীন রাখতে হবে।

মোটকথা, আপনাদের বিশ্বাস, মতাদর্শ, রুচিবোধ, ধ্যান-ধারণা ও চিন্তা-চেতনায় তথা দৈনন্দিন জীবনের যাবতীয় কার্যকলাপে নবুয়তে মুহাম্মাদীর ব্যাপকতা ফুটে উঠতে হবে।

মাদরাসার ছাত্র ও ফারেগীন আলিমগণের বৈশিষ্ট্য

বন্ধুগণ! দুনিয়াতে অন্যান্য মানুষের তুলনায় আপনাদের বিশেষত্ব হচ্ছে, তারা মোটামুটি ঈমান আনলেই যথেষ্ট হবে। কিন্তু আপনাদের ঈমান মজবুত হওয়ার সাথে সাথে সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট জ্ঞান ও মজবুত আস্থা থাকতে হবে। শুধু মুখে স্বীকার করাই যথেষ্ট নয়; বরং তার দাওয়াতও দিতে হবে। সাধারণ লোকদের ঈমান শুধু নিজেদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে পারে, কিন্তু আপনাদের ঈমান তাদের উপর প্রভাব বিস্তারকারী হতে হবে। হাজারো, লক্ষ মানুষের ধ্যান-ধারণা পরিবর্তন করে দেয়ার শক্তি থাকতে হবে। আর এটা তখনি সম্ভব যখন আপনার হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখ সবকিছু একমাত্র আল্লাহর জন্য উৎসর্গ করা হবে এবং তাগুতী শক্তির প্রতি আপনাদের মনোভাব হবে ঠিক তেমন যেমন- রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন,

يكره ان يعود إلى الكفر كمايكره أن يقذف في النار

"জ্বলন্ত অগ্নিকুন্ডে নিক্ষিপ্ত হতে যেমন মানুষ ভয় পায়, ঈমান আনার পর কুফপরের প্রতি ধাবিত হওয়াকে ঠিক তেমনি ভয় পাবে।"

সাধারণ মানুষের কাছে নবুয়তের শিক্ষা মোটামুটি থাকলেই যথেষ্ট। কিন্তু ইলমে নবুয়তে আপনাদের সুগভীর ধারণা থাকতে হবে। এর প্রতি চরম আবেগ, উৎকণ্ঠা এবং সর্বস্ব বিলীন করে দেয়ার মানসিকতা লালন করতে হবে। তা না হলে মানুষকে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেয়ার বিষয়টি কল্পনাও করা যায় না। বরং এ ফিতনার যামানায় নিজেদের পুঁজি ও স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য নিয়ে বেঁচে থাকাই মুশকিল হয়ে দাঁড়াবে।

আধ্যাত্মিক গুণাবলী

নবুয়তে মুহাম্মাদীর মধ্যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের অফুরন্ত ভাণ্ডার ও সুবিপুল সম্পদ রয়েছে। যেমন ইরশাদ হচ্ছে,

فان الأنبياء لم يورثوا دينارا ولادرهما ولكن ورثوا العلم

"আম্বিয়ায়ে কেরাম টাকা-পয়সা, ধন-দৌলত উত্তরাধিকার হিসাবে রেখে যাননি। তাঁরা তো শুধু পরবর্তীদের জন্য ইলমের মীরাস রেখে গিয়েছেন।" কুরআন, হাদীস ও ফিকাহ যা আকারে সংরক্ষিত আছে। আল-হামদুলিল্লাহ! বর্তমান যুগে আপনাদের এ মাদরাসা উলূমে নবুয়ত শিক্ষাদানের এক বিরাট কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে।

উপরোক্ত জ্ঞান-ভাণ্ডারের সাথে আধ্যাত্মিক শিক্ষা, অভ্যন্তরীণ গুণাবলীও নবুয়তে মুহাম্মাদী দান করেছে। কুরআন, হাদীস ও ফিকাহ শাস্ত্র তথা জাহেরী উলূম যেমন যুগ যুগ ধরে সংরক্ষিত হয়ে আসছে, তেমনি আধ্যাত্মিক গুণাবলীও সংরক্ষিত হয়ে আসছে। আল্লাহ তা'আলা কেয়ামত পর্যন্ত উভয়জ্ঞান সংরক্ষণ করার ব্যবস্থা করেছেন।

আধ্যাত্মিক গুণাবলী হলো ইয়াকীন, ইখলাছ, তায়াল্লুক মাআল্লাহ, খুশু'-খুযূ' দরদ, মুহাব্বত, তাওয়াক্কুল আলাল্লাহ ইত্যাদি। এ উভয় জ্ঞানের সমষ্টির নাম হচ্ছে ইলমে নবুয়ত। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة.

"তিনি এমন সত্তা যিনি নিরক্ষর মানুষের মধ্যে একজন রাসূল প্রেরণ করেছেন, যিনি তাঁর আয়াত তেলাওয়াত করেন, লোকদের পূত-পবিত্র করেন, কিতাবুল্লাহর জ্ঞান ও হিকমত শিক্ষা দান করেন।" (সূরা- জুমু'আ-২)

অতএব, নবুয়তে মুহাম্মাদী থেকে শুধুমাত্র জাহেরী জ্ঞান-বিজ্ঞান অর্জন করলে আর আধ্যাত্মিক গুণাবলী ত্যাগ করলে নবুয়তের পূর্ণাঙ্গ ওয়ারিছ হওয়া যাবে না। সঠিক অর্থে তাদেরকে নায়েবে রাসূল বলা যাবে না।

দুনিয়াতে যাঁরা রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর প্রতিনিধি হয়েছেন, ইসলামের পয়গাম আমাদের কাছে পৌঁছিয়েছেন, তাঁরা ইলমে নবুয়তের আংশিক আমানতদার ছিলেন না, জাহেরী উলূম ও আধ্যাত্মিক গুণাবলী উভয় দৌলতের তাঁরা অধিকারী ছিলেন। বর্তমান যামানাতেও ইসলামের দাওয়াত ও তার বিপ্লব সাধন করতে হলে শুধুমাত্র ইলমে নবুয়তের একাংশ দ্বারা তা করা যাবে না। যে সমস্ত বুযুর্গানে দ্বীনের সাথে আপনাদের সম্পর্ক রয়েছে, তাঁরাও উভয়বিধ গুণাবলীর অধিকারী ছিলেন। অতএব আপনারাও যদি খাঁটি নায়েবে রাসূলের আসনে সমাসীন হতে চান, তাহলে নিজেদের মধ্যে জাহেরী উলূম ও আধ্যাত্মিক গুণাবলী উভয়টির সমন্বয় সাধনের চেষ্টা চালাতে হবে। এছাড়া যাবতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান হলো কাগজের ফুলের ন্যায়, যাতে নেই কোন খোশবু, নেই কোন সজীবতা। দুনিয়ার বাজারে কাগজের ফুলের কোন অভাব নেই। আমরা শত চেষ্টা করেও এতে তেমন কিছু সংযোজন করতে পারব না। এখানে তো নবুয়তের বাগানের সজীব তরতাজা ফুলের প্রয়োজন, যার সুগন্ধিতে দিগ-দিগন্ত মোহিত হয়ে যাবে এবং তার সামনে দুনিয়ার সমস্ত ফুল লজ্জায় মাথা নত করে দেবে।

فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون

"সত্য বিকশিত হল আর তাদের যাবতীয় কর্মকাণ্ডের অন্তঃসারশূন্যতা প্রমাণিত হলো।"

দ্বীনী মাদরাসাসমূহে আধ্যাত্মিক গুণাবলীর অবক্ষয়

আপনারা কিছু মনে করবেন না, আমিও আপনাদের মত একজন। আমাদের এ সমস্ত দ্বীনী মাদরাসায় অনেক দিন থেকে সেই তরতাজা সুগন্ধময় ফুল তৈরী হচ্ছে না। দিন দিন আমাদের মাঝে নৈতিক অবক্ষয় নেমে

আসছে। হৃদয় পাষাণ করে রেখে আমাদের শুনতে হবে এবং বিবেচনা করতে হবে এ বিষয়টি কতটুকু সত্য যা কবি বলেছেনঃ

اٹھا میں مدرسہ و خانقاہ سے نمناک
نہ زندگی، نہ محبت، نہ معرفت، نہ نگاہ

"মাদরাসা, খানখাহ হতে অশ্রুসিক্ত নয়নে বেরিয়ে এলাম
পেলাম না তো সেথায় সঞ্জীবণী সুধা, মুহাব্বত,
মা'রেফাত ও সেই অর্ন্তদৃষ্টির প্রকৃত সন্ধান।"

এ নৈতিক অবক্ষয়ের ফলে অতীতের তুলনায় শত-সহস্রগুণ ছাত্র প্রতি বছর ফারেগ হলেও, সমাজের উপর এরা কোন কার্যকরী প্রভাব ফেলতে সক্ষম হচ্ছে না।

কয়েকজন বিপ্লবী মানুষ ঃ

এ উপমহাদেশে অতীতে খাজা মু'ঈনুদ্দীন আজমিরী (রহ.), সাইয়েদ আলী হামাদানী কাশ্মিরী (রহ.)-এর মত সহায়-সম্বলহীন বুযুর্গানে দ্বীন এসেছেন এবং তাদের হৃদয়ের উষ্ণতা, আবেগ-ব্যাকুলতা ও ঈমানের আলোক-রশ্মি দ্বারা সারা দেশ আলোকোজ্জ্বল করেছেন। হযরত মুজাদ্দেদে আলফে ছানী (রহ.) মুঘল সম্রাজ্যে এক বিস্ময়কর বিপ্লব সৃষ্টি করেন। তার নিঃশব্দ, মৌন প্রচেষ্টায় বাদশাহ আকবরের সিংহাসনে আমরা আওরঙ্গজেবের মত দ্বীনী ব্যক্তিত্ব সমাসীন হতে দেখেছি। শাহ ওয়ালীউল্লাহ (রহ.) এসে এ সুবিশাল রাজ্যের গতিধারা সম্পূর্ণ পাল্টিয়ে দেন। তিনি মানুষের চিন্তা-চেতনা ও প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় এক বিপ্লবী ভূমিকা পালন করেন। হযরত মাওলানা কাসেম নানুতুবী (রহ.) অত্যন্ত নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতিতে এবং মুসলমানদের অধঃপতনের যুগে ইসলামের এক সুদৃঢ়-মজবুত দুর্গ নির্মাণ করেন এবং ইলমে শরীয়তের মরণোন্মুখ দেহে সঞ্জীবনী শক্তি ফিরিয়ে আনেন। কিছুদিন পূর্বে মাওলানা ইলিয়াস (রাহ.) দ্বীনী দাওয়াত ও ঈমানী মেহনতের এক নতুন চেতনা দান করেছেন। মোট কথা–

جہانے را دگرگوں کرد یک مرد خود آگاہے

"এক একজন আত্মসচেতন ব্যাক্ত এসে পৃথিবীকে নতুন রঙ্গে রঙ্গীণ করে দিয়েছেন।"

আজ আমাদের ফারেগ ছাত্রদের মধ্যে সেসকল গুণাবলী ও রূহ নেই। যার দ্বারা মানুষ নিজেদের আত্মপরিচয় লাভ করবে এবং জীবনের গতিধারা পরিবর্তন করতে বাধ্য হবে।

আজকের যুগ বস্তুকেন্দ্রিকতার যুগ। মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের সামনেই সে শুধু মাথা নত করে। উন্নত মস্তিষ্কের সামনেই সে বিনয়াবনত হয়। শূন্য হৃদয় ভরপুর হৃদয়ের কাছে, নিরুত্তাপ মন-মগজ উষ্ণতার কাছেই হার মানে। আমদের মাদরাসাসমূহে চিন্তা-চেতনার অবক্ষয় দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। হৃদয়ের স্থবিরতাও বেড়ে চলেছে। বক্তা ও ওয়ায়েযদের এখন কোন অভাব নেই। কিন্তু একথা বাস্তব সত্য যা কবি জিগরের ভাষায় ফুটে উঠেছেঃ

آنکھوں میں سرور عشق نہیں، چہرے پہ یقین کا نور نہیں

"চোখে নেই প্রেম ভালবাসার নিদর্শন, চেহারায় নেই ঈমানের নূর।"

মাদরাসাসমূহের স্থবিরতা

দ্বীনী মাদরাসাসমূহ যা এক সময় রূহানিয়াতের মারকায ছিল, বিপ্লবী মানুষ যেখান থেকে সৃষ্টি হত, সেখানে আজ স্থবিরতা, হীনমন্যতা ও নৈরাশ্যতা বিরাজ করছে। আজ মাদরাসার সংখ্যা, ছাত্রের সংখ্যা, কিতাবাদির সংখ্যা এবং শিক্ষাসামগ্রীর সংখ্যা বিপুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও এর জীবনীশক্তি প্রায় বিলুপ্ত হয়ে আসছে, হৃদয়ের স্পন্দন দূর হয়ে যাচ্ছে। কোন দরদী ও চিন্তাশীল মানুষ এ পথ দিয়ে অতিক্রম করলে তার দম বেরিয়ে আসতে চায়। ব্যথা-বেদনায় কাতর হয়ে তার মন এ প্রশান্ত মহাসাগরের দিকে তাকিয়ে বলে ওঠে–

خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کردے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں
تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراغ، کہ تو کتاب خواں ہیں مگر صاحب کتاب نہیں

"আল্লাহ তা'আলা তোমাকে কোন তুফানের সাথে পরিচয় করিয়ে দিন, কারণ তোমার তরঙ্গমালায় সেই স্পন্দন নেই। কিতাব থেকে তুমি বিচ্ছিন্ন নও, তবে কিতাবের সাথে তোমার কোন সম্পর্ক নেই।"

আজ তো মাদরাসার জন্য তুফানের দোয়া করতেও ভয় হয়। বর্তমানে মাদরাসাসমূহে তুফানের কিছু নিদর্শনাবলী দেখা যাচ্ছে। তবে তা হচ্ছে

বাইরের ঝড়ো হাওয়া, যা মাদরাসার দেয়ালের সাথে টক্কর খাচ্ছে। রাজনৈতিক আন্দোলনের আওয়াজ ছাত্রদের কণ্ঠে ধ্বনিত হচ্ছে।

বিশ্ব নেতা আজো অনুসারী হয়ে আছে ঃ

এটা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, যে সমস্ত দাওয়াত, আন্দোলন, সংগঠন, শোরগোল, হাঙ্গামা আজকের আধুনিক শিক্ষায়তনে বিবর্জিত ও উচ্ছিষ্ট মনে করা হয়, সেগুলোকে আমাদের মাদরাসাসমূহে পূনর্বাসন করা হচ্ছে। যাদের দুনিয়ার ইমাম, যুগের নেতা এবং মর্যাদার শীর্ষচূড়ায় আরোহণ করার দরকার ছিল, তারা ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষাকেন্দ্রের অনুসারী হতে পেরে আজ গর্ববোধ করছে।

کر سکتے تھے جو آپنے زمانہ کی امامت وہ کہنہ دماغ آپنے زمانہ پیرو

"যুগের নেতৃত্ব দেয়ার যোগ্যতা যাদের ছিল, তারাই আজ যামানার গোলামী করছে।"

মাদরাসার সবচে' বড় ফেতনা হচ্ছে ক্রমবর্ধমান হীনমন্যতার ব্যাধি, যা ঘুণের ন্যায় কাঠকে খেয়ে শেষ করে ফেলে। কোন প্রতিষ্ঠান যদি হীনমন্যতার ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়, তাহলে তার জীবনীশক্তি লোপ পেয়ে যায়, বেঁচে থাকার অধিকার সে হারিয়ে ফেলে।

হীনমন্যতা কেন

প্রিয় বন্ধুগণ! আপনারা আজ এ হীনমন্যতার শিকার কেন? সাধারণ লোকদের হীনমন্যতায় তাদের ঈমান-আকীদা ও আমলের দুর্বলতা প্রকাশ পায়। কিন্তু আম্বিয়ায়ে কেরামের যারা প্রতিনিধি, ইলমে নবুয়তের যারা ধারক-বাহক তারা যদি এ হীনমন্যতার ব্যাধিতে আক্রান্ত হন, তাহলে এটা হবে তাদের নবুয়তের মর্যাদা সম্পর্কে অজ্ঞতার সুস্পষ্ট দলিল এবং নবুয়তের বিশ্বাস না থাকার সুস্পষ্ট প্রমাণ। আপনারা তো ঐসমস্ত মহামনীষীর অনুসারী, যাদের ব্যাপারে মাওলানা জালালুদ্দীন রূমী (রহ.) যথাযথ বলেছেনঃ

نخوتے وکبرے چوں شہاں چاکری خواہند از اہل جہاں

"শাহী জাঁকজমক ও মান-মর্যাদার আসনে যারা একদিন অধিষ্ঠিত ছিলেন, তাদের উত্তরসূরীরাই আজ দুনিয়াদারদের নিকট চাকরি ভিক্ষা করছে।" শেখ সাদী (রহ.)-এর ভাষায় তাঁদের চিত্র এভাবে ফুটে উঠেছেঃ

شہاں بے کلہ و خسرواں بے کمر اند

"তাঁরা ছিলেন মুকুটবিহীন রাজা ও সহায়-সম্বলহীন বাদশাহ।"

আত্মপরিচয় ও আত্মমর্যাদাবোধ ঃ

আপনাদের নিকট যে মহামূল্যবান দৌলত রয়েছে, দুনিয়াবাসী তা হতে বঞ্চিত। আপনাদের সিনায় ইলমে নবুয়ত সংরক্ষিত রয়েছে, যা দুনিয়ার মানুষ হারিয়ে আজ গভীর অন্ধকারে হাবুডুবু খাচ্ছে; অশান্তি, অস্থিরতা, অরাজকতা, সন্ত্রাস এবং যাবতীয় ফেতনা-ফাসাদে জড়িয়ে পড়েছে।

আপনারা নিজেদের সাদাসিদে জামা, শীর্ণকায় দেহ ও খালী পকেটের দিকে লক্ষ্য করবেন না। আপনাদের সিনার ভিতরে কত মহা মূল্যবান মণি-মুক্তা এতে সঞ্চিত রয়েছে তা চিন্তা করুন। পূর্ণিমার সেই উজ্জ্বল চাঁদ আপনাদের হৃদয়ে লুকিয়ে আছে।

بر خود نظر کشا ز تہی دامن مرنج در سینہ تو ماہ تمامے نہادہ اند

"নিজের শূন্য আঁচলের দিকে তাকিয়ে তুমি ব্যথিত হয়ো না। তোমার সিনায় তো লুকিয়ে আছে পূর্ণিমার সেই উজ্জ্বল চাঁদ।"

আপনারা মনে রাখবেন, লজ্জা ও অপমান এগুলো মানুষের মনস্তাত্ত্বিক ব্যাপার। বহির্জগতের সাথে এর সম্পর্ক খুবই কম। নিজেকে হেয় মনে করা মুলতঃ এক মনস্তাত্ত্বিক অবস্থারই নাম। এখান থেকেই হীনম্মন্যতাবোধ সৃষ্টি হয়ে থাকে।

মানুষের মনে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, দুর্বলতা ও ইতস্ততাবোধ প্রকৃত পক্ষে আত্মমর্যাদা উপলব্ধির অভাবে হয়ে থাকে। তার মনে সন্দেহ হয় যে অন্যজন তাকে হেয় মনে করে, মানব সমাজে তার কোন মূল্য নেই। এ ধরনের দ্বিধা ও সন্দেহের কারণে সে নিজেই নিজের উপর জুলুম করে বসে।

স্মরণ রাখবেন, যে নিজেকে হেয় মনে করে, তাকে কেউ সম্মানী বানাতে পারে না। নিজের কাছে নিজের মূল্য না থাকলে কার প্রয়োজন আছে তাকে মূল্যায়ন করার? যে নিজের মনে ঠাঁই পায় না, এ বিশাল দুনিয়ার কোথাও তার ঠাঁই নেই। মন সংকীর্ণ হলে পৃথিবীটাও সংকীর্ণ মনে হবে, আর প্রশস্ত হলে পৃথিবীটাও প্রশস্ত মনে হবে।

মানুষকে সর্বপ্রথম দেখতে হবে, তার কাছে নিজের কি পরিমাণ মূল্য আছে। সে নিজেকে কতটুকু সম্মান দান করে? নিজের সাথে নিজের আচরণ কি ধরনের? যে ব্যক্তি নিজেকে লাঞ্ছিত, অপমানিত, অসহায়, অকর্মণ্য, নিরর্থক ও অপদার্থ মনে করে, দুনিয়াতে তার সম্মান পাওয়ার আর কোন আশা নেই। এ বাস্তবতাটিকেই দানবীর হাতেম তাই তার কবিতায় এভাবে ব্যক্ত করেছেন ঃ

ونفسك اكرمها فإنك إن تهن

عليك فلن تلقى من الناس مكرما

"তুমি নিজেকে সম্মান দাও, কারণ নিজেকে যদি অপদার্থ, লাঞ্ছিত মনে কর, তাহলে মানুষের কাছে কোনদিন সম্মান পাবে না।"

বন্ধুগণ! আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে, আমরা হীন নই। শুধুমাত্র হীনম্মন্যতার ব্যাধিতে আক্রান্ত। আমাদের আত্মপরিচয় না থাকার কারণেই এ ব্যাধির সৃষ্টি হয়েছে। এর সুচিকিৎসা হলো, আমরা কোন্ মাকামে আছি, তা সঠিকভাবে নির্ণয় করা এবং আমাদের সহায়-সম্বল ও পুঁজির যথাযথ নিরীক্ষণ করা। দুনিয়ার পরিবর্তন ও চিন্তাধারার পরিবর্তন মূলতঃ আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনের উপরই নির্ভরশীল। আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি যেদিন পরিবর্তন হবে, সেদিন দেখবেন দুনিয়াতেও পরিবর্তন ঘটেছে। হীনম্মন্যতার এ ভয়ানক মূর্তি যা আমাদের মন ও মস্তিষ্কের উপর চেপে রয়েছে এবং হৃদয়-মনে সদা ভীতির সঞ্চার করছে, তা একদিন দূরীভূত হয়ে যাবে। কবি যথার্থই বলেছেন,

اور اگر باخبر اپنی شرافت سے ہوں تیری سپہ انس و جن، تو ہے امیر جنود

"স্বীয় আত্মমর্যাদার সন্ধান পেলে মনে হবে যে, তুমিই তো প্রধান সেনাপতি, আর মানব-দানব সবই তোমার অধীনস্ত বাহিনী।

আমাদের প্রাচীন ও সমকালীন ইতিহাসে যারা নিজেদের সার্বিক মান নির্ণয় করতে পেরেছেন এবং আল্লাহ্ প্রদত্ত দৌলত ও মর্যাদা উপলব্ধি করতে পেরেছেন, সারা পৃথিবী তাদের কাছে হেয় মনে হয়েছে। কোন রাজত্ব তাদের খরিদ করতে পারেনি। দুনিয়ার বড় বড় প্রলোভনের সামনে তাঁরা মাথা নত করেননি। সহাস্য বদনে তাঁরা সব কিছু প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং বলে দিয়েছেনঃ

برو ایں دم بر مرغ دگر نہ کہ عنقاء را بلند است اشیانہ

" চলে যাও তুমি, এ দামে এ ধরনের কোন পাখি খরিদ করতে পারবে না, এর মূল্য তো আরো অনেক অনেক বেশি।"

যারা নিজেদেরকে স্বার্থের বিনিময়ে বিক্রি করতে পারে, সে সব আত্মভোলা, অসচেতন মানুষের লম্বা লম্বা দাস্তানে মানব সভ্যতার ইতিহাস আজ কলংকিত। কিছু সচেতন, খোদাভীরু ও আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন মনীষীগণের বদৌলতেই মানবতার মান আজও শীর্ষে রয়েছে।

জীবনের ইজ্জত আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন ব্যক্তিদের কারণেই টিকে আছে

বন্ধুগণ! মানব জীবনের স্থায়িত্ব ও তার ক্রমধারা টিকিয়ে রাখার জন্যে খাদ্য, বস্ত্র ও জীবন ধারনের প্রয়োজনীয় আসবাবপত্রের যেমন দরকার রয়েছে; তেমনি জীবনের মান-মর্যাদা, গাম্ভীর্যতা ও মানবতার ইজ্জত টিকিয়ে রাখার জন্য এমন কিছু মহামনীষীর প্রয়োজন রয়েছে, যারা এ জড়বাদী দুনিয়ার মাঝে নবুয়তী চেতনার বহিঃপ্রকাশ ঘটাবেন, বস্তুকেন্দ্রিক উপায় উপকরণের প্রতি অনীহা প্রকাশ করবেন এবং নিঃসঙ্কোচে তাদের মুখ দিয়ে উচ্চারিত হবে ঃ

أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم، بل أنتم بهديتكم تفرحون .

"তোমরা কি আমাকে এ সমস্ত ধন-সম্পদ দিয়ে সাহায্য করতে চাও? আল্লাহ তায়ালা আমাকে যা দিয়েছেন তা তোমাদের সম্পদের তুলনায় অনেক অনেক উত্তম। তোমরাই তো বরং পার্থিব উপঢৌকন নিয়ে খুশি হয়ে থাক।"
(সূরা নমল - ৩৬)

যেদিন এ আওয়াজ সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যাবে এবং সারা দুনিয়া নিলামের বাজারে পরিনত হবে, ঈমান-আমল, বিবেক-বুদ্ধি ও জ্ঞান-বিজ্ঞান কোন না কোন দামে খরিদ করা যাবে, প্রাণী ও জড়বস্তুর ন্যায় মানুষ পণ্যে পরিণত হবে, সেদিন এ দুনিয়া বসবাসের অযোগ্য হয়ে যাবে। মানবতার মান-মর্যাদা তখন আর কিছুই বাকী থাকবে না।

বর্তমান যুগ-সন্ধিক্ষণে আপনাদের দায়িত্ব মানবতার মর্যাদা ও নবুয়তের মান টিকিয়ে রাখা। একমাত্র আপনারাই এ দায়িত্ব পালন করবেন। অন্য

কারো কাছ থেকে তা পালনের আশা করা যায় না। যে সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান উদর পূর্তিকেই সবচেয়ে বড় লক্ষ্যবস্তু নির্ধারণ করেছে, তাদের কাছ থেকে এ দায়িত্ব পালনের আশা করা সম্পূর্ণ বৃথা। শুধুমাত্র আপনারাই এ গুরুদায়িত্ব আনজাম দেয়ার যোগ্যতা রাখেন। আপনাদের পূর্বসুরীগণের মধ্যেই তো ইমাম আবু হানিফা (রহ.) ও ইমাম আহমাদ (রহ.) এর মতো আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন আদর্শবান মানুষ অতিবাহিত হয়েছেন। আব্বাসীয় খেলাফত যাঁদেরকে কোন কিছুর বিনিময়ে খরিদ করতে পারেনি। ইমাম গায্যালী (রহ.) এর মতো সৎ সাহসী ও বলিষ্ঠ হিম্মতের অধিকারী ব্যক্তি অতীত হয়েছেন, যিনি খেলাফতের ইঙ্গিত সত্ত্বেও বাগদাদের নিযামীয়া মাদরাসার প্রধান শিক্ষকের পদ নিতে রাজী হননি। খলিফার পরই যা সবচেয়ে বড় ধর্মীয় সম্মান বলে বিবেচিত হতো, তা তিনি গ্রহন করেননি। হযরত মুজাদ্দেদে আলফে ছানী (রহ.) সম্রাট জাহাঙ্গীরের সামনে মাথা নত করার পরিবর্তে গোয়ালিয়ার কারাগারের অন্ধকার প্রকোষ্ঠকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

আপনাদের পূর্বসূরীগণের মধ্যে আরো রয়েছেন হযরত মির্জা মাযহার জানে জানাঁ (রহ.)। দিল্লীর সম্রাট যাঁর কাছে পয়গাম প্রেরণ করেছিলেন যে, আল্লাহ আমাকে এতবড় সালতানাত দান করেছেন, আপনি এর কিছু অংশ গ্রহণ করুন। তখন তিনি বলেছিলেন 'আল্লাহ তায়ালা তো সমগ্র বিশ্ব জাহানকে متاع الدنيا قليل "তুচ্ছ-সামান্য" বলে ঘোষনা দিয়েছেন। আর এর একটি মাত্র অংশ আপনার অধিকারে রয়েছে। অতএব, এ থেকে কিছু অংশ গ্রহণ করার জন্য আমি কিভাবে হাত বাড়াতে পারি? একবার নওয়াব আসিফ জাহ তার সামনে মুদ্রা পেশ করলে তিনি তা গ্রহণ করেন নি। নওয়াব বললেন, এ মুদ্রাগুলো আপনি গ্রহণ করে অভাবীদের মাঝে বিতরণ করে দিন। তখন তিনি উত্তর দিলেন, দান কিভাবে করতে হয় তা আমার চেয়ে আপনিই ভাল জানেন। এখান থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময় আপনি নিজেই বন্টন করতে করতে যান। চলার পথেই তা শেষ হয়ে যাবে।

আপনাদের এক পূর্বপুরুষ ছিলেন হযরত শাহ গোলাম আলী সাহেব দেহলবী (রহ.)। টুংকি প্রদেশের গভর্ণর নওয়াব মীর খাঁ তাঁর খানকাহ্তে বাৎসরিক ব্যয় খাতে কিছু টাকা ধার্য্য করতে চাইলে তাকে উত্তর লিখেন,

با آبروئے فقر و قناعت نمی بریم بامیر خاں بگوے کہ روزی مقدر است

"দরিদ্রতা থাকা সত্ত্বেও অল্পেতুষ্টির গুণ আমাদের মধ্যে রয়েছে। মীর খাঁকে বলে দাও যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে আমাদের রিযিক নির্ধারিত আছে।"

আপনাদের আরেক পূর্বপুরুষ ছিলেন মাওলানা আব্দুর রহীম রায়পুরী (রহ.)। দশ পয়সা বেতনের শিক্ষকতাকে তিনি প্রাধান্য দিয়েছেন; কিন্তু বেরেলী কলেজের আড়াইশত টাকা বেতনের অধ্যাপনা করতে রাজি হননি। তিনি প্রফেসরের সম্মানজনক পদকে এ বলে প্রত্যাখ্যান করেন যে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা আমাকে এ ব্যাপারে প্রশ্ন করলে কি উত্তর দিব?

হযরত মাওলানা কাসেম নানুতুবী (রহ.)-এর ব্যাপারে তো আপনারা জানেন যে, তিনি আলীগড়ের এক ধার্মিক ব্যক্তির কাজ করতেন মাত্র দশ টাকা বেতনে। আম্মা ইন্তেকাল করলে আরো দু'টাকা এ থেকে কমিয়ে নেন। এর কারণ তিনি বলেছিলেন যে, প্রতি মাসে আমি দু'টাকা মায়ের পিছনে খরচ করতাম। তার ইন্তেকালের পর আমার এটাকা খরচের অতিরিক্ত হয়ে যায়। আমি কিয়ামতের দিন আল্লাহর দরবারে এ টাকার জবাবদিহী থেকে নিস্কৃতি পেতে চাই।

আপনাদের পূর্বসুরীগণ নিকট অতীতে কত বড় ত্যাগ ও কুরবানীর নজীর স্থাপন করেছেন। অল্প বেতনে মাদরাসার শিক্ষকতা করেছেন। আর কলেজ-ইউনিভার্সিটির মোটা অংকের বেতনের চাকুরিকে প্রত্যাখ্যান করে দিয়েছেন এবং সীমাহীন ত্যাগ ও কষ্টে জীবন কাটিয়েছেন

أولئك آبائي فجئني بمثلهم

إذا جمعتنا يا جرير المجامع

"এরূপ ছিলেন আমাদের পুর্বপুরুষগণ; তোমাদের পক্ষে সম্ভব হলে এমন দৃষ্টান্ত পেশ কর দেখি।

এ পথ ভোগ-বিলাসের নয়

বন্ধুগণ! আপনারা এরূপ মনে করবেন না যে, যামানার বিবর্তন, প্রয়োজনীয় উপায়-উপরণের আধিক্য, সাহস ও হিম্মতের দুর্বলতা ইত্যাকার সমকালীন বিষয় সম্পর্কে আমার কোন ধারণা নেই। যার ফলে আমি

আপনাদের কাছে মাওলানা আব্দুর রহীম রায়পুরী (রহ.) ও মাওলানা কাসেম নানুতুবী (রহ.) এর মত ত্যাগ ও কুরবানীর নজীর স্থাপন করার আহ্বান জানাচ্ছি। তবে একথা অবশ্যই স্মরণ রাখবেন যে, আপনাদের এ পথ নিঃসন্দেহে ত্যাগ ও কুরবানীর পথ, সীমাহীন কষ্ট ও কঠোর সাধনার পথ। এ পথ দুনিয়া উপার্জন ও মান-মর্যাদা লাভের পথ নয়। এ পথে তো قد كنت فينا مرجوا "তোমার কাছে তো আমাদের বড় আশা ছিল"–এর তিরস্কার শুনতেই হবে। আর-

ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى.

"আমি তাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য পার্থিব জীবনের সৌন্দর্যস্বরূপ ভোগ-বিলাসের যে সকল উপকরণ দিয়েছি আপনি সেদিকে দৃষ্টিপাত করবেন না। আপনার পালনকর্তার দেয়া রিযিক অনেক উত্তম এবং অধিক স্থায়ী।
(সূরা ত্বহা-১৩১)

এর সবক অবশ্যই নিতে হবে। তবে এর পুরস্কার কি হবে, তাও শুনে নিন – وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون.

"ধৈর্যধারণ এবং আমার নিদর্শনাবলীর প্রতি বিশ্বাস থাকার কারণে আমি তাদেরকে আমার নির্দেশিত পথ পরিচালনায় নেতৃত্বের মসনদে সমাসীন করেছি।" (সূরা আস-সাজদা-২৪)

মাওলানা রূমী (রহ.) এটাকে তার ভাষায় এভাবে ব্যক্ত করেছেনঃ

معدہ را تنگ کن سوے دل خرام تا کہ بے پردہ ز حق آید سلام

"উদরপূর্তির ভাবনা পরিত্যাগ করে হৃদয়কে বিকশিত করার চেষ্টা কর, মহান প্রভুর পক্ষ থেকে পাবে তুমি শত সহস্র অভিনন্দন।"

যুগের অসহায়ত্ব ও তার চরম পিপাসা

আপনারা যে হীনমন্যতার ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়েছেন, এর একটা কারণ, আত্মমর্যাদাবোধের অভাব। কিছুক্ষণ পূর্বেই আমি তা বিস্তারিতভাবে তুলে ধরলাম। দ্বিতীয় কারণ হলো, এ দুনিয়ার আবর্তন-বিবর্তন সম্পর্কে আপনাদের কোন ধারণা নেই। আপনারা জানেন না, এ জগত কত অসহায়,

তার পিপাসা কত তীব্র। আপনারা তো এ যামানার দিকে ভীত-সন্ত্রস্ত ও লোভনীয় দৃষ্টিতে তাকান। কারণ তার সাথে আপনাদের কোন পরিচয় নেই। একটু কাছে গেলে উপলব্ধি করতে পারবেন, এ যামানা কি পরিমাণ দেউলিয়া হয়ে আছে। স্বয়ং যামানাই তার দেওলিয়াপনার তীব্রতা উপলব্ধি করতে পেরেছে, তার মুদ্রার জালিয়াতি ধরা পড়েছে। তার সকল পানির উৎস মরীচিকা বলে প্রমাণিত হয়েছে। সকল দর্শন, মতবাদ ও জীবন ব্যবস্থা ব্যর্থ হয়েছে। সকল স্বপ্ন দুঃস্বপ্নে পরিণত হয়েছে।

উলূমে নবুয়তের যে মহান সম্পদ আপনাদের দান করা হয়েছে, হীনমন্যতার কারণে তা জনসম্মুখে পেশ করতে আপনারা সংকোচ বোধ করেন। আপনারা মনে করেছেন যে, এ যুগে জ্ঞান-বিজ্ঞান, পলিটিক্স ও অর্থনীতির চরম উন্নতি ঘটেছে; এখানে আমাদের সেই প্রাচীন থিওরী ব্যর্থ। অথচ বর্তমান যামানা শান্তির তালাশে অস্থির। তার নিদ্রা আজ হারাম হয়ে গিয়েছে।

জাতি আজ তৃষ্ণার্ত। তারা এমন কিছু লোকের অপেক্ষায় রয়েছে, যারা তাদের নতুন পথ দেখাবে। রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর শান্তির পয়গাম শুনাবে এবং ইসলামের চিরন্তন সত্য তাদের সামনে তুলে ধরবে।

همه آهوان صحرا سر خود نهاده بر کف بامید آن که روزے بشکار خواهی آمد

"জঙ্গলের সমস্ত হরিণ ক্ষুধার্ত অবস্থায় হাত মাথায় রেখে বসে আছে এ আশায় যে, হয়ত একদিন আমাদের কাংখিত শিকারের আগমন ঘটবে।"

উলূমে নবুয়তই হলো প্রকৃত জীবন পাথেয়

আপনারা যে সব কথা মামুলি মনে করেন এবং যে সব ব্যাপারে আপনাদের হৃদয়ে কোন গাম্ভীর্য নেই, সে সব বিষয় নিয়ে আমি বড় বড় ডিগ্রীধারীদেরকে মাথা ঘামাতে দেখেছি। তাদের সামনে যখন আমি আম্বিয়ায়ে কেরামের কথা নিঃসঙ্কোচে ব্যক্ত করেছি, তখন মনে হলো যেন পাহাড়ের শীর্ষ চূড়া থেকে তাদেরকে সম্বোধন করা হচ্ছে। আর তারা এমনভাবে উৎকীর্ণ হয়ে শ্রবণ করছে যেন ইতিপূর্বে তা আর কোন দিন শ্রবণ করেনি।

দুনিয়ার বাজারে দুনিয়াবী সম্পদ এবং সেখানকার তৈরী পণ্য সামগ্রী নিয়ে গেলে, তা প্রত্যাখ্যাত হবেই। তখন আর এ অভিযোগ পেশ করা যাবে না যে, بضاعتنا ردت إلينا "আমাদের পণ্য-সামগ্রী গৃহীত হয়নি।"

দুনিয়া আপনাদের কাছে আশা করছে যে, আম্বিয়ায়ে কেরামের শান্তির পয়গাম আপনারা তাকে শুনাবেন। চিরন্তন সত্য তার কাছে পেশ করবেন। বিশ্ব জাহান আজও তার সামনে মাথা নত করতে প্রস্তুত রয়েছে। যেমন খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতকে সীমিত গন্ডির ভেতরে তা প্রতিভাত হয়ে উঠেছিল।

এ কথা সত্য যে, আপনাদের কাছে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও সৌর বিজ্ঞানের মুষ্টিমেয় কিছু পৃষ্ঠা রয়েছে। এর তুলনায় ইউরোপের কাছে রয়েছে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির এক মহাসমুদ্র। একথাও সত্য যে, আপনারা ইউরোপকে গ্রীক দর্শনের থিওরী দ্বারা ভয় দেখাতে পারবেন না। কারণ তার জীবনী শক্তি শেষ হয়ে গিয়েছে। কিন্তু আপনাদের কাছে আম্বিয়ায়ে কেরামের আনীত যে বিদ্যা ভাণ্ডার সংরক্ষিত আছে, তা থেকে ইউরোপ এশিয়া এখনো বঞ্চিত রয়েছে।

তারা হয়তো আপনার চিন্তা, গবেষণা ও যুক্তি-তর্কের মাঝে কিছুটা হলেও খুঁত বের করতে সক্ষম হবে। কিন্তু আম্বিয়ায়ে কেরামের মো'যেজাসমূহ নির্ভুল। চিন্তা, গবেষণা ও যুক্তি-তর্কের উর্ধ্বে তার স্থান। অতএব আপনারা এ মূল শক্তি ও প্রকৃত সম্পদ নিয়ে পূর্ণ ইয়াক্বীন ও আস্থার সাথে জীবন সংগ্রামে অবতীর্ণ হোন। প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে ময়দানে কাউকে দেখতে পাবেন না।

আপনাদের কাছে মানবতার সুমহান পয়গাম, চিরন্তন সত্য গোদায়ী জ্ঞানের ভাণ্ডার রয়েছে। মহান সত্তার সাথে সম্পর্কিত হওয়ার কারণে আপনারাও হয়েছেন মহিমান্বিত ও উচ্চ মর্যাদায় অভিষিক্ত।

জীবনের সাথে ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের সম্পর্ক এবং এ জন্য আমাদের পূর্বপুরুষগণের প্রচেষ্টা

প্রিয় ভাইয়েরা! আমি পূর্বেই বলেছিলাম যে, আপনাদের একপ্রান্ত হলো নবুয়তে মুহাম্মাদীর সাথে সংযুক্ত। এ কারণে কি কি দায়িত্ব আপনাদের পালন করতে হবে, তার সুবিস্তর আলোচনা এতক্ষণ পর্যন্ত পেশ করা হলো। এ কথাও আমি পূর্বে বলেছিলাম যে, আপনাদের অপর প্রান্ত হলো বাস্তব জীবনের সাথে সম্পর্কিত। এ হিসেবে আপনাদের দায়িত্ব কি, কিরূপ কাজ

করলে আপনারা জবাবদিহিতা থেকে মুক্তি লাভ করতে পারবেন, তা এখন আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরবো।

আম্বিয়ায়ে কেরামের মাধ্যমে আমাদেরকে যে জ্ঞান ও মূলনীতি দান করা হয়েছে, এতে বিন্দু পরিমাণ সংযোজন-বিয়োজন করা সম্ভব নয়। আমাদের পূর্বপুরুষগণ এতে কোন প্রকার রদবদল হতে দেননি। এ মহামূল্যবান জ্ঞানভাণ্ডার তার নিজস্ব আকৃতিতে আমাদের পর্যন্ত তারা পৌঁছিয়েছেন। এর সাথে সাথে তাঁরা এ সুমহান জ্ঞান ভাণ্ডারকে জীবনের সাথে সম্পৃক্ত করতে আজীবন মেহনত করে গিয়েছেন। তাদের বিরামহীন প্রচেষ্টার ফলেই ইসলাম আজ জীবন্ত ও গতিশীল ধর্ম হিসেবে টিকে আছে। তারা ইসলামকে এমনভাবে ব্যাখ্যা করেছেন, যার ফলে সমকালীন প্রাকৃতিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও তাদের রত্ন ভাণ্ডারের মাঝে কোন প্রকার তারতম্য ও বিরোধ সৃষ্টি হয়নি। বুদ্ধিজীবী মহল তাদেরকে হেয় ও তুচ্ছজ্ঞান করার সাহস পায়নি। বরং বিবেকবান ব্যক্তিগণ অতি সহজে এটাকে গ্রহণ ও আত্মস্থ করে নিয়েছে।

সেকালের বুযুর্গানে দ্বীন শরীয়তের মূলনীতি ও ধর্মীয় মতাদর্শকে তার নিজস্ব আকৃতিতে সংরক্ষণের ব্যাপারে পাহাড়ের ন্যায় মজবুত ও সুদৃঢ় সংকল্পের অধিকারী ছিলেন। কিন্তু তারা এগুলোর ব্যাখ্যা, উপস্থাপনা এমন সাবলীল ও চমৎকার ভাষায় করেছেন যে, রেশমের কোমলতা ও ফুলের আকর্ষণীয়তা এতে বিদ্যমান ছিল। তাদের চাল-চলন ও বাচনভঙ্গিতে মূলতঃ হযরত আলী (রাঃ) এর সেই প্রজ্ঞাপূর্ণ হেদায়েতের চিত্র ফুটে উঠত:

كلموا الناس على قدر عقولهم أتريدون أن يكذب الله ورسوله

"তোমরা মানুষের সাথে তাদের বুঝবার সামর্থ অনুযায়ী কথা বল, তোমরা কি চাও যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সাঃ) কে মানুষ মিথ্যা প্রতিপন্ন করুক?" এ কারণেই তাঁরা সমকালীন মেধা, বিবেক-বুদ্ধি ও মননশীলতার পরিপ্রেক্ষিতে ইসলামী শরীয়তকে উপস্থাপন করেছেন।

হিজরতের তৃতীয় শতকে বাদশাহ্ মামুনুর রশীদ ও মু'তাসিম বিল্লাহ্র তত্ত্বাবধানে এবং গ্রীক দর্শনের প্রভাবে মু'তাজিলা মতবাদ মানুষের মন-মগজ আচ্ছন্ন করে ফেলে। জনসাধারণ এটাকেই যুক্তি ও তত্ত্বভিত্তিক মতবাদ বলে ভাবতে থাকে। যামানার ফ্যাশন ও উন্নত চিন্তা-চেতনার ধারক-বাহক মনে করতে থাকে। সে যুগে ইমাম আবুল হাসান আশআরী (রহ.) এ ভ্রান্ত মতবাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের পতাকা বুলন্দ করেন এবং আহলে সুন্নাত ওয়াল

জামায়াতের আক্বীদা বিশ্বাস, সুন্নাত ও শরীয়তকে তাদের পরিভাষা ও বাচনভঙ্গিতে উপস্থাপন করতে লাগলেন। এর ফলে অল্প দিনের মধ্যেই সে মতবাদের অসারতা প্রমাণিত হয় এবং আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের মাঝে দ্রুতগতিতে হীনমন্যতার যে হাওয়া বয়ে যাচ্ছিল, তা হঠাৎ থেমে যায়।

আবু বকর আস্ ছায়রাফী বলেন "মু'তাজিলারা অনেক উঁচু আসনে সমাসীন হয়েছিল। আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রতিরোধ করার জন্যে শাইখ আবুল হাসান আশআরী (রহ.) কে সৃষ্টি করেন। তিনি তার মেধা, বিবেক-বুদ্ধি ও যুক্তির ভিত্তিতে তা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দিতে সক্ষম হন।" এ সুমহান কীর্তির কারণে আবু বকর ইসমাঈলীর মত দূরদর্শী ব্যক্তিও তাঁকে উম্মতের একজন মুজাদ্দেদ হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন।

ইমাম আবুল হাসান আশআরী (রহ.) এর তিরোধানের পর তার চিন্তা-চেতনার অনুসারীগণ এ ধারা অব্যাহত রাখেন। যার ফলে কাজী আবু বকর বাকেল্লানী (রহ.), শাইখ আবু ইসহাক ইসফারায়েনী (রহ.)-এর মত তর্কবিদ, আল্লামা আবু ইসহাক সিরাজী ও ইমামুল হারামাইনের মত শিক্ষাবিদ তৈরী হন। তাঁরা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ব এ দুনিয়াতে টিকিয়ে রাখতে আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। কিন্তু সে যুগে গ্রীক দর্শনের জ্ঞান-ভাণ্ডার ধীরে ধীরে আরবী ভাষায় স্থানান্তরিত হচ্ছিল এবং দার্শনিকগণ তাকে বড়ই পূত-পবিত্র ও নির্ভেজাল হিসেবে প্রচার করছিল; যার ফলে তা সত্য-মিথ্যার মানদন্ডে পরিণত হয়েছিল। এর মোকাবেলায় ইলমে কালাম অত্যন্ত স্থবির ও নির্জীব হয়ে পড়েছিল। অন্ধ অনুকরণের ভূত তাদের উপর চেপে বসেছিল। কালাম শাস্ত্রবিদ উলামাগণ শুধু আশআরী ও মাতুরিদী আকায়েদ গ্রহণ করেই ক্ষান্ত হননি বরং তা প্রমাণ করার জন্য সেকালের যুক্তি ও দলিলসমূহ ঐ পরিভাষা ও বাচনভঙ্গিতে পেশ করতে প্রচেষ্টা চালাতেন। অথচ সমকালীন যুগের চাহিদা ছিল নতুন যুক্তি, তত্ত্ব ও উপস্থাপনার মাধ্যমে আকায়েদসমূহ জনগনের কাছে পেশ করা।

ইমাম আবুল হাসান আশ'আরী (রহ.)-এর যুগ ছিল দর্শন শাস্ত্রের শৈশবকাল। তখন মুসলিম বিশ্বে সবেমাত্র তার পরিচয় হতে চলছিল। হিজরী পঞ্চম শতকে গিয়ে তা পূর্ণ যৌবনে উপনীত হয়। তখন মানবজীবনের সাথে তার গাঢ় সম্পর্ক হয়ে যায়। ঐ মুহূর্তে একজন সচেতন, তীক্ষ্ণ মেধা ও গভীর জ্ঞানের অধিকারী সুমহান ব্যক্তিত্বের প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। আল্লাহ তা'আলা এমন সংকটময় মুহূর্তে ইমাম গায্যালী (রহ.)-এর মত একজন

যুগান্তকারী ও কালজয়ী ব্যক্তিকে সৃষ্টি করেন। তিনি তার গ্রন্থরাজির মধ্যে ইসলামের আকায়েদ ও মূলনীতিকে নতুন আঙ্গিকে, অভিনব পদ্ধতিতে ও অত্যন্ত মর্মস্পর্শী ভাষায় সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। ফলে হাজারো বিভ্রান্ত, দিশেহারা ও দ্বিধা-দ্বন্দ্বে অস্থির মানুষ প্রশান্তির সন্ধান পায়। ঈমান ও ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করে।

তখনকার যুগে ইমাম গায্যালী (রহ.)-এর সুমহান দ্বীনী খেদমতকে যদিও কালাম শাস্ত্রবিদ উলামাগণ কোন মূল্যায়ন করেননি, বরং ইলমে কালামের মতাদর্শ থেকে বিচ্যুত হওয়ার কারণে বিভিন্ন প্রকার অভিযোগ উত্থাপন করতে থাকেন। কিন্তু পরবর্তীকালে মুসলিম বিশ্ব তাঁর এ সংস্কারমূলক কীর্তির ভূয়সী প্রশংসা করে।

ইমাম গায্যালী (রহ.) ঈমান-আক্বীদা বিধ্বংসী গ্রীক দর্শনের জবাব দানের জন্য তা গভীর ভাবে অধ্যয়ন করার প্রয়োজন অনুভব করেন। তাই তিনি দু'বছর দর্শন শাস্ত্রের উৎস অনুসন্ধানে ব্যয় করেন। তার আক্বীদা-বিশ্বাস ও দৃষ্টিভঙ্গিকে খুব ভালভাবে আত্মস্থ করেন। অতঃপর তিনি সর্বপ্রথম مقاصد الفلاسفة এরপর تهافت الفلاسفة গ্রন্থদ্বয় প্রণয়ন করেন।

কালাম শাস্ত্রবিদ উলামাগণ ইসলামের পক্ষ থেকে দর্শনের যে জবাব প্রদান করতেন, তা অত্যন্ত দুর্বল ছিল। কিন্তু ইমাম গায্যালী (রহ.) "তাহাফাতুল ফালাসিফা" লিখে দর্শন শাস্ত্রের শীর্ষ মহলে সর্বপ্রথম প্রস্তরাঘাত করেন। পশ্চিমা বিশ্বের ঐতিহাসিক ও দার্শনিকদের ভাষায় বলতে পারি যে, তাঁর এ হামলার প্রভাবে দর্শন শাস্ত্রের ইমারত শতাব্দীকাল যাবত প্রকম্পিত থাকে। প্রায় নব্বই বছর পর দার্শনিক ইবনে রুশদ "তাহাফাতুত্ তাহাফুত" লিখে সে হামলার জবাব দানের চেষ্টা করেন।

ইমাম গায্যালী (রহ.) এর পর দর্শনশাস্ত্রের মূল ভিত্তির উপর আঘাত হানার প্রয়োজন ছিল। উত্তর-প্রতিউত্তর ও অভিযোগের তীর দ্বারা তার প্রাচীর ভেঙ্গে খান খান করে দিয়ে এ সত্য প্রমাণ করার দরকার ছিল যে, শুধুমাত্র অনুমান ও অলীক কল্পনার উপর ভিত্তি করেই এ শাস্ত্রের জন্ম হয়েছে। এর জন্য সুবিস্তর জ্ঞানের অধিকারী, দর্শনশাস্ত্রের তথ্য উদ্ঘাটনকারী একজন গবেষক, পর্যালোচক ও শক্তিশালী লেখকের প্রয়োজন ছিল। শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া ছিলেন এ কাজে যথোপযুক্ত ব্যক্তি। সর্বদিক দিয়ে তার যোগ্যতা ছিল। তিনি তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থে বিশেষতঃ "আর-রাদ্দু 'আলাল

মানতিকিয়্যীন' প্রণয়ন করে ফালসাফার পুরো কাঠামোকে অসাড় ও ভিত্তিহীন প্রমাণ করেন। তার গবেষণামূলক সেসকল গ্রন্থ আজো মন ও মস্তিষ্কে স্পন্দন সৃষ্টি করে। মানুষের চিন্তা-চেতনাকে প্রখর ও কর্মমূখর করে তুলে।

অপরদিকে ফালসাফা ও ইলমে কালাম মিলে যখন মানুষের মন-মগজে যুক্তি ও বুদ্ধির প্রাধান্য বিস্তার করল এবং মুসলিম সমাজে 'সত্য-মিথ্যার মানদণ্ড একমাত্র যুক্তিবাদ' এর কুপ্রভাব ছড়িয়ে দিল, তখন এর বিরুদ্ধে মাওলানা জালালুদ্দীন রূমী (রহ.) কলম ধরলেন। তার কালজয়ী গ্রন্থ 'মছনবী শরীফ' মূলত সপ্তম শতাব্দীর যুক্তিবাদের মোকাবেলায় এক প্রতিবাদী গ্রন্থ। এতে তিনি আকায়েদ ও ইসলামের মৌলনীতি প্রমান করার জন্য নূতন নূতন উদাহরণের মাধ্যমে দলিল পেশ করেছেন, যা একসাথে মন ও মস্তিস্ক উভয়টিকে প্রভাবান্বিত করে, সকল প্রকার দ্বিধা ও কলুষতা থেকে মুক্ত করে আত্মাকে বিশুদ্ধ করে তুলে। এ কালজয়ী গ্রন্থের প্রভাব আজো এ দুনিয়ায় বিদ্যমান রয়েছে। দার্শনিকদের মন-মগজে তা অব্যর্থ তীরের ন্যায় কাজ করে যাচ্ছে।

হাফেজ ইবনে তাইমিয়া (রহ.) ও মাওলানা জালালুদ্দীন রূমী (রহ.)-এর পর দর্শনশাস্ত্রের এক নতুন দিগন্তের সূচনা হয়। ইলমে তাসাওউফ ও আখলাকের সীমানায় তা অনুপ্রবেশ করে এবং রাজনীতি ও শাসন ব্যবস্থাতেও হস্তক্ষেপ শুরু করে। অতএব, তা প্রতিহত করার জন্য শুধু ইলমে ইলাহিয়াত ও ইলমে কালাম যথার্থ ছিল না। বরং ফালসাফার সর্বগ্রাসী হামলা দমন করার জন্য এমন সুমহান বিপ্লবী ব্যক্তিত্বের প্রয়োজন ছিল, যার মধ্যে রয়েছে প্রাচীন গ্রীকদর্শনের জ্ঞান, মধ্যযুগীয় রাজনৈতিক চিন্তাধারার জ্ঞান, সমাজনীতি, অর্থনীতি, ফালসাফা, তাসাউফ তথা সর্ববিষয়ে গভীর ও বিশ্লেষণধর্মী জ্ঞান।

এ পরিস্থিতিতে যুগশ্রেষ্ঠ মনীষী হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ্ মুহাদ্দেসে দেহলভী (রহ.)-এর মত ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব ঘটে। "হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগা" ও "ইযালাতুল খেফা" লিখে তিনি ইসলামের সত্যতা ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছেন, একাডেমিক পরিসরে ইসলামকে অভিনব পদ্ধতিতে জীবন্ত ও গতিশীল ধর্ম হিসেবে উপস্থাপন করেছেন এবং সকলের হৃদয়ে উলামায়ে কেরামের মর্যাদা ফিরিয়ে এনেছেন।

১৭৫৭ সালে ভারত উপমহাদেশে ইংরেজদের আধিপত্য বিস্তারের পর, নতুন নতুন ফেতনা মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। খৃষ্টান মিশনারীগণ ইসলামের উপর প্রকাশ্যে আক্রমণ শুরু করে দেয়। উলামায়ে কেরামকে তারা মোকাবেলা করার আহবান জানাতে থাকে। এহেন সংকটময় মুহূর্তে পাদ্রীদের যাবতীয় অভিযোগ খন্ডনের জন্য বাইবেল ও তার ব্যাখ্যা সংকলনের ইতিহাস এবং খৃষ্টধর্মের সাথে ইসলামের সংঘাতপূর্ণ বিষয়াবলী গভীরভাবে অধ্যয়ন করার প্রয়োজন দেখা দেয়। এহেন মুহূর্তে হযরত মাওলানা রাহমাতুল্লাহ্ কিরানভী সাহেব এ ময়দানে বীরদর্পে এগিয়ে আসেন। "ইযহারুল হক" ও "ইযালাতুল আওহাম"-এর মত গ্রন্থ প্রণয়ন করে খৃষ্টধর্মের প্রচার-প্রসারে এক দুর্দমনীয় আঘাত হানেন। হিন্দুস্তান থেকে মিশর, তুর্কিস্থান পর্যন্ত কোথাও তার প্রণীত এ গ্রন্থগুলোর কোন দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যায় না। খৃষ্টান বিশেষজ্ঞগণ আজ পর্যন্ত এগুলোর মোকাবেলা করার সাহস পায়নি।

তদানীন্তন ইংরেজ সরকারের ছত্রছায়ায় আর্য সমাজও ইসলামের মৌলিক আক্বীদা-বিশ্বাসে আঘাত হানা শুরু করে। পৃথিবীর নতুনত্ব, প্রাচীনত্ব, আল্লাহ তা'আলার সত্তা ও তাঁর গুণাবলী, হায়াতুন্নবী, কেবলা, পুনরুত্থান এবং এ ধরণের আরো অনেক মাসআলার উপর তারা যুক্তিভিত্তিক অভিযোগ পেশ করতে থাকে। আর এগুলো খন্ডনের জন্য ইলমে কালামের প্রাচীন প্রমাণাদী ও তার উপস্থাপন পদ্ধতি তেমন কার্যকরী ছিল না। হযরত মাওলানা কাসেম নানুতুবী (রহ.) এ অভাব পূরণে এগিয়ে আসেন এবং ইলমে কালামের এক নতুন দিগন্তের সূচনা করেন। অত্যন্ত সহজ-সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় ছোট ছোট উদাহরণ এবং সহজ ও বোধগম্য প্রমাণাদি দ্বারা অনেক গুরুত্বপূর্ণ কঠিন মাসআলার সমাধান পেশ করেন। 'তাকরীরে দিলপজীর' 'হুজ্জাতুল ইসলাম' 'আবে হায়াত' ও কেবলা নুমা' -এ গ্রন্থগুলো তার অসাধারণ মেধা, সুরুচি ও সুক্ষ্মদর্শী হওয়ার প্রমাণ বহন করে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ও বিংশ শতাব্দীর শুরুতে পাঞ্জাব প্রদেশে আরেক ফিতনার জন্ম নেয়। যা ছিল মূলতঃ নবুয়তে মুহাম্মাদীর বিরুদ্ধে এক সুপরিকল্পিত বিদ্রোহ। ইসলামী আক্বীদা-বিশ্বাস ধ্বংস করে এক নতুন নবুয়ত ও ইমামাতের প্রাসাদ নির্মাণ করাই ছিল তার লক্ষ্য। এ ফিতনার মোকাবিলায় কয়েকজন দূরদর্শী বিজ্ঞ আলেমে দ্বীন ময়দানে নেমে এলেন। তন্মধ্যে সাইয়েদ মোহাম্মাদ আলী মুংগেরী (রহ.) ও সাইয়েদ আনোয়ার শাহ কাশ্মীরি (রহ.) বিশেষ কৃতিত্বের সাক্ষর রেখে গিয়েছেন।

যুগ চাহিদা পূরণ

উপরোক্ত বিশদ বিবরণ এ জন্য পেশ করা হলো, যাতে আপনারা অনুমান করতে পারেন যে, আমাদের পূর্বসূরী উলামায়ে ইসলাম তাদের মেধা, দূরদর্শিতা ও প্রতিভাকে দ্বীনের স্বার্থে কাজে লাগাতে কোন প্রকার ত্রুটি করেননি। যাত্রাপথে কোথাও বিশ্রাম নেন নি। যামানার ইমামত কখনো তাদের হাতছাড়া হয়ে যায়নি। যুগের বিবর্তন ও কালের গতিধারা অনুধাবন করতে কখনো তারা ত্রুটি করেননি। যুগ চাহিদা অনুসারে দ্বীনের স্বার্থে যে পদ্ধতি অবলম্বন করার দরকার ছিল, নিঃসঙ্কোচে তারা তা অবলম্বন করেছেন। সকল সংকীর্ণতার উর্ধ্বে থেকে তারা ইসলামকে সংরক্ষণ করার অঙ্গীকার করেছিলেন। এ ক্ষেত্রে বিশেষ কোন দল বা গোষ্ঠীর চিন্তাধারা পরিশীলন করে তারা সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দেননি।

ভারত ও মিশরে যখন ইসলামের উপর ভাষা-সাহিত্য, ইতিহাস ও শিক্ষা-সংস্কৃতির মাধ্যমে হামলা শুরু হলো এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের লেখকগণ সত্যনিষ্ঠ ও আস্থাভাজন মুসলিম মনীষীগণের উপর নানা ধরণের অভিযোগ উত্থাপন করে ইসলামের অবকাঠামো চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিতে চাইলো, তখন উলামায়ে কেরামের মধ্যে একদল কলম সৈনিক ময়দানে নেমে এলেন। যাদের প্রণীত গ্রন্থগুলো ইসলামের পাশাপাশি উর্দু ভাষা ও সাহিত্যের রত্ন ভাণ্ডার হিসেবে আজো সংরক্ষিত আছে। শত-সহস্র আধুনিক শিক্ষিত লোক তাদের রচিত গ্রন্থগুলো পাঠ করে ঈমানের সন্ধান পেয়েছে। হৃদয়ের যাবতীয় অস্থিরতা ও উৎকণ্ঠা বিদূরীত হয়েছে এবং ইসলামের সাথে গভীর সম্পর্কের সেতু-বন্ধন রচিত হয়েছে। এ ক্ষেত্রে মাওলানা শিবলী নূমানীর "আল-ফারুক" "আল-জিযিয়া ফিল ইসলাম" "কুতুব খানায়ে ইস্কান্দারিয়া" অত্যন্ত স্বার্থক ভূমিকা রেখেছে।

পাঠ্য তালিকায় সংযোজন-বিয়োজন

স্বয়ং আপনাদের পাঠ্যপুস্তক এ সত্যের সাক্ষ্য বহন করে যে, আমাদের দূরদর্শী উলামায়ে কেরাম, যামানার চক্রালয়ে বিভিন্ন প্রয়োজন মেনে নিয়েছেন এবং যুগ সমস্যা-সমাধানে জরুরী যে কোন পদক্ষেপ নিতে তারা কখনও পিছপা হননি।

আপনাদের এ পাঠ্য তালিকায় যুগ যুগ ধরে নানা রকমের সংযোজন বিয়োজন সাধিত হয়েছে। শুধুমাত্র বিগত শতাব্দীতে সামান্য কিছু বিষয় ছাড়া

উল্লেখযোগ্য কোন পরিবর্তন ঘটেনি। অথচ এ দুর্যোগপূর্ণ মুহূর্তে মানুষের চিন্তা-চেতনা ও মন-মস্তিষ্কের বিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে প্রচলিত পাঠ্য তালিকায় বৈধ ও জরুরী সংস্কার সাধনের সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন ছিল।

ধর্মীয় নেতৃত্বদানের জন্য বহুমুখী যোগ্যতার প্রয়োজন

প্রিয় তালেবানে ইলম! বর্তমান বৈপ্লবিক যুগে ধর্মীয় নেতৃত্ব ও ইসলামী আদর্শ বাস্তবায়নের জন্য শুধুমাত্র তার আলোচনা করা বা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ পেশ করাই যথেষ্ট নয়। বরং এর জন্য ব্যাপক প্রস্তুতি ও বহুমুখিতার প্রয়োজন। আপনারা ইসলামের বীর সিপাহী। জীবন সংগ্রামে জয়ী হতে আপনারা প্রস্তুতি নিচ্ছেন। সেনা ছাউনীতে যারা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে তাদের উচিত নয় নতুন-পুরাতন অস্ত্র-শস্ত্র ও যুদ্ধকৌশল নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত হওয়া। সিপাহীর কাছে অস্ত্রের নতুনত্ব ও প্রাচীনত্ব বলতে কিছু নেই। সে তো শুধু এ বিষয়টি নিরীক্ষণ করবে যে, যুদ্ধের ময়দানে কোন ধরণের অস্ত্র কার্যকরী হবে। আর কিরূপ রণকৌশল অবলম্বন করলে বিজয় ছিনিয়ে আনা যাবে। সিপাহীর জন্য অস্ত্রবিশেষের সাথে শত্রুতা পোষণ করা বা মিত্রতা দেখানোর কোন অবকাশ নেই। সুনির্দিষ্ট কোন রণকৌশলের সাথেও তার সম্পর্ক রাখার সুযোগ নেই। তাকে তো সব ধরণের প্রয়োজনীয় অস্ত্রে-শস্ত্রে সজ্জিত হয়ে বীরদর্পে ময়দানে অবতীর্ণ হতে হবে। আরবের এক কবি অনেক আগেই বলে দিয়েছেন ঃ

كل امرئ يسعى إلى : يوم الهياج بما استعدا

"যে যা প্রস্তুত করেছ, তা নিয়েই সকলে রণাঙ্গনে ঝাপিয়ে পড়।"

সাম্প্রতিক আন্দোলন সম্পর্কে গভীর ও বিশ্লেষণধর্মী অভিজ্ঞানের প্রয়োজন

বন্ধুগণ! আপনাদেরকে সাম্প্রতিককালের আন্দোলন, বিপ্লব ও ফিতনা সম্পর্কে অবশ্যই জ্ঞানার্জন করতে হবে। তবে অপরিপক্ক ও স্বল্প জ্ঞান অজ্ঞতার চেয়ে আরো বেশী ক্ষতিকর। আজ আমাদের মাদরাসাসমূহে ফ্যাশন রূপে অনেক ইজম, মতবাদ ও আন্দোলনের নাম নেয়া হয়। অথচ খোঁজ নিলে দেখা যাবে, সে সম্পর্কে তাদের কাছে গভীর কোন জ্ঞান নেই। বর্তমানে গবেষণা ও বিশ্লেষণধর্মী অধ্যয়ন করে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করা অত্যন্ত জরুরী। এ কাজটি কঠিন মনে হলেও তার প্রয়োজন অনেক। মাদরাসার পক্ষ থেকে সুশৃঙ্খলভাবে তা অধ্যয়ন করার ব্যবস্থা করতে হবে। তা না হলে অন্য কোন পন্থা অবলম্বন করে হলেও এটিকে অবশ্যই আয়ত্ত করতে হবে।

নতুন অধ্যয়নের সংকট ও দায়িত্ব

আমাদের মাদরাসাসমূহে নিত্য-নতুন অধ্যয়নের পরিধি ধীরে ধীরে বিস্তৃত হচ্ছে। তবে আমার দুঃখ হয় এ কারণে যে, সে অধ্যয়নে নেই কোন গভীরতা ও ভারসাম্য। আমি সাধারণ জ্ঞানার্জনে ছাত্রদের সবচেয়ে বেশী উৎসাহ প্রদান করে থাকি। তবে আপনারা জেনে রাখুন, নিঃসঙ্কোচে আমি বলছি "এ কাজটিকে যত সহজ মনে করা হয়, তা এত সহজ নয়।" এর জন্য গ্রন্থ নির্বাচন, বিন্যাস এবং একজন অভিজ্ঞ পরামর্শদাতার প্রয়োজন। তবে এর পূর্বে নিজের ধ্যান-ধারণা ও মননশীলতা সঠিকভাবে যাচাই করে নিতে হবে। অধ্যয়নের পর লব্ধ জ্ঞানকে বিন্যস্ত করতে হবে এবং সঠিক স্থানে তা প্রয়োগ করতে হবে।

সুষ্ঠু ও নিয়মতান্ত্রিক তা'লিম তরবিয়ত পেয়ে যদি কেউ তৈরী হয়ে যায়, তাহলে সে সব ধরণের অধ্যয়ন থেকে উপকৃত হতে পারবে। শিল্প, সাহিত্য, ইতিহাস, সাধারণ জ্ঞান এমন কি অনেক অপ্রাসঙ্গিক বিষয় দ্বারা দ্বীনের এমন খেদমত আনজাম দিতে সক্ষম হবে; যা অনেক সময় মৌলিক বিষয় দ্বারাও আনজাম দেয়া যায় না। আর তখন আল-কুরআনের এ সত্যটি ফুটে উঠবে।

من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين.

" রক্ত ও গোবরের মধ্য থেকে খাঁটি ও তৃপ্তিদায়ক দুধ নির্গত হয়ে আসে।" (সূরা নাহ্‌ল-৬৬)

আর যদি এরূপ না হয়; ধর্মীয় নীতিমালা ও তার মৌলিক বিষয়সমূহ মন ও মস্তিষ্কে প্রভাব সৃষ্টি করতে না পারে এবং রুচিহীন ও বক্র মানসিকতা বিরাজ করে; তাহলে বিভ্রান্তি কখনো দূর হবে না, সঠিক জ্ঞানার্জন করা সম্ভব হয়ে উঠবে না,

ہر چہ گیرد علتے علت شود

"যেখানে হাত দেয় সেখান থেকেই ভ্রান্তি বেরিয়ে আসে।"

মাতৃভাষা ও সাহিত্যের সাথে সম্পর্ক

আমি এ সুযোগে আপনাদেরকে আরো দু'টি বাস্তবতার দিকে নিয়ে যেতে চাই। প্রথমতঃ কোন দেশে দ্বীনী খেদমত, তার প্রচার-প্রসার এবং চলমান জীবনে প্রভাব বিস্তার করতে হলে সেখানকার ভাষা ও সাহিত্যের সাথে গভীর

সম্পর্ক রাখতে হবে। সুস্থ মস্তিষ্ক ও সুরুচির অধিকারী হতে হবে। সঠিক মান-সম্পন্ন ও জীবন্ত ভাষায় লেখা ও বলার যোগ্যতা থাকতে হবে। আর তখনই দ্বীনের দাওয়াত সে দেশে কার্যকরী ভূমিকা রাখতে পারবে।

একথা সর্বজন স্বীকৃত যে, আল্লাহ তায়ালা আম্বিয়ায়ে কেরামকে প্রাঞ্জল ও মধুর ভাষায় তাদের মনোভাব ব্যক্ত করার অসাধারণ ক্ষমতা দান করেছিলেন। যেমন ইরশাদ হচ্ছে ঃ إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون "আমি কুরআনকে আরবী ভাষায় নাযিল করেছি, যাতে তোমরা বুঝতে পার।" (সুরা যুখরুফ-৩) بلسان عربي مبين "আমি সুস্পষ্ট আরবী ভাষায় নাযিল করেছি।" (সূরা শু'আরা-১৯৫) وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه "আমি প্রত্যেক রাসূলকে তার স্বজাতির ভাষা দিয়ে প্রেরণ করেছি।" (সূরা ইব্রাহীম-৪)

চিন্তাশীল, গবেষক ও তত্ত্বজ্ঞানী উলামায়ে কেরাম মনে করেন যে, "স্বজাতির ভাষা বলতে শুধুমাত্র "তাদেরকে বুঝানোর যোগ্যতা"- এর নাম নয়। বরং যুগের সর্বোৎকৃষ্ট সাহিত্যের মানদন্ডে উন্নীত ভাষাকেই বুঝানো হয়েছে। এর প্রমাণ হলো যে, আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে لتبين لهم "যেন আপনি সুস্পষ্টভাবে তাদের সামনে ব্যক্ত করতে পারেন।" রাসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, أنا أفصح العرب অর্থাৎ "আমি সর্বোৎকৃষ্ট আরবী ভাষাজ্ঞানের অধিকারী।"

আপনারা জানেন, ইসলামের ইতিহাসে যারা সংস্কার ও সংশোধনের ক্ষেত্রে উল্লেখ যোগ্য ভূমিকা পালন করেছেন এবং মুসলমানদের চিন্তা-চেতনায় প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছেন; তারা সাধারণতঃ ভাষা ও সাহিত্যে পারদর্শী ছিলেন। শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী (রহ.)-এর উপদেশবাণীর রত্ন-ভাণ্ডার ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে আজো উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে আছে। ইমাম গায্যালী (রহ.)-এর গ্রন্থরাজীর সাবলীলতা, প্রাঞ্জলতা ও মাধুর্যপূর্ণ ভাষা, আবুল ফযল ফয়জীর রচনা সামগ্রীকেও হার মানিয়েছে। শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্ (রহ.)-এর "হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগাহ্" আরবী সাহিত্যে এমন এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে যে, "মুকাদ্দামায়ে ইবনে খালদুন"-এর পর পরবর্তী শতাব্দীগুলোতে এর কোন নযীর পাওয়া যায় না। ফারসী ভাষাতেও শাহ্

ওয়ালীউল্লাহ্ (রহ.) যথেষ্ট কৃতিত্বের অধিকারী ছিলেন। তাঁর রচিত "ইযালাতুল খেফা" কিতাবের কিছু কিছু অংশ ফারসী সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ নমুনার স্বাক্ষর বহন করে।

এতো হলো তখনকার কথা, যখন আরবী, ফারসী এদেশের মুসলমানদের ভাষা ছিল। পরবর্তীতে উর্দু ভাষা চালু হওয়ার পর, স্বয়ং হযরত শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্ (রহ.)-এর সাহেবজাদাগণ সে ভাষাতেই সর্বপ্রথম রচনা ও গ্রন্থনার কাজ শুরু করেন। শাহ্ আব্দুল কাদের (রহ.) কর্তৃক কুরআনুল কারীমের অনুবাদ দিল্লীর ভাষাশৈলীর সর্বোৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। ভাষার সৌন্দর্য্য ও নির্ভরযোগ্যতার কারণে তা ক্লাসিক্যাল সাহিত্যে উন্নত মর্যাদা পেয়েছে।

হযরত কাসেম নানুতুবী (রহ.)-এর গ্রন্থগুলোতে এমন সাবলীল ও মাধুর্যপূর্ণ ভাষা স্থান পেয়েছে, যার ফলে জটিল ও সুক্ষ্ম বিষয়গুলো সহজে অনুধাবন করতে তেমন বেগ পেতে হয় না।

এদেশে সুদীর্ঘকাল পর্যন্ত উলামায়ে কেরামই ভাষা ও সাহিত্যে নেতৃত্ব দান করেছেন। সাহিত্যের পথিকৃত হিসেবে তাঁরাই পরিচিত ছিলেন। খাজা আলতাফ হুসাইন আলী, মৌলবী নযীর আহমাদ দেহলভী, মাওলানা শিবলী নোমানী প্রমুখ উলামায়ে কেরাম ছিলেন উর্দু সাহিত্যের প্রখ্যাত স্থপতি। তাঁদের সূক্ষ্ম রুচিবোধ, উন্নত মানসিকতা এবং রচনা সামগ্রীর এমন মূল্যবান রত্ন-ভাণ্ডার রয়েছে, যা উর্দু ভাষায় উজ্জ্বল নমুনা হয়ে আছে। মাওলানা হাবীবুর রহমান খান শেরওয়ানী (রহ.) ও দারুল উলুম নদওয়াতুল উলামার মহাপরিচালক মাওলানা আব্দুল হাই (রহ.) রচিত গ্রন্থরাজি উর্দু গদ্য সাহিত্যের শ্রেষ্ঠতম সম্পদ এবং ঐতিহাসিক নির্ভরযোগ্যতা ও মাধুর্য্যপূর্ণ উপস্থাপনার অভূতপূর্ব দৃষ্টান্ত।

মাওলানা সোলায়মান নদভী (রহ.) তাঁর তথ্যবহুল আলোচনা ও সাহিত্য সমৃদ্ধ প্রবন্ধমালা দ্বারা উর্দুকে উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছিয়েছেন। তাঁর গ্রন্থরাজিকে আজো ভাষা ও সাহিত্যের মাপকাঠি মনে করা হয়। মাওলানা আবুল কালাম আজাদের রচনা সামগ্রী উর্দু ভাষায় নতুন শক্তি যুগিয়েছে এবং নতুন বর্ণনাভঙ্গি শিক্ষা দিয়েছে। তাঁর সম্পাদনায় পরিচালিত "আল হেলাল" পত্রিকা পুরো হিন্দুস্তানে আলোড়ন সৃষ্টি করে। এখনো সাহিত্যাঙ্গনে তার এক বিশেষ মর্যাদা রয়েছে।

যুগ সচেতনতার ফলশ্রুতিতে উলামায়ে কেরামকে এদেশের উন্নতি, অগ্রগতি ও জাতীয় চাহিদা থেকে বিচ্ছিন্ন বা অবচেতন বলে অপবাদ দেয়া যায় না। তাঁরা তো এদেশের মাটি ও মানুষ থেকে আলাদা থাকার কোন প্রচেষ্টা চালাননি। অন্যান্য মুসলিম রাষ্ট্রের মত যুগোপযোগী পদক্ষেপ নিতে তাঁরা কখনো পিছিয়ে থাকেননি। দ্বীনের দাওয়াত ও ইসলামের পয়গাম পৌঁছাতে দেশের সাহিত্যাঙ্গনে প্রভাব সৃষ্টিকারী ভাষা ব্যবহার করেছেন।

আমাদের কর্তব্য হলো তাঁদের নীতিকে আকঁড়ে ধরা এবং এ পূত-পবিত্র উত্তরাধিকারের যথাযথ সংরক্ষণ করা। আমরা যদি দ্বীনের কার্যকরী খেদমত আনজাম দিতে চাই,- নিজেদের আক্বীদা-বিশ্বাস ও দৃষ্টিভঙ্গি সর্বমহলে পৌঁছে দিতে চাই, তাহলে আমাদের বক্তব্য ও লেখনিতে সহজ-সরল ও মাধুর্যপূর্ণ ভাষা ব্যবহার করতে হবে এবং সমসাময়িক সাহিত্যের মানদন্ডে উন্নীত করতে হবে। আর তা ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ ও বুযুর্গানে দ্বীনের আদর্শের পরিপন্থী হবে না।

আরবী ভাষায় দক্ষতা

সাম্প্রতিককালে আরবী ভাষা একটি জীবন্ত ও শক্তিশালী ভাষা। আরব বিশ্বে তা এখন উন্নতি-অগ্রগতির শীর্ষস্থান দখল করে আছে। রচনা- গ্রন্থনা, বক্তৃতা, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, দর্শন, আইন ও প্রশাসন তথা সর্বস্তরে আরবী ভাষার প্রচলন রয়েছে।

আমাদের দ্বীনী মাদরাসাগুলোতে একটি ভুল ধারণা জন্ম নিয়েছে যে, তাফসীর, হাদীস ও ফিকাহ শাস্ত্রের কিতাবগুলো প্রাচীন আরবী ভাষাতে সীমাবদ্ধ; বর্তমানে তার কোন ব্যবহার নেই। "আধুনিক আরবী ভাষা" নামে সম্পূর্ণ একটি নতুন ভাষার জন্ম হয়েছে, যার অধিকাংশ শব্দই ইংরেজী ও ফারসী ভাষা থেকে উদ্ভুত।

এ ভুল ধারণার ফলে আমাদের অনেক আলেম ও তালেবে ইলমের হৃদয়ে আরবী ভাষার প্রতি চরম অনীহা ও নৈরাশ্যবোধ জন্ম নিয়েছে। আপনারা যদি আমাকে বিশ্বাস করেন, তাহলে অত্যন্ত দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করছি যে, আধুনিক আরবী ভাষার অস্তিত্ব বলতে কোন কিছুই নেই। মধ্যপ্রাচ্যসহ সারা আরব মুলুকে একাডেমীক পর্যায়ে এবং জ্ঞানী-গুণী ও বিদগ্ধ মহলে যে ভাষার প্রচলন রয়েছে, তা কুরআন, হাদীস, জাহেলিয়াত ও ইসলামী যুগের খুব নিকটবর্তী। নতুন প্রয়োজনের ক্ষেত্রেও তারা সেই প্রাচীন যুগে প্রচলিত

ভাষা ও কুরআন-হাদীসের রত্ন-ভাণ্ডার থেকে উদ্ভাবন করে শব্দ প্রয়োগ করেছেন। এ বিস্ময়কর কাজের জন্য তারা হাজারো বার মোবারকবাদ পাওয়ার যোগ্য।

মিশরে নেপোলিয়ানের হামলার পর পাশ্চাত্য সমাজের যে সমস্ত শব্দ আরবী ভাষায় প্রবেশ করেছে, তা এক এক করে সবগুলোকে বাদ দেয়া হয়েছে এবং এ স্থলে আরবী শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে। বর্তমানে আরব দেশসমূহের ভাষা, সাহিত্য, সাংবাদিকতা উন্নতির এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, তা অর্জন করতে এখন অনেক মেহনত, পরিশ্রম ও সাধনার প্রয়োজন রয়েছে।

আমাদের মাদরাসাসমূহে যে পদ্ধতিতে আরবী ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষা দেয়া হচ্ছে, তা দ্বারা আরব বিশ্বে একাডেমিক কোন খেদমত করা বা দাওয়াত ও তাবলীগের দায়িত্ব সম্পাদন করা সম্ভব নয়। আরব দেশসমূহে দ্বীনী দাওয়াত পরিচালনা করতে হলে এবং হিন্দুস্তানের একাডেমিক কার্যক্রমসমূহ তাদের সামনে তুলে ধরতে হলে ব্যাপক ভাবে প্রস্তুতি নিতে হবে।

বিশ্ব রাজনীতিতে মধ্যপ্রাচ্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। আর তা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রত্যেক মুসলমানের দৃষ্টিতে তা এখন বিশ্বের হৃদপিণ্ড ও কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে। মধ্যপ্রাচ্যের সাথে যদি উলামায়ে কেরাম সুসম্পর্ক বজায় না রাখতেন এবং ইসলাম ও মুসলমানদের সঠিক দিক নির্দেশনা প্রদান না করতেন, তাহলে তা নিজের জন্য এবং এ দেশের জন্য অনেক ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াত। অতএব, আরবী চর্চার ক্ষেত্রে আমাদের মাদরাসাসমূহের বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা অপরিহার্য হয়ে পড়েছে।

ভাষা ও সাহিত্য জীবন্ত ও গতিশীল বিষয়। এ ব্যাপারে কোন প্রতিষ্ঠানের সামান্যতম দুর্বলতা থাকলে দীর্ঘকাল সেই ক্ষতির খেসারত বরদাশত্ করতে হবে।

বাস্তবসম্মত আক্বীদা-বিশ্বাসের সংরক্ষণ

বন্ধুগণ! আমি আপনাদের অনেক সময় ব্যয় করেছি। তবে-

لذیذبود حکایت دراز تر گفتم

"ঘটনা ছিল মাধুর্যপূর্ণ, তাই কথা দীর্ঘ করলাম।"

এখন আমি আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নেয়ার পূর্বে, সর্বশেষ একটি কথা বলতে চাই। তবে কথাটি সর্বশেষে হলেও তার গুরুত্ব কোন দিক দিয়ে কম নয়। তা হলো, আমাদের পূর্বসুরী উলামায়ে কেরামের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব হলো, তাঁরা মুসলমানদের দ্বীনী গায়রত ও ধর্মীয় অনুভূতি সংরক্ষণ করেছেন। যুগের কোন ফিতনার সম্মুখে তাঁরা মাথা নত করেননি। তাঁরা বিদআত, কুসংস্কার এবং অসামাজিক কার্যকলাপ প্রতিরোধ করার ব্যাপারে কোন প্রকার দুর্বলতা ও অলসতা প্রদর্শন করেননি। আপনাদের পূর্বসুরীদের মধ্যে শাহ্ মোহাম্মাদ ইসমাঈল শহীদ (রহ.) ও রশীদ আহমাদ গঙ্গোহী (রহ.)-এর দিকে তাকিয়ে দেখুন। দুনিয়ার জীবনে তাঁরা সবকিছু মেনে নিতে পেরেছেন, কিন্তু শরীয়তবিরোধী সামান্যতম বিষয়কেও তাঁরা সহ্য করতে পারেননি। পাহাড়সম স্থিরতা নিয়ে যাবতীয় কুসংস্কারের বিরুদ্ধে আজীবন লড়াই করেছেন।

ইংরেজ শাসনামলে যখন এদেশে পশ্চিমা সংস্কৃতি ও নাস্তিক্যবাদী ধ্যান-ধারণার বন্যা বইতে শুরু করলো, তখন তাঁরা নিজস্ব মতাদর্শ থেকে সামান্যতম বিচ্যুত হননি। আপনাদের পূর্বসুরী উলামায়ে কেরাম শরীয়তের ব্যাপারে এমন তীক্ষ্ণ মনোভাব ও আত্মমর্যাদার পরিচয় দান করেছেন, যার ফলে তাঁরা শেষ পর্যন্ত কোন বিদআতের বৈধতার ফতওয়া দান করেন নি।

ইসলামের যাবতীয় বিধি-বিধান যথাযথভাবে সংরক্ষণ করার দায়িত্ব তাঁরা আনজাম দিয়েছেন। এতে সামান্যতম সংযোজন-বিয়োজন তাঁরা মেনে নেননি। তাঁদের দুরদর্শিতার কারণে কোন বিদআত ইসলামের মৌলনীতিতে প্রবেশ করার সুযোগ পায়নি। তাঁরা মানুষের ঘৃণা, তিরস্কার, বয়কট, কুফরের ফতওয়া এবং যাবতীয় জ্বালা-যন্ত্রনা সহ্য করেছেন, তবুও নিজস্ব মতাদর্শকে কখনো ত্যাগ করেননি। এর ফলে লক্ষ লক্ষ মুসলমান আজ বিদআতের ছোয়া থেকে মুক্ত হয়ে ইসলামের বিশুদ্ধ আক্বীদা-বিশ্বাস নিয়ে বেঁচে আছে। আল্লাহ তা'আলা দ্বীন ও শরীয়তের অতন্দ্র প্রহরী বুযুর্গানে দ্বীনের রূহকে শীতল করুন এবং তাঁদের মেহনতের উত্তম বিনিময় দান করুন।

آسماں انکی لحد پر شبنم افشانی کرے

"আকাশ তাদের কবরগাহে রহমতের বারি বর্ষন করুক।"

আজ আমরা ঐ সমস্ত বুযুর্গানে দ্বীনের অর্ন্তদৃষ্টি, দূরদর্শিতা ও ধর্মীয় জ্ঞানের গভীরতা উপলব্ধি করতে পারছি। তাঁরা নিজেদের দায়িত্ব

অত্যন্ত তীক্ষ্ণতা ও নৈপুণ্যের সাথে আনজাম দিয়েছেন। কুরআনে কারীমে এরশাদ হচ্ছেঃ

من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا.

"মুমিনদের মধ্যে এমন কিছু লোক রয়েছে, যাঁরা আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদা বাস্তবায়ন করেছে; কেউ জীবন দিয়েছে আর কেউ তার প্রতীক্ষায় রয়েছে। আর তাঁদের মধ্যে বিন্দুমাত্র পরিবর্তন আসেনি।"(সূরা আহযাব-২৩)

আমি আপনাদের কাছে একথা বলে যেতে চাই যে, অতীত কালের সত্যনিষ্ঠ বুযুর্গানে দ্বীন যে আদর্শ রেখে গিয়েছেন, তা-ই হল আমাদের প্রিয়তম বস্তু। তাঁরা তো নিজেদের জানকে ঢাল বানিয়ে এ বাগিচা সংরক্ষণ করেছেন। হৃদয়ের তপ্ত খুন প্রবাহিত করে বৃক্ষরাজিতে সিঞ্চন করেছেন এবং তা আমাদের শিখিয়ে গিয়েছেন শরীয়তের বাগিচা কিভাবে সংরক্ষণ করতে হয়।

آغشتہ ایم ہر سر خار بخون دل قانون باغبانی صحرا نوشتہ ایم

কাঁটা বনে হৃদয়ের তপ্ত লহু প্রবাহিত করে লিখে গেলাম
মরুর বুকে ফুল ফুটাবার রীতি।

এ আদর্শকে আজীবন আমাদের বক্ষে ধারণ করে রাখতে হবে এবং এটাকে সবচে' মূল্যবান সম্পদ মনে করতে হবে।

আপনাদের কাছে আমার দরদী হৃদয়ের বন্ধুসূলভ অভিযোগ হল, আপনারা সে আদর্শ থেকে ধীরে ধীরে বিচ্যুত হয়ে যাচ্ছেন। আপনাদের উচিত ছিল তাদের প্রতিভা ও চেতনাকে যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা। তাদের সাথে সম্পর্ক থাকার কারণেই তো আজ আপনারা অনেক মানুষের কাছে ঘৃণিত ও অবাঞ্ছিত হয়ে আছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আপনাদের মধ্যে অনেকেই তাঁদের নাম ও কর্মতৎপরতা সম্পর্কে অবহিত নন। আপনারা কতজন মাওলানা ইসমাঈল শহীদ (রহ.)-এর জীবনবৃত্তান্ত ও অবদান সম্পর্কে জ্ঞান রাখেন? 'সিরাতে মুসতাকীম' 'তাকবিয়াতুল ঈমান' কতজন

পড়েছেন? তাওহীদ ও সুন্নাতের সঠিক পরিচয় আপনাদের মধ্যে কতজন তুলে ধরতে পারবেন?

আপনাদের পূর্বসূরী বুযুর্গানে দ্বীন তো বলতে পারতেন যে, আইয়ামে জাহেলিয়াতে ঈমানের অর্থ কি ছিল? কুরআনে কারীম তাদেরকে কেন মুশরিক বলেছে? তাওহীদের স্তর, শিরকের অর্থ ও বিদ'আতের মর্ম ও তার ক্ষতি সম্পর্কে তারা তো যথেষ্ট প্রজ্ঞার অধিকারী ছিলেন।

আপনাদেরকে এ সকল মাছআলায় বুৎপত্তি অর্জন করতে হবে। সাধারণ মানুষের চেয়ে আপনাদের অধ্যয়ন ও দুরদর্শিতা ব্যাপক ও ব্যতিক্রধর্মী হতে হবে। আমার তো মনে হয় যে, আপনাদের মধ্যে অনেকেই হয়ত এ সমস্ত বিষয়ে একেবারেই জ্ঞান রাখেন না।

আধুনিক যুগের ফেতনা

একথা তো সত্য যে, বর্তমান দুনিয়াতে নিত্য-নতুন ফেতনার আবির্ভাব হচ্ছে। অভিনব রূপ নিয়ে প্রাচীন জাহেলিয়াত আত্মপ্রকাশ করছে। আগেকার যুগে বিদ'আত পর্যন্ত ফেতনা সীমাবদ্ধ থাকলেও এখন তা প্রকাশ্যে মূর্তিপুজাররূপ নিচ্ছে।

বর্তমান সময়ের এই দুর্যোগপূর্ণ পরিস্থিতি আমাদের ধর্মীয় চেতনা, মূল্যবোধ ও আক্বীদা-বিশ্বাসের প্রতি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছে। এখন দেখতে হবে, যারা বিদ'আত ও প্রচলিত কুসংস্কার বরদাশত করতে পারেননি, তারা এ সমস্ত প্রতিমা সংস্কার কিভাবে মেনে নিবেন? এ ব্যাপারে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ও কর্মপদ্ধতি কি হবে?

আমরা আমাদের পুর্বসূরীদের ধর্মীয় চেতনা ও ইসলামী মূল্যবোধ সর্বান্তঃকরণে স্বীকার করি। সৃষ্টি ও স্রষ্টার সামনে একথার সাক্ষ্য দিতে কোন প্রকার কুণ্ঠাবোধ করব না যে, তারা অসার শক্তির সামনে কখনো মাথা নত করেননি, পরাজয় স্বীকার করেননি। এখন দেখতে হবে, আমাদের পরবর্তী বংশধরগণ আমাদের সম্পর্কে কি মন্তব্য করে এবং ইতিহাস কিভাবে আমাদেরকে স্মরণ করে।

বর্তমান যুগের দায়িত্ব

বন্ধুগণ! মহান আল্লাহ তা'আলা যে যুগের জন্য আমাদেরকে নির্বাচন করেছেন, তার প্রতি বিরাট যিম্মাদারী রয়েছে। সাথে সাথে তার মর্যাদা ও বিনিময়ও রয়েছে অনেক বেশি। দায়িত্বে অবহেলা করা ও পলায়নপর মনোবৃত্তি রাখা পৌরুষসম্পন্ন ব্যক্তিদের কাজ নয়।

অতএব, জীবনের অবশিষ্ট সময়টুকু আপনারা মূল্যায়ন করুন। যামানার চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার প্রস্তুতি নিন। আল্লাহ তা'আলা আপনাদেরকে যোগ্যতম মুরুব্বী এবং দয়ালু উস্তাদ নসীব করেছেন। দ্বীনী পরিবেশ ও খ্যাতিমান প্রতিষ্ঠানে এনেছেন। যামানার নাযুকতা ও দায়িত্বের ব্যাপকতা উপলব্ধি করুন। নিজেকে কর্মক্ষম ও প্রাণবন্ত করে গড়ে তুলুন। জাতি আপনাদেরকে মূল্যায়ন করবে।

غافل مشیں، نہ وقت بازیست وقت ہنراست وکارسازیست

অলস হয়ে বসে থেকো না, সময় তো ফিরবার নয়,
সময় হচ্ছে গতিশীল,
তাকে মূল্যায়ন করলেই পাবে তুমি জ্ঞানের আধার।

তরজমা ঃ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান

==ooo==

বিবিধ

রওযা শরীফে উম্মাহর প্রতিনিধি দল

ইতিহাসের মুসাফির যারা, আল্লাহ তাদের মাফ করুন। অতীতের উত্থান-পতনের কাহিনীতে বিভোর যারা, আল্লাহ তাদের রহম করুন। নির্জনে ও লোকারণ্যে, সর্বখানে ও সর্বক্ষণে ইতিহাসই তাদের চিন্তা, ইতহাসই তাদের ভাবনা। এমনকি পৃথিবীর পবিত্রতম স্থানে এবং সর্বোত্তম সময়ে পরম অপার্থিবতার মাঝে ইতিহাসমনস্কতা থেকে তারা অন্যমনস্ক হতে পারে না, মুহূর্তের জন্যও না। কেননা তারা ইতিহাসের ধারক ও বাহক এবং ইতিহাস তাদের পথ প্রদর্শক। ইতিহাসই তাদের জীবন এবং অতীত ও বর্তমানের মাঝে তারই সেতু-বন্ধন। তাই যখন তারা দৃশ্যের পর দৃশ্য অবলোকন করেন, এবং ঘটনার পর ঘটনা পর্যবেক্ষণ করেন। তখন মুহূর্তের মাঝে তাদের চিন্তার পর্দায় ভেসে ওঠে ইতিহাসের সেই পটভূমি যার ফলশ্রুতি হলো এই ঘটনা ও দৃশ্যের ধারাপ্রবাহ। আর সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য আজীবন আমি ইতিহাসের ছাত্র, ইতিহাসই আমার ভাবনা দিবা-রাত্র।

গতকাল আমি মসজিদে নববীর রিয়াযুল জান্নায় বসেছিলাম। ইবাদতকারীদের সমাবেশ ছিলো। একটা নূরানী পরিবেশ ছিলো। উৎসবের এক আমেজ ছিলো। নামাযীরা কেউ রুকুতে, কেউ সিজদায়। তিলাওয়াতের সুমধুর গুঞ্জন শোনা যায়। এমন নূরানী পরিবেশে, এমন রূহানী প্রশান্তিতে ক্ষণিকের জন্য হলেও ইতিহাসের বন্ধন এবং বিগতদের আকর্ষণ থেকে মুক্ত থাকাই সংগত ছিলো। ইতিহাস চিন্তার পরিবর্তে ইতিহাস বিস্মৃতিই কাম্য ছিলো।

কিন্তু অদ্ভুত এক ইতিহাস তন্ময়তায় আমি এমনই আচ্ছন্ন হলাম যে, ঘড়ির কাঁটা হঠাৎ পিছনে ঘুরতে শুরু করলো। ইতিহাস আমাকে অতীতের দিকে, সোনালী যুগের সেই সুদূর অতীতের দিকে টেনে নিয়ে গেলো। দেশ কালের সীমা-রেখা মুছে গেলো এবং এক হাজার শতাব্দীর অতীত জীবন্ত হয়ে উঠলো। ইতিহাসের বিভিন্ন পর্বের, বিভিন্ন ক্ষেত্রের স্মরণীয় বরণীয় ব্যক্তিদের বিভিন্ন প্রতিনিধি দল মসজিদে নববীর অঙ্গনে হাজির হতে লাগলো। আমার সমগ্র সত্তা বিস্ময়-বিমুগ্ধ হলেও সবকিছু আমার কাছে বাস্তব ও বর্তমান মনে

হলো। চোখের সামনে যেন দেখতে পেলাম, ধীরে শান্ত পদক্ষেপে সবাই মসজিদে প্রবেশ করছে। ভাবগম্ভীর ভাবে দু'রাকাত নামায আদায় করছে। তারপর রওযা শরীফে হাজির হয়ে ভক্তি-বিহবল চিত্তে, বিনয়-নম্র স্বরে দুরূদ ও সালামের নাযরান এবং আকীদাত ও মুহাব্বাতের শোকরানা পেশ করছে। এবং নবী রাহমাতুল্লিল আলামীনের ইহসান ও অনুগ্রহের কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছে।

দেশ-কাল ভিন্ন, ভাষা ও বর্ণ স্বতন্ত্র, কিন্তু সবাই তারা অভিন্ন ভাষায়, অভিন্ন অভিন্ন চেতনায় স্বীকার করছে যে, এখানে এই রওযায় শায়িত যিনি, তিনি সেই দয়ার নবী, যাঁর মাধ্যমে আল্লাহ তাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে, দুর্ভাগ্য থেকে সৌভাগ্যের দিকে, শত উপাস্যের বন্দনা থেকে লা-শরীক ইলাহের বন্দেগীর দিকে, বহু ধর্মের গঞ্জনা থেকে এক ইসলামের সত্য-ন্যায়ের পথে এবং দুনিয়ার সংকীর্ণতা থেকে প্রশস্ততার দিকে টেনে এনেছেন।

তাদের বিগলিত হৃদয়ের অশ্রুধারা যেন স্বীকার করছে যে, তারা তো নবী-বাগানেরই ফুল, ইসলাম-বৃক্ষেরই ফল। তাদের অস্তিত্বের যা কিছু উজ্জ্বলতা এবং জীবনের যা কিছু সফলতা মুহাম্মদী নবুয়তেরই অনুগ্রহ তা। পৃথিবীর বুকে যে মান ও সম্মান এবং যে দান ও কল্যাণ তারা লাভ করেছে আল্লাহ না করুন মুহূর্তের জন্য যদি নবুয়তে মুহাম্মদীর নূরানী ছায়া তাদের উপর থেকে সরে যায় তাহলে তারা প্রাণহীন কংকাল অর্থহীন জাল ছাড়া কিছু নয়। তখন এই উন্নত তাহযীব-তামাদ্দুন এবং এই সমৃদ্ধ সভ্যতা ও সংস্কৃতির নাম-নিশানা মুছে ফেলে তাদেরকে আবার ফিরে যেতে হবে ইতিহাসের সেই অন্ধকারতম যুগে যেখানে মানবতা ভূলুণ্ঠিত ছিলো। যেখানে পাশবিক আইনের শাসন এবং নরপশুদের শোষণ ছিলো। ছিলো সর্বপ্রকার অধর্ম-অনাচার ও জুলুম-স্বেচ্ছাচার।

হঠাৎ আমার দৃষ্টি সচকিত হলো। আমি দেখতে পেলাম, রওযা শরীফের নিকটতম দরজা বাবে জিবরীল দিয়ে এক জামাত দাখিল হলো। ভাবগম্ভীর তাদের আগমন। বিনয়-নম্র তাদের আচরণ এবং ভক্তি-সংযত বিচরণ। মুখমণ্ডলে ইলম ও প্রজ্ঞার নূরানী উদ্ভাস এবং বিনিদ্র রজনীর ক্লান্তি আভাস। বাবে রহমাত ও বাবে জিবরীলের মধ্যবর্তী স্থানে তারা জমায়েত হলেন। সংখ্যায় এতো বেশী যে, গণনা করা কঠিন।

আমার অবাক মনের কৌতুহল ও জিজ্ঞাসা, কারা এই নূরানী জামাত! কী তাদের পরিচয়? গায়েব থেকে যেন আওয়ায এলো, এঁরা উম্মাহর ইমাম ও রাহবার এবং মানব জাতির গর্ব ও অহংকার। এঁরা বহু জ্ঞান ও শাস্ত্র এবং বহু চিন্তাধারার প্রবর্তক। এঁরা বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন বংশের শিক্ষক ও দীক্ষক। এঁরা একেকজন সৃষ্টি করেছেন একেকটি গ্রন্থাগার। এঁদের অক্ষয় কীর্তি ও কর্মের নমুনা আজো তুমি দেখতে পারো। এঁদের জ্ঞান, গবেষণা ও ইজতিহাদের আলোকে বংশের পর বংশ জীবন-সফরের সুদীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়েছে। এই যে দেখো, ইমাম মালিক, ইমাম আবু হানীফা, ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল। আর ঐ যে ইমাম বোখারী, ইমাম মুসলিম, ইবনে তায়মিয়াঁ, ইবনে কোদামা, ইবনে হোমাম ও শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলবী।

তাদের দেশ-কাল ভিন্ন, তাঁদের কর্ম ও কীর্তি স্বতন্ত্র এবং তাঁদের ইলমী ও দ্বীনী মরতবায়ও রয়েছে তারতম্য, কিন্তু এখানে মসজিদে নববীর অঙ্গনে সবাই এক মোকামে, এক যবানে পেয়ারা নবীকে ভক্তি-ভালোবাসার নাযরানা পেশ করলেন এবং কৃতজ্ঞতার অশ্রু নিবেদন করলেন। আমি দেখলাম সর্ব প্রথম তাঁরা পূর্ণ আত্মসমাহিত অবস্থায় দু'রাকাত তাহিয়্যাতুল মাসজিদ আদায় করলেন। এরপর পূর্ণ আদব ও বিনয়ের সাথে রওযা শরীফের মোকামে দাঁড়ালেন এবং সংক্ষিপ্ত ও সারগর্ভ, সুপরিমিত ও ভাবসমৃদ্ধ ভাষায় তোহফায়ে সালাম পেশ করলেন। তাঁদের সবার চোখে ছিলো অশ্রুর ঝিলিমিলি, কণ্ঠে ছিলো কান্নার আভাস। কৃতজ্ঞতার অশ্রু, কৃতার্থতার কান্না। তাঁদের সেই আবেগপূর্ণ বক্তব্য এখনো যেন গুঞ্জরিত হচ্ছে আমার কানে। তাঁরা বললেন-

"ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনার আসমানী শরীয়ত ও আল্লাহর বিধান যদি না হতো, আপনার সর্বাঙ্গীন ও সার্বজনীন জীবন ব্যবস্থা যদি না হতো, যা মানবতার অনিবার্য প্রয়োজন পূর্ণ করেছে, যা মানবের চিন্তা-গবেষণা ও বুদ্ধি চর্চার যোগ্যতাকে উজ্জীবিত করেছে- এসব যদি না হতো তাহলে এই বিশাল ইসলামী আইন ও ফিকাহ সম্পদের অস্তিত্ব হতো না, যা থেকে পৃথিবীর সকল জাতি ও ধর্ম যা থেকে আজ বঞ্চিত। এই সুসমৃদ্ধ ও বিশাল ইসলামী কুতুবখানারও সমাবেশ হতো না, যার মোকাবেলায় সকল ধর্মীয় সাহিত্য ভাণ্ডার অতি তুচ্ছ।

ইলমের প্রচার-প্রসার এবং আল্লাহর অসীম কুদরত ও সৃষ্টিজগত সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণার এমন উদাত্ত আহবান আপনি যদি না জানাতেন তাহলে

ইলমের এই মহাবৃক্ষ এত দীর্ঘকাল এমন সবুজ সজীব থাকতো না, এমন ফলে ফুলে সুশোভিত হতো না এবং পৃথিবীব্যাপী তার এই ছায়া বিস্তারও হতো না। বরং মানব-বুদ্ধি যেমন ছিলো তেমনই থাকতো শৃঙ্খলিত এবং জ্ঞানের আলো থেকে পৃথিবী হতো চির বঞ্চিত। এই নূরানী জামাতকে আমি চোখ জুড়িয়ে প্রাণ ভরে দেখছিলাম এবং তাঁদের ভক্তি আপ্লুত বক্তব্য শুনছিলাম, এরই মধ্যে বাবে রহমাত দিয়ে অন্য এক কাফেলার উদয় হলো। তাঁদের মুখমণ্ডলে ছিলো যুহদ ও তাকওয়া, ইবাদত ও মুজাহাদা এবং রূহানিয়াত ও নূরানিয়াতের সুস্পষ্ট ছাপ।

সেই গায়বী আওয়াজে এবার আমাকে বলা হলো-

"এ কাফেলায় রয়েছেন হাসান আল-বাছরী, ওমর বিন আব্দুল আযীয, সুফয়ান ছাওরী, ফুয়াইল বিন আওয, শায়খ আব্দুল কাদির জিলানী ও নিযামুদ্দীন আউলিয়ার মতো পুণ্যাত্মাগণ, পৃথিবীতে যারা তাঁদের পূর্ববর্তীদের জীবন ও চরিত্র এবং কর্ম ও আদর্শ জীবন্ত রেখেছিলেন।

নামায আদায়ের পর তাঁরাও রওযা শরীফের মোকামে আদবের সাথে দাঁড়ালেন এবং রূহ ও কলবের 'শেফা' প্রিয় নবী মোস্তফার উদ্দেশ্যে দুরুদ ও সালামের তোহফা পেশ করে আত্মার আবেগ নিঃসৃত ভাষায় আরয করলেন-

ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি বলেছেন- আখেরাতের জীবনই আসল জীবন। আরো বলেছেন- এমনভাবে করো দুনিয়ার দিন গুযরান যেন তুমি এক মুসাফির কিংবা কোন রাহগীর। কিন্তু ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের সামনে যদি আপনার সীরাত ও সুন্নাতের আলোর মিনার না হতো, যদি আপনার সেই 'জীবন-চিত্র' না হতো যা উম্মে আয়েশা (রা.) আমাদের জন্য এভাবে এঁকেছেন- এক চাঁদ থেকে আপরেক চাঁদ এবং তারপর তৃতীয় চাঁদ পার হতো, অথচ নবী পরিবারের চুলায় আগুন জ্বলতো না, হাঁড়িতে খাবার জ্বাল হতো না এই উসওয়াতুন হাসানা যদি আমাদের সামনে না হতো তাহলে দুনিয়ার লোভ-লালসা ছেড়ে আখেরাতের মোরাকাবা করা আমাদের পক্ষে কখনো সম্ভব হতো না। সম্পদের হাতছানি, নফসের রাহাজানি, দুনিয়ার চাকচিক্য এবং খ্যাতি ও ক্ষমতার মোহ উপেক্ষা করে অল্পেতুষ্টির আদর্শ গ্রহণ করা এবং আত্মশুদ্ধির মুজাহাদায় আত্মনিয়োগ করাও সম্ভব হতো না।

তাঁদের প্রজ্ঞাপূর্ণ বক্তব্যের ভাব ও মর্ম আমি মাত্র হৃদয়ঙ্গম করছি, এমন সময় মনে হলো পর্দা ঘেরা এক কাফেলা যেন বাবে নেসার পথে হাজির

হলো। এ যুগের বে-আবরু বেহায়াপনার নাম-গন্ধ নেই, ঝলমলে পোশাকের বাহার নেই রকমারি অলংকারের ঝংকার নেই বরং আছে সততা ও সতীত্বের এমন এক নূরানী আবরণ যা পুরুষ-দৃষ্টিকে শ্রদ্ধায় অবনত হতে উদ্বুদ্ধ করে। তখন গায়বী আওয়ায যেন আমাকে শাসন করে বললো-

নেগাহ নীচু করো, উম্মতের নারীকুল নবীর যেয়ারাতে এসেছেন। বিভিন্ন যুগের, বিভিন্ন দেশের, বিভিন্ন কাওমের-আরব-আজম ও মাশরিক-মাগরিবের ইবাদতগুযার সতী-সাধ্বী নারীগণ পূর্ণ পর্দার বেষ্টনীতে রওযা শরীফের মোকামে হাজির হলেন এবং পূর্ণ আদব রক্ষা করে ক্ষীণ ও লাজ-নম্র কণ্ঠে এভাবে তাদের কৃতজ্ঞতার অনুভূতি প্রকাশ করলেন-

উম্মতের নারীকুলের সালাম গ্রহণ করুন ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার উপর বড় দয়া ও মেহেরবানী আপনার! আল্লাহর রহমতে আপনি আমাদের উদ্ধার করেছেন জাহেলিয়াতের বর্বরতা, সমাজের নিষ্ঠুরতা, পুরুষজাতির স্বেচ্ছাচার এবং যিন্দা দাফনের পাশবিকতা থেকে। আপনি শিক্ষা দিয়েছেন মাতৃ-সেবা ও মাতৃভক্তির। আপনারই পাক যবানে এরশাদ হয়েছে-

মায়ের পায়ের নীচে সন্তানের জান্নাত। পুরুষের পাশাপাশি আমাদেরও আপনি মা, বোন, কন্যা ও স্ত্রী হিসাবে মীরাছের অংশীদার করেছেন। বিদায় হজ্জের ঐতিহাসিক ভাষণেও আপনি আমাদের কথা ভূলেননি। আপনি বলেছেন- "স্ত্রীদের সম্পর্কে আল্লাহকে ভয় করো। কেননা আল্লাহর নামকে মাধ্যম করে তোমরা তাদের লাভ করেছো। এছাড়াও বিভিন্ন প্রসঙ্গে পুরুষকে আপনি স্ত্রীজাতির প্রতি উত্তম আচরণের এবং তাদের প্রাপ্য অধিকার প্রদানের আদেশ করেছেন।"

আমাদের নারী সমাজের পক্ষ হতে আল্লাহ আপনাকে ঐ সর্বোত্তম বিনিময় দান করুন যা নবী-রাসূল ও আল্লাহর নেক বান্দাদের দান করা হয়। শ্রদ্ধার স্নিগ্ধ অনুভূতি জাগানো এই কোমল নারী কণ্ঠ আমার কানে যখন গুঞ্জরিত হয়ে চলেছে তখন বাবুস্‌সালামের পথে আগুয়ান এক জামাতের দিকে আমার নজর গেলো।

মনে হলো এঁরা বিভিন্ন জ্ঞান ও শাস্ত্রের জনক এবং ইলম ও হিকমতের সাধক। সেই গায়বী আওয়াজ আবার ভেসে এলো– এদের নাম তুমি শুনেছো এবং এঁদের জ্ঞান ও বিদ্যার ছায়ায় তুমি মানুষ হয়েছো। এঁদের মাঝে

রয়েছেন আবুল আসওয়াদ দুআলী, খলীল বিন আহমাদ, সীবওয়ায়, কিসাঈ, আবু আলী আল-ফারসী, আব্দুল কাহির জুরজানী, মাজদুদ্দীন ফীরোযাবাদী, সাইয়েদ মুরতাযা বেলগ্রামী এবং আরও অনেকে।

ইলমের ভাবগম্ভীরতা এবং জ্ঞান সাধনার বিনয় ও সংযমের সাথে এই ইলমী কাফেলা রাওযা শরীফের মোকামে এসে হাজির হলো। এবং আদবের যবানে ও বালাগাতের লিসানে ইলম ও বুদ্ধিবৃত্তির জগতে তাদের গগণচুম্বী খ্যাতি ও কীর্তির নাযরানা পেশ করলো।

আমি মুগ্ধ বিস্ময়ে তাদের জ্ঞানগর্ভ ও অলঙ্কার সমৃদ্ধ এই বক্তব্য শুনলাম- "ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি যদি না হতেন এবং আপনার উপর অবতীর্ণ পবিত্র গ্রন্থ আল-কুরআন যদি না হতো এবং আপনার পবিত্র বাণী সুন্নাহের এই বিশাল ভাণ্ডার যদি না হতো, আর যদি না হতো এই আসমানী শরীয়ত যার সামনে বিশ্ব-জাতি তাদের গর্বিত শির অবনত করেছে তাহলে আরবী ভাষা ও সাহিত্য আসমানী মর্যাদা লাভ করতো না এবং মুসলিম উম্মাহ আরবী ভাষা ও সাহিত্যের সর্বোচ্চ শিক্ষা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তাও বোধ করতো না। তাহলে আমাদের হাতে বিভিন্ন জ্ঞান ও শাস্ত্রের যে উদ্ভব ও বিকাশ ঘটেছে এবং আমাদের মেধা, প্রতিভা ও সৃজনশীলতার ফসল রূপে যে বিশাল জ্ঞান-সম্পদ গড়ে উঠেছে আর বিশ্বের দরবারে আমরা জ্ঞান ও শাস্ত্রের ইমাম ও জনকরূপে অখণ্ড শ্রদ্ধার যে সুউচ্চ আসন লাভ করেছি এসব কিছুই হতো না।

কুরআন-সুন্নাহ ও আসমানী শরীয়ত যদি না হতো তাহলে কোথায় থাকতো নাহব-বালাগাত শাস্ত্রের এ মহা জৌলুস? অভিধান ও লোগাত শাস্ত্রের এ বিশাল ভাণ্ডার?

সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পর্যালোচনা ও বিচার বিশ্লেষণ সম্পন্ন শব্দতত্ত্বের যে মহাসম্পদ আরবী ভাষাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে তার তুলনা পৃথিবীর ভাষা বিজ্ঞানের ইতিহাসে নেই, কিন্তু এ পথে যে বিরাট সাধনা ও মুজাহাদা এবং যে বিপুল ত্যাগ ও কোরবানীর প্রয়োজন ছিলো এবং তার জন্য আমাদের অন্ত পরে আবেগ-জাযবা এবং উৎসাহ-উদ্দীপনার যে মহা আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিলো কখনো তা সম্ভব হতো ন। কেননা আরবের মত আজমেরও ছিলো গর্ব করার মত সমৃদ্ধ ভাষা ও সাহিত্য। সুতরাং আমাদের আজমীদের মাঝে আরবী ভাষা ও সাহিত্যের এমন কালজয়ী লেখক, সাহিত্যিক ও ভাষা

বিজ্ঞানীর কখনো আবির্ভাব হতো না, যাদের সৃজনশীল প্রতিভার অকুণ্ঠ স্বীকৃতি স্বয়ং আরবের জ্ঞানী ও গুণী সমাজ দিতে বাধ্য হয়েছে।

ইয়া রাসূলুল্লাহ! ইসলামের ছায়াতলে আমাদের এবং আমাদের এই জ্ঞান সাধনার মাঝে আপনিই ছিলেন একমাত্র যোগসূত্র। আপনার নবুয়ত-সত্তাই ছিলো আরব-আজমের মাঝে একমাত্র সেতুবন্ধন। জাতিতে জাতিতে যে দূরত্ব ছিলো, মাশরিকে-মাগরিবে যে ব্যবধান ও মহাশূন্যতা ছিলো তা দূর করে আপনিই সবাইকে এক করেছেন, একাত্ম করেছেন। আমাদের মেধা ও বুদ্ধিবৃত্তির, আমাদের জ্ঞান গভীরতা ও সৃজনশীলতার এবং আমাদের ইলমী সত্তার এই শতমুখী বিকাশের ক্ষেত্রে অপরিসীম আপনার অবদান।

আমাদের বুদ্ধিচর্চা ওচিন্তা সাধনার এই যে ফসল এবং আমাদের কলম-কাগজের এই যে সুফল- এসবই আপনার করুণা ও ইহসান, আপনারই অনুগ্রহ ও ফায়যান। ইয়া রাসূলুল্লাহ! আরবের বুকে আপনার শুভাগমন যদি না হতো এবং চিরন্তন ঐশী গ্রন্থ আল-কুরআন যদি আরবী ভাষার পৃষ্ঠপোষক না হতো তাহলে বহু সমৃদ্ধ ভাষা ও সাহিত্য যেমন বিলুপ্ত হয়ে গেছে এবং আপন মৌলিকত্ব ও স্বকীয়তা হারিয়ে চরম বিকৃতির স্বীকার হয়ে পড়েছে, বিভিন্ন আজমী ভাষা ও শব্দের আগ্রাসন এবং বিভিন্ন আঞ্চলিক প্রভাবের সম্প্রসারনের মুখে আরবী ভাষারও হতো সেই পরিণতি।

শুধু আপনি এবং আপনার বয়ে আনা কিতাব তাকে রক্ষা করেছে। ইসলামী জাহানে তাকে শ্রদ্ধা ও মর্যাদার স্বর্ণাসন দান করেছে এবং প্রতিটি মুসলিম হৃদয়কে আরবী ভাষার প্রেম-শৃঙ্খলে বন্দী করেছে। সুতরাং আজ যারা আরব বলে পরিচয় দেয় এবং আরবী ভাষায় কথা বলে কিংবা আরবী ভাষায় কলম ধরে এবং আরবী ভাষার জ্ঞান ও শাস্ত্র সাধনা করে যারা জগতজোড়া খ্যাতি ও সুখ্যাতি লাভ করে তারা সবাই আপনারই অনুগ্রহ-ঋণে চিরঋণী। এ ঋণ শোধ হবে না কোন দিন।

এই ইলমী কাফেলার, সত্যের অকুণ্ঠ স্বীকৃতিপূর্ণ শোকরানা-বক্তব্য আমি বিমুগ্ধ চিত্তে শ্রবণ করছিলাম, হঠাৎ আমার দৃষ্টি নিবদ্ধ হলো বাবে আব্দুল আযীযের দোর গোড়ায়। দেখি, বিভিন্ন দেশের, বিভিন্ন কালের এবং বিভিন্ন জাতির রমরমা ও দব্‌দবাপূর্ণ এক জামাত। সেই গায়বী আওয়ায ভেসে এলো আমার কানে-

এরা হলো দুনিয়ার বড় বড় শাসক ও সুলতান। তাদের অপ্রতিহত শাসন ক্ষমতা ও প্রতাপ প্রতিপত্তির কাহিনী আজো লেখা আছে ইতিহাসের পাতায়। খলীফা হারুনুর রশীদ থেকে সম্রাট আওরযেব, সবাই আছেন এই বাদশাহী কাফেলায়। লোকলস্কর ও সান্ত্রীদলকে দরজার বাইরে রেখে নযর নীচু করে দীনতা ও বিনয়ের প্রতিমূর্তি হয়ে ধীরে পদক্ষেপে এগিয়ে আসছে বাদশাহী কাফেলা। আর আমার কল্পনায় ভেসে উঠছে তাদের রাজকীয় ব্যক্তিত্ব এবং রাজ্য জয় ও রাজ্য শাসনের অমর কীর্তি ও কৃতিত্বের কাহিনী। আমি যেন দেখতে পেলাম সেই সব বিশাল বিস্তৃত সালতানাতের মানচিত্র যেখানে ছিলো তাদের একচ্ছত্র শাসন ক্ষমতা, যেখানে বাজতো শুধু তাদেরই জয় ডঙ্কা। দুনিয়ার বড় বড় জাতি ছিলো তাদের পদানত, প্রতাপশালী বহু রাজা ও রাজ্য ছিলো তাদের অনুগত। জগত জোড়া সেই বাদশাহীর 'তাসাবীর' আমার দৃষ্টিপথে একে একে যেন জীবন্ত হয়ে উঠলো।

এই তো খলীফা হারুন রশীদ, ভাসমান মেঘখণ্ডকে সম্বোধন করে যিনি উচ্চারণ করেছিলেন তার সেই ঐতিহাসিক মন্তব্য- 'যাও, ভেসে যাও। যেখানে খুশী 'জল' ঢেলে দাও। আমারই খাজানায় জমা হবে তোমার খাজনা।' এই তো ওয়ালীদ বিন আব্দুল মালিক, যার সালতানাত পার হতে দ্রুতগামী সওয়ারীর লেগে যেতো পনের মাস।

এখানে আছেন মালিক শাহ সেলজুকীর মত শাসক যিনি অর্ধবিশ্ব শাসন করেছেন, আর দুনিয়ার বড় বড় বাদশাহ তাকে অধীনতা-কর দিয়ে তবে রাজ্য শাসন করতো। এখানে আরো আছেন তুর্কী খলীফা সোলায়মানে আযম, যার ভয়ে গোটা ইউরোপ ছিলো কম্পমান। কোন মুসলমান তখন ইউরোপে গেলে তার ও তার ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধার জন্য গীর্জার ঘন্টাধ্বনি স্থগিত রাখা হতো।

আরো বহু ইতিহাসখ্যাত ও স্বনাম ধন্য শাসক ও সুলতানের সমাবেশ ছিলো এখানে। বিনয়-নম্র পদক্ষেপে তারা সবাই এগিয়ে আসছিলেন তাদের প্রিয়তম নবীর খিদমতে দুরূদ ও সালামের হাদিয়া পেশ করতে, তাদের বাদশাহী জীবনের শ্রেষ্ঠ সৌভাগ্য লাভ করতে। ভয় ও ভক্তি এবং শ্রদ্ধা ও ভলোবাসার এক অপূর্ব অভিব্যক্তির বিচ্ছুরণ ছিলো সবার মাঝে। দু' জাহানের বাদশাহর দরবারে যদি কবুল ও মঞ্জুর হয় তাদের তোহফায়ে দুরূদ ও সালাম তাহলেই যেন তারা ধন্য।

বাদশাহী কাফেলা প্রথমে উপস্থিত হলো ছোফ্‌ফার চত্বরে, যেখানে জীর্ণ বস্ত্র ও শীর্ণ দেহের 'গরীব' ছাহাবা অনাহারে উপবাসে দিন-রাত গুযরান করতেন শুধু ইলমের জন্য, শুধু নবুয়তের জ্ঞান সুধা লাভের জন্য। ছোফ্‌ফার চত্বর পানে তাদের সতৃষ্ণ দৃষ্টি যেন এই আরযু প্রকাশ করছিলো- হায়, সেই খোশ নছীব ছাহাবাগণের পাক কদমের একটুখানি ধূলো যদি পাওয়া যেতো এখন!

সেখানে দু'রাকআত তাহিয়্যাতুল মসজিদ আদায় করে রাওযা শরীফের মোকামে তারা হাজির হলেন। এরপর নবী-ভক্তি ও নবী-প্রেম তাদের হৃদয়ে আবেগ ও জাযবার যে আকুতি ও উচ্ছ্বাস সৃষ্টি করলো তা তারা নবীর খিদমতে নিবেদন করলেন, ঈমান ও তাওহীদের পূর্ণ সীমা ও সংযম রক্ষা করে। তারা বললেন-

"আপনি যদি না হতেন ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনার বিশ্বব্যাপী দাওয়াত ও জিহাদ যদি না হতো, আর যদি না হতো এই 'দ্বীনে আবাদী' ও শরীয়ত মুহম্মদী কল্যাণ ধারা, যার দ্বারা আমাদের পূর্ব পুরুষগণ অজ্ঞতা ও অজ্ঞাতির ঘেরাটোপ থেকে মুক্তি পেয়েছে এবং যিল্লতি ও লাঞ্ছনার জীবন থেকে ইজ্জত ও মর্যাদার সুপ্রসস্ত জীবনে প্রবেশ করেছে এবং এমন বুলন্দ হিম্মত ও উচ্চাশা লাভ করেছে যে, তাদের হাতে কায়েম হয়েছে বিশাল ইসলামী সালতানাত এবং বিজিত হয়েছে পূর্ব-পশ্চিমের, দূর দূরান্তের বহু জনপদ। এমন কি এক সময় যারা লাঠি উঁচিয়ে ভেড়া বকরীর মত তাদেরকে শাসন করেছে তাদের কাছে থেকেও তারা 'প্রজা-কর' আদায় করেছে।

মোটকথা, আপনার দাওয়াত ও জিহাদের কল্যানে জাহেলীয়াত থেকে ইসলামের পথে, এবং মরুজীবনের গোত্রীয় সংকীর্ণতা থেকে বিশ্ব-জয়ের পথে এই মহান অভিযান যদি শুরু না হতো, তাহলে পৃথিবীতে আমাদের বিজয় পতাকা উড্ডীন হতো না এবং ইতিহাসে আমাদের বিজয়গাঁথা লেখা হতো না। উষর মরুভূমি ও বিজন উপত্যকার বেদুঈন জীবনই হতো আমাদের ভাগ্যলিপি। আত্মকলহ ও হানাহানি, দুর্বলের উপর সবলের রাঁহাজানি এবং জীবনযুদ্ধে চূড়ান্ত পরাজয়ই হতো আমাদের অনিবার্য পরিণতি। আমাদের নৈতিকতা ও জীবনযাত্রা ছিলো এমনই অধঃপতিত, যার পরে অধঃপতনের কথা আর কল্পনা করাও সম্ভব নয়। গোত্র ও বস্তির সংকীর্ণ পরিমণ্ডলেই সীমাবদ্ধ ছিলো আমাদের জীবন ও যৌবনের আশা-আকাঙ্খা ও উদ্যম-স্পৃহা। তার বাইরে আর কিছু চিন্তা করারও যোগ্যতা আমাদের ছিলো না।

পুকুরের মাছ কিংবা কুয়ার ব্যাঙের যেমন, তেমনি আমরা আমাদের সীমাবদ্ধ অভিজ্ঞতার জালে আটকা ছিলাম এবং অজ্ঞ, মূর্খ পূর্বপুরুষদের অন্ধ অনুকরণেই মত্ত ছিলাম।

আপনি ইয়া রাসূলুল্লাহ! দ্বীনের এমন আলো ও রোশনী দান করেছেন যা আমাদের দৃষ্টির আঁধার দূর করেছে, চিন্তার ব্যাপ্তি ও গভীরতা এনেছে। ফলে এই দ্বীন ও তার পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান এবং এই রূহানী রিশতা ও আত্মিক বন্ধন গ্রহণ করে আমরা আল্লাহর বিশাল দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছি। আমাদের সুপ্ত প্রতিভা ও যোগ্যতা জাগ্রত হয়েছে এবং আমাদের মাঝে এক নতুন শক্তির এমন জোর ও জোয়ার এসেছে যার সাহায্যে আমরা অজ্ঞতা ও মূর্খতার এবং শিরক ও বুতপুরস্তির বিরুদ্ধে অকুতোভয়ে লড়াই করেছি এবং এমন আযীমুশ-শান ইসলামী সালতানাত কায়েম করেছি যার নিরাপদ ছায়ায় আমরা এবং আমাদের উত্তরসুরীরা বহু শতাব্দী সুখ-শান্তির জীবন যাপন করেছি।

আমরা গোলামানে মুহাম্মদ আজ আপনার দরবারে হাজির হয়েছি আমাদের দিলের আবেগ ও জাযবা, ভক্তি ও শ্রদ্ধা এবং আকীদাত ও মুহাব্বাতের নাযরানা পেশ করে এবং আপনার পাক কদমে আমাদের রাজমুকুট উৎসর্গ করে ধন্য হতে। কেননা তাতেই তো আমাদের গর্ব ও গৌরব এবং আখেরাতের নাজাত ও মুক্তি।

ইয়া রাসূলুল্লাহ! দ্বীন ও শরীয়তের শাসন প্রতিষ্ঠার যে দায়িত্ব-সৌভাগ্য আল্লাহ আমাদের দান করেছিলেন স্বীকার করি তাতে আমাদের বড় ত্রুটি বিচ্যুতি ও গাফলতি হয়েছে। এজন্য আমরা অনুতপ্ত হৃদয়ে দয়াময় আল্লাহর কাছে মাগফেরাতের ভিখারী। এই বাদশাহী কাফেলার আগমন ও বক্তব্য নিবেদন এবং তাদের বিনয়-নম্র আচরণ ও নীরব-প্রশান্ত বিচরণ মুগ্ধ বিস্ময়ে আমি অবলোকন করছিলাম। কেননা কোন রাজসভায় এমন বেশভূষা এবং এমন ভাব ও ভাষা আমার কল্পনায়ও ছিলো না। এমন সময় অন্য এক জামাত দাখিল হলো। বড় অদ্ভূত তাদের আচরণ ও বিচরণ। বাদশাহী কাফেলার কোন পরোয়া না করে তাদের কাতার ডিঙ্গিয়ে তারা রাওযা শরীফের মোকামে হাজির হলো এবং বা-আদব দাঁড়িয়ে গেলো।

মনে হলো, রাজকীয় উত্তাপ ও বাদশাহী প্রতাপ তাদের মনে কোন প্রভাব ফেলতে পারেনি। যেন এক ভিন্ন জগতের বাসিন্দা তারা, যেখানে রাজা নেই,

রাজ্য নেই, শাসক নেই, শাসন নেই। আছে শুধু তাদের চিন্তা ওকল্পনার নিজস্ব জাগত। আমার মনে হলো, এরা হয় কবি না হয় বিপ্লবী। তখন সেই গায়বী আওয়ায ভেসে এলো–

"তোমার ধারণা ভুল নয় মুসাফির! এরা ইসলামী জাহানের কবি ও বিপ্লবীদের সম্মিলিত জামাত। এদের মাঝে রয়েছেন জামালুদ্দীন আফগানী, আমীর সাঈদ হালীম, মাওলানা মুহাম্মদ আলী জাওহার ও শায়খ হাসানুল বান্নার মত মৃত্যু-ভয়হীন জীবন জয়ী বিপ্লবী। আর তাদেরই পাশে রয়েছেন তুর্কীর ইসলামী চেতনার কবি মুহাম্মদ আক্বিফ, প্রাচ্যের দার্শনিক কবি আল্লামা ইকবাল এবং আরো বহু কবি ও বিপ্লবী। এই কাফেলার বক্তব্য নিবেদনের জন্য আল্লামা ইকবাল মুখপাত্র হলেন। সবার পক্ষ হতে এভাবে তিনি তার বক্তব্য নিবেদন করলেন-

ইয়া রাসূলুল্লাহ! মনে বড় জ্বালা নিয়ে এবং দিলে অনেক জখম নিয়ে আমরা আজ এসেছি কাওমের নামে আমাদের নালিশ জানাতে। এরা তো এখনো টিকে আছে আপনার পরিচয় দিয়ে, আপনার দস্তরখানের নেয়ামত ভোগ করে এবং আপনার নবুয়তের বাগানের ফল ও ফুল নিয়ে। রহমতে আলম হয়ে যে শীতল ছায়া আপনি বিস্তার করে রেখেছেন সেই ছায়া ছাড়া তাদের কোন আশ্রয় নেই, ঠিকানা নেই। আপনার নামে, আপনার ডাকে তারা ধর্মের অনাচার এবং মানবের স্বেচ্ছাচার থেকে মুক্তি লাভ করেছে এবং গোলামীর জিঞ্জির ভেঙ্গে আযাদীর আলো-বাতাস গ্রহণ করেছে। আপনারই বরকতে আজ তারা দেশের পর দেশ স্বাধীন ভাবে শাসন করছে। কিন্তু দুর্ভাগা কাওম ও তাদের বদনাছীব শাসকরা সেই ভিত্তিমূলেই আঘাত হেনে চলেছে এবং সেই বুনিয়াদই ধ্বসিয়ে দিতে উঠে পড়ে লেগেছে যার উপর তাদের অস্তিত্ব নির্ভরশীল।

কাওমের নেতৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ যাদের হাতে তারা আজ বাদ-মতবাদ ও জাতীয়তাবাদের নামে তাওহীদবাদী এই উম্মাহকে শতধা বিভক্ত করার অপচেষ্টায় মেতে উঠেছে। জাহেলিয়াতের চিন্তা চেতনা আপনি দাফন করেছেন, জাহেলিয়াতের নাম-নিশানা আপনি মুছে ফেলেছেন, সেই মুর্দা গলীয আবার তারা তুলে আনতে চায়। উম্মাহকে আবার তারা নিয়ে যেতে চায় সেই অন্ধকার যুগে যে অন্ধকার থেকে শাশ্বত আলোর পথে আপনি তাদের পথ দেখিয়েছেন। চিন্তার দৈন্য ও নৈরাজ্য এবং চরিত্র ও নৈতিকতার

অবক্ষয়ে যে ইউরোপ আজ দিশেহারা তাদেরই অন্ধ গোলামীতে আজ তারা আত্মহারা।

এক কথায়, মক্কায় ও মদীনায় তেইশ বছরের মেহনতে তিলে তিলে আপনি যা গড়েছেন তারা আজ তা গুঁড়িয়ে দিতে চায়। আপনার মাধ্যমে যে আসমানী নেয়ামত তারা পেয়েছে তার না-শোকরির চূড়ান্ত করে তারা নিজেরাও চলেছে ধ্বংসের পথে, উম্মাহকেও নিয়ে চলেছে সেই ধ্বংসের শেষ প্রান্তে।

ইয়া রাসূলাল্লাহ! নবুয়তের আলো এবং আবু লাহাবের আগুন-এ দুয়ের সংঘাত আবার শুরু হয়েছে। কিন্তু আফসোস! আবু লাহাবের কাতারে আজ দেখি তাদেরই চেহারা যারা ইসলামের দাবীদার, যারা পেয়েছে আপনারই মুখের আরবী ভাষার উত্তরাধিকার। জাহেলিয়াতের যে রসম-রেওয়াজ এবং মূর্তি ও প্রতিমার যে আওয়াজ আপনি চিরতরে স্তব্ধ করেছেন তাই নিয়ে তারা আজ গর্ব করে। সুযোগ সন্ধানী সওদাগর যেমন শুধু নিতে জানে, দিতে জানে না-এরাও তেমনি আপনার নবুয়তের কল্যাণ ধারা থেকে লাভ করেছে ইজ্জত ও মর্যাদা এবং শক্তি ও ক্ষমতা, অথচ সেই ইজ্জত ও মর্যাদা তারা লুটিয়ে দেয় ইহুদী-নাছারাদের পদতলে আর উম্মাহকে আপনার সুন্নাহ থেকে দূরে হটিয়ে বলি দিতে চায় তাগুতি মতবাদ ও জাহেলি দর্শনের যুপকাষ্ঠে।

বাইতুল্লাহকে আপনি পাক করেছেন মূর্তি পূজার নাপাক থেকে, কিন্তু বিভিন্ন নামে, বিভিন্ন লেবাসে সেই 'বুতপুরুস্তি' আবার তারা চাপিয়ে দিয়েছে মুসলমানদের মন-মগজে। যে আরব জাহান হবে দ্বীনুল ইসলামের কেন্দ্র ও দুর্গ সেখানে আজ দেখা যায় সাধারণ বিদ্রোহের আলামত। অথচ তা দমন করতে দোররা হাতে এগিয়ে আসছে না কোন ওমর ফারুক। ধর্মত্যাগের ইরতিদাদ হয়ত নেই, কিন্তু চিন্তা ও বিশ্বাস এবং ভাব ও ভাবনার জগতে ইরতিদাদের যে সর্বগ্রাসী আগুন ছড়িয়ে পড়েছে তা নেভানোর মর্দানা হিম্মত নিয়ে ময়দানে আসছে না কোন সিদ্দীক আকবার।

ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার এবং আমার কাফেলার সবার অন্তরের অন্তঃস্থল হতে আকীদাত ও মুহাব্বাতের নাযরানা এবং দুরূদ ও সালামের তোহফা কবুল করুন।

হে আল্লাহর পেয়ারা রাসূল! আল্লাহকে সাক্ষী রেখে আজ বলে যাই, ইসলামের কেবলা ছেড়ে ইউপরোপের কেবলায় যারা সেজদা করে তাদের

সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই, আপনার বন্ধন যারা ছিন্ন করে তাদের সাথে আমাদের রক্তের বা চিন্তার কোন বন্ধন নেই। আপনার দ্বীন ও শরীয়তের প্রতি যারা বিদ্রোহী তাদের বিরুদ্ধে আমাদের সারা জীবনের জিহাদ। আমাদের ওফাদারী ও আনুগত্য আপনারই জন্য ছিলো, আপনারই জন্য থাকবে। যতদিন বেঁচে থাকবো ইনশাআল্লাহ কুরআন-সুন্নাহর রজ্জু আঁকড়ে ধরে থাকবো, এই আমাদের আখেরি কালাম ইয়া রাসূলাল্লাহ!' ঈমান ও বিশ্বাসের উদ্দীপনায় এবং আবেগ ও জাযবার উষ্ণতায় পরিপূর্ণ এই শপথবাক্য উচ্চারিত হতে না হতে মসজিদে নববীর সব মিনার থেকে ভেসে এলো আযানের সুমধুর ধ্বনি-আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার।

ইতিহাসের তন্ময়তায় এবং সুদূর অতীতের স্বপ্ন মায়ায় রচিত কল্পনার কোমল সুন্দর জাল হঠাৎ ছিন্ন হয়ে গেলো। আল্লাহর চির বড়ত্বের শাশ্বত ঘোষণায় আমি বাস্তব জগতে ফিপরে এলাম। যেখান থেকে যাত্রা করেছিলাম সেখানে ফিরে এলাম। রিয়াযুল জান্নায় তখন কেউ রুকুতে কেউ সিজদায়। কেউ যিকর-তিলাওয়াতে, কেউ বা নিমগ্ন দোআ ও কান্নায়।

ইসলামী জাহানের বিভিন্ন অঞ্চলের বিভিন্ন ভাষা ও বর্ণের মানুষ দলে দলে জামাতে জামাতে এগিয়ে যায় রাওযা শরীফে এবং তোহফায়ে সালাম ও দুরূদ পেশ করে ভক্তিবিগলিত চিত্তে। মুখের ভাষা তাদের ভিন্ন, কিন্তু অশ্রুর ভাষা অভিন্ন। সে এক অপূর্ব দৃশ্য। তাহলে এতক্ষণ আমি কি এ বাস্তবের মাঝেই কল্পনার ছবি দেখছিলাম, নাকি আত্মার জগত আসলেই জেগে উঠেছিলো! এবং কাফেলার আনাগোনা হয়েছিলো!

তরজমা ঃ আবু তাহের মেসবাহ

মানুষই কি আজ মানুষের বড় শত্রু?

আজ মানুষ মানুষের চোখে কাঁটার ন্যায় বিঁধছে। মানুষ হয়ে গেছে মানুষের চক্ষুশুল। আজ যারা মানুষ মারছে, মানুষকে মারার জন্য হাত তুলছে, খুন করছে তাদেরকে জিজ্ঞেস করছি, বলুন তো আপনি আপনার জীবনে কতটি বিচ্ছু মেরেছেন? আমাকে লিখে দিন। সম্ভবত একটি বিচ্ছুও মারেননি। একটি সাপও মারেননি। সারাজীবনে একটি বাঘও সম্ভবত আপনি শিকার করেননি। তাহলে মারার জন্য, খুন করার জন্য কেবল মানুষই পেলেন? আল্লাহর আযাব ও গজবের এতটুকু ভয় কি আপনার নেই? আল্লাহর শাস্তির ভয়ে আপনার বুক কি এতটুকু কাঁপে না? মানুষ কি বিচ্ছুর চেয়েও খারাপ হয়ে গেছে? সে কি সাপের থেকেও খারাপ?

আচ্ছা, জীবনে কতটা ইঁদুর মেরেছেন- না হয় সেটাই বলুন। ইঁদুর মানুষের বড্ড ক্ষতি করে। কতটি ইঁদুর মেরেছেন আপনি? বড় বীর পুরুষ হয়ে গেছেন। আজ আপনার হাত মানুষের খুনে রঞ্জিত, মানুষের রক্তে রক্তাক্ত। তারা কয়টা ক্ষতিকর জীব মেরেছে? একটাও নয়। মানুষ মারার জন্য বাঘ রয়েছে আর বাঘ মারার জন্য বিড়াল! লজ্জা হওয়া উচিত! কারো বাগানে গিয়ে একটা ফুল ছিঁড়ে দেখুন। টের পাবেন কত ধানে কত চাল। আপনার অবস্থা কি হয় তখন বুঝবেন।

বাগানের মালিক একটা ফুল ছেঁড়া, গোলাপের একটা চারা উপড়ে ফেলা বরদাশত করেন না, আর কুল-মাখলুকের মালিক আল্লাহ যুল-জালাল কি পছন্দ করবেন তিনি বানাবেন আর আপনি তা ভাঙবেন-চুরবেন? কুমোরের বাড়ীতে একদিন গিয়ে দেখুন, তার হাতে গড়া মাটির দু'চারটি হাঁড়ি-পাতিল ভাঙুন, এরপর নিরাপদে ফিরতে পারেন কি না। আপনার ঘাড়ের ওপর মাথাটা ঠিক থাকে কিনা। সামান্য কুমোরও আপনাকে দু'চার ঘাটের পানি না খাইয়ে ছেড়ে দেবে না। কুমোপরের সামান্য হাঁড়ি ভাঙতে পারেন না, তার পাতিল ভাঙার মুপরোদ নেই– সেখানে আল্লাহ যুল-জালালের তৈরী এই ফুল, আল্লাহর হাতে গড়া এই ফুলের মালা, আল্লাহর কুদরতী হাতে নির্মিত এই শীশ মহল, আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের গড়া এই তাজমহল যেই তাজমহলের বিনিময়ে শত-সহস্র তাজমহল উৎসর্গ করা যায়, আজ নির্দয় হাতে নির্মমভাবে আপনি ভেঙে গুঁড়িয়ে চলেছেন, ছিঁড়ে চলেছেন।

তাজমহল কে বানিয়েছে? মানুষ বানিয়েছে। আর মানুষ বানিয়েছেন কে? আল্লাহ বানিয়েছেন। একজন মানুষের সামনে তাজমহলের মূল্য কতটুকু? আর আল্লাহ যেই তাজমহল বানিয়েছেন আপনি সেই তাজমহল ভাঙছেন। আগ্রার তাজমহলের গায়ে হাত দিয়ে দেখুন তো ঘাড়ের ওপর আপনার মাথাটা ঠিক থকে কি না। আপনাদের আশপাশে প্রাচীন আমলের ঐতিহাসিক যুগের দালান-কোঠা, স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে থেকে থাকবে যা একটু একটু করে খসে পড়ছে। কোথাওবা রাষ্ট্রীয় প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর কর্তৃক তা সংরক্ষিত হয়ে আসছে। আপনি এর গায়ে হাত তুলে দেখুন না কি হয়। কেবল আল্লাহর তৈরী মানুষই এতটা সস্তা। কোন মূল্য নেই তার! যখন ইচ্ছা, যেভাবে ইচ্ছা মারবেন, খুন করবেন।

পরিষ্কারভাবে শুনুন, ফেতনা-ফাসাদ করে, অশান্তি-অরাজকতা ও নৈরাজ্য সৃষ্টি করে, মানুষ মেরে, খুন করে, ঘুষ খেয়ে, কাজে ফাঁকি দিয়ে দেশ বাঁচানো যাবে না- তা সে দেশের পৃষ্ঠপোষক আমেরিকা হোক, রাশিয়া হোক আর অন্য কোন দেশই হোক। আমি আবারও বলছি, সাফ সাফ বলছি, নিজের ঘর যদি নিজের হাতেই আপনি ধসিয়ে দেন, তাহলে অন্য কেউ তা বাঁচাতে পারবে না। যার ঘর তার নিজের হাতেরই তৈরী। অতএব, নিজের ঘর নিজেই সামলান।

তরজমা ঃ আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী

অধ্যায়–১৯

খোলাফায়ে কেরাম

হযরত মাওলানা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী (রহ.)-এর নিকট সারা বিশ্বের অসংখ্য আলেম, বুদ্ধিজীবী ও বিশিষ্ট ব্যক্তি বায়আত হয়েছিলেন এবং ইসলাহে বাতেনের জন্য তাঁর সবক ও পরামর্শ মেনে চলতেন। তাঁদের মধ্যে অনেককেই তিনি ইজাযত ও খেলাফত দান করেছিলেন। কিন্তু সাধারণভাবে তিনি এ বিষয়ে নীরবতা অবলম্বন করতেন। ফলে তাঁর আধ্যাত্মিক তরবিয়তের অনেক কিছুই গোপন থাকত। তাঁর খলীফাগণের অনেকেও নিজেদের অবস্থা গোপন রাখতেন এবং হযরতের নিকট থেকে ইজাযত প্রাপ্তির কথা প্রকাশ পেতে দিতেন না। হযরতের স্নেহাস্পদ মাওলানা মাহমুদ হাসান নদভীর মাধ্যমে অবগত হওয়া কয়েকজন বিশিষ্ট খলীফাগণের নাম নিম্নে উল্লেখ করা হল–

১। হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ রাবে' হাসানী নদভী, বর্তমান নাযেম, দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামা, লাখনৌ, ভারত।

২। হযরত মাওলানা আবদুল করীম পারেখ, নাগপুর, ভারত।

৩। শায়খ আবদুল ওয়াহ্হাব যায়েদ হালাবী নদভী, কোরিয়া, তাঁর হাতে প্রচুর সংখ্যক কৃষ্ণাঙ্গ মুসলমান হয়েছে।

৪। শায়খ আবদুল করীম সুলায়মান, মিসর, যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিছ।

৫। মাওলানা আবদুর রশীদ নু'মানী (রহ.), পাকিস্তান, বিশিষ্ট মুহাদ্দিছ।

৬। হযরত মাওলানা আলী আদম নদভী, দক্ষিণ আফ্রিকা।

৭। হযরত মাওলানা সাঈদ বানু দক্ষিণ আফ্রিকা।

৮। ডক্টর ইবাদুর রহমান, প্রফেসর উম্মুল কুরা ইউনিভার্সিটি, মক্কা।

৯। হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ ওলীনূর, জেদ্দা।

১০। ডক্টর সাইয়েদ ফখরুদ্দীন আওরঙ্গাবাদ, ভারত।

১১। হযরত মাওলানা আবু সাঈদ ওমর আলী, পরিচালক, ইসলামী বিশ্বকোষ প্রকল্প, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ।

১২। হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ সালমান, মুহতামিম, মাদরাসা দারুর রাশাদ, মিরপুর, ঢাকা, বাংলাদেশ।

১৩। হযরত মাওলানা জুলফিকার নদভী, শিক্ষক, দারুল মাআরিফ চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ।

১৪। হযরত মাওলানা সাইয়েদ জহুরুল হাসান নদভী, বাদায়ুন, ভারত।

১৫। হযরত মাওলানা কালীম সিদ্দীকী ফুলতী, মুজাফ্ফর নগর, ভারত।

১৬। হযরত মাওলানা ওমর লাদাখী, কাশ্মীর।

১৭। হযরত মাওলানা আবদুল্লাহ মুগীছী, মীরাঠ, ভারত।

১৮। হযরত মাওলানা মুহিউদ্দীন, বিহার, ভারত।

১৯। হযরত মাওলানা মুফতী আবদুল আযীয রায়পুরী (রহ.), ভারত।

২০। হযরত মাওলানা আবদুল মান্নান লাহোরী (রহ.), পাকিস্তান।

২১। হযরত মাওলানা ইউনুস পালনপুরী, ভারত।

২২। হযরত মাওলানা আহমাদ লাট সাহেব নদভী, ভারত।

২৩। হযরত মাওলানা আব্দুল্লাহ হাসানী নদভী, ভারত।

২৪। হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ সুলতান যওক নদভী, পরিচালক, জামেয়া দারুল মা'আরিফ আল-ইসলামিয়া, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ।

==ooo==

অধ্যায়–২০
পরিশিষ্ট
মুসলিম ভারতের অভিভাবক
মাওলানা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী (রহ.)

মাওলানা আবু তাহের মেসবাহ

ইসলামী উম্মাহর ইতিহাসের শুরু থেকে আজ পর্যন্ত আল্লাহর কুদরতি নেযাম এরকম চলে এসেছে যে, যুগে যুগে উম্মাহর প্রয়োজনে উম্মাহর মাঝে আল্লাহ বহু যুগ সংস্কারক মহান ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব ঘটিয়েছেন, যারা তাদের বহুমুখী জ্ঞান ও প্রজ্ঞা, গুণ ও যোগ্যতা, ইলম ও আমল, আখলাখ ও চরিত্র এবং ইখলাছ ও তাকওয়া দ্বারা ইসলাম ও ইসলামী উম্মাহর সেবায় যুগান্তকারী অবদান রেখেছেন, বাতিলের তুফান থেকে ইসলাম প্রদীপকে রক্ষা করেছেন এবং যুগের দুর্যোগ থেকে ইসলামী উম্মাহর কাফেলাকে হেফাযত করেছেন, এমনকি সমগ্র বিশ্ব-মানবতার সামনে হক ও সত্যের পয়গাম তুলে ধরেছেন। তাদের সংস্কার সাধনা ও তাজদীদী মেহনত ইসলামকে নতুন শক্তি এবং ইসলামী উম্মাহকে নবজীবন দান করেছেন। সর্বোপরি মানবজাতিকে নুতন ভাবে সত্যের আলোর সন্ধান দিয়েছে।

হযরত উমর বিন আব্দুল আজীজ (রহ.) থেকে শুরু করে শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (রহ.) পর্যন্ত কিংবা আরো পরে হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহ.) এবং দা'ঈ ইলাল্লাহ হযরত মাওলানা ইলিয়াস (রহ.) পর্যন্ত যে সুদীর্ঘ স্বর্ণ-শৃঙ্খল মুসলিম উম্মাহকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে জুড়ে রেখেছেন এবং কুরআন ও সুন্নাহ সিরাতুল মুস্তাকীমের উপর অবিচল রেখেছে তা আল্লাহর সেই গায়েবী ও কুদরতী নেযামেরই সুফল। পূর্ববর্তী কোন উম্মতের ইতিহাসে এর ন্যূনতম উদাহরণও খুঁজে পাওয়া যায় না। এজন্যই পূর্ববর্তী আসমানী কিতাব ও মাযহাবগুলো একটা নির্ধারিত সময়কাল অতিক্রম করার পর নিজেদের পূর্ণ আসমানী অবয়ব বজায় রাখতে পারেনি। কিন্তু ইসলাম যেহেতু কেয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী বিশ্ব-মানবতার শাশ্বত ধর্ম সেহেতু ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর ক্ষেত্রে এই বিশেষ আসমানী নেযাম কার্যকর হয়েছে। বাতিল ও আহলে বাতিলের মোকাবেলায় হক ও আহলে হকের অস্তিত্বের সংগ্রামে যখনই

প্রয়োজন হয়েছে তখনই আল্লাহর পক্ষ হতে একজন মহান যুগ সংস্কারকের আবির্ভাব হয়েছে।

যুগ সংস্কারক উলামায়ে ইসলামের সেই মোবারক কাফেলায় সর্বশেষ ব্যক্তিত্ব হলেন হযরত মাওলানা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী (রহ.) ।

'মানব-দুর্ভিক্ষের' এবং বিংশ শতাব্দীতে তিনি ছিলেন এমনই এক আদর্শ ব্যক্তিত্ব, আল্লাহ যাকে দান করেছিলেন অসংখ্য গুণ ও যোগ্যতা এবং বহুমূখী প্রতিভা ও প্রজ্ঞা।

তাঁর সমকালে পৃথিবীতে স্মরণীয়-বরণীয় বহু ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্বের সমাবেশ ছিল এবং দ্বীনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাদের বিভিন্ন যোগ্যতা ও বৈশিষ্ট্য এবং ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর সেবায় তাদেরকে কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করার মত বহু অবদানও ছিল। কিন্তু 'এতিম ও মাহরুম' উম্মতের জন্য আমাদের প্রাণপ্রিয় সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী (রহ.) ছিলেন আল্লাহর অতুলনীয় দান। কেননা জ্ঞান ও প্রজ্ঞা, গুণ ও যোগ্যতা, ইসলাম ও আমল এবং ইখলাছ ও তাকওয়ার এমন একত্র সমাবেশ সমকালীন আর কোন ব্যক্তির মাঝে দেখা যায় না।

আমাদের মতো বে-ইলম ও বে-আমল মানুষ এসব বিষয় কী বুঝব! তবে শেষ যুগের আকাবিরীনে উম্মত এ বিষয়ে যাদের অর্ন্তদৃষ্টি ও দিব্যজ্ঞান ছিল তাঁরাই একবাক্যে তাঁকে এই দুর্লভ সম্মান ও মর্যাদা দান করেছেন। অনেক ভেবে, অনেক মেপে একবারে নিক্তির ওজনে যিনি মন্তব্য করতেন, হাকীমুল উম্মত ছিল যার যথাযোগ্য উপাধী, তিনি পর্যন্ত তাঁতে সম্বোধন করেছিলেন 'মাজমাউল কামালাত' (সর্বগুণের আধার) বলে, যখন হযরত আলী মিয়াঁর বয়স ছিল বিশ বছরেরও কম সেই সময়ে।

মাওলানা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী (রহ.) এর শতাব্দী ছুঁই ছুঁই যে বর্ণাঢ্য জীবন এবং জীবনব্যাপী যে সুবিপুল ও বহুমুখী কর্ম-অবদান, সর্বোপরি তাঁর চিত্ত ও চরিত্রের যে বিশাল ব্যাপ্তি তার শুধু শিরোনামও গুলো একটি মাত্র প্রবন্ধের কলেবপরে পেশ করা সম্ভব নয়। তাই আলোচ্য নিবন্ধে আমরা শুধু ভারতীয় মুসলমানদের ঈমান-আক্বীদা ও জাতীয় স্বকীয়তা রক্ষা এবং তাদের জান-মাল ও ইজ্জত-আব্রু হেফাযতের ক্ষেত্রে তিনি যে, অভিভাবকোচিত ভূমিকা ও অবদান রেখেছেন সে সম্পর্কে কিঞ্চিৎ আলোকপাত করব। অবশ্য একথা সত্য যে, একটি মুসলিম দেশের নিরাপদ

সীমান্তের বেষ্টনীতে বাসকারী মুসলমানদের পক্ষে সত্তর কোটি হিন্দু জনগোষ্ঠীর মুখগহ্বরে বাসকারী পঁচিশ কোটি মুসলমানের প্রকৃত অবস্থা অনুধাবন করা কিছুতেই সম্ভব নয়। সুতরাং সেই অসহায় জনগোষ্ঠীর অভিভাবকত্বের দায়িত্ব পালন করতে কী অপরিসীম ধৈর্য, প্রজ্ঞা, অবিচলতা, সাহসিকতা ও আল্লাহর প্রতি নির্ভরতার প্রয়োজন তা অনুমান করাও অসম্ভব।

হযরত আলী নদভী (রহ.) তাঁর আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞান ও প্রজ্ঞা দ্বারা জীবনের প্রথমেই এ সত্য উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, ভারতের মাটিতে মুসলমানদের জাতীয় অস্তিত্ব রক্ষা এবং জান-মাল ও ইজ্জত-আব্রু হেফাজতের একমাত্র উপায় হলো প্রতিবেশী জাতিকে মানবতার সহমর্মিতার উপর উদ্বুদ্ধ করা এবং ইসলামের উত্তম চরিত্র ও নৈতিকতা দ্বারা তাদের উপর নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত করা। প্রতিবেশী বিশাল জনগোষ্ঠীর সাথে রাজনৈতিক ও দৈহিক শক্তি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হওয়াকে মুসলমানদের জন্য তিনি আত্মঘাতী পদক্ষেপ মনে করতেন। কেননা বিদ্যমান কঠিন বাস্তবতার মুখে 'লড়কে লেঙ্গে' জাতীয় অদূরদর্শী শ্লোগান মুসলিম মিল্লাত 'মুসলিম রক্তের বন্যায়' শুধু ভাসিয়েই নিয়ে যাবে, ফায়দা কিছুই হবে না।

ভারতীয় মুসলমানদের উদ্দেশ্যে হযরত আলী নদভী (রহ.)-এর উপদেশ ছিল এই যে, আমাদের সবচেয়ে বড় দুর্বলতা হলো, প্রতিবেশী অমুসলিম জাতির সামনে আমরা আদর্শ ইসলামী সমাজের একটা ক্ষুদ্রতম নমুনাও তুলে ধরতে পারিনি, যাতে তারা বুঝতে পারে যে, তাওহীদ ও রিসালাতের ঈমান এবং বিচার ও পরকালের বিশ্বাস এ ধরণের পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র মানবসমাজ প্রতিষ্ঠা করতে পারে। সন্দেহ নেই যে, হিন্দু-মুসলিম সম্মিলিত জনতার সামনে ধর্ম নিরপেক্ষ মানবতাবাদের বক্তব্য তুলে ধরা খুবই জটিল ও ঝুঁকিপূর্ণ বিষয়। কিন্তু হযরত আলী নদভী (রহ.) এটাকে ভারতের পঁচিশ কোটি মুসলমানদের জাতীয় অস্তিত্বের জন্য অপরিহার্য মনে করতেন। তাই তিনি ১৯৫১ সালে লখনৌর আমীনুদ্দৌলা পার্কে এক হিন্দু-মুসলিম জনসভার মাধ্যমে তাঁর আন্দোলনের সূচনা করেন। এটা ছিল স্মরণাতীত কালের বৃহত্তম হিন্দু-মুসলিম জনসভা। পিন-পতন নিরবতার মাঝে জনতা সেদিন তাঁর আবেগ-উদ্বেলিত ভাষার দরদপূর্ণ বক্তব্য শ্রবণ করেছিল। এরপর তিনি ভারতব্যাপী বিভিন্ন জনসভা ও সুধী সমাবেশে তাঁর বক্তব্য পেশ করে চললেন। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত হযরত মাওলানা অক্লান্তভাবে 'পায়ামে ইনসানিয়াত' (মানবতার ডাক) নামে তাঁর আন্দোলন অব্যাহত রেখেছিলেন

এবং মুসলিম রাজনীতিকদের অদুরদর্শীতা এবং উগ্রতাবাদী হিন্দু সংগঠনগুলোর অপতৎপরতাসহ বিভিন্ন প্রতিকূলতা সত্ত্বেও তাঁর মানবতাবাদী আবেদন হিন্দুদের বিবেকবান শ্রেণীর মাঝে ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছে, ইসলামকে জানার ও বুঝার আগ্রহ সৃষ্টি করেছে এবং মুসলমানদের সমস্যার প্রতি সহানুভূতিশীল করে তুলেছে। সবাই আজ স্বীকার করছেন যে, সাম্প্রদায়িক তুফানের মোকাবেলায় হিন্দু সম্প্রদায়ের এ জাগ্রত বিবেকবান শ্রেণী আজ মুসলমানদের জন্য বিরাট সহায়ক শক্তিরূপে কাজ করছে।

ভারতীয় মুসলমানদের প্রতি হযরত আলী নদভী (রহ.)-এর দ্বিতীয় অবদান হলো মুসলিম শিশু-কিশোরদের দ্বীনী শিক্ষার আন্দোলন; যার প্রেক্ষাপট এই যে, দেশ বিভাগের পর সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় হিন্দু সংস্কৃতি পুণর্জাগরণের কাজ পুরোদমে শুরু হয়ে গিয়েছিল। এমনকি 'ধর্ম নিরপেক্ষ' শিক্ষা ব্যবস্থাও হয়ে উঠেছিল হিন্দু সংস্কৃতি ও প্রতিমাবাদের লালন ও প্রচার ক্ষেত্র। এ সবের মূল লক্ষ্য ছিল ইসলামী আক্বীদা-বিশ্বাস ও শিক্ষা-সংস্কৃতির শেষ চিহ্নটুকু মুসলিম শিক্ষার্থীদের মন-মগজ থেকে মুছে ফেলা, যাতে সময়ের স্রোতধারায় মুসলিম সমাজ হিন্দু সংস্কৃতিতে বিলীন হয়ে যায়। এমতাবস্থায় মুসলমানদের সামনে দুটি মাত্র পথ খোলা ছিল। হয় ঈমান-আক্বীদা রক্ষার স্বার্থে শিক্ষা বর্জন করা কিংবা উচ্চ শিক্ষা ও জাগতিক উন্নতির স্বার্থে মুসলিম সন্তানদেরকে হিন্দু সংস্কৃতির হাওয়ালা করে দেয়া। দুটো পথই ছিল আত্মঘাতী। আর স্বভাবতই সাধারণ মুসলমানগণ ইচ্ছায়, অনিচ্ছায় দ্বিতীয় পথই বেছে নিয়েছিল এবং এর ভয়াবহ পরিণামও সবার সামনে ফুটে উঠেছিল।

এজন্য সচেতন মুসলমানদের উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার কমতি ছিল না। কিন্তু সর্বগ্রাসী সয়লাবের মোকাবেলায় আত্মরক্ষার কোন উপায় ও কর্মসূচী তাদের সামনে ছিল না। ঠিক এমন সময় 'বস্তি' জেলায় কাযী আদিল আব্বাসী মুষ্টি চাঁদার ভিত্তিতে মসজিদকেন্দ্রিক সকাল-সন্ধ্যা দ্বীনী শিক্ষার একটা সীমিত উদ্যোগ গ্রহণ করলেন যা বেশ ফলপ্রসূ প্রমাণিত হলো। হযরত আলী মিঁয়া যেন তাঁর ক্ষত-বিক্ষত হৃদয়ের 'উপশম' পেয়ে গেলেন। তিনি জনাব আব্বাসীকে উদ্বুদ্ধ করে তার সীমিত অভিজ্ঞতাকে প্রথমে প্রদেশ ব্যাপী অতঃপর ভারতব্যাপী আন্দোলনের রূপদান করলেন।

কাযী সাহেবের আহবানে এবং হযরত আলী নদভী (রহ.) এর সভাপতিত্বে ১৯৫৯ সালের ৩০শে ডিসেম্বর থেকে তিনদিন ব্যাপী এক

প্রাদেশিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলো। সভাপতির অভিভাষণটি তিনি অতি ব্যস্ততার কারণে সফরের সময় ট্রেনে বসেই তৈরী করেছিলেন, যা পরবর্তীতে মুসলিম শিশুদের দ্বীনী শিক্ষার আন্দোলনের ক্ষেত্রে দিক নির্দেশক ও মাইলফলক প্রমাণিত হয়েছে। সম্মেলনে দ্বীনী তা'লীমী কাউন্সিল নামে একটি সংস্থার ভিত্তি স্থাপন করা হয় এবং সর্বসম্মতিক্রমে তার সভাপতি মনোনীত হন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি এ গুরুদায়িত্ব পালন করেছেন এবং মূলতঃ হযরত মাওলানার মহান ব্যক্তিত্বের কল্যাণেই দ্বীনি তা'লীমী কাউন্সিল তার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের পথে অনেক দূর অগ্রসর হতে পেরেছে।

ভারতে মুসলমানদের স্বতন্ত্র জাতিসত্ত্বার উপর যতগুলো আঘাত এসেছে তার মধ্যে সর্বধর্মের জন্য অভিন্ন পারিবারিক আইন বাস্তবায়নের দাবীই ছিল সবচেয়ে মারাত্মক। কেননা এর অর্থ ছিল মুসলমানদের নিজস্ব উত্তরাধিকার আইন এবং বিবাহ-তালাক ও অন্যান্য শরীয়তী ব্যবস্থার বিলুপ্তি।

যে সকল সর্বজন শ্রদ্ধেয় মুসলিম ব্যক্তিত্ব এই নতুন বিপদ সংকেত সর্বপ্রথম অনুভব করতে পেরেছিলেন, তাদের মাঝে বিহার-উড়িষ্যার আমীরে শরীয়ত মাওলানা সৈয়দ মিন্নাতুল্লাহ রাহমানী ছিলেন অগ্রণী। তাঁরই সক্রিয় উদ্যোগে ১৯৭২ সালে মুসলিম পার্সোনাল ল' বোর্ড গঠিত হয় এবং হযরত মাওলানা ক্বারী তৈয়ব সাহেব (রহ.) বোর্ডের প্রথম সভাপতি মনোনীত হন। তাঁর ওফাতের পর সর্বসম্মতিক্রমে হযরত মাওলানা আলী নদভী (রহ.) সভাপতি মনোনীত হন। বলাবাহুল্য যে, মুসলিম পার্সোনাল ল' বোর্ড গঠনের ক্ষেত্রেও হযরত মাওলানার অবদান ছিল অবিস্মরণীয়। আলীগড়ে বোর্ডের দ্বিতীয় সম্মেলন তিনিই উদ্বোধন করেছিলেন এবং তাঁর উদ্বোধনী অভিভাষণটি সরকার ও অমুসলিম বুদ্ধিজীবীদের নতুন চিন্তার খোরাক যুগিয়েছিল। হযরত মাওলানা তাঁর আত্মজীবনীতে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। ১৯৮৩ থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সুদীর্ঘ সতের বছর তিনি মুসলিম পার্সোনাল ল' বোর্ডের নেতৃত্ব ও অভিভাবকত্বের দায়িত্ব পালন করেছেন। এ সময় ভারতের সাম্প্রদায়িক সংগঠনগুলো ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে নিত্য-নতুন ফেতনার ঝড় তুলেছে এমনকি স্বয়ং হযরত আলী মিঁয়ার বাসভবনে এবং তাঁর প্রিয় প্রতিষ্ঠান নদওয়াতুল উলামায় বারবার হামলা হয়েছে, গুলি বর্ষণ হয়েছে। কিন্তু মুসলমানদের দ্বীন-ঈমান, জান-মাল ও ইজ্জত-আব্রু রক্ষার জিহাদ থেকে তিনি বিন্দুমাত্র পিছপা হননি। একদিকে তিনি মুসলমানদের রাজনীতির খেলোয়াড়দের সস্তা রাজনীতির উত্তেজনা থেকে দূরে রাখার চেষ্টা

করেছেন, অন্যদিকে ভারত সরকারকে বিবেক-বুদ্ধি এবং নীতি ও নৈতিকতার ডাকে সাড়া দিতে উদ্বুদ্ধ করেছেন এবং প্রয়োজনে কঠোর হুঁশিয়ারীও উচ্চারণ করেছেন।

সরকারী বিশ্ব-বিদ্যালয়গুলোতে যখন হিন্দু-মুসলিম ছাত্রদের জন্য হিন্দুদের বিদ্যাদেবী স্বরসতীর বন্দনা এবং প্রতিমা পুঁজার ধ্যান-ধারণাপূর্ণ জাতীয় সংগীত বাধ্যতামূলক ঘোষণা করা হলো তখন এক পর্যায়ে তিনি এই মর্মে দ্ব্যর্থহীন হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করলেন যে, সরকার যদি তার অন্যায় আদেশ প্রত্যাহার না করে তাহলে মুসলমানদেরকে আমি আহ্বান জানাব যেন তারা সরকারী বিদ্যালয় বর্জন করে তাদের সন্তানদের সেখান থেকে তুলে নেয়। কেননা প্রয়োজনে আমরা দেশদ্রোহী হতে পারি। কিন্তু জীবনের বিনিময়েও ধর্মদ্রোহী হতে রাজী নই। এ ধমকে সরকারের চৈতন্যোদয় হলো এবং স্বরসতী-বন্দনা আইন প্রত্যাহার করে নিল।

শাহবানু মামলায় ভারতীয় সুপ্রীম কোর্ট মুসলিম পারিবারিক আইনের বিরুদ্ধে যে রায় ঘোষণা করেছিল তাতে সমগ্র ভারতের মুসলিম সমাজ বিক্ষোভ তরঙ্গে দুলে উঠেছিল। এ ক্ষেত্রেও হযরত আলী নদভী (রহ.) অন্যান্য সাধারণ প্রজ্ঞাপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। একদিকে তিনি বিভিন্ন রোগ ও বার্ধক্যজনিত দুর্বলতা সত্ত্বেও সারা ভারত সফর করে মুসলমানদেরকে সচেতন ও সংযত করেছেন এবং নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের পথে পরিচালিত করেছেন। অন্যদিকে মুসলিম পার্সোনাল ল' বোর্ডের সভাপতি হিসাবে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শ্রী রাজীব গান্ধীর সাথে সাক্ষাৎ করে হিকমত ও প্রজ্ঞার সাথে বিষয়টির ধর্মীয় দিক থেকে তাকে বুঝিয়েছেন এবং শরীয়তের বিষয়ে আদালতী হস্তক্ষেপের পরিণতি সম্পর্কে সর্তক করেছেন। দীর্ঘ আলাপ-আলোচনার পর রাজীব গান্ধী নীতিগতভাবে বিষয়টি মেনে নিয়েছিলেন এবং পার্লামেন্টের অধিবেশনে মুসলিম পারিবারিক আইনের বিরুদ্ধে হস্তক্ষেপে অবৈধতাসম্বলিত বিল মঞ্জুর করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কিন্তু শেষ মুহূর্তে প্রধানমন্ত্রী শ্রী রাজীব গান্ধীকে পরামর্শ দেয়া হলো যে, বিভিন্ন মুসলিম দেশের পারিবারিক আইন সম্পর্কে খোঁজ-খবর নেয়া হোক। সেখানে যদি পারিবারিক আইনে সংশোধন আনা হয়ে থাকে তাহলে ধর্ম নিরপেক্ষ ভারতে তা করতে দোষ কোথায়? বস্তুতঃ এটা ছিল হিন্দুস্তানের মুসলমানদের ধর্মীয় স্বার্থের বিরুদ্ধে অতি সূক্ষ্ম ও কূটচাল। এর উদ্দেশ্য ছি া একদিকে সময় ক্ষেপণের মাধ্যমে মুসলমানদের বর্তমান উত্তাপ প্রশমিত

করা। অন্যদিকে 'মুসলিম' দেশের উদাহরণ দ্বারা মুসলিম নেতৃবৃন্দের অবস্থান দূর্বল করা।

কুচক্রীদের মতলব বুঝতে পেরে হযরত আলী নদভী (রহ.) তৎক্ষণাৎ খুব সংক্ষেপে অথচ এমন জোরালো বক্তব্য রাখলেন যে, ভারতীয় মুসলিম মিল্লাত শ্রদ্ধার সাথে চিরদিন তা স্মরণ রাখবে। হযরত আলী নদভী (রহ.) প্রথমে নেহেরু পরিবারের সুদীর্ঘ নেতৃত্ব ও ঐতিহ্যের কথা তুলে ধরে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীকে নৈতিক ও মনস্তাত্ত্বিকভাবে নমনীয় করার চেষ্টা করলেন। এরপর তিনি তাঁর সারা জীবনের স্বভাব বিনয় সত্ত্বেও সুস্পষ্ট ভাষায় বললেন- যতদূর মুসলমানদের সাথে সম্পর্কিত বিষয়- আমি পূর্ণ দায়িত্বের সাথে বলতে পারি যে, দ্বীনী ও ইসলামী দিক থেকে হিন্দুস্তান পৃথিবীর কোন মুসলিম দেশ থেকে পিছনে নয়। বিশ্ব-মুসলিম উম্মাহর মাঝে তার আলাদা ও নিজস্ব মর্যাদাপূর্ণ অবস্থান রয়েছে। আমার বলা উচিত নয়, কিন্তু পরিস্থিতির কারণে বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, রাবেতা আলমে ইসলামী মক্কা-এর প্রতিষ্ঠিত 'আল মাজমাউল ফিকহী' হচ্ছে মুসলিম বিশ্বে ইসলামী শরীয়ত ও আইন বিশেষজ্ঞদের সর্বোচ্চ একাডেমী। হিন্দুস্তান থেকে আমি তার একমাত্র সদস্য। অনেকবার এমন হয়েছে যে, সকল সদস্য এক রকম মত পেশ করেছেন আর আমি ভিন্ন মত পেশ করেছি এবং সিদ্ধান্ত আমার মতানুযায়ী হয়েছে। বলাবাহুল্য যে, প্রধানমন্ত্রীর জন্য এটা বেশ চমকপ্রদ তথ্য ছিলো যে, ইসলামী বিশ্বে এমন বিরল মর্যাদার অধিকারী আলেমে দ্বীন হচ্ছেন ভারতভূমির সন্তান। সুতরাং তার উপস্থিতিতে অন্য কোন দেশের দ্বারস্থ হওয়ার অর্থতো স্বজ্ঞানে নিজের দেশের অপমান করা। হযরত মাওলানা এবার তাঁর স্বভাব বিনয়ের তাগাদায় নিজের নাম উহ্য রেখে রেখে গম্ভীর আওয়াজে বললেন-

রাজীব জী! এখানে এই মজলিসেই এমন আলেম রয়েছেন, মিশরের আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ে তার নাম উচ্চারিত হলে শ্রদ্ধায় সবার মাথা নত হয়ে আসে। শেষ মন্তব্য যেন যাদুর মতই কাজ করলো। প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী এরপর কোন মুসলিম দেশের মতামত গ্রহণের কথা মুখে আনলেন না বরং বিনা বাক্য ব্যয়ে পার্লামেন্টে বিল মঞ্জুরীর ব্যবস্থা করলেন।

বস্তুতঃ এটা ছিল ভারতীয় পার্লামেন্টে সংখ্যালঘু সমস্যার ইতিহাসে হযরত আলী নদভীর অনন্য সাধারণ বিজয়, অথচ তিনি পার্লামেন্টের সদস্য ছিলেন না।

ভারতীয় মুসলমানদের জাতিসত্তার বিষয়টি তাঁর চিন্তা- চেতনাকে কতটা আচ্ছন্ন করে রেখেছিল তা বোঝার জন্য নীচের ঘটনাই যথেষ্ট।

পাকিস্থানের শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হক হযরত মাওলানাকে গভীর শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখতেন। একবার এক সাক্ষাতে শহীদ প্রেসিডেন্ট অতি বিনয় ও কৃতার্থতার সাথে আরজ করলেন- হযরত! আমি আপনার কী খেদমত করতে পারি? হযরত আলী মিঁয়া মুহূর্তমাত্র বিলম্ব না করে বললেন- সবচেয়ে বড় খেদমত এই যে, হিন্দুস্তানের সাথে উত্তম সম্পর্ক বজায় রাখার চেষ্টা করুন, যাতে সেখানে আমরা স্বস্তির সাথে দ্বীন ও মিল্লাতের গঠনমূলক ও কল্যাণমূলক কাজ করে যেতে পারি। শহীদ জিয়াউল হক অকপটে বললেন, আমারও একই মত। কিন্তু এখানকার মানুষ খুবই ভাবাবেগ তাড়িত।

মোটকথা, হযরত আলী মিঁয়া ছিলেন ভারতের পঁচিশ কোটি মুসলমানদের একমাত্র পার্থিব আশ্রয়স্থল। যখনই কোন তুফান উঠেছে, মিল্লাতের অস্তিত্বের উপর আঘাত এসেছে তিনি তাঁর পর্বতপ্রমাণ ব্যক্তিত্ব নিয়ে কওম ও মিল্লাতকে আড়াল করে দাড়িয়েছেন। তাছাড়া বহু প্রতিকুল অবস্থা সবার অজ্ঞাতসারে তিনি একাই মোকাবেলা করেছেন। তাঁর বিশাল ব্যক্তিত্বের ছায়াতলে মুসলিম মিল্লাত অনেক সময় জানতেও পারেনি যে, কত বড় তুফান এসেছিল এবং চলেও গিয়েছে।

মাযাহেরুল উলুম সাহারানপুরের শায়খুল হাদীছ মাওলানা মুহাম্মাদ ইউনুছ সাহেব যথার্থই বলেছিলেন- এই বান্দায়ে খোদার ছায়া যেদিন উঠে যাবে, শুধু সেদিন কওম ও মিল্লাত বুঝবে যে, তিনি কে ছিলেন? কী ছিলেন? আজ তাঁর মৃত্যুতে সারা ভারতের মুসলিম নেতৃবৃন্দ যেভাবে শোক প্রকাশ করেছেন তা অক্ষরে অক্ষরে এ কথার সত্যতা প্রমাণ করে। আল্লাহ তাঁকে জান্নাতের আ'লা মাকাম নছীব করুন। আমীন!

নির্ঘন্ট

বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের নামঃ

আ

আবদুল আলী রহ.২৫,২৭,৪৬,৫৭, ৬২,৮৪,১২৫, ২৮৯
আবদুল্লাহ আব্বাস নদভী ৯৪, ২১৮
আবদুল্লাহ সুবাইল রহ.১৫২,৩০১, ৩০২
আলী তানতাবী রহ.১৩৮,৩০০
আমাতুল্লাহ তাসনীম রহ.২৫
আমাতুল আজীজ রহ.২৫,৪৩
আলামুল্লাহ রহ.৩৮,৩৯,৪৪,৪৫,৪৬, ১০৮,১১২,২৩৮,২৪১,২৮০,৩৪১
আহমাদ শেরবাসী রহ.১৭৪
আবদুল্লাহ আস সালেম রহ.১৮০, ২৪৩,২৪৪,২৪৫,৩০৮
আহমাদ আলী সাহারানপুরী রহ.২৫, ২৬
আহমাদ সেরহিন্দী রহ.২৬০,

ই

ইলিয়াস কান্ধলভী রহ.১০১,১০২, ১১০
ইউসুফ কান্ধলভী রহ. ৩০,৯০,১০১, ১১০,
ইউসুফ কারজাবী ১৭৭,২৭৬,
ইয়াকুব কাসেমী রহ.২৪৮
ইয়াকুব মুজাদ্দেদী রহ.২৯৫,৩৪৪
ইমদাদুল্লাহ মুহাজেরে মক্কী রহ. ২৭৮,৩৪১
মাওলানা ইনায়েত আহমাদ রহ.১১৯,

উ

উবায়দুল্লাহ সিন্ধী. ৬৩,৬৫,২৫৫

এ

এজায আলী রহ. ৬৬,১৩৯

ও

শাহ ওসিউল্লাহ ইলাহাবাদী রহ.৩৪১
শাহ ওয়ালী উল্লাহ রহ.৫১,৬০,৮৩, ১৩০ ১৩৭,১৪৬,২৬০

ক

আবদুল করীম পারেখ ৩২০
কাসেম নানুতুবী রহ. ৪৭০,৪৭৮, ৪৭৯,৪৮০,৪৯২
সাইয়েদ কুতুব শহীদ রহ.১৪২, ১৭৪,২১১
আবদুল কাদের জিলানী রহ. ৩৭, ৩৮,৯৫, ২৬১,১৭৮,৩১৯,৪৯১,
আবদুল কাদের রায়পুরী রহ ২৬,২৮, ৩০,৮৭,৮৮,৮৯,৯০, ৯১,১১১,১১২, ২৮৫,২৮০,৩৩২, ৩৩৯,

খ

খায়রুন্নেসা রহ. ৪১,৪২,৪৩
খলীল আরব রহ. ২৫,৬৩,৭২, ১৩৪,১৩৯,

জ

জিয়াউল হক রহ. ২৩০,২৪৮,৫২৩

ত

কারী তৈয়ব রহ. ১৬১,৫২০,
তাকীউদ্দীন হেলালী রহ. ৬৮,৭২

ন

নাযেম নদভী রহ.১২৭,১৭৯

ফ

ফখরুদ্দীন রহ. ৪০,১০৭,১০৮,৫১৪,
আবদুল ফাত্তাহ রহ. ১৮৪,৩০০
ফযলে রহমান গঞ্জমুরাদাবাদী রহ. ১১৯,১২০,১২১,১২৩
ফয়সাল ৩০৪,

ম

মুহাম্মাদ আলী মুঙ্গেরী রহ.৭৪,৭৫, ১১৮
মাসুদ আলম নদভী রহ.৬৮,
মনযুর নোমানী রহ.৯০,১০১,১০২, ১০৯
মানাযের আহসান গিলানী রহ. ৩৪০, ২১০
মুহাম্মাদ আহমাদ ফুলপুরী রহ.২১৬
আবদুল মাজেদ দরীয়াবাদী রহ. ১৪১, ১৫৯,
মাহমুদুল হাসান রহ.১৬৭,২৭৭
মুহাম্মাদুল হাসানী রহ.৩৪১,

য

শায়খুল হাদীছ যাকারিয়া রহ.,২৮,৯০,১১০,১১২,১১১,১৫০, ২৪২,

শ

মুফতী মুহাম্মাদ শফী রহ.২৮৯
শিবলী নুমানী রহ. ২২৩,৪৮৪,৪৮৮,

স

সুলায়মান রহ.৩০,৩১,৩২,৪৭,৫১৪,
সালমান নদভী ১৪৯,২৭৩,
সানাউল্লাহ অমৃতসরী রহ.২৪০,২৪৩,
সিদ্দীক আহমাদ বান্দবী রহ.২১০
আবদুস সালাম কাদওয়ায়ী রহ.১২৭,

হ

ডাঃ আবদুল হাই রহ. ৫৭,৮৫,২৯৭
হাবীবুর রহমান শিরওয়ানী রহ.
হুসাইন আহমাদ মাদানী রহ. ২৬, ৬৬,২৬৩
হায়দার হাসান খান রহ. ২৬,৬৪, ১২৭

স্থানসমূহের নাম :

আ

আযমগড় ৩৩,১৬৭
আজমীর ২৭৬

ক

করাচী ৫১, ১১০,১১৩,১৭৮,২৩০ ২৩১,২৮৯,৪৩২,৪৫৫
কানপুর ৮৬,১১১,১১৯
কলকাতা ৬৮,১৮২,২৪৫,৪৩০,৪৫০
কাশ্মীর ১১১,২৪৫,২৭৬,৫১৫

দ

দেওবন্দ ৩৪,৫৫,৮১৮৭,১০১,১০৩
দায়েরায়ে শাহ আলামুল্লাহ ৩৮,৩৯, ৪০
দিল্লী ৫৬,৮২,৮৮,১০১,১০৮,১৬৭

ন

নিযামুদ্দীন ১০১,১০২,১১০,১৪১

ব

বোম্বে ৩৪,২৪৪

ম

মুরাদাবাদ ৩২৩

র

রায়বেরেলী ২৫,৩৮,৩৯,৪০,৪৩,৪৪, ৪৭,৫০,৬৪,৯১,১০৮,১১২, ১৭৯, ২১৯,২২১, ২৩৭,২৩৮,২৪০,২৫১, ৩২৬,৩৩৯

ল

লাহোর ৩৪,৩৬,,৬৫,৮৩,৮৫, ৮৭, ৯০,১৪১,১৬৭,১৭০,২৪৭,২৫৬, ২৮৩,২৮৫ ২৮৭,৩১৫

স

সাহারানপুর ৮৭,৮৮,৯১,১০১,১০২, ১২০,১৫৫,২১৬,৩২০,৩৪০,৩৪১

হ

হায়দারাবাদ ১২৬,১৩৭,১৩৯,২৪৭, ২৪৯

পত্রিকার নামসমূহ

আ

আল-বা'সুল ইসলামী -২৪৯
আরা-রায়েদ -২৪৯
আদ-দায়ী -২৪৯
আস-সাহওয়াতুল ইসলামীয়া -২৪৯
আল-জমিয়ত -২৪৯
আফকারে মিল্লী -২৪৯
আল-বালাগ -২৫০
আনওয়ারে মদীনা
আন্-নসীহাহ্ -২৫০
আস্-সিয়াসাহ্ -২৫০
আশ-শারেক -২৪৯
আয্-যবরাহ্ -২৪৯
আরমাগানে জামেয়া -২৪৯
আল-হক -২৫০
আল-ফুরকান-২৪৯
আল-ফারুক -২৫০

ই

ইনকিলাব-২৫০
ইয়ানাত-২৫০

খ

খতমে নবুয়ত-২৫০

ত

তামীরে আফকার
তাকবীর -২৫০
তামীরে হায়াত -২৪৯
তরজমানুল কুরআন-২৫০
তাযকীর-২৪৯

ন

নাওয়ায়ে আদব বোম্বে -২৪৯
নুসরাতুল ইসলাম -২৪৯
নকশে নাওয়ায়েত -২৪৯
নয়ী দুনিয়া-২৪৯

ব

বাঙ্গেদারা-২৪৯

ম

মাসিক মদীনা-২৫০
মিল্লী ইত্তেহাদ-২৪৯

স

সংগ্রাম-২৫০
সওতুল কুরআন-২৪৯

র

রিজওয়ান-২৪৯

হ

হেদায়েত -২৪৯
হক চার ইয়ার-২৫০

কিতাবসমূহের নাম :

আ

আল কিরাআতুর রাশীদা ৫৯,১৩৪, ১৪৪
আরকানে আরবাআ ২৯,৩২৮,৩৪০, ৩৫১,৪০৭
আল মুরতাযা ৩৪২

ক

কাসাসুন্নাবিয়্যীন ১৪১,১৪৩,১৪৪
কাদিয়ানিয়্যাত ৩৪২
কারওয়ানে মাদীনা ৩৪২
কারওয়ানে জিন্দেগী ৩৪২

ত

তাযকিয়া, ইহসান, তাসাউফ ওয়া সুলুক ৩৪২
তারীখে দাওয়াত ওয়া আযীমাত ৩৬৭
তামীরে ইনসানিয়াত ৩৪৪

দ

দুরুসুল আদব ১৩৩
দো মাহিনা আমেরিকা মে ৩৪১

ন

নবীয়ে রহমত ৩৩৯
নুকুশে ইকবাল ৩৪৩

প

পাজা সুরগে জিন্দেগী ৩৪৪
পুরানে চেরাগ ৩৪০

ম

মাকামাতে হারীরী ১৩৫,১৩৭
মা যা খাসিরাল আলামু বি - ইনহিতাতিল মুসলিমীন ৩৩৪,৩৩৬
মুখতারাত ১৩৫,১৩৮,১৪৪,১৬৪

য

যিকরে খাইর ৩৪৪
যব ঈমান কা বাহার আয়ী ৩৪৫

স

সুহবতে রা আহলে দেল ৩৪৪

হ

হায়াতে আবদুল হাই ৩৪৪
হাদীসে পাকিস্তান ৩৪৪
হায়াতে শায়খুল হাদীস ৩৪১



দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামার প্রধান গেইট



দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামার কেন্দ্রীয় ভবণ



দায়েরায়ে শাহ্ আলামুল্লাহ রায়বেরেলীতে হযরত মাওলানার বিশ্রাম কক্ষ



এখানে চির নিদ্রায় শায়িত হযরত মাওলানা (শাহ্ আলামুল্লাহ কবরস্থান)



মা'হাদুল কুরআনিল কারীম



আল্লামা শিবলী রহ. পাঠাগার



আল্লামা সুলায়মান নদভী রহ. ছাত্রাবাস



দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামার কেন্দ্রীয় ভবণের একাংশ